তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী

দ্বাদশ খণ্ড

ঊনত্রিংশতিতম এবং ত্রিংশতিতম পারা

(সূরা মুল্‌ক থেকে সূরা নাস পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা তালেব আলী
পুনর্লিখন ও সম্পাদনা ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

মুদ্রকঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা–১০০০।
ফোন ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

তৃতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০১১, সফর ১৪৩২ হিজরী

বিনিময় ঃ চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI (12th Volume): Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Taleb Ali and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange : Taka Four Hundred Fifty only. US$ 20.00

ISBN 984-70240-0012-5

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

পথ। পথচারী। পথপরিক্রমণ। এগুলোই তো আমাদের ভাবনার বিষয়। আর বেদনার বিষয় হচ্ছে জ্ঞান, প্রেম, গন্তব্যগামিতার অনির্ণেয়ন। আমরা জানি না, সম্মুখে কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। সাফল্য, না বৈফল্য। আনন্দ না আক্ষেপ। পরিতৃপ্তি, না পরিহ্বতি।

মহাজীবনের মহাপরিক্রমা জুড়ে আমাদেরই কলরব। নিজেকে নিয়ে। নিজেদেরকে নিয়ে। নিয়ে পরিপার্শ্বের সহস্র-অসংখ্য প্রকরণ— প্রতিদিনের পুষ্প-বৃক্ষ-বিহঙ্গ। নিরবধি নদী-জলধি। নিরন্তর গিরি-মরু-প্রান্তর। আকাশ-মহাকাশ। নক্ষত্র-নীহারিকা। প্রজ্ঞার এমতো বহিরাবয়বসর্বস্বতাই তো আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছে দূরে। হৃদয়ের ঐশ্বর্যানুসন্ধান থেকে। বিশ্বাস থেকে। প্রেম থেকে। গভীর, গভীরতর জীবনায়ন থেকে। এভাবে আমাদের মনোনিবেশন, অভিনিবেশন হয়ে গিয়েছে একনেত্রবিশিষ্ট মৃগের মতো। একদেশদর্শী বিভ্রান্তির মতো। সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিকতায়। অথবা এর বিপরীতের বিকৃতিতে। এভাবে কেউ হয়ে গিয়েছি বস্তুবাদী। কেউ অতি ভাববাদী। কেউ বাম। কেউ ডান। মহামানবতার হৃদয়ের একাংশ তাই ফুল ও ফসলশূন্য। আর একাংশ পরিপূর্ণ আগাছায়। বিষবৃক্ষে। সংঘর্ষ-সংক্ষুব্ধ সভ্যতায় এভাবেই শুরু হয়েছে শরনিক্ষেপণ—

মৌলবাদিতার, প্রতি-মৌলবাদিতার। এভাবে আমরা হারিয়ে ফেলতে বসেছি প্রকৃত পথ। যে পথ সহজ, সরল, অতল, উতরোল। যে পথের বাম যেমন নেই, তেমনি নেই দক্ষিণও। আমাদেরকে তো এ পথেই এসে দাঁড়াতে হবে। সরে আসতে হবে বাম এবং ডান থেকে। সরে আসতে হবে হিংসা-প্রতিহিংসা থেকে। অজ্ঞতা-প্রতিঅজ্ঞতা থেকে। উপড়ে ফেলতে হবে উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা ও উন্নাসিকতার সকল শিকড়। এই মহান কর্তব্যকর্ম আমরা সম্পন্ন করতে পারবো তখন, যখন পূর্ণরূপে মগ্ন হতে পারবো আমাদের একমাত্র প্রভুপালয়িতা আল্লাহ্‌র নিরবচ্ছিন্ন স্মরণে— যা সম্ভব হতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণের সান্নিধ্য-সম্পৃক্ততায়। তাঁরা তো এসেছিলেন। এসেছিলেন তাঁদের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতমজন— হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজ্‌তবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর নেপথ্যায়ন সত্ত্বেও মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত অবশ্যকার্যকর থাকবে তাঁরই আনীত কোরআন, তাঁরই শরিয়তের বিধি-বিধান। তার সঙ্গে অবশ্যই প্রবহমান থাকবে তাঁর সুমহান সান্নিধ্যের পরম্পরা— সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, পীর-মোর্শেদগণ। থাকবেই। কারণ এই সান্নিধ্যপ্রবাহের আলো (তাওয়াজ্জোহ) না পেলে কখনো দূর হবে না বক্ষাভ্যন্তরের অন্ধকার, সংকুচিতি। অন্তরের অন্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে না প্রকৃত বিশ্বাস, জ্ঞান, মারেফত। মুক্তিলাভ ঘটবে না প্রকাশ্য-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (জলি-খফি-আখফা) অংশীবাদিতা (শিরিক) থেকে। বার বার আমরা পঙ্কিত হতে থাকবো কাদিয়ানি, মওদুদী ফেৎনার মতো ভয়ংকর সব ফেৎনায়। সুতরাং আমরা বিদ্বান-অবিদ্বান, দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী সকলকেই বলি, আসুন প্রকৃত পথে— সিরাত্বল মুসতাক্বীমে। এ পথের প্রকৃত তত্ত্ব (হকিকত) অদৃশ্য। এর গন্তব্যের পরিসমাপ্তিও অদৃশ্যে। অদৃশ্য সত্তায়। আর পূর্ণসমর্পণই (ইসলাম) এ পথের পথিকের একমাত্র যোগ্যতা। আমরা তো এভাবেই মান্য করেছি তাঁকে। আর তিনিও আমাদেরকে এভাবে পূর্ণসমর্পিত বিশ্বাসী হতে বলেছেন। এরশাদ করেছেন 'ইউ'মিনূনা বিল গইব' (আর যে অদৃশ্যে বিশ্বাস করে)।

হ্যাঁ, আমাদের প্রকৃত আরাধ্য-উপাস্য হওয়ার যোগ্য যিনি, তিনি তো অদৃশ্যই হবেন। তিনি তো আমাদের দৃষ্টি, শ্রুতি, জ্ঞান, বোধ-উপলব্ধির আওতায় আসতেই পারেন না। কেননা আমাদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বসম্পৃক্ত সকলকিছুই সীমাবদ্ধ। আর তিনি আনুরূপ্যবিহীনরূপে অসীম, অবিভাজ্য, এক, একক, অদ্বিতীয়। নিসর্গ, মহানিসর্গ এবং নিসর্গাধিনায়ক এই আমরা— সমগ্র সৃষ্টি সর্বোতরূপে তাঁরই আওতায়। সুতরাং আমরা তাঁর প্রতি সমর্পিত প্রত্যয়ে স্থিত হবো না কেনো? কেনো মেনে নেবো না তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহকে। তিনিই তো আমাদের একমাত্র আশ্রয়, প্রশ্রয়, মহাপ্রভুপালয়িতা।

জ্ঞান, প্রেম, সফলতা, ঋদ্ধি-সিদ্ধি-পরিত্রাণ সকলকিছুই তো নিহিত রয়েছে তাঁর অব্যয়-অক্ষয় বাণীসম্ভারের মধ্যে— যার সর্বশেষ বিচ্ছুরণ এই মহাগ্রন্থ, এই আল কোরআন। আমরা বিশ্বমানবতাকে এই মহাজ্ঞানের অনুধ্যানে সমবেত হতে বলি, যেমন বলেছেন এই উম্মতের মহান পূর্বসূরী সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী, পীর-মোর্শেদ-আলেম-আরেফগণ। এর এক অনন্যসাধারণ যথাভাষ্যের বঙ্গাক্ষরান্তরণের দুরূহ কাজে

নিয়োজিত হয়েছিলাম আমরা সেই আহ্বানের প্রতিধ্বনি পরিপূরণার্থেই। আলহামদু লিল্লাহ্! দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসর পর আমরা এ মহান দায়িত্ব সমাপন করতে পারলাম। আমাদের যুথবদ্ধ এই প্রচেষ্টাকে তিনিই তো দান করলেন এভাবে নিশ্চিন্তি ও প্রশান্তি। সকল প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি কেবলই তাঁর। আমরা তাঁর অভিপ্রায়ের বাতাসে ভাসমান মেঘমালার মতো। ভেসে ভেসে চলেছি। যেদিকে যেভাবে তিনি চান, সেদিকে সেভাবে। আমরা তো তাঁরই জন্য এবং তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের। সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম প্রতিনিয়ত বর্ষিত হতে থাক তাঁর পরম প্রিয়তম, শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম বার্তাবাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজ্তবা সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি। তৎসহ তাঁর নবী-রসুল-ভ্রাতৃবৃন্দ, তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজন-বংশধর-সহচর এবং একনিষ্ঠ অনুগামী আউলিয়াগণের প্রতি। বিশেষ করে আমাদের প্রিয়তম পীর ও মোর্শেদ ইমামুল আউলিয়া হজরত হাকিম আবদুল হাকিমের প্রতি। আমিন।

এবার **'তাফসীরে মাযহারী'** রচয়িতা সম্মানার্হ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী সম্পর্কে কিছু কথা ঃ ১১৪৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জন্মস্থান ভারতের ঐতিহাসিক শহর পানিপথ। ওই শহরেরই বিজ্ঞ বিচারক ছিলেন তিনি। ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিআল্লাহ্ আনহুর বংশধর। তাঁর মাযহাব ছিলো হানাফী এবং তরিকা ছিলো মোজাদ্দেদি। এই দুই নূরের মহাসমুদ্র তাঁর বিশ্বাসে, আচরণে, কথায়, সিদ্ধান্তে, লেখনীতে বিকশিত হয়েছিলো বিস্ময়কর বিচ্ছুরণে। ধ্রুপদী আরবী ভাষায় দশ খণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ কলেবরের তাফসীরে মাযহারী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি ছিলেন প্রায় তিরিশটি গ্রন্থের সফল রচয়িতা। তার মধ্যে তাফসীরে মাযহারীই তাঁর বৃহত্তম ও মহোত্তম কীর্তি।

গ্রন্থটির নাম রেখেছেন তিনি তাঁর পীর-মোর্শেদের নামে। তিনি ছিলেন প্রকৃত আলেম ও আরেফ। তাঁর মধ্যে সমমাত্রায় একত্র হয়েছিলো রেওয়ায়েত (বর্ণনাক্রমিক বিদ্যা) দেরায়েত (বৃদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানানুশীলন) এবং ফেরাসাত (অন্তর্দৃষ্টি)। যাদের অন্তর অন্ধ, তারা তাঁর সম্যক মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবেন না। বুঝতে পারবেন না কখনো, পীর-মোর্শেদের সাহচর্য ও তাওয়াজ্জোহ্ কতো মূল্যবান। মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দির সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরম্পরা নেমে এসেছিলো তাঁর প্রিয় সন্তান খাজা মোহাম্মদ মাসুম, তাঁর সন্তান খাজা সাইফুদ্দিন, তাঁর খলিফা শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী এবং তাঁর খলিফা শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা'র মাধ্যমে (রহমাতুল্লাহি আ'লাইহিম আজ্মাঈন)। এই তরিকাই শেষ দিকে মোজাদ্দেদিয়া তরিকা, প্রথম দিকে নক্শাবন্দিয়া তরিকা এবং পূর্বাপর সকল সময়ে নেসবতে সিদ্দিকী নামে খ্যাত। কেননা এই আধ্যাত্মিক প্রবাহের মূলে রয়েছেন ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক ইবনে আবু কোহাফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

প্রভূত প্রতিভার অধিকারী এই কালজয়ী পুরুষ সমগ্র কোরআন স্মৃতিবদ্ধ করেন তাঁর সাত বৎসর বয়ক্রমকালে। তারপর শুরু করেন অন্যান্য বিদ্যার চর্চা। তাঁর হাদিসশাস্ত্রের গুরু ছিলেন সে সময়ের সবচেয়ে খ্যাত হাদিসবেত্তা শায়েখ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী। তাঁর

সন্তান শায়েখ আবদুল আজিজ দেহলভী ছিলেন তাঁর সতীর্থ ও সুহৃদ। প্রথমোক্ত জন বলতেন 'ছানাউল্লাহ্কে ফেরেশতারাও সম্মান করে'। শেষোক্ত জন তাঁকে বলতেন 'এযুগের বায়হাকী'। আর তাঁর প্রিয়তম পীর-মোর্শেদ তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন 'পথের দিশারী' (আলামুল হুদা)। তিনি আরো বলতেন 'মহাবিচারের দিবসে কী নিয়ে এসেছো' এমতো প্রশ্নের মুখোমুখি যদি হই, তবে আমি বলবো 'ছানাউল্লাহ্কে'।

প্রতিদিন এক মঞ্জিল কোরআন পাঠ করতেন তিনি। অতিরিক্ত নামাজ পাঠ করতেন একশত রাকাত। আজীবন এই-ই ছিলো তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। এর সঙ্গে নিয়মিত সম্পন্ন করতেন বিচারপ্রার্থীদের বিচার-মীমাংসার দায়িত্ব। এর পরে যে সময়টুকু পেতেন, তা ব্যয় করতেন জ্ঞানানুশীলনে ও গ্রন্থ রচনায়। এভাবে এক সময় অতীত হয়ে গেলো অনেক আলো এবং অনেক অন্ধকার। দিবসের। নিশীথের। মানব সমাজের উত্থান-পতনের। ভারতের সুদীর্ঘ কালের মুসলিম শাসন তখন অস্তমিতপ্রায়। সেই প্রহত প্রদোষকালে তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন এই অনির্বাণ বাতিঘর— মহাজ্ঞানের এই অনন্য উপপ্লব, তাফসীরে মাযহারী। কাজ শেষে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন তাঁর পরম প্রিয়তম সখার কাছে ১২২৫ হিজরী সনের ১১ই রমজানে। আল্লাহ্পাক তাঁকে করুন মহাকল্যাণাধিকারী। আর আমাদেরকে করুন ক্ষমায়িত, অনুকম্পায়িত। আমরা একথা ভেবে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকতে চাই যে, তাফসীরে মাযহারীর অক্ষরান্তরণ-প্রক্রিয়ায় আমাদেরকেও নিযুক্ত করা হয়েছিলো অন্ততপক্ষে তো শ্রমিকরূপে। আমরা নীরবে-নিভৃতে-নেপথ্যে সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি সজল চোখে আমৃত্যু স্মরণ করতে চাই। চাই পরিতোষ কেবল তাঁর। আমরা মানে অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, আর্থিক ও অন্যবিধ-সহায়ক, প্রচারক-প্রচারিকা, পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী। আল্লাহুম্মা আমিন।

পরিশেষের জ্ঞাতব্য ঃ আমরা এই মহান গ্রন্থের অনুবাদ করেছি মূলত দিল্লীর নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈম কৃত উর্দু তরজমা থেকে।। অবশ্য জটিল বিষয়গুলো পরীক্ষা করে নিয়েছি আরবী ভাষ্য থেকে। আর বঙ্গানুবাদখানি আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে ব্যবহার করেছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ এর 'আল-কুরআনুল করীম' থেকে। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি উপরোধ— ত্রুটি ও অনবধানতা চোখে পড়লে জানাবেন। আমরা কৃতার্থ হবো। দোয়াও করবো।

শান্তি সম্ভাষণ— সর্বপ্রথমে ও সর্বশেষে।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

ঊনত্রিংশতিতম পারা¾ সূরা মুলক ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ১ ¾ ৫২

সূরা মাআ'রিজ ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৪

সুরা নূহ ঃ আয়াত ১ ¾ ২৮

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১ ¾ ২৮

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১ ¾ ২০

তাফসীরে মাযহারী
দ্বাদশ খণ্ড
ঊনত্রিংশতিতম এবং ত্রিংশতিতম পারা
(সূরা মূলক থেকে সূরা নাস পর্যন্ত)

মুলক ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০
ক্বলাম ঃ আয়াত ১ ¾ ৫২
হাক্বক্বহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৫২
মাআ'রিজ ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৪
নূহ ঃ আয়াত ১ ¾ ২৮
জ্বিন ঃ আয়াত ১ ¾ ২৮
মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১ ¾ ২০
মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ১ ¾ ৫৬
ক্বিয়ামাহ ঃ আয়াত ১ ¾ ৪০
দাহর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩১
মুরসালাত ঃ আয়াত ১ ¾ ৫০
নাবা ঃ আয়াত ১ ¾ ৪০
নাযিআ'ত ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৬
আ'বাসা ঃ আয়াত ১ ¾ ৪২
তাকভীর ঃ আয়াত ১ ¾ ২৯
ইনফিত্বর ঃ আয়াত ১ ¾ ১৯
মুত্বাফ্ফিফীন ঃ আয়াত ১ ¾ ৩৬
ইনশিক্বাক্ব ঃ আয়াত ১ ¾ ২৫
বুরূজ ঃ আয়াত ১ ¾ ২২
ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ১ ¾ ১৭
আ'লা ঃ আয়াত ১ ¾ ১৯
গশিয়াহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ২৬
ফাজ্বর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০
বালাদ ঃ আয়াত ১ ¾ ২০
শামস্ ঃ আয়াত ১ ¾ ১৫
লাইল ঃ আয়াত ১ ¾ ২১
দ্বুহা ঃ আয়াত ১ ¾ ১১
ইনশিরাহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
তীন ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
আ'লাক্ব ঃ আয়াত ১ ¾ ১৯
ক্বদর ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
বায়্যিনাহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
যিলযাল ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
আ'দিয়াত ঃ আয়াত ১ ¾ ১১
ক্বরিয়াহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ১১
তাকাছুর ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
আসর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩
হুমাযাহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৯
ফীল ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
ক্বুরাইশ ঃ আয়াত ১ ¾ ৪
মাঊন ঃ আয়াত ১ ¾ ৭
কাউছার ঃ আয়াত ১ ¾ ৩
কাফিরূন ঃ আয়াত ১ ¾ ৬
নাসর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩
লাহাব ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
ইখলাস ঃ আয়াত ১ ¾ ৪
ফালাক্ব ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
নাস ঃ আয়াত ১ ¾ ৬

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

ঊনত্রিংশতিতম পারা

হে আমাদের পরম প্রেমময় প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। তাই আমরা স্তব-স্তুতি ও মহিমা প্রকাশ করি কেবল তোমার, করি ইবাদত। কামনা করি কেবল তোমার শরণ। আর মার্জনা প্রার্থী হই তোমারই সকাশে। মানুষ প্রতিপ্রত্তিশালী হতে পারে কেবল তোমারই অভিপ্রায়ানুসারে। আবার তোমার ইচ্ছাতেই হয়ে যায় প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। তুমিই তোমার পবিত্র অনুমোদনানুসারে কাউকে করো রাজ্যাধিপতি, আবার কাউকে করো রাজ্যহারা। কেননা সকল ক্ষমতা তোমার। সমগ্র কল্যাণসম্ভারও তোমার। তুমিই আমাদের এক, একক, অবিভাজ্য, চিরঅসমকক্ষ, আনুরূপ্যবিহীন অধিকর্তা। আমরা তোমারই সকাশে যাচনা করি তোমার কৃপা, শান্তি ও সান্নিধ্য। আর সকল প্রকার শান্তিবারতা ও করুণা বর্ষিত হোক তোমারই প্রেমাস্পদ, সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সালাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি তোমা কর্তৃক অবতারিত শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম নভজ বাণীসম্ভারের ধারক ও বাহক। শান্তিবারতা ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁদের প্রতিও যাঁরা তোমার প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ— নবী-রসুল, সাহাবীবৃন্দ এবং আউলিয়াবর্গ। আমিন।

এবার শুরু হচ্ছে সুরা মুলক সম্পর্কে আলোচনা। ২ রুকু এবং ৩০ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়।

সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ১, ২

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ بِیَدِهِ الۡمُلۡكُ ۫ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرُ ۙ﴿۱﴾ الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَكُمۡ اَیُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿۲﴾

r মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ত; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাবারাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুল্ক'। এর অর্থ— মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত। এখানকার 'তাবারাক' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'বরকত' থেকে। এর অর্থ— সুপ্রচুর, চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতা, যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ন্যূনতার অবকাশ মাত্র নেই। আর এটি আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে এমন এক গুণ, যা তাঁর সত্তার মতোই অচিন্তনীয় ও আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তা অননুমানীয়।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র অন্যান্য গুণবত্তাও এরকম। অর্থাৎ তাঁর সকল গুণই আদি-অন্তহীন, প্রকারবিহীন, অবিভাজ্য ও আনুরূপ্যবিহীন হিসেবে পূর্ণ ও পরিণত। যেমন— 'রহমান' (দয়ার্দ্র)। মানুষের অন্তরে দয়া-মায়ার সূত্রপাত যেভাবে হয়, আল্লাহ্র দয়া-মায়া সেরকম নয়। মানুষ কারো প্রতি আকৃষ্ট হলে তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয় আবেগ, অনুরাগ, করুণা, ভালোবাসা। এই আবেগ-অনুরাগেরই পরিণতি হচ্ছে দয়া-মমতা-ভালোবাসা। কিন্তু আল্লাহ্পাকের দয়া এরকম নয়। কেননা তিনি মানুষের মতো হৃদয়বিশিষ্ট ও আবেগতাড়িত নন। বরং তাঁর দয়া তাঁর সত্তাসম্পৃক্ত। তাই তা তাঁর সত্তার মতোই আকার-প্রকারবিহীন এবং সূচনা-সমাপ্তিবিবর্জিত। তাই তিনি সূত্রপাত ও পরিণতির মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতিরেকেই দয়ার্দ্র, কল্যাণময়, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ইত্যাদি। তাঁর সকল গুণের মতো তাই 'মহামহিমান্বিত' হওয়ার বিষয়টিও অতুলনীয়রূপে সুপ্রচুর, অগণনীয় এবং অননুমানীয়। তাঁর এমতো রকম-প্রকারহীন পরিপূর্ণত্ব প্রকাশার্থেই অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে 'বাসীর' 'আজীম' 'মুতাআ'ল' ইত্যাদি।

'সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত' কথাটি আয়াতে মুতাশাবিহাতের (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতসমূহের) অন্তর্ভুক্ত। এখানকার 'ইয়াদ' এর শাব্দিক অর্থ হাত। হাত হচ্ছে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতীক। কিন্তু এখানে শব্দটির মাধ্যমে যে শক্তি ও কর্তৃত্বের কথা বুঝানো হয়েছে, তা চিররহস্যময়, তাই অবোধ্য। কেননা তা আল্লাহ্র গুণ। পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ শব্দটির অর্থ করেছেন— ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার, আধিপত্য ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার, আধিপত্য কেবল তাঁর। আর 'মুল্ক' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সমগ্র সৃষ্টির একক ও অবিভাজ্য অধিকর্তা কেবল আল্লাহ্। এর মধ্যে অন্য কারো বা কোনোকিছুর অংশীদারিত্ব নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদীর' (তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান)। এখানে 'শাই' অর্থ সচেতন-নিশ্চেতন সকল সৃষ্টি, যার উপরে আল্লাহ্র অভিপ্রায় কার্যকর হয়। অর্থাৎ সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে

ইমকানের) সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়, অধিকার ও ক্ষমতাভূত। তাঁর এমতো অভিপ্রায়, অধিকার ও ক্ষমতা আবার অবশ্যম্ভাবিতার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে (দায়রায়ে উজুবে) কার্যকর নয়। কেননা সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যের সে বৃত্ত কেবল তাঁর, যা আদি-অন্তহীন, রকম-প্রকারবিহীন, অব্যয়, অক্ষয়, চিরন্তন। সম্ভাব্যেরা লুপ্ত হতে পারে, হতে পারে বিবর্তিত, পরিবর্তিত, কিন্তু তাঁর অবশ্যম্ভাবিতার লুপ্তি, বিবর্তিতি ও পরিবর্তিতি অসম্ভব। সুতরাং তিনিই সম্ভাব্যের বৃত্তবাসীদের ভয় ও ভরসার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপাস্য।

যেনো আলোচ্য আয়াতের দাবি চারটি— তিনি সদা বিদ্যমান। তিনি চরম পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আর পরবর্তী আয়াতসমূহে এ দাবির উপরই উপস্থাপন করা হয়েছে যুক্তি প্রমাণ। প্রথমতঃ মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্পাকের শক্তিমত্তার যে নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শীর্ষতম নির্দশন হচ্ছে 'খলাক্বাল মাওতা ওয়াল হায়াত' (জীবন আর মরণের সৃষ্টি)। এরপর আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে অগণন নিদর্শনাবলী। যেমন আকাশে নেই কোনো খুঁত। না আছে ফাটল। এরপর এসেছে পৃথিবী সৃষ্টির কথা। সেখানে ভূমিকে করা হয়েছে বাসোপযোগী। করা হয়েছে উপজীবিকা উৎপাদনের ক্ষেত্র। প্রাণীকুলের বিচরণ ও আহার্য আহরণের শস্যভাণ্ডার। এরপর 'তোমরা কি দ্যাখো না পক্ষীকুলের প্রতি' বলে শূন্যমণ্ডলে অবস্থানকারী সৃষ্ট জীব সারি সারি পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর নেপথ্যে ঘোষিত হয়েছে অবাধ্য অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথা। আর ভীতশংকিত কল্যাণ আহরণকারী বিশ্বাসীদের পুণ্য প্রতিদানের কথা।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন'। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকের এক নাম 'হাই'। এর অর্থ— চিরঞ্জীব, চিরদিনের জন্য জীবিত। এ ধরনের জীবিত সত্তার আবার কয়েকটি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। যেমন— তাঁকে হতে হবে প্রাজ্ঞ, দক্ষ ও জীবনপ্রদাতা। লক্ষণীয়, এ সকল গুণ রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। তিনিই তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে তাঁর সৃষ্টিনিচয়কে দিয়েছেন বিভিন্ন প্রকৃতির ভারসাম্যময় জীবন। যেমন—

মানব জীবন ঃ আল্লাহ্পাক মানুষকে এমন জীবন দান করেছেন যে, সে এমতো জীবনের অধিকারী হওয়ার কারণে লাভ করতে পারে আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের পরিচয়। এই 'আমানত' (গচ্ছিত ধন) মানুষ বরণ করে নিয়েছে স্বেচ্ছায়, সে গুরুভার বহন করবার আহ্বান শুনে শংকিত হয়েছিলো আকাশ-পৃথিবী-গিরি-কান্তার। আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য এই শুভজীবন অর্জিত হতে পারে কেবল তাঁরই দয়ায়, তাঁরই একান্ত সন্নিধানের জ্যোতি-সম্পাতে। এমতো জীবনের বিপরীত মৃত্যু সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সে ছিলো প্রাণহীন, পরে আমিই তাকে দান করলাম জীবন'। একথার অর্থ তত্ত্বজ্ঞানহীন মৃতবৎ মানুষকে আমিই দান করেছি জীবনরূপী ইমান ও তত্ত্বজ্ঞান। এভাবেই বিশ্বাসীরা

হতে পেরেছে এমন সফল জীবনের অধিকারী, যা মৃত্যুহীন। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে বিঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ্ এই মহাসৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন অন্ধকারে। তারপর তার উপর ঘটিয়েছেন জ্যোতির সম্পাত। যে সেই জ্যোতি পেয়েছে, সে হয়েছে পথপ্রাপ্ত এবং যে পায়নি, সে হয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, শুকিয়ে গিয়েছে অদৃষ্ট লিপিবদ্ধকারী লেখনী।

পশু-জীবন। পশুকুলের জীবন আবার অন্য রকমের। এ ধরনের জীবনপ্রাপ্তদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা ছিলো মৃত, তাদেরকে জীবন্ত করেছি, আমিই। অবশেষে তাদেরকে করবো মৃত'। একথার অর্থ— তারা ছিলো মৃত, অতঃপর আমি তাদেরকে দান করলাম পশুর জীবন। পুনরায় আমি তাদেরকে করবো অনুভূতিশূন্য, অচল।

উদ্ভিদ-জীবন ঃ উদ্ভিদরাজিকে জীবন দেওয়া হয়েছে কেবল বংশবিস্তারের জন্য। তাই উদ্ভিদ-জীবন কেবল দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও আয়তনবিশিষ্ট। এ সম্পর্কে এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'আমিই বিশুষ্ক ভূমিকে করি সঞ্জীবিত'। অর্থাৎ— মৃতবৎমৃত্তিকায় বৃষ্টি বর্ষণ করে আমিই করি তাকে তৃণলতা ও উদ্ভিদ উৎপাদনের উপযোগী।

উল্লেখ্য, এই তিন ধরনের জীবনের সৃজয়িতা আল্লাহ্। তাঁর অমোঘ নির্দেশ 'হও' এর মাধ্যমেই বিকশিত হয় এই ত্রিবিধ জীবন। যা নিরেট জড়, তার মধ্যে আল্লাহ্র এমতো নির্দেশের প্রতিফলন নেই। তাই পৌত্তলিকদের জড়প্রতিমাসমূহকে বলা হয়েছে 'অপ্রাণ'। কিন্তু কোনো কোনো জড়প্রস্তরও 'হও' নির্দেশের অন্তর্গত। তাই সেগুলো নিশ্চেতন হলেও জীবিত। সেগুলো সম্পর্কে তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওই প্রস্তরসমূহের মধ্যে এমন প্রস্তরও রয়েছে, যেগুলো পতিত হয় আল্লাহ্র ভয়ে'। এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। এভাবে দেখা যায়, যা কিছু মানবনির্মিত, তার সকলকিছুই অপ্রাণ, আর আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত জড়-অজড় সকল সৃষ্টিই প্রাণবান। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সকল সৃষ্টি বর্ণনা করে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা'।

'মাউত' অর্থ মৃত্যু। এই মৃত্যু হতে পারে দু'ধরনের— ১. অপ্রাণ ২. প্রাণহীন। প্রাণহীন প্রাণবান হবার যোগ্য। যেমন 'দৃষ্টিহীন' শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে মানুষ ও অন্যান্য চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণীকুলের ক্ষেত্রে, যেহেতু তারা সকলে দৃষ্টিশক্তি ধারণের যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু দেয়াল, কিংবা বৃক্ষকে অন্ধ বা দৃষ্টিহীন বলা যায় না। কেননা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই। তেমনি 'অপ্রাণ' হচ্ছে প্রাণধারণের যোগ্যতারহিত এবং 'মৃত' অর্থ ওই মৃত্যুপ্রাপ্ত যে জীবিত অথবা পুনরুজ্জীবিত হবার যোগ্যতাধারী।

জীবন ও মৃত্যুর বিবরণসংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের মতো মৃত্যুও একটি সৃষ্টি। আর আল্লাহ্পাক মৃত্যুকেই সৃষ্টি করেছেন প্রথমে, তারপর জীবনকে। যেমন বলা হয়েছে 'সে ছিলো মৃত, তারপর আমি

তাকে করেছি জীবিত' 'তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, এরপর আমি তোমাদেরকে দান করেছি জীবন' 'তিনি ভূমিকে জীবন্ত করেছেন তার মৃত্যুর পর'। এতে করে বুঝা যায় মৃত্যু শূন্যতানির্ভর নয়, কেননা শূন্যতার উপরে কোনোকিছুই নির্ভরশীল হতে পারে না এবং জীবন অস্তিত্বনির্ভর।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'মৃত্যু'ও অস্তিত্বনির্ভর, তবে সে অস্তিত্ব জীবিত অস্তিত্বের বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ জীবনের বিপরীত মরণ (যেনো কোনো মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ)। জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রজ্ঞা, সামর্থ্য, সচলতা ও অনুভূতি। প্রতিটি জীব সত্তায় এ লক্ষণগুলো পরিদৃষ্ট হয়। মৃত্যু এগুলোকেই বিলোপ করে। এমতো অভিমতের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয় এই আয়াতকেই 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন'। অতএব বুঝতে হবে মৃত্যু যখন সৃষ্ট, তখন তা অবশ্যই অস্তিত্বশীল। কেননা অস্তিত্বহীন কোনো কিছু 'সৃষ্ট' পদবাচ্য হতে পারে না। আমরা কিন্তু এই অভিমতটির পরিপন্থী। তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যু এমন কোনো অনস্তিত্ব নয়, যা অন্য কোনো স্থান থেকে এনে শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। বরং মৃত্যু হচ্ছে দেহের বিলোপন সংক্রান্ত একটি বিশেষণ, যা কার্যকর হয় দেহাভ্যন্তরেই। আর তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় শবদেহে। তখন সচল দেহ হয়ে যায় অচল, স্থবির, অনুভূতিশূন্য ও অকর্মণ্য। যেমন চক্ষুষ্মানেরা হয়ে যায় দৃষ্টিহীন, যখন বিলোপিত হয় তাদের দৃষ্টিশক্তি। তাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, প্রতিটি পদার্থ তাদের নেপথ্যকে নিয়ে আল্লাহ্‌র জ্ঞানভাণ্ডারে সতত বিদ্যমান। যেমন জীবন বিদ্যমান তার মৃত্যুসহ, জ্ঞান, ক্ষমতা ও দৃষ্টি বিদ্যমান যথাক্রমে তাদের অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও অন্ধত্বসহ। একেই বলে প্রকৃতির তত্ত্ব। একেই বলে 'হাকায়েকে কাওনিয়া' বা 'কুন' (হও) নির্ভর আদেশে প্রতিষ্ঠিত জগতের মৌলিক তত্ত্ব এবং একেই বলে 'আয়ানে ছাবেতাহ্' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত মৌল। ওই নৈপথ্যিকতার ভিত্তি অবশ্য অবিকল আল্লাহ্‌র গুণবত্তা নয়, বরং গুণবত্তার প্রতিবিম্ব। কিন্তু প্রকাশ্য যা কিছু তার ভিত্তি এটাই। এই হিসেবে বলতে হয় প্রকাশ্য জগত ওই প্রতিবিম্বেরই প্রতিবিম্ব। সেকারণেই প্রতিটি মূল অবস্থিতিকে বলে 'কওনে আউয়াল' (প্রথম প্রতিষ্ঠা)। ওই অবস্থিতিই অনুপ্রেরণার উৎস। ওখান থেকেই অস্তিত্বে আনা হয় সম্ভাব্য জগতের প্রকাশ্য দিকটিকে। আর তা সুসম্পন্ন হয় সততস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ কর্তৃক। যেনো কাঁচের দেয়াল ঘেরা কোনো প্রদীপ থেকে ঠিকরে পড়া আলো, যা বিচ্ছুরিত হয় ওই কাঁচের দেয়ালের বাইরে। এ বিষয়টিকেই এক আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে 'তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেমন তাকে রক্ষিত একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রক্ষিত কাঁচের চিমনীর মধ্যে'।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌পাকের 'সিফাত' (গুণবত্তা) এর প্রতিবিম্ব এবং সম্ভাব্য জগতের প্রকাশের মাধ্যম কার্যকর কেবল ইহজগতে। পরজগতে নয়। কেননা ইহজগত নশ্বর এবং পরজগত অনশ্বর। আর 'কুনতুম আমওয়াতান ফা আহ্ইয়াকুম' (তোমরা ছিলে মৃত, তারপর আমি তোমাদেরকে জীবিত করেছি) এবং 'মান কানা মাইতান ফা আহ্ইয়াকুম' (সে ছিলো মৃত, এরপর আমি তোমাদেরকে করেছি জীবিত) আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যু হচ্ছে একটি সম্ভাব্য বিশেষণ এবং তা জীবন অপেক্ষা অগ্রগামী।

এবার আসা যাক 'খলাক্বাল মাওতা' (সৃজন করেছেন মৃত্যু) কথাটির মর্মার্থ কী, সে সম্পর্কিত আলোচনায়। কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— আল্লাহ্পাক জীবনকে প্রকাশ অথবা বিলোপ করে প্রকাশ করেছেন মৃত্যুকে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক দেহকে এমন করে দেন, যাতে করে তা প্রাণচ্যুত হয়। 'খল্‌ক্ব' অর্থ আবার 'নির্ধারণ'ও হয়। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন জীবন ও মৃত্যুকে।

আতা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ এই পৃথিবীর জন্য নির্ধারণ করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে নির্ধারণ করেছেন পরবর্তী পৃথিবীর জন্য। আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস সম্ভবত এই জীবনকে মৃত্যু এবং ওই জীবনকে জীবন বলে ঠাহর করেছেন। আর আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সম্ভাব্য জগতের ভিত্তি হচ্ছে 'আয়ানে ছাবেতা' বা নৈপথ্যিক মৌল। আর সকল সম্ভাব্য অস্তিত্বই অনস্তিত্ববিজড়িত। সেকারণেই জীবন জড়িত মৃত্যুর সাথে। এর প্রমাণ রয়েছে এই সকল আয়াতে 'নিশ্চয় তুমি মৃত, মৃত তারাও' 'এ ধরাপৃষ্ঠের সকলেই বিনাশশীল' 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল'। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে কর্তৃবাচক শব্দরূপ থেকে বর্তমান কালের অর্থ করাই অধিকতর সঙ্গত।

আবার অনেকে মনে করেন, মৃত্যু বায়বীয় বা অদৃশ্য কিছু নয়। বরং মৃত্যু অবয়বধারী। তার আকৃতি মেষের মতো। আর জীবনের আকৃতি অশ্বীর মতো। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'বাহরে সাফিরা' গ্রন্থে এরকমই লিখেছেন। এ অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে বাগবী কর্তৃক লিখিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি, যেখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ মৃত্যুকে দিয়েছেন ডোরাকাটা ভেড়ার আকার এবং জীবনকে আকার দিয়েছেন ডোরাকাটা অশ্বিনীর। মরণ-মেষের পদচারণাকালে যার গায়ে তার হাওয়া লাগে, সে-ই পতিত হয় মৃত্যুমুখে। আর জীবনাশ্বী হচ্ছে ওই মাদী অশ্ব, যার উপরে আরোহণ করতেন হজরত জিবরাইল এবং নবী-রসুলগণ। ওই অশ্বীর পদচারণাকালে যার গায়ে তার বাতাস লাগে, সে হয়ে ওঠে জীবন্ত। ওই অশ্বীর পদস্পর্শিত এক মুঠো মাটি নিক্ষেপ করাতেই সামেরীর গো-বৎসমূর্তিতে জেগে উঠেছিলো জীবনের উদ্ভাস।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, মরণ-মেষের নাম মৃত্যু এবং ডোরাকাটা ওই অশ্বীর নাম জীবন। বরং হাদিসটির মর্মার্থ— মৃত্যু ও জীবন হচ্ছে, ওই মেষ ও অশ্বীর প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া, যা বাতাসরূপে এসে লাগে মৃত্যুপথযাত্রীদের গায়ে। যেমন— বিষের নাম মৃত্যু নয়, বরং মৃত্যু বলা যেতে পারে তার প্রতিক্রিয়াকে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন নরকবাসী ও স্বর্গবাসীরা তাদের স্ব স্ব স্থানে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে। তারপর তাকে জবাই করার পর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে স্বর্গ ও নরকবাসীরা! শুনে নাও, তোমরা আর কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। ওই ঘোষণা শুনে

স্বর্গবাসীরা হবে মহাআনন্দিত এবং মর্মাহত হবে নরকবাসীরা। হজরত ইবনে সাঈদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মৃত্যুকে মেষের আকারে দাঁড় করানো হবে বেহেশত ও দোজখের মাঝখানে। তারপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে চিরতরে মৃত্যু ঘটানো হবে তার। হাকেম ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুকে তখন হাজির করা হবে ডোরাকাটা মেষের আকারে। তারপর তার ঘটানো হবে চিরমৃত্যু।

পরবর্তী যুগের আলেমগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বর্ণিত হাদিসসমূহ মুতাশাবিহাত (রহস্যাচ্ছন্ন) শ্রেণীর। সুতরাং আমাদের উচিত কেবল ওগুলোর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ওগুলোর মর্মার্থ আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত করা। অর্থাৎ এরকম বলা যে, এ সকল বিবরণের প্রকৃত তত্ত্ব কেবল আল্লাহ্‌ই উত্তমরূপে অবগত। আল্লামা সুয়ূতী হাকেম ও তিরমিজি থেকে এরকম সিদ্ধান্তের কথাই উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে সুফী-দরবেশগণের অভিমত আবার স্বতন্ত্র। কেননা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় উপমা-জগতের (আলমে মেছালের) দৃশ্য, যেখানে সতত বিদ্যমান রয়েছে প্রকাশ্য জগতের সকলকিছুর সূক্ষ্ম আকার। আল্লাহ্‌পাকের একটি প্রতিবিম্ববিশিষ্ট অবস্থিতিও রয়েছে সেখানে, যা আনুরূপ্যবিহীন, সৌসাদৃশ্যহীন। সুফী-দরবেশগণ সে সকল দৃশ্য অবলোকন করতে পারেন বলেই তাঁরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে, উদাহরণ জগতের দর্শনের প্রেক্ষিতে। এক হাদিসে ওই জগতের দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, আমি আমার সম্মানিত প্রথম পিতাকে দেখেছি শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন সৌম্যকান্তি যুবকের আকৃতিতে। তাঁর চরণযুগলে শোভা পাচ্ছিলো স্বর্ণের পাদুকা। এই হাদিসও মুতাশাবিহাত শ্রেণীর। আর অসংখ্য সুফি-আউলিয়া দ্বারা ওই উদাহরণ জগতের দর্শনাভিজ্ঞতার কথা সুবিদিত। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক তখন ওই উদাহরণ জগতস্থিত মৃত্যুর আকারকে বেহেশত ও দোজখের মাঝখানে উপস্থিত করে তাকেই জবাই করার নির্দেশ দিবেন এবং বেহেশত ও দোজখবাসীকে জানিয়ে দিবেন যে, তাদের বাসস্থান চিরকালীন। ফলে বেহেশতবাসীরা হবে চিরনিশ্চিন্ত। আর দোজখবাসীরা হবে চিরনিরাশ। উদাহরণ জগতের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে আরো অনেক হাদিসে।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'বদরুস সাফিরা' গ্রন্থে লিখেছেন, মানুষের প্রতিটি কর্ম এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টবস্তু। তাই সেগুলোর প্রতিটির রয়েছে এক একটি নির্দিষ্ট আকার, যদিও তা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির অগোচর নয়। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, কর্মসমূহের আকার ও সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আকৃতি দর্শন আউলিয়াগণের একটি বহুল আলোচিত বৈশিষ্ট্য। কেননা তাঁরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। এর প্রমাণ রয়েছে অনেক হাদিসে। বলা বাহুল্য, তাদের এমতো দর্শন উদাহরণ জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম’। একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ জন্ম-মৃত্যুসম্বলিত এই পৃথিবীর জীবন দিয়ে এবং তৎসঙ্গে শরিয়তের বিধি-নিষেধ আরোপ করে তোমাদের বিষয়ে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে চান যে, তোমরা এখানে উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদন করো কিনা। উল্লেখ্য, কথাটির উদ্দেশ্য আবার এরকম নয় যে, মানুষের এই পরীক্ষার ফলাফল কী হবে, তা আল্লাহ্ পূর্বাহ্নে জানেন না। এমতো ধারণা অসম্ভব। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। বরং এরকম পরীক্ষা তিনি সম্পন্ন করতে চান তাঁর বান্দাদের সম্মুখে তাদের উত্তীর্ণতা ও অনুত্তীর্ণতা প্রকাশের জন্য। যেনো তারা সুস্পষ্টভাবে একথা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত করা হচ্ছে তাদেরই কৃতকর্মানুসারে। আর এখানকার ‘কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম’ কথাটি বাক্যের দ্বিতীয় কর্মপদ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বাগবী লিখেছেন, এখানকার ‘কে কর্মে উত্তম’ অর্থ কে অধিক জ্ঞানী, কে-ই বা নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত এবং কে আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো বাধা থাকে না যে, এখানে ‘কর্ম’ অর্থ শুভবোধ, সংযম ও আনুগত্য। আর এখানকার ‘পরীক্ষা করবার জন্য’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন’ বাক্যাংশটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় জীবন ও মৃত্যু-সৃষ্টির তাৎপর্য হবে একথা প্রকাশ করা যে— কে অনুগত এবং কে অনুগত নয়। আর আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনের স্থান হচ্ছে এই পৃথিবী। আর ‘মৃত্যু’ এমতোক্ষেত্রে সতর্ককারী, কর্তব্যবোধের স্মারক, সংকেত, অথবা সদুপদেশ। আর এমতো সদুপদেশকে মান্য করে চলে কেবল তারা, যারা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তাদের কাছে এমতো দায়িত্বপালন হচ্ছে মহাসুযোগ। কেননা সামান্য এ জীবনের যৎসামান্য সৎকর্মসমূহের বিনিময়েই লাভ হতে পারে কাংখিত জান্নাত এবং আল্লাহ্র দীদার। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যু একটি চূড়ান্ত হিতোপদেশ। আর ইমান হচ্ছে অমূল্য বৈভব। তিবরানী।

রবী ইবনে আনাস থেকে প্রায়োন্নত সূত্রে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, পৃথিবী-প্রীতির প্রতি বিরাগ এবং পরবর্তী পৃথিবীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য উপদেশস্বরূপ মৃত্যুভীতিই যথেষ্ট। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সাতটি বিষয় আগমনের পূর্বেই তোমরা তোমাদের পুণ্য কর্মসমূহ সম্পন্ন করো— ১. এমন দারিদ্র, যা আল্লাহ্র বিধানকে বিস্মৃত করে দেয় ২. এমন ঐশ্বর্য, যা করে তোলে আল্লাহদ্রোহী ৩. এমন ব্যাধি, যার নিরাময় নেই ৪. এমন বার্ধক্য, যা লুপ্ত করে দেয় জ্ঞান ৫. মৃত্যু ৬. দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ৭. মহাপ্রলয়। তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, সৎকর্মসমূহ সমাধা করো ছয়টি বিষয় প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে— ১. পশ্চিম দিগন্তের সূর্যোদয় ২. ধুম্রপুঞ্জ ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. দাজ্জাল ৫. মৃত্যু ৬. মহাপ্রলয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— অননুগতদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রতাপশালী এবং অনুগতদের প্রতি পরম ক্ষমাপরবশ।

সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ
مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ
حَسِیْرٌ ﴿۴﴾ وَ لَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ وَ جَعَلْنٰهَا
رُجُوْمًا لِّلشَّیٰطِیْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ ﴿۵﴾ وَ لِلَّذِیْنَ
كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۶﴾ اِذَآ اُلْقُوْا
فِیْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِیْقًا وَّ هِیَ تَفُوْرُ ﴿۷﴾ۙ تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ
الْغَیْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِیَ فِیْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ یَاْتِكُمْ
نَذِیْرٌ ﴿۸﴾ قَالُوْا بَلٰی قَدْ جَآءَنَا نَذِیْرٌ ۙ۵ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ
مِنْ شَیْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ ﴿۹﴾ وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۰﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ
فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۱﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِیْرٌ ﴿۱۲﴾ وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ
اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ
اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۴﴾ؑ

q যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না; তুমি আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?

q অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।

q আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

q যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি; উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

q যখন উহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত।

q রোষে জাহান্নাম যেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই?'

q উহারা বলিবে,'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

q এবং উহারা আরও বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।'

q উহারা উহাদের অপরাধ স্বীকার করিবে। ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য।

q যাহারা দৃষ্টির অগোচরে তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

q তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অর্ন্তযামী।

q যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

'আল্লাজী খলাক্বা সাবআ' সামাওয়াতি ত্বিবাক্বা' অর্থ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে-স্তরে সপ্তাকাশ। এখানকার 'যিনি সৃষ্টি করেছেন' কথাটি আগের আয়াতের 'যিনি' (হুয়া) উদ্দেশ্য পদের বিধেয়। অথবা 'ক্ষমাশীল' বিশেষ্যের বিশেষণ। কিংবা প্রথম আয়াতের 'সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত' বাক্যের অনুবর্তী। আর এখানকার 'ত্বিবাক্ব' (স্তরে স্তরে) শব্দটি বহুবচন 'ত্ববক্ব' এর 'যেমন 'হবল' এর বহুবচন 'হিবাল'। অথবা 'ত্বিবাক্ব' বহুবচন 'ত্বাবাক্বাতুন' এর। যেমন 'রিহাব' বহুবচন 'রহাবাতুন' এর। কিংবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'ত্বিবাক্বা' একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্মপদ। চর্মশিল্পী যদি স্তরে স্তরে জুতা সেলাই করে, তবে তাকে বলা হয় 'ত্বিবাক্বান নাআল' (স্তরে স্তরে জুতা সেলাই করেছে)। 'ত্বিবাক্ব' শব্দটি

সর্বক্ষেত্রেই বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথবা বলা যায়, শব্দটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্মপদের বিশেষণ। কিংবা অবস্থাপ্রকাশক। উল্লেখ্য, সপ্তাকাশের সবিস্তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। প্রয়োজনবোধে সেখানে বিষয়টি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে 'মা তারা ফী খল্‌ক্বির রহমানি মিন তাফাউত' (দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না)। এখানে 'মা তারা' (তুমি দেখতে পাবে না) বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল রসুল স.কে। অথবা সম্বোধনটি এখানে সার্বজনীন। 'মা' অব্যয়টি এখানে হতে পারে না-সূচক। অথবা কথাটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। আবার প্রশ্নবোধকতার ক্ষেত্রে 'তারা' এখানে হতে পারে ক্রিয়াবোধক কর্মপদও। এখানকার 'দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি' অর্থ কেবল আকাশ, অন্যান্য সৃষ্টি নয়। কেননা কথাটি এখানে সীমিতার্থক। আর এখানে সৃজনের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সঙ্গে করা হয়েছে সম্মানার্থে। অর্থাৎ সপ্ত আকাশের সৃজয়িতা কেবলই আল্লাহ্, যিনি দয়াময়। আর 'তাফাউত' অর্থ যদি হয় নিখুঁত অথবা অ-মিলিত, তবে এখানকার সম্বন্ধপদটি হবে জাতিবাচক এবং এমতাবস্থায় এখানকার 'সৃষ্টি করেছেন' কথাটি প্রযুক্ত হবে সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাঁর কোনো সৃষ্টিই ত্রুটিযুক্ত নয়। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে যথাযথ পরিমাপ ও পরিমাণানুসারে এবং যে ব্যবস্থাপনানুসারে সেগুলো পরিচালিত হয়, তার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপনা আর কিছু হতেই পারে না।

এখানকার 'মিন তাফাউত' এর 'মিন' (হতে) অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। অথবা 'মিন' এখানে আংশিক অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিতে সামান্যতম ত্রুটিও নেই। তবে এমতাবস্থায় 'মা' অব্যয়টির অর্থ হবে না-বাচক। আর এখানকার 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হলে 'মিন' হবে বর্ণনামূলক। এমতাবস্থায় পুরো বাক্যটি হবে সপ্তাকাশের অবস্থাপ্রকাশক অথবা 'সৃষ্টি করেছেন' ক্রিয়ার কর্তা, কিংবা কর্মপদের অবস্থাপ্রকাশক।

লক্ষণীয়, এখানে 'তাঁর সৃষ্টিতে' না বলে বলা হয়েছে 'দয়াময়ের সৃষ্টিতে'। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সপ্তস্তরবিশিষ্ট আকাশের নির্মাণনৈপুণ্য দোষত্রুটিশূন্য, কেননা এমন সৃজনকর্ম এমন এক সত্তার, যিনি স্বয়ং যাবতীয় দোষত্রুটিবিমুক্ত। উপরন্তু তিনি দয়াময়ও। অথবা কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে এই প্রশ্নটি 'তাঁর সৃজনকর্ম কীরূপ'? এমতাবস্থায় বাক্যটি হবে পূর্বোক্ত বাক্য থেকে পৃথক এবং হবে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষ যেমন নিখুঁত, তেমনি নিখুঁত সপ্তস্তরবিশিষ্ট আকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি আবার তাকিয়ে দ্যাখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি'? এখানে 'তুমি আবার তাকিয়ে দ্যাখো' বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন শর্তের পরিণতি। অর্থাৎ যদি তোমরা মনে করো আকাশে কোনো খুঁত খুঁজে পাবে, তবে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করো বার বার, যতোবার খুশী।

‘হাল তারা মিন ফুতুর’ অর্থ কোনো ক্রুটি দেখতে পাও কি? প্রশ্নটি ইতিবাচক। আর এখানকার ‘ফুতুর’ (ক্রুটি) শব্দটি এসেছে, ‘ফাতুরাহু’ (ছিঁড়ে ফেঁড়ে দিয়েছে) থেকে। আর ‘মিন’ অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত, অথবা আংশিক অর্থপ্রকাশক।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে’। এখানে ‘বাসারা কার্‌রাতাইন’ অর্থ বার বার দৃষ্টি ফিরাও। ‘কার্‌রাতাইন’ শব্দটি দ্বিবচন এবং আধিক্যজ্ঞাপক। অর্থাৎ শব্দটি দ্বিবচন হলেও এখানে এটি বহুবচনবোধক। যেমন ‘লাব্বাইকা’ কথাটি দ্বিবচনবোধক হওয়া সত্ত্বেও এর মাধ্যমে কেবল দু’বার উপস্থিতির উদ্দেশ্যে বলা হয় না, বলা হয় বহুবার উপস্থিতির উদ্দেশ্যে।

‘ইয়ানক্বালিবু ইলাইকাল বাসারু খশিয়াওঁ ওয়াহুয়া হাসীর’ অর্থ সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। এখানকার ‘ইয়ানক্বালিব’ (ফিরে আসবে) কথাটি ‘ইরজ্বিউ’ (ফিরাও) অনুজ্ঞার জবাব। ‘খশিয়ান’ অর্থ ব্যর্থ হয়ে। ‘খশিউন’ অর্থ ক্লান্ত, নিষ্ফল, লাঞ্ছিত। আর ‘ওয়া হুয়া হাসীর’ বাক্যটি এখানে ‘ফিরে আসবে’ ক্রিয়ার কর্তা। অর্থাৎ ‘বাসারু’ (দৃষ্টিপাত) যাদের প্রথম অবস্থার প্রকাশ ‘ব্যর্থ হয়ে’ এবং দ্বিতীয় অবস্থার প্রকাশ ‘ক্লান্ত হয়ে’।

বাগবী লিখেছেন, কা’ব বলেছেন, পৃথিবীর নিকটতম আকাশ ছিলো উর্মি-বিক্ষুব্ধ, যাকে করা হয়েছে শান্ত। দ্বিতীয় আকাশ শুভ্র জমরুদ প্রস্তরনির্মিত, তৃতীয় আকাশ উষর। চতুর্থ আকাশ হচ্ছে পিতলের, পঞ্চম আকাশ রুপার, ষষ্ঠ আকাশ সোনার, আর সপ্ত আকাশ আল্লাহ্‌পাকের পরম সত্তার অন্তরাল বা সপ্তপ্রান্তরবিশিষ্ট সীমানা।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা’। এখানে ‘প্রদীপমালা দ্বারা’ অর্থ নক্ষত্ররাজি দ্বারা। অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ যেনো অগণিত অসংখ্য প্রদীপ, যেগুলোর দ্বারা আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে। এ সম্পর্কে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা যে কথাই বলুন না কেনো, তাদের কথা যদি কোরআনানুকূল না হয়, তবে তা হবে পরিত্যাজ্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি’। একথার অর্থ শয়তান যখন আকাশের কাছাকাছি গিয়ে চুপিসারে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করে, তখন আমি নক্ষত্র থেকে প্রস্তুত করি অগ্নিপ্রস্তর এবং তা সেই শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করে তাকে ধ্বংস করে দেই। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নক্ষত্র উৎপাটন করে নয়, অগ্নিপ্রস্তররূপে নিক্ষেপ করা হয় নক্ষত্রের কিছু অংশকে। আর এখানকার ‘তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি’ অর্থ আমি তাদের জন্য পরকালেও প্রস্তুত করে রেখেছি দোজখের অগ্নিশাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, তা কতো মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল’। আগের আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তানের জন্য জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত রাখা

হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হলো, জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেও। এতে করে বুঝা যায়, শয়তানও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও শয়তানের সমতুল। অর্থাৎ তারা যেনো একে অপরের জ্ঞাতি ভ্রাতা।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত'। এখানকার 'শাহীক্ব' এর শাব্দিক অর্থ— গর্দভের চীৎকার। মর্মার্থ— বিকট-বীভৎস শব্দ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় শুনতে পাবে সেখানকার লেলিহান অগ্নিকুণ্ডলীর বিকট-বীভৎস শব্দ। অথবা চীৎকার শুনতে পাবে পূর্বে প্রবিষ্ট জাহান্নামীদের। কিংবা নিজেরাই তখন তারা ভয়ে আতংকে বীভৎস আওয়াজ করতে থাকবে গাধার বিকট আওয়াজের মতো।

'ওয়া হিয়া তাফূর' অর্থ আর তা হবে উদ্বেলিত। অর্থাৎ জাহান্নাম তখন ফুটতে থাকবে অতিউত্তপ্ত ডেকচির ফুটন্ত পানির মতো। অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ডলী থেকে তখন উত্থিত হবে সুতীব্র দহনের গর্জন। মুজাহিদ সূত্রে হান্নাদ বলেছেন, স্বল্প পানির জলাধারে জোয়ার এলে পানি যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুলে-ফেঁপে কেবল উপরের দিকে উত্থিত হতে থাকে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপকালে জাহান্নামের অবস্থাও হবে তেমনি। ফুলে ফেঁপে তখন টগবগ করতে থাকবে জাহান্নাম। কথাটি রূপকার্থক।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'রোষে জাহান্নাম যেনো ফেটে পড়বে'। এখানকার 'রোষ' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'ফেটে পড়বে' এর সঙ্গে। এভাবে পুরো বাক্যটি হবে আগের আয়াতের 'উদ্বেলিত হবে' ক্রিয়ার কর্তা। অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থাপ্রকাশক। আগের আয়াতের 'আর তা হবে উদ্বেলিত' বাক্যটি 'লাহা' (তা) অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থাপ্রকাশক। আর এখানকার 'গইজ' অর্থ আল্লাহ্‌র রোষ, ক্রোধ, কোপ। অথবা রোষ শাস্তি প্রদানকারী ফেরেশতাদের। কিংবা ক্রোধ জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখার। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি রূপকার্থক। কেননা অগ্নি জড় পদার্থ, ক্রোধ-আনন্দ ইত্যাদি অনুভূতিশূন্য। তবে জড়পদার্থকে যদি অনুভূতিসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়, তবে শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি প্রকৃতার্থকই হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকটে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি'? এখানে 'রক্ষী' অর্থ জাহান্নামের প্রহরী। তারাই জাহান্নামগমনের সময় জাহান্নামীদেরকে ভর্ৎসনা করে বলবে, কীহে! তোমাদের প্রতি কি কোনো রসুল প্রেরণ করা হয়নি? বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আর একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে— কী অবস্থা হবে তখন, যখন জাহান্নামীদেরকে প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামে? আর এখানকার 'কুল্লামা' (যখন) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'সাআ'লাহুম' (জিজ্ঞেস করবে) এর সঙ্গে। আর আলোচ্য প্রশ্নটি (তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি) স্বীকৃতিমূলক।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিলো'। এখানে 'ক্বলু' অর্থ তারা বললো। কথাটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে তা হবে ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা তখন বলবে 'বালা'। আর 'বালা' অর্থ হ্যাঁ। কথাটি আবেগআরোপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অবশ্যই আমাদের প্রতি যথাসময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্র বার্তাবাহকগণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো'। একথার অর্থ— কিন্তু আমরা তাঁদের কথার কোনো মূল্যই দেইনি। উল্টো বরং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা অসত্যভাষী। তোমরা কস্মিনকালেও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নও। আল্লাহ্ তোমাদের মতো মানুষের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করতে পারেই না। সুতরাং তোমরা মহাবিভ্রান্ত ব্যক্তি বৈ অন্য কিছুই নও। এরকমও হতে পারে যে, এরকম কথা তাদেরকে তখন বলবে জাহান্নামের প্রহরীরা। অর্থাৎ তারা বলবে, তোমরা তো তখন ওই সকল মহাপুরুষকে অমান্য করেছিলে। তাদেরকে সাব্যস্ত করেছিলে 'মহাবিভ্রান্ত' বলে। আর এখানকার 'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী, নবী। শব্দটি একবচন হলেও এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থে। অর্থাৎ এখানে 'নাজীর' অর্থ নবী-রসুলগণ। কেননা শেষে বলা হয়েছে 'তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো'। অথবা বলা যেতে পারে, সম্বোধনের বেলায় এখানে উত্তম পুরুষের স্থলে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মধ্যম পুরুষকে। কিংবা বলা যায়, একজন নবীকে অমান্য করার অর্থ সকল নবীকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ তারা তখন বলবে, আমরা আমাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম, তুমি এবং তোমার মতো নবুয়তের দাবিদারেরা মহাবিভ্রান্তির শিকার।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং তারা আরো বলবে, যদি আমরা শুনতাম, অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না'। একথার অর্থ— তারা তখন আরো বলবে, হায়! যদি আমরা তখন ওই সকল প্রেরিত পুরুষগণের উপদেশ হৃদয়ের কান দিয়ে শুনতাম, অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাঁদের আহ্বান ও প্রমাণপঞ্জীর মর্মোদ্ধার করতে চেষ্টা করতাম, তাহলে নিশ্চয় আমরা হতে পারতাম বিশ্বাসী। আর বিশ্বাসী হতে পারলে এখানকার এই মহাদুর্ভোগ থেকে পেতে পারতাম পরিত্রাণ। এখানে 'না'ক্বিলু' শব্দটির পূর্বে 'নাসমাউ' (শুনতাম) উল্লেখ করার তাৎপর্য হচ্ছে— বুদ্ধিগত প্রমাণ অপেক্ষা শ্রুত প্রমাণ অধিক পালনীয়। অর্থাৎ শুধু যুক্তি-বুদ্ধি ইমানের ভিত্তি নয়। আর 'বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম' বলে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পরিশুদ্ধ বুদ্ধি-বিবেক স্বকপোলকল্পনা থেকে মুক্ত এবং তা প্রত্যাদেশের সম্পূর্ণ অনুকূল। আর এখানকার 'আও' (অথবা) যে 'ওয়াও' (এবং) অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে, এরকম বলারও অবকাশ রয়েছে এখানে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হায়! আমরা যদি তখন তাঁদের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করতাম, তবে নিশ্চয় আজ আমরা হতাম না এই মহাদুর্গতির শিকার।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য'। একথার অর্থ— এভাবে তারা তখন তাদের কৃত অপরাধের স্বীকৃতি প্রদান করবে। কিন্তু সে স্বীকৃতি তাদের কোনোই কাজে আসবে না। কেননা তাদের ওই জাহান্নামবাস হবে চিরকালীন। এখানে 'জামবুন' (অপরাধ) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান। শব্দটি ধাতুমূল বলেই এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে একবচনরূপে। আর এখানকার 'সুহ্‌ক্বান' (ধ্বংস) শব্দটিও ধাতুমূল এবং কর্মপদ। এখানে এর ক্রিয়াপদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তাদেরকে করেছেন তাঁর অনুকম্পাচ্যুত, তাই তারা হয়ে গিয়েছে চিরক্ষতিগ্রস্ত। বক্তব্যকে সংকুচিত করে বিশেষ একটি অর্থকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই এখানে কথাটি বলা হয়েছে এরকম করে। এভাবে এখানকার 'ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য' কথাটি হয়েছে একটি অভিসম্পাত, অসংলগ্নোচ্চারণ।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও পুরস্কার'। এখানে 'গইব' অর্থ অদৃশ্য, অনাগত, দৃষ্টির অগোচর। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা অনাগত শাস্তির ভয় করে, তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। অথবা পরকালের নিশ্চিত শাস্তির সম্মুখীন না হওয়া সত্ত্বেও যারা তার ভয় হৃদয়ে লালন করে, মার্জনা ও মহাপ্রতিদান রয়েছে তাদের জন্যই। কিংবা— যারা নীরবে-নিভৃতেও আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, তাদের জন্যই অপেক্ষমান মার্জনা ও মহাপুরস্কার। আবার 'গইব' বলে এখানে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে দেহের কোনো গোপন অংশকেও। যেমন— অন্তঃকরণ। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— হৃদয়ে যারা পোষণ করে আল্লাহ্‌ভীতি— ক্ষমা, মহাপুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে তাদেরই জন্য। উল্লেখ্য, এতোক্ষণ ধরে অবিশ্বাসীদের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা চলছিলো, তারপর এই আয়াতে ঘটলো প্রসঙ্গান্তর। অবিশ্বাসীদের পরিবর্তে এখানে বলা হলো বিশ্বাসী ও আল্লাহ্‌ভীরুদের কথা। এভাবে বিশ্বাসীগণকে এই শুভসমাচারটি দিয়ে দেওয়া হলো যে, আল্লাহ্-ভীতিই সকল সফলতার ভিত্তি। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ভীতি হচ্ছে জ্ঞানের শিখর। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. সম্পর্কে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অশোভন আলাপ-আলোচনা করতো। আবার একে অপরকে সাবধান করতো এরকম বলে যে, উচ্চস্বরে কিছু বোলো না। না হলে আল্লাহ্ আবার আমাদের কথা শুনে ফেলবে এবং সে কথা জানিয়ে দিবে মোহাম্মদকে। হজরত জিবরাইল তাদের এমতো শলাপরামর্শ সম্পর্কে রসুল স.কে অবহিত করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াতদ্বয়।

বলা হলো— 'তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বলো, অথবা বলো প্রকাশ্যে, তিনি তো অন্তর্যামী (১৩) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত' (১৪)। এখানকার 'তিনি কি জানেন না' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— তিনি তো সকল কিছুই জানেন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই প্রকাশ্য গোপন সকল কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং এটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন? একি কখনো সম্ভব? তোমরাই বলো, এরকম কি কখনো হতে পারে? তিনি যে অন্তর্যামী, সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। অথবা— আরে, সৃজয়িতা কি কখনো তাঁর সৃজন সম্পর্কে অনবগত থাকতে পারেন? নিশ্চয় নয়।

'ওয়া হুয়াল লাত্বীফুল খবীর' অর্থ তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী, তা দৃশ্যমান হোক, অথবা হোক অদৃশ্য।

সূরা মুল্ক ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

r তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন; অতএব তোমরা উহার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট।

r তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধসাইয়া দিবেন, অনন্তর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে?

r অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!

r ইহাদের পূর্ববর্তিগণও অস্বীকার করিয়াছিল; ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো'। এখানে ভূমি অর্থ

পৃথিবীপৃষ্ঠ। আর 'সুগম করে দিয়েছেন' অর্থ পৃথিবীপৃষ্ঠকে করে দিয়েছেন চলাচলের উপযোগী। 'মানাকিবিহা' অর্থ পৃষ্ঠদেশ। 'মানাকিব' বলা হয় মানুষের গ্রীবাদেশকেও। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'মানাকিব' অর্থ শৈলশ্রেণী।

'জালূল' অর্থ সুগম, সহজ। অর্থাৎ আল্লাহ্ পথচারীদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন সহজগম্য, এমন করেননি, যাতে যাতায়াত হতে পারে রুদ্ধ। অনুগত উষ্ট্রীকে তাই বলা হয় 'আন নাক্বাতুজ জালূলু'। এভাবে এখানে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, একান্ত অনুগত উষ্ট্রী অপেক্ষাও এই ধরিত্রীপৃষ্ঠ অধিক সহনশীল। তাইতো পৃথিবীবাসীরা এখানে পদচারণা করতে পারে নির্বিঘ্নে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ করো'। একথার অর্থ— এই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করেই তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া রিজিক অনুসন্ধান করো এবং জীবনধারণ করো সেই রিজিকের দ্বারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে তো তোমাদেরকে তাঁর নিকটেই জবাবদিহি করতে হবে। তখন অবশ্যই তোমাদেরকে এমতো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহসম্ভার পেয়ে ও ভোগ করে অনুগ্রহদাতার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে কিনা।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি এটা থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আকাশে রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন, অনন্তর তা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে স্বেচ্ছাচারীরা! তোমাদের মনে কি আকাশবাসী আল্লাহ্ সম্পর্কে এতটুকুও ভয় নেই, যিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে তোমাদেরকে ভূমিধস, অথবা ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে পারেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি রজনীর তৃতীয় যামে আল্লাহ্পাক অবতরণ করেন পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। আহ্বান জানান— কে আছো যাচনাকারী যাচনা কর। তোমাদের আবেদন পূর্ণ করা হবে। কে আছো ক্ষমাপ্রার্থী! ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন প্রসারিত করে দেন তাঁর বাহুদ্বয়। বলেন, হে প্রার্থনাকারীরা! প্রার্থী হও ওই সত্তার সমীপে, যিনি বিত্তহীন নন, নন কারো অধিকার ক্ষুণ্নকারী। যাচনা করো। আমি তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করবো। এভাবে তিনি তাঁর এমতো দয়ার্দ্র আহ্বান ঘোষণা করতে থাকেন প্রত্যুষ পর্যন্ত। এই হাদিসের আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াত 'দুর্জ্ঞেয়' (মুতাশাবিহাত) শ্রেণীর। কারণ আল্লাহ্ আকার-নিরাকার সম্ভূত সত্তা নন, নন স্থান, অথবা কালসম্পৃক্ত। কেননা তিনি আনুরূপ্যবিহীন (বেমেছাল)। সুতরাং আকাশস্থিত হওয়া তাঁর জন্য শোভন ও সমীচীন যেমন নয়, তেমনি নয় সম্ভবপর।

একারণেই পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মৌন থেকেছেন। আর সুফী-আউলিয়াগণ এ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেরকম, যেরকম মন্তব্য করেছেন 'আল্লাহ্ তাদের নিকট আগমন করবেন মেঘের ছত্রছায়ায়' আয়াত সম্পর্কে। শেষ যুগের বিদ্বানগণ এ সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা। যেমন— 'তিনি আকাশে রয়েছেন' অর্থ আকাশে রয়েছে তাঁর নির্বাহী পরিমণ্ডল। অথবা তাঁদের মতে এখানকার বক্তব্যটিকে পরিবেশন করা হয়েছে আরবের তখনকার জনসাধারণের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁরা মনে করতেন, আল্লাহ্ আকাশে অবস্থান করেন। অথবা 'সামা' অর্থ এখানে আকাশ নয়, বরং অজ্ঞেয় ঊর্ধ্বদেশ। এবং তা স্থান বা কাল সম্পৃক্ত নয়, বরং মর্যাদাসম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাঁর মহিমা এমন গগনচুম্বী, যা ধারণা ও কল্পনার অতীত। আর আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানকার 'মান ফিস্ সামায়ী' অর্থ আকাশচারী ফেরেশতাবৃন্দ, যারা আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ নির্বাহকারী। তারাই আল্লাহ্‌র নির্দেশে নাজিল করেন ভূমিধস, প্রস্তরবৃষ্টি, প্লাবন ইত্যাদি নৈসর্গিক বিপদ-আপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা এ সম্পর্কে কীভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারলো যে, আকাশচারী ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র হুকুমে ভূমিধসের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে না, যেমন ভূপ্রোথিত করে দিয়েছিলো দুরাচার 'কারুনকে' তখন তো অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠেছিলো থরথর করে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— অথবা তোমরা কি এটা থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে কীরূপ আমার সতর্কবাণী'। এখানকার প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। 'আম' অর্থ এখানে 'হাল' (কি)। আর 'হাসিব' অর্থ কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা, প্রস্তরবর্ষণকারী ঝড়, যেমনটি হয়েছিলো নবী লুতের সম্প্রদায়ের উপর। 'জানতে পারবে কীরূপ ছিলো আমার সতর্কবাণী' অর্থ নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপরে যেরকম সর্বনাশা প্রস্তর-ঝড় বয়ে গিয়েছিলো, সেরকম আযাব শুরু হলে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারবে, আমার শাস্তি কতো কঠিন! কিন্তু তখন তোমাদের এমতো বোধোদয় কোনো কাজেই আসবে না।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছিলো; ফলে কীরূপ হয়েছিলো আমার শাস্তি'। বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন শপথের জবাব। 'নাকীর' অর্থ অস্বীকার করা, কোনোকিছুকে নিকৃষ্ট ধারণা করা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এ সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পূর্বসূরীরাও ছিলো এদের মতোই দুর্বৃত্ত, ফলে তারা শাস্তিগ্রস্ত হয়েছিলো। এদের পরিণতিও হতে পারে সেরকম। তখন তারা বুঝতে পারবে আমার শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে। বক্তব্যটিতে যুগপৎ বিধৃত হয়েছে রসুল স. এর জন্য সান্ত্বনার বাণী এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি হুমকি। আর এখানকার 'কীরূপ হয়েছিলো আমার শাস্তি' কথাটি হতে পারে

বিস্ময়সূচক, অথবা অশুভ বার্তাপ্রকাশক। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াতে পারে— অতীতের অবাধ্য জাতিগোষ্ঠীগুলো আমা কর্তৃক অবতারিত ধর্মাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, ফলে তাদের প্রতি আপতিত হয়েছিলো আমার তীব্র রোষ।

সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّ يَقْبِضْنَ ؔ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍۭ بَصِیْرٌ ﴿۱۹﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ ﴿۲۰﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿۲۱﴾ اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۲۲﴾

r উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

r দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? কাফিররা তো রহিয়াছে প্রবঞ্চনার মধ্যে।

r এমন কে আছে, যে তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি তাঁহার জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।

r যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হইয়া সরল পথে চলে?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আ ওয়া লাম ইয়ারাও' (তারা কি লক্ষ্য করে না)। এখানে 'আ' অক্ষরটি প্রশ্নবোধক। 'ওয়াও' অব্যয়টি যোজক। আর সংযোজ্য বাক্যটি এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি আকাশ-পৃথিবীর নির্মাণশৈলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। দ্যাখে না কি তাদের মাথার উপরে উড়ন্ত পক্ষীকুলকে? এখানকার 'তাদের ঊর্ধ্বদেশে' কথাটির যোগ রয়েছে 'সফ্‌ফাত' এর সঙ্গে। 'সফ্‌ফাত' অর্থ শূন্যমার্গে পক্ষ বিস্তার করে উড়তে

থাকা। এভাবে শব্দটির মাধ্যমে অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে ঝাঁক বেঁধে ওড়া পাখিদের। আর 'লক্ষ্য করা' অর্থ এখানে দৃষ্টিপাত করা। কেননা এখানে 'লাম ইয়ারাও' (লক্ষ্য করে না) এর পরে বসানো হয়েছে 'ইলা' (দিকে)।

'ইয়াক্ববিদ্বনা' অর্থ সংকুচিত করে। এভাবে এখানে 'সফ্ফাত' ও 'ইয়াক্ববিদ্বনা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে উড়ন্ত বিহঙ্গবাহিনীর পক্ষসঞ্চারণ ও পক্ষসংকোচনকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা'। কথাটির মর্মার্থ— শূন্যস্থিত কোনো কিছুর পতন স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ্ পরম দয়ালু, সর্বশক্তিধর বলেই পাখিদের উড্ডয়নকে নির্বিঘ্ন করেছেন। আর তিনি সর্বদ্রষ্টাও। তাঁর এমতো নিরন্তর পর্যবেক্ষণের কারণেই পাখিরা নিরাপদ করতে পেরেছে তাদের আকাশী উড়াল। সুতরাং এটা আল্লাহ্র মহিমা ও সর্বশক্তিধরতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি?

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেরেরা তো রয়েছে প্রবঞ্চনার মধ্যে'। বক্তব্যসূত্রে আলোচ্য আয়াত পূর্বোক্ত আয়াতের সঙ্গে গ্রথিত। তাই এই আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে যোজক অব্যয় 'আম'। কেউ কেউ বলেছেন, পুনঃপুনঃ প্রশ্ন থেকে রক্ষাকল্পেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আম'। তবে অব্যয়টি এখানে যোজকও যেমন নয় তেমনি নয় বিয়োজকও। 'মান' (যে, যিনি) এখানে প্রশ্নবোধক উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'হাজা' (এই)। 'আললাজী' বিশেষণ, অথবা বিশেষ্যের অনুবর্তী। আর 'জুনদুন' পদের বিশেষণ 'ইয়ানসুরূকুম' (তোমাদেরকে সাহায্য করবে)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যিনি দয়াময় আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সেনাদল কি আছে, যারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র রোষ থেকে রক্ষা করতে পারবে? সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো পতিত হয়েছে ঘোর প্রবঞ্চনায়।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ ইঙ্গিতসূচক নামপদ 'হাজা' এবং সমন্বয়কারী নামপদ 'আল্লাজী' এখানে ব্যবহার না করলেও বক্তব্যটি অপরিস্ফুট থাকতো না। তাহলে এগুলো এখানে এভাবে ব্যবহার করার সার্থকতা কী?

জিজ্ঞাসার জবাব ঃ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহারের পর বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যামূলক শব্দ ব্যবহার করলে বক্তব্য হয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। যেমন, এখানকার 'হাজাল্ লাজী' কথাটি অস্পষ্ট এবং এই অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে 'ওয়া জুনুদুন' (কোনো সেনাদল) কথাটির মাধ্যমে। এভাবে প্রথমে উল্লেখিত অস্পষ্ট বিশেষ্যকে পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশেষণমূলক কথায়। আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, 'হাজা' এখানে 'উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'আল্লাজী'। আর 'ইয়ুক্বালু' (বলা হয়) কথাটিকে যদি এখানে উহ্য পদ হিসেবে ধরা হয় এবং পুরো বাক্যটিকে যদি ধরে নেওয়া হয় ওই উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'আম্ মাইঁ ইয়ুক্বালু হাজাল লাজী হুয়াহু জুন্দুল্ লাকুম (অথবা যাকে বলা

হবে, এটাই তোমাদের সেনাদল)। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এখানে 'জুনদুন' অর্থ হবে ওই সকল প্রতিমা, পৌত্তলিকেরা যেগুলোকে নির্ধারণ করেছে উপাস্যরূপে। অর্থাৎ এটাতো চিন্তাই করা যায় না যে, তাদের উপাস্যসমূহ তাদেরকে আল্লাহ্‌র রোষ থেকে বাঁচাতে পারবে, অথবা তাদেরকে দিতে পারবে উপজীবিকা। অথবা 'জুনদুন' অর্থ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সহায়-সম্পদ।

'গুরূর' অর্থ শয়তানী প্রবঞ্চনা। এভাবে 'কাফেরেরা তো রয়েছে প্রবঞ্চনার মধ্যে' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— শয়তানই তাদেরকে এমতো প্রবঞ্চনায় নিমজ্জিত করে রেখেছে যে, তারাই সত্যপথে রয়েছে। সুতরাং তারা শাস্তিগ্রস্ত হতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি তাঁর জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? বস্তুত তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, স্তব্ধ করে দেন মৌসুমী বায়ু, তবে মৃত্তিকায় তো ফল ও ফসল উৎপাদিত হতে পারবেই না। তখন কী হবে? কে পারবে জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে? হে আমার রসুল! দেখুন, এর পরেও তারা কীরূপ অবাধ্য ও সত্যবিমুখ। আসত্তা নিমজ্জিত মূর্খতা ও উন্নাসিকতায়।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি ঝুঁকে পড়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি, যে সরল পথে চলে ঋজু হয়ে' প্রশ্নটি স্বীকৃতি জ্ঞাপক। এর উদ্দেশ্য সত্যকে স্বীকার করার মানসিকতাকে উসকে দেওয়া।

'মুকিব্বান' অর্থ ভর দিয়ে চলে। শব্দটি কর্তৃপদরূপে সাধিত হয়েছে 'ইকবাব্' থেকে। এর প্রকৃতি 'কাব্বুন'। তবে আরবী ভাষায় শব্দসাধনের এই রীতি বিরল। অথবা বলা যেতে পারে, 'মুকিব্বান' এখানে কর্তৃপদ এবং এর কর্মপদ এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ কথাটি দাঁড়ায়— 'মুকিব্বান নাফসাহু' (নিজের উপরে নির্ভরশীল)।

কেউ কেউ আবার বলেন, এখানে 'মুখে ভর দিয়ে চলে' অর্থ চলে বন্ধুর পথে। ফলে পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। বলা বাহুল্য, এরকম পথে চলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা চলে সরল সহজ পথে, যা বিভ্রান্তিমুক্ত, সুগম ও অবশ্যই নির্ভুল গন্তব্যে উপনীতকারী। 'সিরাত্বিম্ মুস্তাক্বীম' অর্থ সরল পথ। আর এখানকার 'মান' যোজকটি উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'আহ্দা'। অথবা বিধেয় এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে এখানে একথাটিই বলে দেওয়া হয়েছে যে, সরল পথের পথিকেরাই হতে পারে সফল। কেননা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বাধিকারীরাই অনুসারী বিশুদ্ধচিত্ত-বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

একটি সন্দেহ ঃ এখানকার ‘আহ্দা’ শব্দটি তুলনামূলক বিশেষণ। আর তুলনামূলক বিশেষণের কাজ হচ্ছে দু’জন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যের বিশেষণের তারতম্য নিরূপণ। সুতরাং এরকম মন্তব্য প্রকাশ করার অবকাশ তো রয়েই যায় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও কিছুটা পথপ্রাপ্ত, যদিও তারা বিশ্বাসীদের মতো অতোটা পথপ্রাপ্ত নয়।

সন্দেহভঞ্জন ঃ বিষয়টি সেরকম নয়। এখানে বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বুঝাতে। কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীর পাপাচারীরা পরজগতে পথ চলবে অধোমুখী হয়ে। আর পুণ্যবানেরা পথ চলবে স্বাভাবিক অবস্থায়। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ তখন অধোমুখী হয়ে চলবে কীভাবে? তিনি স. জবাব দিলেন, যে আল্লাহ্ মানুষকে দু’পায়ের উপরে ভর করিয়ে চালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয় তাকে অধোমুখী করেও চালাতে সক্ষম। আবু দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۲۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۵﴾ قُلْ
اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً
سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ
تَدَّعُوْنَ ﴿۲۷﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ
فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ
وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ
اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿۳۰﴾

r বল, ‘তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।’

r বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

r আর উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

r বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

r উহারা যখন তাহা আসন্ন দেখিবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে এবং বলা হইবে, 'ইহাই তো তোমরা চাহিতেছিলে'।

r বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদিগকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদিগকে কে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

r বল, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করি ও তাঁহারই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।'

r বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন আল্লাহ্ই সকলের এবং সকলকিছুর স্রষ্টা ও পালয়িতা। তিনিই তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রুতি, দৃষ্টি ও বোধ। সুতরাং তোমরা শ্রবণ করো তাঁর উপদেশ, অবলোকন করো তাঁর নিদর্শনরাজি এবং অনুভব করতে চেষ্টা করো তাঁর মহিমা-মহত্ব। এভাবে শুনে, দেখে, বুঝে উপাসনা করো কেবল তাঁর।

এখানকার 'আস্সাম্আ' (শ্রবণশক্তি) শব্দটি ধাতুমূল। তাই একবচন, বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয় একইরূপে। লক্ষণীয় 'আবসর' (দৃষ্টিশক্তি) এবং 'আফ্ইদাহ্' (অন্তঃকরণ) কথা দু'টো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের আকারে। এমতো তারতম্যের কারণ সম্ভবত এই যে, শ্রুতির সাহায্যে জ্ঞান অর্জিত হয় একই প্রক্রিয়ায়। কিন্তু দৃষ্টি জ্ঞান আহরণ করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যেমন রঙ-আকার-পরিমাণ-পরিমাপ এবং সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য দেখে। আবার অন্তঃকরণ তা গ্রহণ করে বিভিন্নভাবে— মেনে, না মেনে, চিন্তা-ভাবনা করে অথবা বিনা বিচারে।

'কলীলাম্ মা তাশকুরূন' অর্থ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। 'মা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা আল্লাহ্র দয়া ও দানের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। অথবা যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, সে পরিমাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোমরা করো না। কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব পালনে তোমরা অনিয়মিত ও উদাসীন। তাই কখনো এ দায়িত্বটি পালন করো, আবার কখনো করোই না।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'বলো, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকটই তোমাদেরকে সমবেত করা

হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিন যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। কিন্তু মহাবিচারের দিবসে এভাবে রাখবেন না। তখন তোমাদের সমবেত করে গ্রহণ করবেন তোমাদের কৃতকর্মের হিসাব। কথাটি এখানকার 'জারাআ কুম' (তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন) পদের কর্তার অভিপ্রায়প্রকাশক।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে (২৫)' বলো এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই নিকটে আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র' (২৬)। একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! দেখেছেন, তারা কতোখানি মূর্খ ও উন্নাসিক! মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার এ সকল সুনিশ্চিত বিষয়াবলীর প্রতি তারা এতটুকুও প্রত্যয় রাখে না। তাই আপনাকে বলতে সাহস পায়, বলো, তুমি যা বলে চলেছো, তা ঘটবে কখন? আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ই কেবল এ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। কারণ ওই সকল ঘটনা তিনিই ঘটাবেন তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়ানুসারে এবং তাঁর অপার ক্ষমতাবলে। আমি তো কেবল তাঁর বার্তাবাহক, তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রেরিত দয়ার্দ্র সতর্ককারী।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা যখন তা আসন্ন দেখবে, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই তো তোমরা চেয়েছিলে'। একথার অর্থ— যখন মহাপ্রলয় অত্যাসন্ন হবে, তখন তা অবলোকন করা মাত্র তাদের মুখমণ্ডল ধারণ করবে কৃষ্ণবর্ণ। তখন তাদেরকে বলা হবে, শংকিত হচ্ছো কেনো, এটাইতো তোমরা চেয়েছিলে। চাওনি? এখানে 'তাদ্দাউ'ন। অর্থ চেয়েছিলে, কামনা করেছিলে, ত্বরান্বিত করার জন্য চোটপাট করেছিলে। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'দাওয়া' (প্রার্থনা) থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা তো এটাই প্রার্থনা করেছিলে, জানিয়েছিলে আবেদন ও দাবি।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সঙ্গীগণকে ধ্বংস করেন, অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফেরদেরকে কে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে'? প্রশ্নটি সূচনামূলক ও স্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এখানে 'ভেবে দেখেছো কি' অর্থ 'জানতে পেরেছো কি'। কথাটি এখানে অতীতকালবোধক হলেও অনুজ্ঞা অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ আমাকে তাহলে জানাও। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার বচনবাহক! আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করুন এভাবে— হে মক্কাবাসী! আমাকে তাহলে জানাও, তোমাদের অভিলাষানুসারে আল্লাহ্ যদি আমাকে ও আমার সহচরগণকে ধ্বংসই করে দেন, অথবা তোমাদের অভিলাষবিরুদ্ধ ভাবে আমাদেরকে দান করেন তাঁর দয়ার্দ্র আশ্রয়, তবে তোমাদের এতে করে উৎফুল্ল হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আমাদের প্রতি যা-ই করুন না কেনো, তোমরা

তো তার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে শায়েস্তা করবেনই। কেননা তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। বলো, তখন তোমাদেরকে রক্ষা করবে কে?

এখানকার 'ফামান' কথাটির 'মান' প্রশ্নবোধকটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি থেকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, আমার মৃত্যুকামনার মধ্যে তোমাদের কোনো কল্যাণ তো নেই। বরং তোমাদের জন্য কল্যাণকর দায়িত্ব হচ্ছে এখন থেকে এমন কারো আশ্রয়ার্থী হওয়া, যিনি তোমাদেরকে ওই সুনিশ্চিত শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন। তোমাদের জড়-উপাস্যসমূহের সে ক্ষমতা তো নেই। কোনো কোনো কোরআনব্যাখ্যাতা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার প্রত্যাদেশবাহী! আপনি তাদেরকে বলুন, হে মক্কাবাসী! আল্লাহ্ যদি আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে মৃত্যুদান করেন এবং আমরা যদি শাস্তির উপযোগী হই, তবে তাতে করে তোমাদের কী লাভ? আমরা বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তিনি তো আমাদেরকে দয়া করে মার্জনাও করে দিতে পারেন। আর যেহেতু আমরা বিশ্বাসী, তা-ই আমাদের দৃঢ় আশা যে, তিনি আমাদেরকে মার্জনা করবেন। কিন্তু তোমাদের পরিণতি তখন কী হবে, তা ভেবে দেখেছো কি? তোমরা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তোমাদের শাস্তিপ্রাপ্তি তো সুনিশ্চিত। ওই সুনিশ্চিত শাস্তি থেকে তোমাদেরকে তখন নিষ্কৃতি দিবে কে?

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'বলো, তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁতে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! অতএব আপনি প্রার্থনা করুন এভাবে— বলুন, আমাদের প্রভুপালনকর্তা পরম কৃপাপরবশ। আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি এবং নির্ভর করি কেবল তাঁর উপরেই। আর হে বিরুদ্ধবাদী জনতা! জেনে রেখো, তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব চিরকাল অসমাধ্য অবস্থায় থাকবে না। একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হবেই। তখন তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলো কে।

এখানে 'তাওয়াক্কালনা' (আমরা নির্ভর করি) কথাটির পূর্বে 'আ'লাইহি' (তাঁর উপর) বসানো হয়েছে বক্তব্যটিকে সুনির্দিষ্ট করণার্থে। অর্থাৎ আমরা নির্ভর করি শুধুমাত্র তাঁর উপরেই। বাক্যটি পূর্বোক্ত 'তিনিই দয়াময়' এবং 'আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি' বাক্যদ্বয়ের পরিপোষক। বরং আলোচ্য আয়াতের পুরো বাক্যটি ইতোপূর্বের আয়াতসমূহে উল্লেখিত প্রমাণসমূহের ফলাফল। অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমেই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণতি। শেষে তাই বলা হয়েছে— শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে আমার নবী! তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা যে বিভ্রান্ত, সে কথা তোমরা জানতে পারবে অচিরেই।

শেষোক্ত আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবহমান পানি'?

২৮ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্য শুরু করা হয়েছে 'তোমরা ভেবে দেখেছো কি' বলে। আলোচ্য আয়াতেও করা হয়েছে সেরকম। এখানে ভাবতে বলা হয়েছে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে। সেটি হচ্ছে প্রবহমান পানি যদি তোমাদের নাগাল থেকে অনেক নিচে নেমে যায়, তখন সে পানি তোমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিতে সক্ষম কে? তোমাদের পূজিত উপাস্যরা? নিশ্চয় নয়। সে ক্ষমতা তো রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। তবুও কি তোমরা তাঁর প্রতি পূর্ণসমর্পিত হবে না?

এখানে 'গওরা' অর্থ নাগালের বাইরে, অনেক গভীরে। আর 'মাঈন' অর্থ প্রবহমান পানি। শব্দটি সাধিত হয়েছে 'আলআ'ইনুন জ্বারিয়াতুন' (প্রবাহিত ঝর্ণা) থেকে। শব্দরূপটি কর্তৃপদের। কিন্তু এর অর্থ কর্মপদীয়। অর্থাৎ শব্দটি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে 'আলআ'ইনুন বাসিরাতুন' থেকে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— দৃশ্যমান পানিপ্রবাহ, যা আহরিত হয় সহজে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পানি যদি পৌঁছে যায় মৃত্তিকাভ্যন্তরের সংগ্রহের অযোগ্য কোনো স্তরে, তবে সেখান থেকে ওই পানি বের করে আনতে পারবে কে? তোমাদের দেব-দেবী-প্রতিমারা? না, আল্লাহ্? ভেবে দ্যাখো, তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক কী বলে।

শায়েখ জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, এই সুরা পাঠ করার পর 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' পাঠ করা মোস্তাহাব।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তিরিশ আয়াতসম্বলিত একটি সুরা এমন, যার পাঠকারী অবশ্যই হবে ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুরাটি হচ্ছে— 'তাবারাকাল্ লাজী বিইয়াদিহিল্ মুল্‌ক'। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট সুরা মুল্‌ক তার পাঠকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এভাবে তাকে দোজখ থেকে পৌঁছে দিবে বেহেশতে।

হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. 'আলিফ লাম তানযীল' এবং 'তাবারাকাল্ লাজী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক' না পড়ে ঘুমাতেন না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরাটি সংরক্ষক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষাকারী।

মালেক ইবনে মা'দান বলেছেন, এক লোক 'আলিফ লাম তানযীল' ও 'তাবারাকাল্ লাজী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক' ছাড়া অন্য কোনো সুরা পাঠ করতো না। লোকটি ছিলো পাপী। তার মৃত্যুর পর সুরা দু'টো পাখির আকার নিয়ে তার উপর পক্ষ বিস্তার করেছিলো এবং বলেছিলো, হে আমাদের আল্লাহ্! একে ক্ষমা করো। এ আমাদেরকে বার বার পাঠ করতো। আল্লাহ্‌পাক তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন। বলবেন, এর প্রতিটি পাপ মুছে দাও একটি করে পুণ্য দিয়ে এবং বাড়িয়ে দাও এর মর্যাদা। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, সুরা মুল্‌ক কবরে তার পাঠকারীর পক্ষে

বাদানুবাদ করবে। বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমি যদি তোমার গ্রন্থভূত হই, তবে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। আর যদি তা না হই, তবে আমাকে তোমার গ্রন্থ থেকে বিলোপ করে দাও। সুরাটি তখন ধারণ করবে পাখির আকৃতি। ডানা প্রসারিত করে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাবে তার পাঠকারীকে। তাউস বলেছেন, 'আলিফ লাম তানযীল' ও এই সুরা কোরআনের অন্যান্য সুরা অপেক্ষা ষাটগুণ অধিক পুণ্যবিশিষ্ট। দারেমী।

সূরা ক্বলাম

এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মহা পুণ্যধাম মক্কায়। এর মধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ৫২টি আয়াত।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○
نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢﴾ وَ
اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿٣﴾

r নূন— শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,

r তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।

r তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নূন' বর্ণটি বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির অন্তর্ভূত এবং দুর্জ্ঞেয়। এর মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যশালী, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, 'নূন' অর্থ মৎস্য, সে মৎস্য সাধারণ মাছ হতে পারে, অথবা হতে পারে 'বাহমূত' নামক ওই রহস্যময় মাছ, যার উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে মহাপৃথিবীকে। অথবা এর অর্থ দোয়াত বা কালির পাত্র। কেননা কোনো কোনো মাছ থেকে প্রস্তুত করা হয় কালো কালি, যা কাজে লাগে লেখা-লেখিতে। উল্লেখ্য, অক্ষরটির লেখ্যরূপ অর্ধচন্দ্রাকৃতির এবং এর অভ্যন্তরে রয়েছে বিন্দু চিহ্ন। এ অক্ষরটি উচ্চারিত হয় অন্তঃবর্ণ ও হ্রস্ব করে আনুনাসিক স্বরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'শপথ কলমের' (ওয়াল ক্বলাম)। 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে শপথার্থে। আর এখানে 'ক্বলাম' অর্থ ওই কলম, যে কলম দ্বারা লেখা হয়েছে অদৃষ্টলিপি। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন কলম। তারপর তাকে আজ্ঞা করেন, লেখো। কলম বলে, কী লিখবো? আল্লাহ্ বলেন, নিয়তি। তখন কলম লিখে ফেলে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল বিষয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন বর্ণনাটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সৃষ্টির নিয়তি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে, যখন তাদের প্রভুপালকের আরশ ছিলো পানির উপর। বাগবী লিখেছেন, ভাগ্যলিপি লেখার কলমটি ছিলো জ্যোতির। আর তা লম্বায় ছিলো আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবধানের সমান। ওই কলমের দ্বারাই লেখা হয় মহাকল্যাণকর অসংখ্য বিষয়। কলমের শপথ করা হয়েছে এখানে সেকারণেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার'। এখানে 'কলম' অর্থ যদি ভাগ্যলিপি লেখার কলমকে বুঝানো হয়, তবে সে কলম তো ছিলো একটি। কিন্তু এখানে তো বলা হয়েছে 'তারা যা লিপিবদ্ধ করে (ইয়াস্‌তুরূন)। অর্থাৎ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বহুবচন। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে ওই কলমের মর্যাদা প্রকাশার্থে। আর যদি আলোচ্য বাক্যের 'কলম' হয় সাধারণ কলম, তাহলে বহুবচন তো ব্যবহার করতে হবেই। লিপিক্রিয়ার সম্পর্ক এখানে ঘটানো হয়েছে লেখনীর সঙ্গে। আর লেখনীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে লেখকদেরকে। আর লেখক যেহেতু অসংখ্য, তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বহুবচন 'ইয়াস্‌তুরূন'। অথবা বলা যেতে পারে 'তারা যা লিপিবদ্ধ করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কৃতকর্ম লেখক ফেরেশতামণ্ডলীকে, কিংবা ওই সকল বিদ্বজ্জনকে, যাঁরা লিপিবদ্ধ করেন ধর্মীয় বিষয়াদি।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহী! আপনি তো আসত্তা আপনার মহান প্রভুপালনকর্তার অনুগ্রহসিক্ত। সুতরাং নিন্দুকেরা আপনাকে 'উন্মাদ' বললেও আপনি কিছুতেই উন্মাদ নন। এখানে 'অনুগ্রহ' অর্থ নবুয়ত, কল্যাণ, করুণা, আভিজাত্য, জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিচক্ষণতা, মর্যাদা ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে বলতো, তুমি তো উন্মাদ। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. যখন মহাসত্য ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন সম্মুখীন হলেন প্রচণ্ড বিরোধিতার। তাঁর তখন ছিলো আর্থিক সংকট। আর তাঁর শত্রুরা ছিলো স্বচ্ছল, ধনাঢ্য। তাই তারা বিস্মিত হলো। বলতে লাগলো, এতো দেখছি বদ্ধ পাগল। পাগল ছাড়া কি এরকম সংকটাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কেউ নতুন ধর্মমত প্রচার করতে পারে? তারা ছিলো অবিশ্বাসে অনড়। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে তারা প্রকাশ করেছিলো তাদের অপঅভিমতকে। বলেছিলো 'ইন্‌নাকা লামাজ্‌নূন' (অবশ্যই তুমি উন্মাদ)। তাদের এমতো দৃঢ়তার বিপরীতে আল্লাহ্‌পাকও তাই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন শপথ সহকারে। আবার এর মধ্যেই ব্যক্ত করেছেন তাদের অপমন্তব্যের অসারতার প্রমাণ। বলেছেন তাঁর অনুগ্রহের কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে পায়, সে তো হয় সর্ববিষয়ে সচেতন ও সফল। উন্মাদ তো সে কখনো

হতেই পারে না। এরপরেও যদি কেউ তাঁকে উন্মাদ বলে, তবে তাকে নিশ্চয় কেউ প্রজ্ঞাবান বলে ভাবতে পারবে না। উল্লেখ্য, রসুল স. এর দুগ্ধমাতা মাননীয়া হালিমা যখন তাঁকে কোলে নিয়ে তাঁর মাদী গর্দভের পিঠে চড়ে তাঁর লোকালয়ের দিকে যাত্রা করলেন, তখন গর্দভটি তিনবার কাবামুখী হয়ে সেজদা করলো এবং বলে উঠলো, আমার পৃষ্ঠোপরি রয়েছে নবীকুল শিরোমনি, রসুলগণের মস্তকের মুকুট, মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালয়িতার পরম প্রেমাস্পদ। ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স.কে অমান্যকারীরা গর্দভ অপেক্ষাও অধিক মূর্খ ও হতভাগ্য।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি আপনার উপরে আরোপিত রেসালাতের যে গুরুত্ব পালন করতে গিয়ে ক্রমাগত দুঃখ-যাতনা ভোগ করে চলেছেন, তার জন্য আপনাকে দেওয়া হবে মহান প্রতিদান, যা বর্ধিত হতে থাকবে নিরবচ্ছিন্নরূপে। এখানে 'আজ্বরান' অর্থ মহাপুরস্কার। আর পুরস্কারের মহিমা বোঝাতেই এখানে প্রযুক্ত হয়েছে আভিজাত্যপ্রকাশক 'তানভীন' (দুই যবর)।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿١٣﴾

q তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

q শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে—

q তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

q তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে, যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

q সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করিও না।

q উহারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে,

q এবং অনুসরণ করিও না তাহার— যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,

q পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,
q যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,
q রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত;

'ইন্‌নাকা লাআ'লা খুলুক্বিন্ আ'জীম' অর্থ তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মহান। আপনার স্বভাব-চরিত্র অতীব মহিমময়। সেকারণেই তো আপনি মহাসত্য প্রচারের পথে নীরবে সহ্য করে চলেছেন এতো প্রতিকুলতা, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। এরকম সহিষ্ণুতা, মহত্ত্ব ও দৃঢ়তা তো আর কারো মধ্যে নেই।

রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে আমার মতো কষ্ট আর কেউ সহ্য করেনি। হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'হুলিয়া' নামক পুস্তকে। হজরত জাবের থেকে ইবনে আসাকেরও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অবিশ্বাসীদের জন্য অপপ্রার্থনা করুন। তিনি স. বললেন, আমাকে অভিসম্পাত প্রদানকারীরূপে প্রেরণ করা হয়নি। প্রেরণ করা হয়েছে করুণার প্রতিভূরূপে। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মহান চরিত্র' অর্থ মহান ধর্ম। অর্থাৎ ইসলাম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি তো মহান ইসলাম ধর্মের উপরে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

হাসান বসরী বলেছেন, এখানে 'মহান চরিত্র' অর্থ কোরআনানুগ শিষ্টাচার। উম্মতজননী হজরত আয়েশার কাছে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুলেপাক স. এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তোমরা কি কোরআন পাঠ করো না? তাঁর পবিত্র স্বভাবই তো ছিলো কোরআনের বাস্তবরূপ। এরপর তিনি পাঠ করে শোনালেন 'ক্বদ আফ্‌লাহাল্ মু'মিনূন' আয়াতের শেষ পর্যন্ত। বোখারী, মুসলিম।

কাতাদা বলেছেন, এখানে মহান চরিত্র অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া এবং তাঁর নিষেধসমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। তিনি আরো বলেছেন, যাঁর সম্মুখে আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, তিনিই মহান চরিত্রের অধিকারী।

রসুল স. এর মহিমান্বিত চরিত্রের বিবরণ ঃ হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, রসুল স. ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট সুষমার অধিকারী। ছিলেন সুঠাম, সৌম্য— না দীর্ঘ, না হ্রস্ব।

হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুল স. এর বিশেষ পরিচারক হিসেবে তাঁর সেবা-যত্ন করেছি দশ বৎসর ধরে। এর মধ্যে তিনি স. কখনো আমাকে এরকম বলেননি যে, তুমি এটা করেছো কেনো, অথবা কেনো এটা করোনি। কৈফিয়তও চাননি আমার কোনো অনবধানতার। তিনি ছিলেন সুমধুর স্বভাববিশিষ্ট। তাঁর

পবিত্র করপল্লব দু'টি ছিলো রেশমী বস্ত্রের চেয়েও কোমল। আর তাঁর শরীর নিঃসৃত স্বেদ ছিলো মেশক আম্বর ও কস্তুরীর চেয়েও অধিক সুরভিময়। তিনি আরো বলেছেন, একবার এক মহিলা এসে বললো, আপনার সঙ্গে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, বলো। এজন্য তুমি আমাকে যেখানে যেতে বলবে, আমি সেখানেই যাবো। একথা বলেই তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। মহিলাটিও তার প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিলো। হজরত আনাস আরো বলেছেন, মদীনার ক্রীতদাসীরাও তাঁকে হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারতো। তিনি অম্লান বদনে তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলে, তিনি তার আগে হাত গুটিয়ে নিতেন না। কেউ তাঁর দিক থেকে মুখ না ফেরানো পর্যন্ত তিনিও তার দিক থেকে মুখ ফেরাতেন না। কখনো তিনি কারো সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতেন না। তিরমিজি।

জননী আয়েশা বলেছেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র কখনোই কারো প্রাণসংহার করেননি। প্রহার করেননি কখনো কোনো পরিচারক অথবা পরিচারিকাকে। কেউ তাঁর অধিকার খর্ব করলেও তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে তিনি শাস্তি দিয়েছেন তাকে, যে আল্লাহ্‌র অধিকার খর্ব করেছে। আর তা করেছেন কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধনার্থে। মুসলিম।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. একবার মোটা একটি নাজরানী উত্তরীয় কাঁধে জড়িয়ে এক স্থানে যাত্রা করলেন। আমিও সহগামী হলাম তাঁর। হঠাৎ এক বেদুইন এসে তাঁর উত্তরীয়ের এক প্রান্ত ধরে সজোরে টান মারলো। উত্তরীয়খানি খসে পড়লো তাঁর পবিত্র শরীর থেকে। বেদুইন বললো, মোহাম্মদ! তোমার কাছে আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ যদি থাকে, তবে তা থেকে আমাকে কিছু দাও। রসুল স.একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। নির্দেশ দিলেন তাকে কিছু দেওয়ার জন্য। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক দাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের বলেছেন, কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি না বলতেন না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত যোবায়ের ইবনে মুতঈম বলেছেন, হুনায়েন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম আমি। পথিমধ্যে কিছুসংখ্যক বেদুইন প্রার্থী তাঁকে ঘিরে ধরলো। তিনি বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলেন একটি বাবলা বৃক্ষের নিচে। তারা এক সময় টানাটানি করতে গিয়ে তাঁর উত্তরীয়টি হস্তগত করলো। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমার উত্তরীয়টি দাও। আমার কাছে ওই নুড়ি পাথরগুলোর মতো অজস্র উট থাকলেও তো আমি সেগুলোকে বিলিয়ে দিতাম। আমি তো ব্যয়কুণ্ঠ নই, নই কাপুরুষ, অথবা মিথ্যাশ্রয়ী। বোখারী।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর পবিত্র মুখ থেকে কখনো অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারিত হতো না। তিনি বাজারে চীৎকার করে কথা বলতেন না। মন্দের দ্বারা নিতেন না মন্দের প্রতিশোধ। বরং মার্জনা করে দিতেন। হজরত আবু হোরায়রা

বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুকুমার স্বভাবাবলীর উৎকর্ষ সাধনের লক্ষেই আবির্ভূত হয়েছি আমি। আহমদ। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে রয়েছে, তিনি স. বলেছেন, শুভ স্বভাবের সৌন্দর্যসাধন এবং তার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে আমাকে।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে বিশ্বাসীগণের হিসাবের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে তাদের সুন্দর স্বভাব। আল্লাহ্পাক ঘৃণা করেন কর্কশভাষী ও অশ্লীলভাষীকে। তিরমিজি, আবু দাউদ। তিরমিজি মনে করেন হাদিসটি শুদ্ধসূত্রবিশিষ্ট। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি জানো, কোন আমল অধিকসংখ্যক লোককে জান্নাতবাসী করবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ভীতি ও সচ্চরিত্র। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, শিষ্টাচারের কল্যাণেই মানুষ রাত জেগে নামাজ পাঠকারী এবং দিনভর রোজা পালনকারী অপেক্ষা উত্তম পদবাচ্য হয়। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সহচরবৃন্দের মধ্যে সে-ই আমার অধিকতর প্রিয়, যার স্বভাবচরিত্র অধিকতর উত্তম। বোখারী। বোখারী ও মুসলিমের ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আমার নিকট মহানুভব তারা, যাদের স্বভাব চরিত্র সুন্দর।

বায়হাকীর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এক মাযানী ব্যক্তি সূত্রে এবং 'শরহে সুন্নাহ্' গ্রন্থে হজরত উসামা ইবনে শুরাইক থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীগণ একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সর্বোৎকৃষ্ট দান কোনটি? তিনি স. বললেন, আদর্শ চরিত্র। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেছেন, যাত্রাকালে আমি যখন আমার অশ্বের রেকাবে পা রাখলাম তখন রসুল স. আমাকে শেষ উপদেশস্বরূপ বললেন, মানুষের প্রতি শিষ্টাচারী হয়ো। মালেক।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে—(৫) তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত'(৬)।

এখানে 'ফা সাতুবসিরু' অর্থ শীঘ্রই তুমি দেখবে। কথাটির 'সীন' অক্ষরটি এখানে আবশ্যিক অর্থে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির মাধ্যমে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। 'ওয়া ইয়ুব্সিরুন' অর্থ এবং তারাও দেখবে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! মহাবিচারের দিবসে আপনি যেমন দেখবেন, তেমনি দেখবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও।

'বিআয়্যিকুম' অর্থ তোমাদের মধ্যে। 'বা' অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতিরিক্ত রূপে। আর 'মাফতূন' অর্থ বিকারগ্রস্ত, উন্মাদ। এভাবে এখানে 'বিআয়্যিকুম' হয়েছে উদ্দেশ্য এবং 'মাফতূন' বিধেয়। অথবা 'আল মাকুল' এবং 'আল মাজ্বলুদ' এর

মতো এখানকার 'আল মাফতূন'ও শব্দমূল। অর্থাৎ এর অর্থ হবে— উন্মাদনা। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— তোমাদের মধ্যে কে উন্মাদনায় প্রকটতর, তা পরিদৃশ্যমান হবে অচিরেই, মহাবিচার পর্বের প্রান্তরে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই বিকারগ্রস্ত। তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে যথাস্থানে ব্যবহার করে না। অন্যথায় বুদ্ধি-বিবেকের দাবি তো এই যে, কাউকে স্বেচ্ছায় কোনো কিছু বেছে নিতে বলা হলে সে নিশ্চয়ই বেছে নেয় উত্তমতর বিষয়টিকেই। আবার বিপদসমূহের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হলে সে অবশ্যই বেছে নিবে সর্বাপেক্ষা লঘু বিপদটিকে। বিশ্বাসীগণ তো এরকমই করে। যেহেতু তারা বুদ্ধিমান তাই বেছে নেয় এমন সত্তাকে যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, পরিপূর্ণ ও সকল অক্ষমতা ও দোষত্রুটিমুক্ত। সকল লাভ ও ক্ষতি তাঁরই অভিপ্রায়াধীন। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বেছে নেয় নশ্বর পৃথিবীর ভোগোপকরণকে এবং উপাস্য হিসেবে নির্ধারণ করে এমন জড়প্রতিমাকে, কারো কল্যাণ, অথবা অকল্যাণ করার সাধ্য যাদের আদৌ নেই। তারা এতটুকুও বুঝতে পারে না যে, পৃথিবীর ভোগোপকরণপ্রাপ্তিও নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের উপর। সুতরাং তারা চাইলেও তো সবকিছু পায় না। পায় ততোটুকু, যতোটুকু আল্লাহ্ তাদেরকে দিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং তারা বিকারগ্রস্ত নয়তো কী?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা সৎপথপ্রাপ্ত (৭)। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ কোরো না'(৮)।

এখানে 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি বিয়োজক। আর 'কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে' কথাটি এখানে সম্বন্ধযুক্ত হবে 'সম্যক জানেন' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন, কে বিভ্রান্ত এবং কে পথপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই। কেননা তারা বিকারগ্রস্ত। বলাবাহুল্য, বিভ্রান্ত হওয়া বিকারগ্রস্তদেরই কাজ। 'ফালা তুত্বিই'ল মুকাজ্‌জিবীনা' অর্থ সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ কোরো না। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি হেতুবাচক। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনি যেহেতু জানলেন যে, আপনি সত্যাধিষ্ঠিত, সেহেতু আপনি ওই বিভ্রান্তদের কথামতো চলবেন না। গুরুত্ব দিবেন না তাদেরকে একেবারেই।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে'। এখানকার 'তারা চায়' ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে আগের আয়াতে উল্লেখিত মিথ্যাচারীরা। 'লাও' (যদি) অব্যয়টি এখানে সীমিতার্থক। 'ইয়ুদ্‌হিনূন' অর্থ নমনীয় হও। 'ইদদিহান' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'দিহান' থেকে। এর অর্থ নমনীয়তা, কোমলতা। আর 'ফা ইয়ুদ্‌হিনূন' এর 'ফা' যদি এখানে যোজক হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ধর্মীয় ব্যাপারে তারা নমনীয় হতে চায়,

কিন্তু সেই সঙ্গে তারা এ-ও কামনা করে যে, প্রথমে নমনীয় হোক মুসলমানেরা। অথবা— তারা চায়, তোমরা কোনো কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হও, তাহলে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্যাগ করবে তোমাদের বিরোধিতা।

সমাধান ঃ ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে নমনীয় হওয়া নিষিদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং অনুসরণ কোরো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত (১০), পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়'(১১)।

আগের আয়াতে সাধারণভাবে মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছিলো। আর আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হলো কথায় কথায় শপথকারী, লাঞ্ছিত ও পশ্চাতে নিন্দাকারীদের অনুসরণ করতে।

কাতাদা বলেছেন, আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে লক্ষ্য করে। কালাবী সূত্রে মুনজির এবং সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলো আখফাশ ইবনে শুরাইক। আতা এবং বাগবীও এরকম বলেছেন। তবে মুজাহিদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছকে উদ্দেশ্য করে।

'হাল্লাফ' অর্থ অধিক পরিমাণে মিথ্যা শপথকারী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুরা বাকারার 'ওয়ালা তাজ্বয়ালুল্লহ্ উ'রদ্বাতাল্ লি আইমানিকুম' আয়াতের তাফসীরে। 'মুহীন' অর্থ লাঞ্ছিত, অপমানিত, তুচ্ছ। অর্থাৎ যে অসৎসিদ্ধান্তকামী ও বিচক্ষণতাবিচ্যুত। আর 'হাম্মায' অর্থ পশ্চাতে নিন্দাকারী, ছিদ্রান্বেষী, চোখ অথবা চোখের ভ্রূ দ্বারা ইঙ্গিতে অন্যের দোষত্রুটি বর্ণনাকারী। আর 'মাশ্শাইম বি নামীম' অর্থ একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। তারাও পশ্চাতে নিন্দাকারীদের মতোই।

সমাধান ঃ অত্যধিক শপথোচ্চারণ অশোভন ও অনভিপ্রেত (মাকরূহ)।

একটি সংশয় ঃ এখানে বলা হয়েছে 'কুল্লা হাল্লাফ'। এর অর্থ যে কোনো ধরনের শপথকারী। এতে করে কি একথা বুঝা যায় না যে, সকল মিথ্যা শপথকারীর অনুসরণ করা না গেলেও তাদের মধ্যেই কিছুসংখ্যকদের অনুসরণ করা যাবে?

সংশয়ভঞ্জন ঃ 'কুল' শব্দটি সমষ্টির একটি একক। সাধারণ-বিশেষ উভয় প্রকার নিষেধাজ্ঞাই শব্দটির অর্ন্তভূত হতে পারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সকল প্রকার মিথ্যা শপথকারীর অনুসরণ নিষিদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ (১২), রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত' (১৩)। এখানে 'মান্নাই'ল্লিল্ খইর' অর্থ কল্যাণকর কাজে বাধাদানকারী, বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মময় পথের প্রতিবন্ধক।

'মুয়তাদ' অর্থ সীমালংঘনকারী, অতি মাত্রায় অত্যাচারী। 'আছীম' অর্থ পাপাসক্ত, পাপিষ্ঠ। 'উতুল্লিম' অর্থ রূঢ় স্বভাব। আর 'বা'দা জালিকা যানীম' অর্থ তদুপরি কুখ্যাত। অর্থাৎ এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত দোষগুলো থাকার কারণে যে ব্যক্তি কুখ্যাত।

'যানীম' এর শাব্দিক অর্থ— গোত্রপরিচয়হীন হওয়া সত্ত্বেও গোত্রগৌরব প্রকাশকারী। প্রকৃতপক্ষে 'যানীম' বলে দু'য়ীয়াকে। 'দু'য়ীয়া' বলে পাতানো সন্তানকে, অর্থাৎ যে ঔরসজাত সন্তান নয়। অথবা 'দু'য়ীয়া' বলে অবৈধ জাতককে। কামুস। বায়যাবী লিখেছেন, 'যানীম' কথাটি এসেছে 'যানামাতাশ শাত' থেকে। এর অর্থ— অতি ঝুলন্ত কান ও স্তনবিশিষ্ট ছাগল। উল্লেখ্য আঠারো বছর বয়সে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে পুত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো তার পিতা। আখনাস ইবনে শুরাইক বলেছেন, সে ছিলো সাকাফী গোত্রের। পরে তাকে জোহরা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে অত্যন্ত রূঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মন্দ গুণাবলী। কিন্তু বিশেষভাবে কে এগুলোর লক্ষ্যস্থল তা ছিলো অজানা। পরে যখন অবতীর্ণ হলো 'তদুপরি কুখ্যাত' তখন আমরা বুঝতে পারলাম কুখ্যাত লোকটি হচ্ছে ওলীদ। একটি মাদুলী ঝুলানো থাকতো তার গলায়। তাই তাকে চেনা যেতো সহজেই।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই সুরার ১০ ও ১১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও আমরা বুঝতে পারিনি যে, এ সকল কথার লক্ষ্যস্থল কে। এরপর যখন 'তদুপরি কুখ্যাত' পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো, তখন বুঝতে পারলাম, কথাগুলো বলা রয়েছে ওলীদ সম্পর্কে। ছাগলের কান, অথবা স্তনের মতো ঝুলন্ত ছিলো তার কান।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকটি প্রসিদ্ধ ছিলো তার দুষ্কর্মের কারণে, যেমন কোনো ছাগল প্রসিদ্ধ হয় তার লম্বা কান ও ঝুলন্ত স্তনের জন্য।

আমার ধারণা, উপরোক্ত নিকৃষ্ট বিশেষণগুলির চেয়ে 'যানীম' বিশেষণটি অধিক নিকৃষ্ট। সেজন্য তা উল্লেখ হয়েছে অপকৃষ্ট কয়েকটি বিশেষণের পরে।

হজরত হারেস ইবনে ওয়াহাব খাজায়ী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, জান্নাতী ও জাহান্নামী কে সেকথা কি আমি তোমাদেরকে জানাবো না? সাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, ওই প্রতিপত্তিহীন বিশ্বাসী, যে শপথ করে কিছু বললে আল্লাহ্ তার বাসনাকে সত্যে পরিণত করে দেন। আর জাহান্নামী সে, যে খল ও মদগর্বিত।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿١٤﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾

r এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী।

r উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।'

r আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।

সম্মানিত ক্বারীগণ প্রথমোক্ত আয়াতটি পাঠ করেছেন তিন রকম নিয়মে। যেমন— ১. 'আন কানা জা মালিঁউ ওয়া বানীন' ২. 'আআনকানা জা মালিউ ওয়া বানীন' ৩. 'লি আন কানা জা মালিউ ওয়া বানীন'। এখানে উদ্ধৃত হয়েছে প্রথম নিয়মটি। সাধারণ ক্বারীগণ আয়াতখানি এভাবেই পাঠ করে থাকেন। ক্বারী ইবনে আমের, ক্বারী হামযা, ক্বারী আবুবকর এবং ক্বারী ইয়াকুব পাঠ করতেন দ্বিতীয় নিয়মে 'হামযা' সহযোগে। আবার কোনো কোনো ক্বারী অবলম্বন করেছেন তৃতীয় উচ্চারণ রীতিটি। কিন্তু যে ভাবেই পাঠ করা হোক না কেনো, বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় প্রায় একই রকমের— 'এই জন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী'। অর্থাৎ ওই মিথ্যাচারী চায়, রসুল স. তার আনুগত্য করুন এ কারণে যে, সে ধনবল ও জনবলে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় উচ্চারণরীতির ক্ষেত্রে বাক্যটি হবে প্রশ্নবোধক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি তার অনুসারী কি হবেন এ জন্য যে, সে বিত্তশালী ও অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী? অথবা বলা যেতে পারে, প্রশ্নটি প্রযুক্ত হবে পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে এবং মর্মার্থ দাঁড়াবে— সে কোরআনকে 'সেকালের উপকথা' বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে কি এ জন্য যে, সে সম্পদশালী ও অধিক সন্তান-সন্ততিধারী? কিংবা সম্পদশালী হওয়ার কারণে তার উচিত ছিলো সম্পদদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর বাণী ও তাঁর বাণীবাহককে মান্য করা। কিন্তু সে তো কৃতঘ্ন ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর তৃতীয় উচ্চারণরীতিতে যুক্ত করা হয়েছে একটি উহ্য অব্যয় 'লি'। কিন্তু এতে করে আয়াতখানির কোনো ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় না।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র'। একথার অর্থ— দুরাচার ওলীদের সম্মুখে যখন কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে তা মান্য করার বদলে করে অস্বীকার। চরম দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে এমতো অপমন্তব্য করে যে, এগুলো তো অতীত যুগের কিংবদন্তী মাত্র। আল্লাহ্‌র বাণী কদাচ নয়। এখানে 'আসাত্বীর' অর্থ উপকথা, কল্পকাহিনী, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দিবো'। এই বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। উক্তিটি শাসনমূলক ও হুমকিপ্রকাশক। 'খুরতুম' এর শাব্দিক অর্থ মাতঙ্গ-শুণ্ড ও বরাহের চিবুক। মর্মার্থ— নাসিকা, নাক। মাতঙ্গ ও বরাহের সঙ্গে তুলনা করে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী ওই লোকটির নাক ছিলো হাতীর শুঁড়, অথবা শূকরের থুতনির মতো। ফাররা বলেছেন, এখানে 'শুঁড়' বা নাক বলে বুঝানো হয়েছে তার সারা শরীরকে। অর্থাৎ আংশিক বলে মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে

সমষ্টির। আবুল আলিয়া এবং মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— মহাবিচারের দিবসে তার মুখমণ্ডল হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। ফলে আল্লাহ্‌র শত্রু বলে সহজেই শনাক্ত করা যাবে তাকে। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তার নাকের উপরে হানবো তরবারীর আঘাত। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে সেরকমই ঘটেছিলো।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ১৭—৩৩

إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

r আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান-অধিপতিগণকে, যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, উহারা প্রত্যূষে আহরণ করিবে বাগানের ফল,

r এবং তাহারা 'ইন্‌শাআল্লাহ্‌' বলে নাই।

q অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন উহারা ছিল নিদ্রিত।

q ফলে উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

q প্রত্যূষে উহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলিল,

q 'তোমরা যদি ফল আহরণ করিতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।'

q অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে,

q 'অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।'

q অতঃপর উহারা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম— এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

q অতঃপর উহারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল, তখন বলিল, 'আমরা তো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি।'

q 'বরং আমরা তো বঞ্চিত।'

q উহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?'

q তখন উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।'

q অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

q উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।

q সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক ইহা হইতে আমাদিগকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

q শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি উহারা জানিত!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে'। একথার অর্থ— ইয়েমেন অঞ্চলের ওই বিশেষ বাগানের মালিকদেরকে অন্নসংকটে ফেলে আমি যেমন করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, তেমনি করে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত করে পরীক্ষা করেছি মক্কাবাসীদেরকে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— মক্কার মুশরিকেরা বার বার মহাসত্য ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো। তদুপরি ক্রমাগত অত্যাচার করে যেতে লাগলো রসুল স. ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গের উপর। এভাবে অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন রসুল স. প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! মক্কাবাসীদের উপরে আপতিত করো নবী ইউসুফের যুগের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হলো। এক টানা সাত বৎসর ধরে তাদেরকে ভোগ করতে হলো অবর্ণনীয় কষ্ট। মৃতদেহ ও মৃতের চামড়া-হাড় ভক্ষণ করতে বাধ্য হলো তারা। শেষে মুক্তি পেলো রসুল স. এর দোয়ার বরকতে।

‘আসহাবাল জান্নাহ্’ অর্থ উদ্যান অধিপতিগণ। এখানকার ‘আল’ সীমিতার্থক। অর্থাৎ ‘আল’ ব্যবহার করে এখানে বুঝানো হয়েছে একটি বিশেষ উদ্যানের কথা।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর সেনাস্বল্পতা লক্ষ্য করে আবু জেহেল দর্পভরে বলেছিলো, ওদেরকে ধরে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে ফ্যালো, অযথা হত্যা কোরো না। ওই ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— আমি মক্কার মুশরিকদেরকে শক্তিশালী করে পরীক্ষা করেছিলাম, যেমন বিত্তশালী করে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিদেরকে।

ইবনে সালেহ সূত্রে কালাবীর মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে মারওয়ান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইয়েমেন রাজ্যের সানআ নগরীর ছয় মাইল দূরে বাস করতেন এক পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি রচনা করেছিলেন একটি মনোরম ফলের বাগান। ওই বাগানের নাম ছিলো মারওয়া। তিনি আকর্ষি দিয়ে ফল পাড়ার পর যে ফলগুলো পাড়তে পারতেন না, সেগুলো রেখে দিতেন অভাবগ্রস্তদের জন্য। ফল শুকানোর চাটাই থেকে যে ফলগুলো চাটাইয়ের বাইরে ছিটকে পড়তো, সেগুলোকেও তিনি রেখে দিতেন তাদের জন্য। বাগানের পাশে ছিলো তাঁর শস্যক্ষেত্র। ফসল কাটার সময়েও ঝরে যাওয়া শস্যশীষগুলোকে তিনি আর গ্রহণ করতেন না। রেখে দিতেন দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। এক সময় তিনি ইন্তেকাল করলেন। তখন সে বাগানের মালিক হলো তাঁর সন্তানেরা। তারা শপথ করলো, পিতার আদর্শ তারা অনুসরণ করবে না। এখন থেকে কোনো পরিত্যক্ত ফল ও ফসল রাখবে না অভাবীদের জন্য। তাই-ই করতে লাগলো তারা। ফল ও ফসল নিঃশেষে তুলতে লাগলো নিজেদের ঘরে। তাদের সে শপথের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে—

‘যখন তারা শপথ করেছিলো যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল’।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘এবং তারা ইনশাআল্লাহ্ বলেনি’। এখানে ‘ইসতিছনা’ অর্থ ব্যতিক্রমী বাক্য। আর এখানে ব্যতিক্রমী বাক্য হচ্ছে ‘ইনশাআল্লাহ্’। ব্যতিক্রমী বাক্য দ্বারা পূর্বাপর বাক্যের পার্থক্য নির্ণীত হয়। আবার ‘ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) বললে ব্যতিক্রমীটিই হয় মুখ্য উদ্দেশ্য। অথবা বলা যেতে পারে, তারা বলেনি ‘আফআ’লু ইনশাআল্লাহ্’ (যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি করবো)। কিংবা ‘লা আফআ’লু ইল্লা আনশাআল্লাহ্’ (আল্লাহ্র ইচ্ছা না হলে করবো না)। কথা দু’টোর মর্মার্থ একই। এমতাবস্থায় আগের আয়াতের ‘যখন তারা শপথ করেছিলো’ কথাটির ক্রিয়ার অবস্থাপ্রকাশক হবে ‘তারা ইনশাআল্লাহ্ বলেনি’। অর্থাৎ তারা ব্যতিক্রমী বাক্যটি তাদের শপথের সময় উচ্চারণ করেনি। আর একটি মর্মার্থ হতে পারে আলোচ্য আয়াতের। সেটি হচ্ছে— তারা শপথ করেছিলো, অতি প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল। কিন্তু তাদের পিতার মতো তারা অভাবগ্রস্তদের জন্য কোনো অংশই রাখবে না।

এমতাবস্থায় এখানকার ব্যতিক্রমী বাক্যটি সংযুক্ত হবে আগের আয়াতের 'ফল আহরণ করবে' কথাটির সঙ্গে। অথবা আলোচ্য আয়াতের বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক বিপর্যয় হানা দিলো সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিলো নিদ্রিত'। একথার অর্থ— 'ইনশাআল্লাহ্' বচনবিহীন শপথ উচ্চারণ করার পর তারা ঘুমিয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্র নির্দেশে তাদের বাগানের উপর দিয়ে বয়ে গেলো অগ্নিঝড়। তারা সে ঝড়ের কথা জানতেও পারলো না।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো'। 'সরীম' অর্থ বিরাণ বাগান, যে বাগানে কোনোই ফল নেই। অথবা অর্থ— নিশীথ। অর্থাৎ বাগানটি তখন অগ্নিঝড়ে দগ্ধ হয়ে উৎসন্ন হয়ে গেলো অন্ধকার নিশীথের মতো। অথবা 'সরীম' অর্থ দিবস। অর্থাৎ দগ্ধীভূত বাগান হয়ে গেলো ঝকঝকে দিবসের মতো পরিষ্কার, ফলহীন। 'সরমূন' অর্থ কর্তন। দিবস-রজনী পরস্পরের দিক থেকে কর্তিত হয়। তাই দিবস-রজনীকেও বলে 'সরীম'।

হাসান বসরী বলেছেন, উদ্যানটি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য। অর্থাৎ তখন বাগানের কোনোকিছুই আর অবশিষ্ট ছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বনী খুজাইমারা তাদের প্রবাদে কালো ছাইকে বলে 'সরীম'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আগুনে ঝলসে গিয়ে বাগানটি হয়ে গেলো কালো ছাই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বললো(২১), তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চলো' (২২)।

এখানে 'উগদু' অর্থ সকাল সকাল চলো। আরবী ভাষায় 'উগদু' এর পরে বসে 'ইলা' (দিকে) অব্যয়। অথচ এখানে শব্দটির পরে বসেছে আলা' (উপর)। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, 'গদবুন' এর সম্পর্ক ঊষাকালের যাত্রার সঙ্গে। আর মনোনিবেশনের অর্থও নিহিত হয়েছে এর মধ্যে। অথবা বলা যায়, এর মধ্যে রয়েছে প্রাধান্য ও সক্ষমতার অর্থ। আবার এরকমও বলা যেতে পারে, 'উগদু' শব্দটি এখানে অনুজ্ঞাসূচক অসমাপিকা ক্রিয়া। আর এর বিধেয় 'আ'লা হারছিকুম' (তোমাদের ক্ষেতে)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা চললো নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে (২৩), অদ্য যেনো তোমাদের নিকট কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে না পারে' (২৪)। একথার অর্থ— তারা মৃদু আওয়াজে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে অতি সন্তর্পণে বাগানের দিকে চললো। বললো, একদম শোরগোল করো না। নয়তো আগের অভ্যাস অনুসারে অভাবগ্রস্তরা এসে ভিড় জমাবে। তবুও কোনোক্রমে টের পেয়ে তারা যদি এসেই পড়ে, তবে সাবধান!

কিছুতেই তাদেরকে যেনো ভিতরে ঢুকতে দিয়ো না। এখানকার 'লা ইয়াদখুলান্নাহা' (প্রবেশ করতেই না পারে) কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের না-সূচকতা। অর্থাৎ তারা যেনো বাগানে প্রবেশ না করতে পারে কোনোক্রমেই। যেমন বলা হয় 'লা আতিআন্নাকা হাহুনা' (আমি তোমাদের কাছে কখনোই আসবো না)।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম— এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করলো'। বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত ২৩ সংখ্যক আয়াতের 'অতঃপর তারা বললো' এর সঙ্গে। আর এখানকার 'আ'লা হারদিন' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'নিবৃত্ত করতে সক্ষম ' এর সঙ্গে। 'হারদুন' এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, বাধা দেওয়া, রোষান্বিত হওয়া। একারণেই হাসান বসরী, কাতাদা এবং আবুল আলিয়া বলেছেন, এখানে 'হারদুন' এর অর্থ হবে চেষ্টাচরিত্র। কুরতুবী, মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ একমত। আবু উবায়দা বলেছেন, তারা ওই অভাবীদেরকে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে ছিলো একমত। শা'বী ও সুফিয়ান সওরী বলেছেন, তারা একমত ছিলো ওই অভাবগ্রস্তদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা ছিলো বাগানের মালিক। তাই তাদের ধারণা ছিলো, তারা অবশ্যই ওই দরিদ্র জনতাকে প্রতিহত করতে পারবে। এমতো বিশ্বাস নিয়েই তারা যাত্রা করেছিলো তাদের বাগানের দিকে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলো, তখন বললো, আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি (২৬)। বরং আমরা তো বঞ্চিত (২৭)। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না কেনো'(২৮)? একথার অর্থ— সেখানে পৌঁছে অগ্নিঝড়ে ভস্মীভূত বাগান দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো তারা। সম্বিত হারিয়ে ফেললো প্রায়। ভাবলো, এ কোথায় এলাম। প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারলো সম্বিত ফিরে পাবার পর। আশাহত কণ্ঠে বলে উঠলো, আমরা তো বঞ্চিত হলাম। তাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ, বোধশক্তিসম্পন্ন মাঝবয়সী ভ্রাতা বললো, ইনশাআল্লাহ্ না বলে যে তোমরা শপথ করেছিলে, সেটা যে ঠিক ছিলো না, তা কি আমি তোমাদেরকে আগে বলিনি? আশ্চর্য! এখনো তোমরা অনুতপ্ত হচ্ছো না কেনো? ঘোষণা করছো না কেনো আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা? এখনো কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতীত কোনোকিছুই সংঘটিত হতে পারে না?

আবু সালেহ বলেছেন, শপথ করার সময় তারা ইনশাআল্লাহ্ না বলে বলেছিলো 'সুবহানাল্লাহ্'। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই মধ্যম বয়সী লোকটি তখন বললো, আমি কি তোমাদেরকে আগেই স্মরণ করিয়ে দেইনি যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলে তাঁর প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়? তিনি তোমাদেরকে

দিয়েছেন এতো সুন্দর ফলবান বাগান। অথচ তোমরা পণ করেছিলে আল্লাহ্‌র দরিদ্র বান্দাদেরকে কিছুই দিবে না। এটা কি তাঁর অনুপম অনুকম্পার প্রতি অকৃতজ্ঞতা নয়? এখনো সময় আছে। তাঁর সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হও। ঘোষণা করো তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তখন তারা বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম'। বক্তব্যটিতে নিহিত রয়েছে তাদের দু'টি স্বীকৃতি— ১. আল্লাহ্‌ জুলুম করা থেকে পবিত্র এবং ২. আমরাই নিজেদের উপরে জুলুমকারী। অভাবগ্রস্ত জনতাকে বঞ্চিত করতে চেয়ে সীমালংঘন করেছি আমরাই।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো (৩০)। তারা বললো, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী (৩১)। সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক এ থেকে আমাদেরকে উৎকৃষ্টতম বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম' (৩২)।

এখানে 'আক্ববাল' অর্থ একে অপরের প্রতি। কথাটি এখানে বাক্যের কর্তা এবং এখানে কর্মপদের অবস্থাপ্রকাশক হচ্ছে 'ইয়াতালাওয়ামূন' (দোষারোপ করতে লাগলো)। যেমন বলা হয় 'লাক্বীয়াহু রাকেবাইন' (উভয়ে মিলিত হলো তাদের বাহনারোহী অবস্থায়)। 'হায় দুর্ভোগ! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী' অর্থ হায়! সীমালংঘন তো করেছি আমরাই। আমাদের পুণ্যবান পিতা যেমন দরিদ্র দরদী ছিলেন, আমরা তো তেমন ছিলাম না। তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞচিত্ত। আর আমরা তার বিপরীত।

'সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক এ থেকে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বিনিময় দিবেন' অর্থ তারা বললো আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য সর্বান্তঃকরণে তওবা করলাম। সাবধান হলাম ভবিষ্যতের জন্য। আর আমরা এরকম করবো না। যথাপ্রাপ্য প্রদান করবো দরিদ্রদের। সুতরাং হে আমাদের আল্লাহ্‌! আমরা আশা রাখি তুমি আমাদের তওবা কবুল করবে এবং আমাদেরকে দান করবে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান। কেননা তুমিই একমাত্র ত্রাতা ও দাতা। এখানে 'ইলা' (প্রতি) অব্যয়টির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগের চূড়ান্ত পর্যায়কে। অথবা এখানকার শেষ শব্দটির (রগবত) মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌ অভিমুখী হওয়ার চরমতর আর্তি। তাই এরপর বলা হয়েছে 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম'। এই বাক্যটিতেই নিহিত রয়েছে তাদের দৃঢ় আশাবাদী হওয়ার কারণ। অর্থাৎ তারা বললো, যেহেতু আমরা এখন অনুতাপানলে জর্জরিত মনে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌ অভিমুখী, সেহেতু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তিনি আমাদেরকে দান করবেন উৎকৃষ্টতর বিনিময়।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, তারা বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করেছিলো। আর আল্লাহ্ তাদের আশা পূরণও করেছিলেন। তাদেরকে দান করেছিলেন আর একটি ফলবান বাগান। বাগানটি ছিলো আগের বাগানের চেয়ে অধিক সুন্দর ও বরকতময়। বাগানটির নাম ছিলো 'জুনুন'। ওই বাগানের একটি আঙ্গুরগুচ্ছ বহন করতে প্রয়োজন পড়তো একটি খচ্চরের। বাগবী।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'শাস্তি এরকমই হয়ে থাকে এবং আখেরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— ওই বাগানাধিকারীদেরকে যেমন আমি অকৃতজ্ঞতার কারণে শাস্তি দিয়েছিলাম। তেমনি দুর্ভিক্ষকবলিত করে শাস্তি দিয়েছি মক্কাবাসীদেরকে। এভাবেই আমি পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। এরপরেও যদি তারা তওবা না করে, বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল না হয়, তবে তাদেরকে আমি শাস্তি দিবো পরবর্তী পৃথিবীতে। সে শাস্তি হবে মর্মন্তুদ ও অনিঃশেষ। এ তত্ত্বটি যদি তারা জানতো, তবে এমতো অপকর্ম আর করতো না। পরিত্যাগ করতো অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صٰدِقِينَ ﴿٤١﴾

r মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাহাদের প্রতিপালকের নিকট।

r আমি কি আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করিব?

r তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিতেছ?

r তোমাদের নিকট কী কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর—

r যে, তোমাদের জন্য উহাতে রহিয়াছে যাহা তোমরা পসন্দ কর?

r তোমাদের কি আমার সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার রহিয়াছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যাহা স্থির করিবে তাহাই পাইবে?

r তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর উহাদের মধ্যে এই দাবির যিম্মাদার কে?

r উহাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহারা উহাদের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক— যদি উহারা সত্যবাদী হয়।

মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, আমরা পরকাল বিশ্বাস করি না। আর পরকাল বলে যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে এখানে আমরা যেমন সম্মান ও সম্পদ-বিত্ত নিয়ে সুখে আছি, সেখানেও সেরকমই থাকবো। তাদের এমতো অপকথনের প্রতিবাদ করা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে, যার মর্মার্থ— আমার প্রতি যারা সমর্পিত ও মুত্তাকী তারা কখনোই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো নয়। পরকালে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি অবশ্যই শাস্তি দিবো এবং মুত্তাকীদেরকে করবো পুরস্কৃত। তাদেরকে দান করবো অসংখ্য সুখোপকরণবিশিষ্ট জান্নাত।

এখানে 'আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করবো' বাক্যটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এর সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আত্মসমর্পণকারী ও অপরাধী কি সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে ? কখনোই নয়। তাই আমি যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক, সেহেতু আমিও তো তাদেরকে সমান্তরাল জ্ঞান করতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছো'? একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা কি এতোই মূঢ় ও মূর্খ যে, ভালো ও মন্দের পার্থক্যও বুঝতে পারো না? এ কেমনতর সিদ্ধান্ত তোমাদের?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট কি কোনো কিতাব আছে, যা তোমরা অধ্যয়ন করো— (৩৭) যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো' (৩৮)?

এখানকার 'আম' অব্যয়টি পার্থক্যসূচক 'বাল' (বরং) অর্থে ব্যবহৃত। আর 'ইন্না' অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে কর্মপদের স্থলে, যদিও শব্দটি হওয়া উচিত ছিলো 'আন্না'। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে এখানকার 'ইন্না' এর পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি শব্দ 'ক্বওল' বা 'কথা'। অর্থাৎ তোমরা কি সেই কিতাবে এরকম কথা পাঠ করেছো? অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'লাকুম' এর সঙ্গে 'লাম' ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই 'আন্না' অব্যয়টি হয়েছে 'ইন্না'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! যে অদ্ভুত দাবি তোমরা করছো, তার সপক্ষে কি তোমাদের কাছে এমন কোনো আসমানী কিতাব আছে, যা তোমরা নিয়মিত পাঠ করো এবং যে কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এমন কথা, যা তোমাদের আকাংখার অনুকূল? এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে পরের আয়াতে উল্লেখিত বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তোমাদের কি আমার সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোনো অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে, তা-ই পাবে'? একথার অর্থ— হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! আমি কি মহাপ্রলয়

পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তোমরা যা কামনা করবে, তা-ই আমাকে দিতে হবে? বাক্যটির সম্বন্ধ রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের সঙ্গে আমার এমন প্রতিশ্রুতি কি আছে, যা আমি পরিপূরণ করতে বাধ্য? মহাবিচারের দিবসে তোমরা যে রকম চাও, সেরকম সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে অঙ্গীকারাবদ্ধতা থেকে আমি মুক্ত হতে পারবোই না? অথবা কথাটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে এখানকার 'বালিগা' (সুদৃঢ়) এর সঙ্গে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— যে অঙ্গীকার বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত? আর এখানকার 'আইমান' শব্দটি শপথজ্ঞাপক। আর পুরো বাক্যটি এই শপথের প্রত্যুত্তর। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আমি তোমাদের সঙ্গে কি এই মর্মে শপথ করেছি যে, তোমরা যেমন চাও, আমি তেমনই করবো?

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদের মধ্যে এই দাবির জিম্মাদার কে'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ— এরকম কথার দায়-দায়িত্ব বহন করার সাধ্য, সাহস ও অধিকার আছে কার?

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তাদের কি কোনো দেব-দেবী আছে? থাকলে তারা তাদের দেব-দেবীগুলোকে উপস্থিত করুক— যদি তারা সত্যবাদী হয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তারা নিজেরা যদি তাদের অসম্ভব দাবির দায় বহন করতে না চায়, তবে তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোকে ডেকে আনুক। তারাই বলুক যে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা সমমর্যাদাসম্পন্ন? যদি তাদের দাবি সত্যই হয়, তবে তারা এরকম করে দেখায় না কেনো? এখানে 'উপস্থিত করুক' বলে প্রকাশ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের অক্ষমতাকে। 'ফালইয়া'তূ' (উপস্থিত করুক) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি এখানে কারণপ্রকাশক। আর 'যদি তারা সত্যবাদী হয়' কথাটি পরিণতিপ্রমাণক। কাজেই এখানে শর্তযুক্ত বাক্য হওয়া সত্ত্বেও পরিণতি নিষ্প্রয়োজন।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝٤٢ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝٤٣

r স্মরণ কর, সেই দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হইবে, সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজ্দা করিবার জন্য, কিন্তু উহারা সক্ষম হইবে না;

r উহাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে অথচ যখন উহারা নিরাপদ ছিল তখন তো উহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল সিজ্‌দা করিতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, সেই দিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে'। এখানে 'ইয়াওমা' (সেই দিনে) পদটি কালাধিকরণকারক। এর পূর্বে উহ্য রয়েছে 'উজ্‌কুর' (স্মরণ করো) কথাটি। এখানে অনুবাদ করা হয়েছে ওই উহ্যতা সহকারেই। আর 'পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে' অর্থ তখন কঠিন সংকটে ফেলা হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সেজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌পাক যখন প্রকাশ ঘটাবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতির, তখন সবাইকে হুকুম দেওয়া হবে, সেজদা করো। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন সেজদা করতে পারবে না।

বোখারী, মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার কয়েকজন সাহাবী রসুল স. এর নিকটে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! আমরা কি পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবো? তিনি স. জবাব দিলেন, নির্মেঘ আকাশের দ্বিপ্রাহরিক সূর্যদর্শন কি অস্পষ্ট? সাহাবীগণ বললেন না। তিনি স. বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে উদিত চতুর্দশীর চন্দ্র কি দুর্ণিরীক্ষ্য? তাঁরা বললেন, নাহ্‌। তিনি স. বললেন, তাহলে বোঝো, পুনরুত্থান দিবসের আল্লাহ্‌ দর্শনও তেমনি— স্পষ্ট ও অন্তরালহীন। তখন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা যার যার উপাসনা করতে, তার তার পিছনে চলে যাও। ওই ঘোষণার সাথে সাথে পৌত্তলিকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার উপাসনা করতে? তারা বলবে, আল্লাহ্‌র পুত্র উযায়েরের। বলা হবে, তোমরা মিথ্যার পূজারী। আল্লাহ্‌ তো ভার্যা ও সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করা থেকে চিরপবিত্র। এরপর বলা হবে, কী চাও এখন? তারা বলবে, পানি। আমরা পিপাসার্ত। বলা হবে, তোমরা কি দৃষ্টিহীন! সামনে তাকাও। তারা সামনে তাকাতেই জাহান্নামকে দেখতে পাবে মরীচিকার মতো। তাদের সকলকে তখন তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। এরপর খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা উপাসক ছিলে কার? তারা বলবে, আল্লাহ্‌র পুত্র মসী'র। বলা হবে, তোমরা উপাসক অসত্যের। এরপর তাদেরকে ইহুদীদের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সেদিন সূর্য-চন্দ্র ও মূর্তিপূজারীদের সামনে তাদের উপাস্যসমূহকে সুনির্দিষ্ট অবয়বে উপস্থিত করানো হবে। আর ইহুদী-খৃষ্টানদের সামনে শয়তানকে উপস্থিত করানো হবে নবী উযায়ের ও নবী ঈসা মসীহরূপে। এরপর ওই বাতিল উপাস্যসমূহ ও তাদের উপাসকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। হাদিসটি প্রত্যয়ন করেছেন তিবরানী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী আবু ইয়ালী, বায়হাকী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে দু'জন ফেরেশতাকে উযায়ের ও ঈসা'র আকারে উপস্থিত করা হবে ইহুদী ও নাসারাদের সামনে। তাদের নেতৃত্বেই দোজখে প্রবেশ করবে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা। 'তারা যদি উপাস্যই হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো' আয়াতে সেকথাই বলে দেওয়া হয়েছে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তারপর অবশিষ্ট থাকবে কেবল বিশ্বাসী ও কপটাচারীরা। আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন। তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো? অগ্রসর হও। তারা বলবে, আমরা ওই জাহান্নামীদের অনুসরণ করবো কেনো? পৃথিবীর জীবনে আমরা তো তাদের অনুসারী ছিলাম না। এরপর আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জানুদেশ। সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পতিত হবে পুণ্যবানেরা। যারা পৃথিবীর জীবনে ছিলো বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ও একনিষ্ঠ ইবাদতকারী। কিন্তু লোক দেখানো ইবাদত যারা করেছিলো, তারা তখন সেজদা করতে পারবে না। তাদের পিঠ হয়ে যাবে তক্তার মতো শক্ত। তারা তা বাঁকাতে পারবে না। সেজদা করতে চাইলেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। এরপর জাহান্নামের উপরে স্থাপন করা হবে একটি সেতু। ওই সেতুর নাম পুলসিরাত। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! পুলসিরাত কী? তিনি স. বললেন, কম্পমান পিচ্ছিল পথ, বক্রলৌহকণ্টকিত, নজদে উৎপাদিত কাঁটা-গুল্ম সদৃশ কণ্টক দ্বারা আবৃত। ওই সময় আমাকে ও অন্যান্য নবীকে দেওয়া হবে শাফায়াত করার অনুমতি। তাঁরা নিবেদন করবেন, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! সেতু অতিক্রমকারীদেরকে রক্ষা করুন। বিশ্বাসীরা তখন তাদের আপন আপন সৌভাগ্য অনুসারে পুলসিরাত অতিক্রম করবে বায়ু, পাখি, দ্রুতগামী অশ্ব, অথবা উষ্ট্রের গতিতে। কেউ কেউ আবার কণ্টকাহত হয়ে পড়ে যাবে জাহান্নামে। যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ! বিশ্বাসীগণ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তির পর তাদের জাহান্নামবাসী ভ্রাতাদের জন্য এমনভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে শুরু করে দিবে বাদানুবাদ, যেমন তোমরা বাদানুবাদ করো যথাপ্রাপ্য বুঝিয়ে নেওয়ার জন্য। বলা হবে, কলহ কোরো না। তারা নিবেদন করবে, ওরা তো আমাদের সঙ্গে নামাজ-রোজা পালন করতো। হজও করতো। আল্লাহ্ বলবেন, তাদেরকে সনাক্ত করো। জাহান্নামে প্রবেশ করা সত্ত্বেও যাদের চেহারা অবিকৃত থাকবে, তাদেরকে তখন তারা সনাক্ত করতে পারবে। আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। জান্নাতবাসীরা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা যাদের সম্পর্কে বলেছিলাম, তাদের কেউ আর জাহান্নামে নেই। আল্লাহ্ বলবেন, ভালো করে দেখে নাও। এক দীনার পরিমাণ ইমানের চিহ্ন কারো মধ্যে যদি দেখতে পাও, তবে তাকেও বের করে নিয়ে এসো। নির্দেশ পেয়ে তারা ভালো করে দেখতে শুরু করবে। এভাবে সনাক্ত করতে পারবে আরো অনেককে। আল্লাহ্ তাদেরকেও বের করে আনবেন। পুনঃ নির্দেশ দিবেন, অর্ধ দীনার পরিমাণ ইমান বিশিষ্টদেরকেও

চিহ্নিত করো। এভাবে তারা চিহ্নিত করবে আরো অনেককে। তাদেরকে বের করে আনার পর পুনরায় নির্দেশ দেওয়া হবে, এবার চিহ্নিত করো পিপীলিকা পরিমাণ ইমানবিশিষ্টদেরকে। তারা তাই করবে। এভাবে বের করে আনা হবে আরো অনেককে। তারপর জান্নাতবাসীরা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা। জাহান্নামের মধ্যে আর তো কল্যাণকর কিছু দেখি না। আল্লাহ্ বলবেন, ফেরেশতা ও বিশ্বাসীদের শাফায়াতপর্ব তো শেষ। এবার রইলেন কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু আল্লাহ্। একথা বলে আল্লাহ্ জাহান্নাম থেকে এমন অনেক লোককে বের করে আনবেন, যাদের পুণ্যকর্ম বলে কিছু নেই, আছে শুধু অতি সূক্ষ্ম এক বিন্দু ইমান এবং যাদের সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে হয়ে গিয়েছিলো অঙ্গার। জান্নাতের এক তোরণের কাছে অবস্থিত জীবন-সাগরে গোসল করতে বলা হবে তাদেরকে। সেখানে অবগাহনের পর তারা হয়ে যাবে সিক্ত মৃত্তিকায় অঙ্কুরিত নতুন তরুশিশুর মতো কান্তিময়। কিন্তু তাদের গ্রীবাদেশে তখনো থাকবে একটি সীলমোহর। সেদিকে তাকিয়ে জান্নাতবাসীরা বলবে, এরা হচ্ছে দয়াময় আল্লাহ্ কর্তৃক মুক্তকৃত দাস। এদেরকে আল্লাহ্ জান্নাত দান করলেন পুণ্যকর্ম ব্যতিরেকেই। আল্লাহ্ ওই ক্ষমাপ্রাপ্তদেরকে বলবেন, যা কিছু দেখছো, সবই তোমাদের। উল্লেখ্য, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম। তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— তাদের কাছে তখন আল্লাহ্ এমনভাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটাবেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।

লালকায়ী তাঁর 'কিতাবুস্ সুন্নাহ্'য় এবং আজরী তাঁর 'কিতাবুর রুইয়াত' গ্রন্থে হজরত আবু মুসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মহা বিচারের দিবসে প্রত্যেক জাতির সামনে আকৃতিবিশিষ্ট করে উপস্থিত করা হবে তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক উপাস্যদেরকে। সকলেই পক্ষাবলম্বন করবে তাদের আপন আপন উপাস্যদের। অবশিষ্ট থাকবে কেবল আল্লাহ্র এককত্বে আস্থা স্থাপনকারীরা। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, তোমরাও অগ্রসর হও। দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো? তারা বলবে, কার কাছে যাবো? আমরা যাঁর আরাধনা করতাম, তাঁকে তো দেখছিনা। বলা হবে, তাঁকে দেখলে কি তোমরা চিনতে পারবে? তারা বলবে, আমরা তো জানি, তিনি আকারাতীত। আল্লাহ্ তখন অপসারণ করবেন তাঁর অন্তরাল। তাঁকে প্রত্যক্ষ করে তারা লুটিয়ে পড়বে সেজদায়। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক সেজদা করতে পারবে না। জোর করে সেজদা করতে গিয়ে তারা মাটিতে পড়ে যাবে উল্টো হয়ে। আল্লাহ্ বলবেন, শির উত্তোলন করো। তোমাদের প্রত্যেকের পরিবর্তে দোজখে পাঠিয়ে দিয়েছি একজন করে ইহুদী, অথবা খৃষ্টানকে। এ সকল হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র জ্যোতি তখন প্রতিভাসিত হবে বিভিন্নরূপে। এক ধরনের প্রতিভাস হবে আলমে মেছালের প্রতিভাসের অনুরূপ, যা প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিম্ব দর্শন, মূল দর্শন নয়। যেমন রসুল স. তাঁকে দেখেছিলেন সৌম্যকান্তি যুবাপুরুষরূপে, যিনি ছিলেন কুঞ্চিতকুন্তলবিশিষ্ট এবং স্বর্ণপাদুকা পরিহিত।

এধরনের উদ্ভাস দৃষ্টিগোচর হতেই বিশ্বাসীরা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী। আমরা তো আমাদের প্রভুপালয়িতাকে আকারবিশিষ্ট বলে মানি না। তখন প্রতিভাসিত হবে আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতির সম্পাত। তার মধ্যে থাকবে অবোধ্য এক মানবাকৃতির প্রতিচ্ছবি। সম্ভবত ওই উদ্ভাসনই হবে জানুদেশের উদ্ভাসন, যা বিশ্বাসীরা প্রত্যক্ষ করবে নির্মেঘ আকাশের দ্বিপ্রাহরিক সূর্য, অথবা মেঘমুক্ত আকাশের পূর্ণশশীর মতো সুস্পষ্ট। অবিশ্বাসীরা এমতো দর্শন থেকে হবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ কথাই এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে 'কক্ষণোই নয়, সেদিন আল্লাহ্ থাকবেন তাদের দৃষ্টির অন্তরালে'। রসুল স. বলেছেন, সেদিন পুণ্যবান ও পাপী বিশ্বাসীরা ছাড়া অন্য কেউ যখন সেখানে উপস্থিত থাকবে না, তখন আল্লাহ্ উন্মোচন করবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জানুদেশ। উল্লেখ্য, কোরআন মজীদে উল্লেখিত 'আল্লাহ্র হাত' 'আল্লাহ্র চেহারা' এই কথাগুলো যেমন দুর্জ্ঞেয়, তেমনি দুর্জ্ঞেয় 'আল্লাহ্র জানুদেশ' কথাটিও। মুতাশাবিহাত (দুর্জ্ঞেয়) পর্যায়ের এ সকল কথার প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্পাক। তত্ত্বজ্ঞগণ তাই বলেন, আমরা এসকল কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, যদিও এগুলোর মর্ম আমাদের বোধায়ত্ত নয়। আরো উল্লেখ্য, তৃতীয় জ্যোতিসম্পাত ঘটবে জান্নাতাভ্যন্তরে। সেখানে মনুষ্যাকৃতির প্রতিচ্ছবিও হবে অপসৃত। ওই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'লিল্লাজীনা আহসানুল হুসনা ওয়া যিয়াদাতুন'।

উল্লেখ্য, পরকাল ইবাদত করার স্থান নয়, প্রতিফল প্রাপ্তির স্থান। তৎসত্ত্বেও তখন পুণ্যবান ও পাপী বিশ্বাসীদেরকে সেজদা করতে হুকুম দেওয়া হবে কেবল তাদের দাসত্বের স্বভাব-প্রকৃতি প্রদর্শনার্থে। আর মহামহিমময় আল্লাহ্ যখন তাঁর অন্তরাল উঠিয়ে দিবেন, তখন সে অনন্য অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আল্লাহ্কে সেজদা জানানোই তো হবে তাঁর দাসগণের জন্য স্বাভাবিক। পুণ্যবান ও পাপী বিশ্বাসীরা সকলেই তখন আদিষ্ট হবে সেজদা করতে। পুণ্যবানেরা সে আদেশ পালন করতে পারবে। কিন্তু পাপীরা পারবে না তাদের অহমিকা ও অন্যবিধ পাপের কারণে। যেমন যথানিয়মে ও যথাসময়ে নামাজ না পাঠ করা, বেদাতীদের সঙ্গে হৃদ্যতা, ইবাদতে প্রদর্শনপ্রবণতা ইত্যাদি।

একটি প্রশ্ন ঃ হজরত আবু হোরায়রা প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, অবিশ্বাসীদের দোজখগমনের পর অবশিষ্ট থাকবে কেবল বিশ্বাসী ও কপটাচারীরা। আল্লাহ্ তখন তাঁর জ্যোতির উদ্ভাস ঘটাবেন। এবং হুকুম দিবেন সেজদা করতে। সে হুকুম পালন করতে পারবে বিশ্বাসীরা, কপটাচারীরা পারবে না। কথাটি বিসদৃশ নয় কি? কপটাচারীরা তখন বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকতে পারবে কীভাবে?

জবাব ঃ ওই হাদিসগুলোকে উল্লেখিত কপটাচারী অর্থ ধর্মের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের কপটাচারী। মূল কপটাচারী বা মুনাফিক নয়। তারা তো অবশ্যই অবিশ্বাসীদের দলভূত। কেননা তাদের স্খলন বিশ্বাসগত। তাই তারা প্রাথমিক বিবেচনাতেই জাহান্নামী। তাদের স্থায়ী আবাস হবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। তারা আল্লাহ্-দর্শন থেকে হবে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। রসুল স. বলেছেন, চারটি

অপস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা মুনাফিক। যেমন— ১. আমানত আত্মসাৎ ২. নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যাবচন ৩. প্রতিশ্রুতিভঙ্গ এবং ৪. অশ্লীল ভাষণ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে প্রথমোক্ত তিনটি অপস্বভাবের কথা। আর সেখানে শেষে বলা হয়েছে এই কথাটুকু— যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দাবি করে মুসলমান হওয়ার।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিলো, তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিলো সেজদা করতে'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে যেহেতু সেজদা করার কথা শুনেও তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করেনি, তাই সেখানেও তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করতে পারবে না। সেকারণেই লজ্জায় ও আক্ষেপে মুহ্যমান হয়ে সেজদার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তখন দাঁড়িয়ে থাকবে অধোবদনে। এভাবেই তারা তখন হবে চরম লাঞ্ছনার শিকার।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٤ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝٤٥ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝٤٦ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝٤٧ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝٤٨ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاۗءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝٤٩ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٥٠

r ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহারা এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে, আমি উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ধরিব এমনভাবে যে, উহারা জানিতে পারিবে না।

r আর আমি উহাদিগকে সময় দিয়া থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

r তুমি কি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, তাহা উহাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়?

r উহাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে!

r অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচরের ন্যায় অধৈর্য হইও না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

r তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইত উন্মুক্ত প্রান্তরে।

r পুনরায় তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সীমালংঘনকারী মক্কাবাসীদের ব্যাপারে বিচলিত হবেন না। তাদের শায়েস্তা করার বিষয়টি আমার উপরে ছেড়ে দিন। আমি জানি, যারা আমার প্রত্যাদেশিত বাণীকে অমান্য করে, তাদেরকে শাস্তি দিতে হয় কীভাবে। তারা পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকুক। আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে শাস্তিকবলিত করবো। জানতেও দিবো না, কখন কীভাবে কোথায় আমি তাদেরকে পাকড়াও করবো।

বাক্যটি অনন্বয়ী এবং রসুল স. এর প্রতি একটি সান্ত্বনামূলক নির্দেশ। 'বাণী' অর্থ এখানে কোরআনের বাণী। 'হুম' (তারা) সর্বনামটি এসেছে এখানে 'মান' (যে) পদের অর্থের দিক থেকে। কেননা 'মান' একবচন হলেও বহুবচনার্থক। 'দারজুন' অর্থ কাপড় অথবা কাগজ মোচড়ানো। অর্থগত দিক থেকে শব্দটি কর্মপদরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ জড়িত। 'তুই' শব্দের অর্থ যেমন মৃত্যু, তেমনি ঋণাত্মক অর্থে 'দারুজু' ও মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত। এরকম বলেছেন জাওহারী। তাঁর মতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে কাগজ ভাঁজ করার মতো করে ভাঁজ করবো, মোচড়াবো, তাদেরকে রাখবো অমনোযোগী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো' অর্থ আমি তাদেরকে শাস্তিদানের জন্য পাকড়াও করবো ধীরে ধীরে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে এমনভাবে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবো যে, তারা টেরও পাবে না।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ'। একথার অর্থ— আর আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে এরকম আচরণই করি। শাস্তি দেওয়ার পূর্বে দান করি দীর্ঘ অবকাশ। এটা হচ্ছে আমার দুর্ভেদ্য কৌশল। এ কৌশল ভেদ করার সাধ্য তাদের হয়ই না। কেননা আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, অপ্রতিরোধ্য। এখানে 'কাইদী' অর্থ আমার কৌশল, ব্যবস্থাপনা, অবকাশরূপী এমন প্রতিশোধ, যথাসময়ে যার প্রকাশ অনিবার্য। জাওহারী বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, এখানে 'কাইদী' অর্থ শাস্তি। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে শব্দটির অর্থ— অবকাশ দেওয়া, শিথিলতা করা। অর্থাৎ পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে ধন-জনবলের প্রাচুর্য আমি দেই, তা বিশ্বাসীদের চেয়ে তাদেরকে অধিক পছন্দ করি বলে নয়, বরং তাদেরকে প্রদত্ত এমতো প্রকাশ্য অনুগ্রহ মধুররূপী বিষ, আনন্দরূপী চিরবিষাদ।

একটি উপযোগ ঃ পাপে লিপ্ত হওয়ার পর বিপদকবলিত হলে বুঝতে হবে, এই বিপদ হচ্ছে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সুতরাং এর মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। আর পাপমগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নিরুপদ্রব জীবন যাপিত হওয়া ভয়ের কারণ। তাই এমতাবস্থায় ভাবতে হবে, তাহলে কি চূড়ান্ত শাস্তি দানের জন্য আমাকে অবকাশ দেওয়া হচ্ছে?

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছো যে, তা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন মহাকল্যাণের দিকে। এর জন্য তাদের কাছে তো আপনি কোনো পারিশ্রমিকও দাবি করছেন না। তাহলে আপনার আহ্বান তাদের কাছে এতো দুর্বহ মনে হবে কেনো? 'আম' (কি) অব্যয়টি এখানে অসংবদ্ধ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের উপরে কি তাহলে জরিমানার বোঝা চেপেছে? নিশ্চয় নয়। তবে তারা আপনার মহা আহ্বানে সাড়া দিবে না কেনো? আর এখানকার 'ফাহুম' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি হেতুজ্ঞাপক ও যোজক।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে—'তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে'? একথার অর্থ— তাদের কাছে কি আছে লওহে মাহফুজের তত্ত্বজ্ঞান? অথবা অদৃশ্যাগত কোনো জ্ঞানসংযোগ? নিশ্চয়ই নেই। তাহলে তারা আপনাকে অস্বীকার করে কিসের জোরে? লক্ষণীয়, ৩৭ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের নিকট কি কোনো কিতাব আছে, যা তোমরা অধ্যয়ন করো— যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো'? আর এখানে বলা হলো 'তাদের কি অদৃশ্য জ্ঞান আছে যে তারা তা লিখে রাখে'? এভাবে প্রথমে তাদের জ্ঞানগত ও অনুকৃত (আকলী ও নকলী) জ্ঞানকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে, তেমনি পরে অস্বীকার করা হলো তাদের অদৃশ্যদর্শনজাত (কাশফী) এবং অদৃশ্যাগত বিজ্ঞপ্তি (ইলহামী)কে। অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের কোনোপ্রকার ভিত্তি ও সূত্রই তাদের নেই। সুতরাং বুঝতে হবে তারা অনুসরণ করে কেবল স্বকপোলকল্পনার, স্বেচ্ছাচারিতার ও মিথ্যাচারের। উল্লেখ্য, কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় করেন নবী-রসুল এবং ফেরেশতাগণ। আউলিয়াগণের মধ্যেও অনেকে জ্ঞানাহরণ করেন এদু'টো বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিপদে আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রার্থনা করেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বচনবাহক! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিকামনায় ত্বরাপ্রবণ হবেন না। নবী ইউনুস যেমন তার অবাধ্য সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে ধৈর্যহারা হয়ে আমার প্রত্যাদেশের অপেক্ষা না করে স্থানান্তরে গমন করেছিলেন, শেষে মৎস্য-উদরবাসী হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ধৈর্যের মর্ম এবং কালাতিপাত করতে বাধ্য

হয়েছিলেন আমা সকাশে কাতর প্রার্থনা করে, সেরকম দুরবস্থার দিকে আপনি কিছুতেই গমন করবেন না। বরং আপনি অপেক্ষা করুন আমার প্রত্যাদেশের। দেখুন কী হয়? তাদেরকে সাময়িক যে অবকাশ আমি দিয়েছি, তারপরে আমি অবশ্যই তাদেরকে শায়েস্তা করবো।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, নবী ইউনুস ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন ও পুণ্যবান। কিন্তু ত্বরাপ্রবণতাও ছিলো তাঁর স্বভাবজাত। তাই তাঁর কাছে নবুয়তের দায়িত্বপালনকে মনে হয়েছিলো অত্যন্ত গুরুভার। উষ্ট্রশাবকপৃষ্ঠে বোঝা চাপালে যেমন সে মনেপ্রাণে বোঝা মুক্ত হতে চেষ্টা করে, তাঁর অবস্থাও ছিলো কিছুটা সেরকম। উল্লেখ্য, উলুল আজম পয়গম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন না। তাই এক সময় তাঁর মধ্যে একবার ঘটেছিলো ত্বরাপ্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। হজরত ইবনে মাসউদ, সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ওয়াহাবের বর্ণনানুসারে ঘটনাটি ছিলো এরকম— নীনুয়া নামক স্থানের মোসেল অঞ্চলের অধিবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি। ওই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিলো প্রায় এক লক্ষ। তারা ছিলো অবাধ্যাচারী। নবী ইউনুস বার বার তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। আগের মতোই আঁকড়ে রইলো অবাধ্যতাকে। শেষে একসময় তিনি প্রত্যাদেশানুসারে ঘোষণা করলেন, তোমরা যদি তওবা না করো, তবে তিন দিন পরেই তোমাদের উপরে নেমে আসবে সর্বনাশা শাস্তি। ঘোষণা শুনে তারা চিন্তিত হলো। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, দ্যাখো, ইউনুস কিন্তু যে সে লোক নয়। মিথ্যা কথা সে কোনোদিনই বলেনি। সুতরাং তোমরা তার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। বিশেষ করে রাতে যদি দ্যাখো সে স্থান ত্যাগ করেছে, তবে নিশ্চয় জেনো পরদিন সকালে তার কথিত শাস্তি আপতিত হবেই। তখন আমাদেরকে কিন্তু সর্বান্তঃকরণে তওবা করতেই হবে। একে একে অতিবাহিত হলো তিন দিন তিন রাত। নবী ইউনুস মধ্যরাতে তাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সকাল হতে না হতেই আকাশে জমতে লাগলো ঘন কালো ধোঁয়া। কালো হয়ে গেলো চতুর্দিক। তারা তাড়াতাড়ি খোঁজ নিয়ে দেখলো নবী ইউনুস নেই। ভীত হয়ে পড়লো তারা। সিদ্ধান্ত নিলো, আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই এখন নেই। সকলে পরিধান করলো কম্বল। তারপর নারী-পুরুষ-শিশু-পশু সবকিছু নিয়ে সকাতর ক্ষমাপ্রার্থনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হলো উন্মুক্ত প্রান্তরে। শিশুদেরকে পৃথক করে দিলো তাদের মাতাদের নিকট থেকে। পশুশাবকদেরকেও রাখলো তাদের পশুমাতাদের থেকে দূরে। এরপর আল্লাহ্র ক্ষমা কামনায় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করলো তারা। তাদের অনুশোচনাজর্জরিত রোদনধ্বনিতে ভারী হয়ে গেলো আকাশ বাতাস। রোষ প্রশমিত হলো আল্লাহ্র। তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন তাঁর প্রায়-অবতীর্ণ আযাবকে। ঘটনাটি ঘটেছিলো দশই মহররমে।

নবী ইউনুস দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করলেন। আযাব অপসারিত হওয়ার পর তিনি চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, এখন তো আমি হয়ে গেলাম মিথ্যাবাদী।

নীনুয়ায় ফিরে গেলে লোকেরা তো আমাকে এখন থেকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করতে শুরু করবে। সুতরাং সেখানে ফিরে গিয়ে আর কী হবে? একথা ভেবে তিনি যাত্রা করলেন নিরুদ্দেশের পথে। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক সাগরের পাড়ে। দেখলেন ঘাটে বাঁধা একটি যাত্রী বোঝাই নৌকা ছাড়বো ছাড়বো করছে। তিনিও উঠে পড়লেন ওই নৌকায়। নৌকা চলতে শুরু করলো। মাঝ দরিয়ায় গিয়ে থেমে গেলো নৌকাটি। যাত্রীরা পড়ে গেলো মহাসংকটে। মাঝিমাল্লারা অনেক চেষ্টা করেও নৌকাটিকে আর গতিশীল করতে পারলো না। নবী ইউনুস বললেন, নিশ্চয় এ নৌকায় আরোহণ করেছে আল্লাহ্র অবাধ্য কোনো লোক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে সে? তিনি বললেন, সম্ভবত আমিই। হে অভিযাত্রীবৃন্দ! তোমরা আমাকে সাগরে ফেলে দাও। তাহলেই মনে হয় তোমরা এ মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ পাবে। যাত্রীরা বললো, না। দেখে তো মনে হয় আপনি সাধুপুরুষ। সুতরাং এমতো অপকর্ম আমরা করতে পারবো না। তার চেয়ে আমরা লটারী করে এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেই। এ প্রস্তাবে সম্মত হলো সকলে। লটারী করা হলো তিন বার। আর তিন বারই নাম উঠলো নবী ইউনুসের। তিনি বললেন, এবার তোমরা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দিয়ো না। সাগরবক্ষে আমাকে নিক্ষেপ করো। লোকেরা তাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট মৎস্য গ্রাস করলো তাঁকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নৌকা যখন আর চললো না, তখন মাঝি-মাল্লারা বললো, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয় নৌকায় রয়েছে কোনো মহাঘাতক, অথবা পালিয়ে আসা কোনো ক্রীতদাস। আমরা তাকে লটারীর মাধ্যমে চিহ্নিত করবোই। লটারী করা হলো, তিনবার। প্রতিবারই নাম উঠে এলো নবী ইউনুসের। তিনি তখন স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিলেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশাল সাগরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গিলে ফেললো এক বিশালাকৃতির মাছ। আল্লাহ্ মাছকে নির্দেশ দিলেন, সাবধান! ইউনুস তোমার আহার্য নয়। তোমার উদরকে আমি বানিয়েছি তার আশ্রয়স্থল ও মসজিদ। অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন বললেন, তোমার পেট তার জন্য বন্দীশালা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইউনুস তখন দণ্ডায়মান হয়ে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমিই মহাঘাতক। আমিই পলাতক দাস। লোকেরা বললো, আমরা শুনেছি আপনি আল্লাহ্র নবী। সুতরাং আমরা আপনাকে পানিতে ফেলে দিতে পারি না। আমরা বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চাই লটারীর মাধ্যমে। তাই করা হলো। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখলো, প্রতিবারেই উঠে আসছে হজরত ইউনুসের নাম। তিনি তখন নিজেই ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইউনুস সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তানকে সাথে নিয়ে। যখন জাহাজে উঠতে যাবেন, তখন ঘটলো সাংঘাতিক ঘটনা। স্ত্রী ও এক সন্তানকে হঠাৎ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো সামুদ্রিক ঢেউ। আর অপর সন্তানকে অকস্মাৎ এসে ধরে নিয়ে গেলো একটি নেকড়ে। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত অন্তরে একাই উঠে পড়লেন জাহাজে। সে জাহাজও থেমে গেলো মাঝ দরিয়ায়।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, মাছটি নবী ইউনুসকে গলাধঃকরণ করে নেমে গেলো সাগরের গভীর তলদেশে। ওই ঘোর অন্ধকারেও মৎস্যোদরবাসী নবী শুনতে পেলেন চতুর্দিক থেকে মুহুর্মুহু আল্লাহ্‌র তসবী পাঠের আওয়াজ। তিনিও তখন পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করতে শুরু করলেন 'লা ইলাহা ইল্‌লা আনতা সুবহানাকা ইন্‌নী কুনতু মিনাজ্‌ জলিমীন'।

'ইজ্‌ নাদা ওয়া হুয়া মাকজূম' অর্থ সে বিপদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিলো। অর্থাৎ তিনি মৎস্য উদরে বন্দী হওয়ার কারণে তখন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনবরত আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করছিলেন। এখানকার 'ইজ' অব্যয়টি সম্পর্কযুক্ত একটি উহ্য ক্রিয়া 'উজকুর' (স্মরণ করো) এর সঙ্গে 'লাতাকুন' (হয়ো না) এর সঙ্গে নয়। কেননা হজরত ইউনুস এর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার কাজটি গর্হিত ছিলো না, ছিলো অত্যুত্তম। অনুত্তম ছিলো কেবল তাঁর ত্বরাপ্রবণতা। যে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেই আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে আমার শেষতম রসুল! আপনি যেহেতু রসুলগণের মধ্যে সর্বোত্তম, তাই আপনার জন্য কিছুতেই শোভন নয় মীনোদরবাসী নবী ইউনুসের মতো চাঞ্চল্য প্রকাশ করা, যদিও তিনি চরম বিপদকালেও আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হননি। বরং বিষাদাক্রান্ত হয়েও মুহুর্মুহু আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের মাধ্যমে হয়েছিলেন ক্ষমাপ্রার্থী।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে'। এখানে 'লাও লা আন্‌ তাদারাকাহু নি'মাতুম্‌ মির রব্বিহী' অর্থ তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাঁর নিকটে না পৌঁছলে। এখানকার 'লাও লা' শব্দটি অব্যাহতিসূচক। 'তাদারাকা' 'আদরাকা' শব্দদ্বয় সমার্থক। 'তাদারাকাহু' অর্থ তাকে না সামলাতো, তার নিকটে পৌঁছে তাকে রক্ষা না করতো। কথাটির কর্তা 'নি'মাত' (অনুগ্রহ)। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আর এর ক্রিয়া 'তাদারাকা' পুংলিঙ্গবাচক। উল্লেখ্য, এরকম শব্দসমন্বয় রীতিসিদ্ধ নয়। তবে এর সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, এখানকার কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যকার 'হু' সর্বনামটির উপস্থিতিই এমতো শব্দসমন্বয়কে রীতিসিদ্ধ করেছে। 'নি'মাতুন' অর্থ অনুগ্রহ, দয়া, অনুকম্পা, কৃপা। আর 'মির্‌ রব্বিহী' (তার প্রতিপালকের) কথাটি এর বিশেষণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ওই মহাদুর্বিপাকের সময় আল্লাহ্‌র কৃপা যদি তাঁকে রক্ষা না করতো, তবে উন্মুক্ত প্রান্তরে লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় থাকতো না।

'লানুবিজা বিল আ'রায়ি ওয়া হুয়া মাজমূম' অর্থ সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে। উল্লেখ্য, চল্লিশ দিন পর ওই মৎস্যটি তাঁকে উগলে ফেলে দিয়েছিলো জনমানবশূন্য প্রান্তরে, কিন্তু লাঞ্ছিত তিনি হননি। বরং তখনো করুণাসিক্ত ছিলেন আল্লাহ্‌র। কেননা তিনি ছিলেন অনুতপ্ত এবং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনাকারী নবী। আর নবী বলেই আল্লাহ্‌পাক তাঁকে দিয়েছিলেন এমতো দুর্ভোগ,

যার পরিণতি ছিলো অতীব মঙ্গলময়। কেননা উত্তমতা পরিত্যাগও নবীগণের মহান মর্যাদার অননুকূল। অর্থাৎ সাধারণ বিশ্বাসীগণের জন্য যা কিছুই নয়, তা-ও সম্মানিত নবীগণের জন্য অপরাধ। এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা সফ্ফার তাফসীরে।

আউফী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইউনুস বসবাস করতেন তাঁর স্বজাতির সঙ্গে ফিলিস্তিনে। একবার এক দুর্ধর্ষ ও অত্যাচারী রাজা তাদের উপরে আক্রমণ করে বসলো। ধরে নিয়ে গেলো ফিলিস্তিনবাসীদের বারোটি গোত্রের সাড়ে নয়টি গোত্রের লোকজনকে। অবশিষ্ট রইলো আড়াই গোত্রের লোক। আল্লাহ্ নবী শাইয়াকে প্রত্যাদেশ করলেন, তুমি বনী ইসরাইলদের রাজা হেরাক্লিয়াসকে বলো, সে যেনো ওই অত্যাচারী রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয় কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তিকে। সে যেয়ে ওই রাজাকে সংযত হতে বলবে। আমি তখন তার মনোভাব পরিবর্তিত করে দিবো। ফলে মুক্তি পাবে বন্দীরা। রাজা হেরাক্লিয়াসের শাসনামলে মানুষের পথপ্রদর্শনার্থে নিয়োজিত ছিলেন পাঁচজন নবী। তাঁদের মধ্য থেকে নবী ইউনুসকে সে ডেকে পাঠালো। তাঁকে অনুরোধ করলো অত্যাচারী রাজার কাছে দূত ও সুপারিশকারীরূপে গমন করতে। নবী ইউনুস বললেন,আল্লাহ্ কি আমাকেই সেখানে যেতে বলেছেন? হেরাক্লিয়াস বললো, না। নবী ইউনুস বললেন, তাহলে বিচক্ষণ নবীগণের কাউকে সেখানে পাঠালেই তো হয়। হেরাক্লিয়াস আর কিছু বললো না। কিন্তু জনসাধারণ শুরু করলো পীড়াপীড়ি। তিনি তাদের প্রতি অতুষ্ট হলেন। যাত্রা করলেন নিরুদ্দেশের পথে। চলতে চলতে পারস্য সাগরের পাড়ে গিয়ে দেখলেন যাত্রী বোঝাই একটি জাহাজ ছাড়বো ছাড়বো করছে। এর পরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ইতোপূর্বেই।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত করলেন'। একথার অর্থ— মৎস্যোদরবাসের অনুগ্রহসিক্ত বিপদ ভোগের পর আল্লাহ্ নবী ইউনুসকে পরিণত করলেন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্বে। ফলে সৎকর্মপরায়ণগণের তালিকায় তাঁর নাম সুমুদ্রিত হলো আগের চেয়ে অধিকতর মহিমায়। জনৈক সূফী সাধক বলেছেন, সৃষ্টিকুলের কারো কাছ থেকে দুঃখ-যাতনা এলে ধৈর্য ধারণ করাই কর্তব্য। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অমঙ্গল কামনাও সিদ্ধ নয়। বরং সহিষ্ণুতার সঙ্গে কামনা করতে হবে তাদের হেদায়েত। সুতরাং বুঝতে হবে, নবীগণের দায়িত্ব যখন এরকম, তখন আউলিয়াগণের দায়িত্ব তো সেরকমই হবে।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৫১, ৫২

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

r কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিবে এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।'

r কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকদের প্রবল বিশ্বাস ছিলো, তারা রসুল স. এর প্রতি তীক্ষ্ণ অশুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে প্রতিহত করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে যখন তারা যা চাইলো, তা কার্যকর করতে পারলো না, তখন বললো, মোহাম্মদ তো অদ্ভুত লোক দেখছি। তার দলিল-প্রমাণের কাছে আমরাই তো বার বার কূপোকাত হচ্ছি। এক বর্ণনায় এসেছে, বনী আসাদ গোত্রের লোকদের কুদৃষ্টির প্রভাব ছিলো ভয়ংকর। কোনো মোটা তাজা উট অথবা গরুকে দেখলে যদি তারা বলতো, 'আরে বেটি! কয়েকটা টাকা আর টুকরী নিয়ে যা না, গোশত নিয়ে আয়' তবে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে মরে যেতো ওই উট অথবা গরুটি।

কালাবী বলেছেন, আরব দেশের এক লোক ছিলো এরকম— দু' তিন দিন উপবাসে থেকে যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করে সে ফিরে আসতো তার তাঁবুতে। তখন যদি সে উট অথবা ছাগপালকে দেখে বলতো, বাহ্! এতো সুন্দর পশু তো আর দেখিনি, তবে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেতো পশুগুলো। ওই লোকটিকে একবার পৌত্তলিকেরা বললো, তুমি একবার তোমার দৃষ্টিবান মোহাম্মদের দিকে নিক্ষেপ করো তো দেখি। তাদের এমতো কুপ্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়— 'কাফেরেরা যখন কোরআন শ্রবণ করে, তখন তারা যেনো তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে এবং বলে, এতো এক পাগল'।

'ইযলাক্ব' শব্দটির বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের শব্দরূপ 'ইয়ুযলিক্বুনা' আর নাফেয়ের মতে 'ইয়াযলিক্বুন'। দু'টো শব্দই সমার্থক। তাই এখানে 'যালক্বুন' অথবা ইয়ুযলাক্বুন' অর্থ হবে সফল করা, রসুল স.কে দৃষ্টিবানে বিদ্ধ করে ধরাশায়ী করা বা আছড়ে ফেলা। যেমন বলা হয় 'যালাক্বা আলসিনাতুহুম' (তাদের উক্তিগুলি প্রভাবান্বিত হয়েছে)।

সুদ্দী বলেছেন, শব্দটির অর্থ নজর লাগানো, অশুভ দৃষ্টিনিক্ষেপ। আর কালাবী শব্দটির অর্থ করেছেন— আছড়ে ফেলা, ধরাশায়ী করা। আর এখানে 'আছড়ে ফেলা' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'শ্রবণ করে' এর সঙ্গে। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অশুভ মানুষের কুলক্ষুণে দৃষ্টি মানুষকে নিয়ে যায় কবরে, আর উটকে নিয়ে যায় রন্ধনপাত্রে। আবু নাঈম। হজরত আবু জর সূত্রে ইবনে আদীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, অশুভ দৃষ্টির অপপ্রভাব সত্য। আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুদৃষ্টির কুপ্রভাব সত্য। নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারলে কুদৃষ্টিই তা পারতো। সুতরাং কেউ যদি তোমাদেরকে গোসল করতে বলে, তবে তোমরা গোসল কোরো। গোসলের পানি কুদৃষ্টি প্রভাবিতদের উপরে ঢেলে দিলে

উপকৃত হওয়া যায়। হজরত আবু হোরায়রার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কুদৃষ্টির অশুভ প্রভাব যথার্থ। কেননা কুদৃষ্টির উপরে ভর করে শয়তান। সে হিংসা করে আদম সন্তানদেরকে।

হজরত উবায়েদ ইবনে রেফায়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা বিনতে উমাইস একবার রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! জাফরের সন্তানদের উপর মানুষ বদ নজর করে। আপনি দয়া করে তা দূর করে দিন। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। অদৃষ্টলিপিকে অতিক্রম যদি কেউ করতে পারতো, তবে তা করতো বদনজরই। বাগবী। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— কোরআনের বাণী শুনলে পৌত্তলিকেরা হিংসায় জ্বলে যায়। ইচ্ছে করে কোরআন পাঠকারীদের উপর কুদৃষ্টি হেনে ভূতলশায়ী করে দেয়। তা যখন পারে না, তখন বলে, এতো এক উন্মাদ। যেমন প্রবাদে বলা হয়— সে এমনভাবে তাকালো যে, মনে হলো, তোমাকে ভূতলশায়ী করে দিবে। এমতো মনোভাব হচ্ছে শত্রুতার চরম বহিঃপ্রকাশ। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, তারা হিংসাত্মক মনোভাব প্রকাশ করতো কেবল কোরআন শুনলে। কেননা তারা কোরআনের প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার না করে পারতো না।

শেষোক্ত আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ'। বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে তাদের 'এতো এক পাগল' এই অপউক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ কোরআন যেহেতু বিশ্ববাসীদের জন্য মহান উপদেশ, সেহেতু বিরুদ্ধাচারীরা তো পরাজিত হবেই। অন্ধকার তো আলোর কাছে পরাভূত হয়েই থাকে।

আমার শায়েখ মাযহারে জানে জানাঁ এবং মাওলানা ইয়াকুব কারখী বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' সর্বনামটি রসুল স. এর স্থলাভিষিক্তও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমার প্রিয়তম রসুল তো বিশ্বজগতের জন্য জীবন্ত উপদেশ। এখানে 'জিকরুন' অর্থ উপদেশ। শব্দটি একটি শব্দমূল হলেও এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্তৃপদের শব্দরূপ 'জাকির' (উপদেশদাতা) অর্থে। যেমন 'জায়িদুন আদলুন' অর্থ 'জায়িদুন আদিলুন' (জায়েদ ন্যায়পরায়ণ)।

হজরত হানজালা বলেছেন, একবার পথিমধ্যে সাক্ষাত পেলাম মান্যবর আবু বকরের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হানজালা! ভালো আছো? আমি বললাম, হানজালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লহ্! এ কেমন কথা! আমি বললাম, যখন রসুলুল্লাহ্‌র সুমহান সাহচর্যে থাকি, শুনি স্বর্গ-নরকের বিবরণ, তখন মনে হয়, আমরা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু গৃহে ফিরে এলে হয়ে যাই ঘোর সংসারাসক্ত। তিনি বললেন, আরে, আমার অবস্থাও তো সেরকম। আমরা তখন দু'জনে মিলে রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আমাদের সমস্যার কথা খুলে বললাম। সব শুনে তিনি স. বললেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই আনুরূপ্যবিহীন সত্তার শপথ করে বলছি, আমার

সংসর্গে থাকার অবস্থা যদি নিরবচ্ছিন্ন হতো, তবে পথে-ঘাটে-শয়নকক্ষে তোমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে করমর্দন করতো ফেরেশতারা। শোনো হানজালা! সময় হচ্ছে সময়েরই মতো। তিনি স. একথা উচ্চারণ করলেন পরপর তিনবার।

উপসংহার ঃ আল্লাহ্‌র ওলীগণের সাহচর্যেও প্রকাশ পায় এরকম বরকত। তাদেরকে দেখলে জাগ্রত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণ। কতিপয় সুপরিণত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর নিকট জানতে চাওয়া হলো, আল্লাহ্‌র ওলী কারা? তিনি স. বললেন, যাদের দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। এরকম বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার প্রিয়ভাজন দাস তারাই, যাদের স্মরণ আমারই স্মরণ এবং আমার স্মরণও তাদের স্মরণ। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

হাসান বসরী বলেছেন, কুদৃষ্টি প্রতিকার করতে চাইলে পাঠ করতে হবে এই আয়াত। অর্থাৎ কেউ যদি এই আয়াত পড়ে কুদৃষ্টিপ্রভাবিতকে ফুঁক দেয়, তবে সে লাভ করবে নিরাময়। আল্লাহ্‌ই সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূরা আল হাক্বক্বহ্

৫২ আয়াত ও ২ রুকুসম্বলিত এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

সূরা হাক্বক্বহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

r সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

r কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

r আর তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

r ‘আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল মহাপ্রলয়।

r আর ছামূদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।

r আর ‘আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ূ দ্বারা,

r যাহা তিনি উহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে— উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

r অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল হাক্বক্বহ্'। এর অর্থ সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। অর্থাৎ সেই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সুনিশ্চিত। তা যে সংঘটিত হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। অথবা কিয়ামতকে 'হাক্বক্বহ্' বলা হয়েছে একারণে যে, সেদিনই উদঘাটিত হবে সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব। যেমন বলা হয় 'হাক্বক্বত আ'লাইহিম শাই' (তার উপর বিষয়টি অপরিহার্য হয়েছে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'হাক্বক্বত কালিমুত আ'জাব' (অপরিহার্য হয়েছে শাস্তির বিষয়টি)। সুতরাং বুঝতে হবে মহাপ্রলয়কে 'আল হাক্বক্বহ্' বলা হয়েছে এখানে রূপকার্থে।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মাল হাক্বক্বহ্'। এর অর্থ— কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? এরকম না বলে এখানে 'সেটা কী' এরকম বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু কিয়ামতের বিষয়টিতো আর দশটা সাধারণ বিষয়ের মতো নয়। তাই এর যথাগুরুত্ব প্রকাশার্থে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে প্রশ্নবিশিষ্ট নামপদ। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী'? একথার অর্থ— হে আমার নবী! আপনি এবং অন্যান্য পৃথিবীবাসী কি জানে মহাপ্রলয়ের স্বরূপ হবে কী ভয়ংকর? সে ঘটনা তো অতীব ভয়াবহ? ভুক্তভোগী ছাড়া তার গুরুত্ব কি কেউ পরিমাপ করতে পারবে? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— মহাপ্রলয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করার সাধ্য কারো নেই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আ'দ ও ছামুদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিলো মহাপ্রলয়'। একথার অর্থ— নবী সালেহের স্বজাতি ছামুদ এবং নবী হুদের সম্প্রদায় আ'দ মহাপ্রলয়কে অস্বীকার করে হয়ে গিয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই পৃথিবীর জীবনেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো সর্বনাশা আযাব। সে আযাবে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তারা। এখানে 'মহাপ্রলয়'কে বুঝানো হয়েছে আর একটি সমার্থক শব্দ 'আলক্বারিআ'হ' এর মাধ্যমে। এর শাব্দিক অর্থ এমন বিকট বীভৎস আওয়াজসম্বলিত মহাত্রাস, যা কর্ণবিবরকে করে অকার্যকর, সংহার করে সকল জীবনকে। এভাবে এখানকার আলোচিত আয়াতচতুষ্টয়ের মাধ্যমে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মহাপ্রলয়কে যে অস্বীকার করে, তার বিনাশ অনিবার্য। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সে লাঞ্ছিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই। কেননা সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আর ছামুদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা'। বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের

আয়াতের ‘অস্বীকার করেছিলো’ কথাটির সঙ্গে। এখানে ‘ফাউহলিকূ’ (ধ্বংস করা হয়েছিলো) কথাটির ‘ফা’ অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। ‘আম্মা’ (আর) বিশ্লেষক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কিয়ামতকে অবিশ্বাস করার কারণে আদ ও ছামুদ জাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো। আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ‘তুগীয়াহ্’ (প্রলয়ংকর বিপর্যয়) দ্বারা। ‘তুগীয়াহ্’ অর্থ বিকট-বীভৎস আওয়াজ, মহানাদ। এরকম বলেছেন কাতাদা। অর্থাৎ হজরত জিবরাইল তখন তুলে ছিলেন এক মহানাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে গিয়েছিলো ছামুদ জাতির সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এরকমও বলা হয়েছে যে, তখন আকাশ থেকে উত্থিত হয়েছিলো প্রলয়ংকারী মহানাদ, ফলে তারা কলিজা ফেটে মরে গিয়েছিলো তৎক্ষণাৎ।

কেউ কেউ বলেছেন ‘তুগীয়াহ’ শব্দটি ‘আফিয়াহ’র মতো ধাতুমূল, যা ‘তুগইয়ান’ (উচ্ছৃঙ্খলতা) এর অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ ছামুদ জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো চরম উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে। তারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে অমান্য করেছিলো। বধ করেছিলো আল্লাহ্র অপার ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন অলৌকিক উষ্ট্রীকে। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, ‘তুগীয়াহ’ শব্দটির ‘তা’ আধিক্যপ্রকাশক। এর মর্মার্থ— চরম বিদ্রোহী। উল্লেখ্য, নবী সালেহের অলৌকিক উষ্ট্রীটির হন্তারকদের প্রধান হোতা ছিলো কাজার ইবনে সালিফ। এক বর্ণনায় এরকমও বলা হয়েছে যে, হন্তারকদের যে দলটি কাজারকে উষ্ট্রীবধের ইন্ধন যুগিয়েছিলো, ওই দলটিই ছিলো সমগ্র ছামুদ জাতি গোষ্ঠীর সমূলে উৎপাটিত হওয়ার উপলক্ষ।

ঘটনাটি ছিলো এরকম— দুরাচার ছামুদ জাতির পথপ্রদর্শনার্থে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করলেন নবী সালেহকে। তিনি তাদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, তুমি যে নবী, তার প্রমাণ দেখাও। পাথরের ভিতর থেকে বের করে আনো দশমাসের গর্ভবতী একটি উটনী। যদি এরকম করতে পারো, তবেই কেবল আমরা তোমার কথা মানবো। গ্রহণ করবো তোমার ধর্মমত। নবী সালেহ আল্লাহ্ সকাশে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখলো একটি প্রকাণ্ড পাথরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটি বিরাটাকায় উষ্ট্রী’। তার প্রস্থই ছিলো একশত কুড়ি হাত। একটু পরেই উষ্ট্রীটি প্রসব করলো তার শাবক। নবী সালেহ বললেন, তোমরা আল্লাহ্র এই অলৌকিক নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। তোমাদের কূপের পানি একদিন পর একদিন পান করতে দিয়ো একে। তোমরাও তোমাদের পশুগুলোকে পান করিয়ো একদিন পর একদিন। কিছুদিন পর্যন্ত তারা এই নিয়মটিকে মান্য করলো। তারপর হয়ে উঠলো অসহিষ্ণু। উষ্ট্রীটি একদিন পর একদিন তাদের কূপের পানি নিঃশেষে পান করে। সেদিন তারা কূপের পাশেও যেতে পারে না। নিয়মটি তারা সহ্যই করতে পারলো না। কয়েকজন মিলে ষড়যন্ত্র করলো উষ্ট্রীটিকে বধ করতে হবে। তাদের এমতো অপকর্মের নেতৃত্ব

দিলো চিরহতভাগা কাজার ইবনে সালিফ। একদিন তারা তাদের ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করেই ফেললো। যারপর নাই ব্যথিত হলেন আল্লাহ্‌র নবী সালেহ। বললেন, এবার তাহলে শাস্তিগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। তিন দিন পরেই তোমাদের উপরে আপতিত হবে সর্বগ্রাসী শাস্তি। প্রথম দিন তোমাদের চেহারা ধারণ করবে হলুদ বর্ণ। দ্বিতীয় দিন হবে লাল এবং তৃতীয় দিন কালো। তা-ই হলো। তিন দিন পর হঠাৎ ধ্বনিত হলো মহানাদ। প্রকম্পিত হলো সমগ্র মেদিনী। সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে রইলো তারা। চোখের পলকে জনমানবশূন্য হয়ে গেলো তাদের জনপদ।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা'। এখানে 'ফা উহ্‌লিকূ বিরীহিন সরসরিন আ'তীয়াহ' অর্থ তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। উল্লেখ্য ওই ঝঞ্ঝাবাত্যা ছিলো অত্যুপ্ত, অথবা অতিশীতল— জীবনসংহারক। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে 'আতীয়াতুন' শব্দরূপটি কর্তৃকারক। এর অর্থ— প্রচণ্ড, সীমাহীন। আতা শব্দটির অর্থ করেছেন— সদম্ভ, সীমাতীত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌পাক আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন বীভৎস প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাঝড় দ্বারা। এটি একটি পৃথক বাক্য। অথবা 'ঝঞ্ঝা' এখানে বায়ুর বিশেষণ। ওই ঝঞ্ঝাঝড়ের আঘাতেই যে আল্লাহ্‌পাক আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সে কথা এখানে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অপধারণাটিকে নির্মূল করতে যে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো সাধারণ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে।

তাদের জনপদের উপরে ওই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাঝড় প্রবাহিত হয়েছিলো সাত রাত আটদিন ধরে, এক বুধবার সকাল থেকে আর এক বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর তা ছিলো শীতকালের ঝড়, যে শীতকালকে আরববাসীগণ বলেন, স্থবির ঋতু, বা বৃদ্ধার সময়। বৃদ্ধার সময় বলার কারণ হচ্ছে, তাদের সম্প্রদায়ের এক বৃদ্ধা তখন ওই ঝড় থেকে আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নিয়েছিলো একটি গুদাম ঘরে। কিন্তু তবুও সে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো তার স্বজাতির মতো। পরবর্তী আয়াতে (৭) ওই ঝঞ্ঝাঝড়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে—

'যা তাদের উপরে প্রবাহিত হয়েছিলো সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়'।

এখানে 'হুসূমান' অর্থ বিরামহীন, নিরবচ্ছিন্ন। শব্দটি বহুবচন 'হাসিমুন' এর। যেমন বলা হয় 'হাসামাল ফাইয়া' (ক্ষতস্থানে যুৎ মতো দাগ দাও, যাতে আরোগ্য নিশ্চিত হয়)। অথবা 'হুসূমান' অর্থ অশুভ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফী আইয়্যামিন নাহিসাতিন' (অশুভ দিবসে)। 'হাসামুন' অর্থ মূলোৎপাটন করা। অর্থাৎ ওই দিবসগুলোতে অকুস্থলে কল্যাণকর সকলকিছুর মূলোৎপাটন করা হয়েছিলো। সাত রাত আট দিন ধরে সেখানে আবর্তিত হয়েছিলো কেবল অকল্যাণ

আর অকল্যাণ। কিংবা ‘হুসূমান’ অর্থ এখানে কর্তনকারী। অর্থাৎ ওই অশুভ সময় চিরতরে কর্তন করে দিয়েছিলো তাদের বংশপ্রবাহকে। এরকম বলেছেন জুজায এবং নজর ইবনে শামুয়েল। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘হুসূমান’ হচ্ছে শব্দমূল এবং এখানে শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। এবাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তখন ঝড়কে প্রচণ্ড ও সর্বনাশা করে দিয়েছিলেন তাদেরকে নির্মূল করণার্থে।

‘তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে’ অর্থ হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি যদি ওই সময় সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তবে দেখতেন। ‘ফীহা সরআ’ অর্থ সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে। ‘সরআ’ অর্থ লুটিয়ে পড়া। এর বহুবচন ‘সরীউ’ন’। ‘সরআ’ এখানে কর্মপদের অর্থপ্রদায়ক। এখানে ‘দেখা’ অর্থ যদি আত্মিক দর্শন হয়, তবে ‘তারা’ (দেখতে) ক্রিয়ার দ্বিতীয় কর্মপদ হবে ‘সরআ’। আর যদি তা না হয়, তবে ‘সরআ’ হবে এখানে ‘আল কওম’ (উক্ত সম্প্রদায়কে) কথাটির অবস্থাপ্রকাশক। ‘আ’জ্বায’ অর্থ মূল, কাণ্ড। আর ‘খভিয়াতুন’ অর্থ শূন্য, অন্তসারশূন্য, শূন্যগর্ভ।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি’? প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছে একথা স্বীকার করতে যে, ওই দুর্বৃত্তদের কেউ নিশ্চয় তোমার, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

সূরা হাক্বক্বহ্ ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২

وَجَآءَ فِرۡعَوۡنُ وَمَنۡ قَبۡلَهٗ وَالۡمُؤۡتَفِكٰتُ بِالۡخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوۡا رَسُوۡلَ رَبِّهِمۡ فَاَخَذَهُمۡ اَخۡذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الۡمَآءُ حَمَلۡنٰكُمۡ فِى الۡجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجۡعَلَهَا لَـكُمۡ تَذۡكِرَةً وَّتَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

r ফির’আওন, তাহার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টাইয়া দেওয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

r উহারা উহাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন— কঠোর শাস্তি।

r যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে,

r আমি ইহা করিয়াছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার অনুসারী এবং তাদের পূর্বের নবী লুতের সম্প্রদায়কেও আমি দিয়েছিলাম ভয়ানক শাস্তি। প্রথমোক্তদেরকে

দিয়েছিলাম সলিল সমাধি এবং শেষোক্তদের জনপদ উল্টে দিয়ে করেছিলাম ভূপ্রোথিত। এভাবেই তাদেরকে করেছি নির্মূল। কেননা তারা ছিলো সীমালংঘনকারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এখানকার 'মুতাফিকাত' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ইফ্‌কুন' থেকে। এর অর্থ— উলটিয়ে দেওয়া। আর 'পাপাচারে লিপ্ত ছিলো' অর্থ তারা ছিলো ঘোর অংশীবাদী, চরম দুষ্কৃতিকারী, পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্‌দ্রোহী।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের প্রতিপালকের রসুলকে অমান্য করেছিলো, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন, কঠোর শাস্তি'। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় যেমন অস্বীকার করেছিলো নবী মুসাকে, তেমনি তাদের পূর্ববর্তী অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোও অমান্য করেছিলো তাদের নিজ নিজ নবীগণকে। ফলে তারা সকলেই হয়েছিলো আমার কঠোর শাস্তির শিকার। বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো সমূলে। বাক্যটি বিশ্লেষণাত্মক এবং এর সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'তার পূর্ববর্তীরা' কথাটির সঙ্গে।

এখানকার 'ফাআখাজাহুম' (ফলে তাদেরকে শাস্তি দিলেন) কথাটির 'ফা' (ফলে, অতঃপর) অব্যয়টি হেতুবাচক। আর 'আখজাতান' হচ্ছে সাধারণ কর্মপদ এবং অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ উল্লেখিত পাপাচারের কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন, যার চেয়ে কঠোর শাস্তি আর হয় না।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিলো, তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে'। একথার অর্থ— ওই কঠোর শাস্তিসমূহের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্লাবন সমাধি। সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয়েছিলো ওই ভয়ংকর মহাপ্লাবনে। হে সমসময়ের মানুষ! তখন কিন্তু তোমাদের মহান পিতৃপুরুষ নবী নুহকে আমি ঠিকই রক্ষা করেছিলাম। তাঁকে ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌকায়।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য'। একথার অর্থ— ওই মহাপ্লাবনে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিনাশ করে এবং আমার সত্যাধিষ্ঠিত নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সহচরবর্গকে উদ্ধার করে আমি তোমাদের জন্য এই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি যে, তোমরা যেনো বুঝতে পারো আমি যেমন সংহারকারী, তেমনি দয়াময়ও। অর্থাৎ অবাধ্যদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে যেমন প্রকাশ পায় আমার অতুলনীয় পরাক্রম, তেমনি পরিত্রাণদানের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় সীমাহীন দয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ তা সংরক্ষণ করে'। একথার অর্থ— তোমরা ওই ইতিবৃত্ত শুনবে, ইতিহাস রচনা করে সমৃদ্ধ করবে স্মৃতির ভাণ্ডার, করবে স্মৃতিচারণ, এভাবে ওই ঘটনার আলোকে সংশোধন করবে তোমাদের জীবনযাপন, এটাও ছিলো আমার এমতো ঘটনা ঘটানোর আর একটি উদ্দেশ্য। আর এখানকার 'ওয়াই'ইয়াতুন' (সংরক্ষণ করে) কথাটিতে ব্যবহৃত 'তানভীন'

নির্দিষ্টবাচক ও ন্যূনতাপ্রকাশক। কেননা যারা শিক্ষণীয় ঘটনা স্মৃতিস্থ রাখে, তারা প্রজ্ঞাবান। আর প্রজ্ঞাবানগণের সংখ্যা স্বল্পই হয়। তাঁরাই উপলক্ষ হন সাধারণ জনতার পরিত্রাণের ও জ্ঞানপরম্পরার। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হৃদয় হচ্ছে স্মৃতির ভাণ্ডার। আর সর্বোত্তম হৃদয় সেটাই, যা সংরক্ষণ করে সর্বাধিক স্মৃতি।

সূরা হাক্কাহ্ ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

q যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— একটি মাত্র ফুৎকার,

q পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

q সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়,

q এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে আর সেই দিন উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।

q ফিরিশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে এবং সেই দিন আটজন ফিরিশ্‌তা তোমার প্রতিপালকের 'আর্‌শকে ধারণ করিবে তাহাদের ঊর্ধ্বে।

q সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকিবে না।

q তখন যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'লও, আমার 'আমলনামা, পড়িয়া দেখ;

q 'আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।'

q সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন;

q সুউচ্চ জান্নাতে

q যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।

q তাহাদিগকে বলা হইবে,'পানাহার কর তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে।'

মহাপ্রলয় যে অতীব ভয়াবহ এবং তা অস্বীকারকারীদের পরিণতি যে অতীব মন্দ, সে সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে ধারণা দেওয়ার পর এখান থেকে শুরু করা হয়েছে তার সবিস্তার বিবরণ। প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফা ইজা নুফিখা ফিস্ সূর'। এর অর্থ— যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, 'সূর' হচ্ছে একটি শিঙ। ওই শিঙের মধ্যেই ফুৎকার দেওয়া হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'একটি মাত্র ফুৎকার'। কথাটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে ওই ফুৎকারধ্বনির কথা, যা শুনলে মানুষসহ সকল প্রাণী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। ফুৎকার ধ্বনিত হবে আরো একবার, অথবা দুইবার— এ সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের মধ্যে রয়েছে মতানৈক্য। কেউ কেউ বলেছেন, শিঙ্গায় ফুৎকার ধ্বনিত হবে মোট তিনবার— ১. ত্রাসের ফুৎকার, যা শুনলে সন্ত্রস্ত হবে সকলে ২. সংজ্ঞাবিলোপক ফুৎকার, যা শুনলে সকলে হয়ে যাবে বেহুঁশ। ৩. পুনরুত্থানের ফুৎকার। এই ফুৎকার শুনেই পুনরুজ্জীবিত হবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী।

ত্রাসসঞ্চারক ফুৎকার সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আর সেদিন ফুৎকার দেওয়া হবে শিঙ্গায়, তখন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে নভোবাসী ও পৃথিবীবাসীরা'। সংজ্ঞাবিলোপক ফুৎকার সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আর ফুৎকার দেওয়া হবে শিঙ্গাতে, ফলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী'। আর পুনরুত্থানের শিঙ্গাধ্বনি সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অতঃপর তাতে ফুৎকার দেওয়া হবে পুনর্বার, অকস্মাৎ তারা পুনরুত্থিত হয়ে দেখতে থাকবে পরস্পরকে'। শায়েখ ইবনে আরাবী এরকম ব্যাখ্যার প্রবক্তা। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে বলা হয়েছে, শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তিনবার। প্রথম ফুৎকার হবে বিভীষিকাসঞ্চারক, দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে সকলে হারিয়ে ফেলবে সংজ্ঞা এবং তৃতীয় ফুৎকার শুনে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে, তিবরানী তাঁর 'মুতাওয়ালে', আবু ইয়ালী তাঁর 'মসনদে' এবং বায়হাকী তাঁর 'আল বা'ছ' নামক পুস্তকে।

কেউ কেউ বলেছেন, শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হবে দু'বার— মহামরণের এবং মহাপুনরুত্থানের। অর্থাৎ ত্রাসোদ্দীপক ফুৎকারধ্বনির ফলেই সংজ্ঞাহীন হবে সকলে। হারিয়ে ফেলবে জীবন। পরবর্তীতে জীবন ফিরে পাবে আর একবার

শিঙ্গাধ্বনি উত্থিত হলে। এমতো অভিমতের প্রবক্তা ইমাম কুরতুবী। তিনি তাঁর অভিমত প্রমাণার্থে বলেন, ত্রাসসঞ্চারক ফুৎকার সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— তখন সকলে হয়ে পড়বে সংজ্ঞাহীন, কিছুসংখ্যককে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন সংজ্ঞাহীন হওয়া থেকে, যাদেরকে তিনি ইচ্ছা করবেন। সুতরাং বুঝতে হবে ত্রাস-সঞ্চারক ও সংজ্ঞাহারক ফুৎকার হচ্ছে একটিই ফুৎকার। আবার অধিকাংশ হাদিসে দু'টি ফুৎকারের কথাই এসেছে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, দুই ফুৎকারের মধ্যকার ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত তিন ফুৎকারের বিবরণবিশিষ্ট হাদিসটির সূত্রগত বিশুদ্ধতা সর্ববাদীসম্মত নয়। শায়েখ ইবনে আরাবী এবং কুরতুবীর নিকটে ওই হাদিসটি যথাসূত্র-সম্বলিতরূপে গৃহীত হলেও বায়হাকী এবং শায়েখ আবদুল হকের নিকটে অ-দৃঢ়। কেননা হাদিসটি বিবৃত হয়েছে মদীনার এক বিচারক ইসমাইল ইবনে রাফেয়ের মাধ্যমে। আর ইসমাইল বর্ণনাকারী হিসেবে বিতর্কিত। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, হাদিসটির বর্ণনাভঙ্গি সুসঙ্গত নয়। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসটি এসেছে বিভিন্ন সূত্রপরম্পরা থেকে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে।

'যখন শিঙ্গার ফুৎকার দেওয়া হবে' বলে এখানে কোনো সংকীর্ণ কালকে নির্দেশ করা হয়নি। বরং এর কাল পরিসর সুবিস্তৃত। অবশ্য কিয়ামত শুরু হবে প্রথম ফুৎকার থেকে এবং সমাপ্ত হবে তখন, যখন মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারপর্বের শেষে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীরা চলে যাবে তাদের নিজ নিজ ঠিকানায়। অর্থাৎ কিয়ামতের পরিসর সুবিস্তীর্ণ। তাই কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বলা হয়েছে কিয়ামতের কথা। যেমন 'আল হাক্বকা' (অবশ্যম্ভাবী ঘটনা) 'আল ক্বরিআ'হ্' (মহাবিনাশপর্ব) 'আলক্বিয়ামাহ' (মহাপ্রলয়)।

জিয়াদ ইবনে মিখরাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক মুক্তকৃত দাস ইকরামাকে একবার শাসক হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, পরকালের দিবস কি পৃথিবীর দিবসের মতো, না তার চেয়ে দীর্ঘ? তিনি বললেন, তখনকার দিবস শুরু হবে পৃথিবীর দিবসের মতোই। কিন্তু শেষ হবে পারলৌকিক দিবসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে কিয়ামতের সূচনাপর্বের কথা। আর এর শেষ পর্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'ফাহুয়া ফী ই'শাতির রদ্বিয়্যা' আয়াতে। এর মধ্যেই একে একে ঘটতে থাকবে মহাবিনাশকাণ্ড, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার, আমলনামা প্রদান, পাপ-পুণ্যের ওজন, পুলসিরাত অতিক্রমণসহ এ সম্পর্কিত সকল ঘটনা।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে'।

এখানে 'দাক্কান' অর্থ চূর্ণন, নিষ্পেষণ। জাওহারী বলেছেন, এর আসল মানে— ভেঙে চুরে চুরমার করা। জাওহারীর বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, 'দাককুন' অর্থ কর্দমাক্ত ভূমি। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন 'ওয়া দাককাতিল জ্বিবাল' (আর শৈলশ্রেণী হবে কর্দমাক্ত ভূমির মতো)। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ তখন হয়ে যাবে

কর্দমাক্ত ভূমির মতো একাকার, সমান, উঁচু-নিচু বলে কিছু থাকবেই না। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই ইবনে কাব বর্ণনা করেছেন, তখন গিরিশ্রেণী ও ভূপৃষ্ঠ হবে গোধুলি সদৃশ। অবিশ্বাসীদের সর্বাঙ্গ হবে ধূলি-মলিন। কিন্তু বিশ্বাসীদের অবয়ব থাকবে পরিচ্ছন্ন। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা রয়েছে কেবল শর্তের। কিন্তু এর পরিণতি এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকাস্থিত পাহাড় পর্বতসমূহকে উঠিয়ে নিয়ে করা হবে চৌচির, চুরমার। মহাবিনাশ কাণ্ড শুরু হবে এভাবেই।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়'। একথার অর্থ— যে মহাবিনাশপর্বের কথা যুগ যুগ ধরে মহামানবতার শ্রুতিকে সচকিত করেছে, বিশুদ্ধচিত্তদেরকে করেছে উদ্বেল, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হবে তখনই।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর সেদিন তা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে'। এখানে 'ওয়াহ্ইয়ুন' অর্থ বিশ্লিষ্ট, বিপন্ন, শিথিল। ফাররা বলেছেন, আকাশ তখন ফেটে যাবে বলেই হারিয়ে ফেলবে তার অটুটতার দৃঢ়তা।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে। এখানে 'তোমার প্রতিপালকের আরশ' বলে আরশকে করা হয়েছে সম্মানিত। তার এই সম্মানপ্রাপ্তির কারণ হচ্ছে, সারাক্ষণ তার উপরে পতিত হতে থাকে আল্লাহ্র অবর্ণনীয় জ্যোতির সম্পাত।

আরশবাহী ফেরেশতাগণের সংখ্যা আট। তাঁরা মহাসম্মানিত। আবু দাউদ ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেছেন, একবার আমরা কয়েকজন রসুল স. এর সঙ্গে বুতহা নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। আকাশে ভেসে যাচ্ছিলো একটি মেঘখণ্ড। তিনি স. সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বলো দেখি, ওটা কী? আমরা বললাম 'সাহাব'। তিনি স. বললেন, বলো 'মুযন'ও। আমরা বললাম, হ্যাঁ, 'মুযন'ও। তিনি স. পুনরায় বললেন, বলো, 'ইনান'ও। রসুল স. এরপর বললেন, তোমরা কি জানো, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেকার ব্যবধান কতো? আমরা বললাম, না। তিনি স. বললেন, ওদু'টোর মধ্যকার ব্যবধান একাত্তর, বায়াত্তর অথবা তিয়াত্তর বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এরপর তিনি স. একে একে বললেন সাত আকাশের কথা। বললেন, ওগুলোর প্রত্যেকের একটি থেকে অপরটির দূরত্ব একই রকম। শেষে বললেন, সপ্তম আকাশের উপরে রয়েছে একটি মহাসাগর। ওই মহাসাগরের গভীরতাও দুই আকাশের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছে একটি প্রকাণ্ডকায় পার্বত্য ছাগল। তার পায়ের ক্ষুর থেকে কটিদেশের দূরত্বও দুই আকাশের মধ্যবর্তী

দূরত্বের সমান। তার উপরেই রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। আরশের উচ্চতাও দুই আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর মহামহিম আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন অবস্থিতি সর্বোপরি। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ, এক আকাশ থেকে আর এক আকাশ, মহাসাগর ও আরশের উচ্চতা ইত্যাদির ব্যবধান উল্লেখিত হয়েছে— পাঁচ শত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। গতির ন্যূনতা ও আধিক্যই সম্ভবত এমতো বর্ণনাবৈষম্যের কারণ। সুতরাং বলা যায়, দু'টো বর্ণনাই স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সঠিক।

বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে আল্লাহ্‌র আরশ ধরে আছেন চার জন ফেরেশতা। তাদের এক জনের আকৃতি মানুষের মতো এবং অপর তিন জনের আকৃতি নেকড়ে, বলদ ও গর্দভের মতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে আরশ বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা হবে আট। অর্থাৎ ফেরেশতাদের আটটি বৃহৎ দল তখন আরশ বহনকারী হবে। আল্লাহ্‌ই জানেন, তাদের সংখ্যা কতো।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। একথার অর্থ— হে মনুষ্যমণ্ডলী! মহাপুনরুত্থানের পর কৃতকর্মের বিচারার্থে হাশর প্রান্তরে উপস্থিত করা হবে তোমাদের সকলকে। তখন তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পুণ্য ও পাপ কোনোকিছুই তোমরা চাইলেও গোপন থাকবে না।

রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে মানুষকে হতে হবে তিনটি সাক্ষাতকারের সম্মুখীন। দু'টি সাক্ষাতকার হবে বাদানুবাদ ও অজুহাতের এবং তৃতীয়টি হবে আমলনামা প্রাপ্তির। কেউ আমলনামা পাবে ডান হাতে এবং কেউ বাম হাতে। হাকেম ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, সাক্ষাতকার তিনটি হবে তিনটি পৃথক পরিবেশে। প্রথম সাক্ষাতকার হবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের সঙ্গে। তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না। তাই তারা মনে করবে, বাদানুবাদ করলে বোধ হয় পরিত্রাণের কোনো উপায় পাওয়া যাবে। বাদানুবাদে তারা লিপ্ত হবে একারণেই। দ্বিতীয় সাক্ষাতকার হবে অবাধ্যদের উপস্থিতিতে। তারা উপস্থাপন করবে বিভিন্ন রকমের অজুহাত। আল্লাহ্‌ তখন হজরত আদম ও অন্যান্য নবী-রসুলগণের দ্বারা তাদের অজুহাত খণ্ডন করাবেন। শেষে তাদের সকলকে প্রেরণ করবেন জাহান্নামে। তৃতীয় সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বাসীগণের সমাবেশে। আল্লাহ্‌ তাদেরকে এমনভাবে শাসাবেন যে, তারা হয়ে যাবে লজ্জাবনত ও অনুতপ্ত। শেষে তিনি তাদেরকে দান করবেন মার্জনা ও তুষ্টি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তখন যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে, সে বলবে, নাও, এই হচ্ছে আমার আমলনামা, পড়ে দ্যাখো'। এখানে বলা হয়েছে তৃতীয় সাক্ষাতকারের সম্মুখীন যারা হবে তাদের

কথা। এখানকার ‘হাউম্’ অর্থ লও, নিয়ে নাও, ধরো। শব্দটি ক্রিয়ার অর্থ বিশিষ্ট নামপদ। একবচন বহুবচন পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকলক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয় একইরূপে। এর কর্মপদ বর্তমানে লুপ্ত।

‘কিতাবিয়াহ্’ অর্থ আমলনামা। ‘কিতাবিয়াহ্’ ‘মালিয়াহ’ ‘সুলতানিয়াহ্’ শব্দগুলোর অন্তক্ষরে রয়েছে অপরিণত ছন্দপতনসূচক স্বরভঙ্গি ‘হা’। স্বরভঙ্গিটি উচ্চারিত হয় যতিপাত ঘটলে। আর মিলিত পাঠে স্বরভঙ্গিটি হয় অপসৃত। আলোচ্য আয়াতে বাক্যের শেষে ঘটেছে যতিপাত। তাই এখানে শেষ শব্দটি উচ্চারিত হবে ‘কিতাবিয়াহ্’রূপে। এখানে ‘কিতাবিয়াহ্’ হচ্ছে ‘ইক্বরাউ’ (পড়ে দ্যাখো) কথাটির কর্মপদ। আর ‘হাউমু’ এর কর্মপদ এখানে রয়েছে উহ্য। যেহেতু ‘কিতাবিয়াহ্’ এর অব্যবহিত পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ‘ইক্বরাউ’।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— ‘আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে’। একথার অর্থ— এ বিষয়ে আমার সুদৃঢ় প্রতীতি ছিলো যে, পরকালে আমাকে আমার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবেই। মর্মার্থ— আমি জানতাম, পরকালে কৃতকর্মের জবাবদিহি অনিবার্য। আর তখন পরিত্রাণের উপযোগী হওয়া যাবে কেবল পুণ্যকর্মশীল হলে। তাই আমি আমার জীবনকে করেছিলাম পুণ্যকর্মশোভিত। সেকারণেই আজ আমার ডান হাতে আমলনামা পেয়ে হলাম চিরসৌভাগ্যাধিকারী। উল্লেখ্য, যিনি মহাপ্রভুপালয়িতা, তাঁর সম্মুখে নিজের শুভ কৃতকর্মের উল্লেখ করার অর্থ স্বকৃতিত্ব প্রকাশ করা, যা বিনয়নম্রতা ও বিশ্বাসী হওয়ার বৈশিষ্ট্য-বিরোধী। তাই এখানে কর্মের উল্লেখ প্রচ্ছন্ন রেখে বলা হয়েছে কেবল বিশ্বাসের কথা। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার প্রভুপালক! এরকম যে ঘটবে তা আমি জানতাম, বিশ্বাস করতাম। পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করতাম সেকারণেই। বায়যাবী লিখেছেন, গবেষণালব্ধ জ্ঞান নিঃসন্দিগ্ধ নয়। প্রকৃত অবস্থাকে ধারণার প্রলেপ দিয়ে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে সেকারণেই। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, এভাবে বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করা দূষণীয় কিছু নয়, যদিও বিশ্বাসও গবেষণালব্ধ।

আবু ওসমান নাহদীর বরাতে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদের হাতে তাদের আমলনামা দিবেন সবার অলক্ষ্যে। তারা তাদের আমলনামার পাপগুলো দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যাবে। স্বস্তি ফিরে পাবে তখন, যখন দেখবে পুণ্যকর্মাবলীর বিবরণ। পুনরায় পাপগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখবে, সেগুলো রূপান্তরিত হয়েছে পুণ্যে। তখনই তারা সোৎসাহে বলে উঠবে, এই ধরো আমলনামা। দ্যাখো, পড়ে দ্যাখো।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— ‘সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন (২১); সুউচ্চ জান্নাতে (২২) যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে’ (২৩)।

'ফাহুয়া ফী ঈ'শাতির রদ্বীয়াহ' অর্থ সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। 'রদ্বীয়াহ' অর্থ সন্তোষজনক, আনন্দময়। শব্দটি কর্তৃবাচক হলেও এখানে শব্দটি হবে কর্মবাচক অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ প্রথমোক্ত আয়াত এর অর্থ 'আনন্দদানকারী জীবন' না হয়ে হবে 'আনন্দময় জীবন' বা 'সন্তোষজনক জীবন'। বায়যাবী অবশ্য অর্থ করেছেন কর্তৃবাচক হিসেবেই। জীবনের সঙ্গে আনন্দের বিশেষণটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে রূপকার্থে।

'ফী জ্বান্নাতিন আ'লীয়াহ্' অর্থ সুউচ্চ জান্নাতে। অর্থাৎ চির আনন্দময় ওই জীবন যাপিত হবে চিরউন্নত কাননে, আল্লাহ্র সান্নিধ্যস্নাত মহামর্যাদাসম্পন্ন উদ্যানে। অথবা বলা যেতে পারে স্থানগত দিক থেকেও জান্নাত সর্বোন্নত। কেননা জান্নাত রয়েছে সপ্ত আকাশেরও উপরে। কিংবা সুদীর্ঘ তরুরাজি পরিশোভিত বলেই এখানে জান্নাতকে বলা হয়েছে সুউচ্চ।

'কুতূফুহা দানিয়াহ্' অর্থ যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। অর্থাৎ জান্নাতের বৃক্ষরাজি অতি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর ফলগুচ্ছ থাকবে জান্নাতবাসীদের নাগালের মধ্যে। তাই তারা সেখানে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেকোনো অবস্থায় যখন ইচ্ছা তখন আহরণ করতে পারবে ফল।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, পানাহার করো তৃপ্তির সঙ্গে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে, তার বিনিময়ে'। বাক্যটির পূর্বে উহ্য রয়েছে আর একটি বাক্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের পৃথিবীর জীবনের সুকীর্তির বদৌলতে এখানে করা হয়েছে পানাহারের এই প্রতুল আয়োজন। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্তে ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে এখানে সম্পন্ন করতে থাকো পানাহার। লক্ষণীয়, এখানে বলা হয়েছে 'কুলূ ওয়াশ্‌রাবূ' (তোমরা পানাহার করো)। অথচ ২১ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন'। একবচন ও বহুবচনের এই অসঙ্গতি দূর করণার্থে বলা যেতে পারে, 'হুয়া' (সে) সর্বনামটি কখনো কখনো 'তারা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে কোনো অসঙ্গতি আসলে নেই। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যটি হবে ২১ সংখ্যক আয়াতের 'হুয়া' উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় বিধেয়। অথবা বলা যেতে পারে আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

'অতীত দিনে যা করে ছিলে তার বিনিময়ে' অর্থ তোমরা পৃথিবীতে যেসকল সুকর্ম করেছিলে, তার পারিতোষিক হিসেবে। 'আইয়ামিল খলিয়াহ্' অর্থ অতীত দিনে। পৃথিবীর জীবন একসময় অতীত হয়েই থাকে। পৃথিবীর সময়কে এখানে অতীত দিন বলা হয়েছে সে কারণেই। 'খলী' বলে ওই স্থান ও কালকে, যা শূন্য হলে আর পূর্ণ হয় না। পৃথিবীবাসীরাও তেমনি, একবার মৃত্যুবরণ করলে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসে না। তাই তাদের পৃথিবীর সবকিছুই হয়ে যায় অতীত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ক্বদ্ খলাত মিন ক্ববলিহির রসুল (তাঁর পূর্বে অতীত হয়েছেন অনেক রসুল)।

وَ اَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ کِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ۬ فَیَقُوۡلُ یٰلَیۡتَنِیۡ لَمۡ اُوۡتَ
کِتٰبِیَهۡ ﴿ۚ۲۵﴾ وَ لَمۡ اَدۡرِ مَا حِسَابِیَهۡ ﴿ۚ۲۶﴾ یٰلَیۡتَهَا کَانَتِ الۡقَاضِیَةَ ﴿ۚ۲۷﴾
مَاۤ اَغۡنٰی عَنِّیۡ مَالِیَهۡ ﴿ۚ۲۸﴾ هَلَکَ عَنِّیۡ سُلۡطٰنِیَهۡ ﴿ۚ۲۹﴾ خُذُوۡهُ فَغُلُّوۡهُ ﴿ۙ۳۰﴾ ثُمَّ
الۡجَحِیۡمَ صَلُّوۡهُ ﴿ۙ۳۱﴾ ثُمَّ فِیۡ سِلۡسِلَةٍ ذَرۡعُهَا سَبۡعُوۡنَ ذِرَاعًا
فَاسۡلُکُوۡهُ ﴿ؕ۳۲﴾ اِنَّهٗ کَانَ لَا یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ الۡعَظِیۡمِ ﴿ۙ۳۳﴾ وَ لَا یَحُضُّ
عَلٰی طَعَامِ الۡمِسۡکِیۡنِ ﴿ؕ۳۴﴾ فَلَیۡسَ لَهُ الۡیَوۡمَ هٰهُنَا حَمِیۡمٌ ﴿ۙ۳۵﴾ وَّ
لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ غِسۡلِیۡنٍ ﴿ۙ۳۶﴾ لَّا یَاۡکُلُهٗۤ اِلَّا الۡخَاطِـُٔوۡنَ ﴿ع۳۷﴾

q কিন্তু যাহার 'আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার 'আমলনামা,

q 'এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব!

q 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

q 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না।

q 'আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হইয়াছে।'

q ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে, 'ধর উহাকে, উহার গলদেশে বেড়ি পরাইয়া দাও।

q 'অতঃপর উহাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

q 'পুনরায় তাহাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে',

q সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না,

q এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না,

q অতএব এই দিন সেথায় তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না,

q এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত,

q যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা মনের দুঃখে বলতে থাকবে, হায়! আমাদেরকে আমলনামা যদি দেওয়াই না হতো। বায়হাকী বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বাম হাত পিঠের পশ্চাতে নিয়ে তাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদের আমলনামা। ইবনে সায়েব বলেছেন, তাদের বাম হাত মুচড়ে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর ওই

হাতে গুঁজে দেওয়া হবে তাদের অপকর্মসমূহের বিবরণলিপি। এরকমও বলা হয়েছে যে, তখন তাদের বাম হাত তাদের বক্ষ ভেদ করে পিঠের পশ্চাতে বের করে তাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদেরই কৃতকর্মের বিবরণী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব'। একথার অর্থ— শাস্তি সুনিশ্চিত, একথা বুঝতে পেরে সে তখন তার সতীর্থদেরকে লক্ষ্য করে আরো বলবে, হে আমার স্বজাতি! একি হলো! কতোই না ভালো হতো, যদি আমি আমার এই হিসাব সম্পর্কে জানতে না পারতাম। এখানে 'মা হিসাবিয়াহ্' প্রশ্নবোধক এবং 'লাম আদরি' (না জানতাম) এর কর্মপদ।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো'। একথার অর্থ— সে আরো বলবে, হায়! হায়! শিঙ্গার ফুৎকার শুনে মৃত্যুকবলিত হওয়ার পর আমি যদি আর জীবন্ত না হতাম। ওই মৃত্যুই যদি হতো আমার শেষ পরিণতি! কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীতে মৃত্যুই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সর্বাধিক অস্বস্তিকর বিষয়। আর পরজগতে মৃত্যুই হবে তাদের কাম্য। আরো কাম্য হবে, আমলনামা না পাওয়া, হিসাবের সম্মুখীন না হওয়া, পুনর্জীবনপ্রাপ্ত না হওয়া।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমার ধন সম্পদ আমার কোনো কাজে এলো না (২৮)। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়েছে' (২৯)। এখানে 'মা আগনা আ'ন্নী' (আমার কোনো কাজে এলো না) কথাটির 'মা' না-সূচক। অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কই, আমার ধন-সম্পদ এখন কি আমার কোনো কাজে লাগলো? আমার কর্তৃত্ব-প্রতাপ জনবল— সবকিছুই তো এখন অবলুপ্ত। আমি তো এখন সম্পূর্ণরূপে অসহায়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ধরো তাকে, তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও (৩০) অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে (৩১) পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে' (৩২)।

'ফেরেশতাদেরকে বলা হবে' কথাটি এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ তখন এমতো নির্দেশ দেওয়া হবে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে। 'আল জাহীম' এখানে কর্মপদ, বসেছে 'সল্লূহু' (নিক্ষেপ করো) ক্রিয়াপদের পূর্বে। এভাবে তাদের গন্তব্যকে করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট। আর সে গন্তব্যস্থল হচ্ছে জাহান্নাম। 'আলজাহীম' অর্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, জাহান্নাম। আর 'ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হওয়ার কারণে এখানে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে তাদের দুর্ভোগ। যেমন প্রথমে তাদের গলদেশে বেড়ি পরানো হবে, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারপর বেঁধে ফেলা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক 'শিকলে' আর 'ফাস্লুকূহু' কথাটির 'ফা' এখানে অলংকারিক, তাই অতিরিক্ত। অব্যয়টি এখানে যোজক নয়। অন্যথায় 'ছুম্মা' ও 'ফা' অব্যয় দু'টো হয়ে যাবে একাকার।

আউফী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পশ্চাদ্দেশের ভিতর দিয়ে লৌহশিকল প্রবেশ করিয়ে তা বের করা হবে তাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে। আবার ইবনে জারীর সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিকল প্রবেশ করানো হবে তাদের নিতম্বের ভিতর দিয়ে এবং তা বের করা হবে মুখ-গহ্বর দিয়ে, যেভাবে কাঠিতে গেঁথে ফেলা হয় কোনো টিড্ডিকে। তারপর ওই টিড্ডিকে যেমন আগুনে ভুনা করা হয়, তেমনি তাদেরকেও ঝলসানো হবে জাহান্নামের আগুনে।

নাওফ বুকায়ী শামী বলেছেন, ওই শিকলের দৈর্ঘ্য হবে সত্তর জেরা। প্রতিটি জেরা সত্তর হাতবিশিষ্ট এবং প্রতি হাত হবে কুফা থেকে মক্কা শরীফের দূরত্বের সমান। হান্নাদ ও ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সুফিয়ান বলেছেন, একটি জেরা গঠিত হবে সত্তরটি জেরার সমন্বয়ে। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্ই জানেন, ওই জেরা কোন জেরা। আমি বলি, ওই জেরা হবে নরকের দ্বাররক্ষীদের জেরা বা বিঘত। অথবা নারকীদের হাতের বিঘত। আর হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, তাদের দেহাকৃতি হবে উহুদ পাহাড় সদৃশ বিশাল। আর তাদের গাত্রত্বকের ঘনত্ব হবে তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান। সুপরিণতসূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক ‘উত্তম’ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার তার মাথার তালুর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, নরকের ওই শিকলের এতটুকু একটি বালা পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করা হলে পৃথিবীতে তা পৌঁছবে রাত শেষ হওয়ার আগে, যদিও আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবধান পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। কিন্তু ওই বালা যদি নরকের শিকলের এক প্রান্তে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা অনবরত পতিত হতে হতে নরকের তলদেশে পৌঁছবে চল্লিশ বৎসরে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বলেছেন, ওই শিকলের একটি বালাতে রয়েছে এই জগতের সকল লোহা। মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের বরাত দিয়ে আবু নাঈম লিখেছেন, পৃথিবীর সমূদয় লোহা একত্রিত করলেও নরকের লৌহশৃঙ্খলের একটি কড়ার সমান হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘সে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না (৩৩), এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না’(৩৪)। এখানে ‘বিল্লাহিল আ’জীম’ অর্থ মহান আল্লাহ্। কথাটির মাধ্যমে এখানে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত মহিমা মহত্ব কেবলই তাঁর। সুতরাং কেউ যদি অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশী মনে করে, তবে অবশ্যই সে হবে অংশীবাদী ও মহাশাস্তির উপযোগী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, মহত্ত্ব আমার উত্তরীয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পরিচ্ছদ। যে এ দু’টোকে আকর্ষণ করতে উদ্যত হবে, আমি অবশ্যই তাকে প্রবেশ করাবো নরকাগ্নিতে।

‘অভাবীদেরকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না’ অর্থ সে নিজে তো অভাবীদের অভাব মোচন করতোই না, উপরন্তু এমতো মহান কর্মে অন্যদেরকে করতো নিরুৎসাহিত। কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, অন্নদানে নিরুৎসাহিত করার শাস্তিই যদি এতো ভয়াবহ হবে, তবে যে এমতো অপকর্ম অহরহ করে, তার শাস্তি হবে আরো কতো ভয়ংকর। অতএব সময় থাকতে সাবধান। এখানে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের বিশ্বাসগত স্খলনের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত তো হবেই, উপরন্তু শাস্তিভোগ করবে কর্মগত স্খলনের জন্যও। আর নিকৃষ্টতম বিশ্বাস হচ্ছে ‘কুফরী’(অবিশ্বাস) এবং নিকৃষ্টতম কর্ম— অন্নদানে অনীহা।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— ‘অতএব এই দিন সেখানে তার কোনো সুহৃদ থাকবে না (৩৫), এবং কোনো খাদ্য থাকবে না ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত (৩৬), যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না’ (৩৭)।

এখানে ‘ফা লাইসা লাহু ইয়াওমা’ (এই দিনে তার থাকবে না) কথাটির ‘ফা’ কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ একারণেই সেদিন সেখানে তার পক্ষে থাকবে না কোনো সুহৃদ-স্বজন। ‘লা ত্বআ’মুন’ অর্থ কোনো খাদ্য থাকবে না। ‘লা’ এখানে অতিরিক্ত। ব্যতিক্রমীটি এখানে পার্থক্যসূচক। ‘গিসলীন’ অর্থ নরকবাসীদের ক্ষতস্থাননিঃসৃত তাজা রক্ত। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘গোসল’ থেকে। ইকরামার পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন ‘গিসলীন’ হচ্ছে নারকীদের ক্ষতনিঃসৃত সতেজ শোণিত। রবী ইবনে আনাস এবং জুহাক বলেছেন ‘গিসলীন’ হচ্ছে বিশেষ ধরনের বৃক্ষ, যা আহার্য হবে নারকীদের। মুজাহিদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি জানিনা ‘গিসলীন’ কাকে বলে। তবে মনে হয় ‘গিসলীন’ হচ্ছে সীজ গাছ।

‘লা ইয়া’কুলুহু ইল্লাল খত্বিউন’ অর্থ যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না। এখানকার ব্যতিক্রমীটিও পার্থক্যসূচক। অর্থাৎ তা ভক্ষণ করবে কেবল নারকীরা। ‘খত্বিউন’ অর্থ অপরাধীরা। অর্থাৎ তারা, যারা ভুলে নয়, অপরাধ করে স্বেচ্ছায়, নিঃশংক ও নির্দ্বিধচিত্তে।

সূরা হাক্বক্বহ্ ঃ আয়াত ৩৮— ৫২

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝٤٦ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝٤٧
وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٤٨ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ۝٤٩
وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٥٠ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۝٥١ فَسَبِّحْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝٥٢

q আমি কসম করিতেছি উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও,
q এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না;
q নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।
q ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর,
q ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।
q ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।
q সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত,
q আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম,
q এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,
q অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।
q এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।
q আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে।
q এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হইবে,
q অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।
q অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসম্ভারের শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি আমার মহাসম্মানিত দূত জিবরাইল ফেরেশতার মাধ্যমে।

এখানে 'ফালা উক্বসিমু' এর শাব্দিক অর্থ আমি শপথ করি না। মর্মার্থ— কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার ব্যাপারটি এতোই সুনিশ্চিত যে, এর জন্য শপথ করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। 'লা' অব্যয়টি এখানে না-বাচক। আর 'লা' কে যদি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত বলে ধরা হয়, তবে বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— আমি সুদৃঢ় শপথ করছি। অথবা বলা যেতে পারে, 'লা' অব্যয়টির সম্পর্ক রয়েছে এখানে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অবিশ্বাসীরা কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বীকার করতে চায় না। বলে, মোহাম্মদ কবি ও গণক। সে-ই কোরআন রচনা করে। আমি শপথ উচ্চারণ করে বলছি, তাদের এ সকল মন্তব্য মিথ্যা। নিশ্চয় কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী।

'যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না' অর্থ যা কিছু পরিদৃশ্যমান এবং যা কিছু অপরিদৃশ্য। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানে প্রথমটির অর্থ আকারসম্ভূত এবং দ্বিতীয়টির অর্থ আত্মাবিশিষ্ট। অথবা এখানে 'যা তোমরা দেখতে পাও' অর্থ মনুষ্যজাতি এবং 'যা তোমরা দেখতে পাও না ' অর্থ ফেরেশতা ও জ্বিন। অথবা কথাটির অর্থ— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসম্ভার। কিংবা ওই জ্ঞান, যা দেওয়া হয়েছে মানুষ-ফেরেশতা-জ্বিনকে এবং ওই জ্ঞান, যা দেওয়া হয়নি তাদের কাউকেই। আর 'এই কোরআন এক সম্মানিত রসুলের বাহিত বার্তা' অর্থ এই কোরআনের ধারক-বাহক ও প্রচারক জিবরাইল আমিন, অথবা মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'এটা কোনো কবির রচনা নয়'। একথার অর্থ— হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! 'মোহাম্মদ কবি এবং কোরআন তাঁরই রচনা' তোমাদের এই মন্তব্যটি সর্বৈবরূপে মিথ্যা, ভিত্তিহীন। এরকম বিস্ময়কর, নিখুঁত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাণী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো হতেই পারে না। কিন্তু তোমাদের তো এর প্রতি বিশ্বাস মাত্রই নেই।

এখানে 'অল্পই বিশ্বাস করো' অর্থ কিছুই বিশ্বাস করো না। 'ক্বলীলান' (অল্পই) শব্দটি এখানে কর্মপদ, কিংবা ক্রিয়ার আধার হওয়ার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে। আর স্বল্পতাকে সুনির্দিষ্ট করণার্থে এরপর ব্যবহৃত হয়েছে 'মা' অব্যয়টি। এভাবে শব্দার্থটি দাঁড়িয়েছে— অত্যল্প। অর্থাৎ অত্যল্প সময়ের জন্য তোমরা বিশ্বাস করো। অর্থাৎ কোরআনের বাণীর মহিমা যখন তোমাদের মনোযোগের সম্মুখে সুপ্রকট হয়, তখন তোমরা অভিভূত হয়ে তা স্বীকার করতে বাধ্য হও অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য। পরক্ষণে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের জেদ, গোঁয়ার্তুমি ও পূর্বসংস্কারের কাছে। এধরনের স্বীকৃতি অস্বীকৃতিরই নামান্তর। কেননা তা স্থায়ী ও কার্যকর কোনোটাই নয়। যেমন বলা হয় 'আরে, তুমি তো এদিকে খুব কমই আসো'। অর্থাৎ তুমি তো এদিকে আসোই না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটা কোনো গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন করো (৪২)। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ' (৪৩)।

এখানে 'অল্পই অনুধাবন করো' অর্থ অনুধাবনই করো না। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কোরআনকে যেমন তোমরা বিশ্বাস করো না, তেমনি এর মর্মবাণীও অনুধাবন করতে চেষ্টা করো না। একে কবির কাব্য এবং গণকের কথা বলে উড়িয়ে দাও। অথচ পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস ও সুস্থ বিবেকের দাবি হচ্ছে একথা স্বীকার করা যে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট থেকে। এখানকার 'তানযীল' (অবতীর্ণ) শব্দটি ধাতুমূল ও কর্মপদার্থে ব্যবহৃত।

এরপরের আয়াতচতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'সে যদি আমার নামে কোনো কথা চালাতে চেষ্টা করতো (৪৪), আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম (৪৫) এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী (৪৬), অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে' (৪৭)। একথার অর্থ— কেউ তার নিজের মনগড়া কথাকে আমার কথা বলে চালাতে চেষ্টা করলে আমি কি তা সহ্য করতাম? এরকম অপচেষ্টা করলে আমি তো তাকে মেরেই ফেলতাম। আর তখন তাকে কেউ সাহায্যও করতে পারতো না। সুতরাং হে মক্কাবাসী! মিথ্যাচার পরিত্যাগ করো। মেনে নাও আমার বাণী ও বাণীবাহককে।

এখানে 'লাআখাজনা মিনহু বিল ইয়ামীন' অর্থ আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম। অথবা— আমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমি পাকড়াও করতাম তাকে। শেষোক্ত অর্থের ক্ষেত্রে এখানকার 'মিন' অব্যয়টি হবে অতিরিক্ত। আর 'আল্লাহ্‌র দক্ষিণ হস্ত' কথাটি দুর্জ্ঞেয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্ আকার ও দিকের অতীত, আনুরূপ্যবিহীন (বেমেছাল)। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, কথাটির মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্। তবে হজরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ বলেছেন, এখানে 'দক্ষিণ হস্ত' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র অপার শক্তিমত্তাকে। কেননা হাত হচ্ছে শক্তির প্রতীক। অবশ্য একথাটিও স্বীকার্য যে, আল্লাহ্‌র শক্তিও আল্লাহ্‌র মতো আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি থেকে যায় দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাচ্ছন্নই।

'ওয়াতীন' অর্থ জীবন-ধমনী, হৃৎপিণ্ডের একটি শিরা, যা কেটে দিলে মৃত্যু অনিবার্য হয়। 'ফামা মিনকুম মিন আহাদিন' অর্থ অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। আর 'আ'নহু হাজ্বিযীন' অর্থ যে তাকে রক্ষা করতে পারে। এখানকার 'আহাদিন' শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনার্থক। সেকারণেই শেষে উল্লেখিত হয়েছে বহুবচনরূপী 'হাজ্বিযীন'। অর্থাৎ যারা তাকে রক্ষা করতে পারে।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এই কোরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ'। একথার অর্থ— যারা সাবধানী (মুত্তাকী), কেবল তারাই কোরআনের উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ বলেছেন, এখানকার 'লিল মুত্তাক্বীন' কথাটিতে 'আলিফ লাম' ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ অর্থে। অর্থাৎ কোরআন দ্বারা প্রকৃত অর্থে উপকৃত হতে পারেন কেবল সাবধানীরা। আর সাবধানী তারাই, যারা বিশুদ্ধচিত্ত ও পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট। অর্থাৎ যাদের অর্জিত হয়েছে কলব ও নফসের ফানা। এ ধরনের ব্যক্তিগণই কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উপকৃত হন। অর্থাৎ কোরআন পাঠ তাদের ক্ষেত্রেই হয় আত্মিক স্তরোন্নতির উপলক্ষ। যারা এরকম নন, তাদের কোরআন পাঠ কেবল একটি সাধারণ পুণ্যকর্ম, অথবা পুণ্যময় অনুশীলন, প্রকৃত উপকারপ্রদায়ক নয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে (৪৯) এবং এই কোরআন নিশ্চয়ই কাফেরদের অনুশোচনার কারণ হবে (৫০), অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য' (৫১)। একথার অর্থ— তোমরা যারা কোরআনকে অস্বীকার করো, তাদের সম্পর্কে আমি ভালো করেই জানি। যথাসময়ে আমি তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তিদান করবোই। তখন তারা কোরআনের সতর্কবাণীর কথা স্মরণ করে অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হতে থাকবে। সুতরাং হে মক্কাবাসী! এখনো সময় আছে, সাবধান হও। এই মুহূর্তে মেনে নাও যে, এই কোরআন অবশ্যই-নিশ্চয় মহাসত্য।

এখানে 'ইয়াক্বীন' অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ, সত্য। কামুস। 'ইয়াক্বীন' হচ্ছে প্রজ্ঞার এক উচ্চতর মার্গের বিশেষণ। এভাবে এখানে কথাটির মাধ্যমে এই তত্ত্বটিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআন স্বমহিমায় সতত সমুজ্জ্বল। প্রকৃত অর্থে যারা প্রজ্ঞাবান, তাদের কাছে এ তত্ত্বটি অবিদিত নয়। এভাবে এখানে 'হাক্কুক্কুল ইয়াক্বীন' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— নিশ্চিত সত্য। কথাটির আসল রূপ ছিলো 'ইয়াক্বীনুল হাক্ব' (সত্য বিশ্বাস)। এরকম লিখেছেন 'বাহার' অভিধান প্রণেতা। অর্থাৎ কোরআন যে নিশ্চিত সত্য, তা অবশ্য বিশ্বাস্য।

একটি প্রশ্ন ঃ 'ইয়াক্বীন' অর্থই নিশ্চিত বিশ্বাস বা সুনিশ্চিত সত্য। তাহলে এখানে 'ইয়াক্বীন' এর সঙ্গে আবার 'হাক্ব' (সত্য) সংযুক্ত হলো কেনো? এরকম পুনরাবৃত্তির স্বার্থকতা কী?

উত্তর ঃ এরকম করা হয়েছে 'ইয়াক্বীন' কে অধিকতর সুনিশ্চিতি প্রদানার্থে, অধিক প্রবলভাবে প্রকাশার্থে। বাগবী লিখেছেন, 'ইয়াক্বীন' ও 'হাক্ব' সমার্থক। ফলে বলা যেতে পারে, শব্দ দু'টো যেনো সম্বন্ধিত হয়েছে নিজেদেরই সঙ্গে, পরিস্ফুটক, পরিপূরক বা পরিপোষকরূপে।

শেষোক্ত আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্, রসুল ও কোরআন সম্পর্কে যে সকল অযথার্থ উক্তি করে, তার প্রতিবাদে আপনি বর্ণনা করুন আপনার মহান প্রভুপালয়িতার নামের পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে 'তাসবীহ' অর্থ পবিত্রতা। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'তাসবীহ্' অর্থ নামাজ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি আল্লাহ্র স্মরণে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করুন নামাজ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'বিসমি' (নামের) কথাটির 'বা' অব্যয়টি এবং 'ইসিম' উভয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বর্ণনা করুন আপন প্রভুপালকের পবিত্রতা।

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহুনী বর্ণনা করেছেন, যখন 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'জীম' অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বললেন, তোমরা এ বাণীকে

মিলিয়ে নাও তোমাদের রুকুর সঙ্গে। আর যখন অবতীর্ণ হলো ‘সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ’লা’ তখন তিনি স. বললেন, এ কথাটিকে তোমরা মিলিয়ে নাও তোমাদের সেজদার সঙ্গে।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. রুকুতে পাঠ করতেন ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ’জীম’ এবং সেজদায় পাঠ করতেন ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ’লা’। আর কোরআন পাঠকালে যখন তিনি পৌঁছে যেতেন রহমত-বর্ষণ বিষয়ক কোনো আয়াতে, তখন সেখানে থেমে গিয়ে দোয়া করতেন বরকতের জন্য। তেমনি যদি পৌঁছে যেতেন শাস্তির বিবরণবিশিষ্ট আয়াতে, তখন আশ্রয় চাইতেন আল্লাহ্‌র সমীপে। তিরমিজি, আবু দাউদ, দারেমী।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আওন ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা রুকুর সঙ্গে তিনবার মিলিয়ে নিয়ো ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ’জীম’ এবং তিনবার ‘সুবহানা রব্বিয়াল আ’লা’ মিলিয়ে নিয়ো সেজদার সঙ্গে। কমপক্ষে এতটুকু করলেই পূর্ণ হবে তোমাদের রুকু ও সেজদা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা অযথার্থ। কেননা হজরত ইবনে মাসউদের সঙ্গে আওন ইবনে আবদুল্লাহ্‌র কখনো সাক্ষাত ঘটেনি।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লহিল আ’জীম’ পাঠ করে, আল্লাহ্‌ তার জন্য বেহেশতে রোপণ করেন একটি খেজুর গাছ। তিরমিজি।

মাসআলা ঃ আলেমগণের সর্ববাদী সম্মত মত এই যে, রুকু ও সেজদায় তসবীহ্‌ পাঠ করা সুন্নত। ইমাম আহমদ বলেছেন, ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। কেননা রসুল স. আজ্ঞা করেছেন ‘মিলিয়ে নিয়ো’। তাঁর আজ্ঞা পালন করা ওয়াজিব। আবার তিনি স. একথাও বলেছেন যে ‘এতটুকু করলে পূর্ণ হবে তোমাদের রুকু ও সেজদা’। কিন্তু আলেমগণ বলেন, এখানকার আজ্ঞাটি মোস্তাহাব (অভিপ্রেত) পর্যায়ের।

রুকুতে ও সেজদায় গমনকালে এবং সেজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলা সুন্নত, সকল বিদ্বান এ ব্যাপারে একমত। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল ইমাম আহমদ। তাঁর মতে নামাজের তকবীরসমূহ ওয়াজিব। ‘সামিআ’ল্লহু লিমান হামিদাহ্‌’ এবং ‘রব্বানা লাকাল হামদ’ সম্পর্কেও রয়েছে এরকম মতপ্রভেদ। অর্থাৎ সকল বিদ্বান কাজ দু’টোকে বলেছেন সুন্নত। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন ওয়াজিব। তবে দুই সেজদার মাঝখানের ‘রব্বিগ্‌ফিরলি’ পাঠের ব্যাপারে কারো কোনো মতপৃথকতা নেই। অর্থাৎ এই আমলটির ওয়াজিব হওয়ার কথা কেউই বলেননি। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

সূরা আল মাআ'রিজ্ব

মহাপুণ্যভূমি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ৪৪ টি আয়াত।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ○

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿۱﴾ لِّلۡکٰفِرِیۡنَ لَیۡسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿۲﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِی الۡمَعَارِجِ ؕ﴿۳﴾ تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَ الرُّوۡحُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ کَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِیۡنَ اَلۡفَ سَنَۃٍ ۚ﴿۴﴾ فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِیۡلًا ﴿۵﴾

r এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত—

r কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

r ইহা আসিবে আল্লাহ্র নিকট হইতে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

r ফিরিশ্তা এবং রূহ আল্লাহ্র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যাহার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাযার বৎসর।

r সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর পরম ধৈর্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি, যা অবধারিত'। এখানে 'এক ব্যক্তি' অর্থ নজর ইবনে হারেছ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ ও ইবনে হাতেম বর্ণনা করেছেন, নজর ইবনে হারেছ বলেছিলো, হে আল্লাহ্! এ সকল বাণী যদি সত্যি সত্যিই তোমার নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সবকিছু অস্বীকার করার কারণে তুমি আমাদেরকে এখনই শাস্তি দাও, প্রস্তর বর্ষণ করো।

সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, নজর ও তার সঙ্গী-সাথীদের কাংখিত শাস্তি আপতিত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের দিবসে। প্রথম বর্ণনানুসারে বলতে হয়, তারা চেয়েছিলো প্রস্তরবর্ষণের শাস্তি, অথবা অন্য কোনো মর্মন্তুদ শাস্তি। কেননা এখানে 'সাআলা' ক্রিয়ার কর্মপদ 'আ'জাব' সংবদ্ধ হয়েছে 'বা' অব্যয় দ্বারা (সায়িলুম বি আ'জাবি)। অন্য রকম অর্থও হওয়া সম্ভব কথাটির। যেমন— ক্বারী নাফেয়ের পাঠরীতিতে 'সাআলা' এসেছে 'আলিফ'সহ। ফলে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে— বহমান। আর বদরের রণক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিলো। প্রবাহিত হয়েছিলো তাদের রক্ত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে শাস্তি বহমান হয়

উপত্যকাভূমি থেকে, সে শাস্তিই কামনা করেছিলো নজর ইবনে হারেছ। সুতরাং বলা যেতে পারে— ওই অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো বদর প্রান্তরে, তদুপরি পরকালের শাস্তিও তাদের জন্য অনিবার্য। বাগবী লিখেছেন, দোজখের একটি উপত্যকার নাম 'সায়িল'। আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলামও এরকম বলেছেন।

ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, মক্কার এক পৌত্তলিক একবার আবেদন করলো, যে শাস্তি অবধারিত, সে শাস্তি এখনই নেমে আসুক। তখন অবতীর্ণ হলো 'এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি, যা অবধারিত'। পৌত্তলিক জনতা প্রশ্ন করলো, তাহলে কবে আপতিত হবে সেই শাস্তি? তখন অবতীর্ণ হলো 'কাফেরদের জন্য, এটা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই'। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানকার 'সায়িলুন' অর্থ হবে 'প্রশ্ন'। বি আ'জাবি' এর 'বা' অব্যয়টির অর্থ হবে 'আ'ন' (হতে)। অর্থাৎ প্রশ্নটি যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাই তা পরিবেশিত হয়েছে 'বা' সহযোগে। আর 'ওয়াক্বিয়্' শব্দটি এখানে 'শাস্তি'র বিশেষণ। অর্থাৎ অবধারিত শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'কাফেরদের জন্য, এটা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই'। এ কথার অর্থ— প্রার্থিত ওই শাস্তি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আপতিত হবেই। সে শাস্তি প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। এই কথাটিও পূর্বোক্ত প্রশ্নের জবাব।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা আসবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী'। একথার অর্থ— মহামর্যাদাধারী আল্লাহ্ স্বয়ং যেহেতু ওই শাস্তি অবতীর্ণ করবেন, সেহেতু তা হবে অপ্রতিরোধ্য।

এখানে 'জিল মাআ'রিজ্ব' অর্থ— মহাপারদর্শী আল্লাহ্। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ— মহিমান্বিত। আমি বলি, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ওই সকল স্তরকে, যে স্তরসমূহে স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে উপনীত হন নবী-রসুল, ফেরেশতাকুল এবং আউলিয়াগণ। অর্থাৎ পাত্রভেদে যে সকল স্তরে উন্নিত হয় পুণ্যকর্মসমূহ। অথবা এর অর্থ— বেহেশতের স্তরান্তর। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের ভিতরে আছে একশতটি স্তর। এক স্তর থেকে আর এক স্তরের ব্যবধান আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের মতো। আর ফেরদাউস হচ্ছে বেহেশতের সর্বোন্নত স্তর। সেখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে বেহেশতের স্রোতস্বিনীচতুষ্টয়। এর উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। তোমরা বেহেশত কামনা করলে কামনা কোরো ফেরদাউস। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তবে তাঁর বর্ণনায় 'আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের' স্থলে বলা হয়েছে 'একশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান'।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের আপন আপন প্রাসাদে বসে একে অপরকে দেখতে পাবে দিগন্ত-দূরবর্তী সমুজ্জ্বল তারকার মতো। কারণ তাদের মধ্যে থাকবে স্তরগত পার্থক্য। মান্যবর সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! নবী-রসুলগণ ছাড়া উন্নততর স্তরে অন্য কেউ কি পৌঁছতে পারবে? তিনি স. বললেন, যাঁর আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, উন্নততর স্তরের অধিবাসী হতে পারবে তারাও। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'মাআ'রিজ্ব' অর্থ নভোমণ্ডল। কেননা ফেরেশতামণ্ডলী আরোহণ করে আকাশে। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— অনুগ্রহভাণ্ডার। অর্থাৎ যিনি আকাশাধিকারী, অথবা ভাণ্ডারাধিশ্বর।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্র দিকে ঊর্ধ্বগামী এমন একদিনে, যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসর'। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত 'শাস্তি যা অবধারিত' কথাটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, যেদিন তাদের উপরে মহাশাস্তি আপতিত হবে, সেদিনের পরিমাণ হবে পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসর। সেদিনের নামই মহাবিচার দিবস। ইকরামা সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। ইয়ামান বলেছেন, মহাবিচার দিবসের বিরতিস্থল হবে পঞ্চাশটি। প্রতিটি বিরতিস্থলে অবস্থান করতে হবে এক হাজার বৎসর ধরে।

হজরত আবু হোরয়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে বিত্তপতি তার জমানো সোনা-রূপার জাকাত আদায় করবে না, মহাবিচারের দিবসে তার সোনা-রূপাগুলোকে দোজখের আগুনে পুড়িয়ে বানানো হবে পিণ্ড, আর ওই জ্বলন্ত পিণ্ড দিয়ে দাগ দেয়া হবে তার বাহু ও ললাটে। বিচারপর্ব সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই শাস্তি দেওয়া হবে তাকে। আর বিচারপর্ব সমাপ্ত হতে লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। এরপর তাকে দেখানো হবে স্বর্গ অথবা নরকের পথ। আর যে উষ্ট্রপতি জাকাত আদায় করবে না তার উটের, তাকে শোয়ানো হবে উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারপর পদদলিত করা হবে উটের সাহায্যে। উটের শাবকগুলোও তাকে পদপিষ্ট করবে একইভাবে। তারা একবার তার উপর দিয়ে যাবে, একবার আসবে। সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। এরপর আল্লাহ্ তার জন্য সিদ্ধান্ত দান করবেন জান্নাতের, অথবা জাহান্নামের। ছাগলের মালিকেরা জাকাত না দিলেও এরকমই ঘটবে। তখন তার ছাগলগুলি তাকে শিঙ দিয়ে গুঁতো দিতে থাকবে এবং তাকে জর্জরিত করতে থাকবে তাদের খুরের আঘাতে। সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। পরিশেষে তাদের সম্পর্কেও ফয়সালা দেওয়া হবে বেহেশত, অথবা দোজখের। সুপরিণত সূত্রে আহমদ, আবু ইয়ালা, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সেই

দিনটি কতোইনা দীর্ঘ হবে, যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর! তিনি স. বললেন, আমার জীবনপ্রদীপ যার করতলগত, তাঁর শপথ! ওই দিনটি বিশ্বাসীদের কাছে মনে হবে অতি সংক্ষিপ্ত, ফরজ নামাজ পাঠের সময় অপেক্ষাও কম। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে মহাবিচার দিবসের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। আর সুরা 'তানযীলুল সেজদা'য় বলা হয়েছে— হজরত জিবরাইল আল্লাহ্‌র বিধান পৃথিবীতে এনে পুনরায় ফিরে যান একদিনে। পৃথিবীর হিসেবে এই এক দিনের পরিমাণ এক হাজার বৎসর। বাহ্যত এ দু'টো তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃত পক্ষে এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। তাই হজরত জিবরাইলের পৃথিবীতে আগমন ও প্রত্যাগমনে সময় লাগে পাঁচশ' যোগ পাঁচশ' সমান সমান এক হাজার বৎসর। বরং এর কম সময়ের মধ্যেও ফেরেশতারা দুনিয়ায় এসে আসমানে ফিরে যেতে পারেন।

আবু তালহা সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহজগতে ফেরেশতারা একদিনে এক হাজার বৎসরের পথ অতিক্রম করতে পারে। আর পরজগতের বিচারের দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। তবে এমতো প্রলম্বিতি অনুভব করবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা, বিশ্বাসীরা নয়। আবার কেউ কেউ বলেন 'এক হাজার বৎসর' 'পঞ্চাশ হাজার বৎসর' দু'টো সময়ই আখেরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মহাবিচারের দিবসের প্রলম্বিতিকে কারো কারো কাছে মনে হবে এক হাজার বৎসর, আবার কারো কারো বোধ হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। আর ইমানদারদের কাছে মনে হবে ফরজ নামাজ পাঠ করার সময়ের মতো সংক্ষিপ্ত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সর্বোন্নত ও উন্নত সূত্রে হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য প্রতিফল দিবস হবে জোহর ও আসরের মধ্যকার সময়ের মতো সংক্ষিপ্ত। এমতো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ্‌পাক তাঁর আকাশগত নির্দেশাদি পৃথিবীতে কার্যকর করেন পৃথিবীর সময়ানুসারে। এরপর যখন পৃথিবীর আয়ু শেষ হবে, ইতি ঘটবে সকল বিচারকর্তার বিচারকর্মের, সমাপ্ত হবে সকল শাসনকর্তার শাসনের, তখন সকল নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হবে কেবল মহাবিচার দিবসের সঙ্গে। আর তার পরিমাণ হবে এক হাজার বৎসর।

কেউ কেউ বলেছেন, 'এক হাজার বৎসর' এবং 'পঞ্চাশ হাজার বৎসর' সম্বলিত দু'টো আয়াতেই উল্লেখিত হয়েছে 'ফী ইয়াওমিন' কথাটি, যার সম্বন্ধ রয়েছে 'ইয়া'রুজু' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে বলা যেতে পারে, আকাশ-পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের সমান। এই হিসেবে যাতায়াতে সময় লাগে এক হাজার বৎসর। আর এই হিসেবে হয়তো সপ্ত আকাশ ও সপ্ত-স্তরবিশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াতে মোট সময় লাগে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। লাইছ বর্ণনা করেছেন, এরকম বলেছেন মুজাহিদ। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, কোনো

মানুষ যদি স্বাভাবিক গতিতে পৃথিবী থেকে আরশে পৌঁছতে চায়, তবে তার সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। একারণেই সুফী সাধকগণ বলেন, আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের আত্মিক বিনাশন (ফানা) অর্জিত হয় আল্লাহ্পাকের প্রেমাকর্ষণে (জজবায়) নবী-রসুলগণ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু বা পীর-মোর্শেদের মাধ্যমে। সুতরাং কেউ যদি পীর-মোর্শেদ ব্যতিরেকে স্বচেষ্টায় কেবল ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে ওই স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, তবে তার সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বৎসর আয়ুবিশিষ্ট কেউই নয়। তাছাড়া পৃথিবী যে আরো পঞ্চাশ হাজার বৎসর টিকে থাকবে, তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে জজবা ও পীর-মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ্ (অভিনিবেশ) ব্যতিরেকে ফানা প্রাপ্তি অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি পীর-মোর্শেদ ব্যতিরেকেও ফানার স্তরে উন্নীত হতে পারেন। তাদের নিয়মটি হচ্ছে ওয়াইসী নিয়ম। অর্থাৎ ওয়ায়েস ক্বরনী যেভাবে ফানা লাভ করেছিলেন, সেই নিয়ম। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে রসুলে পাক স. এর রূহানী তাওয়াজ্জোহ অপরিহার্য। আর এটি একটি ব্যতিক্রমী নিয়মও বটে, সাধারণ নিয়ম নয়।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো, পরম ধৈর্য'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের শাস্তির ব্যাপারে অবলম্বন করুন অনুপম সহিষ্ণুতা। অসহিষ্ণু হবেন না মোটেও। এখানে 'ফাস্বির' (ধৈর্যধারণ করো) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি যোজক। এর যোগসূত্র রয়েছে প্রথম আয়াতের 'এক ব্যক্তি চাইলো' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একজন চাইলো, শাস্তি ত্বরান্বিত হোক। এটা ছিলো তাদের উপহাস। রসুল স. মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তাই আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কারণে চাঞ্চল্য প্রকাশ করবেন না। নিশ্চয় যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবেই।

নাফে বলেছেন, প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ 'সাআ'লা' (সে চাইলো, সে প্রশ্ন করলো) পরিগঠিত হয়েছে 'সাইলান' থেকে। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম নবী! ধৈর্য ধরুন। অপেক্ষা করুন। তাদের অপকর্মপ্রবাহ তাদেরকে ক্রমাগত নিয়ে চলেছে শাস্তির দিকেই। আর সে শাস্তি অত্যাসন্নও।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ

بِبَنِيْهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴿١٤﴾

q উহারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর,
q কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আসন্ন।
q সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মত
q এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙ্গীন পশমের মত,
q এবং সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব লইবে না,
q উহাদিগকে করা হইবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাহিবে তাহার সন্তান-সন্ততিকে,
q তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,
q তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত
q এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপণ তাহাকে মুক্তি দেয়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ধারণা করে, কিয়ামত অনেক দূরে, আর তা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না, কিন্তু আমি তো প্রত্যক্ষ করছি, কিয়ামত অত্যাসন্ন। উল্লেখ্য, যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে আসন্ন বলাই সঙ্গত।

এরপরের আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন কঠিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো তরল এবং শৈলশ্রেণী হবে রঙীন পশমের মতো অসংলগ্ন, আর তখন আপনজনেরা তাদের প্রিয়জনদের তত্ত্ব-তালাশ নিতে পারবে না। সকলেই হবে পর্যুদস্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত।

এখানে 'মুহলি' অর্থ গলিত তামা। অথবা অন্য কোনো বিগলিত ধাতু। কিংবা তেলের গাদ। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তখন আকাশ হয়ে যাবে বিবর্ণ। কখনো হবে বিগলিত তাম্র, অথবা অন্য কোনো ধাতুর মতো তরল, আবার কখনো হবে তেলের গাদের মতো লোহিতাভ। হবে বিদীর্ণ, শিথিল। 'পর্বতসমূহ হবে রঙীন পশমের মতো' অর্থ রঙ-বেরঙের তুলির পশমের মতো হয়ে যাবে তখন পাহাড়-পর্বতগুলো। এমনিতে পাহাড়গুলো হয় বিভিন্ন বর্ণের। তাই তখন উড়তে থাকা চূর্ণ-বিচূর্ণ পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হবে, যেনো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে রঙ-বেরঙের তুলি। আর 'সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না' অর্থ মানুষ তখন এতো অধিক বিপদাপন্ন হবে যে, বন্ধু-বান্ধবদের কথা জিজ্ঞেস মাত্র করবে না।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে (১১), তার স্ত্রীকে ও ভ্রাতাকে (১২), তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো (১৩) এবং পৃথিবীর সকলকে যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়' (১৪)।

এখানে 'ইউবাস্সরূনাহুম' (তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর) কথাটি আগের আয়াতের 'হামীমা' (সুহৃদ) এর বিশেষণ। অথবা এখান থেকে শুরু হয়েছে পৃথক বাক্য। কথাটির মাধ্যমে এখানে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যে তখন বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ নিবে না, তা তাদের অনুপস্থিতির কারণে নয়। তারা তখন পরস্পরকে দেখবে ঠিকই। কিন্তু ভয়ে-আতংকে এমনভাবে জড়সড় হয়ে থাকবে যে কারো ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তিও তাদের থাকবে না। আর সেরকম অবকাশও তারা পাবে না। বাগবী লিখেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি বন্ধু-বান্ধব সকলেই সকলকে দেখতে পাবে। কিন্তু তখন তারা এমনভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে যে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার ফুসরত মাত্রই পাবে না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন, তারা একে অপরের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও কেউ কাউকে চিনতে পারবে না, তাদের অবস্থা তখন হবে এতোই সঙ্গিন। বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র ও গৌরবর্ণের এবং কৃষ্ণ মুখাবয়ববিশিষ্ট হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা।

এখানে 'মুজ্বরিম' অর্থ অপরাধী, পৌত্তলিক। তারাই মহাবিচারের দিবসে তাদের সন্তান-সন্ততি, ভার্যা-ভ্রাতা, অধীনস্থ-স্বজন, এমনকি সারা পৃথিবীর সবকিছুকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইবে। 'ইয়াওয়াদ্দু' অর্থ চাইবে, কামনা করবে। অর্থাৎ আপনজনদের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা তাদেরকে পরিত্যাগ করে হলেও তারা তখন মুক্তি পেতে চাইবে। তাদের অবস্থা হবে তখন এতোই শোচনীয়। কিন্তু বিশ্বাসীদের আচরণ হবে তখন ভিন্নতর। তারা তাদের স্বজন-বান্ধবদের খোঁজ-খবর নিবে। এমনকি যারা জাহান্নামে চলে যাবে, তাদের পক্ষেও সুপারিশ করবে। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা কেউই এখন তোমাদের প্রাপ্য সম্পর্কে এতো বাদানুবাদ করো না, যতো বাদানুবাদ করবে মহাবিচারের দিবসে তোমাদের বিপদগ্রস্ত স্বজনদের জন্য। জাহান্নামী স্বজনদের সম্পর্কে তোমরা তখন বলবে, হে আমাদের দয়াময় প্রভুপালনকর্তা! তারা তো আমাদের সাথে নামাজ পড়তো, রোজা পালন করতো। বোখারী, মুসলিম। এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও।

'সাহিবাতিহী' অর্থ তার ভার্যা, পত্নী। 'আখীহি' অর্থ তার ভ্রাতা। 'ফাসীলাতিহি' অর্থ তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ওই গোত্র— যার একটি অংশ পৃথক। 'আললাতী তু'য়িহী' অর্থ যারা তাকে আশ্রয় দিতো। আর 'মান ফীল আরদ্বি জ্বামীআ' অর্থ পৃথিবীর সকলকে।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ

الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢٠﴾ وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢١﴾

q না, কখনই নয়, ইহা তো লেলিহান অগ্নি,

q যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে।

q জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

q যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল।

q মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে।

q যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী।

q আর যখন কল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ;

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— না, কোনোকিছুই তখন মুক্তিপণ হিসেবে গৃহীত হবে না। দোজখে প্রবেশ করতে তাদেরকে হবেই। আর দোজখে রয়েছে কেবল লেলিহান আগুন। সে আগুন অহরহ তাদেরকে দগ্ধীভূত করবে। ফলে চামড়া খসে খসে পড়তে থাকবে তাদের শরীরের। সেই দোজখ তখন তাদেরকে আহ্বান জানাবে, যারা সত্যবিমুখ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা সম্পদপতি হওয়া সত্বেও জাকাত দেয় না, বরং ক্রমাগত স্ফীত করে তুলতে থাকে সম্পদের পাহাড়।

'ইননাহা লাজা' অর্থ এটা তো লেলিহান অগ্নি। এখানকার 'হা' (এটা) সর্বনামটি বিবৃতিমূলক। অথবা সর্বনামটি ওই আগুনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা নিহিত রয়েছে 'শাস্তি' কথাটির মধ্যে। অথবা সর্বনামটি এখানে অনির্ণেয়, দুর্বোধ্য যার বিশ্লেষণাত্মক শব্দ 'লাজা'। বাগবী লিখেছেন, 'লাজা' দোজখের দ্বিতীয় দরোজার নাম। সেখানে রয়েছে বিশেষ ধরনের অতি তেজস্বী লেলিহান অগ্নি।

'নায্‌যাআ'তাল লিশ্‌শাওয়া' অর্থ যা গা থেকে চামড়া খসিয়ে নিবে। 'শাওয়া' অর্থ দুই হাত এবং দুই পা। অর্থাৎ লেলিহান অগ্নি তখন তাদের হাত-পাগুলো উপড়ে তুলে পৃথক করে দিবে। অথবা 'শাওয়া' হচ্ছে 'শূয়াতুন' এর বহুবচন, অর্থ— মস্তিষ্কের চামড়া। অর্থাৎ মস্তিষ্কের চামড়া স্খলক। অথবা হাতের মাংস স্খলনকারী। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই লেলিহান শিখা টেনে নিবে তাদের নিতম্ব। কালাবী বলেছেন, ওই জ্বলন্ত হুতাশন ভক্ষণ করবে গোটা মস্তিষ্কের ঘিলু। পুনরায় ঘিলু তৈরী করে দেওয়া হবে। পুনরায় তা গ্রাসিত হবে অগ্নি কর্তৃক। এভাবে ক্রমাগত শাস্তি দেওয়া হতে থাকবে তাদেরকে।

'তাদ্‌উ' মান আদবারা ওয়া তাওয়াল্লা' অর্থ জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো ও হয়েছিলো বিমুখ। বলবে— ওরে পামর! প্রবঞ্চক! পৌত্তলিক! আয়, আমার কাছে আয়। হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, সেদিন জাহান্নাম অবিশ্বাসী ও কপটদেরকে আহ্বান জানাবে সালংকৃত ভাষায় এবং ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে নিজের ভিতরে, যেমন করে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তার আহার। আর 'ওয়া জ্বামাআ' ফা আওআ' অর্থ যে সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখেছিলো।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে (১৯)। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় হা-হুতাশকারী (২০)। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ'(২১)।

এখানে 'হালূআ'ন' অর্থ অতিশয় অস্থিরচিত্ত। হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— অসিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভাতুর। সাঈদ ইবনে যোবায়ের অর্থ করেছেন— ঘোর কৃপণ। ইকরামা বলেছেন, সংকীর্ণচেতা। কাতাদা বলেছেন, অস্থিরচিত্ত। মুকাতিল বলেছেন, সংকীর্ণমনা। 'হুলউন' অর্থ অত্যধিক লোভী, অসহিষ্ণু। আতিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'অতিশয় অস্থিরচিত্ত' কথাটিকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরের দুই আয়াতে 'হা-হুতাশকারী' ও 'কৃপণ' বলে।

'বিপদ তাকে স্পর্শ করলে সে হয় হা-হুতাশকারী' অর্থ বিপদে সে ধৈর্য ধারণ করে না। হয়ে যায় অসহিষ্ণু ও অকৃতজ্ঞ। 'আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় অতিকৃপণ' অর্থ সে ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে, যখন তার অবস্থা থাকে স্বচ্ছল। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি উপত্যকা ভর্তি সম্পদও যদি কারো হস্তগত হয়, তবুও সে কামনা করবে আর একটি। মানুষের লোভের উদর পরিপূরিত হতে পারে কেবল মৃত্তিকা দ্বারা। আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌মুখী হয়ে যায়, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ বৃদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু দু'টি বিষয় হতে থাকে উত্তরোত্তর যুবক— বিত্তপ্রীতি ও দীর্ঘ আয়ুর আশা। বোখারী, মুসলিম।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٢﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَ الَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾ وَ الَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ

اَيۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُوۡمِيۡنَ ۚ﴿۳۰﴾ فَمَنِ ابۡتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ ۚ﴿۳۱﴾

q তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত,
q যাহারা তাহাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত,
q আর যাহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে
q যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের,
q এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে।
q আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত—
q নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে নিঃশংক থাকা যায় না—
q এবং যাহারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে,
q তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না—
q তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী—

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত'। একথার অর্থ— অস্থিরচিত্ততা, হতাশা ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকতে পারে কেবল তারা, যারা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে যথানিয়মে সুসম্পন্ন করে তাদের নামাজ। এখানে 'মুসল্লী' (নামাজী) অর্থ পূর্ণ ইমানদার। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা কানাল্লহু লিইয়ুদ্বিআ' ইমানাকুম'। সেখানে আবার 'ইমান' অর্থ নামাজ। কেননা বিশ্বাসীগণকে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে নামাজ। সে কারণেই হাদিস শরীফে নামাজকে বলা হয়েছে 'মেরাজ' ও 'ধর্মের স্তম্ভ'। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ বলেছেন, মানুষের সম্ভাব্য মর্যাদাগুলোর মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিবরণ দেওয়া শুরু হয়েছে এখানে ১৯ সংখ্যক আয়াত থেকে। বর্ণনা শুরু করা হয়েছে 'ইন্নাল ইনসান' বলে। এখানে 'আল ইনসান' এর 'আলিফ লাম' জাতিবাচক। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনার্থক। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বহুবচনের উল্লেখ— 'মুসল্লী' না বলে বলা হয়েছে 'মুসাল্লীন'। আর 'ইল্লা' (ব্যতীত) ব্যতিক্রমীটি এখানে মিলনান্তক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অস্থিরচিত্ত, হা-হুতাশকারী ও কৃপণ। তবে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের মনোভাব ও আচার-আচরণ নির্মল ও পরিশোধিত। কেননা তারা নামাজ ও অন্যান্য সৎকর্মের দ্বারা প্রধানতঃ আল্লাহ্‌র সন্তোষকামনাতেই থাকেন বিভোর। তাদের কাছে পরকাল ইহকালের চেয়ে মূল্যবান। তাই চাঞ্চল্য, কার্পণ্য ও লালসা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেই না। তারা নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী, দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞচিত্ততার সঙ্গে আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয়কারী। এই ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাই অবশেষে তাদেরকে নিয়ে যাবে জান্নাতে।

হাবীব সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড বিস্ময়কর। তাদের প্রতিটি কর্মই কল্যাণার্জক। তারা দুঃখে ধৈর্যধারণকারী এবং সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তাই তাদের জীবনের সম্পূর্ণ পরিসর কল্যাণমণ্ডিত। এমতো বক্তব্যের অনুকূল ওই আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে 'সকল মানুষ রয়েছে ধ্বংসের মধ্যে, তারা ব্যতীত, যারা বিশ্বাস করে, সত্যাধিষ্ঠিত থাকে এবং অবলম্বন করে ধৈর্য'।

অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'ইল্লা' (ব্যতীত) ব্যতিক্রমীটি পার্থক্য নির্ণায়ক। আর ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'আল ইন্সান' সীমিতার্থক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে ব্যক্তি সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, সে-ই জন্মগতভাবে থাকে অস্থিরচিত্ত, সংকীর্ণচেতা, লোভী। বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা কখনো এরকম নয়। তারা নামাজ আদায় করে, এখতিয়ার করে সবর এবং শোকর। উল্লেখ্য, এরকম হয় আসলে প্রত্যেকের উৎসস্থলের (মাব্দায়ে তাইয়ুনের) প্রভাবে। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ বলেছেন, আল্লাহ্র নামসমূহই হচ্ছে তাদের উৎসস্থল এবং তাদের প্রতিপালনকারী হচ্ছে আল্লাহ্র গুণসমূহ। যেমন 'হাদী' (হেদায়েত দানকারী) হচ্ছে বিশ্বাসীদের উৎসস্থল। আর অবিশ্বাসীদের উৎসস্থল হচ্ছে 'আল মুদ্বিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী)। প্রত্যেকের পার্থিব জীবনে প্রতিভাসিত হয় তাদের আপন আপন উৎসস্থলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। তাই এখানে কেউ হয় ইমানদার, কেউ কাফের।

রসুল স. বলেছেন, মানবজাতি যেনো বিভিন্ন খনি। খনি হয় সোনা, চাঁদি ও অন্যান্য অনেককিছুর। তাই মূর্খতার যুগে যে শ্রেষ্ঠ, ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী যুগেও সে উত্তম।

মাতা মহোদয়া আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কিছুসংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের জন্য। তারা জান্নাতপ্রাপ্তির যোগ্যতাসম্পন্ন থাকে তাদের পিতৃপৃষ্ঠের অবস্থানের সময়েই। আবার কিছুসংখ্যক মানুষকে তিনি বানিয়েছেন জাহান্নামের জন্য। তারাও তাদের পিতৃপৃষ্ঠে থাকতেই যোগ্যতাধারী হয় জাহান্নামের। মুসলিম। এধরনের কথা বলা হয়েছে আরো অনেক হাদিসে। যেমন— ১. যদি তোমাকে বলা হয়, অমুক পাহাড় স্থানচ্যুত হয়েছে, তবুও তা হয়তো হবে বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু যদি শোনো, অমুক ব্যক্তি তার স্বভাব বদলিয়েছে, তবে তা বিশ্বাস কোরো না। ২. কেউ কেউ সারাজীবন ধরে সম্পাদন করে চলে জান্নাতানুকূল কর্ম। এভাবে এমন অবস্থায় সে পৌঁছে যে, জান্নাত ও তার মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র এক বিঘত। এমতাবস্থায় তকদীর তার উপরে প্রবল হয়। ফলে সে এমন অপকর্ম করে, যার ফলে পণ্ড হয়ে যায় তার সকল পুণ্যকর্ম। শেষে সে পৃথিবী পরিত্যাগ করে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে। আবার কিছুসংখ্যক লোক সারা জীবন ধরে অপকর্ম করে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার এবং জাহান্নামের মধ্যে পার্থক্য থাকে মাত্র এক বিঘত। হঠাৎ

তকদীর তাকে প্রভাবান্বিত করে। ফলে সে শুরু করে শুভজীবন এবং সে পৃথিবী থেকে চলে যায় জান্নাতে গমনের যোগ্য হয়ে। উল্লেখ্য, তকদীরের ভালো-মন্দের উপরে বিশ্বাস রাখার নাম ইমান।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত'। একথার অর্থ— যারা নামাজে তাদের দৃষ্টিকে নিয়ত নিবদ্ধ রাখে সেজদার স্থলে, আর হৃদয়কে একাগ্র রাখে কেবল আল্লাহ্র দিকে। সুরা মু'মিনুনের এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন, 'যারা তাদের নামাজে থাকে বিনয়াবনত'। ৩৪ সংখ্যক আয়াতেও বলা হয়েছে 'এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান'। কিন্তু সেখানকার বক্তব্য ভিন্ন। এখানে বলা হয়েছে নামাজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা সাধন করার কথা। 'সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত' থাকার মর্মার্থ— এটাই।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, আবুল খায়ের একবার হজরত উকবা ইবনে আমেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মান্যবর রসুল সহচর! 'সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত' আয়াতখানির মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, যে নামাজ পাঠকালে সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত আবু জর সূত্রে দারেমী সংকলন করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজী যতক্ষণ নামাজে মনোনিবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ও সরাসরি তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। যখন সে তার মনোযোগ ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ্ও ফিরিয়ে নেন তার বিশেষ দৃষ্টি। 'সুনানে কবীর' গ্রন্থে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. আমাকে এই মর্মে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, আনাস! নামাজে তোমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখো সেজদার স্থানে। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজ পাঠকালে এদিক সেদিক লক্ষ্য করার অর্থ নামাজকে বিনষ্ট করা। উল্লেখ্য, একাগ্রচিত্ততাসহ নামাজ পাঠের অনুষঙ্গ হিসেবে সেজদার স্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার বিষয়টি অত্যন্ত মূল্যবান।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে (২৪) যাচনাকারী ও বঞ্চিতের'(২৫)। একথার অর্থ— তারা সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত তো থাকেই, তদুপরি পরিপূরণ করে যাচনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার। অর্থাৎ জাকাত গ্রহিতাদের যে প্রাপ্য তার সম্পদের মধ্যে রয়েছে, সে প্রাপ্য যে পরিশোধ করে যথারীতি।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে (২৬)। আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত—(২৭) নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে নিঃশংক থাকা যায় না' (২৮)। একথার অর্থ— আর তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মহাবিচারের দিবসে প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবেই। সেকারণেই তো তারা পার্থিব দুখ-সুখে চঞ্চল ও কৃপণ হয় না। ধারণ করে ধৈর্য, পালন করে কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্র

অসন্তোষ ও শাস্তির ভয়ে এখন থেকেই সুসম্পন্ন করতে থাকে নামাজ-জাকাত ও অন্যবিধ নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি। কেননা তারা একথাও ভালোভাবে জানে ও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। সকল প্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকেও তিনি চিরপবিত্র। সুতরাং যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী, তারা কিছুতেই তার কৃত পুণ্যকর্মের উপরে নির্ভরশীল হতে পারে না। হতে পারে না তাঁর অসন্তোষ ও শাস্তির ব্যাপারে নিঃশঙ্কচিত্ত।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে (২৯), তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না—(৩০) তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী' (৩১)।

এখানকার 'ফুরূজ্ব' শব্দটি 'ফরজ্ব' এর বহুবচন। এর অর্থ পুরুষ ও নারীদের যৌন অঙ্গ। যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে অর্থ নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে রতিকর্ম সম্পাদন করে না, করে বৈধভাবে। আপন স্ত্রী অথবা নিজস্ব ক্রীতদাসীর সঙ্গে।

'ইল্লা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম আও মা মালাকাত আইমানুহুম' অর্থ তাদের পত্নী অথবা অধিকারভূত দাসী ব্যতীত। ব্যতিক্রমীটি এখানে পার্থক্যসূচক। আর 'আ'লা' (উপর) অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' (হতে) অর্থে। এভাবে বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত হবে আগের 'সংযত রাখে' কথাটির সঙ্গে। যেমন বলা হয়— 'আহ্ফিজ আ'লা ইনানি ফারাসী' (আমার ঘোড়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকো)। এখানে 'আ'লা' ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অর্থে। অথবা 'আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' বাক্যটি এখানে অবস্থা প্রকাশক। আর 'আ'লা' এখানে স্বঅর্থেই ব্যবহৃত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা সর্বাবস্থায় তাদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। ব্যতিক্রম কেবল স্বামী ও স্ত্রী। কেননা স্বামী-স্ত্রীর রতিবিহার বৈধ।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি, সে মুক্ত হোক, অথবা হোক ক্রীতদাস। সেকারণে আরবী ভাষায় মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'মান' সর্বনামটি। কিন্তু দেখা যায় ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে এখানে সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা'। অথচ 'মা' সর্বনাম ব্যবহার করা হয় বিবেকহীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। এরকম করার কারণ হচ্ছে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা বিবেকসম্পন্ন হলেও স্বাধীন নয়। সেদিক থেকে তারা বিবেকহীন সৃষ্টির মতোই। তাদেরকে জীবনযাপনও করতে হয় তাদের মালিকের ইচ্ছায়। 'তারা হবে সীমালংঘনকারী' অর্থ স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে রতিকর্ম করলে তা হবে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেননা তা স্পষ্টতই শরিয়ত লংঘন। আর এখানে 'মালাকাত' কথাটির অর্থ করা হয়েছে কেবল ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস নয়। কেননা ক্রীতদাসকে সম্ভোগ করা যায় না। এ সম্পর্কে যথাব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে সুরা বাকারায় 'ইয়াসআলূনাকা আনিল মাহিদ্ব' আয়াতের তাফসীরে।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ 'মা মালাকাত আইমানুহুম' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী উভয়েই। সুতরাং বুঝতে হবে উভয়কে কাজকর্মে ব্যবহার করা বৈধ। তাহলে হাদিস কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে কথাটির অন্যরকম ব্যাখ্যা করা হবে কেনো? কেনো বলা হবে, ক্রীতদাসী সম্ভোগ্যা, অথচ ক্রীতদাস সম্ভোগ্য নয়?

জবাব ঃ আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আলোচ্য আয়াত সাধারণার্থক নয়, বিশেষার্থক। তাছাড়া স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকেও তো সব সময় সম্ভোগ করা যায় না। যেমন ঋতুবতী অবস্থায়, জেহার অবস্থায়। দুধ সম্পর্কীয় ক্রীতদাসীর সঙ্গেও সহবাস অসিদ্ধ। এ সকলক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে একক বর্ণিত হাদিস ও কিয়াস (তুল্যমূল্যতা) দ্বারা। কোরআনের সাধারণ বিধানকে এভাবে সুনির্দিষ্ট করা সিদ্ধ। আবার মহিলা মালিকও তার ক্রীতদাসের সম্ভোগ্যা হতে পারবে না। কেননা তা হবে এখানকার 'আ'লা' (উপরে) কথাটির বিপরীত। অর্থাৎ মনিবের মর্যাদা সব সময় গোলামের উপরেই থাকবে, নিচে কখনোই নয়।

'ফাইন্নাহুম গইরু মালূমীন' অর্থ এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। অর্থাৎ স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকে সম্ভোগ করা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং প্রশংসনীয়। তবে এমতাবস্থাতেও তাদেরকে হতে হবে ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবপরবর্তী অপবিত্রতা (নেফাস) থেকে পবিত্র।

'তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী' অর্থ স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীকে কামসহচরীরূপে কামনা যদি কেউ করে, সে অবশ্যই শরিয়তের দৃষ্টিতে হবে অপরাধী। রসুল স. বলেছেন, পর নারী দেখে যদি কেউ চঞ্চল হয়ে পড়ে, তবে তার উচিত তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। কেননা তার কাছে যা আছে, তা আছে এর কাছেও। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারেমী।

একটি পর্যালোচনা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আরো প্রমাণিত হয়, মুতআ (সাময়িক বিবাহ) অবৈধ। কেননা এধরনের রমণী স্ত্রী ও ক্রীতদাসী কোনোটাই নয়। স্ত্রী হলে তার সন্তানেরা তাদের পিতার সম্পত্তির অংশীদার হতো। কিন্তু তাতো তারা হয় না। যারা মুতআকে সিদ্ধ বলে, তাদের মতেও হয় না। সুতরাং মুতআকৃত রমণী স্ত্রী নয়, ক্রীতদাসীও নয়। অতএব মুতআ নাজায়েয।

আলোচ্য আয়াত থেকে বাগবী এই প্রমাণটিও উদ্ধার করেছেন যে, হস্তমৈথুনও অবৈধ। অন্যান্য আলেমও এরকম বলেন। আতার উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, হস্তমৈথুন মাকরূহ্। আতা এরকমও বলেছেন যে, আমি শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক মহাবিচারের দিবসের মহাসমাবেশে উপস্থিত হবে গর্ভবতী হস্ত নিয়ে। আমার মনে হয়, তারাই হস্তমৈথুনকারী। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আল্লাহ্পাক ওই লোকদেরকে শাস্তি দিবেন, যারা তাদের লজ্জা স্থান নিয়ে খেলা করে। আমি বলি, এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, যে স্বীয় হস্তের সঙ্গে বিবাহকর্ম করে, সে

অভিসম্পাতগ্রস্ত। ইজদী হাদিসটি সংকলন করেছেন তাঁর 'জুয়াফা' গ্রন্থে। ইবনে জাওজী তাঁর 'জুযীয়াত' গ্রন্থে হাসান ইবনে আরাফা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, সাত ধরনের ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টি দিবেন না। তন্মধ্যে এক ধরনের হচ্ছে হস্তমৈথুনকারী। অবশ্য বর্ণনাটির সূত্রপ্রবাহ শিথিল।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾

r এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,
r আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্যদানে অটল,
r এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান—
r তাহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে'। আমানত রক্ষা করার অর্থ গচ্ছিত বস্তু যথাযথভাবে তার মালিককে ফেরত দেওয়া। আল্লাহ্র দেওয়া আমানতও রক্ষা করতে হয় মানুষকে। তাঁর বিধানও আমানত। সুতরাং তাদেরকে নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত যেমন পালন করতে হবে, তেমনি বিরত থাকতে হবে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। আমাদের অস্তিত্ব অঙ্গ-প্রতঙ্গ-শরীর-আত্মা এ সকলকিছুও আল্লাহ্র দেওয়া আমানত। সুতরাং এসকলকিছুকেও সতত রাখতে হবে তাঁর সন্তোষ ও স্মরণানুকূল। পরিতুষ্ট থাকতে হবে তিনি যেভাবে রাখেন, সেভাবেই। বিপদে অবলম্বন করতে হবে ধৈর্য এবং সচ্ছলতায় কৃতজ্ঞতা। মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির বেলাতেও আমানত রক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

'প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে' অর্থ তারা যেমন পূরণ করে আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, তেমনি পরিপূরণ করে মানুষের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিও। আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার অর্থ ওই অঙ্গীকার যা সম্পাদিত হয়েছিলো রূহের জগতে, পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে। আল্লাহ্ তখন বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালনকর্তা নই? সকলে বলেছিলো, অবশ্যই। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়েও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করা কপটাচারীদের বৈশিষ্ট্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকদের স্বভাববৈশিষ্ট্য তিনটি— মিথ্যা বচন, প্রতিশ্রুতি চূর্ণন, গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাত। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— যদিও সে নামাজ-রোজা করে এবং দাবি করে, সে মুসলমান।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি অপবৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে, সে অবশ্যই মুনাফিক। একটি পাওয়া গেলে সে মুনাফিক এক চতুর্থাংশের, যতোক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে। ওই চারটি অপবৈশিষ্ট্য হচ্ছে— মিথ্যাবাদিতা, আমানতের খেয়ানত, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, অশ্লীল কথন।

আবু দাউদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবীল হুমাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন রেসালতের দায়িত্ব পাননি, তখন তাঁর সঙ্গে আমার ক্রয়-বিক্রয় হতো। একবার একস্থানে তাঁকে আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, আমি একটু পরেই ফিরে এসে আপনার পাওনা পরিশোধ করে দিবো। আমি বাড়িতে এসে কথাটা ভুলেই গেলাম। মনে পড়লো তিন দিন পর। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম রসুল স.কে। তিনি স. শুধু বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিলে। তিনদিন ধরে আটকে রাখলে।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আর যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল'। এখানে 'সাক্ষ্যদানে অটল' অর্থ যারা সাক্ষ্যের মধ্যে কোনো রদবদল ঘটায় না, সাক্ষ্য গোপন করে না আংশিক কিংবা সামগ্রিকভাবে। সাক্ষ্যেরও রয়েছে দু'টি দিক— একটি সম্পৃক্ত আল্লাহ্র আধিকারের সঙ্গে এবং অপরটি অধিকারের সঙ্গে বান্দার। যেমন আল্লাহ্র এককতত্ত্বজ্ঞাপক সাক্ষ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্', রেসালতের সাক্ষ্য 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'; চাঁদ দেখার সাক্ষ্য, আল্লাহ্র কোনো বিধান কার্যকর করা সম্পর্কিত সাক্ষ্য ইত্যাদি। আর বান্দার অধিকার সম্পৃক্ত সাক্ষ্য হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়, দেনা-পাওনা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি বিষয়ক সাক্ষ্য। অর্থাৎ উভয়বিধ সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যারা এমতো অটল থাকে যে, লোকনিন্দা বা লোকরঞ্জন কোনো কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না, সে সাক্ষ্য পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজেদের বিরুদ্ধে গেলেও।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান'। একথার অর্থ— আর যারা নামাজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ সৌন্দর্যের প্রতি থাকে সতত সতর্ক। নামাজ পাঠ করে একাগ্রচিত্তে, সঠিক সময়ে, ফরজ, সুন্নত, মোস্তাহাব সকল নিয়মকানুনের যথাবাস্তবায়নসহযোগে। উল্লেখ্য, এখানে নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে দু'বার। একবার ২২ সংখ্যক আয়াতে এবং আর একবার আলোচ্য আয়াতে। দুই স্থানে আলোচনার ধরন পৃথক। আর বারংবার বিষয়টি উল্লেখ করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভ অপেক্ষা নামাজই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে'। একথার অর্থ— এতোক্ষণ ধরে যে সকল শুভ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হলো, সে সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যারা, তারাই চিরসুখময় জান্নাতে হবে সম্মানিত।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ
الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ
نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِرَبِّ
الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ
وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى
يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ
سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

q কাফিরদের হইল কি যে, উহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে

q দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে, দলে দলে।

q উহাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে দাখিল করা হইবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?

q কখনো না, আমি উহাদিগকে যাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা উহারা জানে।

q আমি শপথ করিতেছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির— নিশ্চয়ই আমি সক্ষম

q উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে উহাদের স্থলবর্তী করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নহি।

q অতএব উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

q সেদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে দ্রুতবেগে, মনে হইবে উহারা কোন কোন উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে

q অবনত নেত্রে; হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; ইহাই সেই দিন, যাহার বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল উহাদিগকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফা মা লিল্ লাজীনা কাফারূ'। এর অর্থ কাফেরদের কী হলো? তারা এমন করছে কেনো? এখানকার 'ফামা' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। আর 'মা' প্রশ্নবোধক। এভাবে কথাটির মাধ্যমে এখানে শাসানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। বাগবী লিখেছেন, তাদের একটি দল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে রসুল স. এর কোরআন পাঠ শুনতে আসতো। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো অশুভ। তাই মনোযোগী তারা হতো না। বরং কোরআন নিয়ে করতো নানাপ্রকার ব্যঙ্গ-কৌতুক। তাদেরকে ধমক দেওয়ার জন্যই এখানে বলা হয়েছে কী হলো তাদের? আল্লাহ্র বাণী ও তাঁর রসুলের সঙ্গে তারা এমন আচরণ করছে কোন সাহসে?

এরপর বলা হয়েছে— 'ক্বিবালাকা মুহ্ত্বিয়ীন' (তারা বুক টান টান তোমার দিকে ছুটে আসছে)। 'মুহ্ত্বিয়ীন' অর্থ উন্নত মস্তকে বুক টান টান করে ছুটে আসা। এরকম বলেছেন বাগবী। আর 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'হাত্বুআ' 'হাত্বাআ' এবং 'হাত্বআ'ন' অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কোনো নিদিষ্ট দিকে লক্ষ্য করে অতিদ্রুততার সঙ্গে ছুটে আসা। আর 'আহত্বাআ' অর্থ ছুটে আসা বুক টান টান করে উন্নাসিকতার সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে, দলে দলে'। এখানকার 'ই'যীন' বহুবচন 'ই'যাতুন' এর। এর অর্থ পৃথক পৃথক বসতি, ডান ও বাম দিকের সকল জনপদ। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'ই'যাতুন' অর্থ দলবদ্ধ মানুষ।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল হতে হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে'?

মক্কার মুশরিকেরা পরকাল— বেহেশত-দোজখ এসকল কিছু বিশ্বাসই করতো না। আবার কখনো কখনো বলতো, পরকাল যদি থাকেও, তবে সেখানেও আমরা হবো এখানকার মতো ধনাঢ্য, কুলীন ও প্রতাপশালী। সুতরাং জান্নাত থাকলে সে জান্নাতও থাকবে আমাদেরই অধিকারে। তাদের এমতো অপবচনের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এখানে স্পষ্ট করে এই প্রশ্নটি করা হয়েছে যে, জান্নাতপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন ইমান ও সৎকর্ম। সুতরাং এপথের বিরোধিতা করে জান্নাত লাভের আশা করা কি ঠিক? এখানে 'হামযা' অক্ষরটি প্রশ্নটিকে করেছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'কখনো না, আমি তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে'। একথার অর্থ— তারা যা কামনা করে, তা দুরাশামাত্র। কখনোই তা বাস্তবায়িত হবে না। তারা তো জানেই যে, এক ফোঁটা অপবিত্র পানি থেকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদেরকে। ওই অনুল্লেখ্য সলিলবিন্দুটুকুর কী মর্যাদা রয়েছে যে, সে দাবি করতে পারে জান্নাতের। হ্যাঁ দাবি করতে পারতো, যদি ইমান আনতো এবং যাপন করতো সৎকর্মশোভিত জীবন। কিন্তু তা তো তারা করেনি। সুতরাং জান্নাত তাদের জন্য চিরনিষিদ্ধ। এখানে 'কাল্লা' অর্থ কখনো নয়। অর্থাৎ অংশীবাদীদের জান্নাতগমনের ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটবে না।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত বিশার ইবনে জাহাশ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর হাতের তালুতে তাঁর মুখের সামান্য পরিমাণ থুথু নিয়ে বললেন, আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমরা আমার পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারবে কীভাবে? তোমাদেরকে তো আমি গঠন করেছি এমনি এক তুচ্ছ বস্তু থেকে। তারপর দিয়েছি আকৃতি, প্রকৃতি, শরীর, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য। এরপর তুমি বড় হলে। হলে বস্ত্রাবৃত। শুরু করলে উপার্জন। কুক্ষিগত করলে সম্পদ। এরপর প্রাণপাখি যখন তোমার দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যাবে, তখন তো আসতেই হবে আমার সকাশে। তখন মহাসত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা ছাড়া তোমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু কী লাভ হবে তখন আমাকে স্বীকার করে। তখন ইমান গ্রহণ ও সৎকর্ম সম্পাদনের সময় নয়। তখন তো দেওয়া হবে সকলের কৃতকর্মসমূহের যথাপ্রতিফল।

অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— ইমান ও সৎকর্ম ব্যতিরেকে কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে, এরকম তো কখনো হতে পারেই না। একথা তো তোমরা ভালো করেই জানো? জানো না? আমি তো বলেই দিয়েছি— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে। হবে আমার পরিচয়ধন্য। সুতরাং এ পৃথিবীতে ইমান ও শুভ আমলসহ জীবন যাপন করা তো তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন ব্যতিরেকে তোমরা জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে কি? নিশ্চয় না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির— নিশ্চয়ই আমি সক্ষম (৪০) তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে উহাদের স্থলবর্তী করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নই' (৪১)। এখানে 'উদয়াচল ও অস্তাচল' অর্থ নক্ষত্রপুঞ্জের, অথবা সূর্য-চন্দ্রের উদয়স্থল ও অস্তস্থল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ! আমিই উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি। একক অধীশ্বর সমগ্র সৃষ্টির। সুতরাং আমি শপথ করে বলছি— কোরআন আমার বাণী এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আমারই রসুল। তোমরা একথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করো। তাহলেই হতে পারবে জান্নাতবাসী। কেনো গর্ব করো? কেনো প্রদর্শন করো উন্নাসিকতা। তোমাদের জীবন-মৃত্যু-জীবনোপকরণ সবকিছুই তো আমার অভিপ্রায় ও ক্ষমতার অধীন। আমি তো ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। তদস্থলে সৃষ্টি করতে পারি এমন মানবগোষ্ঠীকে, যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম। যারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিবে আমার বাণী ও আমার বার্তাবাহককে। তোমরা কি জানো না, অক্ষমতার স্পর্শ থেকে আমি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'অতএব তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া- কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম

রসুল! আপনি যখন জানেনই যে, আমি সতত-স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তখন অংশীবাদীদের শাস্তিদানের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমার উপরে ছেড়ে দিন। আমি তো তাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত দণ্ডদান করবোই। আপনি ব্যাপৃত থাকুন আপনার প্রচারকর্মে। আর তাদেরকে উপেক্ষা করুন। সাময়িক যে অবকাশ আমি তাদেরকে দিয়েছি, সেই অবকাশে তারা বচসা-বিবাদ ক্রীড়া-কৌতুক এই নিয়ে মেতে থাকুক। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকুক তাদের পাপের বোঝা। হোক তারা আরো অধিক শাস্তির উপযুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা কোনো উপসনালয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কবর থেকে উঠেই দৌড়াতে থাকবে মহাবিচারের সমাবেশ স্থলে, যেমন করে তারা পৃথিবীতে তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর দিকে ধাবিত হয়, কে কার আগে ভক্তি জানাবে, সেই উদ্দেশ্যে। তবে এমতো কর্ম তারা করে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে, কিন্তু তখন তারা এরকম করবে ভয়ে, বাধ্য হয়ে। এভাবেই তখন মহাশাস্তিকে অভ্যর্থনা জানাতে বাধ্য হবে তারা। কালাবী এখানকার 'নুসুব' শব্দটির অর্থ করেছেন— পতাকা, কেতন। অর্থাৎ সেনাবাহিনী যেমন তাদের পতাকাতলে একত্রিত হয়, তেমনি তারা তখন সমবেত হবে মহাসমাবেশস্থলে।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিলো তাদেরকে'। এখানে 'খশিয়াতান আব্সরুহুম' অর্থ অবনত নেত্রে, যেরকম নত দৃষ্টিতে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে লাঞ্ছিত অপরাধীরা। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে'। আর 'এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিলো তাদেরকে' বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যকে দৃঢ়তা প্রদানকারী, অথবা বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা নূহ

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়। সুরাখানি ২ রুকু এবং ২৮ আয়াতবিশিষ্ট।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَطِيْعُوْنِ ۟ۙ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۟

r নূহ্কে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসিবার পূর্বে।

r সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

r 'এই বিষয়ে যে, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর;

r 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা ইহা জানিতে!'

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ইন্না'। এভাবে এখানে গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে নবী নুহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্তের। তারপর বলা হয়েছে— 'নুহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি'। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, নবী নুহকে প্রেরণ করা হয়েছিলো কেবল তাঁর সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শনার্থে। অর্থাৎ তাঁর নবুয়ত সার্বজনীন ছিলো না। একথার সমর্থনে রয়েছে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে দান করা হয়েছে এমন পাঁচটি বিশেষত্ব, যা আমার পূর্বের কোনো নবী পাননি। যেমন— ১. আমার শত্রুরা এক মাসের পথের সমান দূরে থেকেও আমার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে ২. পৃথিবীর সকল স্থানের মৃত্তিকাকে আমার জন্য করা হয়েছে মসজিদ, তাই আমার উম্মত পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠ করতে পারে ৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে কেবল আমার ও আমার উম্মতের জন্য ৪. আমাকে দেওয়া হয়েছে মহাশাফায়াতের অধিকার ৫. পূর্ববর্তী নবীগণকে পাঠানো হয়েছিলো তাঁদের আপন আপন সম্প্রদায়ের লোকদের পথপ্রদর্শনার্থে। আর আমি প্রেরিত হয়েছি বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনের জন্য। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা। সেখানে আবার শাফাআতের উল্লেখ নেই। তৎপরিবর্তে বলা হয়েছে— আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র সৃষ্টির জন্য। আর আমাতেই সমাপ্ত করা হয়েছে নবুয়তের প্রবাহ।

এখানকার 'আরসালনা' (আমি প্রেরণ করেছিলাম) কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে 'এই নির্দেশসহ' বা 'একথা জানাতে' বক্তব্যটি। সেই নির্দেশনাটি বা কথাটি পরক্ষণে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে— 'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসবার পূর্বে'। অর্থাৎ আমি নবী নুহকে এই মর্মে

নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলো। তৎসহ একথা বলে সতর্ক করে দাও যে, ইমান না আনলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ইহ-জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তি— মহাপ্লাবন ও নরক। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আন্' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে একটি উহ্য বাক্য 'আমি বলেছিলাম'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি নুহকে বলেছিলাম, তুমি তোমার স্বজাতিকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করো।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী— (২) এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো ও তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো' (৩)। একথার অর্থ— নবী নুহ আমার নির্দেশ যথারীতি পালন করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! আমি তোমাদের সুহৃদ, সতর্ককারী, পথপ্রদর্শক। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোনো। বিগ্রহ-বন্দনা ছেড়ে দিয়ে উপাসনা করো কেবল আল্লাহ্র। ভয় করো কেবল তাঁকেই। কেননা তিনি মহাসৃজয়িতা, মহাপ্রভুপালয়িতা এবং সকলের কৃতকর্মের হিসাবগ্রহীতা।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র প্রতি ইমান আনলে এবং কেবল তাঁর উপাসনা করলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আর আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি তোমাদেরকে শাস্তিদান করবেন না যথাসময় সমাগত না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু অবকাশ তোমাদেরকে যতোই দেওয়া হয়, অবশেষে তোমরা শাস্তিকবলিত হবেই। সুতরাং সতর্ক হও। এই ক্ষণে মান্য করো আমার উপদেশ।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললাম; হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! হস্ত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি স. বললেন, কী ব্যাপার আমর! হাত গুটিয়ে নিলে কেনো? বললাম, আমি একটি শর্ত আরোপ করতে চাই। তিনি স. বললেন, কী শর্ত? আমি বললাম, আমার পাপসমূহ যেনো মার্জনা করা হয়। তিনি স. বললেন, আমর! তুমি কি জানো না, ইসলাম পূর্বের পাপসমূহকে ঢেকে ফেলে। হিজরত ও হজ্ব বিলোপ করে দেয় অতীতের পাপরাশি। মুসলিম।

হজরত মুয়াজ বলেছেন, আমি রসুল স. এর বাহনে সহআরোহী ছিলাম তাঁর এক প্রবাসযাত্রায়। তিনি সামনে। আমি তাঁর পশ্চাতে। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ছিলো কেবল গদির কাষ্ঠখণ্ডটুকু। তিনি স. বললেন, মুয়াজ! তুমি কি জানো, আল্লাহ্র উপর বান্দার এবং বান্দার উপর আল্লাহ্র অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন,

বান্দার উপরে আল্লাহ্‌র অধিকার হচ্ছে, সে ইবাদত করবে কেবল তাঁর। অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে তাঁর সমকক্ষ বা অংশীদার নির্ধারণ করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দার অধিকার হচ্ছে, তাঁকে যারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! আমি কি জনগণকে এই শুভসমাচারটি জানাবো? তিনি স. বললেন, না। একথা জানলে তারা এটাকেই যথেষ্ট মনে করবে (আমল করবে না)। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। জ্ঞান গোপন করার অপরাধে অপরাধী হন কিনা, এই ভয়ে তাঁরা এই হাদিস প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের অন্তিম যাত্রার কিছুকাল পূর্বে।

এখানকার 'মিন জুনূবিকুম' বাক্যের 'মিন' অব্যয়টি বিবৃতিমূলক। তাই কথাটির অর্থ হবে— তিনি ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের সকল অপরাধ। অথবা 'মিন' এখানে আংশিকার্থক। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তিনি মাফ করে দিবেন তোমাদের ওই সকল গোনাহ্, যা সম্পৃক্ত তাঁর অধিকারের সঙ্গে, কিন্তু বান্দার অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত গোনাহ্ তিনি মাফ করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিতকাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা এটা জানতে'।

প্রকাশ থাকে যে, তকদীর দুই রকমের— আল মুবরাম (অটল) এবং আল মুআ'ল্লাক (পরিবর্তনশীল)। পরিবর্তনশীল নিয়তি এরকম, যেমন— অদৃষ্ট-লিপিতে লেখা রয়েছে, বকর যদি আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকে, তবে এতোদিন পর্যন্ত সে সুরক্ষিত থাকবে, আর অবাধ্য হলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে জীবনসংহারক ঝড়ে।

শর্ত বিলুপ্ত হলেই কেবল পরিবর্তনশীল নিয়তি কার্যকর হয়। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা বিলোপ করে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন, তা রাখেন প্রতিষ্ঠিত'। হজরত সালমান ফারসী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই নিয়তির বিধানকে টলাতে পারে না। আর আয়ু বৃদ্ধি পায় পুণ্যকর্মের দ্বারা। তিরমিজি। অটল নিয়তি সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র বাণী কখনো পরিবর্তিত হয় না'। অবশ্য অটল নিয়তি অনুসারে যখন নির্ধারিত কাল উপস্থিত হয়, তখন তা টলটলায়মান হওয়া অসম্ভব। এরকম সিদ্ধান্তের কখনো অগ্র-পশ্চাৎ ঘটে না। আবার পরিবর্তনশীল নিয়তিও অটল হয়ে যায়, যখন বিলুপ্ত হয় তার শর্ত। তাই আল্লাহ্‌র আনুগত্যকেই আশ্রয় করা উচিত। পরিহার করা উচিত অনানুগত্য। নতুবা পরিবর্তনশীল নিয়তিও রূপান্তরিত হবে অটল নিয়তিতে। তখন আত্মরক্ষার আর কোনো উপায়ই থাকবে না।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ আয়ু সুনির্ধারিত। তার কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এমনকি একজন নিহত ব্যক্তিও পূর্ণ করে তার আয়ুষ্কাল। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে,

পুণ্যকর্ম আয়ুবৃদ্ধির উপলক্ষ। এর অর্থ কী? এখানে আয়ু বৃদ্ধি অর্থ কি আয়ুর বরকত বৃদ্ধি, না বৃদ্ধি সময়? আয়ুর হ্রাস-বৃদ্ধির এরকম ধারণাটি কি মুতাজিলাদের অভিমত সদৃশ নয়?

জবাব ঃ পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা তো তকদীরকেই বিশ্বাস করে না। তারা তো মনে করে মানুষই তার ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা। এ হিসেবে হন্তারক নিজেই হয়ে যায় নিহত ব্যক্তির আয়ুর নিয়ন্তা। তকদীর বলে তো তাহলে আর কোনোকিছুই থাকেই না। আমরা তো মান্য করি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমতকে— যা নির্ভুল। আমরা বিশ্বাস করি— আয়ুষ্কাল অনড়, এর মধ্যে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এটাই অটল নিয়তি। এর পরিবর্তন অসম্ভব। নিহত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে ওই অটল নিয়তি অনুসারেই। তবে হতে পারে, পরিবর্তনশীল নিয়তিতে হয়তো একথা লেখা ছিলো যে, অমুক ব্যক্তি যদি তাকে হত্যা করে, তবেই কেবল তার মৃত্যু হবে, অন্যথায় নয়। অথবা লেখা ছিলো, অমুক সময় অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করবেই। বেঁচে থাকার কোনো উপায়ই সে তখন পাবে না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ওই হাদিসটিও আর অবোধগম্য থাকে না, যা বর্ণিত হয়েছে আবু খুজামা কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে এভাবে— একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কিছু দোয়া কালাম পড়ে মানুষের রোগ নিরাময় করি। উপকৃত হই আমি নিজেও। আমার এ কাজ কি নিয়তিবিরোধী। তিনি স. বললেন, আরে ভাগ্যলিপি তো এটাই। এটাই তকদীর। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তকদীরে লেখা রয়েছে, অমুক ব্যক্তি যদি এই নিয়মে অমুকের চিকিৎসা করে, তবে সে আরোগ্য লাভ করবে।

'লাও কুনতুম তা'লামূন' অর্থ যদি তোমরা এটা জানতে। অর্থাৎ যদি তোমরা একথা বুঝতে পারতে যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক নিরাপত্তা, রয়েছে পাপ মুক্তির নিশ্চয়তা, তাহলে তোমরা কিছুতেই হতে পারতে না স্বেচ্ছাচারী। বিশ্বাস স্থাপন করতে আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নুহ নবুয়তের গুরুদায়িত্ব লাভ করেছিলেন তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমকালে। আর মহাপ্লাবনের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন আরো ষাট বৎসর। মুকাতিল বলেছেন, তিনি নবুয়ত পেয়েছিলেন এক শত বৎসর বয়সে। পঞ্চাশ বৎসর এবং দুই শত বৎসরের কথাও বলেছেন কেউ কেউ। তাঁর আয়ুষ্কাল ছিলো এক হাজার চারশত পঞ্চাশ বৎসর। আর তিনি সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুদীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বৎসর ধরে।

জুহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত নূহকে যখন তখন প্রহার করতো। তিনি সজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন। ফলে কখনো কখনো মৃত ভেবে লোকেরা তাঁকে কম্বলে পেঁচিয়ে রেখে আসতো তাঁর গৃহে। তবুও তিনি জ্ঞান ফিরে পেলে দোয়া করতেন তাদের পথপ্রাপ্তির জন্য। নিরলসভাবে চালিয়ে যেতেন তাঁর প্রচারকর্ম।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, উবায়েদ ইবনে ওমর লাইছি বলেছেন, দুরাচারেরা তাঁকে গলা চেপে ধরতো। ফলে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন। তারা তখন তাঁকে ফেলে অন্যত্র গমন করতো। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তিনি আবার তাদের জন্যই প্রার্থনা করতেন। বলতেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালক! তুমি আমার সম্প্রদায়কে মার্জনা করো। এরা অবুঝ। এভাবে দীর্ঘদিন গত হলো। তবুও তাদের চৈতন্যোদয় ঘটলো না। এলো তাদের পরবর্তী বংশধরেরা। তারাও অনুসরণ করলো তাদের পিতৃপুরুষদের পঙ্কিল পথ। বরং তারা হজরত নুহের বিরোধিতা করলো আরো নিকৃষ্টভাবে। তাদের পরের প্রজন্ম হলো আরো অধিক দুরাচার। হজরত ক্লান্ত হলেন। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে অবসন্ন হয়ে পড়লেন আল্লাহ্‌র নবী। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলো তাঁর সকল উদ্যম। কতোভাবে কতো দরদ দিয়ে যে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর সেই শুভ প্রচেষ্টার কিছু নমুনা।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّ نَهَارًا ۙ﴿۵﴾ فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِیْۤ اِلَّا فِرَارًا ﴿۶﴾ وَ اِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَ اَصَرُّوْا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ﴿۷﴾ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ﴿۸﴾ ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ﴿۹﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ﴿۱۰﴾ یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ یُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِیْنَ وَ یَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ یَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ﴿۱۲﴾

r সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমিতো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্‌বান করিয়াছি,

r 'কিন্তু আমার আহ্‌বান উহাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে।

r 'আমি যখনই উহাদিগকে আহ্‌বান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর, উহারা কানে অংগুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজদিগকে ও জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

r 'অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্‌বান করিয়াছি প্রকাশ্যে

r ‘পরে আমি উচ্চৈস্বরে প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।’

r বলিয়াছি, ‘তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল,

r ‘তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন,

r ‘তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ’ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা শেষে নবী নূহ যখন উদ্যমহারা হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর আকুতি উপস্থাপন করলেন এভাবে— হে আমার পরম প্রভুপালনকর্তা! আমি তো তাদের চৈতন্যোদয়ার্থে বিরতিহীনভাবে চেষ্টা চালিয়ে এলাম। কিন্তু তারা আমার নিকট থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগলো। এখন তো তারা আমার দিকে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করে না। এখন আমি কী করবো?

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি, যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তারা কানে আঙ্গুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জেদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে’। একথার অর্থ— আমি তো উদাত্ত কণ্ঠে পরম আপনজন জ্ঞানে তাদেরকে তোমার পথে আহ্বান জানিয়েছি। তোমা সকাশে তাদের জন্য মার্জনার সুপারিশ করেছি বার বার। কিন্তু তারা তবুও এক চুল নড়েনি তাদের অশুভ অংশীবাদিতা থেকে। আমার কথা শুনে তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকেছে, প্রকাশ করেছে চরম একগুঁয়েমি ও অতিশয় ঔদ্ধত্য।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে’। এখানে ‘জ্বিহারান’ অর্থ প্রকাশ্যে। শব্দটি ‘যবর’ যুক্ত করা হয়েছে এজন্য যে, প্রকাশ্য আমন্ত্রণ হচ্ছে এক প্রকারের বিশেষ আহ্বান। অথবা শব্দটি একটি অনুক্ত ধাতুমূলের বিশেষণ। আর ‘জ্বিহার’ হচ্ছে কর্মপদী শব্দরূপের অর্থ প্রদায়ক। অর্থাৎ তাদের প্রতি আমার আমন্ত্রণ ছিলো প্রকাশ্য আমন্ত্রণ। অথবা শব্দটি কর্তৃপদীয় শব্দরূপের অর্থসম্পন্ন ধাতুমূলের অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ আমি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি প্রকাশ্যে।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘পরে আমি উচ্চস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে’। বাক্যের শুরুতে এখানে ‘ছুম্‌মা’ (পরে, অতঃপর) ব্যবহৃত হয়েছে প্রচারকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রকাশার্থে। অপ্রকাশ্য আমন্ত্রণ অপেক্ষা প্রকাশ্য আমন্ত্রণ অধিক গুরুত্ববহ। তাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকাশ্য আমন্ত্রণের কথা এভাবে ‘পরে আমি উচ্চস্বরে প্রচার করেছি’। পরে বলা হয়েছে ‘উপদেশ দিয়েছি গোপনে’। উল্লেখ্য, উভয় প্রকার আমন্ত্রণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ হজরত নুহ এখানে বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে তিনি কোনো প্রকার প্রচেষ্টাই বাকী রাখেননি।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহাক্ষমাশীল'। বাগবী লিখেছেন, হজরত নুহের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর আহবানকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করতেই লাগলো। বার বার ব্যর্থতার আঘাত খেয়ে মুষড়ে পড়লেন হজরত নুহ। তখন আল্লাহ্ বন্ধ করে দিলেন বৃষ্টিপাত। রহিত করে দিলেন ললনাকুলের জন্মদান যোগ্যতা। এভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের সম্পদ, পশুপাল। রুদ্ধ হলো প্রজন্মায়ণ প্রক্রিয়া। হজরত নুহ বললেন, হে জনতা! অবাধ্যতা পরিত্যাগ করো। কৃত পাপরাশি থেকে করো সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন। ক্ষমাপ্রার্থী হও পরম প্রভুপালক সকাশে। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। তিনি যে মহাক্ষমাপরবশ।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন'। এখানে 'মিদরারা' অর্থ প্রচুর জলবাহী মেঘপুঞ্জ। শব্দটি 'সামাআ'র (আকাশের) অবস্থাপ্রকাশক। আর এটি হতে পারে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় প্রকার বিশেষ্যের বিশেষণ। আলোচ্য প্রসঙ্গের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অবাধ্যতা পরিত্যাগ ও ক্ষমাপ্রার্থনা বিপদ দূরীভূত হওয়ার উপলক্ষ। পার্থিব বিপদ-আপদ আপতিত হয় অবশ্য উগ্র পাপাচরণের কারণেই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমাদের উপরে আপতিত হয়েছে বিপদ, সে-তো তোমাদেরই স্বহস্তার্জিত'। তবে যে সকল বিপদ আপতিত হয় অধিকতর মর্যাদা প্রদানার্থে, তা কখনো ক্ষমাপ্রার্থনা বা অন্য কোনো কারণে রহিত হয় না। এধরনের বিপদ আপতিত হয় কেবল নবী-রসুলগণ এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী পুণ্যবানগণের উপর। যেমন ঘটেছিলো হজরত আইয়ুব ও অন্যান্য নবীগণের উপর।

হজরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিপদের বোঝা সবচেয়ে বেশী বহন করতে হয় নবী-রসুলগণকে। তৎপর তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদাধারীগণকে। এরপর তদপেক্ষা নিম্ন মর্যাদাবিশিষ্টদেরকে। আর পাপীদের বিপদ-আপদ তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া অপসারিত হয় না। আহমদ, বোখারী, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

বোখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে জনৈকা উম্মতজননী সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এ জগতে সবচেয়ে বেশী সংকটাপন্ন হন নবী ও ওলীগণ। হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে মাজা ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উপহার পেলে তোমরা যেমন উৎফুল্ল হও, তেমনি উৎফুল্ল হন নবীগণ বিপদাপন্ন হলে।

উল্লেখ্য, অনাবৃষ্টি একটি সাধারণ বিপদ। জনসাধারণের পাপের কারণেই আপতিত হয় এই সাধারণ মুসিবতটি। সেকারণেই শরিয়তে বিধান রয়েছে বৃষ্টি প্রার্থনার (ইসতেসকার) নামাজের। শা'বীর উক্তি উল্লেখ করে মাতরাফ বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর একবার জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে শহরের বাইরে সমবেত হলেন। সেখানে সকলকে নিয়ে আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন শুধু।

তারপর ফিরে এলেন স্ব আবাসে। জনতা প্রশ্ন করলেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হলো না যে? তিনি বললেন, আমি তো বৃষ্টির মালিকের কাছেই প্রার্থনা করেছি। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহাক্ষমাশীল'।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা'। আতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যদি তোমরা কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ সকাশে হও ক্ষমার্থী, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করবেন আগের মতো স্বাচ্ছন্দ্য। দিবেন বিত্ত-বৈভব, সন্তান-সন্ততি। আবার তোমরা পাবে ফলের বাগান, নদী-নালা বিধৌত ফসলের ক্ষেত।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

r 'তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না!

r 'অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে,

r 'তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?

r 'এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে;

r 'তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে

r 'অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন,

r 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত—

r 'যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী নুহ তাঁর সম্প্রদায়ের জনগণকে আরো বলেছিলেন, হে জনতা! কী হলো তোমাদের? মহাকল্যাণের আহ্বানের প্রতি তোমরা কর্ণপাত করছো না কেনো? কেনো একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছো যে, আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা। তিনিই তো তোমাদেরকে সৃজন করেছেন পর্যায়ক্রমে— পিতৃপৃষ্ঠ থেকে মাতৃউদরে, শুক্রবিন্দু থেকে মানবাকৃতিতে।

এখানে 'মা লাকুম লা তারজুনা' কথাটির 'মা' প্রশ্নবোধক। আর 'ওয়াক্বারা' অর্থ— শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য, মর্যাদা। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন 'রিজ্বা' অর্থ হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, সে কথা তোমরা মানতে চাচ্ছো না কেনো? প্রকৃত প্রস্তাবে 'রিজ্বা' অর্থ আশা, যা একটি গৌণ ধারণার বশবর্তী। অর্থাৎ ধারণার প্রাবল্যই আশা। এখানে সুদৃঢ় বিশ্বাসকে 'আশা' অর্থে প্রকাশ করাতে এটাই অনুমিত হয় যে, বক্তব্যকে অধিক বেগবান করাই এখানে উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ্পাকের মাহাত্ম্য তাদের ধারণায় তেমন সুপ্রকট নয়, যেমন সুপ্রকট থাকে প্রকৃত বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে। কালাবীর নিকট এখানকার 'রিজ্বা' অর্থ ভীতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের অন্তরে কি আল্লাহ্ভীতি একেবারেই নেই? হাসান বসরী কথাটির অর্থ করেছেন— কী হয়েছে তোমাদের? তোমরা কি আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ? তাঁর অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি এতটাই অকৃতজ্ঞ? ইবনে কীসান অর্থ করেছেন— তোমরা তোমাদের উপাসনাকালে আল্লাহ্কে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য বলে মানতে চাও না কেনো? তোমরা কি এতটাই মূর্খ! কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তোমরা কি এমতো আশা একেবারেই পোষণ করো না যে, আল্লাহ্র ইবাদত করলে তিনি তোমাদেরকে এর যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেন? তোমাদেরকে করবেন সম্মানিত?

'ওয়া ক্বদ্ খলাক্বাকুম আত্বওয়ারা' অর্থ অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। অর্থাৎ জরায়ন— জন্ম-প্রবৃদ্ধি-পরিণতি-আয়ুষ্কাল-অন্তিমযাত্রা-পুনরুত্থান-প্রতিফলদিবস-বেহেশত-দোজখ— এসকল পর্যায়ে তোমাদেরকে পরিচালিত করে কে? তিনিই তো। তোমরা তো তাঁর এসকল বিধান মানতে বাধ্য। তাহলে তোমরা তাঁকে স্বীকার করতে কেনো এতো কুণ্ঠিত? তোমাদের অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব-পরিণাম যার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, তিনিই কি তোমাদের একমাত্র উপাস্য ও বিশ্বাসভাজন নন?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি লক্ষ্য করোনি, আল্লাহ্ কীভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী (১৫)? এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে' (১৬)?

এখানে ‘ত্বিবাক্বান’ অর্থ স্তরে স্তরে, একটির উপরে আর একটি। ইতোপূর্বে সপ্ত আকাশের বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরকমও বলা হয়েছে যে, এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের ব্যবধান পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান।

‘ফী হিন্না’ অর্থ সেখানে, আকাশসমূহের মধ্যে একটি আকাশে। অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। কেননা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জ রয়েছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশেই। যেমন বলা হয়, মদীনায় রসুল স. এর শুভাগমন ঘটেছিলো বনী নাজ্জারের গৃহসমূহে। অর্থাৎ ওই গোত্রের গৃহসমূহের মধ্যে একটি গৃহে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, চন্দ্র-সূর্যকে করা হয়েছে আকাশমুখী। তাই এদু'টোর কিরণ বিচ্ছুরিত হয় সেদিকেই। আর পৃথিবীতে পতিত হয় তার প্রতিফলন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

সন্দেহ ঃ সূর্যকিরণ হয় অত্যন্ত প্রখর। আর প্রদীপের আলো অতি কোমল। তাছাড়া আকারের দিক দিয়েও সূর্যাপেক্ষা প্রদীপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তাহলে এখানে প্রদীপকে সূর্যসদৃশ বলা হলো কেনো?

নিরসন ঃ শ্রোতার নিকটে প্রদীপ ব্যতীত এমন আলোকবর্তিকা তো নেই, যার সঙ্গে সূর্যকে তুলনীয় করা যায়। এরকম উপমা এখানে দেওয়া হয়েছে সেকারণেই। লক্ষণীয়, এখানে চাঁদকে বলা হয়েছে আলো, জ্যোতি, আর সূর্যকে বলা হয়েছে প্রদীপ। এতে করে একথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, চাঁদ আলো গ্রহণ করে সূর্য থেকে। কারণ আলো পাওয়া যায় প্রদীপ থেকেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা থেকে (১৭)। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন' (১৮)।

সর্বনাম উল্লেখ না করে এখানে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে ‘ওয়াল্লহু আম্বাতাকুম’। অর্থাৎ ‘তিনি’ না বলে সরাসরি বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্’। এর কারণ হচ্ছে প্রিয়তমজনের নামের উল্লেখ তাঁর সর্বনাম অপেক্ষা অধিক আস্বাদ্য। আর এখানে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন না বলে বলা হয়েছে ‘তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন’। এরকম করা হয়েছে এখানে একথা বুঝাতে যে, সৃষ্টবস্তু থেকে উদ্ভূত বস্তু হয়ে থাকে অধিক অনিত্য।

‘মিনাল আরদ্ব’ অর্থ মৃত্তিকা থেকে। অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে। অথবা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুক্রকণা থেকে, শুক্রকণা সৃষ্ট হয় আহার্যবস্তু থেকে, আর আহার্য বস্তু মৃত্তিকাজাত। আর ‘নাবাতান’ বলার উদ্দেশ্য এখানে একথা বলা যে, তোমরা সৃজিত হয়েছো আল্লাহ্তায়ালার সৃজনাভিপ্রায়ের কারণেই।

‘অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত করবেন’ অর্থ মৃত্যুর পরে তিনি তোমাদেরকে ওই মৃত্তিকার সঙ্গেই মিশিয়ে দিবেন, যে মৃত্তিকা থেকে তোমরা সৃজিত হয়েছো। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা একাকার হয়ে যাবে কবরের মাটির

সঙ্গে। আর ‘পরে পুনরুত্থিত করবেন’ অর্থ মহাপ্রলয়ের পর ঘটানো হবে তোমাদের পুনরুত্থান। তারপর বিচারার্থে সকলকে সমবেত করানো হবে হাশর প্রান্তরে। অর্থাৎ মনে রেখো, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার অবশ্যম্ভাবী। এখানে ‘ইখরাজ্বান’ হচ্ছে বেগপ্রদায়ক সাধারণ কর্মপদ। আগের আয়াতে যেমন বেগপ্রদায়করূপে ব্যবহৃত হয়েছে ‘নাবাতান’ সেখানকার ‘আমবাতাকুম’ (উদ্ভূত করেছেন) কথাটিকে বেগপ্রদানার্থে, তেমনি এখানে ‘ইখরাজ্বান’ বেগ প্রদান করেছে ‘ইউখরিজুকুম’ (পুনরুত্থিত করবেন) কথাটিকে। এভাবে এখানে এই ইঙ্গিতটি দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের জন্ম-মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি অবশ্যম্ভাবী তোমাদের পুনরুত্থান ও মহাবিচারপর্বও। সুতরাং যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকো এখন থেকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত— (১৯) যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্তপথে’ (২০)। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই ধরাপৃষ্ঠকে এমন ভাবে বিস্তৃত করেছেন, যেনো এখানে তোমাদের বসবাস ও বিচরণ হয় স্বচ্ছন্দ ও সুগম। এখানে ‘ফিজ্বাজ্বা’ অর্থ প্রশস্ত পথে। ‘ফাজ্বজুন’ এর বহুবচন ‘ফিজ্বাজুন’। এর অর্থ প্রশস্ত পথ। আর এখানে ‘মিনহা’ (যা থেকে) কথাটির ‘মিন’ (তে, হতে) অব্যয়টির মধ্যে নিহিত রয়েছে ‘গ্রহণ করা’র অর্থ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা যেনো পৃথিবীপৃষ্ঠে তোমাদের জন্য প্রশস্ত পথ তৈরী করে নিতে পারো।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَ اتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ۬ وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ۬ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ۬ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ

دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿۲۸﴾

q নূহ্ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন লোকের যাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।'

q আর উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল;

q এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক ও নাস্রকে।

q 'উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।'

q উহাদের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল এবং পরে উহাদিগকে দাখিল করা হইয়াছিল অগ্নিতে, অতঃপর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্র মুকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।

q নূহ্ আরও বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

q 'তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।

q 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী আরো বলেছিলো, হে আমার প্রভুপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে সর্বোতভাবে অস্বীকার করেছে। আমি তাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি দিন-রাত উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু তারা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেনি। আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে পলায়নপ্রবণতাকে। আমার কথা শুনে কখনো কানে আঙ্গুল দিয়েছে। কখনো নিজেদেরকে করেছে বস্ত্রাবৃত। প্রদর্শন করেছে একদেশদর্শিতা, ঔদ্ধত্য। নিরবচ্ছিন্নরূপে অনুসরণ করেছে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যে গর্বিত তাদের সমাজপতিদের, যারা পথভ্রষ্ট ও চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত যোগাযোগ রয়েছে ৫, ৬,ও ৭ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে। তাই এর মর্মার্থ উপস্থাপন করা হলো সেভাবেই। আর 'ক্বলা' (সে বলেছিলো) কথাটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। একবার বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের শুরুতে সত্যধর্ম প্রচারের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব পালনের বিবরণ প্রদানার্থে এবং আলোচ্য আয়াতের শুরুতে অবাধ্যদের জন্য অপপ্রার্থনা উপস্থাপনের পটভূমিকারূপে।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিলো'। এখানকার 'মাকারূ' (তারা ষড়যন্ত্র করেছিলো) কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'মাল্লাম ইয়াযিদ্হু' (যে তা বৃদ্ধি করেনি) এর সঙ্গে। আর 'মাল্লাম' এর 'মান' একবচন হলেও অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচন। অথবা এখানকার ষড়যন্ত্র করেছিলো' কথাটি সংযুক্ত হবে আগের আয়াতের 'অনুসরণ করেছে' এর সঙ্গে।

'কুব্বারান' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'কাবীর' থেকে। এর অর্থ— ভয়ানক, ভীষণ। অর্থাৎ ভয়ানক ষড়যন্ত্র, ভীষণ চক্রান্ত, বৃহৎ কুট কৌশল। তাদের নেতাদের কুটচক্রান্ত ছিলো, তারা নবী নুহকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতো। অনুপ্রাণিত করতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হতে। আর জনতা তাঁর উপরে অত্যাচার চালাতো বিভিন্নভাবে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের নেতা-জনতা সকলেই নবী নুহের প্রতি অত্যাচার চালাতো। করতো ভয়ানক ষড়যন্ত্র।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এবং বলেছিলো, তোমরা কখনো পরিত্যাগ কোরো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ কোরো না, ওয়াদ, সুওয়াআ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নসরকে' উল্লেখ্য, 'পরিত্যাগ কোরো না তোমাদের দেব-দেবীকে' বললেই তাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ হতো। তৎসত্ত্বেও তারা তাদের দেব-দেবীদের নাম উল্লেখ করতো তাদের গুরুত্ব প্রকাশার্থে।

মোহাম্মদ ইবনে কা'বের উক্তি উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, তাদের উপাস্যগুলো ছিলো তাদের সজ্জন পিতৃপুরুষদের কাল্পনিক মূর্তি, যাঁরা অতীত হয়েছিলেন হজরত আদম ও হজরত নুহের মধ্যবর্তী সময়ে। শয়তান তাদেরকে এই মর্মে প্ররোচনা দিয়েছিলো যে, ওই সকল সাধুপুরুষদের বিগ্রহ সম্মুখে রেখে যদি তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তবে তোমাদের ইবাদত হবে অত্যধিক আস্বাদ্য। এভাবে সে সক্ষম হলো পরের প্রজন্মকে আগের প্রজন্মের সাধুপুরুষদের বিগ্রহমূর্তির অনুরাগী হতে। এভাবে বংশানুক্রমিকভাবে চলতে লাগলো পিতৃপুরুষদের বিগ্রহমূর্তির উপাসনা। ওই মূর্তিগুলোকেই তারা বলতো দেব-দেবী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এসব নামের কিছুসংখ্যক পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন হজরত নুহের সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। তাদের তিরোধানের পর শয়তান তাদেরকে বোঝালো, তোমাদের উচিত তাঁরা যেখানে উপবেশন করতেন সেখানে তাঁদের প্রতিমা বানিয়ে তাঁদের পুণ্যময় স্মৃতি রক্ষা করা। তা-ই করলো তারা। কিন্তু মূর্তিগুলোর আরাধনা তারা করতো না। আরাধনা করতো তাদের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা। তারা ধরেই নিলো যে, সেই মূর্তিগুলোই তাদের দেবতা। তিনি আরো বলেছেন, মহাপ্লাবনে ওই মূর্তিগুলো জলমগ্ন হয়েছিলো। চাপা পড়ে গিয়েছিলো মাটির তলায়। পরে শয়তান সেগুলোকে মক্কাবাসীদের জন্য পুনরুদ্ধার করায়। এভাবে দাওমাতুল জানদালের কেলাব গোত্রের লোকেরা পূজা করতে শুরু

করে, ‘ওয়াদা’ প্রতিমাটির। ‘সুওয়াআ’ হয়ে যায় হুজাইল গোত্রের দেবতা। ‘ইয়াগূছ’ প্রথমে পূজিত হয় বনী মুররা গোত্রের লোকদের দ্বারা। পরে তার পূজারী হয় বনী আতীফেরা। তারা প্রতিমাটিকে নিয়ে চলে যায় সাবা অঞ্চলে, ‘ইয়াউকের’ উপাসনা করতো হামাদান গোত্র এবং বনী হুমাইর ভক্ত ছিলো ‘নসর’ প্রতিমার।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং জালেমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি কোরো না’। এখানে ‘তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে’ অর্থ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের দেব-দেবীগুলো, অথবা তাদের সমাজপতিরা। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে— তারা বিভ্রান্ত হওয়ার উপলক্ষ মাত্র। মূল বিভ্রান্তকারী হচ্ছে শয়তান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘হে আমাদের প্রভুপালক! ওরা আমাদের অধিকসংখ্যককে পথভ্রষ্ট করেছে’। এখানেও পথভ্রষ্টতার সম্পৃক্তি ঘটেছে রূপকার্থে, প্রকৃতার্থে নয়। অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে নয়। আর ‘জালিম’ (অত্যাচারী) অর্থ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। ‘ইল্লা দ্বলাল’ (বিভ্রান্তি ব্যতীত) কথাটির অর্থ হবে এখানে— ধ্বংস বা বিনাশ ব্যতীত। অর্থাৎ ‘বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি কোরো না’ অর্থ হবে এখানে— ধ্বংস ছাড়া তাদের জন্য অন্য কিছু নির্ধারণ কোরো না। কিংবা— তারা যতো ষড়যন্ত্রই করুক না কেনো, তাদের ষড়যন্ত্র কখনো সফল কোরো না।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিলো অগ্নিতে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী’।

এখানকার ‘মিম্মা’ (মিন্ মা) কথাটির ‘মিন’ হেতুবাচক এবং ‘মা’ অতিরিক্ত। কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে। অর্থাৎ তারা প্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিলো অত্যধিক পাপাচরণের কারণে। ‘নার’ অর্থ অগ্নি, আলমে বরজখ বা কবরের জগতের শাস্তিদায়ক আগুন। উল্লেখ্য, কবর হবে জান্নাতের একটি উদ্যান, অথবা জাহান্নামের একটি অংশ। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে এখনো অগ্নিশাস্তি দেওয়া হচ্ছে আলমে বরজখে। কেননা এখানকার ‘ফা উদখিলু’ কথাটির ‘ফা’ (অতঃপর) অব্যয়টি ত্বরিৎ অনুক্রমজ্ঞাপক। আর ‘উদখুলু’ (দাখিল করা হয়েছে) শব্দরূপটি অতীতকালবোধক। এতে করে বোঝা যায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করার পর পরই তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিশাস্তিতে, যে শাস্তি থেকে বাঁচাবে এমন কোনো সাহায্যকারী তাদের নেই। থাকতে পারেও না।

পথভ্রষ্ট মুতাজিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় আলোচ্য আয়াতকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে— পানিতে নিমজ্জিত করা এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট করার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য এখানে নেই। অতএব মনে করা যেতে পারে নিমজ্জনই এখানে অগ্নিপ্রবেশন। অর্থাৎ নিমজ্জনই এখানে অগ্নিপ্রবেশনকে করেছে

অবশ্যম্ভাবী। অতীতকালবোধক শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সে কারণেই। অথবা বলা যেতে পারে— কারণের পর কারণিকের আগমন স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ কারণ যখন বিদ্যমান, তখন কারণিক অনিবার্য। এজন্যই কারণের উল্লেখের পরক্ষণেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কারণিকের।

আমরা বলি, রূপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিরর্থক। কেননা এখানে মূল বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মূল তত্ত্ব। আর সে মূল তত্ত্বটি হচ্ছে, মৃত্যুর পর সকলকে দেওয়া হয় জান্নাতের আনন্দ অথবা জাহান্নামের শাস্তি। অসংখ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আলমে বরজখের স্বস্তি ও শাস্তির কথা। অতএব বুঝতে হবে, মৃত্যুর পর হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্রবেশ করানো হয়েছিলো আলমে বরজখের অগ্নিশাস্তিতে এবং তাদের সে শাস্তি চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এরপর সংঘটিত হবে মহাবিচার পর্ব। তারপর তাদেরকে পুনরায় প্রবেশ করানো হবে মূল দোজখের লেলিহান অনলে। আর তাদের ওই শাস্তি হবে অনন্তকালীন।

এবার উল্লেখ করা যাক কবরের শাস্তি সম্পর্কিত কতিপয় হাদিস।

রসুল স. বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর যখন লোকেরা ফিরে আসতে থাকে, তখন ওই কবরবাসী শুনতে পায় তাদের পাদুকার আওয়াজ। তার কাছে তখন দু'জন ফেরেশতা উপস্থিত হয়। একজন জিজ্ঞেস করে রসুল স. সম্পর্কে। বলে, তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে বিশ্বাসী হলে বলে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল। তখন তাকে দেখানো হয় দোজখ ও বেহেশত, দু'টোই। বলা হয়, ওই দ্যাখো প্রজ্জ্বলন্ত দোজখ। ওই দোজখের বদলে আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন ওই বেহেশত। সে তখন বেহেশত ও দোজখ দু'টোকেই প্রত্যক্ষ করে। আর সে যদি হয় অবিশ্বাসী, তবে রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে বলে, একে আমি চিনি না। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তাকে বেদম প্রহার করতে শুরু করে। তখন যন্ত্রনায় চীৎকার করতে থাকে সে। সে চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পায় মানুষ এবং জ্বিন ব্যতীত অন্য সকল সৃষ্টি। বোখারী ও মুসলিম।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে এমন কোনো নামাজ পাঠ করতে দেখিনি, যে নামাজে তিনি পরিত্রাণকামনা করেননি কবরের আযাব থেকে। বোখারী, মুসলিম।

খলিফা হজরত ওসমান গনি কোনো কবরের পাশে দাঁড়ালে অঝোর ধারায় কাঁদতেন। চোখের জলে ভিজে যেতো তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, রসুল স. বলেছেন, কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম পর্যায়। কবরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ যে পায়, তার পরের পর্যায়গুলোর পরিত্রাণ তার জন্য হয় সহজতর। অন্যথায় হয় এর বিপরীত। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অবিশ্বাসীদের প্রত্যেককে শাস্তিদানের জন্য কবরে নিয়োজিত করা হবে নিরানব্বইটি করে ভয়ংকর দর্শন বিষধর সাপ। তারা তাকে দংশন করতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। ওই সাপগুলোর কোনো একটি যদি পৃথিবীতে একটি প্রশ্বাস

ছাড়ে, তবে ভূপৃষ্ঠে আর কোনোদিনও সবুজ তৃণগুল্ম জন্মাবে না। দারেমী, তিরমিজি। তিরমিজি নিরানব্বইয়ের স্থলে উল্লেখ করেছেন সত্তরটি সাপের কথা।

'নারান' অর্থ অগ্নিতে। এখানে শব্দটিতে 'তানভীন' যুক্ত করা হয়েছে ওই অগ্নিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানার্থে। অথবা বলা যেতে পারে, এরকম করা হয়েছে অনির্দিষ্টবাচকতা বুঝাতে। অর্থাৎ হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে যে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করানো হয়েছে, তা পৃথক প্রকৃতির, সে আগুন দোজখের আগুন নয়।

'ফালাম ইয়াজ্বিদূ লাহুম্ মিন দুনিল্লাহি আনসারা' অর্থ অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী। সমষ্টিকে যখন সমষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তখন অনিবার্য হয় মোকাবিলা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাদের কেউই তাদের কাউকেও সাহায্যকারীরূপে পায়নি। এভাবে এখানে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর প্রতি। অর্থাৎ তাদের দেব-দেবীগুলোও তখন তাদেরকে সাহায্য করতে পারেনি।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'নুহ আরো বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরগণের মধ্য থেকে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিয়ো না'। এখানকার 'আলআরদ্ব' কথাটির 'আলিফ লাম' সীমিতার্থক। অর্থাৎ 'পৃথিবী' অর্থ এখানে একটি বিশেষ ভূখণ্ড। অর্থাৎ হজরত নূহের সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বসবাস করতো, সেই অঞ্চল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা যে অঞ্চলে বাস করে, সেই অঞ্চলের কোনো একটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেও তুমি রেহাই দিয়ো না।

'দাইয়্যারান' অর্থ অব্যাহতি দিয়ো না। কথাটি অনির্দিষ্টবাচক, সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। অর্থাৎ আমাদের জনপদের কোনো গৃহবাসীকে তুমি বাদ দিয়ো না। বিনাশ সাধন করো সকলের। 'দাইয়্যার' শব্দটি মূলতঃ ছিলো 'দাইওয়ার' যেমন 'সাইয়্যাদ' এর মূলরূপ ছিলো 'সাইওয়াদ'।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের'।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী, মুকাতিল ও রবী ইবনে আনাস বলেছেন, হজরত নুহ এরকম অপপ্রার্থনা করেছিলেন তখন, যখন জানতে পেরেছিলেন, যে কয়জন ইমান আনার ছিলো, তারা ইতোমধ্যেই ইমান এনেছে। অবাধ্যদের বংশে আর কোনো ইমানদার আসবে না। তাই হলো। চল্লিশ অথবা নব্বই বৎসর ধরে তাদের নারীরা রইলো বন্ধ্যা এবং পুরুষেরা প্রজনন ক্ষমতাহীন। সেকারণে মহাপ্লাবনের প্রাক্কালে তাদের মধ্যে একটি শিশুও ছিলো না। শিশুরা আমলনামাবিহীন। তাদের উপরে আযাব আসতে পারে না। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর নুহের স্বজাতি যখন রসুলগণের উপর অসত্যারোপ করলো,

তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম'। আর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ ওই মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে মরেনি। মরেছিলো কেবল নবী নুহের সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চল। কেননা অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে অমান্য করেনি। আর তিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের প্রতি প্রেরিতও হননি।

শেষোক্ত আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণকে; আর জালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো'।

হজরত নুহের পিতার নাম ছিলো লামাক ইবনে মনুশালাখ এবং মাতার নাম ছিলো সামুজার বিনতে আতওয়াশ। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন বিশ্বাসী। 'বাইত' অর্থ এখানে গৃহ। জুহাক বলেছেন, মসজিদ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে তরণী। 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী বলে' এখানে বুঝানো হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী আসবে তাদের সকলকে। 'জালিম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অবাধ্য। আর 'তাবারা' অর্থ ধ্বংস। উল্লেখ্য, শয়তানও তখন আরোহণ করেছিলো নুহ নবীর কিশতিতে। কেননা সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হওয়া সত্ত্বেও আয়ুষ্কাল পেয়েছে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— নবী নুহ অবশেষে এই মর্মে প্রার্থনা জানালেন যে, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা। আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার তরণীর আরোহী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে তুমি মার্জনা করো। দাও পরিত্রাণ। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে করো সমূলে উৎপাটিত। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবীর এমতো আবেদন গ্রহণ করেছিলেন। ভয়ংকর মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে মেরেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে।

সূরা জ্বিন

এই সুরা খানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কা নগরীতে। সুরা খানি ২ রুকু এবং ২৮ আয়াত সম্বলিত।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿۱﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ

بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۝

r বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি,

r 'যাহা সঠিক পথনির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না,

r 'এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি বলুন, আমার কাছে এই মর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগের সঙ্গে আমার কোরআন পাঠ শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো শুনেছি বিস্ময়কর বাণী।

এখানে 'নাফারুম্ মিনাল জ্বিন্ন' অর্থ জ্বিনদের একটি দল। তিন থেকে দশ সদস্যবিশিষ্ট দলকে বলা হয় 'নাফার'। নাসীবীন নামক স্থানে ছিলো সাতটি অথবা নয়টি জ্বিন। তাদেরকেই এখানে বলা হয়েছে 'জ্বিনদের একটি দল'। উল্লেখ্য, অন্যান্য প্রাণীর মতো জ্বিনেরাও একটি জাতি। তারা যেমন প্রাণধারী, তেমনি অবয়বধারীও। মানুষের মতো তারাও বিবেকসম্পন্ন। কিন্তু মানুষের মতো সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি তারা নয়। 'জ্বিন' এর শাব্দিক অর্থ গোপনীয়, গুপ্ত। তারা পরিদৃশ্যমান নয়। তাই তাদেরকে বলা হয় 'জ্বিন'। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে, আর জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর জ্বিনদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নি থেকে'। ফেরেশতারা যেমন না নারী, না পুরুষ, জ্বিনেরা তেমন নয়। তাদের মধ্যেও প্রবহমান রয়েছে বিবাহ-বসত-বংশধারা। আর শয়তানও জ্বিন বংশদ্ভূত।

বলাবাহুল্য, জ্বিন, শয়তান ও ফেরেশতার অস্তিত্ব শরিয়ত-স্বীকৃত। গ্রীক দার্শনিকেরা অবশ্য একথা স্বীকার করে না। তারা প্রবক্তা দশ শ্রেণীর বিবেকবানের। কিন্তু বাস্তবে তারা ইসলাম সমর্থিত ফেরেশতা নয়। তাদের তথাকথিত বিবেকবানেরা অশরীরি, কিন্তু ফেরেশতারা অশরীরি নয়, যদিও তারা নয় দৃষ্টিগোচর। ফেরেশতারা আত্মা ও শরীরবিশিষ্ট।

আলোচ্য আয়াত পাঠে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. জ্বিনদের ওই দলটিকে দেখেননি। তারা যে তাঁর কোরআন পাঠ শুনেছিলো, তিনি তা-ও জানতে পারেননি। আর জ্বিনেরাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো অতর্কিতে। আর তিনি স. এসকলকিছুই জেনেছিলেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে

বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জ্বিনদের সম্মুখে কোরআন পাঠ করেননি। আর তিনি তাদেরকে দেখেনওনি। বরং ঘটনাটি ছিলো এরকম— রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পর আকাশের কাছাকাছি শয়তানদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ আড়ি পেতে আকাশের ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্ট করলে তার দিকে ছুঁড়ে মারা হতে লাগলো জ্বলন্ত উল্কাখণ্ড। জ্বিনেরা হলো বিস্মিত, হতচকিত ও চিন্তিত। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, তোমরা পূর্ব-পশ্চিম সবদিকে খবর লাগাও। দ্যাখোতো, কী হলো? তারা দলে দলে ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন দিকে। তেহামার দিকে যে দলটি গেলো সেই দলটিই ফিরতি পথে সাক্ষাত পেলো রসুল স. এর। দেখলো, তিনি স. তাঁর এক প্রিয় সহচর সহ ফজরের নামাজ আদায় করছেন। সুললিত স্বরে আবৃত্তি করছেন কোরআন। তারা তন্ময় হয়ে শুনলো। তারপর বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! একারণেই আমাদেরকে আর আকাশের দিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা ফিরে গেলো তাদের সম্প্রদায়ের কাছে। সকলকে জানালো, আমরা শুনেছি এক বিস্ময়কর আকাশাগত বাণী, যা দান করে সঠিক পথনির্দেশনা। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. এর ওকাজ মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে নাখলা নামক স্থানে।

প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর পর রসুলেপাক স. অসহায় বোধ করতে লাগলেন। অংশীবাদীদের অত্যাচারও বেড়ে চললো ক্রমাগত। তিনি তাই বিষণ্নচিত্তে একদিন পথে নামলেন। যাত্রা শুরু করলেন তায়েফের দিকে। উদ্দেশ্য ছিলো, তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো। আশা ছিলো, হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌পাক এভাবে তাঁর হাতকে করে দিবেন শক্তিশালী। আর তাতে করে তিনি প্রতিহত করতে পারবেন অংশীবাদীদের অত্যাচার। সাক্বীফ গোত্রের লোকদের সম্পর্কেই এরকম আশাধারী হয়েছিলেন তিনি। তাই তাদের কাছেই গমন করলেন প্রথমে।

ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ ও মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তায়েফে পৌঁছে সাক্ষাত করলেন সাক্বীফ গোত্রের কয়েকজনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ছিলো উমাইয়ের তিন পুত্র ও গোত্রনেতা ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। কুরায়েশদের শাখাগোত্রের বনী জামুহীর এক রমণীও ছিলো তাদের মধ্যে। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। বললেন, ইসলাম গ্রহণ করো এবং আমার প্রচারসহযোগী হও। একজন বললো, আল্লাহ্ যদি সত্যিসত্যি তোমাকে নবী বানিয়ে থাকেন, তবে আমি কাবা গৃহের আবরণী কেটে আমার গায়ের জামা বানাবো। দ্বিতীয়জন বললো, আল্লাহ্ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে নবী হিসেবে পেলেন না? তৃতীয়জন বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলতে চাই না। তুমি যা বলছো তা যদি সত্যিই হয়, তবে তোমার মর্যাদা তো আমার কথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর যদি তুমি প্রতারক হও, তবে তোমার সঙ্গে কথা বলাই তো ঠিক নয়। রসুল স. তাদের কথা শুনে হতাশ হলেন। তাই আর কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা

বলার বলেছো। এখন তোমাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাই যে, আমাদের এই কথোপকথনের বিষয়টি তোমরা আর কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। কিন্তু তারা রসুল স. এর একথারও কোনো মূল্য দিলো না। তাঁর আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দিলো সাধারণ জনতা ও ক্রীতদাসদেরকে। তারা তখন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। শুরু করে দিলো হই-চই, কটুবাক্যবর্ষণ। উপায়ন্তর না দেখে রসুল স. আশ্রয় গ্রহণ করলেন উতবা ও শায়বার বাগানে। তারা দু'জন তখন বাগানে উপস্থিত ছিলো। তাই পশ্চাদ্ধাবনকারীরা আর অগ্রসর হলো না। রসুল স. বসলেন একটি আঙ্গুরবীথির ছায়ায়। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! আমি দুর্বল। অসহায়। তাই মানুষ আমাকে অপমান করতে উদ্যত হয়েছে। তুমি তো দুর্বলকে রক্ষাকারী। অসহায়ের পালয়িতা। সকল কৃপাকারীর চেয়ে অধিক কৃপানিধান। আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি এখন দুঃখ-ক্লেশে পতিত। এতে কোনো প্রকার আক্ষেপ আমার নেই। আমি চাই কেবল তোমার পরিতুষ্টি। আমি জানি এবং সর্বান্তঃকরণে একথা মানি যে, তোমার দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক থেকে কোনো শক্তি নেই, সাহায্যও নেই।

বাগানের মালিক রবীয়ার দুই পুত্র উতবা ও শায়বা একটু দূরে থেকে রসুল স. এর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো। বিপর্যস্ত নবীকে দেখে তাদের অন্তর হলো বিগলিত। ক্রীতদাস আদ্দাসকে বললো, যাও, তাঁকে একগুচ্ছ আঙ্গুর খেতে দাও। আদ্দাস নির্দেশ পালন করলো। রসুল স. প্রীত হলেন। 'বিসমিল্লাহ্' বলে আঙ্গুর খেতে শুরু করলেন। আদ্দাস বললো, আপনি যা বলে আহার শুরু করলেন, তাতো এখানকার কাউকে উচ্চারণ করতে দেখি না। রসুল স. বললেন, তুমি কোথাকার লোক? আদ্দাস বললো, আমি খৃষ্টান। আমার নিবাস নীনুয়ায়। রসুল স. বললেন, ও, তুমি নবী ইউনুস ইবনে মাতা'র জনপদের লোক? সে বললো, আপনি তাঁর নাম জানলেন কীভাবে? তিনি স. বললেন, তিনি তো আমার ভ্রাতা। তিনি নবী ছিলেন, আমিও নবী। আদ্দাস অভিভূত হলো। চুম্বন দিতে লাগলো রসুল স. এর পবিত্র মস্তকে, হাতে ও চরণে। একটু দূরে থেকে উতবা ও শায়বা ঘটনা কোন দিকে গড়াচ্ছে তা আঁচ করতে পারলো। আদ্দাস ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলো, আদ্দাস! কী ব্যাপার? আমরা দেখলাম, তুমি আগন্তুক ব্যক্তিটির মাথায়-হাতে-পায়ে চুমু দিচ্ছো। আদ্দাস বললো, পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু কথা শুনিয়েছেন, যা নবী ছাড়া অন্য কারো জানা থাকতে পারে না। তারা বললো, দেখো, সে তোমাকে যেনো আবার ধর্মচ্যুত না করে দেয়। তোমার ধর্মই তো সর্বোত্তম।

রসুল স. এবার ফিরে চললেন মক্কা অভিমুখে। সন্ধ্যা হলো। তিনি স. যাত্রা স্থগিত করলেন নাখলায়। রাতে নামাজে দণ্ডায়মান হয়ে পরম অনুরাগে পাঠ করতে লাগলেন আল্লাহ্র বাণী। নসীবীনের কিছুসংখ্যক জ্বিন তখন সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তন্ময় হয়ে গেলো তারা। রসুল স. যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন তারা স্বজাতির কাছে গমন করে সব

ঘটনা খুলে বললো। নিজেরা ইমান তো আনলোই; অন্যদেরকেও আহ্বান জানালো ইসলামের প্রতি। এই ঘটনাটির কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

ইবনে জাওজী তাঁর 'কিতাবুস্ সফওয়া'য় স্বসূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি একবার অবস্থান গ্রহণ করলাম ওয়াযআর পাশ্ববর্তী এক এলাকায়। আমি সেখানে দেখতে পেলাম একটি প্রস্তরনগরী। ওই নগরীর অধিবাসীরা ছিলো জ্বিন। এক বাড়িতে দেখলাম, এক বৃদ্ধ লোক কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করছে। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিলো একেবারে নতুন। আমি ঝকঝকে পরিচ্ছদ দেখেই বিস্মিত হলাম বেশী। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, সহল, বস্ত্র পরিধান করলেই তা পুরাতন হয় না। পুরাতন হয় পাপের দুর্গন্ধে এবং নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করার কারণে। আমি এ জামাটি পরিধান করে আছি সাতশত বৎসর ধরে। এটা পরে আমি সাক্ষাত করেছি নবী ঈসার সঙ্গে এবং পরে নবী মোহাম্মদ মোস্তফার সঙ্গেও। আমি তাঁদের দু'জনের উপরেই ইমান এনেছিলাম। আমি বললাম, আপনার পরিচয়? তিনি বললেন, আমি তাদের একজন যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে সূরা জ্বিন।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, রসুল স. জ্বিনদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে নির্দেশিত হয়েছিলেন। তাই নীনুয়া থেকে যখন একদল জ্বিন তাঁর কাছে হাজির হলো, তখন তিনি স. তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শোনালেন। সেদিন তিনি স. বলেছিলেন, আজ কে আমার সাথী হতে চাও? আজ আমি একদল জ্বিনকে কোরআন পাঠ করে শোনাবো। উপস্থিত সাহাবীগণ নিশ্চুপ রইলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কেবল বললেন, আমি। তিনি বলেছেন, আমি ছাড়া আর কেউ তখন রসুল স. এর সাথী হওয়ার সাহস করেনি। রসুল স. যথাসময়ে যাত্রা শুরু করলেন। আমিও অনুগামী হলাম তাঁর। উপনীত হলাম মক্কার উপকণ্ঠে এক উচ্চ ভূমিতে। এরপর শু'বুল হাজ্জুন নামক এক গিরিপথ ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি স.। যাবার আগে তিনি বললেন, তুমি এখানেই বসে থাকো। এরপর আমার চারপাশে একটি রেখা এঁকে দিয়ে বললেন, আমি না ডাকা পর্যন্ত এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ো না। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি স. থেমে গেলেন। উপবেশন করলেন এবং শুরু করলেন কোরআনের মনোমুগ্ধকর আবৃত্তি। আমি দেখতে পেলাম শকুনের মতো এক ধরনের পাখি দ্রুত ছুটে আসছে। পাখিগুলো রসুল স.কে ঘিরে ফেললো। আমি তখন তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। শুনতেও পেলাম না তাঁর কণ্ঠস্বর। বেশ কিছুক্ষণ পর পাখিগুলো খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো উড়ে উড়ে সরে যেতে লাগলো। রাত শেষ হলো। রসুল স. আমার কাছে এসে বললেন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? আমি বললাম, না। আমার একবার মনে হচ্ছিলো, আপনার সাহায্যের জন্য চীৎকার করে লোক জড়ো করি। কিন্তু যতোবার এরকম মনে হলো, ততোবারই দেখলাম, আপনি লাঠি উঁচিয়ে উঁচিয়ে আমাকে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তিনি স. বললেন, আর কি দেখেছো? আমি যা দেখেছিলাম, তা

বললাম। আরো বললাম, শাদা পোশাক পরিহিত কালো বর্ণের কিছু লোককেও দেখেছি আমি। তিনি স. বললেন, ওরা ছিলো নাসীবীন অঞ্চলের জ্বিন। তারা তাদের আহার্যদ্রব্য কী হবে তা জানতে চাইলো। আমি আহার্য হিসেবে তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিলাম পুরুষ্ট অস্থি, শুকনো গোবর ও ভেড়া-ছাগলের লেদ। তারা বললো, এগুলোকে মানুষ অপবিত্রতা দূর করার কাজেও লাগায়। আমি বললাম, অস্থি ও শুকনো গোবর দ্বারা অপবিত্রতা দূর করা আমি মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম জন! এগুলো থেকে তারা কী পাবে? তিনি স. বললেন, অস্থিগুলো পাবে গোশতপূর্ণ এবং গোবর-লেদে পাবে ওই সকল বস্তু, যা ভক্ষিত হয়েছিলো আহার্যরূপে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমি যে একসময় তুমুল কোলাহল শুনতে পেলাম। তিনি স. বললেন, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত একটি মামলা আমার কাছে উপস্থিত করেছিলো তারা। বচসা শুরু করেছিলো বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই। আমি সবকিছু শুনে সিদ্ধান্ত দিয়েছি। তারা তা মেনেও নিয়েছে। এ পর্যন্ত বলে রসুল স. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে কিছু দূরের এক স্থানে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, পানি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু সে পানিতে ভেজানো রয়েছে খেজুর। তিনি স. বললেন, তাই আনো। আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি ওজু সমাপন করলেন এবং বললেন, খেজুর পবিত্র, খেজুরের পানিও পবিত্র।

দাউদের মাধ্যমে ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম সূত্রে আলী ইবনে মোহাম্মদের বর্ণনা উল্লেখ করে মুসলিম বলেছেন, আমর উল্লেখ করেছেন, আমি একবার আলকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে যে রাতে জ্বিনেরা উপস্থিত হয়েছিলো, সে রাতে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কি রসুল স. এর সঙ্গে ছিলেন? আলকামা বললেন, আমি এ ব্যাপারে একবার যখন হজরত ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, ঘটনাটি ছিলো এরকম— এক রাতে রসুল স.কে খুঁজে পাওয়া গেলো না। আমরা আশেপাশের পাহাড়ে সমতলভূমিতে গিরিপথে তাঁকে খুঁজে বেড়ালাম। ভাবলাম, কেউ কি তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো, না কি কেউ তাকে শহীদ করে ফেলে রাখলো কোনো গোপন স্থানে। রাতটিকে আমাদের কাছে মনে হয়েছিলো অত্যন্ত অশুভ। শেষে এক সময় তিনি স. আমাদেরকে দর্শন দিয়ে বললেন, শংকামুক্ত ও কৃতার্থ হও। আরো বললেন, আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলো জ্বিনেরা। তাদের সঙ্গেই আমি গিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শুনিয়েছি। এরপর রসুল স. কেবল আমাকে সঙ্গে নিয়ে এক স্থানে গেলেন। দেখালেন তাঁর যাত্রাপথের নিশানা এবং স্থানে স্থানে অগ্নিচিহ্ন।

শা'বী বর্ণনা করেছেন, জ্বিনগুলো ছিলো উপদ্বীপবাসী। তারা রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলো তাদের আহার্যবস্তু সম্পর্কে। রসুল স. বলেছিলেন, তোমরা আহার কোরো ওই অস্থি, যার উপরে পাঠ করা হয়েছে বিসমিল্লাহ্। ওই অস্থি যদি

তোমাদের অধিকারে আসে এবং তাতে যদি কিছু গোশত লেগে থাকে, তবে তোমরা তা আহার করতে পারো। আর আহার করতে পারো চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও ভক্ষিত অংশ। মানুষকে এগুলো দ্বারা অপবিত্রতা দূর করতে (কুলুখ হিসেবে ব্যবহার করতে) নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলো তোমাদের ভ্রাতা জ্বিনদের খাদ্য। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ জাঠ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দেখে বলেছিলেন, এরা দেখতে সেই জ্বিনের রাত্রির আগন্তক জ্বিনগুলোর মতো।

আমি বলি, রসুল স. এর সঙ্গে জ্বিনদের সাক্ষাত ঘটেছিলো দু'বার। একবার রসুল স. এর তায়েফ থেকে ফেরার পথে। আর একবার ওকাজ মেলার দিকে গমনের প্রাক্কালে। ওই সময়েই তিনি স. জ্বিনদেরকে প্রথম কোরআন পাঠ করিয়ে শুনিয়েছিলেন। সেই ঘটনার কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে 'বলো, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি....'। আর হজরত ইবনে মাসউদের বিবরণটি ছিলো অন্য এক সময়ের।

বাগবী লিখেছেন, সুরা আহকাফের 'ফাসতাজাবা লাহুম' আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, নাখলায় রসুল স. এর কোরআন পাঠ শুনে জ্বিনেরা চলে গেলো তাদের স্বজাতির কাছে। তাদেরকে খুলে বললো সবকিছু। তখন সত্তর জন জ্বিন আগ্রহান্বিত হয়ে উপস্থিত হলো বুতহা নামক স্থানে অবস্থানরত রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। রসুল স. তাদেরকেও কোরআন পাঠ করে শোনালেন। জানালেন আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে।

খাফাজী বলেছেন, রসুল স. এর কাছে জ্বিনেরা আগমন করেছিলো মোট ছয় বার। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. প্রেরিত হয়েছেন মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁর পূর্বে উভয় সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শকরূপে আর কোনো নবী আর্বিভূত হননি।

'ফাক্বালূ ইন্না সামি'না কুরআনান্ আ'জ্বাবা' অর্থ এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি। অর্থাৎ আমরা শুনেছি এমন বিস্ময়কর বাণী, যা কোনো মানুষের দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভবই নয়। নিশ্চয় এ বাণী আকাশাগত। এখানে 'আজ্বাব' অর্থ বিস্ময়কর, অনন্য। শব্দটি ধাতুমূল।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যা সঠিক পথনির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরীক স্থির করবো না'। এখানে 'পথনির্দেশ করে' কথাটি কোরআনের বিশেষণ এবং 'ইলার রুশ্দি' অর্থ সঠিকতার দিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— এই অনন্য কোরআন দান করে সঠিক গন্তব্যের পথনির্দেশনা। সে গন্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্র পরিতোষ ও জান্নাত। 'ফা আমান্না বিহী' অর্থ আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অর্থ কোরআন যে আল্লাহ্র বাণী এবং নির্ভুল পথের দিশারী, তা আমরা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি। 'ওয়া লান্ নুশরিকা বিরব্বিনা আহাদা' অর্থ

আমরা কখনো আমাদের প্রভুপালকের কোনো শরীক স্থাপন করবো না। অর্থাৎ অংশীবাদিতাকে আমরা আর কখনো প্রশ্রয় দিবোই না। কেননা অংশীবাদিতা নিষিদ্ধ, অপবিত্র ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের অন্তরায়।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেননি কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান'।

এখানে 'ইন্‌নাহু' (নিশ্চয় তিনি) কথাটির 'হু' (তিনি) সর্বনামটি অভিজাত শ্রেণীর। সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে এখানে 'রব' (প্রতিপালক) এর সঙ্গে। 'জ্বাদ্‌দু' এর শাব্দিক অর্থ পিতামহ। এখানে এর মর্মার্থ হবে— সমুচ্চ, মহিমময়। এরকম বলেছেন মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইকরামা। হজরত আনাসের একটি অভিবচন এরকম 'ইজা ক্বরিয়া বাক্বারাতিন ওয়া আ'লা ইমরানা জ্বাদ্‌দা ফীনা' (সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান যখন আবৃত্ত হয়, তখন আমাদের নিকটে বৃদ্ধি পায় তাঁর মহিমা)। এই অভিবচনটির মধ্যে মুজাহিদ প্রমুখের ব্যাখ্যার পোষকতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু সুদ্দী শব্দটির অর্থ করেছেন— আদেশদাতা, মহাশাসক। আবুল হাসান অর্থ করেছেন— অমুখাপেক্ষী। হজরত ইবনে আব্বাসের মতে— শক্তি। জুহাকের নিকট— ক্রিয়াশীল। কুরতুবীর নিকট— অনুগ্রহদাতা। আর আখফাশের মতে— সর্বাধিপতি, সর্বময় কর্তৃত্বাধিকারী। আর কেবল 'জ্বাদ্‌দুন' না বলে এখানে 'জ্বাদদু রব্বিনা' বলা হয়েছে সৃষ্টির লালন-পালন করার বিষয়টিকে সুপ্রকটিত করতে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন বলেই তো তিনি সমুচ্চ ও মহামহিম।

'মাত্‌তাখাজা সহিবাতাঁও ওয়া লা ওয়ালাদা' অর্থ তিনি গ্রহণ করেননি কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান। এখানকার 'মাত্‌তাখাজা' কথাটি হচ্ছে এ বাক্যের দ্বিতীয় বিধেয়। বক্তব্যকে অধিকতর সুদৃঢ়করণার্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই অতিরিক্ত বিধেয়টি। 'সমুচ্চ আমাদের প্রভুপালকের মর্যাদা' বলে এখানে প্রথমে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন মহিমময়তাকে, তারপর তাঁর চিরঅমুখাপেক্ষিতাকে প্রকাশ করা হয়েছে একথা বলে যে 'তিনি গ্রহণ করেননি কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান'। অর্থাৎ তিনিই এক, অবিভাজ্য ও আনুরূপবিহীন সৃজয়িতা। আর সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপে সৃষ্টির কোনো প্রকার অংশ থাকা সম্ভবই নয়— ভার্যারূপে যেমন নয়, তেমনি নয় সন্তান-সন্ততিরূপেও।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬, ৭

وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ

رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧

r ‘এবং আরও এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

r ‘অথচ আমরা মনে করিতাম মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ করিবে না।

r ‘আরও এই যে, কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ লইত, ফলে উহারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত।’

r আরও এই যে, জিন্নেরা বলিয়াছিল, ‘তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাসত্যের পরিচয়প্রাপ্ত ওই সকল জ্বিন আরো বলেছিলো, আমাদের জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য ধর্মের পরিচয়প্রাপ্ত কেউ তো এতোদিন ছিলোই না। আর মহাসৃষ্টির মহাসৃজয়িতা সম্পর্কে তারা নানা প্রকার আজেবাজে ধারণার কথা প্রচার করতো। এখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তারা কতোটা নির্বোধ ও হতভাগ্য। এখানে ‘সাফীহুনা’ অর্থ আমাদের নির্বোধেরা। এরকম বলেছেন কাতাদা। মুজাহিদ শব্দটির অর্থ করেছেন— ইবলিস ও তার অনুসারীরা। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— অবাধ্য জ্বিনেরা। ‘শাত্বাত্বা’ অর্থ সত্যের অতি অপলাপ, সীমাতিক্রম। অর্থাৎ ওই নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অনেক অযথার্থ উক্তি করতো। যেমন স্বকপোলকল্পনায় নির্ণয় করতো তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না’। এখানে ‘কাজিবুন’ অর্থ মিথ্যা বলা, কথা বলার একটি ধরন। শব্দটি ধাতুমূল এবং ‘ক্বওল’ (কথা) ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা বিশ্বাস করি কোরআনকে। আর কোরআনের বাণী-বৈভবের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারলাম সত্যের স্বরূপ। বুঝলাম, আমাদের নির্বোধ নেতারা সত্যাশ্রয়ী নয়। আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা এতোদিন ধরে আমাদের যেসকল কথা শুনিয়েছে, সেগুলো অযথার্থ ও অংশীবাদিতাদুষ্ট।

সন্দেহ ঃ বলা হয়েছে, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে জ্বিনেরা আকাশের কাছে গিয়ে আড়ি পেতে ফেরেশতাদের আলাপচারিতা শুনতো। ফেরেশতারা তো আল্লাহ্‌র এককত্ব ঘোষণা করতো। মুহুর্মুহু বর্ণনা করতো আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা। তৎসত্ত্বেও জ্বিনেরা ইমান আনতো না কেনো? অথচ একবার মাত্র কোরআন শুনে তারা ইমানদার হয়ে গেলো। বলতে শুরু করলো, তাদের নির্বোধ নেতারা এতোদিন আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদেরকে মিথ্যা ধারণা দিয়েছে। বিষয়টি সঙ্গতিহীন নয় কি?

নিরসন ঃ ইমান সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র দয়া ও দান, স্বেচ্ছার্জিত কোনো বিষয় নয়। পথপ্রদর্শকগণের পথপ্রদর্শন প্রচেষ্টা পথান্বেষীগণের হৃদয়ে সৃষ্টি করে ইমান গ্রহণের এক ধরনের যোগ্যতা। আবার এমতো যোগ্যতা সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়। আর এই গ্রহণযোগ্যতার রয়েছে দুটি দিক— একটি গোপন এবং অন্যটি প্রকাশ্য। গোপন দিকটি সম্পৃক্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে এবং প্রকাশ্য দিকটি যুক্ত সৃষ্টির সঙ্গে। এভাবে পথান্বেষীরা তাদের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে গ্রহণ করে তাঁর অনুকম্পা, বদান্যতা। কেননা আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ কোনো গুণই তার অভিভাবক, প্রতিপালক ও সূচনাস্থল। আবার পথপ্রদর্শন-কর্মেরও রয়েছে দু'টি দিক। একটি দিক সম্পৃক্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে, অপরটি সংযুক্ত সৃষ্টির সঙ্গে। তাই পথপ্রদর্শকগণের অভ্যন্তরীণ দিকটি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জ্যোতিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রকাশ্য দিক তা বিতরণ করে সৃষ্টিকুলের মধ্যে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে থাকে উরুজ (ঊর্ধ্বারোহণ) ও নুযুলের (নিম্নাবতরণের) মাধ্যমে। নবী-রসুলগণের গ্রহণ-বিতরণের প্রক্রিয়া উপলক্ষ, মাধ্যম বা যোগসূত্র। আর ফেরেশতাগণের মধ্যে রয়েছে কেবল গোপন দিকটি। অর্থাৎ তাদের মধ্যে রয়েছে কেবল উরুজ, নুযুলের দিকটি একেবারেই নেই। তাই উপকার আহরণের মাধ্যম হিসেবে তারা একেবারেই অচল। সেকারণেই অসংখ্যবার তাদের কথাবার্তা ও আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি শুনেও জ্বিনেরা উপকৃত হয়নি। আর নির্বোধ জ্বিনেরা যেহেতু তাদের স্বগোত্রীয়, তাই তাদের মিথ্যা কথাই স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তাদের উপর। পরে তাদের সে সকল অপধারণা এক মুহূর্তে কেটে গেলো একারণে যে, রসুল স. হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, শেষতম, শ্রেষ্ঠতম নবী, যাঁর উরুজ-নুযুল দু'টোই সর্বাধিক পরিপূর্ণ। জ্বিনেরা তাদের অন্তরের অভাবিতপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাই বলেছিলো 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি' (যার পাঠক আরো অধিক বিস্ময়কর)।

জিজ্ঞাসা ঃ নবী-রসুলগণ যখন উরুজ ও নুযুল উভয় দিকে সম্পর্ক রাখেন, তখন হজরত নুহ, হজরত মুসা, হজরত ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের দ্বারা জ্বিন জাতি প্রভাবান্বিত হতে পারেনি কেনো? কেনোই বা তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়নি জ্বিন জাতির পথপ্রদর্শনার্থে?

জবাব ঃ এর কারণ হচ্ছে, অন্যান্য নবী-রসুলের উরুজ পূর্ণ হলেও নুযুল ছিলো অপূর্ণ। আর শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. ছিলেন উরুজ-নুযুল উভয়ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ, পূর্ণত্বের চরম পরাকাষ্ঠা। ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক উন্নত ছিলো তাঁর উরুজ। আবার নুযুল ছিলো মহাসৃষ্টির সকল সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই তিনিই কেবল হতে পেরেছিলেন মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত পথপ্রদর্শক। তাঁর হেদায়েতের সূর্য পরিপ্লাবিত করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল অঞ্চলকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, আবু জেহেল এবং তার মতো লোকেরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। এর কারণ ছিলো এই যে, তারা ছিলো স্বভাবগতভাবে চিরভ্রষ্ট। হৃদয় ছিলো তাদের চির অবরুদ্ধ। তাই

প্রকৃত শ্রুতি, দৃষ্টি ও বিবেকবোধ তাদের ছিলোই না। মধ্যাহ্ন গগনের প্রখর সূর্য যেমন জন্মান্ধের অন্ধত্ব দূর করতে পারে না, তাদের অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ। সেকারণেই হেদায়েতের মহাকাশের মহাসূর্য রসুলেপাক স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত থেকেও তারা হেদায়েত পায়নি।

শায়েখে আকবর বলেছেন, হজরত নুহের আমন্ত্রণকে তাঁর স্বজাতির অধিকাংশ লোক গ্রহণ করেনি একারণে যে, তাঁর নুজুল ছিলো অসম্পূর্ণ। ফলে সর্বসাধারণের মন-মানসিকতার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ছিলো অনেক। আর মোহাম্মদ মোস্তফা স. ছিলেন পরিপূর্ণ নুজুলসম্পন্ন। তাই পথভ্রষ্টরা তাঁকে হৃদয়ের কাছে পেয়েছে। অতি সহজে তাদের অন্তর্দেশকে আলোকিত করতে পেরেছে তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ জ্যোতিচ্ছটায়। এমতো সফলতার মূলে ছিলো তাঁর উরুজ-নুজুলের সমতা, পরিপূর্ণতা। তার সাথে ছিলো কোরআনের হৃদয়-স্পর্শী ও জ্যোতির্ময় বাণী। তাঁর পূর্বের কোনো নবীই এমতো পরিপূর্ণতার প্রতিভূ ছিলেন না। তিনিই ছিলেন কেবল মহাসৃজয়িতা ও মহামানবতার মহামিলনোৎসবের মহান আয়োজক। মহাসাফল্যের মহামহিম অগ্রনায়ক।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'আরও এই যে, কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ নিতো, ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো'।

ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত করুম ইবনে সায়েব আনসারী বলেছেন, একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে এক কার্যোপলক্ষে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে দিবাবসান হলো। আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। আশ্রয় নিলাম এক রাখালের আস্তানায়। গভীর রাতে এক নেকড়ে আক্রমণ করলো তার ছাগলের পালের উপর। একটু পরেই উধাও হলো এক ছাগ-শাবককে নিয়ে। রাখাল তার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলো, হে উপত্যকার মালিক! ছাগলছানাটি ছিলো তোমারই আশ্রয়ে। হঠাৎ নেপথ্য থেকে আওয়াজ ধ্বনিত হলো, ওহে নেকড়ে। ছাগশিশুটিকে ছেড়ে দাও। একটু পরেই ছাগলছানাটি দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এলো। মিশে গেলো অন্যান্য ছাগলের সাথে। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম, তার গায়ে কোনো আঁচড়েরও চিহ্ন নেই। ঘটনাটি ছিলো তখনকার, যখন যত্রতত্র শোনা যাচ্ছিলো ইমান ও ইসলামের আলোচনা। সম্ভবত তখনই অবতীর্ণ হয় 'আরো এই যে, কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ নিতো ......'।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু রিজা আতরিদী বলেছেন, আমি সাংসারিক কাজকর্ম করতাম। ছাগল চরাতাম। রসুল স. এর মহাআবির্ভাব যখন ঘটলো, তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়লাম অন্যান্য গোত্র থেকে। একদিনের ঘটনা— আমরা যাত্রা করলাম এক স্থানের উদ্দেশ্যে। একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত নেমে এলো। আমাদের গোত্রপতির রীতি ছিলো ভ্রমণকালে অরণ্যসংকুল অথবা বিরাণ কোনো প্রান্তরে রাত কাটাতে হলে তিনি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতেন, আমরা আজ রাতের জন্য এ অরণ্যের, অথবা এ প্রান্তরের জ্বিন

অধিপতির আশ্রিত। সেদিনও তিনি তেমনই ঘোষণা দিলেন। নেপথ্য থেকে সহসা ধ্বনিত হলো, এরূপ আশ্রয়ের নিরাপত্তামূলক স্বীকৃতি হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্!' আমরা চমৎকৃত হলাম। ওই সফর থেকে ফিরে এসেই আশ্রয় গ্রহণ করলাম ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। আমার ধারণা,আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমি এবং আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে লক্ষ্য করে।

জাযাউসাফী তাঁর 'হাওয়াতিফুল জ্বিন' গ্রন্থে স্বসূত্রে উল্লেখ করেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তামীম গোত্রের রাফে ইবনে উমাইর। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি অতিক্রম করছিলাম আলেজ মরুপ্রান্তর। হঠাৎ ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। আমি আমার উটনী থেকে নেমে একস্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমোবার সময়শরণ গ্রহণ করলাম জ্বিনের। স্বপ্নে দেখলাম, বর্শা হাতে এক লোক এলো। সে আমার উটনীটির গলদেশে আঘাত করতে উদ্যত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। কিন্তু জেগে উঠে কিছুই দেখতে পেলাম না। পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার একই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো। এবার দেখলাম উটনীটি আতঙ্কগ্রস্ত। এদিকে ওদিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম স্বপ্নে দেখা লোকটিকে। তার হাতে ছোট একটি বর্শা। সে উটনীটির দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছে। আর তাকে প্রতিহত করছে আর একজন প্রবীণ লোক। হঠাৎ উপস্থিত হলো তিনটি নীল গাভী। প্রবীণ ব্যক্তি লোকটিকে বললো, এ লোকের উটনীর বদলে তোমার ইচ্ছামতো গাভী তিনটির যে কোনো একটিকে শিকার করে নিয়ে যাও। লোকটি একটি নীল গাভী শিকার করে নিয়ে গেলো। আমি প্রবীণ ব্যক্তির দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, এখন থেকে কোনো নির্জনপ্রান্তরে রাত্রিযাপন করলে বোলো, আমি শরণ প্রার্থনা করছি মোহাম্মদের প্রভুপালয়িতার। জ্বিনদের সাহায্য আর চেয়ো না। কেননা তাদের প্রতিপত্তি এখন অবলুপ্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মোহাম্মদ কে? তিনি বললেন, আরব উপদ্বীপবাসী একজন নবী। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনো স্থানের নন। তাঁর মহাআবির্ভাব ঘটেছে সোমবারে। আমি বললাম, তিনি এখন কোথায়? প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, খর্জুর কানন শোভিত ইয়াসরিবে।

ভোর হলো। আমি আমার উটনীর পিঠে আরোহণ করে যাত্রা করলাম মদীনার দিকে। রসুল স. আমাকে দেখেই বলে দিলেন, গত রাতে কী ঘটেছিলো। আমাকে আহ্বান জানালেন ইসলামের প্রতি। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেন, তাঁর কথা শুনে আমার মনে হলো, এই সেই লোক, যার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে 'কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ গ্রহণ করতো....'।

'ফাযাদুহুম রহাক্বা' অর্থ ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো। এখানে 'রহাক্বা' অর্থ আত্মম্ভরিতা। এরকম অর্থ করেছেন ইব্রাহিম নাখয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— পাপ। হাসান বসরী অর্থ করেছেন— দুষ্কর্ম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জ্বিনদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা গর্বিত হতো। বলতো, আমরাই মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের নেতা। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে—

জ্বিনেরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতো। তাই মানুষ পথ হারাবার ভয়ে তাদের শরণ যাচনা করতো। এতে করে তারা বোধ করতো আত্মপ্রসাদ। 'রহাক্ব' এর আভিধানিক অর্থ কোনো কিছুতে লিপ্ত হওয়া। মর্মার্থ— নিষিদ্ধ কোনো কিছুতে জড়িত হওয়া, পাপপ্রলিপ্ত হওয়া।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, জ্বিনেরা বলেছিলো, তোমাদের মতো মানুষ মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না'। এখানকার 'আন্নাহুম' কথাটিকে যদি 'ইন্নাহুম' (হামযা বর্ণটিকে যের সহযোগে) পাঠ করা হয়, তবে উক্তিটি হবে জ্বিনদের এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জ্বিনেরা বলেছিলো, ইতোপূর্বে মানুষ ছিলো বিভ্রান্তির শিকার। কিয়ামত হাশর-নশর এসকলকিছু তারা মানতোই না। এরপর অবতীর্ণ হলো কোরআন। মানুষ তখন বুঝতে পারলো, প্রকৃত সত্য কী। তারা বিশ্বাস করলো অদৃশ্য সত্তাকে। প্রত্যয়ী হলো মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার-এর উপর। আর কথাটিকে যদি 'আন্নাহুম'ই পাঠ করা হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! আগে জ্বিনেরাও ছিলো তোমাদের মতো অবিশ্বাসী। পরকালের প্রতি তাদেরও আস্থা ছিলো না। পরে যখন কোরআন অবতীর্ণ হলো, তখন তারা পরিত্যাগ করলো অবিশ্বাসকে। তোমরাও কোরআন শোনো এবং আগমন করো অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের অমল আলোয়।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০

وَّ اَنَّا لَمَسۡنَا السَّمَآءَ فَوَجَدۡنٰهَا مُلِئَتۡ حَرَسًا شَدِيۡدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقۡعُدُ مِنۡهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمۡعِ ؕ فَمَنۡ يَّسۡتَمِعِ الۡاٰنَ يَجِدۡ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾ وَّ اَنَّا لَا نَدۡرِىۡۤ اَشَرٌّ اُرِيۡدَ بِمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ اَمۡ اَرَادَ بِهِمۡ رَبُّهُمۡ رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾

r 'এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ;

r 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

r 'আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের মংগল চাহেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে'। এখানে 'সামাআ' (আকাশ) অর্থ মেঘমালা। কেননা ঊর্ধ্বমার্গের সকল

কিছুকেই বলা হয় 'সামাআ'। এরকম বলেছেন জননী আয়েশা। তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতামণ্ডলী অবতরণ করে মেঘের উপরে। তারা সেখানে আলাপ-আলোচনা করে আকাশাগত বিধান সম্পর্কে। আর শয়তানেরা তা আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করে। যা শুনতে পায় তা এসে আবার বলে দেয় তাদের ভক্ত গণৎকারদেরকে। তারা আবার সে তথ্যগুলোকে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে প্রচার করে জনসমক্ষে। বোখারী।

সন্দেহ ঃ কোনো কোনো হাদিসের বিবরণানুসারে 'সামাআ' অর্থ প্রকৃত আকাশই, মেঘমালা নয়। যেমন হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ঊর্ধ্বাকাশে যখন কোনো সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ করেন, তখন ফেরেশতারা বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশার্থে ঝাপটাতে থাকে তাদের ডানা। ফলে আওয়াজ উত্থিত হতে থাকে সেরকম, যেরকম হয় পাথরে শিকল আছড়ালে। সিদ্ধান্ত প্রদান যখন শেষ হয়, তখন ফেরেশতারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, বলো তো, তোমাদের প্রভুপালক কী ঘোষণা দিলেন। তারাই আবার জবাব দেয়, তিনি যা বলেছেন, তা সত্য বলেছেন। তিনি মহামহিমময়। সুমহান। এরপর তারা উল্লেখ করে সদ্য অবতীর্ণ সিদ্ধান্তের কথা। শয়তানেরা চুপিসারে তা শুনে ফ্যালে এবং তা জানিয়ে দেয় তাদের নিম্নবর্তীদেরকে। তারা আবার জানায় তন্নিম্নবর্তীদেরকে। এভাবে এক সময় তা পৌঁছে যায় পৃথিবীবাসী গণকদের কাছে। তারা আবার প্রাপ্ত সংবাদ প্রচার করে তার সঙ্গে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে। আবার কখনো আড়ি পেতে থাকা শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয় আগুনের গোলা। ফলে তাদের প্রচেষ্টা হয়ে যায় ভণ্ডুল। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক যখন নবতর বিধান প্রবর্তণ করেন, তখন আরশবাহী ফেরেশতারা ঘোষণা করতে থাকে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা। তন্নিম্নবর্তী ফেরেশতারাও তখন বারংবার উচ্চারণ করতে থাকে 'সুবহানাল্লহ্' 'সুবহানাল্লহ্'। এভাবে ক্রমান্বয়ে 'সুবহানাল্লহ্' ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে নিম্নবর্তী আকাশসমূহের ফেরেশতাদের কণ্ঠে। এরপর সকল ফেরেশতার মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে সদ্য অবতীর্ণ বিধান সম্পর্কে। তারা তখন একথাও বলতে থাকে যে, আমাদের প্রভুপালক যা বলেছেন, তা সত্য বলেছেন। শয়তানেরা আড়ি পেতে শুনতে চেষ্টা করে সবকিছু। তারপর যতোটুকু জানতে পায়, তা বলে দেয় তাদের একান্ত অনুগত গণৎকারদেরকে। তারা আবার তা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে জনতার কাছে। মুসলিম।

নিরসন ঃ বর্ণিত হাদিস দু'টোতে এমন কোনো বর্ণনা নেই, যাতে করে বুঝা যায় শয়তান আকাশের কাছে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে। তাই এরকম ভাবাই সমীচীন যে, মেঘমালার উপরে অবতরণ করে ফেরেশতারা যে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে, শয়তানেরা সারিবদ্ধ হয়ে তা আড়ি পেতে শুনে নেয়। এভাবে তারা পরস্পরের মাধ্যমে শ্রুত সংবাদ পৌঁছে দেয় পৃথিবীস্থ শয়তানের কাছে। সে

আবার তা জানিয়ে দেয় গণৎকারদেরকে। আর তাদের এমতো চেষ্টা সব সময় সফলও হয় না। ফেরেশতারা তাদের অবস্থান টের পেলে তাদের প্রতি উল্কা ছুঁড়ে মারে। তখন তারা পুড়ে ছাই হয়ে ঝরে পড়ে নিম্নে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ'। এখানে 'হারাস' অর্থ প্রহরী, রক্ষী। শব্দটি 'খাদাম' শব্দের মতো বহুবচনবোধক নামপদ। 'শিহাব' এর বহুবচন 'শুহুব'। এর অর্থ নক্ষত্রাগত পতনশীল অগ্নিপিণ্ড। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জ্বিনেরা বলেছিলো, আমরা আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করতে যেয়ে দেখলাম সেখানে রয়েছে প্রহরারত অসংখ্য ফেরেশতা। আর নিরাপত্তা নিশ্চিতার্থে অগণিত উল্কাপিণ্ডও সেখানে রয়েছে প্রস্তুত।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়'। একথার অর্থ— রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের আগে আমরা আকাশের কাছাকাছি গিয়ে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকতে পারতাম, কিন্তু এখন আর তা পারি না। কেননা সেখানে এখন প্রহরা বসানো হয়েছে অগ্নিপিণ্ডধারী ফেরেশতাদের। এখানকার 'রসাদা' শব্দটি 'রসিদ' এর বহুবচন। এর অর্থ অগ্নিদণ্ডধারী ফেরেশতা। উল্লেখ্য, অগ্নিদণ্ডধারী ফেরেশতাদের দ্বারা আকাশের এলাকা সুরক্ষিত করার এই ব্যবস্থাটি রসুল স. এরই একটি মোজেজা। আর এমতো মোজেজা দেখেই ইমান এনেছিলো নাসীবীনের জ্বিনেরা।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমরা জানি না, জগতবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান'। একথার অর্থ— ওই জ্বিনেরা আরো বলেছিলো, আকাশকে এভাবে সুরক্ষিত করার মধ্যে আল্লাহ্র কী অভিপ্রায় নিহিত? তিনি কি আমাদের অমঙ্গল চান, না মঙ্গল? তবে আল্লাহ্তায়ালার দয়ায় আমরা তো একথা বুঝতে পারলাম যে, তিনি এমতো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে আমাদেরকে পথপ্রদর্শনই করতে চান। তাইতো আমরা তাঁর বাণীর প্রতি এবং তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনতে পারলাম। আর এতে করেও যারা ইমান আনতে সমর্থ হলো না, তাদের অমঙ্গল তো অতিনিশ্চিত। আল্লাহ্র অভিপ্রায়ও সেরকমই। তাঁর অভিপ্রায়বিরোধী কোনো কিছু সংঘটিত তো হতে পারেই না। আরো উল্লেখ্য, আল্লাহ্ই সকলকিছুর একক সৃজয়িতা। আর ভালো-মন্দ সকলকিছুই সৃজিত হয় কেবল তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে। কিন্তু শালীনতা বজায়ার্থে এখানে অভিব্যক্তি দু'টো প্রকাশ করা হয়েছে দু'রকমভাবে— অমঙ্গলের সঙ্গে তাঁর অভিপ্রায়কে প্রকাশ করা হয়েছে কর্মবাচ্যে এভাবে 'অমঙ্গলই অভিপ্রেত' এবং মঙ্গলের সঙ্গে অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করা হয়েছে কর্তৃবাচ্যে। 'মঙ্গল চান' বলে। আর এভাবে এখানে একথাটিও উত্তমরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, এখানকার ৮, ৯ ও ১০ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যগুচ্ছ

রসুল স. এর রেসালতের সত্যতার একটি অনন্য প্রমাণপঞ্জী। এ প্রমাণপঞ্জীকে অস্বীকার যারা করে, বুঝতে হবে তাদের অমঙ্গলই আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত এবং যারা প্রমাণকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদেরই মঙ্গল চান।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿۱۱﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿۱۲﴾ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ یُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ﴿۱۳﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾ وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾

r 'এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;

r 'এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না।

r 'আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনিলাম তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

r 'আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বাছিয়া লয়।

r 'অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।'

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই সকল জ্বিন আরো বলেছিলো, আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে পুণ্যবান ও পাপী ছিলো। পাপীরা আবার ছিলো বিভিন্ন মতের অনুসারী। কিন্তু এখন আমরা কোরআন শুনে বুঝতে পারলাম শেষতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অনুসারী হওয়া ছাড়া কল্যাণের আর কোনো পথ খোলা নেই। আল্লাহ্‌র এই মহানির্দেশনাকে অকার্যকর করতে আমরা কখনোই পারবো না। অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে যে আমরা আত্মরক্ষা করবো, সে সুযোগও আমাদের নেই। কেননা সকল জগত আল্লাহ্‌র। তাই আমরা যখন বিস্ময়কর বাণী শুনে পথের দিশা পেলাম, তখনই তা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে নিলাম। একথাটিও ভালোভাবে বুঝতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রভুপালককে বিশ্বাস করে, সে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে থাকে চিরসুরক্ষিত।

এখানে 'সলিহুনা' (সৎকর্মপরায়ণ) বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল জ্বিনকে, যারা ইমান এনেছিলো পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের প্রতি অবতারিত আসমানী কিতাবসমূহের উপর, বিশেষ করে তওরাত শরীফের উপর। 'আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী' অর্থ বিভিন্ন প্রকার অপথ, কুপথ ও বিপথের অনুসারী ছিলো আমাদের পূর্বসূরীরা। এখানে 'ক্বিদাদা' অর্থ বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড। শব্দটি বহুবচন 'ক্বিদ্‌দাতুন' এর। শব্দটি এখানে বেগবান করেছে আগের বাক্যের 'কতক সৎকর্মপরায়ণ' কথাটিকে। হাসান বসরী ও মাহদী বলেছেন, জ্বিনদের মধ্যেও তোমাদের মতো বিভ্রান্ত কাদরিয়া, জাবরিয়া, মারজিয়া, রাফেজী ইত্যাদি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় রয়েছে। আর এখানকার 'আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ' কথাটিও ১৩ সংখ্যক আয়াতের 'আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনলাম' বাক্যটির পটভূমিকা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা এখন যেমন আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তেমনি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলো আমাদের কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুষও। অর্থাৎ সকলেই যে তারা অবিশ্বাসী ও পাপী ছিলো, তা নয়। বরং তাদের অনেকে পথভ্রষ্টতায় শতধাবিচ্ছিন্ন হলেও কিছুসংখ্যক তো বিশ্বাসী ও সজ্জন ছিলোই।

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনে, তার কোনো ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা থাকবে না' অর্থ বিশ্বাসীরা চিরনিরাপদ। ইহকাল ও পরকালে ক্ষতি ও আশংকা থেকে চিরমুক্ত। অথবা অর্থ— যারা বিশ্বাসী, তারা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে নিঃশংক থাকতে পারে না। কেননা কোরআনের দাবি হচ্ছে সকল প্রকার অন্যায়াচরণ থেকে সততসতর্ক জীবনযাপন।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ করে, তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়'। এখানে 'মুসলিমূন' অর্থ আত্মসমর্পণকারী। আর 'ক্বসিত্বুন' অর্থ সীমালংঘনকারী, দুরাচার, সত্যবিমুখ। যে সুবিচার করে, তাকে বলা হয় 'আক্বসাতার রজুলু' আর যে পীড়ন করে, তাকে বলে 'ক্বসাত্বা'। এই 'ক্বসাত্বা' শব্দেরই কর্তৃকারকের বহুবচনীয় শব্দরূপ হচ্ছে 'ক্বসিত্বুন'। উল্লেখ্য, ১১ সংখ্যক আয়াতের 'আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ' এবং আলোচ্য আয়াতের 'আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী' কথা দু'টো সমার্থক। কিন্তু কথা দু'টির উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রথমোক্তটির উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে, আমরাই প্রথম বিশ্বাসী নই, বিশ্বাসী ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবানও। আর শেষোক্তটির বক্তব্যটি হচ্ছে— কোরআন শোনার পর আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং কিছুসংখ্যক এখনও রয়ে গেলো অবিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, একথাগুলো তাদের, যারা রসুল স. এর কণ্ঠে কোরআন আবৃত্তি শুনে ইমান এনেছিলো, তারপর তাদের স্বজাতির কাছে গিয়ে আহ্বান জানিয়েছিলো ইসলামের প্রতি। তখন তাদের আহ্বানে কেউ কেউ সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিলো এবং কেউ কেউ হয়নি। সে পরিস্থিতির কথাই তাদের কণ্ঠে এখানে উচ্চারিত হয়েছে

এভাবে 'আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী'। আর এখানে 'ফামান আসলামা ফা উলায়িকা তাহার্রাও রশাদা' অর্থ যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিত সত্য পথ বেছে নেয়।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই জন্য'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো জাহান্নামের ইন্ধন হবেই। উল্লেখ্য, ৮ সংখ্যক আয়াত থেকে ১৪ সংখ্যক আয়াতের প্রতিটির শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে 'আন্না'। এমতো উল্লেখের কারণে বক্তব্যগুলো যে জ্বিনদের, সে কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু কথাটিকে 'আন্না' না পড়ে যদি 'ইন্না' পড়া হয়, তবে কথাগুলি যে জ্বিনদের, এ বিষয়টি আর ব্যাখ্যা করে না বুঝিয়ে দিলেও চলে।

সমাধান ঃ ঐকমত্যসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, অবিশ্বাসী জ্বিনদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে অগ্নিশাস্তি। অন্যান্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'আর বক্র পথের পথিক! সে তো হবে জাহান্নামের জ্বালানী'। এবার আসা যাক বিশ্বাসী জ্বিনদের পরিণতি কী হবে, সে সম্পর্কে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তুমুল মতপ্রভেদপূর্ণ। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বিশ্বাসী জ্বিনেরা দোজখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে, কেবল এটাই হবে তাদের পুরস্কার। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'ওহে স্বজাতি! আল্লাহ্র পথের আহ্বানকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করো, তাঁর প্রতি যদি ইমান আনো, তবে মার্জনা করা হবে তোমাদের পাপরাশি এবং মুক্ত রাখা হবে তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে'।

বাগবী লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফাও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। লাইছের অভিমতের অনুসরণে সুফিয়ান সওরী বলেছেন, বিশ্বাসী জ্বিনদের প্রতিদান কেবল এই হবে যে, তারা নিষ্কৃতি লাভ করবে নরকানল থেকে। এরপর চতুষ্পদ জন্তুদেরকে যেমন মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে, তাদেরকেও করা হবে তেমনই। নিয়াজ বলেছেন, আল্লাহ্পাক যখন মানব জাতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান করবেন, তখন বিশ্বাসী জ্বিনদেরকে বলবেন, মাটি হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তারা রূপান্তরিত হবে মৃত্তিকায়। অবিশ্বাসী মানুষেরা তখন এ দৃশ্য দেখে বলতে থাকবে, আহা! আমরাও যদি এভাবে মাটি হয়ে যেতে পারতাম।

এরকমও বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কেননা রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্ যে বিষয়কে রহস্যাচ্ছন্ন করে রেখেছেন, তোমরাও সে বিষয়কে রহস্যাচ্ছন্ন রাখো। আল্লাহ্ অবিশ্বাসী জ্বিনদের জাহান্নামের জ্বালানী হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্বাসী জ্বিনদের প্রতিফল প্রদান সম্পর্কে থেকেছেন নীরব। তাদের সম্পর্কে কেবল এতটুকু বলেছেন যে— তারা নিরাপদ থাকবে নরকবাসী হওয়া থেকে।

কিছুসংখ্যক বিদ্বজ্জন বলেছেন, জ্বিনেরাও তাদের পুণ্য ও পাপের প্রতিফল পাবে। ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী লাইলা এমতো অভিমতের প্রবক্তা।

জুহাকের বক্তব্যের অনুকরণে ইবনে জারীর বলেছেন, জ্বিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তারা পানাহারও করবে। নাককাশা তাঁর তাফসীরে এই মর্মে এক হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্বাসী জ্বিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু শায়েখকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, জ্বিনেরা পরকালে কী কী নেয়ামত পাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক তাদের অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে সৃষ্টি করে দিবেন জিকির ও তসবীহ্'র সতত অনুরণন। তারা ওই জিকির ও তসবীহ্'র মাধ্যমে সেরকমই আস্বাদ প্রাপ্ত হবে, যেভাবে আস্বাদ লাভ করবে বিশ্বাসী মানুষেরা জান্নাতের বিভিন্ন প্রকারের আপ্যায়ন দ্বারা। এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, আবু শায়েখ বিশ্বাসী জ্বিনদেরকে করেছেন ফেরেশতাদের পর্যায়ভূত। কেননা ফেরেশতাদের অবস্থাও তখন হবে এরকম। ইবনে মুনজির বলেছেন, আমি একবার হজরত হামযা ইবনে হাবীবকে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বিন জাতি কি কোনো প্রতিদান পাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'লাম ইয়াত্বমিছ্হুন্না ইনসুন ক্ববলাহুম ওয়া লা জ্বান' (ইতোপূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি কোনো মানব অথবা জ্বিন)। কাজেই জান্নাতে মানব হুর পাবে মানুষ এবং জ্বিন হুর পাবে জ্বিনেরা।

জুহাক সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন সমগ্র সৃষ্টি বিভক্ত হবে তিনটি শ্রেণীতে। একশ্রেণী হবে বিনা বিচারে জান্নাতী, আর একদল বিনা বিচারে জাহান্নামী। প্রথম দল হবে ফেরেশতাদের এবং দ্বিতীয় দল জ্বিনদের। তৃতীয় দলটির মধ্যে কেউ কেউ প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং কেউ কেউ নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। আর তারা হবে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়ভূত।

ইবনে ওয়াহাবের নিকট একবার জিজ্ঞেস করা হলো, জ্বিনদেরকে কি কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর পাঠ করলেন 'মানুষ, জ্বিন— প্রত্যেকের জন্য রয়েছে যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা'। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেছেন, জ্বিনেরা থাকবে জান্নাতের সন্নিকটবর্তী প্রান্তরে, জান্নাতাভ্যন্তরে নয়।

জ্বিনদের পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রবক্তারা বলেন, বিশেষভাবে নয়, সাধারণভাবেই আল্লাহ্পাক উল্লেখ করেছেন 'যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা আপ্যায়িত হবে জান্নাতুল ফেরদাউসে'। এরকম আয়াত রয়েছে আরো অনেক। তাছাড়া সুরা ক্বসাসে জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'ওলিমান খাফা...লাম ইয়াত্বমিস্ হুন্না ইনসুন'। হানাফী বিদ্বানগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে কেবল মানবজাতির কথা। জ্বিনেরা এ আয়াতের বক্তব্যভূত নয়। সুফীসাধকগণের অভিমতও এরকম। অবশিষ্ট রইলো সুরা আর রহমানের পুনঃপুনঃ বিধৃত 'তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে' আয়াত প্রসঙ্গ। এ আয়াতে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে জ্বিন ও মানুষ উভয়কে। এই আয়াতখানি

আবার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের পরেও। যেমন 'নিক্ষেপ করা হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রপুঞ্জ। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'। আবার 'অপরাধীদেরকে চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অমান্য করবে'। আবার ওই সুরায় বর্ণিত সাধারণ অনুগ্রহসম্ভারের কোনো কোনোটি প্রযোজ্য কেবল মানুষের বেলায়। জ্বিনদের সেখানে কোনো দখলই নেই। সেগুলোর পরেও আবার জ্বিন-মানব উভয়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ অনুকম্পাকে অস্বীকার করবে'। যেমন সাগরে বিচরণশীল জাহাজের কথা। এগুলো তো মানুষেরই কাজে লাগে। জ্বিনদের জাহাজের কোনো প্রয়োজনই নেই। অথচ সেখানেও উভয়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে। সুতরাং এমতো সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, জান্নাতের অনুগ্রহসম্ভারের অধিকারী হবে কেবল মানুষ, জ্বিনেরা নয়।

আমার মতে বিদ্বানগণের ঐকমত্যটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেন, জ্বিনেরাও পুণ্যাধিকারী হয়। একথা সুপ্রমাণিত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা কেবল দলিল প্রমাণের অভাবেই এর অধিক মন্তব্য করতে পারেননি। আর এ ব্যাপারে হজরত ইবনে আব্বাস, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ যা কিছু বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর সূত্রপরম্পরা সর্বোন্নত পর্যায়ের না হলেও বক্তব্যার্থ সর্বোন্নত পর্যায়েরই। তবে সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, বিশ্বাসী জ্বিনদের জন্য রয়েছে পুণ্য এবং অবিশ্বাসী জ্বিনদের জন্য রয়েছে শাস্তি। আমরা প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. জানালেন, তারা বসবাস করবে আ'রাফে, জান্নাতে নয়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আ'রাফ কী? তিনি স. বললেন, সাগর, বৃক্ষ ও ফলে পরিপূর্ণ জান্নাতের বাইরের একটি স্থান।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

r উহারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম,

r যদ্দ্বারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

r এবং এই যে মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সহিত তোমরা অন্য কাহাকেও ডাকিও না।

r আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জ্বিন ও মানুষ যদি ইমান আনতো এবং ইসলামের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তবে আমি তাদেরকে কখনো অন্ন সংকটে ফেলতাম না, দান করতাম প্রচুর উপজীবিকা।

এখানে 'সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো' অর্থ যদি তারা মেনে নিতো আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। 'আর প্রচুর বারিবর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম' অর্থ তাহলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে আমি তাদের ভূমিকে করতাম সুজলা, সুফলা। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক মক্কাবাসীদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন একটানা সাত বৎসরের অনাবৃষ্টি। অন্নকষ্টে যখন তারা ঘোর বিপন্ন, তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'প্রচুর বারিবর্ষণ' অর্থ প্রতুল জীবনোপকরণ। কেননা পানিই জীবনোপকরণ প্রাপ্তির প্রধান উৎস। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যে জীবনোপকরণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন....'। এখানে 'জীবনোপকরণ' (রিজিক) অর্থ পানি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌কে মান্য করা ও সত্যাধিষ্ঠিত হওয়ার শর্তে দেওয়া হয়েছে প্রতুল রিজিক প্রদানের অঙ্গীকার। এরকম নিশ্চয়তার কথা ঘোষিত হয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন ১. যদি তারা প্রতিষ্ঠা করে তওরাত, ইঞ্জিল, আরো যা অবতীর্ণ হয়েছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, তবে অবশ্যই তারা আহার করবে তাদের মাথার উপর থেকে এবং পায়ের তলদেশ থেকে ২. জনপদবাসী যদি ইমান গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য উন্মোচন করে দিবো আকাশের বরকতসম্ভার।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যদ্দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম'। একথার অর্থ— আর সুপ্রচুর জীবনোপকরণ দিয়ে আমি তাদেরকে এই মর্মে পরীক্ষাও করতাম যে, তারা আমার দানের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আতা ইবনে রেবাহ, জুহাক, কাতাদা, মুকাতিল ও হাসান বসরী। আর রবী ইবনে আনাস, জায়েদ ইবনে আনাস, কালাবী এবং ইবনে কীসান ব্যাখ্যা করেছেন— যদি তারা সত্যাধিষ্ঠিত না হয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরেই অনড় থাকে, তবুও আমি তাদেরকে দান করবো ধনবল, জনবল ও অন্যান্য পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য। এরকম করবো আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য, যেনো সত্যোপলব্ধির অবকাশ আর না পায় এবং ঘোর পার্থিবতায় মগ্ন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চিরদিনের জন্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে যখন তারা মুখ

ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন তাদের জন্য আমি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম সকলকিছুর দুয়ার'। কিন্তু ব্যাখ্যাটি যথার্থ নয়। কেননা এতে করে এই ধারণাটিই বদ্ধমূল হয়ে পড়বে যে, জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈভবিত জীবন মাত্রেরই উৎসস্থল কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যান। অথচ উক্ত আয়াতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে 'যদি তারা প্রতিষ্ঠা করে তওরাতের বিধিবিধান.... আর জনপদবাসী যদি ইমান গ্রহণ করে'। সুতরাং বুঝতে হবে বক্তব্যদু'টো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এখানে বলা হয়েছে 'সমগ্র মানবজাতি যদি এক দলভূত না হতো, তাহলে যারা তাদের দয়াময় প্রভুপালকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের গৃহের ছাদগুলি আমি করে দিতাম রৌপ্যের'। কিন্তু বাস্তবে সেরকম হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে, এরকম না করার কারণ এই যে, এতে করে সবাই এরকম ধারণাকেই বদ্ধমূল বলে মনে করতো যে, বিত্তশালী হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে কুফরী। আর এরকম ধারণা তাহলে এমন সর্বোজনীন হয়ে পড়তো যে, সকলেই তখন হয়ে যেতো সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী। তারা ছাড়া অন্য কোনো দল আর থাকতোই না। এখন আসা যাক 'তারা যখন বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলো উপদেশ....' এই আয়াতের আলোচনায়— এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তাতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে উপদেশবিস্মৃতির উপর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বক্তব্যটি একটি অতীত ইতিবৃত্তের বিবৃতি। সাধারণ বিধান এটা নয়। আর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটও শেষোক্ত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। ঘটনাটি ছিলো এরকম— আবু জেহেল ও তার সঙ্গী-সাথীরা যখন সীমালংঘন করলো, তখন আল্লাহ্‌পাক তাদের উপরে চাপিয়ে দিলেন সাত বৎসরের একটানা দুর্ভিক্ষ। পরিস্থিতি এতো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ালো যে, ক্ষুধার তাড়নায় তারা চতুষ্পদ জন্তুর বর্জ্য ভক্ষণ করেও জীবন বাঁচাতে বাধ্য হলো। পরে তাদেরকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো বদর যুদ্ধে। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করেও মহান ইসলামে অনড় অবস্থান করার বদৌলতে পরবর্তীতে লাভ করেছিলেন স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান ও সাম্রাজ্য। রোম ও পারস্যের মতো দুর্ধর্ষ জাতিগোষ্ঠীগুলোও হয়েছিলো তাদের অধীন। এছাড়া পরবর্তী বাক্যটিও প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটির পরিপোষক। যেমন এরপর বলা হয়েছে—

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন'। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকে তাকে তিনি দান করবেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে, আর ইহকালে লাঞ্ছিত করবেন এবং পরকালে দুঃসহ শাস্তিতে নিপতিত করবেন তাকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র স্মরণবিচ্যুত।

এখানে 'আ'জাবান সআ'দা' অর্থ দুঃসহ শাস্তি, অসহনীয় দুঃখ যাতনা। আর সে শাস্তি হতে পারে পৃথিবীতে, কবরে, অথবা পরকালে। অথবা সকল স্থানে। তবে জাগতিক শাস্তিই আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যভঙ্গির সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

কেননা একথা বলা হয়েছে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের বিপরীতে। এরকম কথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে 'যে আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার পার্থিব জীবন হবে অনটনক্লিষ্ট এবং পুনরুত্থান দিবসে আমি তাকে অন্ধ করে ওঠাবো'। এ আয়াতে 'অনটনক্লিষ্ট' অর্থ পার্থিব জীবনের অভাব-অনটন। আর অন্ধ করে ওঠানোর শাস্তিটি হবে তার পরকালে। এখানে বক্তব্যগত কোনো অস্পষ্টতা একেবারেই নেই। এর বিপরীত বক্তব্য এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে এভাবে 'যে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী পুণ্যকর্ম করে, তাকে আমি অবশ্যই দান করি পুতঃপবিত্র জীবন, আর আমি তাকে দান করবো উত্তম পারিতোষিক'। এ আয়াতে 'হায়াতান ত্বইয়্যিবান' (পুতঃপবিত্র জীবন) অর্থ পৃথিবীর আনন্দঘন জীবন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তাকওয়া' বা সংযমের অভাব ঘটলে স্বচ্ছল জীবনকেও মনে হবে অনটনক্লিষ্ট। উল্লেখ্য, যাদের সংযম নেই তারা বিত্তশালী হলেও পরিতৃপ্ত হতে পারে না। কারণ তারা সব সময় এক আতংকে ভুগতে থাকে যে, এই বুঝি অর্থবিত্ত সব হাতছাড়া হয়ে গেলো। যে অর্থ ব্যয় হলো তা বুঝি আর পূরণ হবে না। এ সকল দুঃশ্চিন্তার কারণেই তারা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় অপরিতৃপ্তি ও অস্বস্তির সঙ্গে। অথচ এক সময় সকলকিছু তো তাদের অধিকারচ্যুত হয়েই যায়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'অল্পেতুষ্টি' বৈশিষ্ট্যটি সাধারণত বিত্তপতিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে কারণেই স্বস্তির মুখ দেখার সৌভাগ্য তাদের কোনোদিনই হয় না।

আমি বলি, পৃথিবীপ্রসক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে 'অল্পেতুষ্টি' গুণটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, একথা ধ্রুব সত্য। সেকারণেই তারা প্রতিটি মুহূর্ত লিপ্ত থাকে উপার্জনের চিন্তায় এবং সার্বক্ষণিক প্রহরী হয়ে যায় সঞ্চিত সম্পদের। সম্পদচ্যুতির আশংকায় মনোকষ্ট পেতে থাকে প্রায় সারাক্ষণ। হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি। তারা কখনো অনুমানও করতে পারে না, বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীর সংযমশোভিত জীবন কতো আস্বাদ্য, স্বস্তি-সুখ পূর্ণ। তাঁরা অল্পে তুষ্ট। তাই সম্পদচ্যুতির আতংক তাঁদের নেই। নেই কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুশ্চিন্তা ও অশান্তি। তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য পেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে অবলম্বন করেন ধৈর্য। এভাবে আল্লাহ্‌রই স্মরণে থাকেন সতত মগ্ন। বরং তাঁদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্‌র অধিকতর নৈকট্যভাজন, তাঁদের কাছে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক আস্বাদ্য। কারণ তাঁরা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ্‌প্রেমিক। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন সুখের আস্বাদে প্রবৃত্তিও অংশগ্রহণ করে, যদিও সে হয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে তার অংশগ্রহণের কোনো সুযোগই নেই। দুঃখকালে জেগে থাকে কেবল পরম প্রেমময় প্রভুপালকের একক অভিপ্রায়, সে অভিপ্রায়ের মধ্যে স্বঅভিপ্রায়কে বিলীন করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ, চূড়ান্ত সফলতা।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এবং এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না'।

বাক্যটির সংযোগ রয়েছে ১৬ সংখ্যক আয়াতের 'তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অপরাপর প্রত্যাদেশের সঙ্গে এই প্রত্যাদেশটিও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ নির্মাণ করা হয় কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য। মসজিদের মধ্যে অংশীবাদিতামূলক কার্যকলাপ করার অধিকার কারো নেই। সুতরাং তোমরা মসজিদসমূহে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত কোরো না।

কাতাদা বলেছেন, ইহুদী-খৃষ্টানেরা তাদের উপাসনালয়সমূহে আল্লাহ্‌কে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও ডাকতো। যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সেখানে আল্লাহ্‌র পুত্র জ্ঞানে ডাকতো যথাক্রমে হজরত উযায়ের এবং হজরত ঈসাকে। সেজন্য আল্লাহ্‌পাক এখানে মুসলমানদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেনো সেরকম না করে। মসজিদে আরাধনা করে কেবল আল্লাহ্‌র। এখানে 'মসজিদ' অর্থ পৃথিবীর সকল মসজিদ। এক আয়াতে কাবা মসজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তোমরা এই গৃহকে রুকুকারী, সেজদাকারী, অবস্থানকারী ও প্রদক্ষিণকারীদের জন্য সতত পবিত্র রাখো'। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা মসজিদ থেকে পৃথক রাখো শিশু, উন্মাদ, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাদ-বিসম্বাদ, চীৎকার, দণ্ডবিধান ও উন্মুক্ত অসি থেকে। মসজিদের প্রবেশ দ্বারে রেখে দিয়ো পবিত্রতা অর্জনের আয়োজন। আর জুমআর দিবসে মসজিদকে কোরো সুশোভিত। ওয়াসেলা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে শোয়াইব উল্লেখ করেছেন, আমার পিতামহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মসজিদে উচ্চস্বরে কবিতা পাঠ, ক্রয়-বিক্রয় এবং জুমআর দিন গল্পের আসর বসাতে নিষেধ করেছেন। তিনি স. আরো বলেছেন, মসজিদের ভিতরে থুথু ফেলা পাপ। যদি কেউ এরকম করেই ফ্যালে, তবে সে যেনো তা মাটির মধ্যে দাবিয়ে দেয়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পুণ্যকর্ম আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি স. আরো আজ্ঞা করেছেন, তোমরা যদি মসজিদের ভিতরে কাউকে তার হারানো উটের খোঁজ-খবর নিতে শোনো, তবে বোলো, আল্লাহ্ যেনো তোমার উটকে ফিরিয়ে না দেন। কেননা হৃত উটের খোঁজ-খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করছেন তিরমিজি ও দারেমী। হাদিসটি উল্লেখ করার পর এর বর্ণনাকারী তিরমিজি ও দারেমী বলেছেন, মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলেও তোমরা বোলো, আল্লাহ্‌পাক যেনো তোমার ব্যবসায় উন্নতি না দেয়।

হাসান বসরী বলেছেন, এখানে 'মসজিদ' বলে বুঝানো হয়েছে সারা পৃথিবীর জমিনকে। কেননা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য গোটা পৃথিবীকেই মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই যে কোনো স্থানে তারা নামাজ পাঠ করতে পারে। সুতরাং এখানকার 'তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না' কথাটির মর্মার্থ হবে— কোনো স্থানেই তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে শরীক কোরো না।

আবু সালেহ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার জ্বিনেরা রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা কি আপনার সঙ্গে মসজিদে নামাজের জামাতে অংশ নিতে পারি? তাদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত যোবায়ের বলেছেন, একবার জ্বিনেরা রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আমরা কেমন করে আপনার সঙ্গে নামাজের জামাতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে পারবো? আমরা তো থাকি অনেক দূরে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। কোনো কোনো জ্ঞানী বলেন, এখানে 'মসজিদ' অর্থ সেজদার স্থান। অর্থাৎ সেজদায় ব্যবহৃত কপাল, হাত-পা স্থাপন করার স্থান। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। সুতরাং এসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সেজদা কোরো না। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সেজদা করতে বলা হয়েছে— ললাট, দু'হাঁটু, দুই হাত, দুই পা। এরকমও আদেশ করা হয়েছে যে, নামাজের মধ্যে কাপড় গুটিয়ে নিতে পারো, ধূলাবালি নয়।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হলো, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো'।

এখানে 'আল্লাহ্‌র বান্দা' (আবদুল্লাহি) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। এখানে এরকম বলে প্রকাশ করা হয়েছে রসুল স. এর অতুলনীয় বিনয়াবনতাকে, যা দাসত্বের মর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। 'তাঁকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হলো' অর্থ রসুল স. যখন নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। নামাজের দণ্ডায়মানতাই একজন আল্লাহ্‌র বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এরকম বলেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ। 'তাঁকে ডাকবার জন্য' অর্থ আল্লাহ্‌র ইবাদত করবার জন্য।

কাদূ ইয়াকূনূনা আ'লাইহি লিবাদা' অর্থ তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। ক্বারী হিশাম এখানকার 'লিবাদা' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'লুবাদা'। আর 'লিবাদা' পাঠ করতেন অন্য ক্বারীগণ। 'লুবদাতুন' এর বহুবচন 'লুবাদুন' বা 'লিবাদুন'। শব্দটির ধাত্যার্থ— মানুষের প্রচণ্ড ভীড়, যেনো একজন চড়েছে আরেকজনের ঘাড়ে। কাতাদা এবং ইবনে জায়েদ কথাটির অর্থ করেছেন— রসুল স. যখন জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো মক্কার অংশীবাদী ও দুষ্ট জ্বিনেরা। এভাবে আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসলামের নূরকে তারা ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের সকল বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োজিত করলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অন্যরূপ। তিনি তাঁর রসুলের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করতে চেয়েছেন। তাই শতসহস্র বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা হয়েছে দুর্বার। পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়েছে বিজয়ীর বেশে।

বক্তব্যটি এখানে এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. যখন বতনে নাখলায় নামাজে দণ্ডায়মান হয়ে কোরআন পাঠ করতে শুরু করলেন, তখন জ্বিনদের একটি দল কোরআন শোনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহভরে সেখানে ভীড় জমালো।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُّجِيْرَنِي مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ وَّلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهِۦ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتّٰٓى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيْٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾

r বল, ‘আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও শরীক করি না।’

r বল, ‘আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নহি।’

r বল, ‘আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাইব না,

r ‘কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পৌঁছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

r যখন উহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, বুঝিতে পারিবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

r বল, ‘আমি জানি না তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন।’

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে ‘ক্বুল’। এরকম পাঠ করতেন ক্বারী আসেম, ক্বারী হামযা ও ক্বারী আবু জাফর। অন্যান্য ক্বারী পাঠ করতেন ‘ক্বলা’। ‘ক্বুল’ অর্থ বলো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি জ্বিনদেরকে বলুন। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! যারা অতি আগ্রহভরে আপনার কাছে ভিড় জমিয়েছে, ওই সকল জ্বিনকে আপনি বলুন, আমি আমার সকল আবেগ-

আবেদন উপস্থাপন করি আমার পরম প্রভুপালকের নিকটে। তোমরাও এরূপ করো। আর কখনোই কাউকে অথবা কোনোকিছুকে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশীদার নির্ধারণ কোরো না। আর এখানকার 'কুল'কে যদি পড়া হয় 'ক্বলা' তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে—আল্লাহ্‌র বান্দা তখন ওই জ্বিনদেরকে বললেন, তোমরা অযথা ভীড় জমিয়ে আমার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছো কেনো? আমি তো তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে। আর এ বিষয়েও তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তোমরা কখনোই কাউকে অথবা কোনো কিছুকে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশীদার বানিও না।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, তোমাদের লাভ-ক্ষতি অথবা তোমাদের পথভ্রষ্টতা-পথপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার অধিকারীও আমি নই। আমি কেবল সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শক। সুতরাং সত্য পথের দিকে আহবান জানানোই আমার কাজ। এখানে 'রুশদ্' অর্থ ইষ্ট এবং 'দ্বর্‌রা' অর্থ অনিষ্ট। মর্মার্থ— পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা। যেভাবেই অর্থ করা হোক না কেনো, একটি বিশেষ্য হবে ধাত্যর্থক এবং অপরটি রূপকার্থক।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না'।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য গঠিত হয়েছে দু'টো বাক্যের সমন্বয়ে। আর 'মুলতাহাদা' অর্থ এখানে আশ্রয়স্থল। শব্দটিকে যেদিকেই সম্পর্কযুক্ত করা হোক না কেনো, এখানকার বাক্য দু'টো হবে একটি অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর। ওই অনুক্ত প্রশ্নটি হচ্ছে— রসুলেপাক স. যেনো আল্লাহ্‌কে বলছেন, হে আমার আল্লাহ্! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো আমার প্রচারকর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কেউ কেউ বলছে, তুমি যদি সত্যি সত্যিই নবী হও, তবে আমি যে তোমাকে অমান্য করলাম, এর জন্য তুমি তোমার কথিত শাস্তি আনয়ন করো। আবার কেউ কেউ বলছে, তুমি আমাদের ধর্মের বিরোধিতা যদি পরিত্যাগ করো, তবে আমরাই তোমাকে আশ্রয় দান করবো। আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করবো। এখন আমি তাদেরকে কী বলবো? এমতো সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবেই যেনো এখানে বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, যদি তিনি আমাকে শাস্তি দিতে চান। কেননা তাঁর অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর এরকম যদি ঘটেই, তবে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আশ্রয় আমি পাবো না। বস্তুত তিনি ছাড়া কারোই কোনো আশ্রয়স্থল নেই। এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানকার প্রথম বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি যেনো এরকমের— যখন রসুল স. এর

সঙ্গে তারা সাক্ষাতের জন্য আগ্রহান্বিত হলো, তখন তিনি স. নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন, আমি তাদেরকে কী বলবো এখন? তাদের অপধারণাটি অপসারিত করাই সম্ভবত সমীচীন। অপধারণাটি হচ্ছে— রসুল স. ই সকল কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ন্তা। তখন আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিলেন, হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্ যদি আমাকে শাস্তি দিতে চান, তবে সে শাস্তি থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আবার এরকমও হতে পারে যে, এখানকার প্রথম বাক্যটি রসুল স.কে বলতে বলা হয়েছে সীমাতীত বিনয় প্রকাশার্থে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি এসেছে প্রথম বাক্যটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলতে। হাজরামী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, জ্বিনদের কোনো এক গোত্রনেতা তার গোত্রের লোকদেরকে বলেছিলো, মোহাম্মদ মনে হয় চান, আমরা তাঁকে আশ্রয় দেই। কাজেই আমিই তাঁকে আশ্রয় দান করলাম। তার এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব'। এখানকার 'ইল্লা' (কেবল, ব্যতীত) শব্দটি ব্যতিক্রমী অব্যয়। অর্থাৎ এখানে এই অব্যয়টির মাধ্যমে আগের আয়াত দু'টোর ব্যতিক্রমী বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। বরং ব্যতিক্রমী অব্যয়টির মাধ্যমে যেনো আগের অক্ষমতাপ্রকাশক বক্তব্য দু'টোকে (ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না) আরো অধিক গুরুত্ববহ করা হয়েছে। আর এই বিষয়টিও প্রমাণ করা হয়েছে যে, নবীগণের কাজ কল্যাণ নির্ধারণ নয়, কল্যাণের সংবাদ প্রচার। অথবা ব্যতিক্রমী অব্যয়টি এখানে সম্পর্কযুক্ত হবে আগের আয়াতের 'আহাদুন' (কেউ) কিংবা 'মুলতাহাদ' (আশ্রয়স্থল) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্র শাস্তি থেকে যেমন কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, তেমনি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো আশ্রয়ও আমার নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্র বাণী প্রচারের যে দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত, সেই দায়িত্বের যথাপ্রতিপালনই কেবল আমাকে রক্ষা করতে পারে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে এবং সেটুকুর বদৌলতেই আমি পেতে পারি আল্লাহ্র আশ্রয়লাভের নিশ্চয়তা। অন্যথায় নিষ্কৃতিপ্রাপ্তির অন্য কোনো অবলম্বন আমার নেই। হাসান ও মুকাতিল কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমার না আছে ইষ্ট-অনিষ্টের উপরে কোনো অধিকার, না আছে কাউকে হেদায়েত করার ক্ষমতা। আমাকে তো কেবল দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্র বচনবৈভব পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানকার 'ইল্লা' শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'ইন্ লা'। শর্তযুক্ত 'ইন' অর্থ যদি এবং 'লা' অর্থ না। আর শর্তের পরিণতি এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি তাঁর মহাবাণী যদি মানুষের কাছে না প্রচার করি, তবে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না তাঁর শাস্তি থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে'।

এখানকার ‘মান’ (যে) শব্দটি একবচন হওয়ার কারণে ‘ইয়া’সি’ (যে সীমালংঘন করে) এবং ‘লাহু’ (তার জন্য) কথাটিও এসেছে একবচনে। ‘খলিদীনা’ কথাটি আবার বহুবচন হয়েছে ভাবগতভাবে। আর এখানকার ‘অমান্য করে’ কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বার্তা পৌঁছানোই কেবল আমার দায়িত্ব। তাই আমি এমতো দায়িত্ব পালনে সতত তৎপর। এখন যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে মান্য করবে, সে সুপথ পাবে এবং যে এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে অবশ্য অবশ্যই প্রবেশ করবে জাহান্নামে। আর জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী আবাস।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প’।

১৯ সংখ্যক আয়াতের ‘তারা তাঁর নিকট ভীড় জমালো’ কথাটির অর্থ যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের যুথবদ্ধ বিরোধিতা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে— তাদের বিরোধিতা চলতে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তারা প্রতিশ্রুত শাস্তির সম্মুখীন হবে। তারা তো রসুলকে দুর্বল মনে করেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতো এবং ভাবতো, তারা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু তারা সহজেই ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পারবে। কিন্তু তাদের এমতো অপধারণা কর্পুরের মতো উবে যাবে তখন, যখন এসে পড়বে প্রতিশ্রুত শাস্তি। তখন তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, দুর্বল ও সংখ্যালঘু কে। আর যদি ‘ভীড় জমানো’র অর্থ হয় কোরআন শুনতে আগ্রহী জ্বিন সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ, তবে এখানকার ‘হাত্তা’ (যতোক্ষণ না) অব্যয়টির সম্বন্ধ হবে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে এবং সে বাক্যটি হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থাবিষয়ক। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা রসুল স.কে দুর্বল মনে করেই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলো। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে দুর্বল মনে করে তাঁর অবাধ্যতা করতেই থাকবে, যতোক্ষণ না প্রত্যক্ষ করবে আল্লাহ্র শাস্তি।

এখানে ‘প্রতিশ্রুত শাস্তি’ অর্থ বদর যুদ্ধের শাস্তি। ওই যুদ্ধে তাদের অনেকেই নিহত ও আহত হয়েছিলো, কেউ কেউ হয়েছিলো বন্দী এবং অবশিষ্টরা প্রাণ বাঁচিয়েছিলো পালিয়ে। আর ‘প্রতিশ্রুত শাস্তি’ অর্থ যদি পরকালের শাস্তি হয়, তবে সে শাস্তি হবে, মৃত্যু, কবরের আযাব, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও দোজখ। আর ‘বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প’ অর্থ প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে তাদের কাছে এই তত্ত্বটি উন্মোচিত হয়ে পড়বে যে, দুর্বল ও সংখ্যায় স্বল্প কার দল— রসুল স. এর, না তাদের। এই প্রশ্নবোধক বাক্যটির পুরোটাই এখানে ‘ফাসাইয়া’লামূন’ (বুঝতে পারবে) কথাটির দুটি কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘বলো, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য

কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন'। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কেউ কেউ যখন বলতে শুরু করলো, কই, কোথায় তোমার তথাকথিত শাস্তি। সত্যবাদী যদি তুমি হও, তবে এখনই শাস্তি নিয়ে এসো। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এখানে 'ক্বরীব' অর্থ আসন্ন। বিধেয়টি এখানে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে 'মা তূআ'দূন' (তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) উদ্দেশ্যের। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পরিপূরিত হবে। কিন্তু তা এখনই হবে, না পরে, তা আমি জানি না। বিষয়টি সম্পূর্ণতই আমার প্রভুপালকের অভিপ্রায়াধীন। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۙ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

r তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,

r তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন,

r রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কি না জানিবার জন্য। রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

'আ'লিমুল গইব' অর্থ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। কথাটি আগের আয়াতের 'রব্বী' (আমার প্রতিপালক) এর বিশেষণ। অথবা একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। অর্থাৎ 'হুয়াল আ'লিমূল গইব'। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— তিনিই অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা নয়।

'গইব' অর্থ অদৃশ্য, অনুপস্থিত, অপ্রত্যক্ষ। যেমন পরলোকের ঘটিতব্য বিষয়। অথবা অতীতের অবলুপ্ত ঘটনা, ইতিহাস যা ধরে রাখেনি। অথবা আল্লাহ্র সত্তা সম্পৃক্ত নাম-গুণাবলী, যে গুণগুলো সম্পর্কে তাঁর বান্দাগণ অনবগত, যা দলিল-প্রমাণের ঊর্ধ্বে। অবশ্য আল্লাহ্পাকের কোনো কোনো নাম ও গুণ সম্পর্কে আমরা

পরিচিত— যেমন, তিনি চিরঞ্জীব, গফুর, রহমান। পৃথিবীর পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কেও আমরা অনবগত নই। সুতরাং শ্রুতি, দৃষ্টি ও চিন্তার আয়ত্ত যা কিছু, তার কোনোটাই 'অদৃশ্য' পদবাচ্য নয়।

কোনো কোনো জিনিস আবার এমনও রয়েছে যে, তা কখনো দৃশ্যমান, আবার কখনো অদৃশ্য। যেমন ফেরেশতা ও জ্বিন। তারা আকৃতি ধারণ করলে দৃশ্যমান হয়, নচেৎ থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। আবার দূরের জিনিস অগোচর হলেও, ফেরেশতা-জ্বিনদের কাছে তা দৃশ্যমান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে, ফেরেশতা ও জ্বিনেরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। এক আয়াতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে এভাবে 'যখন (নবী সুলায়মানের) পবিত্র মরদেহ ভূতলশায়ী হলো, তখন জ্বিনেরা জানতে পারলো তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ। তারা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতো, তবে কখনোই অবস্থান করতো না লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির মধ্যে'।

অথবা 'অদৃশ্য' অর্থ এখানে পৃথিবীবাসীদের কাছে অদৃশ্য, যেমন আকাশজগত। যেমন প্রাচ্যবাসীদের কাছে অদৃশ্য প্রতীচ্য এবং প্রতীচ্যবাসীদের কাছে অদৃশ্য প্রাচ্য। তবে এধরনের অদৃশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় কখনো কখনো প্রত্যাদেশ, অথবা ইলহামের (অন্তর্জ্ঞানের) মাধ্যমে। আবার কখনো মধ্যবর্তী অন্তরাল অপসারিত করে কাশফের (অন্তর্চক্ষুর) মাধ্যমে। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বসেছিলাম হাজরে আসওয়াদের সম্মুখে। কুরায়েশরা আমাকে মেরাজ রজনীর ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। জিজ্ঞেস করতে লাগলো, বায়তুল মাকদিস মসজিদের কয়টি সিঁড়ি, কয়টি দরজা ইত্যাদি। আমি অস্বস্তিতে পড়লাম। কেননা অতো কিছু তো আমি মনে রাখিনি। তখন বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো আমার ও বায়তুল মাকদিসের দূরত্বের অন্তরাল। আমি তখন দেখে দেখে জবাব দিতে লাগলাম তাদের প্রশ্নের।

আবু ওমর সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর একবার সারিয়াকে সেনাপতি বানিয়ে তাঁর নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে পাঠালেন এক যুদ্ধক্ষেত্রে। এরপর একদিন মসজিদে খুতবা দান কালে হঠাৎ বলে উঠলেন, হে সারিয়া! জাবাল! জাবাল! (পাহাড়ের দিকে, পাহাড়ের দিকে)। অর্থাৎ খুতবা দান কালেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মদীনা থেকে বহু দূরের সারিয়া-বাহিনীকে। দেখেছিলেন, একদল শত্রুসেনা পেছনের পাহাড় থেকে তাদের উপরে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি 'পাহাড়ের দিকে' এরকম বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন সারিয়া-বাহিনীকে। আর ওই বাহিনীও আমিরুল মুমিনীনের কণ্ঠস্বর শুনে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর পরলোকগমনের পর তাঁর সমাধি থেকে যে আলোর উদ্ভাস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো, সে সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতাম। উল্লেখ্য, অন্তরাল উন্মোচিত হওয়ার পর অন্তরালবর্তী বিষয় আর

অদৃশ্য থাকে না, যদিও তা পরিদৃষ্ট হয় অলৌকিক নিয়মে। আবার এমতো দৃশ্য সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর নয়। একারণেই পরবর্তী আয়াতের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে 'তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত'। আর আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে এধরনের অদৃশ্যজ্ঞান দান করেন এ কারণে যে, তাঁদের সুসংবাদপ্রদানকর্ম ও ভীতিপ্রদর্শন কার্য যেনো প্রতিষ্ঠিত থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত'। অর্থাৎ তাঁর মনোনীত প্রত্যাদেশবাহক যাঁরা, তাঁদের কাছে তিনি অদৃশ্যের কোনো কোনো বিষয় প্রকাশ করেন।

এখানে 'মির রসুলি' অর্থ রসুল, প্রত্যাদেশ বাহক, দূত, প্রেরিত পুরুষ। উল্লেখ্য, ফেরেশতা ও মানুষ উভয়েই রসুল হতে পারে। নবীগণ প্রেরিত পুরুষ হিসেবেই পৃথিবীতে প্রচার করেন আল্লাহ্র বিধি-বিধান। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁদের উপরে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদেরকেই ব্যবহারিক অর্থে বলা হয় রসুল। প্রকৃত অর্থে সকল নবীই রসুল, অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত পুরুষ। কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, রূপকার্থে ওলীগণও রসুল পদবাচ্য। কেননা রসুল স. বলেছেন, ধর্মীয় বিষয়ের বিদ্বানগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। এরকম বর্ণনা করেছেন কাছীর ইবনে কায়েস সূত্রে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী, হজরত আনাস সূত্রে বোখারী এবং হজরত আলী সূত্রে ইবনে আদী। শেষোক্ত সূত্রপরম্পরা কর্তৃক প্রাপ্ত বিবরণটি এরকম— রসুল স. বলেছেন, আলেমগণ পৃথিবীর প্রদীপ্ত প্রদীপ এবং তাঁরা নবীগণের স্থলাভিষিক্ত। অথবা বলেছেন, আলেমগণ আমার উত্তরাধিকারী। হজরত আনাস সূত্রে ইবনে আকীল বর্ণনা করেছেন, আলেমগণ নবীগণের পক্ষ থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসভাজন, যতোক্ষণ তারা দ্বারস্থ হবে না কোনো শাসকের, অথবা যতোক্ষণ তারা থাকবে পার্থিব মোহমুক্ত।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত এই যে, ওলীগণের কারামতও নবীগণের মোজেজার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কারামত হচ্ছে মোজেজার প্রতিবিম্ব। আর প্রতিবিম্ব যেহেতু মূল বস্তুর অনুরূপ, সেহেতু কারামতও মোজেজার অনুরূপ। আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন, 'আমি প্রত্যেক রসুলকে তাঁদের মাতৃভাষায় দৌত্যকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেছি'। রসুল স. যেহেতু শেষ নবী, সেহেতু তাঁর কাছে সমগ্র মানবমণ্ডলী একই জাতি। আর সেকারণে সকল দেশের সকল গোত্রের আলেম-ওলী তাঁরই মুখপাত্র, তাঁরই বচন। তাঁদের অলৌকিকত্বও তাঁরই অলৌকিকত্ব, তাঁরই মোজেজার প্রতিবিম্ব, বিস্তৃতি বা বিকাশ। সুতরাং ওলীগণের যদি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। আল্লাহ্পাক যেহেতু অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন, সেহেতু তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্তরা তো সে জ্ঞানের অংশ পেতেই পারেন। বরং একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, তাঁদের অদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞান রসুল স. এর অদৃশ্য জ্ঞানেরই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। আবার যদি রসুল স. এর অদৃশ্য জ্ঞান থেকে তাঁদেরকে পৃথকও করা হয়, তবুও তাঁরা অদৃশ্য জ্ঞান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না। কেননা তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়

ইলহাম দ্বারা, যা ওহী বা প্রত্যাদেশের প্রতিবিম্ব। এরকম ধারণাও এই আয়াতের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। আর এমতাবস্থায় তাঁদের ইলহামগত জ্ঞান হবে ধারণাপ্রসূত, প্রত্যাদেশের মতো অকাট্য নয়। অর্থাৎ ইলহাম সত্য হবে তখন, যখন তা হবে প্রত্যাদেশের পরিপূর্ণ অনুকূল। আর তখনই তা হতে পারবে কেবল প্রত্যাদেশের প্রতিবিম্ব, যা প্রত্যাদেশেরই অধীন বা অন্তর্ভুক্ত। সে কারণেই সুফী-আউলিয়াগণ বলেন, ইলহামকে পরখ করতে হবে প্রত্যাদেশের নিরীখে। অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের মাপকাঠিতে। এভাবে পরীক্ষা করার পর কোরআন-হাদিসের অনুকূল যদি হয়, তবে তা হবে গ্রাহ্য। আর প্রতিকূল হলে হবে অবশ্য পরিত্যাজ্য। তাঁরা আরো বলেন, যা শরিয়তবিরোধী, তা অবশ্যই পথভ্রষ্টতা। উল্লেখ্য, এখানে যে অদৃশ্য জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা অকাট্য, সন্দিগ্ধ নয়। নবীগণকে কখনোই অস্পষ্টতার মধ্যে রাখা হয় না। কেননা তাঁরা অবশ্যঅনুসরণীয়। আর সন্দিগ্ধতা বা অস্পষ্টতা কখনোই অবশ্য অনুসরণীয় হতে পারে না।

এতোক্ষণের আলোচনার মাধ্যমে 'কাশশাফ' রচয়িতা জমখশরীর ওই অভিমতটি রহিত হয়ে যায়, যা মুতাজিলাদের মতবাদভিত্তিক। তা হচ্ছে— আলোচ্য আয়াতে কেবল নবীগণকে অদৃশ্যজ্ঞানদানের কথা বলা হয়েছে, ওলীদের বিষয়ে এখানে কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ তাঁর মতে নবীগণের মোজেজা সত্য হলেও ওলীগণের কারামত সত্য নয়। বলা বাহুল্য, মুতাজিলারা পথভ্রষ্ট। তাই তাদের অন্যান্য ভুল অভিমতসহ তাদের এই অভিমতটিও পরিত্যাজ্য।

ওলীগণের কারামত ও ইলহামের প্রমাণ রয়েছে কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতেও। যেমন—

'আর আমি মুসা-জননীকে ইলহাম করলাম, তুমি তাকে স্তন্য দান করো। আর যদি তার ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত হও, তবে তাকে নিক্ষেপ করো নদীগর্ভে। দুঃখ কোরো না। আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে ফিরিয়ে দিবো। তাকে আমি করবো আমার নবীগণের একজন'।

'অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলো, দুঃখ কোরো না। তোমার প্রভুপালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিবেন। আর তুমি খেজুর কাণ্ড ধরে নাড়া দাও, তা থেকে পতিত হবে সুপক্ক খেজুর। তুমি তা পান করো ও আহার করো এবং শীতল করো দু'চোখ। কোনো মানুষ যদি তোমার বিষয়ে প্রশ্ন করে, তবে তুমি ইঙ্গিতে বোলো, আমি রোজা মানত করেছি, তাই কথা বলবো না'।

'আমি হাওয়ারীগণের নিকট ইলহাম করলাম, আমার উপর এবং আমার রসুলের উপর ইমান আনো'।

পর্যালোচনা ঃ ওলীগণের যে ইলহামকে আমরা ধারণা প্রসূত (জন্নী) বলেছি, তা হচ্ছে অর্জিত জ্ঞান। কখনো তা অর্জিত হয় সরাসরি অনুপ্রেরণা (ইলহাম) যোগে, কখনো ফেরেশতাদের মাধ্যমে, আবার কখনো মধ্যবর্তী অন্তরাল বিলুপ্ত

করে, যেমন হয়েছিলো খলিফা হজরত ওমরের বেলায়। তাঁর সামনে থেকে অন্তরাল অপসৃত হয়েছিলো বলেই তিনি বহুদূরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন এবং তাদেরকে সতর্কও করে দিতে পেরেছিলেন তাঁর মিম্বরে দণ্ডায়মান থেকেই। তাঁর ওই আত্মিক প্রতিভাস (ইনকেশাফ) ওই শ্রেণীর প্রতিভাস, যা কখনো কখনো কোনো কোনো ওলীর অন্তরে প্রতিবিম্বিত হয় লওহে মাহফুজ থেকে। ওই সকল ওলী তা প্রাধ্যয়ন করে থাকেন অনড় (মুবরাম) অথবা পরিবর্তনশীল (মুয়াল্লাক) অদৃষ্টলিপি হিসেবে। আবার এমতো প্রতিভাস কখনো কখনো পরিদৃষ্ট হয় স্বপ্নে অথবা আধ্যাত্ম্যানুশীলনাবস্থায় (মোরাকাবায়) উপমা জগতের প্রতিচ্ছায়ারূপে। তাই হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সঠিক স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, মুবাশ্‌শিরাত ব্যতীত নবুয়তের আর কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মুবাশ্‌শিরাত কী? তিনি স. বললেন, পরিশুদ্ধ স্বপ্ন। বোখারী। নবী-রসুলগণ ব্যতীত প্রজ্ঞার্জনের বর্ণিত মাধ্যমগুলোতে অন্যান্যদের ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তাই তাঁদের ইলহামের মধ্যে কখনো শয়তানের অপচেষ্টার প্রভাব পড়তেও পারে। কেননা মানুষের হৃদয়ে রয়েছে দুটি প্রকোষ্ঠ— একটি অধিকার করে রাখে ফেরেশতা এবং অপরটিকে প্ররোচনাপিষ্ট করে শয়তান। তাই কখনো কখনো শয়তানী প্ররোচনাও ফেরেশতাদের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশ পায়। আবার এর মধ্যে থাকতে পারে কল্পনার দখলও। অথবা শয়তান প্রতারণা করে কাশফ এবং উদাহরণ জগতের (আলমে মেছালের) পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায়। হজরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শুভ স্বপ্ন আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং অশুভ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। বোখারী, মুসলিম।

মোহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেছেন, স্বপ্ন তিন ধরনের— ১. মনের খেয়াল ২. শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি সঞ্চার ৩. আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে শুভসমাচার। বোখারী ও মুসলিম এরকমই বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো স্বপ্নের তাৎপর্য বিশ্লেষণেও হয়ে যায় ভুল, যদিও ওলীগণের কাশফ ও ইলহামে ভুল হয় কদাচিৎ। কেননা তাঁরা নবী না হলেও তাঁদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী। তাই উভয়ের মধ্যে রয়েছে সৌসাদৃশ্য। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নবীগণ মাসুম (নিষ্পাপ), আর ওলীগণ সুরক্ষিত (মাহফুজ)।

এবার আসা যাক ওলীগণের সত্তাসঞ্জাত জ্ঞানের (এলমে হুজুরীর) আলোচনায়। বলা বাহুল্য, ওলীগণের সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান দিবালোকের চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট। এই জ্ঞানকে এলমে লাদুন্নিও বলা হয়। এ জ্ঞান সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ্‌তায়ালার পরম সত্তা ও গুণবত্তার (সিফাতের) সঙ্গে। এই জ্ঞানের মধ্যে ভুলের কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেননা এ জ্ঞান সত্তা কর্তৃক উপলব্ধ। তাই নির্ভুল। বরং এ জ্ঞানের স্তর সাধারণ অকাট্য জ্ঞানের স্তর অপেক্ষাও উন্নত পর্যায়ের।

যেহেতু স্বীয় সত্তা অপেক্ষা অধিক নির্ভুল ও নিশ্চিতা কোনোকিছুই নয়, সেহেতু সত্তা কর্তৃক উপলব্ধ জ্ঞানও সুনিশ্চিত ও সর্বাংশে নির্ভুল। সত্তা এমতোক্ষেত্রে একাধারে জ্ঞানী (আলেম), জ্ঞান (এলেম) ও উপলব্ধি (মা'লুম)। আপন সত্তাকে অনুভব করার জন্য যেমন চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় না, তেমনি এমতো জ্ঞান অনুভব করার জন্যও মুখাপেক্ষী হতে হয় না চিন্তা-গবেষণার। এই জ্ঞান যে পায়, সে-ই পায় আল্লাহ্‌র পরিচয়। কেননা আল্লাহ্‌র পরম সত্তা নিজের সত্তা অপেক্ষাও অধিক নিকটে। তাই তাঁর পরিচয় পাওয়া সম্ভব কেবল এই সত্তাসঞ্জাত জ্ঞানের পথেই। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং বলেছেন 'আমি তোমাদের প্রাণ-ধমনী অপেক্ষাও অধিক নিকটে'। একথার অর্থ— হে আমার বান্দা! তুমি তোমার যতোখানি নিকটে, তার চেয়েও অধিক নিকটে আমি তোমার। এই অবস্থাটি চিন্তা-গবেষণা-অবলোকনের অতীত। এটাই এলমে লাদুন্নি। আবার ওলীগণ এই জ্ঞান পেয়ে ধন্য হন নবীগণের মাধ্যমে। সে মাধ্যম যতো বেশী প্রলম্বিত হোক না কেনো (আধ্যাত্মিক সংশ্লিষ্টতার শিকল বা সিলসিলা হোক না কেনো যতো অধিক দীর্ঘ)।

সংশয় ঃ 'আমি তোমার প্রাণ-ধমনী অপেক্ষা অধিক নিকটে' ঘোষণাটি একটি সাধারণ ঘোষণা। তাহলে কি একথাই বলতে হবে যে, সকলেই আল্লাহ্‌র এমতো নৈকট্যধারী?

নিরসন ঃ না। আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনতার নৈকট্য বিশেষ ধরনের, যা নির্ভর করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপর। আমি সুরা মুলকের তাফসীরে আলোচনা করেছি জীবন চার ধরনের, তন্মধ্যে এক ধরনের জীবন এরকম, যা আনয়ন করে আল্লাহ্ পরিচিতি। ওই জীবনের অধিকারী হতে গেলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। আর এমতোক্ষেত্রে কেবল আলাপ-আলোচনা নিরর্থক।

জিজ্ঞাসা ঃ আধ্যাত্মবিদগণ যে এলমে হুজুরী (সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান) লাভ করেন তা নির্ভুল। এ জ্ঞানে ভুলের সম্ভাবনা নেই। তৎসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয় কেনো? দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তওহীদে ওজুদী মতাবলম্বী এবং কেউ তওহীদে শুহুদীর প্রবক্তা। এরূপ হওয়ার কী কারণ?

জবাব ঃ এলমে হুজুরীর ভাবপ্রকাশের ভাষা এখনো অনাবিষ্কৃত। তাই এ জ্ঞানকে যখনই ভাষা দিতে চাওয়া হয়, তখনই ঘটে বিপত্তি। অথচ মূল অনুভব একটিই। সেখানে কোনো দ্বিত্ব নেই। বৈষম্য ঘটে কেবল প্রকাশের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টির যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক সৃষ্টির কারো সঙ্গে কারোই নেই। কেননা তাদের কেউ কারো স্রষ্টা নয়। শিল্পীর সঙ্গে তার শিল্পকর্মের সম্পর্কও সেরকম নয়। কেননা শিল্পী তার শিল্পকর্মের স্রষ্টা নয়, নির্মাতা। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র, অর্থাৎ আল্লাহ্ শিল্পী ও তার শিল্পকর্মসহ সকল কিছুর স্রষ্টা। মুতাজিলারা অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট বলেই এ বিষয়টি বুঝতে পারে না। বলে, মানুষ তার ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা। বিবেকবান সৃষ্টির সঙ্গে বিবেকহীন সৃষ্টিরও এক প্রকার সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন মানুষের সঙ্গে

অন্যান্য প্রাণীকুলের অথবা পাথরের। কিন্তু এরকম সম্পর্কও আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টান্ত হওয়ার অনুপযোগী। কেননা স্রষ্টা সম্পূর্ণতই স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সর্বোতভাবেই সৃষ্টি। স্রষ্টা চিরঅমুখাপেক্ষী, আর সৃষ্টি চিরমুখাপেক্ষী। তাদের অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব-প্রবৃদ্ধি-পরিণতি-সাফল্য-বৈফল্য সবকিছুই আল্লাহ্‌র চিরঅমুখাপেক্ষী অভিপ্রায়নির্ভর। সুতরাং এমতো সম্পর্ককে ভাষা দিতে পারা যাবে কীভাবে। তওহীদে ওজুদী এবং তওহীদে শুহুদীর ধারণাবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তো এই অনির্বচনীয় সম্পর্কটিকে প্রকাশ করতে গিয়েই।

তত্ত্বজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও মানব সত্তা মৌলিকভাবে এক নয়। তাহলে সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাকার ভাবা তো যাবেই না। আবার যদি বলা হয় সৃষ্টি সত্তাগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহলে তো তাকে স্বয়ম্ভু বলতে হয়। কিন্তু তা-ও তো হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই বা কোনোকিছুই স্বয়ম্ভু, স্বাধিষ্ঠ, বা স্বতিষ্ঠ নয়। সৃষ্টি তার অস্তিত্ব পেয়েছে তাঁর অভিপ্রায়ে, দয়ায় ও দানে। কিন্তু সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক নির্ণয়ের ভাষা আবিষ্কার সত্যিই দুরূহ। অর্জিত জ্ঞানের (এলমে হুসুলীর) সকল অহমিকা এমতোক্ষেত্রে স্থবির, বিমূঢ়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বপূর্ণ। সুতরাং এমতো সম্পর্কের স্বরূপ উপলব্ধ হতে পারে কেবল এলমে হুজুরীর দ্বারা। কেননা তা পরম সত্তা সন্নিহিত। তাই বলা যেতে পারে কেবল, তিনি আনুরূপ্যবিহীন। বোধ, চিন্তা, কল্পনা ও ধারণার অতীত হিসেবে সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিধর। মার্জনাপরবশ, দয়ালু, শাস্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা, সর্বাধিপতি, সৃজয়িতা, পালয়িতা। অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের অদৃশ্য, রকম, প্রকার ও আকার নিরাকারহীন। অর্জিত জ্ঞান কেবল এভাবে প্রকাশ করতে পারে তার আল্লাহ্‌পরিচিতি প্রসঙ্গের অক্ষমতা। আর এলমে হুজুরী পায় সেই অক্ষমতার পরিচয়, যা কেবল সত্তা দ্বারা অনুভব্য। ভাষা দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র মারেফত জ্ঞান লাভ হয় এই এলমে হুজুরীর পথেই।

সংশয় ঃ এতো গেলো নবী ও ওলীগণের এলেম ও মারেফতের বিবরণ। কিন্তু দেখা যায়, গণৎকার ও চিকিৎসকেরাও এক ধরনের অদৃশ্য জ্ঞান রাখে। নাহলে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় কীভাবে? যেমন ইলীয়ার প্রশাসক ইবনে নাতুর সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন ইলীয়ায় এলেন, তখন একদিন সকালে তাকে দেখা গেলো অত্যন্ত বিমর্ষ। নেতৃপর্যায়ের এক লোক জিজ্ঞেস করলো, সম্রাটপ্রবরকে বিষণ্নচিত্ত মনে হচ্ছে কেনো? হেরাক্লিয়াস বলেছিলো, রাতে নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম, পুরুষাঙ্গের ত্বক ছেদনকারীদের রাজার জন্ম হয়েছে। সে তার এক জ্যোতির্বিদ সুহৃদকেও একথা লিখে জানালো। প্রত্যুত্তরে সে-ও জানালো, হ্যাঁ, খতনাকারীদের সম্রাট নবীর শুভাগমন ঘটেছে।

ফেরাউনের দরবারের জ্যোতিষীদের বিষয়টিও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা বলেছিলো, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এমন এক শিশু জন্মগ্রহণ করবে, যার হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ফেরাউনের সাধের সাম্রাজ্য। ফেরাউন একথা

শুনে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও সফল হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটেছিলো, যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো জ্যোতিষীরা। আবার রোগী দেখে ও পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা যে ব্যবস্থাপত্র দেন, তার অনুসরণ করে অধিকাংশ রোগীই ভালো হয়ে যায়। তারা ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কেও জ্ঞাত, যে গুণাগুণ পরিদৃশ্যমান নয়। তাহলে কি বুঝতে হবে তারাও এক ধরনের অদৃশ্য জ্ঞান রাখে?

নিরসন ঃ রসুলেপাক স. এর মহাআর্বিভাবের আগে জ্যোতিষ-গণকদের কথা সাধারণত সত্য হতো একারণে যে, তারা আকাশে আড়ি পেতে শোনা শয়তানদের কাছ থেকে আকাশবাসী ফেরেশতাদের কথাবার্তার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ে জানতে পারতো। আবার সে সংবাদ অবিকল আহরণ না করতে পারলে তাদের কথা সঠিক হতো না। কিন্তু রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পর তাদের অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী হয় প্রমাদপূর্ণ। কেননা শয়তানকে আর আকাশের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। অগ্নিদণ্ডধারী ফেরেশতারা সেখানে সতত প্রহরারত। এখন তারা যা বলে, তা নিছক অনুমান ও শয়তানী খেয়াল, কাকতালীয়ভাবে তা কখনো কখনো ফলেও যায়। তাই বিষয়টি এখন একেবারেই গুরুত্বহীন। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, গণৎকারদের সম্পর্কে আমাদের করণীয় কী? তিনি স. বললেন, কখনো কখনো তাদের কথা ফলে যায়। শয়তান ফেরশতাদের কথাবার্তা চুরি করে শুনে তা মুরগীর মতো কোঁ কোঁ করে তাদেরকে শোনায়। তারা আবার সেগুলোকে প্রচার করে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে। বোখারী, মুসলিম।

এবার আসা যাক জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকদের আলোচনায়। নিঃসন্দেহে জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞতা। আর অভিজ্ঞতা লব্ধ হয় দৃশ্যমান বস্তু থেকে। নক্ষত্রের গতিবিধির হিসাব যার অভিজ্ঞতায়ত্ত, সে তো শুভ-অশুভ ক্ষণের একটা নির্ঘন্ট প্রস্তুত করতে পারবেই। তেমনি ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে যে চিকিৎসক ওয়াকিফহাল, তার ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে নিরাময় লাভ অন্যান্য সচরাচর ঘটনার মতোই। কিন্তু তাদের জ্ঞান ও ব্যবস্থাপত্রও সর্বাংশে ফলপ্রসূ হয় না। হতে পারেও না। আর তাদের এই বিদ্যাটি নবীগণের শিক্ষা থেকেই জ্যোতিপ্রাপ্ত। মানুষ তাদের আগ্রহে ও প্রয়োজনে এই বিদ্যা দু'টোকে তাদের অভিজ্ঞতাপরম্পরাভুক্ত করে নিয়েছে। কেননা এর মধ্যে রয়েছে ইহজাগতিক কল্যাণ। নবী ইব্রাহিমের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইব্রাহিম নক্ষত্রমালার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো এবং বললো, আমি পীড়িত'। অর্থাৎ অচিরেই আমি পীড়িত হবো।

চিকিৎসা বিজ্ঞান তো সম্পূর্ণতই নবুয়তের আলোক থেকে আলোকপ্রাপ্ত। একথার প্রমাণস্বরূপ ইমাম বাগবী সুরা সাবা'র তাফসীরের একস্থানে উল্লেখ করেছেন, বায়তুল মাকদিসে ইবাদত করতেন নবী সুলায়মান। সেখানে কোনো বৃক্ষ চারা উদ্গত হতে দেখলে তিনি তাকে বলতেন, কী নাম তোমার? উদ্ভিদ শিশুটি তার নাম বলতো। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করতেন, কী কাজ তোমার? সে এ প্রশ্নেরও

জবাব দিতো। তিনি তার জবাব লিখে রাখতেন এবং চারাটি তুলে রোপণ করিয়ে দিতেন অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে। একবার এক নতুন বৃক্ষচারা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোমার? সে বললো খারুবা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ তোমার? সে বললো, আপনার মসজিদ বিনষ্ট করা। ইমাম গাজ্জালীও ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আল মুনকিজ আনিদ দ্বলাল' নামক পুস্তকে।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, নক্ষত্র ও ঔষধের নিজস্ব কোনো গুণাগুণ নেই। যেমন আগুনের নেই নিজস্ব দাহিকা শক্তি। এদের অস্তিত্ব যেমন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তেমনি— তাদের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও। তাই দেখা যায় অনেক সময় ঔষধেও কাজ হয় না— এবং নক্ষত্রের গতিবিধির হিসাবও মেলে না। তাই স্বীকার করতে হবে সকল শুভ ও অশুভের প্রকৃত স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রয়িতা কেবলই আল্লাহ্‌। সকল কিছু তাঁর অভিপ্রায়াধীন। তিনি যা যেমন ভাবে করতে ইচ্ছা করেন, তা তেমনভাবেই হয়। তাঁর পবিত্র অভিপ্রায় সতত স্বাধীন। অপ্রতিরোধ্য। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে বলা যেতে পারে, যদি কোনো জ্যোতির্বিদ এরকম বিশ্বাস রাখে যে, নক্ষত্রগুলোর মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করা গেলেও আল্লাহ্‌পাকই তাদের ও তাদের অবস্থানগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা এবং তাদের নিয়ন্ত্রয়িতা, তাহলে সে কাফের হবে না। তেমনি চিকিৎসক ও পীড়িত ব্যক্তিও কাফের হবে না, যদি তারা বিশ্বাস করে, ঔষধ ও ঔষধের গুণাগুণ আল্লাহ্‌ কর্তৃক সৃজিত এবং আল্লাহ্‌ এই রোগ থেকে মুক্ত করবেন ওই ঔষধটি সেবন করলে। যেমন হলাহল পান মৃত্যুর নিমিত্ত হলেও মৃত্যু সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তনির্ভর। এরকম বিশ্বাস অন্যায় নয়। এভাবে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্ট বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ধারণা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই সকল কল্যাণ-অকল্যাণের স্রষ্টা ও অধিকর্তা। অন্য কেউ বা কোনোকিছু নয়। এভাবে সৃষ্টিকে উপলক্ষ হিসেবে এবং আল্লাহ্‌কে চূড়ান্ত মীমাংসাকারীরূপে জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহাইনি বর্ণনা করেছেন— আমরা তখন হুদায়বিয়ায়। রাতে বৃষ্টি হলো। ভোরে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পাঠ করলেন। তারপর আমাদের দিকে ঘুরে বসে বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বলেছেন? আমরা অপারগতা প্রকাশ করলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ বলেছেন— আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী এবং কেউ কেউ অবিশ্বাসী। যারা বলেছে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে, তারা অবিশ্বাসী। আর যারা বলেছে, বৃষ্টিপাত হয়েছে আমার অভিপ্রায়ে ও কৃপায়, তারা বিশ্বাসী। বোখারী, মুসলিম।

একথাটি প্রণিধাননীয় যে, জ্যোতির্বিদ্যায় কোনো কল্যাণ নেই। তাই এই বিদ্যাচর্চা করা মাকরুহ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে লোক জ্যোতির্বিদ্যা থেকে জ্ঞান আহরণ করলো, সে যেনো জ্ঞান আহরণ করলো যাদুবিদ্যার একটি শাখা থেকে। বাহ্যত সে বিদ্যার্থী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়।

এবার আলোচনা করা যেতে পারে হস্তরেখা গণনা, তাবিজ তুমার ইত্যাদি সম্পর্কে। বলাবাহুল্য, এ সকলকিছু নবীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত তুচ্ছ বস্তু। তাই এগুলো মূল্যহীন। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমরা তো অজ্ঞতার যুগে গণকদের কাছে যাতায়াত করতাম। তিনি স. বললেন, আর যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা তাদের কাছ থেকে তাবিজ-কবজ গ্রহণ করতাম। তিনি স. বললেন, আর নিয়ো না। আমি বললাম, কিছুসংখ্যক লোক তো রেখা গণনা করে। এর ফলে ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে পায়। তিনি স. বললেন, একজন নবীও এরকম করতেন। কিন্তু এখন তা পরিত্যক্ত। মুসলিম।

জিজ্ঞাসা ঃ কোনো কোনো সন্যাসী-সন্তুর ভবিষ্যদ্বাণীও ফলে যায়। অথচ তারা কাফের, কৃচ্ছসাধনায় নিমগ্ন। তাদের সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কী?

জবাব ঃ অদৃশ্যের জ্ঞান আহরণের মূল ভিত্তি হচ্ছে, অন্তরালের বিলুপ্তি এবং উপমার জগতের প্রতিভাস ধারণ। তবে দেখতে হবে, এদু'টো অবস্থা সাধিত হচ্ছে কীভাবে? বিষয়টি সম্ভব হতে পারে দু'রকমভাবে। যেমন— ১. যাঁরা শরিয়তের পুরাপুরি পাবন্দ, তাঁরা হন সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী। আর সে কারণে তাঁদের অভ্যন্তরভাগ ও বহির্বিভাগ হয়ে যায় জ্যোতির্ময়। আর ওই জ্যোতিই তখন হয় তাদের অদৃশ্য জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। এই মাধ্যমকেই বলে ফেরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টি। ২. কৃচ্ছসাধনাও মধ্যবর্তী অন্তরালকে ভেদ করতে পারে, এবং কাফের হলেও এরকম সাধকদের দৃষ্টিপথে ভেসে আসতে পারে উপমাজগতের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তবু এমতো প্রতিচ্ছবিকে অদৃশ্যজ্ঞান বলা যাবে না। বরং তাদের জ্ঞান পরিদৃশ্যমান জ্ঞানের মতোই। কেননা তারা মিথ্যানুসারী, শয়তানের চেলা। আর আলোচ্য আয়াতে যে অদৃশ্য জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা প্রযোজ্য হবে কেবল নবী-রসুলগণের বেলায়। শয়তানের চেলারা এমত উচ্চমার্গীয় বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্কই রাখে না। পরবর্তী বাক্য থেকে শেষোক্ত আয়াতের শেষ পর্যন্ত একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আরো স্পষ্টভাবে। বলা হয়েছে—

'সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ রসুলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন (২৭), রসুলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কিনা জানবার জন্য। রসুলগণের নিকট যা আছে, তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন' (২৮)। একথার অর্থ— রসুল স. ফেরেশতাদের সতত সুরক্ষার মাধ্যমে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্র আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পর্যবেক্ষণভূত। সুতরাং তাঁর প্রত্যাদেশে, প্রজ্ঞায় ও সিদ্ধান্তে শয়তানের প্রভাব বিস্তারণের অবকাশ মাত্রই নেই। তাঁর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ প্রেমিক অনুগামীরাও তাঁর কারণে এরকম নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।

মুকাতিল প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর কোনো মনোনীত বান্দাকে যখন নবুয়তের দায়িত্ব দেন, তখন ইবলিস ফেরেশতার আকৃতি ধরে তার কাছে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান থেকে মেরে পিটে তাড়িয়ে দেয় প্রহরী ফেরেশতারা। প্রত্যাদেশবহনকারী ফেরেশতার কাছেও ইবলিসকে যেতে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ নবীগণ সতত সুরক্ষিত, তাই নিষ্পাপ। তাঁদের এমতো নিরাপত্তার কথা এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে 'তাঁর নিকট আসতে পারে না কোনো অবাঞ্ছিত, না তাঁর সম্মুখ থেকে, না পশ্চাৎ থেকে'।

'লি ইয়া'লামা আন ক্বদ আব্‌লাগূ রিসালাতি রব্বিহিম' অর্থ রসুলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কিনা, তা জানার জন্য। আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ তবুও এখানে এরকম করে বলা হয়েছে তাঁর জ্ঞানের সম্পর্ক কখনো কখনো নিমিত্তের সঙ্গেও যে সম্পৃক্ত হয় সেকথা বোঝাতে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যেনো জেনে নিতে পারেন, কে তাকে না দেখে ভয় করে'। বাক্যটি প্রহরী ফেরেশতা নিযুক্তির কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ এ কারণেই আল্লাহ্‌ নিযুক্ত করেন প্রহরী ফেরেশতাদেরকে, যদিও সকলের ও সকল কিছুর প্রকাশ্য-গোপন সবকিছু তাঁর জানা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এ বিষয়টি তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, প্রহরী ফেরেশতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত তাঁর সুরক্ষিত নবী তাঁর প্রত্যাদেশাবলী যথাযথভাবে জনসমক্ষে প্রচার করেন।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার 'জানবার জন্য' কথাটির কর্তা নির্ধারণ করেন রসুল স.কে। যদি এরকমই করা হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুল স. যেনো একথা জানতে পারেন যে, তিনি এবং তাঁর অন্যান্য নবী ভ্রাতাগণ সঠিকভাবে জনসমক্ষে প্রচার করেন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ। আর এ প্রত্যাদেশ শয়তানের প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অথবা বলা যেতে পারে 'পৌঁছে দিয়েছেন' ক্রিয়ার কর্তা এখানে ফেরেশতা। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ফেরেশতা কর্তৃক আনীত প্রত্যাদেশ যে সম্পূর্ণরূপে শয়তানের প্রভাবমুক্ত, রসুল স. যেনো বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিতে পারেন।

'ওয়া আহাত্বা বিমা লাদাইহিম' অর্থ রসুলগণের নিকট যা আছে, তা আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর। অর্থাৎ রসুল, প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ, প্রহরী ফেরেশতা— সকলকিছুই আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। আর 'ওয়া আহ্‌সা কুল্‌লা শাইইন আ'দাদা' অর্থ এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির ক্ষুদ্র-বৃহৎ দৃশ্য-অদৃশ্য সকলকিছুর হিসাব তাঁর জানা। কোথায় কীভাবে কতোটুকু কখন বিদ্যমান, অথবা অবিদ্যমান— তার কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

সূরা মুয্যাম্মিল

মহাতীর্থভূমি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর রুকু সংখ্যা ২ এবং আয়াত সংখ্যা ২০।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿۱﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿۲﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿۳﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ﴿۴﴾

r হে বস্ত্রাবৃত!

r রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত,

r অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প

r অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে;

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল'। কথাটির অর্থ— হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! 'তাযামমুল' ধাতুমূল থেকে ' মুয্যাম্মিল' সাধিত হয়েছে কর্তৃপদীয় শব্দরূপে। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'মুতাযাম্মিল'। সন্ধিরীতি অনুসারে 'তা' অক্ষরটি হয়েছে 'যা'। আর এভাবেই শব্দরূপটি দাঁড়িয়েছে—'মুয্যাম্মিল'। বস্ত্রাবৃত ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল' বলে। যেমন বলা হয় 'তাযাম্মালা ছিয়াবাহ' (সে তার দেহে বস্ত্র জড়িয়েছে)। 'মুয্যাম্মিল' ও 'মুদ্দাস্সির' সমার্থক। রেসালাতের গুরুভার অর্পণের প্রাক্কালে সুরাগুলোর শুরুতে আল্লাহ্পাক এভাবে তাঁর প্রিয়তম জনকে স্নেহসিক্ত স্বরে সম্বোধন করতেন। আর ওই সময় রসুল স.ও অধিকাংশ সময় থাকতেন বস্ত্রাবৃত। পরবর্তী সময়ে তিনি স. সম্বোধিত হতে থাকেন 'হে আমার নবী', 'হে আমার রসুল'— এভাবে।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, প্রথম বার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘকাল যাবত ওহী আগমন বন্ধ ছিলো। ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে রসুল স. একদিন আমাকে বললেন, আমি পদব্রজে কোথাও যাচ্ছিলাম। অকস্মাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। দৃষ্টি উত্তোলন করতেই দেখতে পেলাম সেই ফেরেশতাকে, যিনি আমার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন হেরা পর্বতের গুহায়। দেখলাম, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে তিনি একটি আসনে বসে রয়েছেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়িতে ফিরে এসে বললাম, খাদিজা! আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। আমাকে

বস্ত্রাবৃত করো। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্সিরু' থেকে 'ফাহজুর' পর্যন্ত। এরপর থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে শুরু করলো কিছুকাল পরপর ক্রমাগতভাবে। বোখারী, মুসলিম।

এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন এক দীর্ঘ হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. তখন গৃহে ফিরে এসে মাননীয়া খাদিজাকে বললেন, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে দিলেন। এভাবে ক্রমশঃ প্রশমিত হলো তাঁর আতংক। ইনশাআল্লাহ্ হাদিসটি আমি সবিস্তারে বর্ণনা করবো সুরা ইক্বরা'র তাফসীরে।

শিথিল সূত্রপরম্পরা যোগে বায্যার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, কুরায়েশদের পরামর্শকক্ষ লোকে লোকারণ্য। সকলে মিলে একটি ব্যাপারে একমত হলো যে, মোহাম্মদকে একটি অপঅভিধায় অভিহিত করতে হবে। আর ওই নামটি প্রচার করতে হবে ব্যাপকভাবে। তাহলে ওই খারাপ নামেই সকলের কাছে পরিচিত হবে সে। প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, তাহলে তার কী নাম দেওয়া যায়? একজন বলে উঠলো, তার নাম দেওয়া হোক কাহিনীকার। আর একজন বললো, না, তাকে বলা হোক উন্মাদ। অন্য আর একজন বললো, তাকে যাদুকর বললেই ভালো হয়। রসুল স. এর কানে গেলো এ সমস্ত কথা। তিনি স. মনঃক্ষুণ্ন হলেন। মনের দুঃখে শুয়ে পড়লেন গায়ে কাপড় জড়িয়ে। তখন প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। পাঠ করলেন 'ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল' ও 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্সির'।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ক্বুমিললাইল' (রাত্রি জাগরণ করো)। অর্থাৎ রাতে জাগ্রত হয়ে নামাজ পাঠ করো। এখানকার 'ক্বুম' শব্দটি এসেছে 'ক্বিয়াম' (নামাজের দণ্ডায়মানতা) থেকে। ব্যষ্টির উল্লেখ করে মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে সমষ্টির। অর্থাৎ কেবল ক্বিয়ামের কথা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে রুকু, সেজদা, তেলাওয়াতসহ পুরো নামাজকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার বস্ত্রাবৃত রসুল! রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে নামাজ পাঠ করুন। বাক্যটির মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, দণ্ডায়মানতা (ক্বিয়াম) হচ্ছে নামাজের প্রধান স্তম্ভ। অবশ্য এটাই ঐকমত্যসম্মত অভিমত।

'আল্লাইল' অর্থ সারা রাত। এর পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি যের প্রদানকারী অব্যয় 'ফী'। আর এভাবেই কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— সারা রাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইল্লা ক্বলীলা' (কিছু অংশ ব্যতীত)। এখানে আবার ব্যতিক্রমী অব্যয় 'ইল্লা' (ব্যতীত) অব্যয় ব্যবহার করে সমস্ত রাত থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা কতোখানি, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩) এভাবে—

'নিস্ফাহু' (অর্ধরাত্রি)। কথাটি প্রলম্বিত হয়েছে 'আললাইল' থেকে। আরেক আয়াতে বলা হয়েছে 'কিছু অংশ ব্যতীত'। অর্থাৎ রাতের কিছু অংশ বাদে সারা

রাত ধরে নামাজ পাঠ করো। কেননা ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে বাকী অংশটুকু হয়ে যায় বিধানের আওতাভূত। এরপর আবার এই আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, অর্ধরাত্রি বাদ দিয়ে রাতের অবশিষ্ট অর্ধাংশ নামাজ পাঠে অতিবাহিত করুন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'নিস্‌ফাহু' (অর্ধরাত্রি) শব্দটি 'ক্বলীলা' (কিয়দংশ) কথাটির অনুবর্তী এবং 'নিস্‌ফাহু' এখানে 'ক্বলীলা' এর বিশ্লেষক। এভাবে এখানে অনিশ্চিত ব্যতিক্রমকে করা হয়েছে সীমায়িত। ব্যতিক্রমীর উল্লেখ করে লোপ করা হয়েছে অনিশ্চয়তাকে। স্থিরীকৃত হয়েছে— নামাজ পাঠ করতে হবে অর্ধরাত্রি ব্যাপী। আর 'অর্ধরাত্রি'কে এখানে 'কিছু অংশ' বলা হয়েছে একথা বোঝাতে যে, সারা রাতের তুলনায় অর্ধেক রাত তো অল্পই, কিছু অংশই। 'কিছু অংশ' বলার আরো একটি কারণ থাকতে পারে এখানে। সেটি হচ্ছে— রাতের অংশেই পাঠ করতে হয় মাগরিব, এশা, সম্পন্ন করতে হয় রাতের পানাহার। তাই নিদ্রার জন্য থাকে অর্ধরাত্রির কম সময়, যদি নিদ্রা থেকে উঠে ঠিক ঠিক অর্ধরাত্রি নামাজে কাটাতে হয়।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানকার 'নিস্‌ফাহু' অনুবর্তী 'আললাইল' এর। তাঁরা 'নিস্‌ফ' (অর্ধ)কে কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন ব্যতিক্রম। এভাবে প্রতিপাদ্য বক্তব্যটি দাঁড়ায় 'ক্বুম নিস্‌ফাল লাইলা ইল্‌লা ক্বলীলা'। অর্থাৎ মাঝরাতে জেগে উঠে নামাজ পাঠ করো। তার মধ্যে আবার কিছু অংশ বাদ দাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আউইন ক্বুস্‌ মিনহু ক্বলীলা' (কিংবা তদপেক্ষাও অল্প)। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে 'ক্বুম' এর সঙ্গে। অর্থাৎ ব্যতিক্রমের পর অবশিষ্ট রইলো যে অর্ধেক, সেই অর্ধেকেরও কম, এক চতুর্থাংশের চেয়ে কিছু বেশী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আওযিদ আ'লাইহি' (অথবা তদপেক্ষা বেশী)। অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রির বেশী, যতো বেশী বাড়াতে ইচ্ছা করো। এভাবে এখানে শেষ সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো— রাতে শয্যাসুখ থেকে গাত্রোত্থান করে নামাজ পাঠ করো রাতের এক চতুর্থাংশ সময়ের জন্য। অথবা এর চেয়ে কিছু বেশী সময়ের জন্য, যতোটুকু বেশী তুমি ইচ্ছা করো। উল্লেখ্য, বিধানটি আবশ্যিক, কেননা এর প্রকৃতি আদেশসূচক। জননী আয়েশা থেকে বাগবী এরকমই বর্ণনা করছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে— ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রসুল স. এবং তাঁর উম্মতগণের উপরে রাত জেগে নামাজ পাঠ করা ছিলো ফরজ। অবশ্য পরে এই বিধানটির অত্যাবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। বাগবী লিখেছেন, তখন রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দ রাত জেগে নামাজ পাঠ করতেন। নামাজে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে যেতেন যে, কারো খেয়ালই থাকতো না, কতোক্ষণ ধরে তাঁরা নামাজ পাঠ করেছেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ, অর্ধেক, না দুই তৃতীয়াংশ। বিনিদ্র রজনী তাঁরা এভাবে অতিবাহিত করতেন এই ভেবে যে, সময়ের আবশ্যিকতা যেনো লংঘিত না হয়। নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুলে যেতো

তাঁদের চরণযুগল। দায়িত্বটি তাঁদের কাছে যখন হয়ে পড়লো নিতান্তই কষ্টকর, তখন আল্লাহ্পাক সদয় হলেন তাঁদের প্রতি। অবতীর্ণ করলেন 'ততোটুকু পাঠ করো, যতোটুকু হয় তোমাদের জন্য স্বস্তিকর'। এভাবে বিধানটিকে পরিণত করা হয় সুন্নতে।

সাঈদ ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, আমি একবার মাতা মহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকার পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মাননীয়া জননী! রসুল স. এর অনন্য চরিত্রামৃত সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন পাঠ করোনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কোরআনই তাঁর অনুপম চরিত্রের আলেখ্য। আমি নিবেদন করলাম, তাঁর নিশীথের নামাজ সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি সুরা মুয্যাম্মিল পড়োনি? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, সুরাখানির প্রথমাংশের কতিপয় আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর উপরে নিশীথের নামাজ ফরজ করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি স. ও তাঁর সাহাবীগণ সারা বছর ধরে প্রতিরাতে জেগে জেগে নামাজ পাঠ করতেন। এতে তাঁদের খুব কষ্ট হতো। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুলে যেতো পা। শেষের আয়াতখানি তখনো আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি। অবশেষে শেষ আয়াতখানি অবতীর্ণ করে বিধানখানিকে লঘু করা হয়। তখন নিশিথের নামাজ হয়ে যায় নফল। আবু দাউদ, নাসাঈ, বাগবী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম এবং ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

মুকাতিল ও ইবনে কীসান বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিশীথের নামাজ (তাহাজ্জুদ) ফরজ ছিলো। পরে যখন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের বিধান অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরজ হয়ে যায় রহিত এবং তা হয়ে যায় নফল।

আমি বলি, নিশীথের নামাজ ফরজ ছিলো কেবল রসুল স. এর উপর। কেননা শেষ আয়াতে (২০) বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ করো কখনো রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের একটি দলও। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের একটি দলও'। অর্থাৎ সাহাবীগণের কেউ কেউ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং কেউ কেউ পড়তেন না। তাহাজ্জুদ যদি রসুল স. ছাড়া অন্যদের উপরে ফরজ হতো, তবে নিশ্চয় সাহাবীগণ সকলেই তাহাজ্জুদ পড়তেন। অবশ্যই ফরজ দায়িত্ব কেউই লংঘন করতেন না।

জিজ্ঞাসা ঃ তাহাজ্জুদ যদি কেবল রসুল স. এর উপরেই ফরজ হতো, তবে সাহাবীগণের কেউ কেউ কেনো তা পাঠ করতেন। আর শেষ আয়াতে একথা কেনো বলা হয়েছে 'তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরাপুরি পালন করতে পারবে না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন'। আরো বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে'। এতে করে কি এটাই প্রতীয়মান হয় না যে, তাঁদের উপরে রাতের নামাজ ফরজ ছিলো এবং তা পালন করা কষ্টকর ছিলো বলেই আল্লাহ্‌পাক তা লঘু করে দিয়েছেন। অর্থাৎ উম্মতের দৈহিক দৌর্বল্যই কি তাদের উপর থেকে তাহাজ্জুদের ফরজ দায়িত্ব রহিত হওয়ার কারণ নয়? তাহলে কেনো এরকম বলা হবে যে, তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো কেবল রসুল স. এর উপরে।

জবাব ঃ উম্মতের দৈহিক দৌর্বল্যই ছিলো তাহাজ্জুদের অত্যাবশ্যকতা রহিত হওয়ার কারণ, একথা যেমন ঠিক, তেমনি এই অভিমতটিও সঠিক যে, তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো কেবল রসুল স. এর উপর। উল্লেখ্য, যে নফল রসুল স. নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেন, তা-ও তাঁর উম্মতের জন্য হয়ে যায় সুন্নত, তবে আবশ্যিক হিসেবে নয়। সেজন্য এরকম সুন্নত পরিত্যাগ তিরস্কারযোগ্য হলেও শাস্তিযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং বলেছেন 'তোমাদের রসুলের চরিত্রে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আশা রাখে আল্লাহ্‌র ও পরকালের'। কিন্তু রসুল স. এর কিছু কিছু কর্ম আবার এরকম নয়। যেমন 'সওমে বেসাল' (ইফতার ও সেহেরী ব্যতিরেকে কয়েকদিন ধরে একটানা রোজা রাখা)। এই আমলটি উম্মতের জন্য সুন্নত নয়। বরং তাদের জন্য এই আমলটি নিষিদ্ধ।

বিদ্বানগণের কেউ কেউ বলেন, রসুল স. এর সকল আমলই উম্মতের জন্য সুন্নত, তা ওয়াজিব-নফল, যা-ই হোক না কেনো। কিন্তু অভিমতটি যথার্থ নয়। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, উম্মতের জন্য রসুল স. এর সকল আমল মাকরুহ বা হারাম নয়। তবে তাঁর কোনো কোনো আমলের অনুসরণ অবশ্যই হারাম। যেমন— সওমে বেসাল, চার জনের অধিক রমণীর পানিগ্রহণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া রত্তিলিল কুরআনা তারতীলা' (আর কোরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে)। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে ২ সংখ্যক আয়াতের 'কুমিল্ লাইল' (রাত্রি জাগরণ করো) এর সঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, যথাযথ উচ্চারণে কোরআন পাঠ করার দায়িত্বটি চিত্তবিনোদনমূলক, তাই মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কিন্তু অভিমতটি অযথার্থ। কেননা কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'রাত্রি জাগরণ করো' এর সঙ্গে। আর 'রাত্রি জাগরণ করো' কথাটি আদেশসূচক, যা পালন করা ওয়াজিব। সুতরাং যথাযথ উচ্চারণে কোরআন পাঠ করাও ওয়াজিব। কেননা যোজ্য ও যোজিত সমগুরুত্বসম্পন্ন। এর একটি ওয়াজিব হলে অন্যটি তো ওয়াজিব হবেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করো, উন্নতমান হও এবং তারতীল করো। তোমার অবস্থিতি হবে তোমা কর্তৃক পঠিত শেষ আয়াতে। এখানে তারতীল অর্থ সরল ও সহজ উচ্চারণ, ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে আবৃত্তি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তারতীল' অর্থ খোলাখুলিভাবে কোরআন বর্ণনা। হাসান বসরীও এরকম

বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ— পাঠ করো স্বচ্ছগতিতে। কাতাদা বলেছেন, হজরত আনাসকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. কীভাবে কোরআন পাঠ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি স. কোরআন পাঠ করতেন দীর্ঘ লয়ে। এরপর তিনি স. এর নমুনা হিসেবে পাঠ করে শোনালেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। 'আল্লাহ্' 'রহমান' ও 'রহীম' শব্দত্রয় পাঠ করলেন প্রলম্বিত মাত্রায়।

আমি বলি, 'আল্লাহ্' শব্দের 'লাম' বর্ণ এবং 'রহমান' শব্দের 'মীম' বর্ণ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। আর 'রহীম' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু যতিপাত করতে হবে, তাই তা দুই আলিফ সমান টেনে পড়া সিদ্ধ। আর যতিপাত না ঘটিয়ে পরের বাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে টানতে হবে এক আলিফ সমান। একবার জননী উম্মে সালমার কাছে রসুল স. এর কোরআনের পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, তিনি স. প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করতেন সুস্পষ্ট উচ্চারণে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ। জননী উম্মে সালমা থেকে এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' পাঠ করে থেমে যেতেন। আবার 'আর্রহ্মানির রহীম' বলেও পাঠবিরতি দিতেন। পাঠ করতেন এভাবে বাক্য শেষের বিরতি দিয়ে। তিরমিজি। আমি বলি, সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করাও 'তারতীল' এর অন্তর্ভূত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর ভূবনমোহিনী কণ্ঠের কোরআন পাঠের প্রতি আল্লাহ্ যেরূপ মনোনিবেশ করেন, সেরকম মনোনিবেশ আর কোনো কিছুর প্রতি করেন না। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মধুর স্বরে সশব্দে কোরআন পাঠে রত থাকেন, তখন আল্লাহ্ যেভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, সেভাবে আর কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হন না। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা চিত্তাকর্ষক কণ্ঠে কোরআন আবৃত্তি করবে না, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। বোখারী। হাদিসটিতে উল্লেখিত 'তুগান্নী' শব্দটি কিন্তু সঙ্গীতের সুর নয়। কেননা গান হারাম। বরং এর অর্থ সুমধুর স্বর। এই সুমধুর স্বরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আরো কয়েকটি বর্ণনায়।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কোরআন আবৃত্তি কোরো, আরবী উচ্চারণভঙ্গি ও ধ্বনি সহযোগে। বিরত থেকো ইহুদী-খৃষ্টানদের সুরলহরী ও প্রেমসঙ্গীতের সুরমুর্চ্ছনা থেকে। আমার মহাতিরোধানের পর এমন কিছুসংখ্যক লোকের আগমন ঘটবে, যারা কোরআন পাঠ করবে সঙ্গীতের সুরলহরী সহকারে। কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নে পৌঁছবেই না। তাদের ও তাদের অনুরক্তদের হৃদয় হবে বিশৃঙ্খল (ফেত্নাযুক্ত)। বায়হাকী।

উপযোগ ঃ তারতীলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপদেশমূলক বাণীসম্ভারের প্রতি অভিনিবেশী হওয়া। শাস্তির আয়াত পাঠকালে ভীত হওয়া, পুণ্য দানের সংবাদসম্বলিত আয়াত পাঠকালে হওয়া আশাবাদী ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, চীৎকার করে কোরআন পাঠ কোরো না। সঙ্গীতবিদদের মতো সুরসংযোজনা কোরো না। গুরুত্ব দিয়ো বাণীসম্ভারের অসাধারণত্বের উপর। একটি সুরা শেষ পর্যন্ত পাঠ করাই যেনো তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়। বরং এর সঙ্গে মিলন ঘটিয়ো তোমার হৃদয়ের।

হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে নিশীথের নামাজ পাঠ করেছি। তিনি স. জান্নাতের বিবরণবিষয়ক আয়াত পাঠ করার পর থামতেন। অভিলাষ প্রকাশ করতেন জান্নাতের। জাহান্নামের বিবরণবিশিষ্ট আয়াত পাঠ করার পরও থেমে যেতেন তিনি। নিবেদন জানাতেন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের।

হজরত উবায়েদ মুলকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওহে কোরআনের বাহক! কোরআনকে তোমরা উপলক্ষ মনে কোরো না। দিবস-নিশীথে যথানিয়মে পাঠ কোরো। এর বাণী প্রচার কোরো। পাঠ কোরো সুমধুর স্বরে। আর এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণাও কোরো, যাতে তুমি লাভ করতে পারো সাফল্য। তাড়াহুড়া করে কখনো কোরআন আবৃত্তি কোরো না। জেনো যথাআবৃত্তিতেও রয়েছে পুণ্য। বায়হাকী।

হজরত সহল ইবনে সা'দ সায়েদী বলেছেন, আমরা কোরআন পাঠ করছিলাম। এমন সময় শুভাগমন ঘটলো রসুল স. এর। তিনি স. বললেন, তোমাদের কোরআন কিন্তু একটিই। অথচ তোমাদের মধ্যে আছে বিজ্ঞজন। কালো শাদা রঙের মানুষ। তোমরা পাঠ করতে থাকো ওই যুগ আসার পূর্বে, যে যুগে এমন কিছুসংখ্যক কোরআন পাঠকারীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে কোরআন পাঠ করবে, যেমন বাঁকা তীর সোজা করা হয় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নে নামবে না। তারা অভিলাষী হবে তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির। তর সইবে না তাদের এতোটুকুও (ধৈর্য থাকবে না পরকালের পুণ্যপ্রাপ্তির)।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ৫

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

r আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।

'ইন্না সানুল্ক্বী আ'লাইকা ক্বওলান ছাক্বীলা' অর্থ আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'গুরুভার বাণী' (ক্বওলান ছাক্বীলা) অর্থ রাতের নামাজ। তাহাজ্জুদ বা রাতের নামাজ সত্যিই প্রবৃত্তির (নফসের) উপরে এক গুরুভার। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতখানি ইতোপূর্বের আয়াতসমূহের গুরুত্ববর্ধক ও পরিপূরক। আর 'সানুল্ক্বী' (অবতীর্ণ করেছি) কথাটির 'সীন' এখানে ভবিষ্যতকালবোধক নয়, বরং গুরুত্বপ্রদায়ক।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সানুল্‌ক্বী' অর্থ কোরআন মজীদ। অর্থাৎ গুরুভার রূপে আমি অবতীর্ণ করেছি কোরআন মজীদ। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, কপটাচারীদের জন্য কোরআন একটি ভারী বোঝা। আমি বলি, এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে ওই আয়াতের মতো, যেখানে বলা হয়েছে 'অংশীবাদীদের জন্য এটা একটা গুরুতর বোঝা, (যদিও আপনি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন)। হাসান ইবনে ফজল বলেছেন, কোরআন মজীদ অত্যন্ত ভারী হবে মীযানে। আমি বলি, এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দুটি মাত্র কথা, যার উচ্চারণ সহজ, কিন্তু মীযানে তা হবে অত্যন্ত ভারী। কথা দুটি হচ্ছে 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী' এবং 'সুবহানাল্লহিল আ'জীম'। বোখারী, মুসলিম।

মুকাতিল বলেছেন, কোরআন অত্যন্ত গুরুভার বাণী। কারণ এতে রয়েছে নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা ও দণ্ডবিধান। কাতাদাও এরকম বলেছেন। আবুল আলীয়া বলেছেন, কোরআন গুরুভার অঙ্গীকার ও হুমকির কারণে। বর্ণিত অভিমতসমূহের সারমর্ম হচ্ছে— কোরআনে যেহেতু আছে সুকঠিন আদেশ-নিষেধ, পুরস্কারের অঙ্গীকার-শাস্তির হুমকি, আছে পরকালের ভীতিপ্রদ আলোচনা, তাই যাদেরকে কোরআন মান্য করতে বলা হয়েছে, তাদের জন্য কোরআন গুরুভারই। বিশেষ করে রসুল স. এর উপরে এটা সবদিক থেকেই গুরুভার। কেননা এ ভারোত্তলনের প্রধান দায়িত্ব তাঁর। তাঁর উম্মতও এ ভারোত্তলনের জন্য আদিষ্ট। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, সুরা হুদ এবং এর সন্নিহিত সুরাগুলি আমাকে বয়োপ্রবীণ বানিয়েছে। হাদিসটি হজরত হুজায়ফা এবং উতবা ইবনে আমের থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী। রসুল স. এর এরকম বলার কারণ হচ্ছে, সেখানে তাঁকে এই মর্মে আজ্ঞা করা হয়েছে 'সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছো, তাতে স্থির থাকো এবং তোমার সঙ্গে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও স্থির থাকুক; এবং সীমালংঘন কোরো না'। উল্লেখ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল হিসেবে স্বভাবগতভাবেই তিনি স. ছিলেন সর্বাধিক আল্লাহ্‌ভীরু। তার উপর এরকম নির্দেশ তাঁকে করে তুলেছিলো আরো বেশী আতংকগ্রস্ত। তাই তিনি স. বলেছেন, এই সুরা আমার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, সুরা হুদে উল্লেখ করা হয়েছে পরকালের ভয়াবহতা এবং অতীতযুগের অবাধ্যদের মর্মন্তুদ ইতিবৃত্ত। তাই তিনি স. বলেছেন, সুরা হুদ আমাকে করেছে বৃদ্ধ। এরকম ভীতিসঞ্চারক বিবরণ রয়েছে অন্যান্য সুরাতেও। তাই রসুল স. বলেছেন, সুরা হজ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআ'লুন এবং ইজাশ্‌ শামসু কুয়্যিরাত আমাকে বৃদ্ধ বানিয়েছে। হজরত আবু বকর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম। এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি এবং হজরত সা'দ থেকে ইবনে মারদুবিয়া। হজরত আনাস থেকে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সুরা হুদ এবং তার দোসর সুরাগুলি বয়োবৃদ্ধ করে দিয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন গুরুভার এর গবেষকদের জন্য। কারণ এমতো দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রয়োজন হয় নিবিষ্টচিত্ততা, পরিশুদ্ধতা এবং সর্বাধিক সতর্কতা। তৎসহ প্রয়োজন অখণ্ড উদ্দীপনা ও অটুট দৃঢ়তা। এই ব্যাখ্যাটি পূর্বাপর বক্তব্যের সঙ্গে একারণে সঙ্গতিপূর্ণ যে, গবেষণা ও উপলব্ধিও চায় তারতীল (ধীর ও সুস্পষ্ট আবৃত্তি)। এর সঙ্গে রয়েছে রাত্রি জাগরণ। মুখ ও মনের সমন্বয়ন।

এরকমও বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য কোরআনের সঙ্গোপন পাঠও অত্যন্ত গুরুভার। কেননা সঙ্গোপন পাঠের ফলে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও ভালোবাসার জ্যোতিসম্পাত ঘটে অন্তরের অন্তস্থলে, যা সর্বাধিক গুরুভার। ফাররার বক্তব্যও এরকম। তিনি বলেছেন, আমাদের মহান প্রভুপালকের বাণী কোনো লঘু বিষয় নয়, বরং তা সকল ভার-অপেক্ষা অধিক ভারী।

আমাদের মহামান্য শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ রহ. বলেছেন, কোরআনের নিগুঢ় নির্যাস (হকিকতে কোরআন) আধ্যাত্মিক পথযাত্রীদের (সালেকদের) অন্তর্জগতের (বাতেনের) জন্য বিশাল গুরুভার। আমি বলি, এমতো উপলব্ধির পোষকতায় এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে পেতে'।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বলেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল তখন হয়ে যেতো বিবর্ণ। বর্ণনান্তরে এসেছে, প্রত্যাদেশ গ্রহণকালে তিনি স. মস্তক অবনত করতেন। উপস্থিত সাহাবীগণও তখন বসে থাকতেন মাথা নিচু করে। প্রত্যাদেশ শেষ হলে তাঁরা উত্তোলন করতেন তাঁদের মস্তক।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন,একবার হারেছ ইবনে হিশাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আপনার উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় কীভাবে? তিনি স. জবাব দিলেন, কখনো ঘণ্টাধ্বনির মতো। তখন আমার কষ্ট হয় খুব। আবার কখনো মনুষ্য আকৃতিতে আবির্ভূত হয় ফেরেশতা। তখন সে যা বলে, তা আমি স্মরণ রাখি। মাতা মহোদয়া আরো বলেছেন, ঘোর শীতকালেও আমি দেখেছি, প্রত্যাদেশ গ্রহণের সময় রসুল স. ঘামছেন। টপটপ করে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ছে তাঁর ললাটদেশ থেকে। বোখারী, মুসলিম।

প্রত্যাদেশ গুরুভার হওয়ার আর একটি সম্ভাব্য কারণ এরকম— প্রথমে রসুল স. ছিলেন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্ অভিমুখী। হেরা পর্বতের গুহায় দিনের পর দিন কেবল আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন তিনি। যখন নির্দেশ দেওয়া হলো 'গাত্রোত্থান করুন। ভীতিপ্রদর্শন করুন নিকটাত্মীয়দেরকে' তখন তাঁকে হতে হলো সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী। নিঃসন্দেহে এমতো নির্দেশ তাঁর জন্য ছিলো বেদনাদায়ক গুরুভার। কেননা এটা ছিলো এক ধরনের বিচ্ছেদ, যা যাতনাদায়ক।

‘গুরুভার’ এর মর্মার্থ সম্পর্কে এরকমও বলা হয়েছে যে, হেরা গুহার নিভৃত ধ্যানমগ্নতা থেকে গৃহবাসীদের অধিকার পূরণার্থে গৃহে আগমন, মাতা মহোদয়া খাদিজাকে সঙ্গদান, আহার্য গ্রহণ ইত্যাদিও ছিলো রসুল স. এর জন্য গুরুভার। সৃষ্টির প্রতি এমতো মনোনিবেশন বৈধ হলেও তা পীড়াদায়ক বইকি। কেননা এরকম অবস্থা অখণ্ড মগ্নতার অননুকূল। মাতা মহোদয়া আয়েশা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। একারণেই আধ্যাত্মিক পথযাত্রীরা নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্নতাকেই অধিক পছন্দ করেন। কেউ কেউ তাই বলেন, বেলায়েত (নৈকট্য) নবুয়ত (বার্তাবহন, পথপ্রদর্শন) অপেক্ষা উত্তম, যদিও নবুয়ত সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ নবুয়ত অত্যুত্তম হলেও বেলায়েত আস্বাদ্য। কেননা এমতাবস্থায় ধ্যান-জ্ঞান-মন জুড়ে থাকেন কেবল আল্লাহ্, অন্য কেউ নয়। তাই কেউ কেউ বলেন, একজন নবীর নবুয়ত অপেক্ষা তাঁর বেলায়েত উত্তম। কেননা তিনি তাঁর বেলায়েত অবস্থায় পুরোপুরি অভিনিবেশী হতে পারেন আল্লাহ্র প্রতি। আর নবুয়তের অবস্থায় পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালনার্থে তাঁকে অভিনিবেশী হতে হয় সৃষ্টির প্রতি।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেন, সিদ্ধান্তটি ঠিক নয়। নিঃসন্দেহে নবুয়ত সর্বাবস্থায় বেলায়েত অপেক্ষা উত্তম, সে বেলায়েত নবীর হলেও। কেননা নবীগণ পরিভ্রমণ করেন আল্লাহ্র সত্তাগত জ্যোতিচ্ছটার (তাজাল্লিয়ে জাতির) মধ্যে, আর ওলীগণকে পরিভ্রমণ করতে হয় গুণবত্তাগত জ্যোতিবিচ্ছুরণের (তাজাল্লিয়ে সিফাতের) মধ্যে। সুতরাং নবুয়ত ও বেলায়েতের মধ্যকার ব্যবধান বিরাট। সুফী-আউলিয়াগণ আল্লাহ্মুখী আরোহণকে বলেন উরুজ এবং সৃষ্টিমুখী অবতরণকে বলেন নুযুল। ওলীগণের উরুজ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য থাকে সাধারণত ঊর্ধ্বপানে। আর নবীগণ উরুজে পূর্ণ বলে নুযুলেও সম্পূর্ণ। তাই তাঁরা অন্যকেও প্রদর্শন করতে পারেন পূর্ণত্বের পথ। যদিও তাঁদের অভীষ্ঠ সৃষ্টি নয়, স্রষ্টা। তবুও তাঁরা সৃষ্টিকে পথ দেখান আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে। আর এমতো নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম মর্যাদা। এভাবে তাদের সংগ্রামমুখর জীবনে যখন যবনিকা নেমে আসে, তখন তাঁরা চিরদিনের জন্য মিলিত হতে পারেন তাঁদের পরম সখার (রফিকে আ'লার) সঙ্গে। এভাবে অবশেষে তাঁরা পরিপূরিত, পরিশোভিত ও পরিকৃতার্থ হন যুগপৎ নবুয়ত ও বেলায়েতের মহাসফলতায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের বাক্যটি আগের আয়াতের বক্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপক এবং পরিপূরক। অথবা বাক্যটি নিশিজাগরণের তাৎপর্য বহণকারী একটি পৃথক বাক্য। এভাবে এখানে বিষয়টির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে নিশিজাগরণকে অধিক গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। কেননা গভীর নিশীথের উপাসনা নিঃসন্দেহে শ্রম-সাধ্য ও সাধনাসংকুল। তাই তা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধতা অর্জনের সহায়ক। অথবা বলা যেতে পারে গভীর রাতের নামাজ রসুল স. এর কাছে ছিলো আনন্দদায়ক, যদিও তা অন্যদের জন্য ছিলো কষ্টকর। আহমদ,

নাসাঈ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজকে আমার জন্য করে দেওয়া হয়েছে নয়ন শীতলকারী। খাজায়ী গোত্রের জনৈক সাহাবী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত বেলালকে বলতেন, বেলাল! নামাজের ইকামত বলে আমাকে প্রশান্ত করো। এ সকল হাদিসের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির পথপ্রদর্শনের যে গুরুদায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত ছিলো, সেই গুরুদায়িত্ব বহনের ক্লান্তি তিনি স. অপনোদন করতেন তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে। কিংবা বলা যেতে পারে, তাহাজ্জুদ নামাজ প্রভূত প্রভাব বিস্তারকারী। তিনি স. তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ তাঁর নির্দেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ না করে পারতেন না। জ্বিনেরাও তাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেনি। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, রাতের নামাজ সম্পর্কযুক্ত প্রতিফল দিবসের সুপারিশস্থলের (শাফায়াতের মাকামের) সঙ্গে। কেননা আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন 'আর কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পাঠ করুন। আপনার জন্য এটা অতিরিক্ত। অনতিবিলম্বে আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনাকে স্থিত করবেন প্রশংসিত স্থানে'।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ৬, ৭

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيۡلِ هِىَ اَشَدُّ وَطۡاً وَّ اَقۡوَمُ قِيۡلًا ؕ﴿۶﴾ اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبۡحًا طَوِيۡلًا ؕ﴿۷﴾

r অবশ্য দলনে রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফুরণে সঠিক।

r দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

'ইন্না নাশিয়াতাল্ লাইলি হিয়া আশাদ্দু' অর্থ নিশ্চয় দলনে রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর। অর্থাৎ রাতে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পাঠ করা প্রবৃত্তির জন্য অত্যন্ত কঠিন। কেননা সাধনা-শ্রম প্রবৃত্তির পছন্দ নয়। নিদ্রাসুখই তার অভিপ্রেত। তাই গভীর রাতের সাধনা প্রবৃত্তিকে দলিত-মথিত তো করবেই।

এখানে 'নাশিয়াতাল্ লাইল' অর্থ রাত্রিকালের উত্থান। অর্থাৎ শয্যাসুখ থেকে গাত্রোত্থান করে নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া, তাহাজ্জুদ পাঠ করা। ইবনে কীসান বলেছেন, নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে শেষ রাতে জাগ্রত হওয়াকে বলে 'নাশিয়াতাল্ লাইল'। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'নাশা' শব্দটি আবিসিনীয়। এর অর্থ দাঁড়ানো। তাই রাতের যে কোনো অংশে নামাজের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়াকে বলে 'নাশিয়া'। ইবনে জায়েদও এরকম বলেছেন। ইকরামা বলেছেন 'নাশিয়া' বলে রাতের প্রথমাংশে জাগ্রত হওয়াকে।

ইমাম জয়নুল আবেদীন সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তীতে নামাজ পাঠ করতেন এবং বলতেন, এটাই 'নাশিয়াতাল্ লাইল'। লক্ষণীয়, ইকরামা এবং হজরত ইমাম হোসাইনের বক্তব্য

রসুল স. এর কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা রসুল স. আদিষ্ট হয়েছিলেন রাতের শেষাংশে নামাজ পাঠ করতে। হাসান বলেছেন, ইশার নামাজ পাঠের পর যে কোনো নামাজই 'নাশিয়াতাল্ লাইল'।

কেউ কেউ বলেছেন, 'নাশিয়াতান' হচ্ছে কর্তৃপদীয় শব্দরূপ। এর অর্থ— দণ্ডায়মান হওয়া। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই। মর্মার্থ— নিদ্রা থেকে জেগে উঠে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। 'নাশা' অর্থ সে দাঁড়িয়েছে। এই 'নাশা'রই কর্তৃপদীয় শব্দরূপ 'নাশিয়াতিল'। রাতের যে কোনো অংশে জাগ্রত হওয়াকেই বলে 'নাশিয়া'। যেমন বলা হয় 'নাশাতিম্ মাহাবাতু ওয়াবাদাত' (মেঘ উঠেছে ও প্রকাশ পেয়েছে)। তাই রাতে কোনো বিষয়ের উৎপত্তি বা প্রকাশ না হওয়াকে বলে 'নাশি'। আর 'নাশি' বহুবচন 'নাশিয়াতুন' এর। ইবনে মুলায়িকা বলেছেন, আমি একবার মান্যবর ইবনে আব্বাস এবং মাননীয় যোবায়েরের কাছে 'নাশিয়া' শব্দটির অর্থ জানতে চাইলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, সারারাতের যে কোনো অংশের কর্মকাণ্ডকে বলে 'নাশিয়া'।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াত্বআঁও ওয়া আক্বওয়ামু ক্বীলা'। এর অর্থ— এবং বাকস্ফুরণে সঠিক। ক্বারী ইবনে আমের ও ক্বারী আবু আমর এখানকার 'ওয়াত্বআন' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'উইত্বউন'। এভাবে উচ্চারণ করলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— সমন্বয়ন। অর্থাৎ রাতের এই নামাজে মন ও মুখ যেনো থাকে সমভাবসম্পন্ন। মুখের আবৃত্তি যেনো পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করে হৃদয়। আর 'ওয়াত্বআন' পড়লে শব্দার্থটি দাঁড়ায়— ভার, বোঝা, কষ্ট। অর্থাৎ দিনের নামাজ অপেক্ষা রাতের নামাজ অধিক গুরুভার, কষ্টকর। রসুল স. বলেছেন, হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ থেকে মুজাব গোত্রকে কাঠিন্য কবলিত (ওয়াত্বআন) করো। উল্লেখ্য, কষ্ট সহ্য করতে শিখলে তখন সে কষ্ট আর কষ্ট থাকে না। আর সুন্নত স্বীকৃত কষ্ট তো প্রভূত কল্যাণকর ও আস্বাদ্য। কেননা এতে করে প্রবৃত্তি থাকে অবদমিত, বশীভূত। এ ধরনের প্রবৃত্তিপীড়ক আমল মীযানের পাল্লায় হবে অত্যন্ত গুরুভার।

মান্যবর ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর' অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরজ করে দেওয়া রাতের নামাজ প্রচণ্ড কষ্টকর। তাই এ নামাজ পাঠ করা উচিত রাতের প্রথমাংশে। কারণ নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির পক্ষে এমতো নিশ্চয়তা নেই যে, সে জাগতে পারবে। কাতাদা বলেছেন, 'প্রবলতর' অর্থ এখানে— পুণ্যসঞ্চয়কারী ও আবৃত্তি সংরক্ষণকারী। ফাররা বলেছেন, রাতি জাগ্রত হওয়া রাতের নামাজের প্রস্তুতিকে সুদৃঢ় করে। কেননা তখন প্রকৃতি থাকে নীরব, নিস্তব্ধ। আর দিনে যেহেতু সকলেই জেগে থাকে ও কর্মমুখর হয়, তাই দিনের পরিবেশে নামাজ পাঠ সহজ। কথাটির মর্মার্থ এরকমও করা হয়েছে যে— রাতে জেগে ওঠা কঠিন। কারণ তা প্রবৃত্তির জন্য কষ্টদায়ক।

রাতের নামাজ অধিক আস্বাদন করেন সুফী-আউলিয়াগণ। ইবনে জায়েদ বলেছেন, রাতের বেলা সাংসারিক ঝক্কি-ঝামেলা থাকে না, তাই দিনের তুলনায়

রাতই ইবাদতের অধিক অনুকূল। হাসান বলেছেন, রাতের নামাজ পুণ্যসঞ্চারক ও শয়তান থেকে সুরক্ষক। আর 'বাকস্ফুরণে সঠিক' অর্থ রাতের নামাজে কোরআন আবৃত্তি করা যায় অতীব আন্তরিকতাসহ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'ইন্‌না লাকা ফিন্‌নাহারি সাব্‌হান ত্বউইলা'। এর অর্থ দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। এখানকার 'সাব্‌হান' শব্দটির ধাতুমূল 'আস্‌সাব্‌হু'। এর অর্থ— দীর্ঘ, দ্রুতগামিতা। পানিতে দ্রুত সন্তরণকারী মৎস্যকে এ কারণেই বলা হয় 'সাবাহাত'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! দিনের বেলায় আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয় ধর্মপ্রচারে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজে। রাতে পান আপনি অবকাশ। সুতরাং আমার দিকে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করুন গভীর রাতের নামাজের মাধ্যমে। এভাবে এখানে কারণ বিবৃত হয়েছে ইতোপূর্বে প্রদত্ত আদেশের।

রাতের নামাজের মাহাত্ম্য ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্‌পাকের আনুরূপ্যবিহীন অবতরণ ঘটে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। তখন তিনি আহ্বান করতে থাকেন, কে আছো আবেদনকারী! আবেদন করো। তোমার আবেদন গ্রহণ করা হবে। কে আছো ক্ষমাপ্রার্থী! ক্ষমা প্রার্থনা করো। তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হবে। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হস্তযুগল প্রসারিত করে দিয়ে বলেন, তোমরা কেউ কি ঋণ দিতে পারো এমন এক সত্তাকে, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কারো অধিকার হরণকারীও নন।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতে রয়েছে এক বিশেষ সময়। ওই সময় কেউ আল্লাহ্ সকাশে তার ইহ-পারত্রিক কল্যাণকামনায় প্রার্থী হলে আল্লাহ্ তার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামাজ হচ্ছে নবী দাউদের নামাজ। আর সর্বাপেক্ষা প্রিয় রোজা হচ্ছে নবী দাউদের রোজা। তিনি অর্ধরাত্রি অতিবাহিত করতেন নিদ্রায়। তারপর নামাজ পাঠ করতেন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকার পূর্ব পর্যন্ত। তারপর, আবার রাতের এক ষষ্ঠাংশ কাটাতেন ঘুমে। আর রোজা রাখতেন একদিন পর একদিন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু উমামা বাহেলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতের নামাজকে তোমরা অপরিহার্য করে নিয়ো। এটাই ছিলো পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবানগণের রীতি। আর এটাই পরম প্রভুপালনকর্তার নৈকট্যভাজন হওয়ার মাধ্যম। পাপস্খলনের উপলক্ষ। আর পাপপ্রবণতা থেকে আত্মরক্ষার ঢাল। তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষের কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহ্ প্রীত হন— ওই ব্যক্তি, যে রাতে জেগে উঠে

নামাজ পড়ে, যে নামাজ পাঠ করে একাগ্রচিত্ততার (হুজুরী কলবের) সঙ্গে এবং ওই ব্যক্তি, যে জেহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। বাগবী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে। হজরত আমর ইবনে উয়াইমিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতের শেষ পর্বে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার সর্বাধিক সন্নিকটবর্তী হন। তোমরা সমর্থ হলে ওই সময় আল্লাহ্‌র স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ ও উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআনের ধারক, বাহক (হাফেজ, আলেম) এবং নিশাচারী (গভীররাতে নামাজ পাঠকারী) আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম। বায়হাকী এরকম বর্ণনা করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান নামক পুস্তকে।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ৮, ৯

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾

r সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও।

r তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে।

'ওয়াজ্ কুরিস্‌মা রব্বিকা ওয়া তাবাত্‌তাল ইলাইহি তাবতীলা' অর্থ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও'। এখানে 'প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো' অর্থ সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র জিকির করো, কোনো মুহূর্তের জন্য জিকির থেকে অমনোযোগী থেকো না। বাক্যটির বক্তব্যগত যোগাযোগ রয়েছে ২ সংখ্যক আয়াতের 'রাত্রি জাগরণ করো' কথাটির সঙ্গে। উল্লেখ্য, সার্বক্ষণিক জিকির মুখের দ্বারা সম্ভব নয়। মুখ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা, কোরআন পাঠ, নামাজ ইত্যাদি। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে কলব দ্বারা মনে মনে জিকির করার কথাই বলা হয়েছে। আর মনের জিকিরই প্রকৃত জিকির। মনই স্মরণের স্থান। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, অমনোযোগীদের মধ্যে অবস্থানরত একজন জিকিরকারী বিত্তশালীদের মধ্যে ধৈর্যশীলের মতো। এই হাদিস দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জিকির দ্বারা অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এরই নাম জিকির বা আল্লাহ্‌র স্মরণ। অমনোযোগিতা দুষ্টে নামাজ মূল্যহীন। আল্লাহ্‌র স্মরণবিহীন তসবীহ, ক্বেরাত ধর্তব্যের বাইরে। অন্যমনস্ক হয়ে যে নামাজ আদায় করে, তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।

আমরা আলোচ্য আয়াত দ্বারা সার্বক্ষণিক স্মরণ মর্মার্থ নিয়েছি একারণে যে, এর যোগাযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'রাত্রি জাগরণ করো' কথাটির সঙ্গে।

উল্লেখ্য, যোজ্য ও যোজিতের মধ্যে অর্থের বৈপরীত্য আসে বৈয়াকরণগতভাবে। সাধারণ জিকির তো রাতের নামাজ ও কোরআন পাঠের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। এ কারণেই এখানে 'ওয়াজ্‌কুর' (স্মরণ করো) কথাটির অর্থ যদি আমরা 'সার্বক্ষণিক জিকির' নেই, তাহলে অধিকতর কল্যাণ থেকে আমরা আর বঞ্চিত হই না। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে অর্থগত গুরুত্বাপেক্ষা অন্বয়ার্থক ভাব গ্রহণ করাই উত্তম। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, এখানকার 'নাম স্মরণ করো' অর্থ পাঠ করো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' (শুরু করছি পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্‌র নামে)। অর্থাৎ কোরআন পাঠ করো আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে।

মাসআলা ঃ নামাজের বাইরে কেউ যদি সুরা ফাতিহা অথবা অন্য কোনো সুরা পাঠ করতে চায়, তবে তাকে সর্বাগ্রে পাঠ করতে হবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এরকম করা সুন্নত। কিন্তু এভাবে তেলাওয়াত করতে করতে নতুন সুরা এসে পড়লে তার পূর্বে পুনরায় 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়তে হবে কিনা সে ব্যাপারে রয়েছে বিভিন্ন অভিমত। সুরা আনফাল ও সুরা তওবা এক টানা পাঠ করার সময়ে সুরা তওবার আগে 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়া যাবে না, কিন্তু এক টানা পাঠের সময়েও সকল সুরার পূর্বে বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করতে হবে, এরকম অভিমতের প্রবক্তা ইবনে কাছীর, ক্বারী কালুন ও ক্বারী আসেম। তাঁদের মতে পৃথক পৃথক সময়ে তেলাওয়াত করলেও প্রতি সুরার শুরুতে পাঠ করতে হবে 'বিসমিল্লাহ্‌'। অন্য ক্বারীগণ বলেন, একটানা পাঠ করার সময় প্রথমে একবার 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠ করলেই হবে। অর্থাৎ এর মধ্যে নতুন সুরা এসে পড়লেও পুনঃপুনঃ 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়তে হবে না। তাঁদের মধ্যে আবার ক্বারী হামযা ও তাঁর সতীর্থগণ এমতাবস্থায় প্রথম সুরার শেষ শব্দটিকে মিলিয়ে পড়তেন পরের সুরার প্রথম শব্দের সঙ্গে। ক্বারী ওয়ারশ, ক্বারী আবু আমর ও ক্বারী ইবনে আমর উভয় সুরার মাঝে নিঃশ্বাস না ছেড়ে একটুখানি বিরতি দিয়ে (সেকতা করে) পাঠ শুরু করতেন। তাঁদের মতে কোনো সুরার মাঝামাঝি কোনো স্থান থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে তেলাওয়াতের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়ে নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করে পাঠকের অভিরুচির উপর। অর্থাৎ এমতাবস্থায় পাঠক 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়ে নিতে পারেন, অথবা না-ও পারেন। তবে সুরা আনফাল ও সুরা তওবার মিলিত পাঠের সময় সুরা তওবার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্‌' না পড়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

এবার আসা যাক নামাজের ভিতরে কোরআন পাঠের নিয়ম কানুনের আলোচনায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' প্রতিটি সুরার প্রথম আয়াত। তাই সুরা ফাতিহার আগে 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়া ওয়াজিব এবং অন্যান্য সুরার পূর্বে সুন্নত এবং নামাজে 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠ করতে হবে সরবে। অন্য ইমামত্রয় বলেন, 'বিসমিল্লাহ্‌' কোনো সুরারই অংশ নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ্‌' কোরআনের আয়াত ঠিকই, কিন্তু তা অবতীর্ণ হয়েছে সুরাসমূহকে পৃথককরণের উদ্দেশ্যে। ইমাম মালেক বলেছেন, নামাজের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠ করা যাবেই না, সুরা ফাতিহা, অথবা অন্য কোনো সুরার সঙ্গেও

নয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, 'বিসমিল্লাহ্' নীরবে পাঠ করতে হবে কেবল সুরা ফাতিহার শুরুতে। অন্যান্য সুরার শুরুতে কিছুতেই নয়। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, প্রতি সুরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করা মোস্তাহাব। আমি সুরা ফাতিহার তাফসীরে সপ্রমাণ উল্লেখ করেছি যে 'বিসমিল্লাহ্' সুরা ফাতিহা এবং অন্য কোনো সুরারই অংশ নয়। আর নামাজের মধ্যে বিসমিল্লাহ্র সরব উচ্চারণ রসুল স.এর আমল দ্বারা যেমন প্রমাণিত হয়নি, তেমনি প্রমাণিত হয়নি খলিফা চতুষ্টয়ের আমল দ্বারা।

নামাজের ভিতরে সরবে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠের সমর্থনে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ উপস্থাপন করেছেন নয়টি হাদিস। হাদিসগুলি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী ও খতিব বাগদাদী। কিন্তু ইবনে জাওজী হাদিসগুলি উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন, দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসগুলির সূত্রপরম্পরা সঠিক নয়। তবে কেবল সাহাবীগণ থেকে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কোনো কোনোটি বিশুদ্ধ, কোনো কোনোটি শিথিল।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ওই সময় বিসমিল্লাহ্ সশব্দে পাঠ করতেন, যখন ইয়ামামার মিথ্যাবাদী মুসায়লামা প্রসিদ্ধ ছিলো 'ইয়ামামার রহমান' নামে। মক্কার মুশরিকেরা তা শুনে বলেছিলো, শোনো, শোনো, এবার মোহাম্মদ ডাকতে শুরু করেছে ইয়ামামাবাসীদের পরম পূজনীয় রহমান মুসায়লামাকে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে 'বিসমিল্লাহ্' নীরবে পাঠ করার নির্দেশ দেন। রসুল স. এই আমলটি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন তাঁর মহাতিরোভাব পর্যন্ত। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. তাঁর মক্কাবাসের প্রথমদিকে নামাজে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করতেন সশব্দে। তারপর আর এরকম করেননি। সেকারণেই মহামান্য খলিফা চতুষ্টয় এবং মান্যবর সাহাবী ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে ইয়াসার, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল, আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের, আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকাম এবং শ্রদ্ধেয় তাবেয়ী হাসান বসরী, শা'বী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইব্রাহিম নাখয়ী, কাতাদা, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, আ'মাশ, সুফিয়ান সওরী প্রমুখের আমলে 'বিসমিল্লাহ্'র সশব্দ পাঠের কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য মান্যবর সাহাবী মুয়াবিয়া এবং শ্রদ্ধেয় তাবেয়ী আতা, তাউস ও মুজাহিদ থেকে সশব্দে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠের পক্ষে বিবৃতি পাওয়া গিয়েছে। এরকম বলেছেন ইবনে জাওজী।

'ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাব্তীলা' অর্থ এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। এখানকার 'তাবাত্তাল' শব্দটির ধাতুমূল 'তাবতীল' তাফয়ীলের শব্দরূপে পরিগঠিত। এর অর্থ— সম্পর্কচ্ছিন্ন করে, একনিষ্ঠভাবে। হাসান বসরী বলেছেন, 'তাবাত্তাল' অর্থ চেষ্টা করো। ইবনে জায়েদ অর্থ করেছেন, জাগতিক বিষয়ে চিত্তাকর্ষণবিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্ অভিমুখী হও। অর্থাৎ 'তাবাত্তাল' হচ্ছে আল্লাহ্ অভিমুখিতার পারিপার্শ্বিকতার নাম। কিন্তু কথাটির অর্থ আবার এরকম নয় যে, পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে বাহ্যিক আকর্ষণও ছিন্ন করতে হবে, খর্ব করতে হবে

বান্দার অধিকার, গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাস। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাস অবলম্বনের অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলাম হচ্ছে কর্মবাদ, নিষ্ক্রিয়তাবাদ নয়। জীবনাবাদ, পলায়নবাদ নয়। তাই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, পথচারী, বিধবা এতিমদের অধিকার পূরণ করতে গিয়ে সংসারী যেমন হতে হবে, তেমনি অন্তর্দেশকে সদা মুক্ত রাখতে হবে এ সকল কিছুর মোহ থেকে, অতি-আকৃষ্টি থেকে। তাই আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে—আল্লাহ্র স্মরণে একাগ্র হও, কিন্তু একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ো না। কেননা আত্মভোলা যারা, তারা যেমন বান্দার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, তেমনি নয় আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন। আধ্যাত্ম-মনীষীগণ তাই বলেন, যে পথ আমরা রুদ্ধ করতে চাই, সে পথের মোহনা দ্বিধাবিভক্ত। একটি হচ্ছে সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ অভিমুখীনতা। এদু'টো আবার একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। একারণেই আল্লাহ্ বান্দার উভয় কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে মাঝে যুক্ত করেছেন যোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং), যা সমষ্টির অর্থবহ। প্রথমে নির্দেশ করেছেন 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো'। তারপর বলেছেন 'এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও'। দায়িত্ব দু'টিকে তিনি একাকার করে দেননি। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন প্রথমে। তারপর দিয়েছেন পার্থিব মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ, যা মূলতঃ মুখ্য উদ্দেশ্যটিরই পরিপূরক।

আমি 'জিক্রুল্লাহ্' (আল্লাহ্র জিকির)কে বলি মহাসত্যের মানদণ্ড। কেননা জিকিরই কেবল দূর করে দিতে পারে আলস্য, ঔদাসীন্য ও বিস্মৃতি। আর এমতো জিকিরই এলমে হুজুরী। অর্থাৎ যে এলমে হুজুরীসম্পন্ন সে-ই কেবল হতে পারে সার্বক্ষণিক জিকিরকারী। এধরনের ব্যক্তিবর্গই এমন অবস্থানে স্থিত হন, যাকে বলে অভেদ (ইত্তেহাদ) ও সুস্থিতি (বাক্বা)। শব্দ ব্যবহারে ভিন্নতা থাকলেও এখানে অর্থগত দিক থেকে প্রকৃত বিষয় অভিন্ন। আর এই অভিন্ন কর্তব্যটিকেই প্রথম যুগের পুণ্যবান মনীষীগণ বলেছেন চিত্তশুদ্ধি (এখলাস)। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস তাই উপদেশ দিয়েছেন, তোমরা বিশুদ্ধচিত্ত হও কেবল আল্লাহ্র জন্য।

এখানে 'ওয়াজ্কুর রব্বাকা' না বলে বলা হয়েছে 'ওয়াজ্কুরিস্মা রব্বিকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জিকির করো' না বলে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র নামের জিকির করো'। কেনো? এমতো প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র সত্তার জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ অতীব দুরূহ। কেননা এর মধ্যে রয়েছে অগণন অন্তরাল, এমনই দুর্বোধ্যতা, সৃষ্টির পক্ষে যা ভেদ করা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে সৃষ্টি তাঁর পরিচয় যৎকিঞ্চিত হলেও লাভ করতে সক্ষম। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে 'একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও'। অর্থাৎ একাগ্রতার সঙ্গে কেবল তাঁর প্রতি অভিনিবেশী হয়ে করতে থাকো তাঁর নামের জিকির। তাহলে তাঁর নাম-গুণাবলী থেকে বিচ্ছুরিত দ্যুতিচ্ছটা দ্বারা তোমরা রঞ্জিত হতে পারবে এবং পাবে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন পরিচয়। উল্লেখ্য, এখানে 'তাবাত্তাল' (একনিষ্ঠভাবে)

কথাটির অর্থ ‘ফানা’ হওয়া। এমনভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যাতে অন্তর্জগতে প্রতিভাসিত হতে থাকে আল্লাহ্র নাম-গুণবত্তার তাজাল্লি। আরো উল্লেখ্য, আল্লাহ্র সত্তাসম্পর্কিত জ্ঞানের নাম ‘তাবাত্তাল’ নয়। ‘তাবাত্তাল’ হচ্ছে আল্লাহ্র নাম-গুণাবলীসম্পৃক্ত জ্ঞান, যা লাভ হতে পারে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্তে মগ্ন হলে। অর্থাৎ ফানা (আত্মবিলোপন) লাভ করে।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানে ‘জিকির’ অর্থ মৌখিক জিকির, যা অবশ্যই সম্পৃক্ত সার্বক্ষণিক জিকিরের সঙ্গে। আর ‘সার্বক্ষণিক জিকির’ অর্থ সুযোগ ও সামর্থ্যানুসারে জিকির করা। এরকম জিকিরও পৌঁছে দিতে পারে ‘তাবাত্তাল’ (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্মগ্ন) এর পর্যায়ে। এরকম জিকিরও নিরবচ্ছিন্ন জিকির পদবাচ্য। তবে শর্ত হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি হতে হবে অনুকূল এবং সাথে সাথে পেতে হবে সামর্থ্যের (তাওফীকের) আনুকূল্য, যেমন দেখা যায় কোনো কোনো নবী ও কিছুসংখ্যক ওলীর ক্ষেত্রে। কিংবা বলা যেতে পারে, স্বীয় পীর- মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ এর ফলে সামর্থ্য প্রাপ্তি হয় সহজে। এরকম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানে ‘একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্মগ্ন হওয়ার পূর্বে প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো’ কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে সঠিক ও স্বাভাবিক। কেননা সাফল্যের উল্লেখের পূর্বে সাফল্যলাভের মাধ্যমের উল্লেখ করাই রীতিসম্মত। এখানেও তেমনি মূল সাফল্য হচ্ছে আল্লাহ্মগ্ন হওয়া এবং তার মাধ্যম হচ্ছে জিকির।

বর্ণিত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এখানে ‘প্রতিপালকের নামের স্মরণ করো’ বলে নির্দেশ করা হয়েছে ‘আল্লাহ্’ নামের পুনঃপুনঃ আবৃত্তির। আর পরবর্তী আয়াতে ‘তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা’ কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে এই তত্ত্বটি যে, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্রগামী। অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। এরপরের কথাটিতে (লা ইলাহা ইল্লা হুয়া) রয়েছে দু’টি বিষয়— ঋণাত্মক ও ধ্বনাত্মক। অর্থাৎ ‘নফী’ (লা ইলাহা) এবং ‘ইছবাত’ (ইল্লা হুয়া)। এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তিও জিকির এবং এমতো জিকির জিকিরকারীকে পৌঁছে দেয় পরিপূর্ণ নৈকট্যে (কামেল বেলায়েতে)। নফি হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল কিছুকে অভীষ্ট পথ থেকে বিলীন করে দেওয়া এবং ‘ইছবাত’ হচ্ছে প্রমাণ করা কেবল আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্কে। উল্লেখ্য, নিশিথের নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত এবং প্রভুপালনকর্তার মহিমময় নামের জিকির পৃথক পৃথক তিনটি বিধান।

এমতো বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নামাজ, কোরআন পাঠ, ‘আল্লাহ্’ ‘আল্লাহ্’ জিকির এবং ‘নফী ইছবাত’ (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্) জিকির— এই চারটি আমল আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন হওয়া ও প্রিয়ভাজন হওয়ার মূল মাধ্যম। প্রথমোক্ত দু’টি উপনীত করায় মর্যাদার চূড়ান্ত স্তরে। আর শেষোক্ত দু’টি সাহায্য করে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরসমূহ অতিক্রম করতে। যেহেতু এখানে সম্বোধিতজন রসুল স. স্বয়ং এবং যেহেতু তিনি স. সকল নবী ওলীগণের পুরোধা, তাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে নামাজ পাঠ ও কোরআন আবৃত্তির। তারপর সাধারণ সালেকদের (আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের) উপযোগী মাধ্যম ‘জিকির’ ও ‘তাবাত্তাল’ এর।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, অতএব তাঁকেই গ্রহণ করো কর্মবিধায়করূপে'।

এখানকার 'রব্বুল মাশরিক্বি' কথাটির 'রব্বুল' শব্দটিকে পেশ সহযোগে পাঠ করেছেন আল্লামা ইবনে কাছীর, ক্বারী নাফে, ক্বারী আবু আমর ও ক্বারী হাফস। এমতাবস্থায় শব্দটি হবে একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। অথবা শব্দটিই হবে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হবে অবলুপ্ত। আর যদি শব্দটিকে যের সহযোগে 'রব্বিল' পাঠ করা হয়, তবে বলতে হবে, শব্দটি আগের আয়াতে উল্লেখিত 'রব্বিকা' এর অনুবর্তিকা। কিংবা বলা যেতে পারে, এর পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি শপথসূচক বাক্য, যার জবাব 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' (তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)।

'ফাত্তাখিজ্হু ওয়াকীলা' অর্থ অতএব তাঁকেই গ্রহণ করো কর্মবিধায়করূপে। এখানকার 'ফাত্তাখিজ্হু' এর 'ফা' (অতএব) হচ্ছে নিমিত্ত অব্যয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও কর্মকুশলতার কারণেই সমগ্র সৃষ্টির একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকর্তা। আর তিনি ছাড়া যেহেতু অধিকর্তা কেউ নেই এবং উপাস্য হওয়ার দিক থেকে তিনি যখন এক, একক ও অদ্বিতীয়, সেহেতু সকল কর্মকাণ্ড তাঁর প্রতি ন্যস্ত করাই সমীচীন। অতএব হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি এমনই করুন।

প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, আল্লাহ্র উপরে সবকিছু সোপর্দ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার কথাই কি এখানে বলা হলো? যদি তাই হয়, তবে তো প্রশ্রয় দেওয়া হলো সন্ন্যাসবাদকেই। সমাজ জীবন তাহলে চলবে কীভাবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, না, বিষয়টি সেরকম নয়। অপরিহার্য বৈধ কর্মকাণ্ডে মানুষকে তো নিয়োজিত থাকতেই হবে। তবে তাঁকে সর্বাবস্থায় নির্ভর করতে হবে আল্লাহ্র উপরে এবং সকল প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা দূরীকরণের প্রার্থনা জানাতে হবে কেবল তাঁরই সকাশে। কেননা তিনিই সমগ্র সৃষ্টির একক সৃজয়িতা, পালয়িতা, অধিকর্তা। সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারিত হয় তাঁরই অভিপ্রায়ে। তিনিই একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তাঁর নিকটে সকলকিছু ন্যস্ত করাই তো সমীচীন। বরং তা অত্যাবশ্যক। বিশ্বাসের দাবি তো এটাই।

'রব্বুল মাশ্রিক্বি ওয়াল মাগ্রিবি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' বচনটি স্তুতিপ্রকাশক। বচনটিতে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্র বিশেষ গুণাবলী। বচনটি এখানে একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্পাকের কর্ম ও আধিপত্যের বিস্তৃতি তাঁর প্রজ্ঞা ও অজেয় শক্তিমত্তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' (তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই) কথাটির দ্বারা চিরতরে বিলুপ্ত করা হয়েছে অন্য কারো, অথবা অন্য কোনোকিছুর উপাস্য হওয়ার সম্ভাবনাকে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এমতো শাশ্বত বিশ্বাসের— আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। আধ্যাত্ম পথের পথিকগণ যখন এই অবস্থানটি অতিক্রম করে, তখনই তার জিকির হয় প্রকৃত জিকির। এর আগে আগে যা হয়, তা জিকিরের অনুশীলন মাত্র, প্রকৃত জিকির নয়। এভাবে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহ্র। তখন তার অন্তর থেকে মুছে যায় পৃথিবীপ্রসক্তি। ফলে সে একনিষ্ঠভাবে হতে পারে আল্লাহ্মগ্ন।

হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যেরকম নির্ভরযোগ্য, তোমরা যদি তাঁর প্রতি সেরকম নির্ভরশীল হতে পারো, তবে তিনি তোমাদেরকে রিজিক দিবেন সেভাবে, যেভাবে তিনি রিজিক দেন বিহঙ্গকুলকে। তারা প্রত্যুষে নীড় ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত উদরে, আর সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে পানাহার-পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জিবরাইল ফেরেশতা আমার বক্ষ্যাভ্যন্তরে এই কথাটি প্রক্ষেপণ করেছে যে, নির্ধারিত উপজীবিকা নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে কেউই পরলোকগমন করে না। সুতরাং তোমরা সাবধান হও। উপজীবিকা অন্বেষণ করো শরিয়তসিদ্ধ পথে। হাদিসটি বায়হাকী উল্লেখ করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমানে' এবং বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য়।

হজরত আবু জর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সংসার বিরাগ এরকম নয় যে, তুমি হালালকে মনে করবে হারাম। বিনষ্ট করবে বৈধ ধনসম্পদ। বরং সংযম হচ্ছে এই, তোমার নিকট যা আছে, তার চেয়ে তুমি অধিক নির্ভরশীল হও, যা আছে আল্লাহ্র অধিকারে তার উপর। বিপদে পতিত হলে কামনা কোরো না বিপদের প্রলম্বায়নকে।

আমাদের পরম শ্রদ্ধার্হ শায়েখ মাওলানা ইয়াকুব চরখী রহঃ বলেছেন, এ সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অধ্যাসনের (মাকামের), পথপরিক্রমার (সুলুকের)। নিশীথের নিভৃত নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার, আল্লাহ্মগ্নতা, আল্লাহ্নির্ভরতা এ সকল কিছুর রয়েছে বিভিন্ন স্তর। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাসন হচ্ছে অরাতিকুলের অবদমন, দলন, যার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾

r লোকে যাহা বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল।

r ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীদিগকে; আর কিছু কালের জন্য উহাদিগকে অবকাশ দাও,

r আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্বলিত অগ্নি,

r আর আছে এমন খাদ্য, যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

r সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখে 'উন্মাদ' 'কবি' 'যাদুকর' ইত্যাদি অপবচন শুনে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। অবলম্বন করুন ধৈর্য। কৌশলে এড়িয়ে চলুন তাদেরকে। তাদের অশুভ আচরণের বিপরীতে প্রদর্শন করুন সৌজন্য। উল্লেখ্য, জেহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এই আয়াতখানির কার্যকারিতা রহিত হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীদেরকে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আবু জেহেল ও তার মতো অন্যান্য বিত্তপতি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিষয়টি আপনি আমার প্রতি ন্যস্ত করুন। তাদেরকে শায়েস্তা করতে আমিই যথেষ্ট। যথাকালে যথাশাস্তি আমি তাদেরকে দিবোই। সুতরাং এ নিয়ে আপনি যেনো আর বিচলিত না হন। এখানে 'উলিন্ নি'মাতি' (বিলাস সামগ্রীর অধিকারী) বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদের দলপতিকে। আর 'ওয়াল মুকাজ্জিবীন' (সত্য অস্বীকারকারীদেরকে) কথাটির 'ওয়াও' (এবং) এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'সাথে' অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও'। একথার অর্থ— আপনি স্বাভাবিক নিয়মে তাদেরকে মরতে দিন। তারপর চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা তো তাদের জন্য রয়েছেই। অথবা অচিরেই আমি পৃথিবীতেও তাদেরকে শাস্তি দিবো। মুসলমানদের হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ভবলীলা সাঙ্গ করার ব্যবস্থা করবো তাদের। এভাবে স্বস্তিদান করবো আপনাকে এবং আপনার অত্যাচারিত সঙ্গীসাথীকে।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ইঙ্গিত। ওই যুদ্ধেই নিহত হয়েছিলো সত্যঅস্বীকারকারীদের প্রধান প্রধান দলপতিরা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমার নিকট আছে শৃঙ্খল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি (১২) আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি' (১৩)।

এখানকার 'আনকালা' শব্দটি 'নাকালা' এর বহুবচন। এর অর্থ শৃঙ্খল, বেড়ি। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, এখানে 'আনকালাঁও ওয়া জ্বাহীমা' অর্থ অগ্নিশৃঙ্খল। 'ওয়া ত্বয়ামান জা গুছ্ছাতিন' অর্থ এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায়, যা গলাধঃকরণ করা যেমন যায় না, তেমনি যায় না উগলানো। এভাবে বক্তব্যটি

দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! শুনুন, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি ভয়ংকর সব শাস্তির উপকরণ— শৃঙ্খল, লেলিহান অগ্নি, এমন বিস্বাদযুক্ত খাদ্য, যা আটকে থাকবে গলায়। এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক মর্মন্তুদ শাস্তি।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বলেছেন, গলায় খাদ্য আটকে যাবে আগুনের কারণে। অর্থাৎ খাদ্য হিসেবে তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে আগুন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদেরকে খাওয়ানো হবে যাক্কুমবৃক্ষ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোযখে রয়েছে 'দ্বরী' নামক একটি বৃক্ষ, যা হবে কণ্টকাকীর্ণ, তিক্ত, মরদেহবৎ দুর্গন্ধযুক্ত ও উত্তপ্ত। ওই বৃক্ষ দোজখীদেরকে যখন খাওয়ানো হবে, তখন তা আটকে থাকবে তাদের কণ্ঠনালীতে। তারা তা না গিলতে পারবে, না পারবে উগলে দিতে।

'আ'জাবান আ'লীমা' অর্থ মর্মন্তুদ শাস্তি। এসম্পর্কে সুপরিণত সূত্রে হজরত হুজায়ফা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, নরকবাসীদের উপরে আপতিত হবে অগ্নি, সর্প ও বৃশ্চিক। ওই সর্প যদি পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ছাড়ে, তবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আর যদি সে একজন মানুষকে দংশন করে, তবে সকল মানুষই হয়ে যাবে লাশ। ওই সর্প ও বৃশ্চিকগুলো প্রবেশ করবে নরকবাসীদের চামড়ার মধ্যে। হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, নারকীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তি হবে আবু তালেবের। তাকে পরানো হবে অগ্নিপাদুকা। ফলে গলে যাবে তার মস্তকের মগজ।

হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, নরকবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে ওই সকল লোকের, যাদেরকে পরানো হবে আগুনের জুতা। ফলে জ্বলন্ত উনুনে চাপানো ডেকচির ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করে ফুটতে থাকবে তাদের মাথার মগজ। সে তখন ভাববে, সবচেয়ে বেশী শাস্তি ভোগ করছে সে। এরকম আরো হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে'। একথার অর্থ— 'কিয়ামতের দিন শুরু হবে প্রচণ্ড ভূকম্পন। পৃথিবী ও পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতগুলো কাঁপতে থাকবে থর থর করে। এভাবে সেগুলো হবে ধূলিসাৎ। পরিণত হবে বালুকারাশিতে।

এখানে 'ইয়াওম' (দিবস) কথাটি ক্রিয়ার কালাধার। আর ক্রিয়ার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে আগের আয়াত দুটোতে। বলা হয়েছে, শৃঙ্খল, অগ্নি ও তিক্ত খাদ্যের কথা।

সংশয়ঃ পৃথিবীতে ভূকম্পন শুরু হবে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের পূর্বে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে মহাবিচারপর্ব শেষে নরকে। অথচ এখানে আগে দোজখের শাস্তির বিবরণ দেওয়ার পর উল্লেখ করা হলো কিয়ামতের। এতে করে বর্ণনার ক্রম-বৈপরিত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হলো না কি?

সংশয়ভঞ্জনঃ কিয়ামতের পরিসর সুবিশাল। শিঙ্গাধ্বনির পূর্বের ভূকম্পন থেকে শুরু করে স্বর্গবাসী ও নরকবাসীদের স্ব স্ব ঠিকানায় গমন করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। সুতরাং এই সুবিশাল পরিসরের কোনো কোনো ঘটনা আগে পরে উল্লেখ করলে দোষের তো কিছু নেই।

এখানকার 'ওয়া কানাতিল জ্বিবালু' এর 'ওয়াও' (এবং) হচ্ছে যোজক অব্যয়। এর যোজ্য হবে 'তারজুফূ' (প্রকম্পিত হবে)। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'কাছীবাম মাহীলা' বাক্যটির মর্মার্থ করেছেন উড়ন্ত বালুকা সদৃশ। কালাবী বলেছেন, এমন বালির স্তূপ, যা থেকে একমুঠো উঠিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শূন্যস্থান হয়ে যায় পূর্ণ।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا ﴿١٧﴾ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

r আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠাইয়াছিলাম ফির'আওনের নিকট,

r কিন্তু ফির'আওন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

r অতএব যদি তোমরা কুফরী কর তবে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে সেই দিন যেই দিনটি কিশোরকে পরিণত করিবে বৃদ্ধে,

r যেই দিন আকাশ হইবে বিদীর্ণ। তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

r নিশ্চয় ইহা এক উপদেশ, অতএব যে চাহে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! শোনো, আমার নিয়ম এই যে, যুগে যুগে আমি পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করে থাকি বার্তাবাহক। যেমন ইতোপূর্বে নবী মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন ও তার অনুসারীদের পথপ্রদর্শনার্থে। এখন আবার তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি আমার প্রিয়তম নবী মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্কে। তোমাদের মধ্যে কারা তাঁকে মান্য করো এবং কারা মান্য করো না, তিনি হবেন তার সাক্ষ্যদাতা।

এখানে ‘ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রসুলা’ অর্থ নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রসুল। লক্ষণীয়, ইতোপূর্বে রসুল স.কে যেমন নিশ্চিতার্থক শব্দ ‘ইন্না’ (নিশ্চয়) দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিলো (ইন্না সানুল্ক্বী), এখানেও তেমনই বক্তব্য শুরু করা হয়েছে ‘ইন্না’ দিয়ে। এভাবে দু’টো সম্বোধনকেই করা হয়েছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সম্বোধিতজন এক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও বক্তব্যপ্রবাহকে করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক ও বেগবান।

‘শাহীদান আ’লাইকুম’ অর্থ তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে স্বীকার করো এবং কে করো না, তার সাক্ষ্য তিনি উপস্থাপন করবেন আমার কাছে। আর এখানকার ‘কামা আরসালনা’ কথাটি এখানে বিশেষণ এবং এর বিশেষ্য এখানে রয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ফেরাউনের নিকট রসুল প্রেরণের বিষয়টি যেমন ছিলো, তোমাদের নিকট রসুল প্রেরণের বিষয়টি তেমনই।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— ‘কিন্তু ফেরাউন সেই রসুলকে অমান্য করেছিলো, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম’। এ কথার অর্থ— ফেরাউন আমা কর্তৃক প্রেরিত সেই বার্তাবাহককে অমান্য করেছিলো। ফলে আমি সে ও তার বশংবদদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম সমুদ্রগর্ভে। অতএব হে মক্কাবাসী! এখনো সময় আছে, সাবধান হও। সর্বান্তঃকরণে মেনে নাও আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহককে। অন্যথায় তোমাদেরকেও দেওয়া হবে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের মতো, অথবা তদপেক্ষা অধিক শাস্তি।

এখানে ‘আখজাঁও ওয়াবীলা’ অর্থ কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। মুষলধারার বৃষ্টিকে বলে ‘ওয়াবীল’। আবার ‘ত্বআ’মুন ওয়াবীলুন’ অর্থ দুষ্প্রাপ্য আহার্য। এভাবে ‘কঠিন শাস্তি’ কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায় ব্যতিক্রম ধারার সুকঠিন শাস্তি। বলা বাহুল্য, ব্যতিক্রম ধারার শাস্তিই দেওয়া হয়েছে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ‘অতএব যদি তোমরা কুফরী করো, তবে কী করে আত্মরক্ষা করবে সেই দিন, যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে’। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! বিষয়টি তাহলে ভালোভাবে চিন্তা করে দ্যাখো। যদি তোমরা অবাধ্যতার সঙ্গেই জীবন যাপন করতে চাও এবং এভাবেই সাঙ্গ করো পৃথিবীর জীবন, তবে যেদিন ভয়ে-আতংকে দুশ্চিন্তায় বালকেরাও হয়ে যাবে বৃদ্ধের মতো পক্ককেশবিশিষ্ট ও নিস্তেজ, সেই ভয়ংকর কিয়ামত দিবসে কী করে তোমরা পাবে পরিত্রাণ? আত্মরক্ষাই বা করতে পারবে কী করে জাহান্নামের মর্মন্তুদ ও চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে? বক্তব্যটি একটি উপমা। অর্থাৎ বালকের বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপমা উপস্থাপন করে এখানে ধারণা দেওয়া হয়েছে মহাপ্রলয়কালের ভয়াবহতার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট একটি হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স. বললেন, প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্পাক নবী আদমকে ডেকে

বলবেন, ওহে আদম! তিনি বলবেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। এই যে আমি। আল্লাহ্পাক বলবেন, জাহান্নামের অংশ পৃথক করো। নবী আদম বলবেন, কতো? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে একজন বাদ দিয়ে অন্য সবাই। তখন কোনো নারীই গর্ভবতী অবস্থায় থাকবে না। আর আপামর জনসাধারণকে মনে হবে নেশাগ্রস্ত, উন্মত্ত। কিন্তু আসলে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। ওরকম হয়ে যাবে তারা ভয়ে ও দুঃশ্চিন্তায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হাজারে একজন করে যারা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্তার পাবে, তারা কারা? তিনি স. বললেন, 'ইয়াজুজ-মাজুজদের মধ্য থেকে জাহান্নামী হবে এক হাজার এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন (এ-ই হবে তখন জাহান্নামী ও জান্নাতীদের অনুপাত)। কিছুক্ষণ পর তিনি স. বললেন, তোমরা কি এ সংবাদে খুশী নও? যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা হবে জান্নাতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ। সাহাবীগণ আনন্দিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন আল্লাহু আকবার। তিনি স. পুনরায় বললেন তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ। সাহাবীগণ পুনরায় তকবীর ধ্বনি দিলেন। তিনি স. আবারো বললেন, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে তোমরাই। সাহাবীগণ তকবীরধ্বনি দিলেন আরো অধিক উচ্চ কণ্ঠে। শেষে তিনি স. বললেন, জাহান্নামে (সাময়িকভাবে) তোমাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য, যেনো শাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশম, অথবা কালো ষাড়ের শরীরে একটি শাদা লোম। বোখারী, মুসলিম।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন আকাশ হবে বিদীর্ণ'। একথার অর্থ— আকাশ সুবিশাল, দুর্ভেদ্য ও সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। ভেঙে চুরে হয়ে যাবে চুরমার।

এখানকার 'সামা' (আকাশ) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর 'মুনফাত্বিরুন' (বিদীর্ণ) শব্দটি পুংলিঙ্গ। আর আরবী ভাষার রীতি অনুসারে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় হতে হয় সমলিঙ্গবাচক। অথচ এখানে তা করা হয়নি। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এখানে 'সামা' অর্থ নেওয়া হয়েছে 'সাকারা' (ছাদ), যা পুংলিঙ্গবাচক। এভাবেই শব্দদু'টোকে করা হয় সমলিঙ্গসম্পন্ন। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'মুনফাত্বিরুন' এর পূর্বে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 'শাই' (বস্তু) শব্দটি। অর্থাৎ আকাশ ভেঙে ফেটে যাওয়ার বস্তু। এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিলে লিঙ্গরীতি সমস্যা আর থাকেই না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে'। একথার অর্থ— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার এ সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ যে অঙ্গীকার করেছেন, তার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। তাঁর এমতো অঙ্গীকার পরিপূরিত হবেই হবে।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক'। এখানে 'ইন্না হাজিহী' অর্থ

নিশ্চয় এটা। অর্থাৎ এই সকল নিদর্শন, যা আমি আমার রসুলের উপরে অবতীর্ণ করেছি। 'তাজকিরাতুন' অর্থ উপদেশ, স্মারক। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ্র অনুগ্রহসম্ভার, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কথা। 'ফা মান শাআত্ তাখাজা' অর্থ অতএব যে চায় সে অবলম্বন করুক। আর 'ইলা রব্বিহী সাবীলা' অর্থ তার প্রতিপালকের পথ।

এখানকার 'ফা মান শাআ' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ এই উপদেশাবলীই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত। এর বিকল্প আর কিছু নেই। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ-ধমনী অপেক্ষা অধিক নিকটে। কিন্তু তাঁর ও আমাদের মধ্যে রয়েছে ঔদাসীন্যের ও অমনোযোগিতার অন্তরায়। বিশ্বাসী মনোনিবেশন ছাড়া এই অন্তরায় ভেদ করা অসম্ভব। উদাসীন ও অবিশ্বাসী মানুষ তাই তাঁর মহিমান্বিত ও অবোধ্য নৈকট্যের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয় না। রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্পাককে আনুরূপ্যবিহীনরূপে ঘিরে রয়েছে আলো ও অন্ধকারের সত্তর হাজার পর্দা। মহত্ত্ব ও পরাক্রমের পর্দাগুলো জ্যোতির্ময়। আল্লাহ্পাক বলেন, মহত্ত্ব আমার উত্তরীয় এবং পরাক্রম আমার পরিধেয়। আর তমসাময় পর্দাগুলো হচ্ছে বান্দার উদাসীনতার। যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল পর্দা অপসারণ করেন, তবে তাঁর জ্যোতিসম্পাতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি। অন্ধকার পর্দাগুলোকে অপসারণ করতে পারে কেবল আল্লাহ্র জিকির। যারা জিকিররত, তাঁরাই লাভ করেন আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন নৈকট্য, হতে পারেন আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন (ওলী)। রসুল স. বলেছেন, যে যাকে ভালোবাসে, সে তার সঙ্গে। এপথেই অর্জিত হয় 'ফানা' (সমাহিতি) ও 'বাক্বা' (স্থিতি)। অর্থাৎ আল্লাহ্মগ্নতা ও আল্লাহতে স্থায়িত্ব লাভ।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ২০

اِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ اَنَّكَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰى مِنۡ ثُلُثَىِ الَّيۡلِ وَ نِصۡفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ مَعَكَ ‌ؕ وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيۡلَ وَ النَّهَارَ ‌ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ‌ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ‌ ؕ عَلِمَ اَنۡ سَيَكُوۡنُ مِنۡكُمۡ مَّرۡضٰى ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ يَضۡرِبُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ يَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ‌ ۙ وَ اٰخَرُوۡنَ يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ‌ ۖ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُ ۙ وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقۡرِضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا ‌ؕ وَ مَا

تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

r তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদের একটি দলও এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা ইহা পুরাপুরি পালন করিতে পারিবে না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর, আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। কাজেই তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। অতএব সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তাহা তোমরা পাইবে আল্লাহ্র নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকট; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্না রব্বাকা ইয়া'লামু আন্নাকা তাকূমু আদ্না'। এখানে 'আদ্না' অর্থ প্রায়, কাছাকাছি। 'মিন ছুলুছাইল লাইলি' অর্থ রাতের দুই তৃতীয়াংশ। 'ওয়া নিস্ফাহু' অর্থ অর্ধেক। 'ওয়া ছুলুছাহু' অর্থ এবং এক তৃতীয়াংশ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনার প্রভুপালক আপনার এবং আপনার কিছুসংখ্যক সহচরের রাত জেগে ইবাদত করার সংবাদ নিশ্চয় জানেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। তাই কখনো আপনি ও আপনার ওই সঙ্গীরা রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময়, কখনো অর্ধেক, আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ সময় ধরে নামাজ ও কোরআন পাঠ করেন, সে সম্পর্কে তিনি এতোটুকুও অনবগত নন। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে কাছীর ও কুফানিবাসী ক্বারীগণ পাঠ করতেন 'নিস্ফাহু ওয়া ছুলুছাহু'। এভাবে পাঠ করলে পদ দুটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'আদ্না' (প্রায়) শব্দটির সঙ্গে এবং অর্থ দাঁড়াবে— আপনি রাত্রি জাগরণ করেন কখনো প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কখনো অর্ধেক এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ। অন্যান্য ক্বারী পাঠ করতেন 'নিস্ফিহী ওয়া ছুলুছিহী'। এই পাঠরীতিকে মান্য করলে পদদু'টি সম্পর্কিত হবে 'ছুলাছাই' এর সঙ্গে এবং এমতাবাস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনি নামাজ পড়েন কখনো প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো প্রায় অর্ধেক এবং কখনো প্রায় এক তৃতীয়াংশ রাত্রি ব্যাপী।

আলোচ্য বাক্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. রাত জাগতেন কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি ব্যাপী, অথবা এক চতুর্থাংশের অধিক। 'এক চতুর্থাংশের অধিক' বলা হলো ইতোপূর্বের 'কিংবা তদপেক্ষা অল্প' (মিনহু ক্বলীল) কথাটির ভিত্তিতে। কথাটির উদ্দেশ্য এক চতুর্থাংশের অধিকই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ত্বয়িফাতুম মিনাল্ লাজীনা মাআ'ক্'। এর অর্থ— এবং জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের একটি দলও। এখানে 'মিনাল্ লাজীনা মাআ'ক' এর 'মিন' আংশিকার্থক। অর্থাৎ নিশি জাগরণকারী ছিলেন কিছুসংখ্যক সাহাবী, সকলেই নন। বাগবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, সকল সাহাবীই ছিলেন নিশি জাগরণকারী। কিন্তু তাঁর একথাটি ঠিক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু ইউক্বদ্দিরুল লাইলা ওয়ান নাহার'। এর অর্থ— এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে 'রব্বাকা' (প্রতিপালক) এর সঙ্গে। উল্লেখ্য, এখানে সর্বনাম ব্যবহার না করে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে নামপদ 'আল্লাহ্'। এর তাৎপর্য হচ্ছে দিবস-রজনীর পরিমাপের রহস্য জানেন কেবল আল্লাহ্। তাই তিনিই কেবল নির্ধারণ করতে পারেন দিবস-যামিনীর পরিমাপের হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রবহমানতা।

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, এখানে বাক্যের প্রারম্ভে আল্লাহ্ উল্লেখ করে ক্রিয়াপদীয় বাক্যে নামপদীয় বাক্যের বিধেয়কে স্থির করাতে প্রতীয়মান হয় যে, সময়ের প্রকৃত রহস্য কেবল আল্লাহ্ই জানেন। অন্য কেউ নয়। এরকম বলেছেন আবদুল কাহের এবং জমখশারীও। সাক্কাকী অবশ্য এ প্রসঙ্গে পোষণ করেন ভিন্নমত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ উত্তমরূপে এ বিষয়টি অবগত যে, তোমরা পূর্ণরূপে সময়ের রহস্য ভেদ করতে পারবে না। সময়ের যথাসংরক্ষণ ও যথা মূল্যায়নও তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। সেকারণেই তিনি পাঁচওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারণ করেছেন সূর্যের গতিবিধির ভিত্তিতে। সূর্যের উদয়-অস্ত, দ্বিপ্রাহরিক অবস্থান, ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধি-প্রলম্বায়ন, এগুলোই তো সময়প্রবাহের বাহ্যিক চিহ্ন। এ সকল চিহ্ন নির্ণয় করা সহজ। সেকারণেই আল্লাহ্ এখন থেকে রাতের অংশ নির্ধারণের জটিলতা রহিত করে দিলেন। এখন থেকে তোমাদের জন্য ফরজ হিসেবে নির্ধারণ করলেন সহজসাধ্য আমল— পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাক্বরাউ মা তাইস্সারা মিনাল ক্বুরআন'। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি নিমিত্ত প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— গভীর রাতে উঠে যতোটুকু নামাজ পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততোটুকু নামাজ পড়ো। এখানে 'আবৃত্তি করো' (ফাক্বরাউ) অর্থ নামাজ পাঠ করো। কোরআন আবৃত্তি করা নামাজের একটি অঙ্গ। আর এখানে এই অঙ্গটির উল্লেখ দ্বারাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে পুরো অবয়বকে, অর্থাৎ নামাজকে। যেমন অন্য আয়াতে 'ক্বিয়াম' উল্লেখ করে উদ্দেশ্য করা হয়েছে পুরো নামাজকে। আর এটা ঐকমত্যসম্মত অভিমত যে, 'ক্বিয়াম' (দণ্ডায়মানতা) ও 'ক্বিরাত' (কোরআন পাঠ) দু'টোই নামাজের স্তম্ভ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত দ্বারা রাত্রি জাগরণের সময়সীমায় (দুই-তৃতীয়াংশ,

অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) অত্যাবশ্যকতাকে রহিত করা হয়েছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহাজ্জুদের অত্যাবশ্যকতাকে রহিত করা হয়নি। পরে যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়, তখন রহিত হয়ে যায় তাহাজ্জুদ পাঠের অত্যাবশ্যকতা। তাহাজ্জুদ তখন হয়ে যায় নফল। এরকম বলেছেন মাতা মহোদয়া আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস, মুকাতিল ও ইবনে কীসান।

আমি বলি, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রসুল স. সহ তাঁর সকল উম্মতের উপরে তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিলো। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, পরে যখন উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ রহিত করা হলো, তখন কি-তা রসুল স. এর জন্যও রহিত করা হয়েছিলো? যদি তা না হয়, তবে কি বলা যাবে, তখনও রসুল স. এর উপরে তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো? তারপর যখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্য, তখন কি তাঁর উপর থেকে অপসারিত করা হলো ফরজের বিধান? অথবা এরকম কি বলা যেতে পারে যে, পূর্বের ফরজ বিধান আলোচ্য বাক্য (ফাক্বরাউ) অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এবং তাঁর উম্মত উভয়ের উপর থেকে এক সাথে এ সম্পর্কিত ফরজ রহিত হয়ে যায়? বিদ্বজ্জনের নিকট বিষয়টি মতদ্বৈধতাধীনই রয়ে গিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত রসুল স. এর উপরে তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো, না নফল। কেউ কেউ বলেছেন, পরলোক গমন পর্যন্ত তাঁর স. উপর তাহাজ্জুদ পাঠ ছিলো ফরজ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পরে তাহাজ্জুদকে তাঁর জন্য করা হয় নফল। আমি বলি, শেষোক্ত অভিমতটি অধিকতর যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফা তাহাজ্জাদ বিহী নাফিলাতাল্লাক' (আর রাতের কিয়দংশে তাহাজ্জুদ পাঠ করো, এটা তোমার জন্য নফল)। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এখানে 'নাফিলা' অর্থ 'অতিরিক্ত'। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। আর তোমার উপরে ফরজ এই অতিরিক্ত এক ওয়াক্ত (তাহাজ্জুদ) সহ মোট ছয় ওয়াক্ত। আমি বলি, অভিমতটি ঠিক নয়। কেননা তাহলে এখানে 'লাকা' না বলে বলা হতো 'আ'লাইকা' (তোমার উপর)। অর্থাৎ হে আমার নবী! এ বিধান অপরিহার্য শুধু আপনার উপর। অনিবার্যতা বুঝাতে উল্লেখ করা হয় 'আ'লাইকা' 'লাকা' নয়। কিন্তু এখানে তো তা করা হয়নি। সুতরাং ছয় ওয়াক্ত ফরজের কথা ধোপে টিকে না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, উদ্ধৃত আয়াতের 'লাকা' অর্থ আপনার জন্য। যদি তাই হয়, তবে বলতে হয় তাহাজ্জুদ নফল কেবল রসুল স. এর জন্য। অন্যের জন্য নয়। অথচ একথাটি সুবিদিত যে, তাহাজ্জুদ নামাজ নফল গোটা উম্মতের জন্য। উদ্ভূত জটিলতা নিরসনার্থে মুজাহিদ, হাসান বসরী ও হজরত আবু উমামার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি বলতে চাই, 'এটা আপনার জন্য নফল' কথাটির অর্থ— তাহাজ্জুদ নফল আপনার মর্যাদার অনুকূলে আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমরূপে এবং আপনার উম্মতের জন্য তাদের কৃত ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় ভুল-ত্রুটির ক্ষতিপূরণরূপে।

হজরত মুগীরা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসেও একথার প্রমাণ রয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামাজ ছিলো রসুল স. এর জন্য নফল। তিনি বলেছেন, রসুল স. গভীর

নিশীথে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। ফলে তাঁর পা ফুলে যেতো। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার অতীত-ভবিষ্যতের সকল অনবধানতাই তো আল্লাহ্‌ মাফ করে দিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও আপনি এতো কষ্ট করেন কেনো? তিনি স. জবাব দিলেন, আমি কি হবো না তাঁর কৃতজ্ঞচিত্ত দাস? উল্লেখ্য, তিনি স. তখন এমন কথা বলেন নি যে, তাহাজ্জুদ আমার উপরে ফরজ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সফরের সময় রসুল স. তাহাজ্জুদ পড়তেন তাঁর বাহনে আরূঢ় আবস্থায়। তখন তাঁর উট যেদিকে মুখ করে চলতো, তিনিও সেদিকে মুখ করে তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর রুকু-সেজদা আদায় করতেন ইশারায়। তবে এভাবে তিনি স. কখনো ফরজ নামাজ পাঠ করেননি। কিন্তু বিতির নামাজ আদায় করেছেন। বোখারী, মুসলিম।

প্রবিধান ঃ তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা, না মোস্তাহাব, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। একদল আলেম বলেন, সাধারণ মুসলমানের জন্য তাহাজ্জুদ মোস্তাহাব, আর রসুল স. এর জন্য ছিলো সারা জীবন ফরজ। কেননা তিনি স. সারাজীবনই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন। আমি বলি, তাহাজ্জুদ নামাজ 'সুনানে হুদা' (পথপ্রদর্শক সুন্নত)। কেননা রসুল স. তাহাজ্জুদ পালন করেছেন নিরবচ্ছিন্নরূপে। তিনি স. যদি এই আমল ওয়াজিব হিসেবে পালন করেন, তাতেও কোনো অসঙ্গতি দেখা দেয় না। কেননা তাঁর বিরতিহীন আমল তার জন্য ওয়াজিব বা নফল যা-ই হোক না কেনো আমাদের জন্য তা সুন্নত। তবে শর্ত এতটুকুই যে, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি, যেমন বাধা দেওয়া হয়েছিলো সওমে বেছালের ক্ষেত্রে।

প্রবিধান ঃ নামাজে কী পরিমাণ ক্বেরাত (কোরআন পাঠ) করতে হবে, সে সম্পর্কেও আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। এক বর্ণনানুসারে ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, যতোটুকু ক্বেরাতকে কোরআন বলে চিহ্নিত করা যায় এবং যতোটুকু নামাজের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়, ততোটুকু ক্বেরাত আবৃত্তি করতে হবে। অর্থাৎ যতোটুকু পাঠ করলে মানুষের উক্তি সদৃশ না হয়, ততোটুকু পাঠ অত্যাবশ্যক। এরূপ অভিমতের প্রেক্ষিতে বলতে হয়, এক আয়াতের কম পাঠ করলেও নামাজ সিদ্ধ হবে। কুদুরী প্রণেতাও এই অভিমতটির পরিপোষক। আর এক বর্ণনানুসারে, ইমাম শ্রেষ্ঠের অভিমত হচ্ছে, এক আয়াতের কম পাঠ করলে নামাজ সিদ্ধ হবে না। ইমাম আহমদও এরকম বলেছেন। হেদায়া প্রণেতাও এটা মেনে নিয়েছেন। অপর আর এক বর্ণনানুসারে ইমামশ্রেষ্ঠ বলেন, হ্রস্ব তিন আয়াত, অথবা তত্তুল্য দীর্ঘ এক আয়াত পাঠ করা নামাজ সিদ্ধ হওয়ার জন্য অনিবার্য। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম। তাঁরা দু'জন আরো বলেন, সুরা ফাতিহার সঙ্গে ছোট তিন আয়াত, অথবা বড় এক আয়াত মিলানো ওয়াজিব। যদি এ ওয়াজিব ভুলক্রমে পরিত্যক্ত হয়, তবে আদায় করে নিতে হবে সংশোধনের সেজদা (সোহ সেজদা)। আর ইচ্ছাকৃতভাবে যে এরকম করবে, সে গোনাহ্‌গার হবে এবং ওই নামাজ আবার আদায় করতে হবে। এরকম করা হবে তার জন্য ওয়াজিব, ফরজ নয়।

উল্লেখ্য, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজই হবে না। আর সুরা ফাতিহার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলানো সুন্নত, ওয়াজিব নয়। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে তার নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করলো না, তার নামাজই হলো না। দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, যে সুরা ফাতিহা পড়লো না, তার নামাজ সিদ্ধ হলো না। দারাকুতনী আরো বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। তবে এই বর্ণনাটিতে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— বর্ণনাকারী তখন বললেন, আমি যদি কোনো ইমামের পিছনে নামাজ পাঠ করি? তিনি বললেন, তখন মনে মনে পড়ে নিয়ো। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পাঠ করলো, অথচ কোরআন-জননী (সুরা ফাতিহা) আবৃত্তি করলো না, তার নামাজ হলো অসম্পূর্ণ। আমি বললাম, হে রসুল সহচর! আমি যে কখনো কখনো ইমামের পিছেনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করি? তিনি বললেন, ওহে পারস্যবাসী! তখন সুরা ফাতিহা পাঠ কোরো মনে মনে। আশহালের পদ্ধতিতে আবু উতবা সূত্রে হাকেমের মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং মোহাম্মদ ইবনে রবী কর্তৃক হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, অন্যান্য সুরা কোরআন জননীর অনুবর্তী। কিন্তু কোরআন-জননী অন্যান্য সুরার অনুবর্তী নহে।

আমি বলি, একদল আলেম 'সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না' কথাটির অর্থ করেছেন, সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ এমতাবস্থায় নামাজ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তা থেকে যায় অসম্পূর্ণ। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, মসজিদের প্রতিবেশীদের পক্ষে অন্য মসজিদে নামাজ হয় না। অর্থাৎ এরকম করলে তার নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। উল্লেখ্য, এরকম ব্যাখ্যা ভুলের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া 'সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না' হাদিসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ 'নামাজ হয় না' অর্থ শরিয়তসমর্থিত নামাজ হয় না। অর্থাৎ নামাজ বিশুদ্ধ হয় না। আর মসজিদের প্রতিবেশীর অন্য মসজিদে নামাজ না হওয়ার অর্থ তার নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। হাদিস দু'টোর বর্ণনারীতি এক নয়। সুরা ফাতিহা সংক্রান্ত হাদিসে যের প্রদানকারী ও যের মিলিতভাবে 'ফাতিহা'কে বিধেয় করেছে বাক্যটির উদ্দেশ্যের। কিন্তু মসজিদে নামাজ পাঠসংক্রান্ত হাদিসে যের প্রদানকারী অব্যয় ও যের প্রদত্ত পদ 'মসজিদ' উভয়ে মিলিতভাবে বাক্যটির উদ্দেশ্য হয়নি। বরং সেখানে বিধেয় হয়েছে লুপ্ত। সুতরাং ব্যাকরণগত ভিন্নতার কারণে অর্থগত ভিন্নতাকে মান্য করতেই হবে। অর্থাৎ এক হাদিসের বক্তব্য— নামাজ বিশুদ্ধ হবে না এবং আর এক হাদিসের উদ্দেশ্য নামাজ পূর্ণ হবে না। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। হাদিসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ্ বলেন, আমি নামাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছি আমার এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে। অর্থাৎ সুরা ফাতিহাকে করেছি দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে, সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবেই না।

ইমাম আবু হানিফা এই হাদিসটিকে তো মান্য করেছেনই, তদুপরি মান্য করেছেন মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত আর একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা এবং এর চেয়েও অধিক ক্বেরাত পাঠ করলো না, তার নামাজই হলো না। একারণেই তিনি বলেছেন, সুরা ফাতিহা এবং তার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলিয়ে পাঠ করা ওয়াজিব।

ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলিতভাবে পাঠ করে না, তার নামাজ নামাজই নয়, সে নামাজ ফরজ হোক, অথবা হোক নফল। ইবনে হুম্মাম—কাতাদা—আবু বকরা— এই সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে সুরা ফাতিহা এবং তার সঙ্গে সাধ্যমতো কিছু পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন না যে, সুরা ফাতিহা নামাজের অঙ্গ এবং সুরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামাজই হবে না; বরং তিনি বলেন, 'কোরআন যতোটুকু তোমাদের জন্য পাঠ করা সহজ ততোটুকু আবৃত্তি করো' এই আয়াত অনুসারে সাধ্যমতো কোরআনের যে কোনো স্থান থেকে কিছু আয়াত পাঠ করা ফরজ। আর তাঁর মতে হাদিসটি দ্বারা কোরআনের কোনো সাধারণ বিধানকে বিশেষায়িত করা যায় না। অর্থাৎ নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ নয়, ওয়াজিব। একারণেই আমরা বলি নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা এবং তার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলানো ওয়াজিব।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, সুরা ফাতিহা পাঠ ও তার সঙ্গে আর একটি সুরা সংযুক্ত করণ দু'টোই নামাজের অঙ্গ— এ দুটো ছাড়া নামাজ সিদ্ধ হবে না। আর এখানকার 'কাজেই কোরআনের যতোটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততোটুকু আবৃত্তি করো' এই আয়াত দ্বারা সুরা ফাতিহা নামাজের অঙ্গ নয়, একথার প্রমাণ গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। কেননা এখানে 'পাঠ করো' অর্থ রাতের নামাজে পাঠ করো। আর 'ফাতাবা আলাইকুম মা তাইয়াস্‌সারা' অর্থ নিশি জাগরণের গুরুভারকে করে দেওয়া হচ্ছে সহজ, যা ছিলো অ-সহজ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মবিশিষ্ট। অর্থাৎ এখন থেকে রাতের নামাজ ও অন্যান্য নামাজে কোরআন পাঠ কোরো ইচ্ছামতো, যতোটুকু করা তোমার জন্য হয় সহজ। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা নামাজের ক্বেরাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা সমীচীন নয়। কেননা এরকম দুর্বল ব্যাখ্যা দ্বারা ওই হাদিসকে পরিত্যাগ করা কী করে সম্ভব, যা সুবিদিত এবং যার উপর আমল করেছেন গোটা উম্মত। রসুল স. কিংবা তাঁর পরের কেহ কি সুরা ফাতিহা ছাড়া কখনো নামাজ পড়েছেন? নিশ্চয় নয়। তাহলে হাদিসটি একক বর্ণিত হলেও গোটা উম্মতের ঐকমত্যসঞ্জাত। তাছাড়া কোরআন মজীদে

নামাজের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হলে হাদিসের শরণাপন্ন হতেই হয়। একথাটিও তো মনে রাখতে হবে যে, এরকম একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা হানাফী মতাবলম্বীগণও দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন। যেমন হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিস দ্বারা তাঁরা নামাজের শেষ বৈঠক যে ফরজ তা প্রমাণ করে থাকেন, যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা যখন এটা বলেছো, বা করেছো, তখন তোমাদের নামাজ পূর্ণ হয়েছে। এখন ইচ্ছা করলে তোমরা উঠে যেতে পারো, অথবা বসেও থাকতে পারো। হানাফীগণ বলেন, এই হাদিসের বর্ণনানুযায়ী নামাজের পূর্ণতা সংশ্লিষ্ট দু'টো বিষয়ের যে কোনো একটির সঙ্গে। কাজেই এদু'টোর যে কোনো একটি ফরজ— বলা, না হয় করা। হাদিসটি একক বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও তো হানাফীগণ এর দ্বারাই শেষ বৈঠক ফরজ হওয়ার প্রমাণ গ্রহণ করেছেন।

তাঁরা সুরা ফাতিহা যে নামাজের অঙ্গ নয়, তা প্রমাণার্থে উপস্থাপন করেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার পর 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তারপর কোরআন থেকে ততোটুকু পাঠ করবে, যতোটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়.... শেষ পর্যন্ত। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় কোরআনের যে কোনো স্থান থেকে কিছু আয়াত পাঠ করার অপরিহার্যতা। আর 'সুরা ফাতিহা বিহনে নামাজ হয় না' এই হাদিস দ্বারা অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় সুরা ফাতিহা পাঠের। তাহলে সুনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টকে যদি একীভূত করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয় সুরা ফাতিহা নামাজের অঙ্গ, সুতরাং তা পাঠ করা ফরজ এবং তৎসহ আরো কিছু আয়াতও এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া ফরজ এবং তা-ও নামাজের অঙ্গ— তাহলে আর সমস্যা থাকে কোথায়? এছাড়াও হজরত আবু হোরায়রা থেকে রেফা ইবনে রাফেয়ের মাধ্যমে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তোমরা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন প্রথমে উচ্চারণ কোরো 'আল্লাহু আকবার'। তারপর পাঠ কোরো কোরআন জননী এবং তারপর পাঠ কোরো যে কোনো স্থান থেকে যতোটুকু ইচ্ছা। দারাকুতনীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— এরপর তাকবীর বোলো, তারপর পাঠ কোরো সুরা ফাতিহা এবং তারপর পাঠ কোরো যতোটুকু পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যতোটুকু তোমাদের জন্য সহজ।

একটি বিধানের জটিলতা নিরসন ঃ মুকতাদীকে (ইমামের অনুসারীকে) সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে আলেমগণের মতপৃথকতা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুকতাদী ও একা নামাজ পাঠকারীর জন্য সুরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুকতাদীর জন্য সুরা

ফাতিহা পাঠ মাকরুহ। ইমাম মালেক বলেন, সশব্দ ক্বেরাতবিশিষ্ট নামাজে মাকরুহ। আর ইমাম আহমদ বলেন, ওয়াজিব-মাকরুহ কোনোটাই নয়, বরং সর্বাবস্থায় তা মোস্তাহাব। তবে তিনি এর সঙ্গে একটি শর্তও জুড়ে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে— ইমাম যখন সশব্দে ক্বেরাত পাঠ করে, তখন মাকরুহ। আর যখন পাঠবিরতি দেয় (শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য থামে) তখন মাকরুহ নয়, মোস্তাহাব। ইমাম মালেক, জুহুরী ও ইবনে মোবারকও এরকম বলেছেন। এরকম আরো বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের এবং আবুল কাসেম ইবনে মোহাম্মদ থেকেও।

ইমামের ক্বেরাত পাঠ করার সময় মুক্তাদীর ক্বেরাত পাঠ নিষিদ্ধ, এই অভিমতটির প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে হজরত জাবের থেকে জাবের জু'ফী সূত্রে ইমাম আহমদ ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ইমামের ক্বেরাত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট। দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটি সুদৃঢ়সূত্রবিশিষ্ট। এরকম আরো বলেছেন সুফিয়ান সওরী ও শো'বা। দারাকুতনী হাদিসটি ভিন্নতর সূত্রে বর্ণনা করেছেন লাইছের মাধ্যমেও। কিন্তু ইবনে আলীয়া বলেছেন, লাইছ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালামের পদ্ধতিতে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, যে নামাজে গ্রন্থজননীকে পাঠ করা হয় না, ওই নামাজ হয় অসম্পূর্ণ, তবে ইমামের পশ্চাতে এরকম করা হলে অসম্পূর্ণ হয় না। ইয়াহ্ইয়াকে দুর্বল বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন দারাকুতনী। আবার ইবনে জাওজী মন্তব্য করেছেন, তাকে অদৃঢ় বর্ণনাকারী বলেছেন, এরকম কাউকেই আমি পাইনি। দারাকুতনী, বায়হাকী এবং ইবনে আদী বলেছেন, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের। কেননা অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারীই একে প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরায় মুসা ইবনে আয়েশা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদের পদ্ধতিতে রসুল স. থেকে বর্ণনা করেছেন। ওই বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন— সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, সুফিয়ান সওরী, আবুল আহ্ওয়াস, শো'বা, ইসরাইল, শরীক ইবনে খলদালানী, জরীর, আবদুল হামীদ, জায়েদাহ্ এবং জুহাইর।

আমরা বলি, প্রায়োন্নতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসও আমাদের নিকট দলিলরূপে গণ্য। ইবনে জাওজী তো বলেছেন, হাদিসটি সর্বোন্নত পর্যায়ের। অধিকন্তু ইমাম আবু হানিফা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ সূত্রে। লক্ষণীয় ইমাম মোহাম্মদ তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন, আমার নিকট হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু হানিফা। তিনি বলেছেন, আমার নিকট হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে আবুল হাসান মুসা ইবনে আবী আয়েশা। তিনি হজরত জাবের থেকে এবং তিনি রসুল স. থেকে। আবার আহমদ ইবনে মুনী' তাঁর 'মসনদ' নামক পুস্তকে এরকম সূত্রসহযোগে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা মুসলিমের শর্তবহ। তিনি বলেছেন, আমি হাদিসটি পেয়েছি ইসহাকুল আযরক

থেকে। তিনি বলেছেন, আমাকে হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন সুফিয়ান ও শুরাইক। তাঁরা হাদিসটি পেয়েছেন মুসা ইবনে আবী আয়েশা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি হজরত জাবের থেকে। আলোচনা যাতে দীর্ঘ না হয়, সেজন্য এ সম্পর্কে আরো অনেক শিথিল সূত্রবিশিষ্ট হাদিস পরিহার করা হলো।

সংশয় ঃ এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'কাজেই কোরআনের যতোটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততোটুকু আবৃত্তি করো' ঘোষণাটি সার্বজনীন। তাহলে ইমাম আবু হানিফার রীতি অনুসারে একক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা বিধানটিকে সীমায়িত করা যেতে পারে কীভাবে?

সমাধান ঃ আয়াতখানি আংশিক সীমায়নসহ সার্বজনীন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু অবস্থায় এসে ইমামের সঙ্গে নামাজে অংশগ্রহণ করে, সে বিধানটির সার্বজনীনতা থেকে মুক্ত। সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। এ ধরনের মুক্তাদী বাদে অন্যান্যদের জন্য বিধানটি সার্বজনীনই।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকল নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা মোস্তাহাব। যেমন রসুল স. বলেছেন, আবৃত্তি যদি সশব্দে করা হয়, তবে তোমরা মুক্তাদীরা কোরআন থেকে কোনো আয়াত পাঠ কোরো না, কেবল গ্রন্থজননী ব্যতীত। দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেছেন, এর সকল বর্ণনাকারীই বলিষ্ঠ। এই হাদিসের দ্বারা সশব্দ ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাজে মুকতাদীদের ক্বেরাত পাঠ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। বিশেষভাবে এখানে সশব্দ ক্বেরাতের কথা উল্লেখ থাকাতে প্রতীয়মান হয় যে, সকল নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা মোস্তাহাব। তবে ব্যতিক্রমের যে ইঙ্গিত এখানে রয়েছে, তার দাবি হচ্ছে, তা পাঠ করতে হবে ইমামের পাঠ-যতির সময়। এরকম করলে এ সম্পর্কিত সকল হাদিসের উপরেই আমল করা হয়ে যায়। আবার এতে করে 'যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন শোনো এবং চুপ থাকো' এ আয়াতের উপরেও আমল করা হয়। মান্যবর সাহাবীগণের অনেকেও মুকতাদীর ক্বেরাত পাঠ না করার প্রবক্তা। নাফে সূত্রে ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে ওমর ইমামের পশ্চাতে নামাজে দাঁড়ালে ক্বেরাত পাঠ করতেন না।

হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত এবং হজরত জাবেরের উক্তি উল্লেখ করে তাহাবী বলেছেন, ইমামের পশ্চাতে কোনো অবস্থায় ক্বেরাত পাঠ করা যাবে না। ইমাম আহমদ তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদকে একবার মুকতাদীর ক্বেরাত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, ওই সময় নিশ্চুপ ও মনোযোগী থেকো। কেননা তোমার ক্বেরাতে নামাজের নিবিষ্টচিত্ততা বিঘ্নিত হতে পারে। তোমার জন্য ইমামের ক্বেরাতই যথেষ্ঠ। মোহাম্মদ ইবনে সা'দ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাজ আদায়কালে ক্বেরাত পড়ে, আমার তো মনে হয়, তার মুখ অগ্নিপূর্ণ। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বলেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যে অগ্নির বদলে এসেছে পাথরের কথা।

উজলান থেকে দাউদ ইবনে কায়েস সূত্রে মোহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে নামাজ আদায় করে, সে যেনো মনে করে তার মুখে রয়েছে পাথর।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, ইমাম সশব্দে ক্বেরাত পাঠ করুক, অথবা পাঠ করুক নিঃশব্দে, সর্বাবস্থায় মুকতাদীদের উচিত ক্বেরাত পাঠ না করা। এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সরব-নীরব উভয় ক্বেরাতবিশিষ্ট নামাজে মুকতাদীদের ক্বেরাত পাঠ মাকরূহ। আবার এমতো অভিমতের পক্ষে রয়েছে এই আয়াতও 'যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং চুপ থাকো'। রসুল স.ও বলেছেন, যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন চুপ থাকো ও মনোযোগের সঙ্গে শোনো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

প্রবিধান ঃ ফরজ-নফল সব রকমের নামাজের প্রতি রাকাতে ক্বেরাত পাঠ করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে বিভিন্ন অভিমত। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, সাধারণভাবে প্রত্যেক রাকাতেই ক্বেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। রুকু-সেজদার মতো ক্বেরাতের বিধানও এক। তবে এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজের এক রাকাতে যদি ক্বেরাত বাদ পড়ে যায়, তবে সোহ সেজদা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু হানিফার মতে বিতির ও নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে ক্বেরাত ওয়াজিব। তবে তা পরিত্যক্ত হলে সংশোধনের সেজদা ওয়াজিব হবে না, যেহেতু তাঁর অভিমত হচ্ছে, নফল নামাজের প্রতি দু'রাকাত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নামাজ। আর ফরজ নামাজ কেবল দুই রাকাতে ক্বেরাত ওয়াজিব, অথচ নীতিগতভাবে ক্বেরাত ওয়াজিব শুধু এক রাকাতে। সূত্রানুসারে অনুজ্ঞাসূচক বিধান পুনঃ পৌনিকতার দাবি রাখে না। আর অনুজ্ঞা হয়েছে 'যতোটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততোটুকু পাঠ করো'। বার বার পাঠের কথা এখানে বলা হয়নি। তবুও আমরা ক্বেরাতকে দু'রাকাতের জন্য বিধিবদ্ধ করার প্রবক্তা। তবে তিন অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের শেষ এক অথবা দুই রাকাত এমতো বিধান থেকে মুক্ত। অর্থাৎ শেষ এক অথবা দুই রাকাতে ক্বেরাত ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে আলোচ্য আয়াত। তিনি বলেন এই আয়াত দ্বারাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ক্বেরাত পাঠের উপযোগিতা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই অভিমতটি মেনে নেওয়া দুষ্কর।

জমহুর আলেমগণের অভিমতের সপক্ষে রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, একবার মসজিদে ঢুকেই এক লোক নামাজ পাঠ করতে শুরু করলো। নামাজ শেষ হলে সে রসুল স.কে সালাম বললো। তিনি স. সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, তোমার নামাজ হয়নি। পুনরায় নামাজ পড়ে নাও। সে একটু দূরে গিয়ে পুনরায় নামাজ পাঠ

করলো। নামাজ শেষে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করতেই তিনি স. বললেন, নামাজ হয়নি। পুনরায় পড়ো। সে পুনরায় নামাজ পড়লো। এরকম ঘটলো তিনবার। শেষে লোকটি বললো, আপনাকে যিনি সত্য বার্তাবাহক করে পাঠিয়েছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি তো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নামাজ জানি না। তিনি স. বললেন, দণ্ডায়মান হয়ে প্রথমে তাকবীর বলো। তারপর কোরআন থেকে পাঠ করো ততোটুকু, যতোটুকু পাঠ করা হয় তোমার জন্য সহজ। এরপর রুকুতে যাও। শান্তভাবে রুকু সম্পন্ন করার পর মস্তক উত্তোলন করে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর সেজদা করো। প্রশান্তির সঙ্গে সেজদা সম্পন্ন করে মস্তক উত্তোলন করে স্থির হয়ে বসো। এভাবে ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করো তোমার নামাজ। রেফা যরকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ।

হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, রসুল স. জোহর ও আসর নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহাসহ আর একটি করে সুরা পাঠ করতেন। আর শেষ দুই রাকাতে পাঠ করতেন কেবল সুরা ফাতিহা। আর তিনি স. ফজরের দুই রাকাতে এবং জোহরের প্রথম দুই রাকাতে পাঠ করতেন দীর্ঘ ক্বেরাত। বর্ণিত হাদিসগুলোকে 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দ্যাখো, সেভাবে নামাজ আদায় কোরো' হাদিসটির সঙ্গে পাঠ করলে এগুলোকে মনে হবে কোরআনের সংক্ষিপ্ত বিধানেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! প্রত্যেক নামাজেই কি কোরআন পাঠ করতে হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনেই সেখানে উপস্থিত জনৈক আনসারী বলে উঠলো, তাহলে তো বিধানটি ওয়াজিব? যদি বলা হয়, বর্ণিত হাদিসগুলো তো একক বর্ণিত। আর একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা তো কোরআনের আয়াতের উপর অতিরিক্ততা করা যায় না, তাহলে ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূল সূত্রাবলী মেনেও বলা যেতে পারে বিধানটি ওই সময়ের, যখন বিশেষ কোনো বিধানের উপর কোরআনের অবস্থান ছিলো অকাট্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমুক্ত। আর এখানকার 'ফাক্বরাউ' (আবৃত্তি করো) বাক্যটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। আর নামাজের জন্য যেরূপ আবৃত্তি করার কথা বলা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত হলেও বিস্তারিত অর্থবহ। তাই এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে, হাদিসগুলো তার বিশ্লেষক।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে'। এখানে 'আ'লিমা' (জানেন) ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্। আর এখানকার 'আন' হচ্ছে হ্রস্ব অব্যয়। আর 'ফাক্বরাউ' (আবৃত্তি করো) কথাটির পুনঃপৌনিকতা বক্তব্যটিকে করেছে অধিকতর গুরুত্ববহ। এমনও বলা যেতে পারে যে, গুরুত্ববহ ঠিক নয়, বরং প্রথম বিধানের সুসংস্কৃত দ্বিতীয় বিধান, যা সহজলভ্যতার দাবিদার। দ্বিতীয় 'পাঠ করো' বাক্যটি প্রথম 'পাঠ করো' বাক্যটির বিবরণ। একারণেই তার উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বিধানের শাখা-প্রশাখা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা অসুস্থ, তারা তো নিশিজাগরণের মতো কষ্টসাধ্য আমল করতে সমর্থ হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেউ কেউ আমার অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে'। একথার অর্থ— কেউ কেউ তো আবার ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যার্জন, হজ এসকল উদ্দেশ্যে অনুগৃহীত হওয়ার আশায় সফর করবে। তখন তো তাদের জন্য রাত জেগে নামাজ পড়া ও কোরআন পাঠ করা হবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এখানে 'ফাদ্বলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ, বাণিজ্য, বিদ্যার্জন, হজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র পথে যারা জেহাদ করবে তাদের জন্যও তো তাহাজ্জুদ পাঠ করা প্রায় অসম্ভব।

ইব্রাহিম সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে অন্য দেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মুসলিম অধ্যুষিত কোনো শহরে আমদানী করে এবং মওজুদ করার আগেই তা বিক্রি করে দেয়, সে ব্যক্তি হয়ে যায় শহীদের পর্যায়ভূত। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতোটুকু সহজসাধ্য, তা আবৃত্তি করো'। একথার অর্থ— সুতরাং রাত জেগে জেগে কোরআন পাঠ করার এই কঠিন আমলটির অত্যাবশ্যকতা তোমাদের উপর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হলো। বিষয়টিকে এখন করে দেওয়া হলো তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমরা এখন থেকে আমলটি করতে পারো ততোটুকু, যতোটুকু হয় তোমাদের জন্য সহজসাধ্য।

সংশয় ঃ এখানে 'মা' (যা, যতোটুকু) অব্যয়টি সাধারণার্থক। তাহলে কি বুঝতে হবে, এখানে যতোটুকু বলে বুঝানো হয়েছে সমুদয় কোরআনকে?

নিরসন ঃ না, বিষয়টি সেরকম নয়। কেননা বক্তব্যের গতিধারা এখানে একথাই বলে দিচ্ছে যে, পাঠ করতে হবে কোরআনের কিয়দংশ, যা পাঠ করা সহজ।

প্রবিধানঃ ক্বেরাতের পরিমাণ কতোখানি হবে তা বিবেচনা করতে হবে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই। মনে রাখতে হবে, শরিয়তে মধ্যাবস্থাই প্রশংসনীয়। সুতরাং মধ্যম পরিমাণ ক্বেরাত পাঠ মোস্তাহাব। মধ্যম ধরনের ক্বেরাত হচ্ছে একশত পঞ্চাশ আয়াত। আর সর্বোতিরিক্ত এক হাজার আয়াত। এভাবে পড়লে কোরআন খতম হয়ে যায় এক সপ্তাহের মধ্যে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন থেকে তোমরা যথাসাধ্য আবৃত্তি কোরো। প্রতিদিন পাঠ কোরো এক শত আয়াত। ইবনে কাছীর বলেছেন, হাদিসটি একেবারে দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করবে, সে কখনো উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত

হবে না। যে একশত আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে গণ্য করবেন ইবাদতকারী বলে। যে পাঠ করবে দুই শত আয়াত, মহাবিচারের দিবসের বাদানুবাদে কোরআন তার উপরে জয়ী হতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচশত আয়াত পাঠ করবে, তাকে দেওয়া হবে পুণ্যের এক বিশাল স্তূপ।

প্রায়োন্নত সূত্রে হাসান বসরী থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর নিকটে উপস্থিত সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, রাতে যে একশত আয়াত তেলাওয়াত করে, তার সাথে কোরআন বিতণ্ডা বাধায় না। যে পাঠ করে দু'শ আয়াত, সারা রাত ধরে তার আমলনামায় পুণ্য লেখা হতে থাকে। আর যে পাঠ করে পাঁচশত থেকে এক হাজার আয়াত, তার জন্য প্রস্তুত করা হয় পুণ্যের একটি বিরাট স্তূপ। মান্যবর সহচরগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! স্তূপ কী? তিনি স. বললেন, বারো হাজার উন্নত স্তর।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, কোরআন আদ্যোপান্ত পাঠ করে শেষ কোরো এক মাসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তো এর কম সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করতে সক্ষম। তিনি স. বললেন, তাহলে পাঠ সমাপ্ত কোরো কুড়ি রাতে। আমি বললাম, এর কমেও তো আমি পারি। তিনি স. বললেন, তাহলে খতম কোরো সাত দিনে, এর কমে নয়। মাতা মহোদয়া আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে ওই ইবাদত প্রিয়, যা করা হয় নিয়মিত, অত্যল্প হলেও। মাতা মহোদয়া আরো বলেছেন, রসুল স. একথাও উল্লেখ করেছেন যে, সামর্থ্যে যতোটুকু কুলায়, ততোটুকু ইবাদত কোরো। কেননা বেশী করতে গেলে তোমরা নিজেরাই হবে বিব্রত, কিন্তু আল্লাহ্ বিব্রত হবেন না (তোমাদেরকে পুণ্যদান করতে)। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত নামাজ দীর্ঘায়িত কোরো, আর পরিত্যাগ কোরো আলস্য আসার সাথে সাথে।

মাতা মহোদয়া আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজে নিদ্রা বা তন্দ্রা এলে নামাজ পাঠে বিরতি দেওয়া উচিত। ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার আগে। কেননা নিদ্রাপ্রভাবিত নামাজে নামাজী কী বলে, তার খবর সে নিজেই জানে না। সে হয় তো ক্ষমাপ্রার্থনা শুরু করলো, অথচ গালি দিলো নিজেকেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ'।

এখানে 'নামাজ' অর্থ ফরজ নামাজ। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ফাক্বরাউ' (আবৃত্তি করো) কথাটির সঙ্গে। 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টি এখানে সমষ্টিবাচক। আর এমতো যোগসূত্রের দাবি হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ

দ্বারা যেনো তাহাজ্জুদকে রহিত না করা হয়। যেমন অনেকে বলেছেন, তাহাজ্জুদ ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। 'জাকাত' অর্থ এখানে ফরজ জাকাত। আর 'করদ্বান হাসানা' অর্থ উত্তম ঋণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— জাকাত ছাড়া অন্যান্য দান-খয়রাত এবং অন্যান্য কল্যাণকর আমল। যেমন অতিথি সেবা, আত্মীয়দের সঙ্গে শিষ্ট আচরণ। আমি বলি, কথাটির অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্যপ্রকাশক কর্মাবলী। আবার এমনও হয়ে থাকতে পারে যে, 'ক্বরদ্বান হাসানা' অর্থ এখানে উত্তম পন্থায় যাকাত আদায় করা। অবশ্য বর্ণিত সকল বিষয়ই কথাটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। 'হাসান' (উত্তম) শব্দটির দ্বারা উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদনকারীদেরকে অনুপ্রাণিত করাই এখানে উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র নিকটে। তা উৎকৃষ্টতর ও পুরস্কার হিসেবে মহত্তর'। এখানে 'খইর' (ভালো যা কিছু) অর্থ শারীরিক ইবাদত, অথবা এমন সৎকর্ম, যা হতে পারে 'অগ্রিম' হিসেবে গণ্য।

'খইরান' (উৎকৃষ্টতর) কথাটি এখানে দ্বিতীয় কর্মপদ হয়েছে 'তাজ্বিদুহু' (তা তোমরা পাবে) এর। আর 'হুয়া' (তা) সর্বনামটি এখানে কৃতিত্বপ্রকাশক ও নির্দিষ্টবাচক। হজরত আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো, যার কাছে অংশীবাদীদের বিত্তসম্পদ অপেক্ষা নিজের বিত্তসম্পদ উত্তম? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, না, এমন কেউই তো আমাদের মধ্যে নেই, যার কাছে অংশীবাদীদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের সম্পদ অধিক পছন্দনীয় নয়। তিনি স. বললেন, বুঝে সুঝে জবাব দাও। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো এতটুকুই বুঝলাম। তিনি স. বললেন, তোমরা সাধারণত অংশীদারদের সম্পদই অধিক পছন্দ করো। সাহাবীগণ বললেন, কীভাবে? তিনি স. বললেন, নিজের সম্পদ সেটাই, যা তোমরা পুণ্যের আশায় অগ্রিম ব্যয় করো। আর অংশীদারদের সম্পদ সেটাই, যা তার মালিক মৃত্যুর পরক্ষণে ত্যাগ করে যায়, বাগবী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করো আল্লাহ্র নিকট; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— পুণ্যকর্মসমূহ যথানিয়মে সম্পাদন করা সত্ত্বেও কখনো সেগুলোর উপরে নির্ভরশীল হয়ে পোড়ো না। এতে করে তোমরা হয়ে যাবে গর্বিত, ফলে পুণ্যকর্মসমূহের প্রতিফল আর তোমরা পাবেই না। তাই দাসত্বের মূল বৈশিষ্ট্য বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং পুণ্যসমূহের যথাসংরক্ষণ নিশ্চিত করণে তোমরা আল্লাহ্ সকাশে মার্জনাপ্রার্থী হও। একথাটিও মনে রেখো যে, পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদনের মনোবৃত্তি, প্রচেষ্টা ও বাস্তবায়ন সকল কিছুই সম্পন্ন হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সামর্থ্যানুসারে। তাঁর-ই দয়ার্দ্র অভিপ্রায়ের আনুকূল্যে। সুতরাং কৃতিত্ববোধের আবিলতা দূর করণার্থে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি বিনয়াবনত ক্ষমাপ্রার্থীদের জন্য ক্ষমাপরবশ ও অতীব দয়ালু, তোমাদের যৎকিঞ্চিত পুণ্যকর্মের বিশাল বিনিময় দাতা।

সূরা মুদ্দাছ্‌ছির

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থধাম মক্কায়। সুরাখানি ২ রুকু এবং ৫৬ আয়াতবিশিষ্ট।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাছীর বলেছেন, একবার আমি আবু সালমা ইবনে হজরত আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো, কোরআনের কোন অংশ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলো? তিনি বললেন, 'আল মুদ্দাছ্‌ছির'। আমি বললাম, লোকে যে বলে, সবার আগে অবতীর্ণ হয়েছে 'ইক্বরা বিসমি'? আবু সালমা বললেন, তুমি যেভাবে প্রশ্ন করছো, সেভাবে আমিও প্রশ্ন করেছিলাম মান্যবর সাহাবী জাবেরকে। তিনি বলেছিলেন, আমি রসুল স.কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, আমি সেবার হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করলাম একটানা একমাস। তারপর সেখান থেকে নেমে বাড়ির পথ ধরলাম। সহসা শুনতে পেলাম অদৃশ্য আওয়াজ। আকাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ভয় পেলাম। বাড়িতে এসেই খাদিজাকে বললাম, শিগগির আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। গায়ে ঢেলে দাও ঠাণ্ডা পানি। এর কিছুক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্‌ছির......ফাহজুর' (আয়াত ১—৫)। ঘটনাটি ঘটেছিলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে। বোখারী, মুসলিম।

কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো 'ইক্বরা বিস্‌মি রব্বিকাল্ লাজী খলাক্ব'। এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করবো 'ইক্বরা বিস্‌মি' সুরার তাফসীরে ইনশাআল্লাহু তায়ালা। এখানে কেবল উল্লেখ করছি এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। তাঁরা বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে ফিতরাতুল ওহীর সময়ের কথা বলতে শুনেছি (ফিতরাতুল ওহী হচ্ছে প্রত্যাদেশরুদ্ধ কাল, প্রথম প্রত্যাদেশের পর বেশ কিছুকাল ধরে যে প্রত্যাদেশ বন্ধ ছিলো— সেই সময়)। তিনি বলেছেন, পথ চলতে চলতে আমি আকাশের দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখলাম সেই ফেরেশতাকে, যিনি ইতোপূর্বে আমার কাছে আগমন করেছিলেন হেরা পর্বতের গুহায়। দেখলাম, তিনি বসে আছেন আকাশ পৃথিবীর মাঝখানে শূন্যে স্থিত একটি আসনে। আমি ভীত হলাম। ফিরে এলাম গৃহে। খাদিজাকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। এর কিছুক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠো, আর সতর্ক করো, এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো, আর অপবিত্রতা পরিহার করে চলো'। এরপর থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে লাগলো ধারাবাহিকভাবে। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সুরা মুদ্দাছ্‌ছির অবতীর্ণ হয়েছে ফিতরাতুল ওহীর পরে। এর আগে হজরত জিবরাইল প্রত্যাদেশ নিয়ে রসুল স. এর কাছে আগমন করেছিলেন হেরা পর্বতের গুহায়।

শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরায়েশ গোত্রপতিদেরকে নিমন্ত্রণ করলো। পানাহারপর্ব শেষ হলো। শুরু হলো আলাপচারিতা। একজন বললো, এ লোক (রসুল স.) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? এক ব্যক্তি জবাব দিলো, আমার তো মনে হয় সে যাদুকর। আর এক ব্যক্তি বলে উঠলো, না না, যাদুকর নয়, গণৎকার। অন্য আর এক ব্যক্তি বললো, না, গণৎকার নয়, কবি। তবে তার কথায় যাদুর প্রভাব রয়েছে। তাদের এসকল কথা পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. মর্মাহত হলেন। মনের দুঃখে বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা মুদ্‌দাছ্‌ছির ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ﴿۲﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ﴿۳﴾

r হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!

r উঠ, আর সতর্ক কর,

r এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ! যে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, সে বস্ত্র পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান। নৈরাশ্য পরিহার করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে তৎপর হন। আপনি তো আমার রসুল। সুতরাং রেসালাতের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব পালনার্থে মানুষকে ওই অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করুন, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। উল্লেখ্য, এখানে কর্মপদের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ কাকে সতর্ক করতে হবে তার কথা এখানে বলা হয়নি। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, এখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, অথবা বিশেষ দলকে সতর্ক করার কথা বলা হয়নি। বরং 'সতর্ক করো' কথাটির দ্বারা এখানে ভীতি প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষকে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি সর্বাবস্থায় ঘোষণা করতে থাকুন আপনার মহিমময় প্রভুপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা। এখানকার 'ফাকাব্‌বির' (শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি পরিণতিপ্রকাশক। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'রব্বাকা' (তোমার প্রভুপালকের) কথাটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। আর এরপরের 'ফাকাব্‌বির' কথাটি এর গুরুত্ববোধক। এভাবে বিধানটিকে করা হয়েছে নিত্যবৃত্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন অহরহ, অবিরাম।

'তাকবীর' অর্থ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। তিনি যে অনশ্বর, অক্ষয়, চিরন্তন, সেকথা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করা। তাঁর একক উপাস্য হওয়ার ধারণার সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে সমকক্ষ বা অংশী স্থির না করার প্রতিজ্ঞা করা। তিনিই যে কেবল পরিপূর্ণ, মহান, সকল গুণবত্তাধিকারী, সে কথা প্রকাশ্যে বলা। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে বলতে হয়, 'তাকবীর' এর উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অত্যাবশ্যক। বরং সকল কাজের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর অন্যথা ক্ষমার অযোগ্য। আর শরিয়ত যদি একে অপরিহার্য না-ও করতো, তবুও সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক ছিলো জ্ঞান-চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে এমতো বিশ্বাসের কাছে উপনীত হওয়া। কিন্তু এভাবে প্রকৃত বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব বলেই শরিয়ত এ সম্পর্কে সকলকে পথপ্রদর্শন করেছে।

বিধান ঃ ফেকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণ এই আয়াতের উপরে ভিত্তি করেই বলেছেন, নামাজের তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর 'আল্লাহু আকবার') ফরজ। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, 'আল্লাহু আকবার' এর বদলে অনুরূপ যে কোনো আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য প্রকাশক শব্দ দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা সম্পন্ন করলেও তা যথেষ্ট হবে। যেমন 'আল্লাহ্‌ আজ্বাল' 'আল্লাহ্‌ আ'জামু' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌' 'আর রহমানু আকবার'। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করতে অক্ষম, কেবল তার জন্যই জায়েয হবে অন্য কোনো সমার্থক বাক্যের মাধ্যমে তাকবীরে তাহরীমা সম্পন্ন করা। অবশ্য তিন জন ইমাম বলেছেন, তাকবীরে তাহরীমা সিদ্ধ হবে 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল্লাহুল কাবীর' দু'টো কথার যে কোনো একটি দ্বারা। আর প্রশংসার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টবাচক 'আলিফ লাম' সংযোজন করা আলংকারিক রীতিতে শুদ্ধ। আর তাঁর প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় 'আকবারু' 'আফ্‌দ্বলু' ও 'কারীমু' শব্দরূপে, যেমন 'কাবীর' 'রহীম' সমপর্যায়ভূত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'আল্লাহু আকবার' ছাড়া অন্য কোনো বাক্যের মাধ্যমে তাকবীরে তাহরীমা সম্পাদন করা হলে, তা হবে অশুদ্ধ, মাকরুহে তাহরীমি। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, কেবল 'আল্লাহু আকবার' বলাই সিদ্ধ। অন্য কোনো কিছু তাকবীরে তাহরীমারূপে গণ্য নয়।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, আলোচ্য আয়াত তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কিত নয়। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নামাজ ফরজ হওয়ার অনেক আগে। সুতরাং এখানে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার কথা আসবে কীভাবে? এর বিপরীতে যদি কেউ যুক্তি দেখায়, নামাজের বাইরে তো তাকবীর পাঠ ওয়াজিব নয়। অথচ কথাটি (রব্বাকা ফা কাব্বির) অনুজ্ঞাজ্ঞাপক, তাহলে আমরা বলবো, নামাজের বাইরেও তাকবীর ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্‌র অখণ্ড এককত্বের স্বীকৃতিদানের নামই তো তাকবীর। সুতরাং এর আবশ্যিকতা তো রয়েছে নামাজের বাইরে ভিতরে সকল সময়। এতো হচ্ছে ইমান, যা ফরজ স্থায়ীভাবে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে নামাজ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক বিষয়, সার্বক্ষণিক কোনো দায়িত্ব

নয়। আর তাকবীর হচ্ছে সুবিস্তৃত, সামগ্রিক ও নিরবচ্ছিন্ন। তবে কীরূপ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাকবীর উচ্চারণ করতে হবে, সে কথা কোরআন মজীদের কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এর রূপায়ণ রয়েছে রসুল স. এর মহিমময় জীবনে। সুবিদিত সূত্রে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি স. তাকবীরে তাহরীমার জন্য উচ্চারণ করতেন আল্লাহু আকবার। অন্য কোনো বাক্যদ্বারা তিনি তাকবীরে তাহরীমা সম্পন্ন করেছেন, এরকম কোনো প্রমাণ তাঁর পবিত্র জীবনে নেই। তাই তাঁর সাহাবীগণের জীবনেও এর বিকল্প কোনোকিছু পরিদৃষ্ট হয়নি। বরং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রেফায়ার হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই লোকের নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়, যে ওজু করে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ না করে 'আল্লাহু আকবার'।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬, ৭

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧

- তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ,
- পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া চল,
- অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
- এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! প্রবৃত্তিকে পরিমল রাখুন যাবতীয় পাপাচারণের প্রভাব থেকে। কাতাদা, মুজাহিদ, ইব্রাহিম, জুহাক, শা'বী, জুহুরী ও ইকরামা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, এই আয়াতের অর্থ— পাপার্জিত পরিচ্ছদ পরিধান কোরো না। তারপর বললেন, তোমরা কি গইলান ইবনে সালমা সাকাফীর কবিতাটি শোনোনি—

ওয়া ইননী বিহামদিল্লাহি লা ছওবু ফাজ্বিরিন
লাবিসতু ওয়ালা মিন উজরাতিন আত্তাক্বনিউ

অর্থ ঃ আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ জন্যে যে, আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো পোশাক পরিনি। শরীরেও জড়াইনি কোনো কলুষিত উত্তরীয়।

হজরত উবাই ইবনে কা'বও এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ স্বীয় কর্মাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করো। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ পুণ্যকর্ম করো। কেননা পুণ্যশীলগণকে বলা হয় পুতঃপবিত্র পরিচ্ছদধারী, আর দুর্বৃত্তদেরকে বলা হয় অপবিত্র পোশাকধারী। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো' অর্থ পবিত্র রাখো নিজের হৃদয় ও আবাসকে।

হাসান বসরী বলেছেন, এর অর্থ চরিত্রবান হও। ইবনে সিরীন ও ইবনে জায়েদ কথাটির অর্থ করেছেন— পরিধেয় বস্ত্রকে পবিত্র রাখো, কেননা অংশীবাদীরা তাদের পরিধেয়কে পবিত্র রাখে না। তাউস অর্থ করেছেন— ভূলুণ্ঠিত হয়, এতো দীর্ঘ পরিধেয় পরিধান কোরো না। পরিধেয় বস্ত্রের এমতো দীর্ঘতা পরিহার করাই পরিচ্ছদ পবিত্র রাখা।

আমি বলি, এখানে যেহেতু স্পষ্ট করে পরিচ্ছদ পবিত্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই বুঝতে হবে, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখা ফরজ। এর সঙ্গে একথাটিও মান্য করতে হয় যে, শরীরও পবিত্র রাখা ফরজ। কেননা পরিধেয় বসন অপেক্ষা শরীর অধিক মূল্যবান। অর্থাৎ পরিধেয় বসনের অপবিত্রতা যেহেতু আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়, সেহেতু শরীরের অপবিত্রতা তাঁর কাছে আরো বেশী অপছন্দের। এভাবে একথাটিও আর অস্পষ্ট থাকে না যে, হৃদয় পবিত্র রাখা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। কেননা হৃদয় তো দেহ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, আল্লাহ্‌র স্মরণ— এসকলকিছুর সম্পর্ক তো মূলতঃ হৃদয়ের (কলবের) সঙ্গেই। তওবাও প্রধানতঃ কলবের ব্যাপার। আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন তওবাকারী ও পবিত্রতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গকেই।

প্রবিধান ঃ ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এই আয়াতের অধ্যাদেশ থেকে প্রমাণ করেন, নামাজীদের বস্ত্র, দেহ ও তাদের নামাজ পাঠের জায়গা পবিত্র হওয়া ফরজ। আমি বলি, এই আয়াতে কেবল এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। কেননা বিশ্বাসীগণকে পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয় সার্বক্ষণিকভাবে। তবে নামাজের সময় এই তিনটি বিষয় বিধানগতভাবেও ফরজ। আর সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মতও। কিন্তু এ কথাটিও ভুলে গেলে চলবে না যে, বিধানগতভাবে শারীরিক ও পরিচ্ছদিক পবিত্রতা যখন প্রমাণিত, তখন স্বভাবগত পবিত্রতা তো আরো অধিক উত্তম রূপে প্রমাণিত। যেমন ওজুর বিধান সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় এরকম নয় যে, তিনি তোমাদের প্রতি সৃষ্টি করবেন কোনো অসংগতি, বরং তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে তোমাদেরকে পবিত্র করা'। হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলকে সম্বোধন করে আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা আমার গৃহটিকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ইতেকাফকারীদের জন্য এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্য'।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন একবার আমি এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম দু'জন কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। একজনকে প্রস্রাবজনিত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত না থাকার কারণে এবং অপরজনকে পরচর্চার জন্য। বোখারী, মুসলিম।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'পৌত্তলিকতা পরিহার করে চলো'। মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, জুহুরী, ইবনে যায়েদ ও আবু সালমা এখানকার 'রুজ্‌যা' শব্দটির অর্থ করেছেন প্রতিমা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার

রসুল! আপনি আপনার উম্মতসহ প্রতিমা পরিহার করে চলুন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রুজ্‌যা' অর্থ পাপ। অর্থাৎ পরিহার করে চলুন পাপ। আপনি তো এরকম করেনই, সুতরাং এমতো নির্দেশ দিন আপনার উম্মতকে।

আবুল আলীয়া ও রবী ইবনে আনাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ অপবিত্রতা ও পাপ। জুহাক বলেছেন, এর মর্মার্থ— শিরিক। কালাবী অর্থ করেছেন— শাস্তি। অর্থাৎ আপনি মানুষকে এমন বিশ্বাস ও কর্ম পরিহার করতে বলুন, যা অনিবার্য করে শাস্তিকে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান কোরো না'। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা আয়াতখানির অনুবাদ এভাবেই করেছেন। কাতাদা অর্থ করেছেন— পার্থিব বিনিময় প্রত্যাশী হয়ে কাউকে কিছু দিয়ো না। দিয়ো কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনের আশায়।

বলা হয়, এই নিষিদ্ধতাটি মাকরুহে তানযিহী, বাধ্যতামূলক নয়। জুহাক ও মুজাহিদ মন্তব্য করেছেন, প্রবিধানটি বাধ্যতামূলক ছিলো কেবল রসুল স. এর বেলায়। জুহাক এমনও বলেছেন, সুদ দুই প্রকার। তার মধ্যে একটি হালাল— যেমন, হাদিয়া, উপঢৌকন, উপহার। হারাম প্রকারটি হচ্ছে প্রচলিত সুদ। হাসান বসরী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— স্বীয় পুণ্যকর্মকে অধিক মনে করে আল্লাহ্‌র কাছে বিনিময় প্রত্যাশী হয়ো না। তিনি আরো বলেছেন, নিজের সুকর্মকে অধিক মনে কোরো না। আল্লাহ্ কর্তৃক যে অনুগ্রহরাশি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার বিপরীতে সেগুলো তো সামান্যই। খসীফ বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, 'মাযীন' অর্থ দুর্বল। মর্মার্থ— অধিক কল্যাণ অন্বেষায় দুর্বল হয়ো না। ইবনে জায়েদ অর্থ করেছেন— নবী-রসুলগণের নিকটে পার্থিব প্রত্যুপকার প্রত্যাশী হয়ো না। কথাটির অর্থ এভাবেও করা হয়েছে যে— অভাবীকে কিছু সম্প্রদান করে তার কাছে প্রত্যুপকার প্রত্যাশা কোরো না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করো'। একথার অর্থ— ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ্‌পাকের পরিতোষ ও পুণ্যের অন্বেষায় তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে ও বিপদাপদে। বাক্যটির মূলরূপ ছিলো এরকম 'ওয়াস্‌বির লিরব্বিকা ফাস্‌বির' (পালনকর্তার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর্তব্য)। এভাবে 'সবর' (ধৈর্য) কথাটির পুনরাবৃত্তি ধৈর্য ধারণের দায়িত্বটিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণের মহিমা প্রকাশার্থে করা হয়েছে 'ধৈর্য' কথাটির এমতো পুনরাবৃত্তি। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— সব ধরনের দুঃখ-ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করো। ইবনে জায়েদ অর্থ করেছেন— দায়িত্ব এসেছে আরব-অনারব সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার। এই জেহাদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। অথবা কথাটির অর্থ হতে পারে— নিয়তির বিধানকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নাও।

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝٩ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١٠

r যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে

r সেই দিন হইবে এক সংকটের দিন—

r যাহা কাফিরদের জন্য সহজ নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে'। এখানকার 'নাক্বর' শব্দটির অর্থ শিঙ্গা। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নাক্বার' থেকে। আর 'নুক্বিরা' অর্থ ফুৎকারধ্বনি। শাব্দিক অর্থ— কোনো বস্তুকে এমনভাবে আঘাত করা, যাতে তাতে তৈরী হয় ছিদ্র। একারণেই পাখির চঞ্চুকে বলে 'মিনক্বার' যেহেতু পাখি তার চঞ্চু দ্বারা ঠুকরে ঠুকরে ছিদ্র করে বৃক্ষশাখা, অথবা বৃক্ষের পত্রপল্লব। সিহাহ্, জাওহারী। আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান তার 'আল উজমা' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, আল্লাহ্পাক মুক্তা অপেক্ষা অধিক শুভ্র পাথর থেকে সৃষ্টি করেছেন শুভ্রোজ্জ্বল শিঙ্গা। তারপর আরশকে বললেন, গ্রহণ করো। আরশ গ্রহণ করলো। শিঙ্গা লটকিয়ে রাখা হলো আরশে। এরপর আল্লাহ্পাক আজ্ঞা করলেন, হও। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হলো ফেরেশতা ইসরাফিল। তাকে বললেন, গ্রহণ করো। ইসরাফিল শিঙ্গাটি গ্রহণ করলেন। সে শিঙ্গাগাত্রে ছিদ্র করা হলো ততোগুলো, যতোগুলো সৃষ্টি আছে তাঁর। আর শিঙ্গাটির মাঝখানে করা হলো আকাশ-পৃথিবীর পরিধিতুল্য একটি সুবিশাল ছিদ্র। ওই ছিদ্রমুখে মুখ দিয়ে ইসরাফিল দণ্ডায়মান হলো। আল্লাহ্পাক বললেন, আমি তোমাকে দায়িত্ব দিলাম যথাসময়ে ত্রাসসঞ্চারক ও জীবন সংহারক ফুৎকার ধ্বনি দানের। এমতো নির্দেশ পেয়ে ইসরাফিল উপস্থিত হলো আরশের পুরোভাগে। এক পা আরশের এলাকায় রেখে অপর পা বাড়িয়ে দিলো আরশের সীমানার বাইরে। এভাবে সে এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ্পাকের আদেশের প্রতীক্ষায়।

সুদৃঢ় সূত্রসহযোগে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, কী করে আমি স্বস্তিলাভ করতে পারি? শিঙ্গাধারী যে নির্দেশের অপেক্ষায় সতত উৎকর্ণ। কখন আসে আদেশ। সাহাবীগণ একথা শুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, আল্লাহ্র রসুলই যদি স্বস্তি না পান, তবে আমরা স্বস্তি পাবো কীভাবে? তিনি স. বললেন, তোমরা পাঠ কোরো 'হাসবুনাল্লহা ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি উত্তম মুখপাত্র)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ ও হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় দোয়াটির সঙ্গে অতিরিক্ত রয়েছে এই কথাটুকু 'আলাল্লহি তাওয়াক্কালনা'।

এখানকার ‘ফা ইজা নুক্বিরা’ বাক্যের ‘ফা’ অব্যয়টি নৈমিত্তিক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদের অপমন্তব্য শুনে ধৈর্য ধারণ করুন। তারা তো শাস্তিগ্রস্ত হবেই। আর আপনার ধৈর্য ধারণ আপনার জন্য বয়ে আনবে সুফল।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘সেদিন হবে এক সংকটের দিন— (৯) যা কাফেরদের জন্য সহজ নয়’ (১০)। একথার অর্থ— সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে, পুনরুত্থানের সময় ও বিচারানুষ্ঠানকালে পড়বে মহাসংকটে। পরিত্রাণের কোনো উপায়ই তখন তাদের থাকবে না। এখানে ‘জালিকা’ (সেই) কথাটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনির প্রতি। এখানে ‘জালিকা’ উদ্দেশ্য এবং ‘ইয়াওমুন আ’সীর’ (সংকটের দিন) বিধেয় এবং এর অনুবর্তী হচ্ছে ‘ইয়াওমাইজিন’। আর ‘গইরু ইয়াসীর’ অর্থ সহজ নয়। কথাটি পূর্বের ‘আ’সীর’ শব্দের গুরুত্ববর্ধক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি সেদিন এতটুকুও লাঘব করা হবে না। অথচ বিশ্বাসীগণের জন্য সেইদিন হবে শুভ ও সহজ।

বাগবী লিখেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো ‘হা মীম তানযীলুন কিতাবি মিনাল্লহি.......ইলাইহিল মাসীর’ তখন রসুল স. তা কুরায়েশ জনতার সামনে পাঠ করে শোনালেন। ওলীদ ইবনে মুগীরাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনে মুগ্ধ হলো। তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গিয়ে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আজ আমি মোহাম্মদের মুখে এমন বাণী শুনলাম, যা কোনো মানুষ অথবা জ্বিনের বাণী নয়। সে বাণী এতো হৃদয়স্পর্শী, যেনো তা ফুল-ফল ভারাবনত কোনো অবাক বৃক্ষ। তার বিজয় সুনিশ্চিত। সে কখনো পরাভব মানতেই পারে না। একথা বলেই সে স্থানত্যাগ করলো। চলে গেলো তার বাড়িতে। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করলো, ওলীদ ধর্মান্তরিত হয়েছে। এখন কুরায়েশরাও সকলে ধর্মান্তরিত হবে। উল্লেখ্য, লোকেরা তাকে উপাধি দিয়েছিলো কুরায়েশ-সৌরভ। আবু জেহেল চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে তার বাড়িতে গিয়ে বললো, হে পিতৃব্য! আমি তোমার দুঃখে দুখী। একথা বলেই সে ওলীদের পাশে বসে পড়লো। ওলীদ বললো, ভ্রাতুস্পুত্র! কী বলতে চাও তুমি? মনে হচ্ছে তুমি খুব মুষড়ে পড়েছো। আবু জেহেল বললো, মুষড়ে পড়বো না কেনো? আপনি একাধারে বয়োপ্রবীণ ও জ্ঞানপ্রবীণ। অথচ লোকেরা আপনার নামে বদনাম ছড়াচ্ছে। আপনি নাকি মোহাম্মদের বাণীকে পরীক্ষা করে সত্য বলে রায় দিয়েছেন। আর উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য আপনি নাকি ইবনে কাছীর ও ইবনে আবু কোহাফার কাছে যাতায়াত করেন। একথা শুনে ওলীদ রেগে গেলো খুব। বললো, কী! তাদের এতো বড় সাহস! কী বলতে চায় তারা। আমি সকলের চেয়ে অধিক বিত্তশালী ও অধিক সন্তানের জনক। আর মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা তো আধপেটা খেয়ে জীবন কাটায়। তাদের আবার উচ্ছিষ্ট থাকবে কোত্থেকে? এরপর সে আবু

জেহেলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো কুরায়েশদের এক সমাবেশে। বললো, তোমরা কী মনে করো? মোহাম্মদ কি উন্মাদ? তোমরা কি তাকে কখনো কোনো অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুনেছো? লোকেরা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো তাকে অবান্তর কথাবার্তা বলতে কখনোই শুনিনি। ওলীদ বললো, তাহলে তোমরা কি ধারণা করো, সে গণৎকার? বলো, তাকে কি তোমরা কোনোদিন গণৎকারের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখেছো? লোকেরা বললো, আল্লাহ্‌ সাক্ষী, আমরা কখনোই তাকে এরকম করতে দেখিনি। ওলীদ বললো, তোমরা তো তাকে কবিও বলো। বলো দেখি, তোমরা কি তাকে কখনো কবিতার আসরে বসতে দেখেছো? লোকেরা বললো, না। ওলীদ বললো, কেউ কেউ তো আবার বলো, সে মিথ্যাবাদী। সে কখনো মিথ্যা কথা বলেছে, এরকম কোনো প্রমাণ কি তোমাদের হাতে আছে? তারা বললো, আল্লাহ্‌র দিব্যি! মিথ্যার সঙ্গে কোনো সংস্রবই তো তার নেই। আমরা তো তাকে 'আলআমীন' বলে ডাকি। এরকম বলার পর লোকেরা প্রশ্ন করে বসলো, তাহলে আপনিই বলুন, সে আসলে কী? ওলীদ চিন্তায় পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকার পর বিদ্রূপের স্বরে বললো, কী আবার? যাদুকর। দেখতে পাও না, তার কথা কেমন যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করে। সে-ই তো আমাদের লোকালয়ে শুরু করেছে অনাসৃষ্টি। বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নির মধ্যে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিবরণটি উপস্থাপন করেছেন হাকেম এবং তিনি বিবরণটিকে প্রত্যয়নও করেছেন। বাগবী লিখেছেন, পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে। বিবরণটি অপর এক সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম।

সূরা মুদ্‌দাছ্‌ছির ঃ আয়াত ১১—২৫

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾
وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ
أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾
إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

q ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি একাকী।
q আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ
q এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ,
q এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ—
q ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরও অধিক দেই।
q না, তাহা হইবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।
q আমি অচিরেই তাহাকে চড়াইব শাস্তির পাহাড়ে।
q সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল।
q অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল!
q আরও অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল!
q সে আবার চাহিয়া দেখিল।
q অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল।
q অতঃপর সে পিছন ফিরিল এবং দম্ভ প্রকাশ করিল।
q এবং ঘোষণা করিল, 'ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নহে,
q 'ইহা তো মানুষেরই কথা।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দুরাচারশ্রেষ্ঠ ওলীদের বিষয়টি আপনি আমার উপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। আমিই তাকে শায়েস্তা করবো। তার স্রষ্টা তো আমিই। সুতরাং তাকে শাস্তিদান আমারই অধিকার ও দায়িত্বভূত।

এখানকার 'ওয়াও' অব্যয়টি সঙ্গতার্থক। অর্থাৎ তাকে ছেড়ে দিন আমার হাতে। যা করবার আমিই করবো। আর 'আমি সৃষ্টি করেছি একাকী' অর্থ অন্য সকলের এবং সকলকিছুর মতো তার সৃষ্টি কর্মেও আমার সঙ্গে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। অথবা— আমি তাকে সৃষ্টি করেছিলাম বিত্তহীন-সন্তানহীনভাবে, তখন তো কেউ ছিলো না তার সঙ্গে। কিংবা আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি দুষ্টমতি সহকারে। 'ওয়াহীদা' অর্থ এখানে— পিতৃপরিচয় শূন্য। অর্থাৎ ওলীদ ছিলো অবৈধ সন্তান। বাগবী লিখেছেন, ওলীদ তার সমাজে পরিচিত ছিলো 'ওয়াহীদা' হিসেবে। আল্লাহ্পাকও উপহাসচ্ছলে এখানে তাকে বলেছেন 'ওয়াহীদা'।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ'। এখানে 'মামদুদ' অর্থ বিপুল, প্রচুর। ওলীদ ছিলো বিপুল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী। কৃষিক্ষেত, পশুচারণ ভূমি, বাণিজ্য— সবকিছুই ছিলো তার। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তার সঙ্গে সব সময় থাকতো এক হাজার দীনার। কাতাদা বলেছেন, চার হাজার দীনার। সুফিয়ান বলেছেন, হাজার হাজার দীনার। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নয় হাজার মিছক্বাল রৌপ্য। মুকাতিল

বলেছেন, তায়েফে ছিলো তার এমন একটি বাগান, যার ফল কখনো নিঃশেষ হতো না। শীত-গ্রীষ্ম কোনো মওসুমেই নয়। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উল্লেখ করে আতা বলেছেন, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকায় চরে বেড়াতো তার বহুসংখ্যক উট, ঘোড়া ও ছাগল। পানির উৎস ও দাস-দাসীও ছিলো তার অনেক।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ'। ওলীদ ছিলো দশজন সন্তানের গর্বিত পিতা। মুকাতিল বলেছেন, তার সন্তান ছিলো সাতজন— ওলীদ ইবনে ওলীদ, খালেদ, আম্মারা, হিশাম, আস, কায়েস ও আবদে শামস্। মক্কাতেই বসবাস করতো তারা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ'। অর্থাৎ পুত্ররা তার কাছেই থাকতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। ফলে ওলীদকে কখনো বাণিজ্যব্যপদেশে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতো না। তার সন্তানদের মধ্যে মুসলমান হয়েছিলেন তিনজন— মান্যবর হিশাম, আম্মারা ও খালেদ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ— (১৪) এর পরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দেই' (১৫)। একথার অর্থ— আমি তাকে দিয়েছি কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব-খ্যাতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি। সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালও দিয়েছি তাকে। 'কুরায়েশ-সৌরভ' বলে লোকেরা তাকে সমীহও করে। তৎসত্ত্বেও সে পরিতৃপ্ত নয়। দিন দিন বেড়েই চলেছে তার লালসার আগুন।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী'। এখানকার 'কাল্লা' হচ্ছে রোধক অব্যয়। অর্থ— না, তা হবে না। অর্থাৎ সে চূড়ান্ত পর্যায়ের অকৃতজ্ঞ। তাই আমি তার লালসার আগুনে আর ইন্ধন যোগাবো না। এখন থেকে শুরু হলো তার পতনের পালা। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই তার অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমশ ক্ষয় হতে থাকে। এমতো ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা দেখেই শেষপর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় তাকে। 'সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী' অর্থ সে আমা কর্তৃক অবতারিত প্রত্যাদেশ ও আমার প্রত্যাদেশবাহককে অবজ্ঞা করেছে। তার এমতো ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য। তার ক্ষয়-ক্ষতি-অপপরিণতি অনিবার্য। সে যা চায়, তা আর কখনোই হবে না।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আমি অচিরেই তাকে চড়াবো শাস্তির পাহাড়ে'। এখানে 'সঊ'দা' অর্থ শাস্তির পাহাড়, সর্বোচ্চ শাস্তি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'সঊ'দা' হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ওলীদকে ওই পাহাড়ে চড়তে বলা হবে। কিন্তু সে যখনই পাহাড়ের গায়ে হাত রাখবে, তখনই অত্যুত্তাপের প্রতিক্রিয়ায় গলে যাবে তার হাত। পা রাখতে গেলেও ঘটবে একই বিপত্তি। বাগবী। হজরত ওমর সূত্রেও

হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বাগবী কর্তৃক। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। হাকেম বর্ণনাটিকে প্রত্যয়নও করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর আর এক বর্ণনায় এসেছে রসুল স. বলেছেন 'সঊ'দ' হচ্ছে নরকাভ্যন্তরের একটি পাহাড়। সত্তর বছর ধরে চেষ্টার পর তার চূড়ায় অতি কষ্টে আরোহণ করতে সমর্থ হবে ওলীদ। এভাবে অনুবর্তন হতেই থাকবে তার ওঠা-নামার। কালাবী বলেছেন 'সঊ'দ' হচ্ছে দোজখের তেলতেলে পিচ্ছিল শৈলশৃঙ্গ। ওলীদকে আরোহণ করতে বলা হবে তার উপর। লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাকে উঠতে বাধ্য করা হবে তার চূড়ায়। তারপর সেখান থেকে ফেলে দেওয়া হবে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পেটাতে পেটাতে। তার প্রতি আরোহণে সময় লাগবে চল্লিশ বৎসর। আর তার এমতো ওঠানামা চলতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত করলো'। একথার অর্থ— সে কোরআন ও কোরআনের বাহকের বিরুদ্ধে যুৎসই কথা বলার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, গবেষণা করে, বুদ্ধি খাটায় এবং এ ব্যাপারে তার অনুচরদেরকে অশুভ সিদ্ধান্ত দেওয়ার অপচেষ্টা থেকেও ক্ষান্ত হয় না। আলোচ্য বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে ওলীদের বিরুদ্ধাচরণ ও তার সুকঠিন শাস্তিভোগ অবধারিত হওয়ার কারণ। অর্থাৎ মাথা খাটিয়ে বিরোধিতার কৌশল আবিষ্কার করা এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অপপরামর্শ দেওয়ার কারণেই তাকে সেদিন উঠতে বাধ্য করা হবে ওই অতিভয়ংকর শাস্তির পাহাড়ে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো (১৯)! আরো অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো' (২০)। এখানকার 'কাইফা' (কেমন করে) কথাটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও বিস্ময়সূচক অব্যয়। ওলীদের অপকর্মের প্রতি এভাবেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে ভর্ৎসনা ও বিস্ময়। আর এখানকার শেষোক্ত বাক্যটি প্রথমোক্তটির গুরুত্ববর্ধক। আর 'ছুম্মা' (অতঃপর) এখানে ক্রিয়ার ক্রম।

এরপরের আয়াত পঞ্চকের (২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫) মর্মার্থ হচ্ছে— ওলীদ বহু চিন্তা-গবেষণা করেও যখন রসুল স.কে প্রতিহত করার যুৎসই কোনো যুক্তি খুঁজে পেলো না, তখন সে রসুল স. এর প্রতি কিছুক্ষণ কেবল রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো, ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করলো, ক্ষোভে বিকৃত করলো মুখের আদল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলো দম্ভভরে এবং বললো, শোনো হে জনতা! এ লোক কিন্তু যাদুকর। তার কথায় রয়েছে যাদুর প্রভাব, যা সে অবশ্যই শিখেছে কারো না কারো কাছ থেকে। আর সে আল্লাহ্‌র কথা বলে যা কিছু তোমাদেরকে পাঠ করে শোনায়, তা আল্লাহ্‌র কথা নয়, তা তার নিজের, অথবা অন্য কোনো মানুষের রচনা।

এখানকার 'নাজারা' (চেয়ে দেখলো) কথাটির যোগ রয়েছে আগের আয়াতের (১৮) 'চিন্তা করলো' ও 'সিদ্ধান্ত করলো' কথাদু'টোর সঙ্গে। অর্থাৎ সে যখন চিন্তা-গবেষণা করেও কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলো না, তখন রসুল স.

এর দিকে চেয়ে রইলো নিষ্ফল আক্রোশে। তারপর ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে ভ্রূ বাঁকিয়ে, মুখ ভেঙচিয়ে দম্ভভরে ফিরিয়ে নিলো মুখ। আর এখানকার 'এটা তো মানুষের কথা' বাক্যটি বেগবান করেছে আগের বাক্যের 'এটা তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়' কথাটিকে। সেকারণেই এ বাক্যটির আগে কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়নি।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

r আমি তাহাকে নিক্ষেপ করিব সাকার-এ,

r তুমি কি জান সাকার কী?

r উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছাড়িয়া দিবে না।

r ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করিবে,

r সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! অবাধ্যশ্রেষ্ঠ ওলীদের কী পরিণতি হবে তা শুনুন। আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারের অভ্যন্তরে। আপনি কি জানেন সাকার কী? সাকার হচ্ছে এমন এক দোজখ, যা কাউকে পেলে তাকে জীবিত যেমন রাখবে না, তেমনি মরতেও দিবে না চিরতরে। তার অধিবাসীরা জ্বলে পুড়ে ভস্ম হওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে, তারপর পুনরায় হবে ভস্মীভূত। এভাবে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে তার জীবন-মরণ শাস্তি। উল্লেখ্য, সকলকিছুর পরাক্রম-প্রতাপ এক সময় স্তিমিত হয়ে আসবে, কিন্তু 'সাকার' এর দাপট কখনো কমবে না। উল্লেখ্য 'তুমি কি জানো সাকার কী' এই প্রশ্নটি এখানে 'সাকার' এর ভয়াবহতার অবস্থাপ্রকাশক।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এটা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে'। একথার অর্থ— সাকারের ভয়াবহ আগুন পুড়িয়ে ফেলবে গায়ের চামড়া। ফলে তার অধিবাসীদের শুভ্র গাত্রত্বক হয়ে যাবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত জায়েদ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সাকার' হবে গাত্রচর্ম দগ্ধকারী। আবার 'লাওওয়াহা' কথাটির অর্থ করা হয়েছে— উদয় হওয়া, প্রকাশ পাওয়া। অর্থাৎ সাকার উদয় হবে মানুষের দৃষ্টিপথে। হাসান ও ইবনে কীসান বলেছেন, যার দৃষ্টিপথে 'সাকার' এর অভ্যুদয় ঘটবে, সে-ই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার অভ্যন্তরে। যেমন বলা হয়েছে পথভ্রষ্টদের সম্মুখে দোজখ প্রকাশিত হবে'।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশ জন প্রহরী'। একথার অর্থ— সাকার নামক নরক পাহারা দিয়ে রাখবে ঊনিশ জন ফেরেশতা। অর্থাৎ প্রধান প্রহরী মালেক ফেরেশতার অধীনে আরো আঠারো জনের তত্ত্বাবধানে থাকবে সাকার নরক। আবুল আওয়ামের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইবনে মোবারক এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই প্রহরীদের স্কন্ধদেশ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে হবে এতো এতো। জায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে ওয়াহাব বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাদের প্রত্যেকের দুই কাঁধের ব্যবধান হবে এক মাসের পথের দূরত্বের সমান। তারা হবে দয়ামায়াশূন্য। তারা ইচ্ছে করলে প্রত্যেকে একাই সত্তর হাজার দোজখীকে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করতে পারবে দোজখের যে কোনো স্থানে।

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও জুহাক সূত্রে বাগবী এবং ইবনে ইসহাক সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু জেহেল অংশীবাদীদেরকে একত্র করে বললো, কী হে, তোমাদের জন্য তোমাদের মা কেঁদে মরুক। তোমরা কি এতোই কাপুরুষ যে, দশ জনে মিলেও একজন প্রহরী ফেরেশতাকে ধরাশায়ী করতে পারবে না? ইবনে কাবশা যে বলছে, দোজখের দৌবারিক মাত্র ঊনিশ জন। আর তোমরা তো শুনি, এক এক জন জবরদস্ত পালোয়ান। আবুল আসওয়াদ ইবনে কেলাদা জামুহী বলে উঠলো, ঊনিশ জনের মধ্যে সতের জনকে তোমরা আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি একাই তাদের জন্য যথেষ্ট। দশ জনকে বেঁধে নিবো পিঠে এবং বাকী সাতজনকে পেটে। ব্যস! জঙ্গখতম। তোমাদের ভাগে তো রইলো মাত্র দু'জন। তার এমতো গর্হিত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। সুদ্দীর বরাত দিয়ে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, যখন 'সাকার তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী' এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন জোড়া বাঘের জনক বুক টান টান করে বললো, মাত্র ঊনিশ জন প্রহরীর ভয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণই তো দেখি না আমি। আরে আমি তো একাই ডান কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারবো তাদের দশ জনকে। বাকী নয় জনকে ফেলে দিবো বাম ঘাড় দিয়ে ধাক্কা মেরে। তার এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত—

সূরা মুদ্‌দাছ্‌ছির ঃ আয়াত ৩১

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ

وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿۳۱﴾

r আমি ফিরিশ্তাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি উহাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি যাহাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফিররা বলিবে, 'আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন'? এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

সাকার এর তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এর কারণ হচ্ছে চারটি— ১. অবিশ্বাসীরা যেনো পরীক্ষায় নিপতিত হয়। এই আয়াতকে অস্বীকার করে হয়ে যায় আরো অধিক শাস্তির উপযোগী। ২. কিতাবীরা (ইহুদী-খৃষ্টানেরা) যাতে বুঝতে পারে কোরআন সত্য, কেননা তাদের কিতাব তওরাত ও ইঞ্জিলেও প্রহরী ফেরেশতাদের এমতো বিবরণ বিদ্যমান। ৩. যারা বিশ্বাসী, তাদের বিশ্বাস যেনো হয় অধিকতর বর্ধিত— ইতোপূর্বে অবতারিত আয়াতগুলোর সঙ্গে সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। ৪. বিশ্বাসী ও কিতাবীরা যেনো সন্দেহবিমুক্ত থাকতে পারে এই ভেবে যে, এ ব্যাপারে তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের সাক্ষ্য এক। এই কারণগুলিই আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আমি ফেরেশতাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফেরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়, এবং বিশ্বাসী ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে'। উল্লেখ্য, এখানকার 'যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে' বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আমি দোজখের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করলাম একারণে, আপনার রেসালত ও আপনার উপরে অবতীর্ণ কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে যেনো কিতাবীরা জানতে পারে এবং হতে পারে আপনার ধর্মমতের উপরে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, কেননা প্রহরী ফেরেশতাদের এমতো সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তওরাত এবং ইঞ্জিলেও।

'ওয়া লা ইয়ারতাবাল্ লাজীনা উতুল কিতাবা ওয়াল মু'মিনূন' অর্থ এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এখানে যোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং) ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক যোজক হিসেবে। আর এখানে সন্দেহ পোষণ না করার অর্থ হচ্ছে, প্রহরী ফেরেশতাদের সংখ্যার উপর সন্দেহ পোষণ না করা।

অর্থাৎ সংখ্যাস্বল্পতার কারণে এরকম মনে না করা যে, মাত্র এই কয়েকজন ফেরেশতা আর কী করতে পারবে। আমরা তো তাদের চেয়ে শক্তিমান। অথবা— মাত্র কয়েকজন ফেরেশতার মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষকে শাস্তি দেওয়া আবার সম্ভব নাকি?

ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, ইহুদীদের একটি দল একবার সাহাবীগণের নিকটে জানতে চাইলো, নরকের তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা কতো। সাহাবীগণ তখন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে। তখন অবতীর্ণ হলো 'সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী'। এই আয়াত শুনে যুগপৎ বৃদ্ধি পেয়েছিলো কিতাবী ও বিশ্বাসীগণের ইমান।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর ফলে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা ও কাফেরেরা বলবে, আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন'? এখানে 'মারাদ্ব' অর্থ অন্তরের ব্যাধি, কপটতা। 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' অর্থ যারা কপট, মুনাফিক। উল্লেখ্য, আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। সেখানে কোনো মুনাফিক ছিলো না। রসুল স.কে মুনাফিকদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো তাঁর হিজরতের পরে, মদীনায়। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য বাক্যটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মনে করেছিলো মাত্র ঊনিশজন প্রহরী দ্বারা দোজখের তত্ত্বাবধান করার সংবাদটি অদ্ভুত কোনো উপমা নয়। এই উপমাটির দ্বারা আল্লাহ্ হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন ভিন্নতর কোনো বিষয়। 'আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন' বলেছিলো তারা সেকারণেই। বলা বাহুল্য, তাদের এমতো প্রশ্ন কৌতূহলনিবারক ছিলো না, ছিলো সন্দেহমূলক, যা আল্লাহ্র বাণীর প্রতি ঘোরতর অস্বীকৃতিই, অন্য কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন'। এখানকার 'কাজালিকা' (এভাবে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সাথে। অর্থাৎ নরকের তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা নির্দেশ করে তিনি কাউকে করেন পথভ্রষ্ট এবং কাউকে পথপ্রাপ্ত। এভাবেই তিনি বাস্তবায়ন করেন তাঁর অভিপ্রায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন'। একথার অর্থ— ফেরেশতা কেবল ঊনিশজন নয়। ফেরেশতা তো আরো অনেক, অজস্র, অসংখ্য— যার পরিসংখ্যান সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই অবগত নয়। আর তাদের শক্তিমত্তা পরিমাপ করবার সামর্থ্যও কারো নেই। উল্লেখ্য, ঊনিশ জন ফেরেশতা সম্পর্কে যখন আবু জেহেল তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছিলো, তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য বাক্য। আতা বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাক যে কতো ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অবহিত নয়। অর্থাৎ

নরকের তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতা তো কেবল উনিশ জন। কিন্তু তাদের সহকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা যে কতো, তা কি কেউ জানে? নিশ্চয় জানে না। কা'বের উদ্ধৃতি দিয়ে হান্নাদ বলেছেন, যাকে দোজখে নিয়ে যেতে বলা হবে, তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হবে এক লক্ষ ফেরেশতা। একারণেই কুরতুবী বলেছেন, ওই উনিশজন ফেরেশতা হচ্ছে ফেরেশতাদের দলপতি। তাদের অধীনস্থ ফেরেশতারা ছাড়া দোজখে আরো যে কতো ফেরেশতা দায়িত্ব পালন করবে, তার সংখ্যা আল্লাহ্পাক ছাড়া আর কেউ জানে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী'। একথার অর্থ— নরক, নরকের ফেরেশতা, অথবা নরকের বিবরণসম্বলিত এই সুরা, এই আয়াত, কিংবা এধরনের অন্যান্য আয়াত ও সুরাগুলি মানুষের জন্য সতর্কবাণী। যারা সতর্ক হবার, তারা এ সকল বিবরণ শুনে সতর্ক হয়ে যায়। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে নরক থেকে আত্মরক্ষা করতে।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

r কখনই না, চন্দ্রের শপথ,

r শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে,

r শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল—

r এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

r মানুষের জন্য সতর্ককারী—

r তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হইতে চাহে কিংবা যে পিছাইয়া পড়িতে চাহে তাহার জন্য।

r প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কাল্লা' (কখনোই না)। কথাটির দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। অর্থাৎ নরকের এমতো বিবরণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সাবধানবাণী নয়। এ সকল কথা তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, কেননা এ গুলোকে তারা বিশ্বাসই করে না, অথচ এগুলো হচ্ছে সার্বজনীন উপদেশমালা।

এরপর বলা হয়েছে— 'চন্দ্রের শপথ (৩২), শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান ঘটে (৩৩), এখানে 'ওয়াল ক্বমার' অর্থ চন্দ্রের শপথ। 'ওয়াল্ লাইলি' অর্থ শপথ

রাত্রিকালের। আর 'ইজ্ আদবারা' অর্থ যখন তার অবসান ঘটে। ক্বারী নাফে, ক্বারী হাসান, ক্বারী হামযা ও ক্বারী ইয়াকুব কথাটিকে পড়তেন 'ইজ আদবারা'। আর অন্য ক্বারীগণ পড়তেন 'ইজ দাবারা'। দু'টো পাঠই সমার্থক। যেমন সমার্থক 'ক্বীলা' ও 'উক্বীলা' শব্দদ্বয় 'দারাবাল লাইল' ও 'আদবারাল লাইল' বাক্য দু'টো সমার্থক। ক্বারী আবু আমর বলেছেন, এগুলো হচ্ছে কুরায়েশদের পাঠরীতি। কুতরব বলেছেন, 'দাবারা' অর্থ 'আক্ববালা' (অগ্রবর্তী হলো)। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন 'দাবারানী ফূলানুন' (অমুক ব্যক্তি আমার পশ্চাতে এসেছে), তেমনই রাত আসে দিনের পশ্চাতে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'শপথ প্রভাতকালের, যখন তা হয় আলোকোজ্জ্বল— (৩৪) এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম' (৩৫)। একথার অর্থ— আদিগন্ত আলোকিত করে আগমন ঘটে যে উষাকালের, তার শপথ করে ঘোষণা করছি, সম্মুখে রয়েছে বৃহত্তর বিপদ সাকার। ওই বিপদে অবশ্যই পতিত হবে অনেক মানুষ। সাকার ছাড়া আরো তো অনেক মুসিবত রয়েছে তাদের জন্য— জাহান্নাম, লাজা, হুতামাহ্, সায়ীর, জাহীম, হাভীয়া। এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমুহের অন্যতম। বাক্যটি এখানে চন্দ্র, রাত্রি এবং প্রভাত কালের শপথের জবাব। অথবা আগের আয়াতের (৩২) 'কাল্লা' ব্যতিক্রমীটি হচ্ছে নিমিত্ত। আর মাঝখানের শপথগুলো উদ্ধৃত বক্তব্যটির গুরুত্ববর্ধনকারী।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য সর্তককারী'। এখানকার 'নাজীর' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ সর্তককারী, ভীতিপ্রদর্শনকারী। অথবা পূর্ববর্তী বাক্যের অবস্থাপ্রকাশক। অথবা পরিস্থিতিগত দিক থেকে 'সাকার' অতীব ভয়াবহ। হাসান বলেছেন 'সাকার'এর চেয়ে অধিক ভয়াবহ কোনোকিছুর বর্ণনা কোরআনে নেই। খলিল বলেছেন, 'নাজীর' 'নাক্বীর' এর মতো ধাতুমূল, সাকার এর অবস্থাপ্রকাশক। কেউ কেউ বলেছেন 'নাজীর' অর্থ ভীতিজনক, ভীতিসংকুল। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রিয়তম বার্তাবাহক! গাত্রোত্থান করুন, মানুষকে পরকালের বিষয়ে ভীতি প্রদশর্ন করুন।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায়, তার জন্য'। একথার অর্থ হে আমার রসুল ! বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয় দলের জন্য আপনি ভীতি প্রর্দশনকারী। অথবা কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— 'তোমাদের মধ্যে যে চায়' (লিমান শাআ মিনকুম) কথাটি এখানে অগ্রবর্তী বিধেয়। আর 'অগ্রসর হতে কিংবা পিছিয়ে পড়তে' (আইঁইয়াতা ক্বদ্দামা আও ইয়াতাআখ্খারা) হচ্ছে পশ্চাদবর্তী উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় আয়াতখানি হবে ভর্ৎসনামূলক ও হুমকিপ্রকাশক।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য আবদ্ধ'। এখানকার 'রহীনাতুন' শব্দটি 'শাতীমাতুন' এর মতোই ধাতুমূল।

শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ্যের বিশেষণার্থে, কর্মপদ অর্থে নয়। কেননা 'ফায়ীল' শব্দরূপে যদি 'রহীন' হতো, তবে তা ব্যবহৃত হতো কর্মপদার্থে। শব্দটি পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে একইরূপে ব্যবহার্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রত্যেকে তার আপন কৃতকর্মের দায়ে চিরদিনের জন্য আটকা পড়ে যাবে জাহান্নামের জিন্দানখানায়। এখানে 'কৃতকর্ম' অর্থ এমন অপকর্ম, যা দোজখকে অবধারিত করে। অর্থাৎ 'কৃতকর্ম' অর্থ এখানে অবিশ্বাস, সত্যপ্রত্যাখ্যান।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১. ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّٰتٖ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ ﴿٤٧﴾

q তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,

q তাহারা থাকিবে উদ্যানে এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

q অপরাধীদের সম্পর্কে,

q 'তোমাদিগকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করিয়াছে?'

q উহারা বলিবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,

q 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করিতাম না,

q 'এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সহিত বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম।

q 'আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করিতাম,

q 'আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নয়'। একথার অর্থ— ডানের দিকের দলটি তখন থাকবে দোজখ থেকে মুক্ত। কেননা তারা বিশ্বাসী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারাই ডানদিকের দল। আসাদ গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি পরলোকবিষয়ক কোনো বাণী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! মহাবিচারের দিবসে আমলনামাসমূহ উপস্থিত করা হবে সকলের সম্মুখে। প্রত্যেকে তা প্রত্যক্ষ করবে। এরপর আমলনামাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হবে আরশের চতুষ্পার্শ্বে। তারপর বিশ্বাসীদের আমলনামা দেওয়া হবে তাদের ডান হাতে। তারা তা পড়বে, আর ভাববে।

মুকাতিল বলেছেন, দক্ষিণ পাশের দল হবে জান্নাতের অধিকারী। অঙ্গীকার দিবসে এরা ছিলো হজরত আদমের ডান পাশে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেছেন, এরা হবে জান্নাতী। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দলে থাকবে তারাই, যাদের হৃদয় পুতঃপবিত্র। এসকল অভিমতের সারকথা হচ্ছে, বিশ্বাসীগণের দলই হবে দক্ষিণ পাশের দল। তারাই থাকবে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্ত। পাপের কারণে তারা সাময়িক শাস্তি ভোগ করলেও অবশেষে প্রবেশ করবে জান্নাতে। অথবা তারা মাফ পাবে শাফায়াতের মাধ্যমে, কিংবা আল্লাহ্পাক এমনিতেই তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এভাবে কেবল আল্লাহ্পাকের অনুকম্পাস্নাত হয়ে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। হাসান বসরী বলেছেন, বিশুদ্ধ-চিত্ত বিশ্বাসীরাই হবে 'আসহাবে ইয়ামিন' (দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দল)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে কাসেম বলেছেন, সেদিন প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে তাদের ভালো-মন্দ কৃতকর্মের জন্য। যারা তাদের পুণ্যকর্মের উপরে নির্ভরশীল তাদেরকে আবদ্ধ রাখা হবে তাদের পুণ্যকর্মের সঙ্গে এবং তাদের হিসাব নেওয়া হবে কঠোরতার সঙ্গে। আর যারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দয়া-অনুকম্পার উপরে নির্ভর করবে, তাদেরকে কোনো জবাবদিহিই করতে হবে না। বিনা হিসাবেই তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। এরাই আসহাবে ইয়ামিন। বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে সকলকেই। তবে কারো কারো হিসাব হবে সহজ। আর আসহাবে ইয়ামিন অর্থ যে কামেল ইমানদার (পরিপূর্ণ বিশ্বাসী) সেকথার কোনো প্রমাণ নেই।

হজরত আলী থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, 'আসহাবে ইয়ামিন' হচ্ছে মুসলমানদের ওই সকল শিশু যারা মৃত্যুবরণ করে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায়। হাকেম বর্ণনা করেছেন অতিরিক্ত এই কথাটুকু— যারা কোনো পুণ্যকর্ম করতে সক্ষম হয়নি, অথবা যারা বাঁধা পড়েনি পুণ্যে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু জুবিয়ান বর্ণনা করেছেন, 'আসহাবে ইয়ামিন' বলা হয় ফেরেশতামণ্ডলীকে।

পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে— (৪০) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪১), তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে' (৪২)? একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মনোরম উদ্যানে বসবাস করবে মহা আনন্দে। আর পরিচিতজনদের মধ্যে যাদেরকে জান্নাতে দেখতে পাবে না, তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে শুরু করবে আলাপচারিতা। তাদের মধ্যে আবার কেউ জাহান্নামীদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেই বসবে, কী কারণে আজ তোমরা পতিত হয়েছো এরকম ভয়ানক শাস্তিতে? 'আন' (হতে, থেকে, সম্পর্কে) অব্যয়টি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। তাই মর্মার্থ হবে— জান্নাতবাসীরা সরাসরি জাহান্নামবাসীদেরকেই জিজ্ঞেস করবে যে, এমতো করুণ পরিণতি তোমাদের কেনো হলো?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না (৪৩)। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না' (৪৪)। একথার অর্থ— তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না, অনাহারক্লিষ্টদেরকে অন্নদান করতাম না।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীদেরকে সেদিন শরিয়তের ফরজ দায়িত্বাবলী সম্পর্কেও জবাবদিহি করতে হবে, যদিও পৃথিবীতে তাদের উপরে শরিয়তের নির্দেশাদি বর্তায় না। বর্তায় না একারণে যে, তারা ইমানদার নয়। কিন্তু তারা যে শরিয়তের দায়িত্বমুক্ত, সে কথাও বলা যায় না। কেননা, ইমান আনা ছিলো তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। সে দায়িত্ব তারা পালন না করাতেই তো শাস্তিগ্রস্ত হবে। তখন শরিয়তের দায়িত্ব লংঘনের কারণেও শাস্তি দেওয়া হবে তাদেরকে। আবার একথাও ঠিক যে, ইমান আনলে ইমানপূর্ব জীবনের ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। তৎসহ মুছে যায় অন্য সকল পাপও। রসুল স. তাই বলেছেন, ইসলাম বিগত জীবনের পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সঙ্গে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম (৪৫)। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম (৪৬), আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত' (৪৭)। একথার অর্থ— যারা পথভ্রষ্ট, তাদের অনুগমন ছিলো আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, অথচ পৃথিবীতে তাদের সঙ্গেই ছিলো আমাদের দহরম মহরম। তারা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতো। আমরাও তাই করতাম। এভাবে একসময় এসে পড়লো মৃত্যু। তওবা করার সময় আমাদের হয়নি। লক্ষণীয়, সর্বশেষে বলা হলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা। এভাবে এখানে একথাই বোঝানো হলো যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানই (কুফরী) সর্ববৃহৎ পাপ। আর এখানকার 'ইয়াক্বীন' শব্দটির মর্মার্থ— মৃত্যু। শাব্দিক অর্থ 'বিশ্বাস' এখানে গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ 'হাত্তা আতানাল ইয়াক্বীন' অর্থ আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ ৪৮

r ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ উহাদের কোন কাজে আসিবে না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পক্ষে যদি সকল সুপারিশকারী একযোগে সুপারিশ করে, তবুও তা গৃহীত হবে না। বক্তব্যটির যোগসূত্র রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ' (৩৮) এবং 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত' (৪৩) কথা দু'টোর সঙ্গে। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের বিপরীতে এই কথাটিও পরিস্ফুট হয় যে, ইমানদারগণ পাপী হলেও তার পক্ষের সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে।

ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উম্মতজননী উম্মে হাবীবা, অথবা উম্মে সালমা বলেছেন, একবার আমরা উপস্থিত হলাম আমাদের সপত্নী আয়েশার ঘরে। একটু পরে সেখানে রসুল স. উপস্থিত হলেন এবং বললেন, কারো যদি তিন সন্তান শিশুকালে মৃত্যুবরণ করে, তবে মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে উপনীত করানো হবে জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে। বলা হবে, প্রবেশ করো। তারা বলবে, আগে আমাদের পিতা-মাতাকে প্রবেশ করানো হোক। দু'তিন বার এরকম বলার পর শেষে নির্দেশ দেওয়া হবে, ঠিক আছে, তোমরাও প্রবেশ করো, তোমাদের পিতা-মাতাও প্রবেশ করুক। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এরকম সুপারিশ পাবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, প্রতিফল দিবসে সুপারিশ করবেন নবী-রসুলগণ, ফেরেশতামণ্ডলী, পুণ্যবান, শহীদ ও ইমানদারগণ। শেষে চার প্রকারের লোক ছাড়া আর কেউই থাকবে না দোজখের মধ্যে। ওই চার প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে এবং এই সুরার ৪৩-৪৬ আয়াতে। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, নিঃসন্দেহে শাফায়াত মঙ্গল সাধন করবে মানবজাতির। তবে তাদের জন্য শাফায়াত একেবারেই কার্যকর হবে না, যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত ইবনে হোসাইনের বক্তব্যে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ ও জাকাত পরিত্যাগকারী এবং বিভ্রান্তিমূলক আলোচনাকারী যদি বিশ্বাসীও হয়, তবুও তাদের জন্য সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। আর তাঁরা এমতো মন্তব্য করেছেন এই আয়াতের ভিত্তিতেই। তাঁরা বলেন, এখানকার 'ফামা' কথাটির 'ফা' নৈমিত্তিক। তাই বুঝতে হবে, নামাজ-জাকাত পরিত্যাগ ও বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় লিপ্ত থাকা এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করা— এই চারটি দোষের যে কোনো একটিও হতে পারে সুপারিশ ফলপ্রসূ না হওয়ার নিমিত্ত। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, সমষ্টিগতভাবে যে এই দোষগুলোর অধিকারী, সুপারিশ কার্যকর হবে না কেবল তার বেলায়। আর এর মধ্যে প্রতিফল দিবস অস্বীকার দোষটি থাকতেই হবে। সুতরাং এই দোষটি বাদে অন্যগুলোর যে কোনো একটি, দু'টি বা তিনটি শাফায়াত কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় নয়।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ সিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। তাই তখন দেখা যাবে, যে পাপী বিশ্বাসীর জন্য দোজখ নির্ধারিত হয়েছে, সে-ও সুপারিশের বদৌলতে দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আবার অনেককে সুপারিশের কারণে মুক্ত করে আনা হবে দোজখাভ্যন্তর থেকেও। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলা, খারেজী ইত্যাদি সম্প্রদায় সুপারিশ করার বিষয়টিকে মানে না। অথচ সুপারিশের বিষয়টি সুবিদিত হাদিসসমূহের দ্বারা সুপ্রমাণিত।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। অবশেষে আমার দয়াময় প্রভুপালনকর্তা

আমাকে বলবেন, ‘তুমি খুশী হয়েছো তো? আমি বলবো, হ্যাঁ। হজরত আনাস থেকে বায্যার, তিবরানী ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি সুপারিশ করবো পাপিষ্ঠ উম্মতের জন্যই। হজরত জাবের থেকে তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আহমদ ও আবু দাউদ এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে মাজা, তিবরানী; হজরত ইবনে ওমর থেকে খতিব বাগদাদী এবং হজরত কা’ব ইবনে উজারাহ্ থেকেও খতিব বাগদাদী।

হজরত ওসমান থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে এক জায়গায় জড়ো করা হবে আলেম ও আবেদকে। আবেদকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে চলে যাও। আর আলেমকে বলা হবে, তুমি থামো। তোমাকে তো সুপারিশ করতে হবে। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ওসমান গণি থেকে ইসপাহানী, তিরমিজি ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আমার উম্মতের দুষ্কৃতিকারীরাও পুণ্যবান। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কীভাবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাক আমার সুপারিশে তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর পুণ্যবানেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র অনুকম্পায়। হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নত সূত্রে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন বিদ্বানকে বলা হবে, তোমার ছাত্রদের জন্য সুপারিশ করো, যদিও তাদের সংখ্যা হয় আকাশের নক্ষত্রতুল্য অসংখ্য। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তরজন সদস্যের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে জনগণ সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে। এমন সময় একজন জান্নাতী গমন করবে একজন দোজখীর সামনে দিয়ে। দোজখী তাকে দেখে বলবে, তোমার কি মনে নেই, একদিন তুমি আমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে শরবত পান করিয়েছিলাম। একথা শুনে জান্নাতী ব্যক্তি ওই দোজখীর জন্য সুপারিশ করবে। তার সুপারিশে তখন দোজখী ব্যক্তিটি পরিত্রাণ পাবে। পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকটি আবার গমন করবে আর একজন দোজখীর সামনে দিয়ে। সে বলবে, তোমার কি স্মরণ আছে, একদিন আমি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিয়েছিলাম সুপেয় পানীয় দ্বারা। সে তখন ওই লোকটির জন্য সুপারিশ করবে। সে-ও পাবে পরিত্রাণ। তারপর সে যখন আর এক দোজখীর সামনে দিয়ে যাবে তখন ওই দোজখী বলবে, খেয়াল করতে চেষ্টা করো দেখি ওই দিনের কথা, যেদিন তুমি এক কাজের জন্য কোথাও যাচ্ছিলে। আমি উপযাজক হয়ে তোমার ওই কাজটি করে দিয়েছিলাম। একথা শুনে ওই পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকটি তার জন্যও সুপারিশ করবে। ফলে সে-ও নিষ্কৃতি পাবে দোজখ থেকে।

মাসআলা ঃ হজরত আনাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই লোকের ভাগ্যে শাফায়াত জুটবে না, যে শাফায়াতকে

অস্বীকার করে এবং ওই লোক হাউজে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না, যে অবিশ্বাস করে হাউজে কাওছারকে। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম এবং আরো দশজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আমার শাফায়াত সত্য, যে একথা বিশ্বাস করবে না, সে আমার শাফায়াত পাবে না। ইবনে মুনী'।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য আমার শাফায়াত অবারিত। কেবল তাদের জন্য নয়, যারা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সম্প্রদায় হবে আমার শাফায়াতবঞ্চিত— মরজিয়া ও ক্বদরিয়া (পথভ্রষ্ট মরজিয়ারা বলে, ইমান ঠিক থাকলে গোনাহ্‌তে কোনো ক্ষতি হয় না, ফরজ পরিত্যক্ত হলেও এবং হারামে লিপ্ত হলেও। আর ক্বদরিয়া বা মুতাজিলারা বলে, বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা। উভয় সম্প্রদায়ই শাফায়াতে অবিশ্বাসী)।

মাসআলা ঃ বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, কতিপয় পাপ শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করে। সুপরিণত সূত্রে হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আরববাসীগণের সঙ্গে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে দু'ধরনের লোক হবে আমার শাফায়াতবঞ্চিত— অত্যাচারী, জনগণের অধিকার খর্বকারী এবং অধিক দুনিয়াদার, ধর্মবিচ্যুত।

হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে চলো। প্রতিফল দিবসে আমি কলহপ্রিয়দের পক্ষে সুপারিশ করবো না।

সূরা মুদ্‌দাছ্‌ছির ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝٤٩ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝٥٠ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝٥١ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝٥٢ كَلَّا ۭ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝٥٣ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝٥٤ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝٥٥ وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦

q উহাদের কী হইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ হইতে?
q উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ—
q যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর।
q বস্তুত উহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক।
q না, ইহা হইবার নহে; বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।
q না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশবাণী।
q অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।
q আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখানকারীরা এরকম কেনো, কোরআনের হৃদয়স্পর্শী বাণী তাদেরকে শোনানো হয়, অথচ তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এ অনন্য মহাকল্যাণ থেকে? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা এমন করছে কেনো? আর এখানকার 'তাজকিরাহ' (উপদেশ) অর্থ কোরআন।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'কা আন্‌না হুম হুমুরুম মুসতানফিরাহ্' (তারা যেনো ভীত-পলায়নপর গর্দভ)। এখানকার 'মুসতানফিরাহ্' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নাফারা' 'ইসতানফারাহ্' থেকে। শব্দরূপটি কর্তৃপদীয়। এর অর্থ ভীত-পলায়নপর।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'ফাররাত মিন ক্বাসওয়ারাত' (যা সিংহের সম্মুখ থেকে পলায়নপর)। এখানকার 'ক্বাসওয়ারাহ্' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ক্বাসওয়ারাতুন' শব্দমূল থেকে এবং গঠিত হয়েছে ক্বাসারা থেকে। এর অর্থ দুর্যোগ, দুর্বিপাক। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এখানে 'ক্বাসওয়ারাহ্' অর্থ সিংহ। আতা এবং কালাবীও এরকম বলেছেন। মুজাহিদ, কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, এর অর্থ ধনুর্ধর, শিকারী। শব্দটির একবচন হয় না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতা এরকম বলেছেন। জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, স্থূলকায় বলশালী ব্যক্তিকে আরববাসীগণ বলেন 'ক্বাসওয়ারাহ্'। আবুল মুতাওয়াককিল বলেছেন, 'ক্বাসওয়ারাহ' বলে হৈ হল্লোড়কে।

ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিকারীর জালকে বলে 'ক্বাসওয়ারাহ্'। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ শিকারী।

সুদ্দী সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মক্কার মুশরিকেরা একবার বললো, মোহাম্মদ যদি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকে, তবে তার লিখিত একটি পত্রিকা যেনো আমরা কাল ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বালিশের নিচে পাই, যাতে লেখা থাকবে নরক থেকে সুরক্ষিত থাকার নিয়মাবলী। তাদের এমতো অপমন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতসমূহ।

প্রথমে (৫২) বলা হয়— 'বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক'। এখানে 'বাল' অর্থ বস্তুত। শব্দটি এখানে বসানো হয়েছে প্রারম্ভিকাস্বরূপ। কিন্তু এর দ্বারা প্রসঙ্গান্তর ঘটানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, মক্কার অবিশ্বাসীরা বলেছিলো, মোহাম্মদ! সত্যিই যদি তুমি রসুল হয়ে থাকো, তাহলে এমন একটা ব্যবস্থা করো, যাতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা যেনো প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ বালিশের নিচে দেখতে পাই একটি পরিপত্র, যাতে একথা লেখা থাকবে যে, সত্যি সত্যিই তুমি একজন প্রত্যাদেশবাহী।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'না, এটা হতে পারে না'। বরং তারা আখেরাতের ভয় পোষণ করে না। এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, কক্ষণো নয়। কস্মিনকালেও এটা হতে পারে না। কেননা কোরআন হচ্ছে সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা। এমতো আলোর প্রকাশের পর অন্য অলৌকিকত্ব নিষ্প্রয়োজন। আর এখানেও 'বাল' (বরং) অব্যয়টি সূচনার্থক। কিন্তু এর দ্বারা এখানেও প্রসঙ্গান্তর ঘটানো হয়নি। অর্থাৎ এখানেও মূল বক্তব্য হচ্ছে, কর্মফল দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাস মাত্রই নেই। তাই অবতারণা করে এরকম অবান্তর কথাবার্তার। পলায়ন করে 'উপদেশ' (কোরআন) থেকে, যেনো সিংহের সম্মুখ থেকে পলায়নপর কোনো আতংকিত গর্দভ। অথবা 'বাল' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের অযথার্থ দাবি যদি পূরণ করা হয়ও, তবুও তারা ইমান আনবে না। কেননা তারা বিষয়টিকে অস্বীকার করছে জেনে, শুনে, বুঝে। আসল কথা হচ্ছে, পরকালের ভীতি তাদের একেবারেই নেই। উল্লেখ্য, পরকালভীতি হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অনন্য উপহার, যা পায় কেবল বিশ্বাসীরা। অবিশ্বাসীরা এমতো উপহার থেকে বঞ্চিত বলেই শতসহস্র সুস্পষ্ট নিদর্শনও তাদের কোনো উপকারে আসে না।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'কাল্লা ইন্নাহু তাজকিরাহ্' (না, তা হয় না, কোরআন সকলের জন্যই উপদেশবাণী)'। এখানেও 'কাল্লা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। অথবা সতর্ককরণার্থে, নির্বাক করে দেওয়ার জন্য, ধমক প্রদানের উদ্দেশ্যে। এখানকার এই 'কাল্লা' পূর্বোক্ত 'কাল্লা'র গুরুত্ব বর্ধনকারী। আর 'কোরআন সকলের জন্য উপদেশবাণী' অর্থ কোরআন হচ্ছে সকলের জন্য সতত-উন্মুক্ত উপদেশ। এতে রয়েছে আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ, কোমলতা-কঠোরতা, দয়া-নির্মমতা, স্বস্তি-শাস্তির বিশদ বিবরণ।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অতএব যার ইচ্ছা সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক'। একথার অর্থ— যে ইচ্ছা সে, খোলা মনে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এই কোরআন থেকে। আর যে এরকম করবে না, তার শাস্তিভোগ অনিবার্য।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করবার অধিকারী'। একথার অর্থ— কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়ের আনুকূল্য না পেলে কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং ভয় যদি করতে হয়, তবে ভয় করতে হবে তাঁকেই। ক্ষমাপ্রার্থীও হতে হবে কেবল তাঁরই সকাশে। কেননা ক্ষমা করার অধিকার ও যোগ্যতাও সংরক্ষণ করেন কেবল তিনিই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও সুপ্রমাণিত হয় যে, মানুষের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই আল্লাহ্র সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিজড়িত।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী' কথাটির অর্থ তোমাদের প্রভুপালক বলেন আমি এক, অংশীহীন, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো, বিরত থাকো অংশীবাদিতা থেকে। যে এরকম করবে তাকে আমি মার্জনা করবো। কেননা মার্জনা করার অধিকার সংরক্ষণ করি কেবল আমিই। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম।

সূরা ক্বিয়ামাহ্

মহাতীর্থ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এতে রয়েছে ২ রুকু এবং ৪০ আয়াত।

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

لَاۤ اُقۡسِمُ بِیَوۡمِ الۡقِیٰمَةِ ۙ﴿۱﴾ وَ لَاۤ اُقۡسِمُ بِالنَّفۡسِ اللَّوَّامَةِ ؕ﴿۲﴾ اَیَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَلَّنۡ نَّجۡمَعَ عِظَامَهٗ ؕ﴿۳﴾ بَلٰی قٰدِرِیۡنَ عَلٰۤی اَنۡ نُّسَوِّیَ بَنَانَهٗ ﴿۴﴾ بَلۡ یُرِیۡدُ الۡاِنۡسَانُ لِیَفۡجُرَ اَمَامَهٗ ۚ﴿۵﴾

- আমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের,
- আরও শপথ করিতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।
- মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?
- বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।
- তবুও মানুষ তাহার ভবিষ্যতেও পাপাচার করিতে চাহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'লা উক্বসিমু বিইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ' (আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের)। ক্বারী কানাবেল ও ক্বারী বযী'র নিকটে বাক্যটি হবে 'লা উক্বসিমু' (অবশ্যই আমি শপথ করি)। 'লা' অব্যয়টি এখানে বেগসঞ্চারক। আর 'উক্বসিমু' হচ্ছে শপথসূচক ক্রিয়া। তবে সর্বজনীন পাঠ হচ্ছে 'লাম-আলিফ' সহযোগে 'লা উক্বসিমু'। অর্থ হবে পূর্ববৎ এবং বুঝতে হবে 'লা' (না) সংযোজিত হয়েছে এখানে অতিরিক্তরূপে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়া লা উক্বসিমু বিন্‌নাফসিল লাওওয়ামা' (আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার)। এখানে 'লা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত, অর্থ গ্রহণ করতে হবে কেবল শপথের। আর শপথের জবাব, অর্থাৎ শপথ করে যা বলা হবে, তা এখানে উহ্য। তার ইঙ্গিত হচ্ছে— মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থান সুনিশ্চিত। সুনিশ্চিত হিসাব, পুণ্য-পাপের ওজন, পুরস্কার-তিরস্কার।

আবু বকর ইবনে আয়াশ বলেছেন, শপথকে গুরুত্ববহ্ করবার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লা'। বায়যাবী লিখেছেন, শপথকে গুরুত্ববহ করবার জন্য 'লা' তাকিদ আরবী ভাষায় অহরহ ব্যবহৃত হয়। আমি বলি, শপথ ক্রিয়ার না-সূচক 'লাম' ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য, সুস্পষ্ট ও ধ্রুব করে তোলা। শপথ করার পর বাক্যমধ্যে গুরুত্ববহ পৃথক অব্যয় ব্যবহারের আর প্রয়োজন থাকে না। বিবেকসম্পন্ন লোকেরা ভালো করেই জানে যে, পৃথিবীতে বাস করে এমন কিছুসংখ্যক লোক, যারা অকৃতজ্ঞ, অত্যাচারী, স্বজন-বন্ধন ছিন্নকারী এবং বিবিধ অপকর্মমগ্ন। অথচ তারা জীবন যাপন করে নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। আবার কিছুসংখ্যক লোক ঠিক এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি কৃতজ্ঞ, বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত ও পরিতুষ্ট, ন্যায়বিচারপ্রেমিক। অথচ তাদেরকে ভোগ করতে হয় দুঃখ-ক্লেশ, বিপদাপদ। বিষয়টি অবশ্যই বিসদৃশ ও অন্যায়। সুতরাং বুঝতে হবে, এর প্রতিকারের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। কৃতকর্মসমূহের চূড়ান্ত প্রতিফল প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়াই সমীচীন এবং তা হবেও। হবে পরবর্তী পৃথিবীতে, মহাবিচারের দিবসে। অন্যথায় জয় হবে অন্যায়ের, আর ন্যায়-বিচার হবে মূল্যহীন।

'বি নাফসিল লাওওয়ামাহ্' অর্থ তিরস্কারকারী আত্মার। এখানকার 'আলিফ লাম' অব্যয়টি জাতিবাচক। অর্থাৎ সকল নফস (প্রবৃত্তি)ই এর অর্ন্তভূত। ফাররা বলেছেন, পুণ্যবান, পাপী সকলেই মহাবিচারের দিবসে ধিক্কার দিতে থাকবে নিজেদেরকে। পুণ্যবানেরা এই ভেবে আক্ষেপ করবে যে, আরো বেশী পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলাম না কেনো! আর পাপীরা ভাববে, হায় পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সুযোগ আমরা হেলায় হারালাম কেনো! এভাবে সকলেই তখন নিজেদেরকে তিরস্কার করতে থাকবে। তাই এখানে শপথ করা হয়েছে সকল প্রবৃত্তির। বলা হয়েছে— আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

হাসান বসরী বলেছেন, 'নাফসিল লাওয়ামা' (তিরস্কারকারী আত্মা) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসীগণের নফসকে। কেননা তারা অহরহ ভর্ৎসনা করে তাদের প্রবৃত্তিকে। কিন্তু পাপিষ্ঠরা এমতো আত্মসমালোচনায় লিপ্ত হয়ই না। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'তিরস্কারকারী আত্মা' বলে বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। কেননা প্রতিফল দিবসে তারাই তাদের নফসকে তিরস্কার করবে। অথবা কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে ওই সকল লোকের কথা, যারা ছিলো আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞার প্রতি অননুগত, অপরিতুষ্ট ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশকারী।

সুফী-আউলিয়াগণ বলেন, প্রবৃত্তি সাধারণত অসৎকর্মের প্রতি প্ররোচিত করতেই অভ্যস্ত। যারা আল্লাহ্র জিকির করে, তারাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করে প্রবৃত্তিকে পরাভূত করবার সামর্থ্য। আর তখন প্রবৃত্তির অসৎস্বভাবের পরিচয় পেয়ে সে হয়ে পড়ে চমকিত ও চিন্তিত। তিরস্কার করতে থাকে নিজেকে। যে নফস এই স্তরে উপনীত হয়, সেই নফসকেই বলে 'নফসে লাওওয়ামা'। আল্লাহ্র অনুগ্রহে এরপর যখন সে আল্লাহ্র প্রেমে পূর্ণমগ্ন (ফানা) হয়, তারপর হয় আল্লাহ্র অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল (বাকা) তখন তার নফস হয় 'নফসে মুত্বমাইন্না' (প্রশান্ত প্রবৃত্তি, পূর্ণানুগত আত্মা)।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও শাসনমূলক। আর এখানে 'আল-ইনসান' (মানুষ) বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সমগ্র মানব জাতিকে। অথবা বলা যেতে পারে 'আল' এখানে সীমিতার্থক। অর্থাৎ 'মানুষ' অর্থ এখানে বিশেষ কোনো ব্যক্তি। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আদী ইবনে রবীয়া সম্পর্কে। সে ছিলো জোহরা গোত্রের মিত্র। আর জামাতা ছিলো আখনাস ইবনে শুরাইক ছাক্বাফীর। রসুল স. তাদের সম্পর্কেই দোয়া করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে অসৎপ্রতিবেশী থেকে হেফাজত করো।

একদিন আদী রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! বলো, পুনরুত্থান কবে হবে? আর তখন পরিস্থিতিই বা হবে কীরকম? রসুল স. সবিস্তারে বিবরণ দিলেন পুনরুত্থান দিবসের। সে বললো, আমি পুনরুত্থান দিবস স্বচক্ষে দেখলেও তা বিশ্বাস করবো না। তোমাকেও স্বীকার করবো না সত্যবাদী বলে। কী বিস্ময়! মাটিতে মিশে যাওয়া হাড়গুলোকে আবার আল্লাহ্ জোড়া লাগাবেন কীভাবে? তার এরকম গর্হিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এর মর্মার্থ হচ্ছে— পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরা কী ভেবেছে? আমিই সকলের ও সকল কিছুর একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা। আমিই তো প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তা হলে দ্বিতীয়বার কী তা পারবো না? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা তো দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে—'বস্তুত আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম'। এখানে 'বালা' অর্থ বস্তুত, কেনো নয়, অবশ্যই। অর্থাৎ অবশ্যই আমি মৃতের অস্থিগুলি একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবিত করবো। আর এখানকার 'ক্বাদিরীন' হচ্ছে একটি উহ্য কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে অত্যধিক শক্তিমত্তার। অর্থাৎ আমি তার অস্থিগুলোকে সংযোজিত তো করবোই, তদুপরি তার সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গকে করবো যথাযথরূপে বিন্যস্ত। যেমন বলা হয় 'আমি তোমাকে জব্দ তো করবোই, জব্দ করবো তোমার গোষ্ঠীকেও'। আর 'বানান' অর্থ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অঙ্গুলীর অগ্রভাগ তো নিতান্তই হালকা ও সূক্ষ্ম, তৎসত্ত্বেও সেগুলোকে আমি সৃষ্টি করবো অবিকল আগের মতো করে। আর এরকম করা আমার জন্য সহজ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তবুও মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়'। এখানে 'বাল' (তবুও) অব্যয়টি যোজক, যোজিত হয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ কি মনে করে' কথাটির সঙ্গে। বাক্যটি এখানে প্রশ্নবোধকও হতে পারে, আবার হতে পারে তাকিদপ্রকাশকও। কারণ ৩ সংখ্যক আয়াতের প্রশ্ন ও প্রশ্নকারী থেকে প্রসঙ্গান্তর ঘটানোই এখানে উদ্দেশ্য। এভাবে এখানে বোঝানো হয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ' এবং এখানকার 'মানুষ' পৃথক ব্যক্তি।

মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইকরামা ও সুদ্দী আয়াতখানিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেকে জানে যে, আল্লাহ্পাক তার অস্থিসমূহ পুনঃ সংযোজন করতে সক্ষম। কিন্তু পুনরুত্থান দিবসকে তারা অস্বীকার করে কেবল অহমিকাবশত। এভাবে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর। ফলে তওবাও করতে সক্ষম হয় না শেষাবধি। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ব্যাখ্যা করেছেন— পাপকর্মে মানুষ ত্বরা করে। দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করে তওবা করতে। বলে, সময় হলে সৎকর্ম তো করবোই। সহসাই আগমন ঘটে মৃত্যুর। ফলে পরপারে পাড়ি দিতে হয় তওবা ব্যতিরেকেই। জুহাক অর্থ করেছেন— মানুষ দীর্ঘ আশাধারী হয়ে থাকে। মনে করে সে দীর্ঘজীবি হবেই। সুতরাং এই বেলা সম্পদ-সম্মান অর্জনের প্রতি মনোযোগী হওয়াই উত্তম। এভাবে সহসা তাকে বরণ করতে হয় মৃত্যুকে। চিরতরে হারিয়ে যায় তওবা করার সুযোগ।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানকার 'ইয়াফজুরা' অর্থ সে মিথ্যা কথা বলতে চায়। আর 'আমামাহু' অর্থ ভবিষ্যতকে, পুনরুত্থান দিবসকে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য পুনরুত্থান দিবসকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। 'ফজুর' এর আভিধানিক অর্থ বিকর্ষিত হওয়া। 'ফাজের' অর্থ মহাসত্য থেকে বিকর্ষিত জন, পাপাচারী।

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۨالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥

q সে প্রশ্ন করে, ‘কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?

q যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে,

q এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন,

q যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে—

q সেদিন— মানুষ বলিবে,‘আজ পালাইবার স্থান কোথায়?’

q না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।

q সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

q সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।

q বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত,

q যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সে আবার উপহাসচ্ছলে এরকম প্রশ্নেরও অবতারণা করে যে, কই, কোথায় কিয়ামত? কিয়ামত দিবস আবার কখনো আসবে নাকি? অর্থাৎ কিয়ামত তো কখনো আসতে পারেই না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে—‘যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে’। এখানে ‘বারিক্বাল বাসার’ অর্থ চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। ক্বারী নাফে পাঠ করতেন ‘বারাক্বা’। আর জমহুর পাঠ করেন ‘বারিক্বা’। দু’টো শব্দই রয়েছে ‘কামুস’ অভিধান গ্রন্থে। শব্দদু’টোর ধাতুমূল ‘বারকুন’ ও ‘বারুকুন’। এর অর্থ আতংকে চক্ষু স্থির হয়ে যাওয়া, চোখে কিছু না দেখা। ফাররা ও খলিল বলেছেন, ‘বারিক্বা’ অর্থ সন্ত্রস্ত হবে, হবে ভীত। অর্থাৎ যা সে অস্বীকার করতো, তা স্বচক্ষে দেখে হয়ে যাবে ভীত, সন্ত্রস্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে’ অর্থ মৃত্যুর ভয়াবহতা যখন সে প্রত্যক্ষ করবে, তখন ভয়ে-আতঙ্কে তার চক্ষু হয়ে যাবে স্থির। কিন্তু কথাটির অর্থ এরকম না হওয়াই সমীচীন। কেননা পূর্বাপর আয়াতসমূহে বিবৃত

হয়েছে কিয়ামতের সময়ের অবস্থা। তাই কথাটির অর্থ হবে— যখন সে মহাপ্রলয়কালের বিভীষিকা স্বচক্ষে দেখতে পাবে, তখন আতংকে ত্রাসে স্থবির হয়ে যাবে তার চক্ষুগোলক।

পরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'যখন চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন (৮), যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে— (৯) সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায় (১০)? না, কোনো আশ্রয় স্থল নেই' (১১)। এখানে 'যখন চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন' অর্থ যখন উধাও হয়ে যাবে চন্দ্রের কিরণ প্রকাশের ক্ষমতা। 'যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে' কথাটির অর্থ কেউ কেউ করেছেন এভাবে— যখন সূর্য-চন্দ্র উভয়টি নিষ্প্রভ হয়ে একযোগে উদিত হবে পশ্চিম আকাশে। এখানে 'খসাফা' এর রূপকার্থ দ্যুতিহীন। আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, তখন চাঁদ-সুরুজকে একত্র করে নিক্ষেপ করা হবে মহাসমুদ্রে। ফলে মহাসাগরের নীলাম্বুরাশি হয়ে যাবে অগ্নিময়। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানে 'সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে' অর্থ উভয়টিকে জ্যোতিহীন করা হবে একযোগে। 'জুমাল' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ কেউ যেহেতু ৭ সংখ্যক আয়াতের 'চক্ষুস্থির হয়ে যাবে' কথাটির অর্থ করেন 'মৃত্যু-বিভীষিকা দেখে স্থির হয়ে যাবে চোখের দৃষ্টি' তাই তারা 'চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন' বাক্যটির অর্থ করেন— তার চোখের জ্যোতি যেহেতু তখন বিলীন হয়ে যাবে, তাই সে চাঁদকেও দেখতে পাবে জ্যোতিবিবর্জিতরূপে। মৃত্যুর আতংকে চন্দ্র-সূর্যকে জ্যোতিহীন পরিদৃষ্ট হওয়াই তখন তার জন্য হবে স্বাভাবিক। অথবা মর্মার্থ হবে— মানবাত্মা তখন এমন স্তরে উন্নীত হবে যে, সূর্য-চন্দ্রের অস্তিত্ব সেখানে থাকবেই না। সেখানে বিকিরীত হবে কেবল জ্ঞানের দ্যুতি।

'শামস্' (সূর্য) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। 'জুমিয়া' ক্রিয়াপদটি পুংলিঙ্গ। যেহেতু কর্তৃপদ এখানে প্রকাশ্য, তাই ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গ। অথবা বলা যেতে পারে, 'ক্বমার' (চন্দ্র) শব্দটি পুংলিঙ্গ, যা যোজিত হয়েছে 'শামস্' এর সঙ্গে। পুংলিঙ্গবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে এখানে সেকারণেই। এভাবে এখানে যোজ্যকে রাখা হয়েছে আড়ালে। ৭ সংখ্যক আয়াতের 'ইজা' (যখন) শব্দটি ক্রিয়ার আধার। 'স্থির হয়ে যাবে', 'হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন' এবং 'একত্র করা হবে' ক্রিয়াত্রয়ের ঘটিতব্য নির্ধারিত কালাধার হচ্ছে 'সেদিন মানুষ বলবে'। এখানে 'সেদিন মানুষ বলবে' অর্থ সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে। 'পালাবার স্থান কোথায়' বাক্যটি এখানে 'বলবে' এর কর্মপদ। অর্থাৎ 'আজ পালাবার স্থান কোথায়' বক্তব্যটি হবে অবিশ্বাসীদের। আর 'কোনো আশ্রয়স্থল নেই' অর্থ এখানে— প্রাণ বাঁচাবার কোনো ব্যবস্থাই যে এখন নেই। এখানে 'আশ্রয়স্থল' অর্থ পাহাড়। কেননা সে যুগের মানুষ প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতো গিরিগহ্বরে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট'। একথার অর্থ— সেদিন আশ্রয় নিতে গেলে গ্রহণ করতে হবে কেবল আল্লাহ্‌র আশ্রয়। তখন এককভাবে কার্যকর থাকবে কেবল তাঁর অভিপ্রায় ও আদেশ। এখানে 'মুস্‌তাক্বার' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে—'সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে কী অগ্রে প্রেরণ করেছে ও কী পশ্চাতে রেখে গিয়েছে'। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'কী অগ্রে প্রেরণ করেছে' অর্থ কোন কোন পুণ্যকর্ম সে প্রেরণ করেছে পূর্বাহ্নে। আর 'কী পশ্চাতে রেখে এসেছে' অর্থ পৃথিবীতে পরিত্যাগ করে এসেছে কোন কুকর্ম, অপপ্রথা। কাতাদা বলেছেন, কথাদু'টোর অর্থ আনুগত্য ও অনানুগত্য। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— প্রথম কর্ম ও শেষ কর্ম। জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, এখানে অগ্রে প্রেরিত কর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে অর্থব্যয়, আর পশ্চাতে রেখে যাওয়ার অর্থ পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারীদের জন্য। আবার কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— কে পারলৌকিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে ইহলৌকিকতার উপর। অথবা এর বিপরীত। অর্থাৎ দু'টো ব্যাপারেই অবহিত করা হবে তাকে প্রতিফল দিবসে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— পার্থিব বিষয়াদিতে মানুষ খুবই সচেতন। অসচেতন কেবল পারলৌকিক বিষয়ে। এখানকার 'বাসীরাহ্‌' শব্দটিতে 'তা' প্রযুক্ত হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ নিজের বিষয়ে সে খুবই সচেতন। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট'। এরকম বলেছেন আবুল আলীয়া ও আতা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবীও এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এমনও বলা যেতে পারে যে, 'বাসীরাহ্‌' এর বিশেষ্য এখানে রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বস্তুত মানুষ নিজেই তার নিজের অবস্থার সম্যক দ্রষ্টা।

অথবা 'বাসীরাহ্‌' অর্থ এখানে প্রমাণ। অর্থাৎ মানুষ নিজেই তার নিজের বিরুদ্ধের প্রমাণ। কেননা প্রত্যক্ষ-দর্শীরা স্বয়ং সাক্ষ্যপ্রমাণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রভুপালকের পক্ষ থেকে অবশ্যই এসেছে প্রমাণ'। কিংবা 'বাসীরাহ্‌' অর্থ এখানে নিয়োজিত ফেরেশতা, যারা মানুষের কৃতকর্ম লিপিবদ্ধকারী, যারা উপস্থাপন করবে সাক্ষ্য প্রমাণ। মুকাতিল ও কালাবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষের জন্য নিযুক্ত রয়েছে কতিপয় সাক্ষ্যদাতা। তারা মহাবিচারের দিবসে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তারা হচ্ছে— চোখ, কান ও হাত-পা। অর্থাৎ 'বাসীরাহ্‌ অর্থ এখানে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অথবা বলা যায়, এখানে উহ্য রয়েছে একটি যের প্রদানকারী অব্যয়। অর্থাৎ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাই তার বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন আরাত্‌তুম আন্‌

তাসতারদ্বাউ' আওলাদুকুম'। এখানেও যের প্রদানকারী 'আওলাদুকুম' এর পূর্বে উহ্য রয়েছে 'লি'। তেমনি এখানেও 'আল ইনসান' (মানুষ) এর পূর্বে 'লি' অব্যয়টি উহ্য থাকা অসম্ভব নয়।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে'। এখানকার 'মাআ'জীরাহ্' বহুবচন 'মিজার' এর 'মাআ'জীরাহ্' অর্থ অজুহাতের অবতারণা করে। পর্দাকে বলা হয় 'মিজার'। একারণেই জুহাক ও সুদ্দী আয়াতখানিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষ তার ঘরের জানালা-দরজার পর্দা লাগিয়ে, এমনকি জানালা-দরজা অর্গলাবদ্ধ করেও যদি কোনো অপকর্ম করে, তবুও তা গোপন থাকবে না। কেননা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই হবে তার প্রতিপক্ষীয় সাক্ষী। তদুপরি সাক্ষী রয়েছে ফেরেশতারা। আর আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

মুজাহিদ, কাতাদা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষ সেদিন শত অজুহাত খাড়া করলেও, সহস্র বচসা-বাদানুবাদ করলেও কোনো লাভ হবে না। কেননা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তখন জালেমদের অজুহাত কোনো কাজে আসবে না'।

ফাররা বলেছেন, মানুষ যদিও সেদিন নানা অজুহাতের অবতারণা করবে, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকেই সেগুলোকে আবার করবে নাকচ। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'তোমাদের কথা তোমাদের বিরুদ্ধেই নিক্ষেপ করো, নিশ্চয়, তোমরা মিথ্যাবাদী'। এসকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এখানকার 'মাআ'জীর' শব্দটি বহুবচন 'মাআ'জুরাত' এর। অবশ্য এরূপ শব্দোৎসারণ রীতি নিপাতনে সিদ্ধ। যেমন নিপাতনে সিদ্ধ 'মুনকার' এর বহুবচন 'মানাকীর'। 'মাআ'জীর' এবং 'মানাকীর' দুটো শব্দই আবার বহুবচনীয় নামপদ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইল প্রত্যাদেশিত বাণী যখন পাঠ করে শোনাতেন, তখন রসুল স.ও সাথে সাথে তা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পাঠ করতেন এই ভেবে যে, তিনি স. যেনো তা আবার ভুলে না যান। বিষয়টি ছিলো তাঁর জন্য বিব্রতকর। তাঁর এমতো বিব্রতকর অবস্থা ফুটে উঠতো তাঁর চোখে-মুখেও। এমতো অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতসমূহ ' বলা হয়—

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾

r তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না।

r ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই।

r সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর,
r অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! প্রত্যাদেশিত বাণী আয়ত্ত করবার মানসে আপনি তা তড়ি-ঘড়ি করে আওড়াবেন না। ব্যতিব্যস্ত হয়ে অতি দ্রুত করবেন না রসনা-সঞ্চালন। বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. আশংকা করতেন, তিনি স. প্রত্যাদেশিত বাণী আবার যেনো ভুলে না যান। তাই তিনি স. প্রত্যাদেশকালেও তা ঘন ঘন আওড়াতে থাকতেন।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমার'। একথার অর্থ— হে প্রত্যাদিষ্টপুরুষ! আপনি তো আমার প্রত্যাদেশের ধারক, বাহক ও প্রচারক। সুতরাং প্রত্যাদেশিত বাণী যাতে যথাযথভাবে আপনার স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে এবং আপনি যেনো তা যখনই প্রয়োজন হবে তখনই সুষ্ঠুভাবে পাঠ করতে পারেন, তার দায়িত্ব তো ন্যস্ত আমার উপরেই। সুতরাং আপনি দুঃশ্চিন্তিত হবেন কেনো?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো'। এখানে 'আমি তা পাঠ করি' অর্থ যখন আমার দূত জিবরাইল তা পাঠ করে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! এখন থেকে আপনি এই নিয়মটি মেনে চলুন— প্রথমে জিবরাইল তার পাঠ শেষ করবে, তারপর আপনি শুরু করবেন আপনার আবৃত্তি। এভাবেই দেখবেন, সকলকিছুই আপনি অবিকল স্মৃতিবদ্ধ করে ফেলেছেন। উল্লেখ্য, এই নিয়মটিই অনুসৃত হয় শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে। প্রথমে শিক্ষক বলেন, পরে বলে ছাত্ররা।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—'অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার'। একথার অর্থ— স্মৃতিস্থ ও পঠিত হওয়ার পর যে বিষয়টি বাকী থাকে, তা হচ্ছে প্রত্যাদেশাবলীর যথাব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এ দায়িত্বটিও আপনি ছেড়ে দিন আমার উপরে। আপনার হৃদয়ে আমি যেমন সৃষ্টি করে দিবো প্রত্যাদেশাবলীর যথার্থ বোধ, তেমনি প্রচারকালে আপনার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত করবো এর নির্ভুল ব্যাখ্যা।

আমি বলি, কোরআনের কোনো কোনো আয়াত 'মুহকামাত' (সুস্পষ্ট) এবং কোনো কোনো আয়াত 'মুতাশাবিহাত' (রহস্যাচ্ছন্ন, দুর্জ্ঞেয়)। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. উভয় প্রকার আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবগত। অর্থাৎ তাঁর কাছে সকল আয়াতের মর্মার্থ ছিলো সুস্পষ্ট। এরকম হওয়াই শোভন ও সমীচীন। অন্যথায় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ। তদুপরি, তা হয়ে যায় আলোচ্য আয়াতের প্রতি সরাসরি অস্বীকৃতি। আমরা বিষয়টিকে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি 'আল্লাহ্ ব্যতীত তার তাৎপর্য কেউ জানে না' এই আয়াতের ব্যাখ্যায়।

এখানকার 'ছুম্‌মা' (অতঃপর) শব্দটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সম্বোধনকালে যদি বক্তব্য পরিষ্কার করে দেওয়া না হয়, তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কিছুকাল পরেও তার ব্যাখ্যা প্রদান সিদ্ধ। তবে তা সিদ্ধ হবে অনিবার্যতা ব্যতীত। আগের আয়াতের (১৬) 'রসনা সঞ্চালন কোরো না' বাক্যটি বিপত্তিমূলক। কেননা বক্তা যাকে লক্ষ্য করে কথা বলতে চায়, সে যদি নিজেই তার কথার মধ্যে কথা বলতে থাকে, তখন বক্তা তাকে এরকম করতে নিষেধ করে দেয়। যেমন তখন বক্তা বলে, কথার মধ্যে কথা বলছো কেনো? প্রথমে শোনো আমি কী বলি। এই কথাগুলি বিজ্ঞপ্তিমূলক। আর এধরনের কথা বক্তার মূল বক্তব্য বিষয় নয়। এরকম বলার পরই বক্তা ফিরে যায় তার মূল বক্তব্যে। এখানেও ঘটেছে তেমনই। সাময়িক বিরতির পর পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হয়েছে মূল বক্তব্য এভাবে—

সূরা ক্বিয়ামাহ্ আয়াত ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

r না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস;

r এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।

r সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে,

r তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

প্রথোমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আসলে পৃথিবীপ্রসক্ত। আখেরাতকে উপেক্ষা করাই তোমাদের স্বভাব। এখানে 'ইউহিব্বুনা' অর্থ ভালবাসে এবং 'তাজারূনা' অর্থ উপেক্ষা করে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে — সেদিন কোনো কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে (২২), তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' (২৩),। এখানকার 'উজুহুন' (মুখমণ্ডল) হচ্ছে উদ্দেশ্য। এর পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি সম্বন্ধপদ। অর্থাৎ যারা আল্লাহর নৈকট্যভাজন, প্রতিফল দিবসে তাদের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। এখানে বিশেষণও রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ কোনো কোনো মুখমণ্ডল। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'উজুহুন' এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'মিনহুম' (তাদের মধ্যে)। 'ইয়াওমাইজিন' অর্থ সেদিন, প্রতিফল প্রদানের দিন। 'নাদ্বিরাহ্' অর্থ উজ্জ্বল, সতেজ, সৌন্দর্যমণ্ডিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— প্রতিফল দিবসে মানুষের মধ্যে ওই সকল মানুষের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, যারা আল্লাহর নৈকট্যভাজন।

'ইলা রব্বিহা' অর্থ প্রতিপালকের দিকে। 'নাজিরাহ্' অর্থ তাকিয়ে থাকবে। অর্থাৎ ওই সকল উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট সৌভাগ্যবানেরা সেদিন আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে থাকবে পরম পরিতৃপ্তি ও মুগ্ধতার সঙ্গে। বলাবাহুল্য, তাদের এমতো দর্শন হবে স্থান-কাল-পাত্রের অতীত, আনুরূপ্যবিহীন। কেননা আল্লাহ্ আনুরূপ্যবিহীন।

‘কিতাবুর রুইয়াত’ গ্রন্থে উল্লেখিত আজরী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার ‘নাদ্বিরাহ্’ অর্থ অনিন্দ্য সুন্দর। আর ‘ইলা রব্বিহা নাজিরাহ্’ অর্থ দৃষ্টিপাত করবে প্রভুপালকের দিকে। হাসান বসরী এবং আরো অনেকে এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের একজন জান্নাতবাসী তার উদ্যান, সঙ্গিনী, সুখোপকরণসমূহ, পরিচারক-অনুচর ও মশারীগুলো ঘুরে ফিরে পরিদর্শন করবে একমাসের পথের সমান দূরত্ব অতিক্রম করে। আর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতবাসী প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় লাভ করবে আল্লাহ্র মহিমময় দীদার। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন আলোচ্য আয়াত। আহমদ, তিরমিজি, দারাকুতনী, লালকায়ী, আজারী। আজারীর বর্ণনায় এসেছে, সবচেয়ে নিম্নমর্যাদাধারী জান্নাতির রাজত্বের পরিধি হবে দুই হাজার বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। সে তার পুরো এলাকাই দেখতে পাবে একসঙ্গে। দূর ও নিকট তার চোখে প্রতিভাসিত হবে একই লহমায়।

আল্লাহ্দর্শন প্রসঙ্গে হজরত আনাস থেকে বাযযার, তিবরানী, বায়হাকী, আবু ইয়ালা ও ইসপাহানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, শুক্রবারে জান্নাতে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন আবির্ভাব ঘটবে সর্বাধিক বরকতের সঙ্গে। এজন্যই শুক্রবারকে বলা হয় ‘ইয়াওমুম্ মাজ্বীদ’ (আধিক্যের দিন)।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আজারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীরা প্রতি শুক্রবার তাদের প্রিয়তম আল্লাহ্র দর্শন লাভ করবে। হাসান বসরী থেকে প্রায়োন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতি শুক্রবারে স্বর্গের অধিবাসীরা তাদের প্রভুপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে নির্ণিমেষ নেত্রে। হাদিসটি উদ্ধার করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি তার প্রিয় দু’চোখের অধিকারী হবো। প্রতিদানে সে বাস করবে আমারই গৃহে (জান্নাতে)। নির্ণিমেষ নেত্রে অবলোকন করবে কেবল আমাকে।

হজরত জারীর বাজালী বলেছেন, একরাতে আমরা কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে। আকাশে শোভা পাচ্ছিলো পূর্ণিমার পূর্ণশশী। সে দিকে ইঙ্গিত করে তিনি স. বললেন, নিশ্চয় তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তাকে, যেমন এখন দেখতে পাচ্ছো চতুর্দশীর চাঁদ। ওই দর্শন হবে অনন্তরাল। সুতরাং উদয়াস্তের পূর্বের নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো। বোখারী, মুসলিম। হজরত হুজায়ফা থেকে লালকায়ীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম।

হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত বলেছেন, রসুল স. দোয়া করতেন, হে আমার পরম সখা! তোমা সকাশে আমি প্রার্থনা করি, পরবর্তী পৃথিবীতে তুমি আমাকে দান কোরো সৌভাগ্যময় জীবন। দিয়ো তোমার দীদার। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মৃত্যুর পূর্বে তোমরা তোমাদের

প্রভুপালনকর্তাকে দেখতে পাবে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে লালকায়ীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. প্রার্থনা জানালেন, 'হে আমার প্রভুপালয়িতা! দ্যাখা দাও। তারপর 'তারা তাদের প্রভুপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' এই আয়াত পাঠ করে বললেন, আল্লাহ্ নবী মুসাকে জানিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীতে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। দেখবে শুধু জান্নাতবাসীরা। তাদের দৃষ্টি সেখানে বিপর্যস্ত হবে না। আর তারাও হবে না কখনো বৃদ্ধ। 'যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার সাক্ষাত লাভে আগ্রহী, তারা যেনো পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে' এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত আলী বলেছেন, যারা আল্লাহ্র দীদারের অনুরাগী, তাদের জন্য পুণ্যপরায়ণ হওয়া অপরিহার্য। তারা যেনো কখনোই তাদের প্রভুপালকের সমকক্ষ অথবা অংশীদার নির্ধারণ না করে। সারকথা কোরআন মজীদের অনেক আয়াত দ্বারা আল্লাহ্র দীদার সন্দেহাতীতরূপে সুপ্রমাণিত। যেমন 'ফামান কানা ইয়ারজু লিক্বাআ রব্বিহী ফাল ইয়া'মাল আ'মালান সলিহা' 'লিল্লাজীনা আহসানুল হুসনা ওয়া যিয়াদাহ', 'লাদাইনা মাযীদ' ইত্যাদি। এছাড়া রসুল স. তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দ, তাঁদের অনুসারী এবং তাঁদের অনুসারীগণ কর্তৃক দীদারের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। হাদিসবেত্তাগণ তাই মন্তব্য করেন, বিষয়টি উপনীত হয়েছে সুবিদিত পর্যায়ে। আল্লামা সুয়ূতী এবং প্রথিতযশা কোরআনব্যাখ্যাতা ও হাদিসবেত্তা তাই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন অত্যাবশ্যকীয় বিশ্বাসরূপে। অর্থাৎ বিশ্বাসটি ঐকমত্যসম্মত, যার অস্বীকারকারীরা অবশ্যই কাফের।

পথভ্রষ্ট মুতাজিলা ও খারেজী সম্প্রদায় বলে, দীদার অসম্ভব। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যা দৃষ্টির আয়ত্ত, তা অবশ্যই আকারসম্ভূত ও স্থানবিশিষ্ট। অথচ আল্লাহ্ স্থান, আকার ও নিরাকারের অতীত। এমতো যুক্তির কারণেই তারা আলোচ্য আয়াতের 'নাজিরাহ্' (তাকিয়ে থাকবে) কথাটির অর্থ করে, অপেক্ষমান থাকবে। কিন্তু তাদের এমতো অর্থোদ্ধার প্রচেষ্টা আরবী ভাষার ব্যাকরণরীতিসিদ্ধ নয়। কেননা 'ইনতেজার' (অপেক্ষা) ক্রিয়ার কর্মপদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় 'লাম' অব্যয়। 'ইলা' (দিকে) অব্যয় নয়। আর চোখে দেখা ক্রিয়ার পর কর্মপদে ব্যবহৃত হয় 'ইলা' অব্যয়। এখানে সেরকমই হয়েছে। অর্থাৎ 'লি রব্বিহা' (তার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে) না বলে বলা হচ্ছে 'ইলা রব্বিহা' (তার পালনকর্তার প্রতি)।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিদ্বানগণ বলেন, দ্রষ্টব্যের জন্য কেবল মাত্র উপস্থিতিই যথেষ্ট। দর্শক তা দর্শন করবে জীবিতাবস্থায়, সজ্ঞানে, তার দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে। যদি দ্রষ্টব্য উপস্থিত থাকে এবং দর্শক তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে তার দর্শন তো ঘটবেই। এসকল শর্ত প্রযুক্ত হয় বস্তুগত দর্শনের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্পাককে এভাবে দর্শন করা অসম্ভব। কেননা তিনি বস্তুর অতীত, অদৃশ্যের অদৃশ্য। লক্ষণীয়, আল্লাহ্পাক সৃষ্টিজগতের প্রকাশ্য-গোপন, সংক্ষিপ্তি-বিস্তৃতি সকলকিছুই এক সঙ্গে দেখেন। তাঁর এমতো দর্শনের না আছে কোনো সীমা, না

আছে পার্থক্যরেখা। নিকট দূর বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব এতে নেই। তার এমতো দর্শন তাঁর দৃষ্টিকে ক্লান্তও করে না কখনো। কেননা তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। সৃষ্টি এমতো বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। এতদসত্ত্বেও বেহেশতে বেহেশতবাসীরা যে তাঁকে দেখবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা বিষয়টি সুপ্রমাণিত। তবুও কথা থেকে যায় যে, তাহলে সে দীদারের প্রকৃতি হবে কী রকম? অথবা তা কি সত্যিসত্যিই দীদার, না দীদার নামের অন্য কোনোকিছু? কেননা আল্লাহ্পাক বলেছেন 'লা তুদ্রিকুহুল আবসার' (তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন)। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইদরাক' শব্দটি। স্মর্তব্য, শুধু দেখার নাম 'ইদরাক' নয়। 'ইদরাক' হচ্ছে কোনোকিছুকে পুরোপুরি পরিবেষ্টন করা, কোনো কিছুর তথ্য ও তত্ত্বসমূহ পুরোপুরি আয়ত্ত করা। বলাবহুল্য, এরকম যোগ্যতা সৃষ্টির নেই, থাকা সম্ভবও নয়। তবে যাকে সে জানতে, বুঝতে, অবলোকন করতে পারে না, তাঁর সকাশে তার বিদ্যমানতা তো অসম্ভব নয়। আর এ বিষয়টিও অসম্ভব নয় যে, যদি তাঁর দর্শনকে বলা হয় তাঁরই মতো অবোধ্য ও আনুরূপ্যবিহীন। আর তা সংঘটিত হতে পারবে এখানে নয়, ওখানে, যে জগত, জগতবাসীরা অনশ্বর ও যারা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

উপযোগ ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতবাসীরা তাদের প্রভুপালকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে এবং তারা তখন হবে উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট। কেননা নামপদীয় বাক্যের (জুমলায়ে ইসমিয়ার) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা কর্মকে করে নিরবচ্ছিন্ন ও প্রবহমান। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ কেউ আল্লাহ্র দীদার পাবে সপ্তাহে একদিন এবং কেউ কেউ পাবে সপ্তাহে দুদিন। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া এরকমই বর্ণনা করেছেন। কারো কারো আবার দীদার ভাগ্যে জুটবে দুই ঈদের মতো বৎসরে দু'বার। আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ মাজানী থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবেই। অবশ্যই নামপদীয় বাক্য হয় নিরবচ্ছিন্ন। সুতরাং বুঝতে হবে এখানেও বলা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন দীদারের কথা। কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে যে এরকম ঘটবে, সেরকম কথা এখানে নেই। তবে একথা অবশ্যই বলা হয়েছে যে, এরকম সৌভাগ্যের অধিকারী হবে বিশ্বাসীগণের একটি বিশেষ দল। আর ওই দলটি যে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। অর্থাৎ সেদিন যারা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, তাদেরই মুখাবয়ব হবে বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল এবং বিশেষভাবে তারাই আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশে।

আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আবু ইয়াযিদ বোস্তামী বলেছেন, আল্লাহ্পাকের কিছু বান্দা এরকমও হবেন, যারা দীদার বিরতির সময় এমন করুণভাবে ফরিয়াদ জানাতে থাকবেন, যেমনভাবে জাহান্নামীরা ফরিয়াদ জানাতে থাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্পাকের নৈকট্যভাজনতার স্তর হবে অসংখ্য। সে সকল স্তর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর

তা আমাদের দায়িত্বভূতও নয়। তাই আমরা এই হাদিস পর্যন্ত এসেই থেমে যেতে চাই যে, বেহেশতের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত জন যারা হবেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবেন সকাল-সন্ধ্যায়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সকলের অগ্রণী হচ্ছেন নবী-রসুলগণ। তারপর তাঁরা যাঁরা আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য। আনুরূপ্যবিহীনরূপে সতত আল্লাহ্‌র সত্তাসন্নিহিত। তাঁর অস্তিত্বে সতত স্নাত, মাঝে মাঝে বা বিরতি সহকারে নয়। এ পার্থিব জগত আল্লাহ্‌র দীদারের অন্তরায়। তাই পৃথিবীতে তাঁরা আল্লাহ্‌র দীদার পান না। কিন্তু আখেরাতে যেহেতু এ অন্তরায়টি আর থাকবে না, তাই সেখানে তাঁরা অবশ্যই পাবেন তাঁদের কাংখিত দীদার, সার্বক্ষণিকভাবে, এবং যাঁরা মাঝে মাঝে তাজাল্লি লাভ করেন, তাঁরা মাঝে মাঝে।

উপযোগ ঃ আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন যাঁরা, তাঁদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা থাকতেই পারে না। অথচ দেখা যায় হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্র হজরত ইউসুফের মহব্বতে ছিলেন পাগলপারা। পুত্রবিরহে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিষয়টি বেশ রহস্যময়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বিষয়টির রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেক মানুষের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তিস্থল (মাবদায়ে তাইয়ুন)। সে উৎপত্তিস্থলের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো না কোনো নাম অথবা গুণ। ওই নাম গুণই তাদের রব বা প্রতিপালক। পৃথিবীর জীবনে তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ওই বিশেষ বিশেষ নাম অথবা গুণের বিকাশ— তরুলতা, সাগর-নদী, সেবক-পরিচারক, বিভিন্নরূপে। এরকম বিকাশ ঘটবে জান্নাতেও। রসুল স. সেজন্যই বলেছেন, জান্নাতের মৃত্তিকা পবিত্র এবং সেখানকার পানি সুমিষ্ট। আর সেখানকার স্রোতস্বিনী এবং প্রাসাদ-বৃক্ষরাজি হবে 'সুবহানাল্লহ্' 'আলহামদুলিল্লাহ্' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' ও 'আল্লাহু আকবার'। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির কথাতেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নাম-গুণাবলীর জ্যোতি বিকিরীত হবে জান্নাতের প্রাসাদ-বৃক্ষরাজি- স্রোতস্বিনীর মধ্যে। জান্নাতবাসীরা তা দেখে হবে ধন্য, উল্লসিত, পরিতৃপ্ত। এরপর তাঁরা অধিকতর আনন্দিত ও মোহিত হবে তখন, যখন ঘটবে আল্লাহ্‌র সরাসরি দীদার। তখন জান্নাতের সুখোপকরণসমূহের জ্যোতি হয়ে যাবে নিষ্প্রভ। সেগুলো আবার সমুজ্জ্বল হবে দীদারে ছেদ পড়লে। এভাবে জান্নাতবাসীগণ অনন্তকাল ধরে শান্তি ও পরিতৃপ্তি পেতে থাকবেন কখনো আল্লাহ্‌র নাম-গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটা দর্শনে, আবার কখনো আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যহীন দর্শনধন্য হয়ে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি আরো বলেছেন, সুফী-আউলিয়াগণ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌পাকের সত্তাসঞ্জাত জ্যোতিচ্ছটা (তাজাল্লিয়ে জাতি) লাভ করেন তাঁর নাম গুণাবলীর (আসমা-সিফাতের) জ্যোতিচ্ছটার আড়ালে থেকে। কখনো কখনো আবার এই আড়াল অপসারিতও হয়। তখন তাঁরা অবলোকন করেন বিদ্যুৎবৎ জ্যোতিচ্ছটা (তাজাল্লিয়ে বরকী)। পরকালের দর্শনও হবে এরকম—

কখনো নাম গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটার আড়াল থেকে, আবার কখনো আড়ালবিবর্জিত অবস্থায়, সরাসরি। তখন প্রত্যেক জান্নাতবাসীর মাবদায়ে তাইয়ুন যে নাম ও গুণ, সেই নাম-গুণই প্রকাশিত হবে তার জান্নাতরূপে। কখনো কখনো জান্নাতের সুখপোকরণই হবে তাঁর প্রিয়তম দর্শনের দর্পন। আবার কখনো কখনো দর্শন হবে দর্পন ছাড়াই, সরাসরি। আমি বলি, এরকম অবস্থা হবে সাধারণ জান্নাতবাসীর। আর দর্পনবিবর্জিত সার্বক্ষণিক দর্শনধন্য হবেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ। অথবা পৃথিবীতে যাঁরা সার্বক্ষণিকভাবে তাজাল্লিয়ে জাতির জ্যোতিচ্ছটাস্নাত, তাঁরাই তখন বিরতিহীনভাবে লাভ করবেন আল্লাহ্‌র দীদার।

সংশয় ঃ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানকার 'ইলা রব্বিহা নাজিরাহ্' বাক্যের শুরুতে 'ইলা' ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের বিষয়বস্তুকে করেছে সীমিতার্থক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যখন আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করবেন, জান্নাতবাসীরা তাঁর দিকে তাকাতে পারবেন তখনই। ওই সময় তাঁরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো দিকেই দৃষ্টিপাত করবেন না। একথার সমর্থন রয়েছে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা আরাম আয়াশে মগ্ন থাকবে। অকস্মাৎ আলোকসম্পাত ঘটবে ঊর্ধ্বদেশ থেকে। তারা দৃষ্টি উত্তোলন করেই দেখতে পাবে তাদের প্রিয়তম প্রভুপালককে। আল্লাহ্ বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তিবারতা (সালামুন ক্বওলাম মির রব্বির রহীম)। এরপর আল্লাহ্ এবং তাঁর-বান্দাগণ তাকিয়ে থাকবে পরস্পরের দিকে। জান্নাতবাসীদের দৃষ্টি তখন অন্য কোনো দিকে যাবেই না। এক সময় নেমে আসবে যবনিকা। অন্তর্হিত হবে আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্যচ্ছটা। কিন্তু জান্নাতের সকল পরিসরে তখনো জেগে থাকবে তার রেশ। ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ্‌দুনইয়া, দারাকুতনী।

এখন প্রশ্ন ঃ কিছুসংখ্যক লোকের জন্য যদি দীদার নিরবচ্ছিন্ন হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটিকে সীমিতার্থক বলার হেতু কী?

উত্তর ঃ বাক্যের শুরুতে যের প্রদানকারী অব্যয় ও যের প্রদত্ত পদ 'ইলা রব্বিহা' ব্যবহৃত হওয়ায় বক্তব্যটি সীমিতার্থক হয়েছে, এমনটি মেনে নেওয়া যায় না। বরং বলা যেতে পারে— এরকম করা হয়েছে যতিপাত ঘটাতে, ও ছন্দবদ্ধতার লক্ষ্যে। আর প্রিয়তম দর্শনের ক্ষেত্রে জান্নাতের অনুগ্রহসম্ভারসমূহ তো বিপত্তিকর কিছু নয়। বরং ওগুলো তো তাঁদের প্রিয়তমদর্শনের দর্পন। এভাবেই তো তাদের দর্শন হবে নিরবচ্ছিন্ন, কখনো দর্পনের মাধ্যমে, কখনো মাধ্যম ছাড়া। ফলে জান্নাতের সুখোপকরণসমূহ সম্ভোগের ক্ষেত্রেও কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না। অর্থাৎ এক অবস্থা তাদেরকে অন্য অবস্থা থেকে করতে পারবে না উদাসীন। তবে সাধারণ জান্নাতবাসীদের ক্ষেত্রে তাদের সুখোপকরণসমূহ সৃষ্টি করবে অন্তরায়। তারা যখন জান্নাতমুখী হবে তখন আল্লাহ্‌মুখী হতে পারবে না। আবার যখন আল্লাহ্‌মুখী হবে, তখন আর খেয়াল রাখতে পারবে না জান্নাতের দিকে। আর এরকম ঘটবে তাদের যোগ্যতার অভাবের কারণেই।

অথবা প্রশ্নটির জবাব দেওয়া যেতে পারে এভাবে— আলোচ্য আয়াতকে সীমিতার্থক বলার অর্থ, ওই সকল লোককে সুনির্দিষ্ট করা, যাদের ভাগ্যে জুটবে নিরবচ্ছিন্ন দীদারের সৌভাগ্য। আর হজরত জাবেরের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সাধারণ মর্যাদাবিশিষ্ট জান্নাতবাসীদের অবস্থা।

সংশয় ঃ একথা মেনে নিতে আর আপত্তি নেই যে, বেহেশতের অনুগ্রহ সম্ভারের প্রতি মনোনিবেশন প্রিয়তম দর্শনের ক্ষেত্রে বিপত্তি সৃষ্টি করবে না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তবে এমতাবস্থায় অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি মনোনিবেশনের প্রয়োজনই বা কী?

নিরসন ঃ আল্লাহ্পাকের নাম-গুণাবলীর বিকাশই হচ্ছে জান্নাত এবং তা প্রিয়তম দর্শনের দর্পনও বটে। তাহলে দর্পনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনাবশ্যকই বা হবে কেনো?

উপযোগ ঃ কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, প্রিয়তমদর্শনের এই মহামূল্যবান সম্পদটি নির্ধারিত রয়েছে কেবল বিশ্বাসী মানুষের জন্য। এমন কি ফেরেশতামণ্ডলীও এমতো সম্পদ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু বায়হাকী এ সম্পর্কে পোষণ করেন ভিন্ন মত এবং তাঁর অভিমতের সমর্থনে তিনি উপস্থাপন করেন এই হাদিস— হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক তাঁর ইবাদত করার দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট ফেরেশতাকে। তাঁরা তাদের সৃষ্টিলগ্ন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারিবদ্ধ হয়ে সম্পন্ন করে চলেছেন ইবাদত। মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবেন তাঁরা। মহাপ্রলয়ের পর আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে দান করবেন তাঁর দীদার। তাঁরা তখন আল্লাহ্পাকের আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্যচ্ছটা অবলোকন করে বলবে, হে আমাদের পরম প্রভুপালয়িতা! আমরা তোমার যথাযথ ইবাদত করতে পারিনি। দ্বিতীয় সূত্রপরম্পরায় আদী ইবনে আরতাতের পদ্ধতিতে অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে অন্য একজন সাহাবী কর্তৃক। আর আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, প্রত্যেকে তার মাবদায়ে তাইয়্যুন (উৎসস্থল) অনুযায়ী লাভ করবে আল্লাহ্র দীদার। এতে করে বুঝা যায়, সাধারণ বিশ্বাসী অপেক্ষা সাধারণ ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ। মানুষের ব্যক্তি-সত্তার চেয়ে ফেরেশতাদের ব্যক্তিসত্তাও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। মহামান্য মোজাদ্দেদে আলফে সানির তত্ত্বগত ব্যাখ্যাও সেরকমই বলে। তবে আমরা এ কথাও উল্লেখ করেছি যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রিয়তম দর্শন হবে নিরবচ্ছিন্ন। এতে করে একথাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বিশেষ মানুষ বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আকায়েদ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীতে বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে সবিস্তারে।

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

q কোন কোন মুখমণ্ডল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ,

q আশংকা করিবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে।

q কখনো নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে,

q এবং বলা হইবে, 'কে তাহাকে রক্ষা করিবে?'

q তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ।

q এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।

q সেই দিন তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন কোনো কোনো লোকের মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ, বিকৃত। আর তারা এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়বে যে, চরম বিপদকবলিত হওয়া ব্যতিরেকে তাদের নিস্তার নেই। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় তাদেরকে আঘাত করবেই। 'ফাক্বিরাহ' অর্থ এমন বিপদ, যা আঘাত করে মেরুদণ্ডে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়' অর্থ অবধারিত নরকগমন। আর কালাবী বলেছেন, প্রিয়তমজন দর্শন থেকে বঞ্চিতি।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'কখনো নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে'। 'কাল্লা' অর্থ কখনোই নয়। অর্থাৎ পরকাল অপেক্ষা ইহকালকে অধিক মূল্যবান মনে করার বিষয়টি কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। 'ইজা বালাগাতিত্ তারাক্বিয়া' অর্থ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। এখানে 'ইজা' (যখন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শর্ত হিসেবে। এর জবাব হচ্ছে 'সেদিন তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে' (৩০)। আর 'ইজা' কে যদি এখানে ক্রিয়ার আধার হিসেবে ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে ক্রিয়াটি রয়েছে এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ তখনই তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুপালনকর্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন কণ্ঠাগত হবে তোমাদের প্রাণ। 'তারাক্বী' বলে কণ্ঠনালীর দু'পাশে অবস্থিত বঙ্কিম অস্থিদু'টোকে। এখানে 'যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে' অর্থ যখন সমুপস্থিত হবে মৃত্যু।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে'? কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— মৃত্যুপথযাত্রী, অথবা তার পাশে উপস্থিত লোকেরা তখন বলে, বাঁচাও। মন্ত্রটন্ত্র কিছু পাঠ করে ফুঁ দাও। সুলায়মান তাইমী এবং মুকাতিল ইবনে সুলায়মান অর্থ করেছেন— মৃত্যুদূতের সহযোগী ফেরেশতারা তখন বলে, এ লোকের আত্মাকে হস্তগত করবে কে? স্বস্তি না শাস্তির ফেরেশতা? এখানকার 'রক্ব' (রক্ষা) শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'রক্বইয়ুন'।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ'। একথার অর্থ— প্রাণ কণ্ঠাগত হলে মৃত্যুপথযাত্রী ভালোভাবেই একথা বুঝতে পারবে যে, এটাই পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের সময়।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে'। শা'বী, হাসান বসরী প্রমুখ কথাটির অর্থ করেছেন— তখন এক পাঁজরের সঙ্গে মিশে যাবে আর এক পাঁজর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সাক্ব' অর্থ ইহকাল ও পরকাল। মৃত্যুই হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের মিলনমুহূর্ত, মানুষের জন্য এক অনপনেয় সংকট, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় এবং অনন্তকালের দিকে অনিশ্চিত যাত্রা। জুহাক বলেছেন, পৃথিবীবাসীরা তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার মরদেহ সৎকারের বিষয়ে, আর ফেরেশতারা ব্যস্ত হয় তার আত্মা নিয়ে।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সেদিন তোমার প্রভুর নিকট সকলে প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মৃত্যুর পর, অথবা পুনরুত্থান দিবসে আপন আপন কৃতকর্মের হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সকলকে তাদের প্রভুপালনকর্তার সমীপে উপস্থিত হতেই হবে। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়।

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلٰٓى أَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ﴿٣٥﴾

r সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই।
r বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।
r অতঃপর সে তাহার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে,
r দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!
r আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আল্লাহ্‌র রসুল ও আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। নামাজ পাঠ করেনি। জাকাতও দেয়নি।

এই আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে 'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবো না' (৩) আয়াতের সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা মনে করে মৃত্যুর পর আমি তাদের অস্থিসমূহকে পুনঃসংযোজিত করতে পারবো না। তাদের পুনরুত্থান কখনো হবেই না। সেকারণেই তো তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপর ইমান আনে না। নামাজ পড়ে না। জাকাত দেয় না। এখানকার 'সদ্‌দাক্বা' এবং 'সল্‌লা' পদ দু'টির সর্বনাম পদ প্রত্যাবৃত হবে

৩ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ' কথাটির প্রতি। এভাবে বক্তব্যভঙ্গিটির প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর লক্ষ্য আদী ইবনে রবীয়া। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, রবীয়া নয়, আবু জেহেল। উল্লেখ্য, 'আল্ইনসান' এর 'আল' অব্যয়টিকে যদি সীমিতার্থক ধরা হয়, তবেই কেবল ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করা যায়— সে রবীয়া, বা আবু জেহেল, যে-ই হোক না কেনো। আর 'আল' যদি হয় জাতিবাচক, তবে এখানে 'মানুষ' দ্বারা উদ্দেশ্য হবে রবীয়া, আবু জেহেল সহ সকল অবিশ্বাসী ও বেনামাজী।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'বরং সে সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো'। একথার অর্থ— নামাজ-জাকাত ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, সত্যের প্রতি প্রদর্শন করেছে চরম অবজ্ঞা, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে চিরতরে। অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে করেছে চিররুদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিলো দম্ভভরে (৩৩), দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ (৩৪)। আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ' (৩৫)। এখানে 'ইয়াতামাত্ত্ব' অর্থ দম্ভভরে ফিরে গিয়েছিলো, প্রত্যাবর্তন করেছিলো দ্রুতগতিতে। 'কামুস' অভিধানগ্রন্থে রয়েছে 'মাত্বা ফী সাইরিহী' (সে চলেছে দ্রুতগতিতে)। 'সিহাহ্' রচয়িতা জাওহারী লিখেছেন, কথাটির অর্থ গর্বিত পদক্ষেপে চলা। কেউ কেউ বলেছেন, বুক উঁচু করে চলা। আর এখানকার 'দুর্ভোগ, তোমার জন্য দুর্ভোগ' কথাটি একটি ভীতি-ভর্ৎসনা প্রদর্শক অপপ্রার্থনা। ইতোপূর্বে 'ইনসান' (মানুষ) এর সর্বনাম 'সে' সহযোগে বাক্য উপস্থাপন করা হয়েছিলো, আর এখানে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো ভিন্নতররূপে, মধ্যম পুরুষে। আর কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বক্তব্যটিকে গুরুত্ব প্রদানার্থে। আবার এরকমও হতে পারে যে, প্রথমে বলা হয়েছে ইহজগতের দুর্ভোগের কথা এবং পরে দুর্ভোগ কামনা করা হয়েছে পরকালের। অর্থাৎ ইহকালে যুদ্ধে হতাহত হওয়া এবং পরকালে ভোগ করা দোজখের আযাব। কিংবা প্রথম বাক্যে দু'বার 'আওলা' (দুর্ভোগ) বলা হয়েছে জীবন-যাপনে ও মৃত্যুকালে বিপর্যয় কামনার্থে এবং পরের দুই 'দুর্ভোগ' অর্থ মহাবিচারের দিবসের আতংক এবং দোজখের শাস্তি। এর বিপরীতে যেমন নবী ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আর শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি তার জন্মগ্রহণকালে, অন্তিম যাত্রার সময় এবং পুনরুত্থান দিবসে।

এখানে বার বার 'দুর্ভোগ' কামনা করে অভিসম্পাত করা হয়েছে আদী, আবু জেহেল প্রমুখ দাম্ভিক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি এবং উদ্ধৃত আয়াতে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়েছে নবী ইয়াহ্ইয়ার প্রতি। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানে পার্থক্যসূচক বিশেষণীয় শব্দরূপে 'আওইয়ালু' শব্দটি সাধিত হয়েছে ধাতুমূল 'ওয়াইলু' থেকে, যার লিখিতরূপ 'আওলা'। এর অর্থ ধ্বংসাত্মক দুর্ভোগ।

যেমন ধাতুমূল ‘দুনা’ থেকে সাধিত বিশেষণীয় শব্দরূপ ‘আওদানুন’ যার লিখিত রূপ ‘আদ্না’। অথবা বলা যায় ‘আওলা’ শব্দরূপটি এখানে অতীতকালবোধক। আর এখানকার ‘লাকা’ পদের ‘লাম’ অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমার ধ্বংস সাধিত হোক। যেমন বলা হয় ‘আওলাকাল্লহু মা তুকরাহুহু’ (আল্লাহ্ তোমাকে সেটাই দান করবেন, যাতে তোমার অরুচি)। কেউ কেউ বলেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— ‘আওলা লাকাল হালাক্ব’ (তোমার ধ্বংসই তোমার জন্য মঙ্গল)। ‘কামুস’ গ্রন্থে বলা হয়েছে ‘আওলা লাকা’ বাক্যটি তিরস্কারসূচক। এর উদ্দেশ্য একথা বলা যে, ধ্বংস তোমার সন্নিকটবর্তী। এমতাবস্থায় বলতে হয়, ‘আওলা’ শব্দটি সাধিত হয়েছে ‘ওয়ালীউন’ ধাতুমূল থেকে, যার অর্থ সন্নিকটবর্তী।

কাতাদা বলেছেন, আমাদের নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বুতহা নামক স্থানে আবু জেহেলকে পেয়ে তার পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করে পাঠ করলেন ‘দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ’। আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদ! তুমি কি আমাকে ধমক দিচ্ছো? আল্লাহ্র শপথ! তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না, তোমার পালনকর্তাও নয়। তুমি তো ভালো করেই একথা জানো যে, আমি এই পার্বত্য শহরের একজন অত্যন্ত বলশালী ব্যক্তি। বলাবাহুল্য, তার এমতো দর্প পূর্ণরূপে চূর্ণ করা হয়েছিলো বদর যুদ্ধে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেওয়ার মাধ্যমে। রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে থাকে একজন করে ফেরাউন। আর আমার উম্মতের ফেরাউন হচ্ছে আবু জেহেল।

আউফির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন সুরা মুদ্দাস্সিরের ৩০ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হলো, বলা হলো ‘সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশ জন প্রহরী’ তখন আবু জেহেল তার সঙ্গী-সাথীদেরকে বললো, তোমাদের মায়েরা তোমাদের জন্য কেঁদে মরুক! শুনেছো কাবশার ব্যাটা কী বলে? জাহান্নামে নাকি নিযুক্ত আছে মাত্র ঊনিশজন প্রহরী। তোমরা তো এক একজন মস্ত বড় পালোয়ান। কী? দশজনে মিলেও কি তোমরা একজন পাহারাদারকে কাবু করতে পারবে না? কী? জবাব দিচ্ছো না কেনো? তার এমতো আস্ফালনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার রসুল! আপনি আবু জেহেলের কাছে যান এবং তাকে পাঠ করে শোনান ‘আওলা লাকা ফা আওলা। ছুম্মা আওলা লাকা ফা আওলা’।

নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, একবার সাঈদ ইবনে যোবায়ের হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মান্যবর! রসুল স. কি নিজে থেকে আবু জেহেলকে ‘দুর্ভোগ তোমার জন্য’ কথাগুলো বলেছিলেন, না এটা ছিলো তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ। তিনি জবাব দিলেন, প্রথমে তিনি নিজে থেকেই আবু জেহেলকে কথাগুলো শুনিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ্পাক ওই কথাগুলোকেই অবতীর্ণ করেন প্রত্যাদেশরূপে।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

r মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

r সেকি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

r অতঃপর সে 'আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন'।

r অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল— নর ও নারী।

r তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ ভেবেছে কী? তাকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা বহনের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে না? ঘটানো হবে না পুনরুত্থান? প্রতিফল দিবসে দেওয়া হবে না তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল? উল্লেখ্য, পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করবার জন্য যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞানুগত এবং কে নয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ক্বুল মা ইয়াবাউবিকুম রব্বী লাও লা দুআ'উকুম'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না (৩৭)? অতঃপর সে 'আলাকা'য় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতিদান করেন ও সুঠাম করেন' (৩৮)। একথার অর্থ— আবু জেহেল এবং তার মতো লোকেরা এতো দম্ভ দ্যাখায় কিসের ভিত্তিতে? তারা কি জানে না, আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মাতৃগর্ভান্তরে অত্যন্ত অনুল্লেখ্য এক শুক্রকণা থেকে। তারপর সে শুক্রবিন্দুটিকে করেছি মাংসপিণ্ড, তারপর চর্মবেষ্টিত, অস্থিময়, তারপর তাতে ফুৎকার করেছি রূহ। অবশেষে তাদেরকে ভূমিষ্ঠ করেছি সুন্দর সুঠাম দেহবল্লরী সহকারে। যে আমি এরূপ অপূর্ব সৃজন ক্ষমতাসম্পন্ন, সেই আমি কেনো তাদেরকে পুনর্জীবিত করে ওঠাতে পারবো না পুনরুত্থান দিবসে? দ্বিতীয় সৃজন তো প্রথম সৃজন অপেক্ষা অবশ্যই সহজতর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৩৯, ৪০) মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষের জন্মায়নের এই পরিণতিকে আমি আবার করি দ্বিধাবিভক্ত। কাউকে করি নারী, কাউকে নর। তবুও কি তারা বলবে, আমি পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম নই? কেনো বলবে? তারা কি এতোই নির্বোধ?

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা তীনের শেষ আয়াত 'আ- লাইসাল্লহু বি আহকামিল হাকিমীন' পাঠ করে, তার বলা উচিত 'বালা ওয়া আনা আ'লা জালিকা মিনাশ শাহিদীন' (হে আল্লাহ্! হ্যাঁ, আমি একথার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা)। আর যে ব্যক্তি পাঠ করে সুরা ক্বিয়ামাহ্'র শেষ আয়াত 'তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নয়' তারও বলা উচিত 'বালা ওয়া আনা আ'লা জালিকা মিনাশ শাহিদীন'। আর যে ব্যক্তি পাঠ করে সুরা মুরসালাতের আয়াত 'ফাবিআইয়্যি হাদিছিম্ বা'দাহু ইউমিনূন' তাকে বলতে হবে 'আমান্না বিল্লাহ'। আবু দাউদ।

মুসা ইবনে আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার জনৈক সাহাবীকে দেখা গেলো, তিনি তাঁর গৃহের ছাদে নামাজ পাঠ করছিলেন। নামাজে আবৃত্তি করলেন 'আ-লাইসা জালিকা বিক্বদিরিন আ'লা আঁইউহ্য়িইয়াল মাওতা'। তখন তিনি বললেন 'সুবহানা বালা'। লোকেরা পরে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এমন করলেন কেনো? তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে এরকম করতে দেখেছি। আবু দাউদ।

সূরা দাহর

এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মদীনায়। এর মধ্যে রয়েছে ২রুকু এবং ৩১ আয়াত।

সূরা দাহ্র ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

هَلۡ اَتٰى عَلَى الۡاِنۡسَانِ حِيۡنٌ مِّنَ الدَّهۡرِ لَمۡ يَكُنۡ شَيۡـًٔا مَّذۡكُوۡرًا ۝١ اِنَّا خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَةٍ اَمۡشَاجٍ ۖ نَّبۡتَلِيۡهِ فَجَعَلۡنٰهُ سَمِيۡعًا بَصِيۡرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيۡنٰهُ السَّبِيۡلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوۡرًا ۝٣ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ سَلٰسِلَاۡ وَ اَغۡلٰلًا وَّ سَعِيۡرًا ۝٤ اِنَّ الۡاَبۡرَارَ يَشۡرَبُوۡنَ مِنۡ كَاۡسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوۡرًا ۝٥ عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوۡنَهَا تَفۡجِيۡرًا ۝٦

r কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

r আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য; এইজন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

r আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

r আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

r সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর—

r এমন একটি প্রস্রবণ যাহা হইতে আল্লাহ্র বান্দাগণ পান করিবে, তাহারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হাল আতা আ'লাল ইনসানি হীনুম মিনাদ্‌দাহরি'। এর অর্থ— কালপ্রবাহে কি মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিলো? এখানকার 'হাল' (কি) অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হলেও নিশ্চিতার্থক। স্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিলোই। আর এখানে 'মানুষ' অর্থ মানবমণ্ডলী। অথবা সীমিতার্থে কেবল হজরত আদম।

'হীন' অর্থ এমন একসময়, নির্ধারিত এক কাল। এরকম অর্থ করেছেন বায়যাবী। আর কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'হীন' হচ্ছে অনির্ধারিত কাল, যা প্রযোজ্য হয় সর্বসময়ে, হ্রস্ব সময়সীমা অথবা দীর্ঘ সময়পরিসর উভয়টি বোঝাতে। কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ অথবা ষাট বৎসর, এক অথবা দুই মাস সময় পরিসরকে বলে 'হীন'।

আর 'দাহর' হচ্ছে নিঃসীম মহাকাল। 'কামুস' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সুদীর্ঘ কাল, অথবা কমপক্ষে এক হাজার বৎসরের সময় সীমাকে বলে 'দাহর'। আমি বলি, হজরত আদমের আয়ুষ্কাল ছিলো এক হাজার বৎসর। 'সিহাহ' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাপৃথিবীর আয়ুষ্কালের নাম দাহর। অর্থাৎ 'দাহর' অর্থ সৃষ্টির সূচনা-সমাপ্তি। আলোচ্য আয়াতেও 'দাহর' অর্থ সৃষ্টির সূচনা-সমাপ্তি। এখানে 'দাহর' ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ আয়ুষ্কাল অর্থে। যেমন বলা হয় 'দাহরু ফুলানিন' (অমুক ব্যক্তির সারা জীবন)।

এরপর বলা হয়েছে— 'লাম ইয়াকুন শাইয়াম্ মাজকূরা'। এর অর্থ— যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না। অর্থাৎ যখন সে অস্তিত্বের অতীত ছিলো, তখন তার সম্পর্কে কেউ কোনোকিছু জানতোই না। বাক্যটি পূর্বোক্ত 'হীন' পদের বিশেষণ। আর নামপদের সঙ্গে যোজক অব্যয়টি এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ সে সময়টি ছিলো এমন, যখন সে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূত ছিলোই না। লক্ষণীয়, বাক্যের গতিধারা কিন্তু একথা প্রমাণ করে যে, মানুষ অস্তিত্বপূর্ব অবস্থাতেও কিছু না কিছু ছিলো। নতুবা তার উপরে কাল অতিবাহিত হল কীভাবে। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সে তখন স্মরণভূত কিছু না থাকলেও ছিলো

স্মরণবহির্ভূত। কিন্তু সে ছিলো। একারণেই ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, এখানে 'মানুষ' বলে বোঝানো হয়েছে পিতা আদমকে। আর 'এমন এক সময়' অর্থ ওই সময়, যখন কর্দম থেকে তাঁর দেহ নির্মাণ করে চল্লিশ বৎসর ধরে প্রাণহীন অবস্থায় তাঁকে ফেলে রাখা হয়েছিলো মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পিতা আদমকে প্রাণবন্ত করা হয়েছিলো তাঁর মূর্তি নির্মাণের একশত বিশ বৎসর পর। আর যদি এখানে 'মানুষ' অর্থ ধরা হয় সকল মানুষ, তবে 'এমন এক সময়' কথাটির অর্থ হবে ওই সময়, যখন তারা অবস্থান করে স্ব স্ব মাতৃ-উদরে, যার সময়সীমা কমপক্ষে ছয় মাস এবং ঊর্ধ্বপক্ষে দুই বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন, সাত বৎসর। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, যে সময় মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না, সেই সময়ের পরিসর হয় পিতা আদমের মূর্তির প্রাণবিবর্জিত অবস্থা, না হয় মনুষ্যজাতির মাতৃজঠরে অবস্থানের সময়। আলোচ্য আয়াতের দাবিও সেরকম। কেননা মানুষের আত্মপ্রকাশের পূর্বেও মানুষ ছিলো, যদিও তা প্রকাশ্য অবস্থায় নয়। সে জন্যই সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, মানুষ এক সময় ছিলো আরো সূক্ষ্ম অবস্থায় 'আইয়ানে ছাবেতা'র (মৌল অস্তিত্বের) স্তরে, যে স্তর সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন সুফী-তাত্ত্বিকগণ। 'হীন' শব্দটির 'তানভীন' এর প্রমাণ, যেহেতু তা আধিক্যের অর্থবহ। ওই অবস্থায় মানুষকে থাকতে হয় বহু বহু বৎসর। আর ওই অবস্থাটির যথাভাষ্য প্রদানও অসম্ভব। তাই ওই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানার্থে এখানে বলা হয়েছে— যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর একবার এক লোককে পাঠ করতে শুনলেন 'যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না'। তিনি তখন বললেন, হায়! মানুষের সম্পূর্ণ জীবন যদি এরকম হতো। তাঁর এই মন্তব্যটি সুফী-দরবেশগণের ব্যাখ্যার সন্নিকটবর্তী। তাঁরা বলেন, মানুষ আত্মিক উন্নতির এমন স্তরে পৌঁছে যায়, যখন সে হয়ে যায় অনস্তিত্বসদৃশ, আলোচনার অতীত। ওই স্তরের নামই ফানা বা আত্মবিনাশন, মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু। আর ওই স্তরটি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব লাভ হয় ওই স্তরেই। আর যখন সে উল্লেখযোগ্য থাকে তখন, যখন সে তার মানবিক দোষ-গুণ নিয়ে জীবিত থাকে পৃথিবীতে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেছেন, হে আমার প্রভুপালক! মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয় এমন এক সময়, যখন সে থাকে না উল্লেখ করার মতো কোনো অস্তিত্ব। সে তো থাকে তখন দর্শনের অতীত এক অনস্তিত্বের বলয়ে। এরপর তুমিই তাকে দান করো তোমার জীবন থেকে জীবন, তোমার স্থিতি থেকে স্থায়িত্ব, তোমারই স্বভাব থেকে সুপ্রবৃত্তি। তোমারই করুণাস্নাত হয়ে সে তখন আত্মবিনাশিত হয়েও স্থিত হয় তোমার স্থিতিতে। তার ফানা ও বাকা দুই অবস্থাই তখন থাকে অন্তরালবিহীনরূপে সমভাবে সক্রিয়। তাঁর 'যদি তোমার অভিপ্রায় হয়' কথাটিই এখানকার 'হীনুম মিনাদ্ দাহরি' বাক্যের ব্যাখ্যা। এখানে 'মিন' অব্যয়টি সূচনামূলক। আল্লাহ্‌পাকের নামসমূহেই তো গণনা করা হয়

যুগের। এরকমই বলেছেন ‘কামুস’ রচয়িতা। বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদমসন্তানেরা আমাকে ক্লেশ দেয়। তারা গালি দেয় কাল-কালান্তরকে। অথচ আমিই কাল। আমিই যুগের গতিনিয়ন্ত্রক। আমিই দিবস-বিভাবরীর বিবর্তক।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ‘আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করবার জন্য’। ‘মাশজুন’ অথবা ‘মাশীজুন’ এর বহুবচন ‘আমশাজ্ব’। শব্দটি ‘মাশাজ্বাশ শাই’ থেকে সাধিত। এর অর্থ— মিলিত, মিশ্র। ‘নুত্বফাতিন আমশাজ্ব’ অর্থ মিলিত শুক্রবিন্দু। ‘নুত্বফা’র (শুক্রবিন্দুর) বিশেষণরূপে এখানে ‘আমশাজ্ব’ এজন্যই ব্যবহৃত হয়েছে যে, নর-নারীর শুক্রবিন্দুর মিলিতরূপের নাম ‘নুত্বফা’। আর প্রত্যেক ‘নুতফা’ই বৈশিষ্ট্য, লঘুত্ব ও বলিষ্ঠতার দিক দিয়ে ভিন্ন।

কেউ কেউ বলেছেন, ‘আমশাজ্ব’ শব্দটি একবচন। এর অর্থ সম্মিলিত, বিমিশ্র। অর্থাৎ নর-নারীর শুক্রবিন্দুর মিলিত অস্তিত্ব। কাতাদা বলেছেন, ‘আমশাজ্ব’ অর্থ পদ্ধতি। অর্থাৎ বিভিন্ন পদ্ধতিতে মিলিত শুক্রকণা, যে শুক্রকণা পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে, তারপর মাংসপিণ্ডে। এরপর থেকে সৃজন সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যা অতিক্রম করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

‘নাবতালীহ্’ অর্থ পরীক্ষা করবার জন্য। অর্থাৎ পরীক্ষা করবার জন্য মানুষের বিভিন্ন অবস্থা। ‘ইব্‌তিলাহ্’ এর রূপকার্থ পরীক্ষা, রূপান্তরণ। অথবা কথাটির মর্মার্থ— আমি পরীক্ষা অনুপাতে মানুষকে সৃজন করেছি মিলিত শুক্রকণা থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন’। একথার অর্থ— আমার অস্তিত্ব ও নাম-গুণাবলীর প্রমাণরূপে শ্রবণ ও দর্শনের যোগ্যতা আমি তাদেরকে দিয়েছি। দিয়েছি এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করবার জন্য যে, তারা তাদের এমতো যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বাসীদের দলভূত হয় কিনা। অর্থাৎ শ্রুতি ও দৃষ্টিদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা করা। সেজন্যই এখানে বাক্যের শুরুতেই যোজক অব্যয় ‘ফা’ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর যোজ্য হচ্ছে আগের বাক্যের ‘খলাক্বনা’ (আমি সৃষ্টি করেছি)।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে’। একথার অর্থ— আমি তাকে সৎপথের নির্দেশনা দিয়েছি কিতাব ও নবী-রসুলগণের মাধ্যমে। এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্য জগতে উন্মোচন করে রেখেছি আমার সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপের অসংখ্য নিদর্শন। এখন বিষয়টি তার অভিপ্রায়ভূত। সে এখন যথাযথ নির্দেশনা মেনে আমার পথপ্রাপ্ত কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূত হতে পারে, অথবা তা অমান্য করে হয়ে যেতে পারে অকৃতজ্ঞ, পথভ্রষ্ট। এখানে ‘হেদায়েত’ অর্থ পথের নির্দেশ, পথ অতিক্রম শেষে গন্তব্যে উপনীত করানো নয়। অর্থাৎ সুরা ফাতিহার ‘ইহ্‌দিনাস সিরাত্বল মুসতাক্বীম’ আয়াতে সত্য পথের পথিক হওয়ার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে রকম পথপ্রাপ্ত হওয়া নয়।

এখানে 'শাকির' অর্থ কৃতজ্ঞ এবং 'কাফুর' অর্থ অকৃতজ্ঞ। শব্দ দু'টো এখানকার 'হাদাইনাহু' (আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি) কথাটির 'হু' (তাকে) সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। অর্থাৎ হয় মানুষ আমার এই পথের নির্দেশনাকে মান্য করে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অমান্য করে হবে কৃতঘ্ন। অনেকে আবার বলেছেন, শব্দদু'টো এখানকার 'সাবীল' (পথ) পদটির অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ আমি মানুষকে দু'টি পথই দেখিয়েছি— একটি কৃতজ্ঞতার, অপরটি অকৃতজ্ঞতার। এখন সে যেটা পছন্দ করে সেটারই অনুসারী হোক। এর যথাপ্রতিফল পাবে সে-ই। এতে করে আমার কিছু এসে যায় না। অথবা কৃতঘ্নতার পথ প্রদর্শনের বিষয়টি হবে এখানে রূপকার্থক।

উল্লেখ্য, এখানকার 'ইম্মা' পদটি বিয়োজক অব্যয়। সুতরাং এর সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক হেদায়েতের সঙ্গে যেমন নয়, তেমনি নয় গোমরাহীর সাথে। বরং এর সম্পর্ক কেবল পথের সঙ্গে, সে পথ হতে পারে দু'রকমের— কৃতজ্ঞতার অথবা অকৃতজ্ঞতার। অনেকে এই মূল তত্ত্বটি না বুঝে এখানকার 'পথের নির্দেশ' কথাটিকে সম্মিলিত করেন কেবল হেদায়েতের পথের সঙ্গে। যদি তা-ই হয়, তবে বিয়োজক অব্যয়টি ব্যবহারের আর যৌক্তিকতা থাকে কোথায়। এই বিয়োজকটির কারণেই বক্তব্যার্থটি দাঁড়ায়— সত্য-অসত্য দু'টো পথই আমি খুলে রেখেছি মানুষের জন্য। এখন তারা ভেবে দেখুক, কোন পথ অবলম্বন করবে তারা, ন্যায়ের, না অন্যায়ের। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, অদৃষ্টের বিধান অনুসারেই মানুষ চলবে— হয় শুভপথে, না হয় অশুভ পথে। এবং দু'টো পথেরই সন্ধান দিয়েছেন আল্লাহ্।

কেউ কেউ মনে করেন বাক্যটি শর্তযুক্ত। অর্থাৎ এখানকার 'ইম্মা' এর 'ইন' (যদি) শর্তজ্ঞাপক এবং 'মা' (যা) অতিরিক্ত, দু'টো পদের সন্ধি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ কৃতজ্ঞ হোক, অথবা হোক অকৃতজ্ঞ, তাতে আমার তো কিছু এসে যায় না। আমি তো চিরঅমুখাপেক্ষী। আর তাদেরকে পথের সন্ধানও তো আমিই দিয়েছি। কোনো সুযোগ রাখিনি অজুহাত প্রদর্শনের।

প্রশ্ন জাগে, এখানে 'শাকির' বলার পর 'কাফির' বলাই ছিলো অধিকতর সঙ্গত। কিন্তু তা না করে 'কাফুর' বলা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে, 'শাকির' এমন 'কৃতজ্ঞ' যার মধ্যে অল্পবিস্তর অকৃতজ্ঞতা থাকলেও থাকতে পারে। তাই এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে 'কাফুর', যার অর্থ ঘোর অকৃতজ্ঞ। অথবা বলা যেতে পারে, ছন্দগত পার্থক্য নিরূপণার্থে এখানে বলা হয়েছে 'আলকাফুরা'।

উল্লেখ্য, এখানে 'ইন্না হাদায়না' থেকে শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। এমতাবস্থায় উত্থিত হয় এই প্রশ্নটি— আল্লাহ্পাক যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন, তাকে দিলেন শ্রবণ ও দর্শনশক্তি। এরপর মানুষ কী করলো? আল্লাহ্পাকই বা কী করলেন? এরকম একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরেই এখানে বলা হয়েছে 'ইন্না হাদায়না' (আমি তাকে পথের নির্দেশনা দিয়েছি)।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি'। বাক্যটিতে বিবৃত হয়েছে অকৃতজ্ঞদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা। লক্ষণীয়, আগের আয়াতে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে কৃতজ্ঞদের এবং পরে অকৃতজ্ঞদের। কিন্তু প্রতিফল দানের বেলায় প্রথমে উল্লেখ করা হলো অকৃতজ্ঞদের। আবার পরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কৃতজ্ঞদের। কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ তাহলে কী পাবে— এরকম একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এখানে। আর অকৃতজ্ঞদের প্রতিদানের উল্লেখ এসেছে আগে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সুসংবাদ প্রদান অপেক্ষা ভীতিপ্রদর্শন মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ। আর এরকম বক্তব্যবিন্যাসটিও অনবদ্য। আল্লাহ্‌র বক্তব্যশৈলী এরকম অনবদ্য ও অতুলনীয় হওয়াই তো সমীচীন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সৎকর্মশীলেরা পান করবে এমন পানীয়, যার মিশ্রণ কাফুর— (৫) এমন একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে' (৬)।

এখানকার 'আবরার' শব্দটি 'বাররুন' এর বহুবচন। 'আবরার' অর্থ ওই সকল সৎকর্মশীল, যাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও অটুট। 'বাররুন' শব্দটি ধাতুমূল। 'ইয়াশরাবূনা মিন কা'স্' অর্থ পান করবে এমন পানীয়। 'সিহাহ্' প্রণেতা জাওহারী বলেছেন, 'কা'স' বলে শরবতপূর্ণ অথবা শরবতশূন্য পাত্রকে। যেমন বলা হয় 'কা'সুন খলিস' (শরবতশূন্য পাত্র) 'শারিব্‌তু কা'সান ত্বয়্যিবাতান' (আমি পবিত্র শরবতপূর্ণ পেয়ালা পান করেছি)।

'কামুস্' অভিধানে উল্লেখিত হয়েছে, 'কা'স' বলে পানপাত্রকে। অথবা পানীয়পূর্ণ পানপাত্রের নাম 'কা'স'— তার মধ্যে যে পানীয়ই থাকুক না কেনো — মদ, মধু, দুধ, অথবা পানি। সম্ভবত এখানে শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেরকম কোনো পানপাত্রকেই। 'মিন' অব্যয়টি এখানে সূচনাজ্ঞাপক। অথবা পুণ্যবানেরা তখন দুধ-মধু-সুরা বা পানি যা কিছুই পান করুক না কেনো, তা পান করবে পানপাত্র দ্বারাই। অথবা এর মর্মার্থ হবে কেবল পানীয়— ভাবার্থক হোক, অথবা রূপকার্থক। আধারের উল্লেখ করে এখানে বুঝানো হয়েছে আধারস্থিত বস্তুকে। যেমন বলা হয় 'জ্বারান্ নাহার' (নদী প্রবহমান)। কিন্তু নদী তো প্রবাহিত হয় না, প্রবাহিত হয়, নদীর পানি। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে 'মিন কা'স' বাক্যাংশের 'মিন' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং তা আংশিকার্থকও। যেমন— কিছু পরিমাণ শরবত। আবার বিবৃতিতার্থকও, যেমন— কী পান করবে? হতে পারে শরবত।

'কানা মিযাজুহা কাফুরা' অর্থ যার মিশ্রণ কাফুর। এখানে 'মিযাজ্ব' অর্থ মিশ্রিত বস্তু। আর 'হা' (যার) সর্বনামটি যুক্ত হবে পাত্রের সাথে। এখন 'কা'স' অর্থ যদি হয় পানীয়, তবে মিশ্রিত বস্তু হবে প্রকৃতই। আর এর অর্থ যদি হয় পাত্র, তবে

এখানকার 'মিশ্রণ' হবে রূপকার্থক। অর্থাৎ পাত্রস্থিত পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত কোনো বস্তু। যেমন বলা হয় 'কোনো অঞ্চলে যদি বৃষ্টিপাত হয়, তবে আমি তাকে গোপন করি'। অর্থাৎ উৎপন্নোন্মুখ তৃণরাজিকে করি গোপন।

কাতাদা বলেছেন, জান্নাতবাসীদের শরবতের সাথে মিশ্রিত করা হবে 'কাফুর' (কর্পুর) এবং তা সীল করা থাকবে মেশক দিয়ে। ইকরামা বলেছেন, ওই পানীয় পান করার সময় সুবাস পাওয়া যাবে কর্পুরের। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যখন সেটাকে করা হলো আগুন'। অর্থাৎ আগুনের মতো। কালাবী বলেছেন, জান্নাতের একটি নির্ঝরের নাম কাফুর, যেমন আর একটি নির্ঝরের নাম তাসনীম।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এমন একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহ্র বান্দাগণ পান করবে'। এখানকার 'আইনান' (এমন এক প্রস্রবণ) পদটি আগের আয়াতের 'কাফুর' এর অনুবর্তী, অথবা অনুগামী 'কা'স' এর কর্মপদের। এর সম্বন্ধপদ এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জান্নাতবাসীগণ পান করবে ঝর্ণার পানি। এখানকার 'বিহা' পদের 'বা' অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। 'হা' (যা) সর্বনামটি কর্মপদীয়। অর্থাৎ যা থেকে তারা পান করবে। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'ইয়াশরাবু' (সে পান করবে) কথাটির অর্থ হবে— আস্বাদ গ্রহণ করবে। আস্বাদ গ্রহণ করার কর্মপদের সাথে 'বা' অব্যয় যুক্ত হয়। তাই 'ইয়াশরাবু' কর্মপদের সঙ্গেও এখানে যুক্ত হয়েছে 'বা'। আর 'ইবাদুল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র দাসগণ, যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী এবং একনিষ্ঠ অনুগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে'। একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা ঝর্ণাগুলোকে তাদের ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে প্রবাহিত করতে পারবে, প্রাসাদে, অলিন্দে, উদ্যানে অথবা প্রান্তরে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'আজজুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, ইবনে শাজুর বলেছেন, জান্নাতবাসীদের হাতে থাকবে বৃক্ষশাখার মতো স্বর্ণের একটি শাখা। তারা ওই সোনার ডালগুলো দিয়ে বেহেশতের ঝর্ণাগুলোকে যেদিকে খুশী সেদিকে খেদিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। জান্নাতের পানি হবে তাদের নির্দেশানুগত।

সূরা দাহ্র ঃ আয়াত ৭

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾

r তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

প্রথমোক্ত আয়াতখানি একটি প্রারম্ভিক বাক্য। অর্থাৎ এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ। বাক্যটি যেনো একটি ধারণাপ্রসূত প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ্র পুণ্যবান বান্দাগণকে এরকম প্রতিদান দেওয়া হবে কী কারণে? অথবা তাদের পরিচয় কী? এমতো প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে এখানে এভাবে— তারা

কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। অর্থাৎ তারা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ কামনায় যথানিয়মে ও যথাসময়ে পালন করে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাবলী এবং ভয় করে কেবল তাঁকেই, যিনি অনিবার্য করেছেন মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবস। উল্লেখ্য, এ সকল গুণ অর্জিত হয় ফানা ও বাকার স্তরে উপনীত হলে। তখন কলব (হৃদয়) হয় 'সালিম' (প্রশান্ত) এবং নফস (প্রবৃত্তি) হয় 'মুত্বমাইন্না' (প্রশান্ত)। এমতাবস্থায় তাঁরা হন 'মুক্বাররাবীন' (নৈকট্যভাজন), 'আবরার' (পুণ্যবান) অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

আবার এরকমও হতে পারে যে, পূর্ববর্তী বাক্যের নিমিত্ত হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইউফূনা' (পালন করে) কথাটি। অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের বর্ণিত সুখোপকরণসমূহ প্রাপ্তির প্রধানতম কারণ এই যে, পৃথিবীতে তারা পালন করতো 'নজর' (কর্তব্য)। 'নজর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা অত্যাবশ্যক নয়, তাকেও অত্যাবশ্যক কর্ম হিসেবে গ্রহণ করা। 'সিহাহ্' অর্থাৎ পুণ্যপ্রেমিকগণ মোস্তাহাব (শোভন) বিষয়াবলীকেও নিজের উপর ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) করে নেয়। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'কর্তব্য পালন করে' অর্থ সম্পাদন করে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ দায়িত্বসমূহ।

ওয়াজিবের বিবরণ ঃ 'নজর' বা 'মানত' অর্থ যা আবশ্যিক নয়, তাকেও আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করা। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নজর বা মানত বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে দুটি—১. যে বিষয়ে মানত করা হয়, তা হতে হবে শরিয়তসিদ্ধ। সুতরাং বুঝতে হবে শরিয়তগর্হিত কোনো বিষয় মানত হিসেবে প্রতিপালন করা যায় না। রসুল স. বলেছেন, মানত ওই বিষয়, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুকূল। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। ২. প্রথম থেকে যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অপরিহার্য হবে না। হবে কেবল সিদ্ধ (জায়েয)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এর সঙ্গে শর্ত রয়েছে আরো দুটি—১. ইবাদতটি হতে হবে মৌলিক, আনুসাঙ্গিক নয়। ২. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে থাকতে হবে ওই রকম আরো একটি অপরিহার্য ইবাদত। জমহুর বিদ্বানগণের মতে এই শেষোক্ত শর্ত দু'টো আবশ্যিক নয়। যেমন ইতেকাফের মানত সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক, ইতেকাফ একটি মৌলিক ইবাদত না হওয়া সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, ইতেকাফ নিজে কোনো ইবাদত নয়, বরং ইতেকাফ হচ্ছে অবস্থান করা, নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। আবার ইতেকাফ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবধারিতও করা হয়নি। এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিলে ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক কথিত শর্তদু'টোর অস্তিত্ব আর থাকে না। একারণেই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মানতের কারণেই সূচিত হয় ইবাদতের কর্তব্য। অর্থাৎ প্রথমে যা ওয়াজিব ছিলো না, মানতের পর তা হয়ে যায় ওয়াজিব। যেমন— পীড়িতের সেবা, জানাযায় সহগমন, সালাম প্রদান ইত্যাদি। উম্মতজননী হজরত আয়েশা থেকেও সাধারণভাবে মানত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ

পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মানত করে, তার উচিত তা পরিপূরণ করা। আর যারা মানত করে আল্লাহ্‌র অনানুগত্যের উপর তাদের কর্তব্য হচ্ছে তা অপরিপূরিত রাখা। বোখারী।

মাসআলা ঃ যদি কেউ শরিয়ত সম্মত মানত করা সত্ত্বেও তার সঙ্গে যুক্ত করে কিছু নিরর্থক শর্ত, তার কর্তব্য হবে ওই নিরর্থক শর্তসমূহ ছাড়া ওই মানত পরিপূরণ করা। যেমন কেউ মানত করলো, অথবা বললো, আমি রোজা পালন করবো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমতাবস্থায় তাকে রোজা পালন করতে হবে ওই অতিরিক্ত শর্ত দু'টোকে বাদ দিয়ে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ বলেন, কেউ যদি মসজিদে হারামে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে তাকে ওই মসজিদেই নামাজ পড়তে হবে। অন্য মসজিদে নামাজ পড়লে তার মানত পুরা হবে না। তবে মসজিদে নববী, অথবা মসজিদে আকসায় নামাজ আদায়ের মানত করার পর কেউ যদি মসজিদে হারামে তার মানতকৃত নামাজ পাঠ করে, তবে তার মানত পরিপূরিত হবে। অর্থাৎ কম মর্যাদাবিশিষ্ট যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠের মানত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদে আদায় করলে তা যথাযথ হবে। এর বিপরীত করলে হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে নামাজ পাঠের মানতকারী পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠ করলেও তার মানত পুরা হয়ে যাবে। হজরত জাবের বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে এক ব্যক্তি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! আমি মানত করেছিলাম, আল্লাহ্ আপনাকে মক্কাবিজয়ী করলে আমি বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করবো। তিনি স. বললেন, এখানেই আদায় করো। লোকটি দু'তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। শেষে রসুল স. বললেন, যা ভালো বোঝো, করো। অর্থাৎ এখানে আদায় করো, অথবা ওখানে। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত। আবু দাউদ, দারেমী। এই হাদিসের উপরে ভিত্তি করেই ইমাম আবু হানিফা সুনির্দিষ্ট স্থানের শর্তটিকে অনাবশ্যক মনে করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে, ত্রয়ী মসজিদের যে কোনো একটিকে মানতের সঙ্গে শর্তযুক্ত করলেই অধিকতর পুণ্যের বিষয়টি গণনায় আনতে হবে। আর মানতকারীর উদ্দেশ্যেও তো আনুগত্য প্রতিপালনই। কাজেই শর্ত এমতোক্ষেত্রে নিরর্থক বিবেচিত হবে না।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মসজিদে হারাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো মসজিদ অপেক্ষা আমার মসজিদে পঠিত নামাজের মর্যাদা হাজারগুণ বেশী। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, স্বগৃহে পঠিত নামাজের পুণ্য একগুণ। গ্রামের মসজিদে পঁচিশ গুণ। জামে মসজিদে পাঁচশত গুণ। মসজিদে আকসায় হাজার গুণ। আমার মসজিদে পঞ্চাশ হাজার গুণ। আর মসজিদে হারামে একলক্ষ গুণ। ইবনে মাজা। উল্লেখ্য, বর্ণিত পুণ্যের তারতম্য ঘটে কেবল ফরজ নামাজের বেলায়। নফল

নামাজের বেলায় নয়। হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ আমার মসজিদে পাঠ করা অপেক্ষা নিজগৃহে পাঠ করা উত্তম। আবু দাউদ, তিরমিজি।

আনুগত্যের শর্ত ব্যতীত অন্যান্য শর্ত মূল্যহীন— একথার সমর্থনে উপস্থাপন করা যেতে পারে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন, রসুল স. একবার বক্তৃতাকালে দেখলেন, এক লোক রোদে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি স. তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আবু ইসরাইল তখন বললো, সে মানত করেছে, সে রোজা পালনকালে কখনো ছায়ায় বসবে না এবং কারো সাথে বাক্যালাপও করবে না। তিনি স. বললেন, লোকটিকে বলে দাও, সে যেনো ছায়ায় বসে, কথা বলে এবং তার রোজাও পালন করে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান। বোখারী। বোখারীর বর্ণনায় রোদের উল্লেখ নেই। প্রায়োন্নত সূত্রে ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— রসুল স. তখন বললেন, তাকে শুনিয়ে দাও, সে আল্লাহ্র আনুগত্য পূরণ করুক এবং বিরত থাকুক তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, আমাদের নিকট এই তথ্যটিও পৌঁছেছে যে, তিনি স. তাকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা) করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম শাফেয়ীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনার শেষাংশে বলা হয়েছে, রসুল স. তাকে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দেননি। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ ইবনে কুরাইবের মাধ্যমে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের কথা। অবশ্য মোহাম্মদ ইবনে কুরাইব বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

মাসআলা ঃ ওয়াজিব মানত যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে তার কাজা আদায় করতে হবে। ওই কাজা প্রকৃত (হাকীকী) হোক, অথবা হোক হুকুমী (প্রবিধানগত)। যেমন নামাজের মানতের কাজা নামাজ। রোজার মানতের কাজা রোজা। এরকম কাজা হচ্ছে প্রকৃত কাজা। আর বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল, যে রোজা রাখতে অসমর্থ, সে আহার করাবে একজন অভাবীকে। এরকম কাজার নাম প্রবিধানগত কাজা।

কেউ যদি পদব্রজে হজযাত্রায় মানত করার পর যাত্রাকালে বাহনে আরোহণ করতে বাধ্য হয়, তবে জমহুরের মতে কাফ্ফারাস্বরূপ তাকে দিতে হবে একটি কোরবানী। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইমামশ্রেষ্ঠও এরকম অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিমত হচ্ছে— কেউ পদব্রজে হজযাত্রার নিয়ত করলেও তার উপরে পদব্রজে হজ গমন ওয়াজিব হয় না। তাই এমতাবস্থায় যানবাহনে আরোহণ করলেও তার উপরে কোরবানী ওয়াজিব হয় না। কেননা হজরত উকবা ইবনে আমের জুহুনী বলেছেন, আমার বোন মানত করলো, সে হজ করবে খোলা মাথায়, খালি পায়ে ও পায়ে হেঁটে। হজযাত্রার সময় রসুল স. তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? তার সহযাত্রীদের একজন জবাব দিলো, সে এভাবেই হজযাত্রা করবে বলে মানত করেছে। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তাকে বলে দাও, সে যেনো বাহনে আরোহণ করে এবং ঢেকে নেয় তার মস্তক। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. দেখলেন, এক লোক তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে হজপালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে চলেছে। রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, সে এভাবে চলেছে কেনো? জনৈক সাহাবী জবাব দিলেন, সে এভাবেই হজে যাবে বলে মানত করেছে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র কী প্রয়োজন পড়েছে লোকটিকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার? এরপর তিনি স. লোকটিকে তার বাহনোপরি আরোহণ করতে নির্দেশ দিলেন। বোখারী, মুসলিম। জমহুর (নিখিল আলেম সমাজ) বলেন হজরত উকবা ইবনে আমেরের হাদিসটি সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, যার শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে— রসুল স. তখন তাকে যানবাহনে আরোহণ করে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন এবং একটি কোরবানী দিতে বললেন।

'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে হজরত জায়েদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উকবা ইবনে আমেরের ভগ্নি পায়ে হেঁটে হজগমনের মানত করলো। কিন্তু এরকম সামর্থ্য তার ছিলো না। রসুল স. তা জানতে পেরে হজরত উকবাকে বললেন, তোমার ভগ্নির এরকম আমলের পরওয়া আল্লাহ্ করেন না। সুতরাং তাকে তার বাহনে চড়ে হজে যেতে বলো। আর এর জন্য তাকে কোরবানী দিতে বোলো একটি উট। হাদিসটি সর্বোন্নত সূত্রে হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণনা করেছেন তাহাবীও। এ সকল উদ্ধৃতি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলো ছিলো সংক্ষিপ্ত। তাই সেগুলোতে উট কোরবানীর কথা আসেনি। আর অন্যদের দ্বারা বর্ণিত হাদিসগুলো বিস্তারিত বলেই সেগুলোতে উল্লেখ এসেছে কোরবানীর এবং কোরবানী করতে হবে উট। বিশুদ্ধসূত্রপরম্পরায় আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবার পথে গমন করার মানত করে, তার পায়ে হেঁটে কাবাভিমুখে যাত্রা করা উচিত। তবে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে যানবাহনে চড়তে পারবে এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে কোরবানী দিতে হবে একটি উট। এরকম মন্তব্য এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং হাসান বসরী থেকেও।

মাসআলা ঃ আনুগত্যের পর্যায়ভূত নয়, এরকম সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ কর্মের মানত যদি কেউ করে, তবে তার মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, তার এরকম মানত সঠিক হবে না। ইমামশ্রেষ্ঠ বলেন, এমতাবস্থায় মানত হয়ে যাবে পণ্ড। নিখিল আলেম সমাজ বলেন, এমতাবস্থায় মানত সাব্যস্ত হবে না বটে, কিন্তু তার কথা বৃথাও যাবে না। তাই এমতোক্ষেত্রে সুস্থ জ্ঞানসম্পন্নদের কথাকে পণ্ড হওয়া থেকে সংরক্ষণ করতে হবে, কেননা মানতের নেপথ্যে থাকে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এর সঙ্গে উচ্চারিত হয় আল্লাহ্র নামও। তাই বক্তব্যটি শব্দগতভাবে শপথের পর্যায়ে পড়ে। অর্থগতভাবেও। কারণ যে বস্তু মানতকে অবধারিত করেছে, তার বিপরীত বস্তুকে নির্ধারণ করা হয়েছে হারাম। একারণেই ওলামা সমাজ বলেন, এধরনের শপথ ভঙ্গ করা এবং

পাপযুক্ত মানতের ক্ষেত্রের শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব। তবে সিদ্ধ কর্মের মানতের ক্ষেত্রে বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন, এমতাবস্থায় হয় সে তার মানত পূরা করবে, না হয় প্রায়শ্চিত্ত করবে শপথভঙ্গের মতো। তাঁদের এমতো অভিমতের পরিপোষকতায় রয়েছে বহুসংখ্যক হাদিস। তন্মধ্যে একটি এরকম— হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, মানতের প্রায়শ্চিত্ত শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের মতোই।

সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কোনো মানত সিদ্ধ নয়। এরকম মানতের কাফ্‌ফারা শপথের কাফ্‌ফারার অনুরূপ। নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী। হাদিসটির মূল বর্ণনাকারী মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানযালী। তিনি আবার বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী নন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, অন্য পদ্ধতিতেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, যার সূত্রপরম্পরা বিশুদ্ধ, তবে তা রুগ্নদশাসম্পন্ন (মা'লুল)। ইমাম আহমদ, সুনান রচয়িতাবর্গ, বায়হাকী, জুহ্‌রীর মাধ্যমে আবু সালমা সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সূত্রপরম্পরাটি বিকর্তিত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু সালমার হাদিস শোনার বিষয়টি প্রামাণ্য নয়। সুনান রচয়িতাগণ জননী আয়েশা থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সূত্রসংযুক্ত বর্ণনাকারী সুলায়মান ইবনে আরকাম পরিত্যক্ত। জননী আয়েশা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনীও, যেখানে বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাপূর্ণ মানত নিজের উপরে অবধারিত করে নেয়, তার প্রায়শ্চিত্ত শপথের প্রায়শ্চিত্ত। হাদিসটির সূত্র প্রবাহভূত গালিব ইবনে আবদুল্লাহ্ পরিত্যাজ্য। তবে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কুরাইবের মাধ্যমে আবু দাউদ যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার সূত্রপরম্পরা আবার উত্তম পর্যায়ের। কিন্তু ইমাম নববী লিখেছেন, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধভাবাপন্ন মানত পালনীয় নয়। তার প্রায়শ্চিত্ত শপথের প্রায়শ্চিত্তের মতো। হাদিসবেত্তাগণের ঐকমত্য এই যে, বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, তাহাবী হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এরকম বলেছেন আলী ইবনে সাকানও। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নির্দিষ্ট মানতের কাফ্‌ফারা শপথের কাফ্‌ফারার মতো। পাপযুক্ত মানতের বিধানও একই। আর কেউ যদি এমন মানত করে, যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই। তার কাফ্‌ফারাও শপথের কাফ্‌ফারার মতো। কেউ সাধ্যায়ত্ত মানত করলে, তা যেনো পূরণ করে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত ছাবেত ইবনে জুহাক বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে উট জবাই করার মানত করলো। রসুল স. একথা জানতে পেরে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, অজ্ঞতার যুগে কি সেখানে কোনো পূজাপার্বন হতো? লোকেরা বললো, না। রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, তখন সেখানে কি কোনো প্রমোদসর্বস্ব মেলা বসতো? লোকেরা বললো, না। তিনি স. বললেন, ঠিক

আছে, তুমি তোমার মানত পুরা করো। আবু দাউদ। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ বিশুদ্ধ। আমর ইবনে হজরত শোয়াইব তাঁর পিতা ও পিতামহ থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা। এতে করে বুঝা যায়, আনুগত্য অথবা অনানুগত্য কোনো প্রকৃতিরই নয়, এরকম মানত করা হলে তা পূরণ করা সিদ্ধ। আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স.কে বললো, আমি মানত করেছিলাম, এখানে আপনার শুভাগমন ঘটলে আমি আপনার সামনে দফ বাজাবো। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, বাজাও। সম্ভবত ঘটনাটি ছিলো দফ বাজানো নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের।

শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানতটি হয়ে যায় অনিবার্য মানত। তখন তার বিধানও হয় অবশ্যপূরণীয় মানতের মতো। ইমাম শ্রেষ্ঠ কর্তৃক সংকলিত 'জাহিরুর রওয়ায়েত' গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ। ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমতও এরকম। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। অপর বর্ণনানুসারে আবার এর বিপরীত। যেমন তিনি বলেছেন, যদি কেউ তার মানতে এই শর্তটি যুক্ত করে যে, সে তার সমুদয় সম্পদ দান করবে, তবে তাকে দান করতে হবে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। এছাড়া অন্যান্য সকলক্ষেত্রে যা মানত করা হয়েছে, তা পূরণ করতে হবে হুবহু।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমামশ্রেষ্ঠ তাঁর বর্ণিত অভিমতটি পরে নিজেই পরিত্যাগ করেছেন। উপরন্তু বলেছেন, শর্তযুক্ত মানত পূরণ করতে পারলে তো ভালোই, অন্যথায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে শপথের প্রায়শ্চিত্তের মতো। ইমাম মোহাম্মদও এরকম বলেন। হেদায়া রচয়িতা ও অন্যান্য হানাফী তাত্ত্বিকগণ বলেন, ইমামশ্রেষ্ঠের অভিমতে শপথের প্রায়শ্চিত্ত ওইরূপ শর্তযুক্ত মানতের জন্য যথেষ্ট হবে, যখন কাম্য থাকবে না শর্তের উপস্থিতি। যেমন কেউ বললো, আমি যদি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি, অথবা অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলি, কিংবা অমুক কাজ করি, তাহলে আমার উপরে একটি হজ, অথবা এক বৎসরের রোজা অবধারিত। এমতাবস্থায় মানতকারীর নিকট শর্তগুলো কাম্য নয়। আর যদি শর্তসমূহ মানতকারীর কাম্য হয় এবং সেগুলো উপস্থিতও হয়ে যায়, তাহলে মানত পূরণ করা তার জন্য হবে আবশ্যিক। যেমন কেউ বললো, অমুক নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এসে পড়ে, কিংবা আমার অমুক শত্রু যদি বিনাশ হয়, অথবা আমার অমুক কর্ম যদি সিদ্ধ হয়, বা আমার স্ত্রী যদি একটি পুত্র সন্তানের জননী হয়, তবে আমার উপরে অমুক বিষয় অবধারিত। এমতোক্ষেত্রে যেমন মানত করা হয়েছে, তেমনই পূরণ করতে হবে। এ ধরনের মানতকে বলে, মানতে তাবাররু। এমতো বিস্তৃত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী। অবশ্য ইমাম শাফেয়ীর তৃতীয় অভিমতটি ইমাম মোহাম্মদের অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। অভিমতটি হচ্ছে, হজের মানতে শপথের প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত, এমতাবস্থায় মানত পূরণ করা সিদ্ধ নয়।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, দুজন আনসারী ভ্রাতা ঘটনাক্রমে কিছু অংশীদারিত্বের সম্পদের মালিক হলো। তারা একে অপরকে বললো, তুমিই বণ্টন করো। একজন হঠাৎ বললো, তুমি যদি আর একবার আমাকে বণ্টনের কথা বলো, তবে আমি বলবো, আমার সকল অংশ ব্যয়িত হবে কাবাগৃহের উন্নয়নমূলক কার্যে। এরপর থেকে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেলো তাদের। বিষয়টি হজরত ওমরের কর্ণগোচর হলো। তিনি বললেন, তোমার সম্পদের কোনো প্রয়োজন কাবাগৃহের নেই। তোমরা বরং তোমাদের কৃত শপথের প্রায়শ্চিত্ত করো। পরস্পরের মধ্যে বাক্য বিনিময় করো। আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের উপরে শপথের কোনো দায়িত্ব বর্তাবে না, আবার মানতেরও কোনো দায় আসবে না, যদি তোমরা মানত করো আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার, এমন বিষয়ের, যা তোমার আওতাবহির্ভূত।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সাধ্যাতীত মানত করে তবে তার জন্য তার প্রায়শ্চিত্ত করা সিদ্ধ। ইমামশ্রেষ্ঠ বলেন, এমতাবস্থায় শুধু ক্ষমাপ্রার্থনা করলেই চলবে। আমাদের জন্য দলিল ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার সাধ্যবহির্ভূত মানত করে, তার কাফ্‌ফারা শপথের কাফ্‌ফারার মতো। রসুল স. হজরত উকবা ইবনে আমেরকে বলেছিলেন, তোমার বোনের পায়ে হেঁটে চলার পরিশ্রান্তির কোনো প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই। তাকে যানবাহনে চড়ে হজে যেতে বলো এবং আদায় করতে বলো কসমের কাফ্‌ফারার মতো কাফ্‌ফারা। আবু দাউদ। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, আমার সহোদরা খালি মাথায়, খালি পায়ে পদব্রজে হজ করার মানত করেছিলো। রসুল স. একথা জানতে পেরে বলেছিলেন, তোমার বোনকে বলে দাও, সে যেনো তার মস্তকে ওড়না জড়িয়ে নেয় এবং যাত্রা করে বাহনে আরোহণ করে এবং তিন দিন রোজা পালন করে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী ও তাহাবী। হাদিসগুলোর বর্ণনাবৈষম্যের সমাধান করা যেতে পারে এই বলে যে, সম্ভবত রসুল স. তাঁকে কাফ্‌ফারা দিতে বলেছিলেন তখন, যখন তিনি স. জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি মানত পূরণ করতে অক্ষম। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

'ওয়া ইয়াখাফূনা ইয়াওমান' অর্থ এবং সেই দিনের ভয় করে। অর্থাৎ ওই পুণ্যবানগণের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, তারা ভয় করে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে।

'কানা শার্‌রুহূ মুসতাত্বীরা' অর্থ— সেই দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। এখানে 'শার' অর্থ বিপত্তি, অনভিপ্রেত বিষয়, যাকে এড়িয়ে চলা হয়। আর 'মুসতাত্বীর' অর্থ ব্যাপক, সুদূর প্রসারিত। যেমন বলা হয় 'ইস্‌তাত্বরল হাকীক্ব' (বিস্তৃত হয়েছে আগুন) 'ইসতাত্বরল ফাজ্বরু' (প্রসারিত হয়েছে উষালোক)। মুকাতিল বলেছেন, মহাপ্রলয়ের প্রভাব আকাশে ছড়িয়ে পড়লে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে আকাশসমূহ, খসে পড়বে নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্র-সূর্য হয়ে পড়বে নিষ্প্রভ। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে ফেরেশতামণ্ডলী।

আর যখন তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে, তখন পাহাড়-পর্বত শূন্যে ভেসে বেড়াতে থাকবে ধূলিকণার মতো হয়ে, মহাসমূদ্রের পানি হয়ে যাবে অগ্নিময়। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে পুণ্যবান বিশ্বাসীগণের দু'টি বিশেষ গুণের কথা— কর্তব্যপালন ও পরকালভীতি।

সূরা দাহ্র ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠

r আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে,

r এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।

r 'আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর ওই সকল পুণ্যবানেরা আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাণীদের প্রতিও অত্যন্ত মমতাপরবশ। তাই তারা পানাহারের প্রয়োজন ও আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্নদান করে অন্নহীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে। এরকম করে তারা কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়।

এখানে 'আসীরা' অর্থ বন্দী। ইবনে জুরাইজের উক্তি উল্লেখ করে ইবনে মুনজির বলেছেন, রসুল স. কোনো মুসলমানকে বন্দী করতেন না। তাই এখানকার 'বন্দীদেরকে আহার্য দান করে' কথাটির অর্থ হবে— আহার করায় পৌত্তলিক বন্দীদেরকে, যারা মাঝে মাঝে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসতো। রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে ওই সকল বন্দীর সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করার নির্দেশ দিতেন। এরকম কথা এসেছে কাতাদার বিবরণ থেকেও। তবে মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়েরের ব্যাখ্যায় এসেছে 'আসীরান' অর্থ মুসলিম বন্দী। কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিক স্পষ্ট। কারো কারো মতে এখানে 'আসীর' বলে বুঝানো হয়েছে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নারী জাতিকে। যেহেতু রসুল স. বলেছেন, দু'টি দুর্বল জাতির ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কোরো— অধীনস্থ দাস-দাসী এবং নিরীহ নারী।

আবু আমর বর্ণনা করেছেন, জননী উম্মে সালমা আজ্ঞা করেছেন, নামাজ পাঠকালে এবং অধিকৃত দাস-দাসীদের আচরণের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্কে

বিশেষভাবে ভয় কোরো। খতীব। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী আজ্ঞা করেছেন, অধিকৃত গোলাম-বাঁদীর বিষয়ে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রমণীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলো, কেননা তারা তোমাদের হাতে বন্দী।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জনৈক আনসার সাহাবীকে লক্ষ্য করে। তিনি একই দিনে পানাহার করিয়েছিলেন একজন অভাবগ্রস্ত, একজন পিতৃ-মাতৃহীন ও একজন বন্দীকে।

মুজাহিদ ও আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আলী ইবনে আবু তালেব সম্পর্কে। তিনি একদিন এক ইহুদীর বাড়িতে শ্রম দিয়ে যে পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন, তার এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করে তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য আহার্য প্রস্তুত করালেন। এমন সময় জনৈক অভাবগ্রস্ত এসে অন্নপ্রার্থনা করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে প্রস্তুতকৃত আহার্য দিয়ে দিলেন। তারপর আহার্যের ব্যবস্থা করালেন আর এক তৃতীয়াংশ খরচ করে। তখন এলো একজন পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক। তিনি প্রস্তুতকৃত আহার্য তাকেই দিয়ে দিলেন। অবশেষে শেষ তৃতীয়াংশ দিয়ে আহার্য বানানোর পর দেখলেন, একজন পৌত্তলিক বন্দী ক্ষুধায় কাতর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওই আহার্য দিয়ে দিলেন তাকে। এরপর তিনি সেদিন উপোস করলেন পরিবারবর্গসহ।

ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার হাসান-হোসাইন ভ্রাতৃদ্বয় অসুস্থ হয়ে পড়লো। রসুল স. তাঁর প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে দেখতে গেলেন। আলীকে বললেন, আবু হাসান! তোমরা যদি এদের রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে মানত করো, তবে উত্তম হয়। একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে রোজার মানত করলেন, আলী, ফাতেমা এবং তাদের দাসী কুজ্জা। তাঁরা উল্লেখ করলেন, পর পর তিনদিন রোজা রাখবেন তাঁরা। সে সময় আলীর গৃহে খাবার ছিলো না। তাই তিনি খায়বরবাসী এক ইহুদীর কাছ থেকে কর্জ হিসেবে গ্রহণ করলেন প্রায় বারো সের পরিমাণ আটা। রোজা শুরু করলেন পরদিন থেকে। প্রথম দিনের রোজা শেষে তাঁরা গৃহে প্রস্তুতকৃত কয়েকটি রুটি দিয়ে ইফতারের আয়োজন করলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক অভাবী লোক। খাদ্যপ্রার্থনা করলো সে। তাঁরা রুটিগুলো তাঁকেই দিয়ে দিলেন। রোজা ভঙ্গ করলেন কেবল পানি পান করে। অভুক্ত অবস্থাতেই শুরু হলো তাদের দ্বিতীয় দিনের রোজা। সেদিনও ইফতারের সময় একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। হঠাৎ এসে খেতে চাইলো এক অনাথ বালক। প্রস্তুতকৃত রুটি দেওয়া হলো তাকেই। তৃতীয় দিনের রোজাও শুরু হলো খালি পেটে। কিন্তু সেদিনও রোজা শেষে তাঁরা প্রস্তুতকৃত রুটি খেয়ে রোজা ভঙ্গ করতে পারলেন না। সহসা হাজির হলো একজন অন্নপ্রার্থী। তাকে দিয়ে দিতে হলো রুটিগুলো। তৃতীয় রাতও কেটে গেলো নিরাহারে। তখন

হজরত জিবরাইল রসুল স. সকাশে আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! আল্লাহ্ আপনার কন্যা-জামাতার পরিবারের প্রতি পরিতুষ্ট হয়েছেন। প্রেরণ করেছেন শুভবারতা। এরপর তিনি পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত। হাকেম ও তিরমিজি বলেছেন, নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউ এরকম ঘটনা বিশ্বাস করবে না। ইবনে জাওজী ঘটনাটি বিবৃত করেছেন তাঁর 'মাওজুয়াত' গ্রন্থে এবং বলেছেন, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে স্বকপোলকল্পিত। কেননা আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় এবং হজরত আলী ও হজরত ফাতেমার বিয়ে হয়েছিলো রসুল স. এর হিজরতের দু'বছর পর মদীনায়।

আমি বলি, মুকাতিল ও মুজাহিদের বর্ণনাকেও এরকম আপত্তি-বানে বিদ্ধ করা যেতে পারে। আয়াতখানি যদি মক্কী হয়, তবে কোনো আনসারীকে লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে কীভাবে? আবার হজরত আলী ইহুদীর বাড়িতে কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কথাটি যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বলতে হয় আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। কেননা মক্কায় কোনো ইহুদী বসতি ছিলো না। কিন্তু আয়াতখানির বিষয়বস্তুর দাবি অনুসারে একথা বলতে হয় যে, আয়াতখানি মদীনায় অবতীর্ণ। কেননা মক্কায় কোনো বন্দীর অস্তিত্ব ছিলো না। জেহাদের সূত্রপাত হয় পরে, মদীনায়। আর তারপর থেকেই বিধর্মীরা মুসলমানদের হাতে বন্দী হতে থাকে। সুতরাং এরকম বলাই সঙ্গত যে, আয়াতখানির কিছু অংশ অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায়। আর যদি সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে বলতে হয়, এখানে বিঘোষিত হয়েছে ভবিতব্য। অর্থাৎ হিজরতের পর মদীনায় গিয়ে মুসলমানেরা যে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং বলে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি'। এখানকার 'নুত্বয়িমুকুম' (আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি) কথাটি আয়াতের 'আহার্যদান করে' কথাটির অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ তারা এরকম বলতো, কিংবা এটা ছিলো তাদের ভাবগত অভিব্যক্তি। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তাঁরা একথা মুখে উচ্চারণ করতেন না। এটা ছিলো তাঁদের মনের কথা, যা আল্লাহ্ জানতেন এবং তাঁর জানা কথাটিই তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে। আর 'ওয়াজহুন' কথাটি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে। এভাবে এর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমাদের এমতো কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র পরিতোষ অর্জন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না'। একথার অর্থ— আমাদের এমতো দানের কোনো প্রকার প্রতিদান আমরা তোমাদের নিকট থেকে চাই না— না দৈহিক, না আর্থিক। আর 'ওয়ালা শুকূরা' অর্থ এবং কৃতজ্ঞতাও নয়। অর্থাৎ এজন্য আমরা তোমাদের কৃতজ্ঞতাপ্রত্যাশীও নই। 'শাকুর' 'দাখুল' 'জারুহ' 'ক্বুবুল' এসকল শব্দ ধাতুমূল। এক বর্ণনায় এসেছে, জননী

আয়েশা কোনো বাহককে দিয়ে কারো গৃহে সদকা প্রেরণের পর তার অপেক্ষায় থাকতেন। সে ফিরে এলে বলতেন, গৃহকর্ত্রী কী বললো? বাহক যদি বলতো, তিনি আপনার জন্য দোয়া করেছেন। একথাও শোনার সাথে সাথে তিনিও ওই গৃহকর্ত্রীর জন্য দোয়া করতেন, যাতে করে তার দান কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অবশেষ থাকে।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিবসের'। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে অভাবী, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দানের আর একটি কারণ। সেটি হচ্ছে— আল্লাহ্‌র ভয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা অন্নদান করি কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ লাভের অভিলাষে এবং সেই প্রভুপালকের ভয়ে, যিনি নিশ্চিত অবতারণা ঘটাবেন মহাভীতিপ্রদ মহাপ্রলয় দিবসের। এছাড়া অন্য কিছু আমরা চাই-ই না— না কৃতিত্ব, না কৃতজ্ঞতা, না অন্য কোনো প্রকারের প্রতিদান।

'ইয়াওমান আ'বূসান ক্বমত্বরীরা' অর্থ এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। 'আ'বূস' অর্থ ভীতিপ্রদ, ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত। পদটি এখানে দিবসের বিশেষণ এবং রূপকার্থক। যেমন বলা হয় 'নাহারুহু সাওমুন' (তার দিবস রোজাদার)। দিবস তো কখনো রোজাদার হয় না। তাই কথাটির অর্থ হবে— সে দিবসে রোজা রেখেছে। অনুরূপ এখানে দিনের ভীতিপ্রদ হওয়ার অর্থ সেদিন মানুষ ভয়ার্ত হয়ে পড়বে। 'ক্বমত্বরীর' অর্থ ভয়ংকর। কালাবী এর অর্থ করেছেন— ভীষণ ভয়াবহ। আখফাশ বলেছেন, 'ক্বমত্বরীর' অর্থ সুদীর্ঘ ভয়াবহ দিবস। 'কামুস' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ক্বমত্বরীর' অর্থ ভয়াবহ, ভয়ংকর। 'ইক্বমাত্বর্‌রা' অর্থ কঠিনতম হয়ে যাওয়া। 'ইক্বমাত্বররা নাফসুহু' অর্থ সে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তের দিকে উন্নীত হচ্ছে।

সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত **১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯**

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ﴿۱۱﴾ وَ
جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ﴿۱۲﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى
الْاَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ﴿۱۳﴾ وَ دَانِيَةً
عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿۱۴﴾ وَ يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿۱۵﴾
قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿۱۶﴾ وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا
كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿۱۷﴾ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿۱۸﴾ وَ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

q পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ,

q আর তাহাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

q সেথায় তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করিবে না।

q সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাহাদের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

q তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে—

q রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

q সেথায় তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া ইহবে যান্জাবীল মিশ্রিত পানীয়,

q জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যাহার নাম সালসাবীল।

q তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চিরকিশোরগণ, যখন তুমি উহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে উহারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা,

---

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পুণ্যবান বিশ্বাসীরা যেহেতু আল্লাহ্ ও মহাপ্রলয় দিবসকে ভয় করে, সেহেতু তিনি তাদেরকে তখন সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে তখন দান করবেন সজীবতা ও শান্তি। এখানকার 'ফা ওয়াক্বাহুমুল্লহ' (আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন) কথাটির 'ফা' হেতুপ্রকাশক। অর্থাৎ যেহেতু অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও পরকালের শাস্তির আতংক থাকার কারণে তারা সতত পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকে, সেহেতু আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেদিনের অকল্যাণ থেকে। 'শার' অর্থ এখানে অনিষ্ট, চক্রান্ত। আর 'ওয়া লাক্বক্বাহুম নাদ্বরাতাওঁ ওয়া সুরূরা' অর্থ এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে দুঃখ-ক্লেশে পতিত হয়ে অদৃষ্টের বিধানকে মেনে নিয়ে তারা যে ধৈর্য অবলম্বন করে, তার বিনিময় হিসেবেই আমি তাদেরকে দান করবো জান্নাত। সেখানে তাদেরকে পরাবো রেশমী বসন।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম, অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না'। এখানকার 'মুত্তাকিঈনা' পদটি অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ পুণ্যবানেরা জান্নাতে

সমাসীন হবে সুসজ্জিত পালংকে। 'আরাইক' অর্থ সুসজ্জিত, ঝালরযুক্ত মশারী বা পালংক। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— পর্দাবিবর্জিত উন্মুক্ত খাট। আর বায়হাকী বলেছেন, 'আরাইক' বলে ছাউনি ও পর্দাঘেরা খাটকে, উন্মুক্ত খাটকে নয়।

'কামুস' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, হিম-ঠাণ্ডা চাঁদকে বলে 'যামহারীর'। 'ইযমাহার্‌রাতিল কাওয়াকিব' অর্থ নক্ষত্রপুঞ্জ চমকাচ্ছে। 'যামহারী'র প্রকৃত অর্থ প্রচণ্ড শৈত্য। আর 'শামস্' অর্থ প্রখর দাবদাহ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বেহেশতের আবহাওয়া কখনোই চরমভাবাপন্ন হবে না। বরং সেখানে বিরাজ করবে চিরবসন্ত— না গ্রীষ্ম, না শীত।

ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'জাওয়ায়েদ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জান্নাত অত্যন্ত আরামদায়ক স্থান। সেখানে অত্যধিক উষ্ণতা যেমন নেই, তেমনি নেই অতিরিক্ত শীতলতা। অথবা 'যামহারীর' অর্থ এখানে— চন্দ্র, কিংবা জ্যোতির্ময় নক্ষত্র। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে জান্নাত স্বয়ং আলোকজ্জ্বল, তার প্রভুপালকের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান। তাকে আলোকিত করার জন্য চন্দ্র-সূর্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শুয়াইব ইবনে জাইহান বলেছেন, একদিন আমি অতি প্রত্যুষে আবুল আলিয়ার সঙ্গে বাইরে বের হলাম। তিনি বললেন, জান্নাত এরকম শুভ্র ও পরিমল আলোয় সতত উদ্ভাসিত। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'আর দীর্ঘায়িত ছায়া'।

আমি বলি, আবুল আলিয়ার বক্তব্যটি এমন নয় যে, ভোরের আলো অবিকল জান্নাতের আলোর মতো। এরকম হওয়া সম্ভবই নয়; কেননা ভোরের আলোর শুভ্রতা ও পরিমল ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া তার মধ্যে রাতের আবছা অন্ধকারও তো রয়েছে। বরং তাঁর এমতো তুলনার অর্থ হচ্ছে— ভোরের শুভ্রতা যেমন অনিঃশেষে এগিয়ে চলে নতুন নতুন দিগন্তে, তেমনি জান্নাতের জ্যোতিচ্ছটাও অন্তহীন, অনিঃশেষ, চিরভাস্বর।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'ওয়া দানিয়াতান আ'লাইহিম জিলালুহা' (সন্নিহিত বৃক্ষচ্ছায়া তাদের উপরে থাকবে)। এখানে 'দানিয়াতুন' অর্থ সন্নিহিত, নিকটবর্তী, সমীপবর্তী। এর যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'মুত্তাকিঈনা' কথাটির সঙ্গে; অথবা 'লা ইয়ারাওনা' এর সঙ্গে। অর্থাৎ তারা সন্নিকটেই দেখবে। কিংবা কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ১২ সংখ্যক আয়াতের জান্নাত এর সঙ্গে এবং ধরে নিতে হবে নামপদ এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক দান করবেন আর একটি জান্নাত, যার ছায়া হবে সন্নিকটবর্তী, যেনো তাদেরকে দান করা হবে দু'টি করে জান্নাত, যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সম্মুখীন হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত'। তবে এ ব্যাখ্যাটি অ-সবল। কেননা এতে করে এই ধারণাটি প্রশ্রয় পেতে পারে যে, আগের জান্নাতের ছায়া নিকটবর্তী হবে না, সেখানে সন্নিহিত বৃক্ষচ্ছায়া তাদের উপরে থাকবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া জুল্লিলাত ক্বতুফুহা তাজ্লীলা' (এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে)। এখানকার 'জুললিলাত' আগের বাক্যের 'জিলালুহা' এর অবস্থাপ্রকাশক। অথবা শব্দটি সম্পর্কযুক্ত হবে আগের বাক্যের 'দানিয়াতুন' এর সঙ্গে। 'ক্বতুফ' অর্থ ফল। অর্থাৎ জান্নাতের ফলমূল হবে সহজলভ্য। জান্নাতবাসীগণ যখন যেভাবে যতোটুকু ইচ্ছা সেগুলো চয়ন করতে পারবে। ভোগও করতে পারবে যথেচ্ছভাবে। হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের ইচ্ছা মতো সেখানকার বৃক্ষের ফল আহরণ ও আস্বাদন করতে পারবে— দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে। বায়হাকী, সাঈদ ইবনে মনসুর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্রে— (১৫) রজতশুভ্র স্ফটিকপাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে' (১৬)।

এখানকার 'আকওয়াব' অর্থ রৌপ্যপাত্র। 'কানাত' ক্রিয়াটিকে যদি এখানে অসমাপিকা ক্রিয়া ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এখানকার 'ক্বওয়ারীর' হবে অবস্থা প্রকাশক। অর্থাৎ পানপাত্র হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। আর যদি ক্রিয়াটিকে ধরা হয় সমাপিকা তাহলে 'ক্বওয়ারীর' হবে তার বিধেয়, অর্থাৎ ওই পানপাত্র হবে স্বচ্ছতায় ও ঔজ্জ্বল্যে স্ফটিকনির্মিত পেয়ালার মতো। আউফি সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই পানপাত্রগুলি হবে রৌপ্যনির্মিতই, কিন্তু তার স্বচ্ছতা হবে স্ফটিক সদৃশ। সাঈদ ইবনে মাসউদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর রূপা পিটিয়ে মাছির পাখার মতো হালকা পাত তৈরী করে তা দিয়ে যদি তোমরা পানপাত্র নির্মাণ করো, তবুও সে পাত্রের গাত্র ভেদ করে পানি দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু জান্নাতের পানপাত্রের শুভ্রতা হবে চাঁদির মতো এবং স্বচ্ছতা কাঁচের মতো।

'ক্বওয়ারীরা মিন ফিদ্বদ্বাতিন' অর্থ রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে। এই কথাটি আগের বাক্যের 'ক্বওয়ারীরা' এর অনুবর্তী। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতে এমন কিছু নেই, যার নমুনা পৃথিবীতে নেই। যেমন সেখানকার রৌপ্যপাত্র এখানকার রূপার পেয়ালার মতো। কালাবী বলেছেন, প্রত্যেক জাতির পানপাত্র সে দেশের মৃত্তিকানির্মিত। কিন্তু জান্নাতের মৃত্তিকা রৌপ্যের। তাই জান্নাতের পানপাত্রও রৌপ্যের।

'পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে' অর্থ জান্নাতের সেবকগণ ওই পানপাত্রগুলো এমনভাবে পানীয়পূর্ণ করবে যে, তা হবে সুপরিমিত, যা পান করলে জান্নাতবাসীরা হবে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত। পানীয়ের পরিমাণে থাকবে না বিন্দুবৎ ন্যূনতা, অথবা অতিরিক্ততা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ফারইয়াবি এরকমই বর্ণনা করেছেন। শায়েখ ইয়াকুব চরখী বলেছেন, সম্ভবত কথাটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পরিচিতি যে যতোটুকু লাভ করবে, সে অনুপাতে

জান্নাতবাসীরা পান করবে তাদের পানীয়। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে' অর্থ সেবকেরা পানপাত্রগুলো পূর্ণ করবে কানায় কানায়, কিন্তু তা উপচে পড়বে না। আর সেগুলোতে তারা এমনভাবেও পরিবেশন করবে না যে, দেখে মনে হবে পানীয় পড়ে রয়েছে প্রায় তলায়। প্রকৃত কথা হচ্ছে— জান্নাতবাসীরা মনে মনে একটা পরিমাণ স্থির করবে। ঠিক সেই পরিমাণেই পানীয় পরিবেশিত হবে তাদের পানপাত্রে। অথবা মর্মার্থ হবে— পুণ্যকর্মের তারতম্যানুসারে তখন ঘটবে তাদের প্রাপ্তি।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়'। এখানকার 'পান করতে দেওয়া হবে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'পরিবেশন করবে কিশোরগণ' বাক্যের সঙ্গে। আর 'কা'সান' অর্থ এখানে প্রকৃতই পানীয় বস্তু, রূপকার্থক নয়। আর এখানকার 'যানজাবীল মিশ্রিত পানি' বাক্যটি পান করতে দেওয়া হবে' বাক্যের বিশেষণ। আর 'যানজাবীল মিশ্রিত' অর্থ আদা মিশ্রিত। শুকনো আদা ভেজানো পানীয় আরববাসীগণের নিকট ছিলো খুবই প্রিয়। এখানে আল্লাহ্পাক তাদের ওই প্রিয় পানীয় প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআন মজীদে জান্নাতের যে সকল নেয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর নমুনা পৃথিবীতেও আছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'যানজাবীল' হচ্ছে বেহেশতের একটি ঝর্ণা, যার পানি হবে শুকনো আদা মিশ্রিত। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন জান্নাতীরা ঝরণার পানি পাবে মিশ্রিত হওয়ার আগে এবং সাধারণ জান্নাতীরা মিশ্রিত হওয়ার পরে।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক কখনো বলেছেন, কর্পুর মিশ্রিত পানির কথা। আবার কখনো বলেছেন, শুকনো আদা মিশ্রিত পানির কথা। সুতরাং বুঝতে হবে, বেহেশতে পানীয় পরিবেশন করা হবে বেহেশতবাসীদের রুচি ও স্বভাব অনুসারে। উষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন যারা, তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে শীতল পানীয়। কর্পুর মিশ্রিত পানীয়ও তাদের জন্য হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আর শিষ্টস্বভাবসম্পন্নদের জন্য অধিক আকর্ষণীয় মনে হবে তেজবর্ধক পানীয়। শুকনো আদামিশ্রিত পানীয়ই পছন্দ করবে তারা।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সালসাবীল'। একথার অর্থ— ওই আদা মিশ্রিত পানি হবে সালসাবীল নামক প্রস্রবণের।

'সালসাবীল' যদি বেহেশতের কোনো প্রস্রবণের নাম হয়, তবে এখানকার 'আইনান' পদটি হবে তার অনুবর্তী। অন্যথায় শব্দটি অনুবর্তী হবে আগের আয়াতের 'কা'সান' (পান করতে দেওয়া হবে) কথাটির এবং মনে করতে হবে সম্বন্ধ পদ এখানে রয়েছে উহ্য।

‘সালসাবীল’ বলে ওই প্রস্রবণকে, যার পানি অনায়াসে পান করা যায়। অর্থাৎ যার পানি সুপেয়। ‘সালসালা’ ‘সালসালান’ ‘সালসাবীলান’ শব্দত্রয় সমঅর্থসম্পন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, ‘সালসাবীল’ এর মূল রূপ ছিলো ‘সালসীল’। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে একটি অতিরিক্ত অক্ষর ‘বা’। ‘সালসাবীল’ নামকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে জুজায বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের ইচ্ছা মতো সেখানকার নদীগুলোকে প্রবাহিত করতে পারবে। নদীগুলোকে এরকম নাম দেওয়া হয়েছে সে কারণেই। মুকাতিল ও আবুল আলিয়া বলেছেন, সালসাবীল প্রবহমান থাকবে জান্নাতের পথে-ঘাটে, অলিন্দে-উদ্যানে, ঘর- দোরের আনাচে কানাচে। আরশের নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে জান্নাতে আদন ভেদ করে সেগুলো বিস্তৃত হয়ে পড়বে অন্যান্য জান্নাতে। সেগুলো প্রবাহিত হবে জান্নাতবাসীদের অভিপ্রায়ানুসারে। আর সেগুলোর পানিতে থাকবে কর্পুরের শীতলতা, শুকনো আদার আস্বাদ ও মেশকের সুরভি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরগণ, যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন মনে করবে, তারা যেনো বিক্ষিপ্ত মুক্তা’। ‘উইলদান’ অর্থ গিলমান, জান্নাতের সেবক, পরিচারক, অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অকালপ্রয়াত শিশুগণ। তাদেরকেই সেখানে নিযুক্ত করা হবে বেহেশতবাসীদের পরিচারকরূপে। বার্ধক্য এবং মৃত্যু তাদেরকে কখনোই স্পর্শ করবে না। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘মুখাল্লাদূন’। ওই গিলমানেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে জান্নাতের যত্রতত্র। তাদের ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য দেখে তাই তখন মনে হবে, তারা যেনো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। হান্নাদ, ইবনে মোবারক ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর একবার বললেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী বেহেশতবাসী হবে এক হাজার গিলমানের মালিক। আর ওই গিলমানদের প্রত্যেকের কর্ম ও দায়িত্ব হবে পৃথক পৃথক। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন আলোচ্য আয়াত।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতবাসীদের প্রত্যেকের নির্দেশ পালনের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকবে দশ হাজার পরিচারক। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন স্তরের বেহেশতবাসী যে হবে, তার সেবার উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যায় আগমন করবে পাঁচ হাজার সেবক। তাদের প্রত্যেকের হাতে এমন পান-ভোজনের আয়োজন থাকবে, যা থাকবে না অন্যের হাতে। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

ইকরামা সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি স. শুয়ে রয়েছেন একটি খেজুরপাতার পাটির উপর। তাঁর পবিত্র শরীরে অঙ্কিত রয়েছে খেজুর পাতার দাগ। তিনি এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললেন। রসুল স. বললেন, ওমর! কাঁদছো কেনো? তিনি বললেন, রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার রাজারা কতোইনা বিলাস

ব্যসনে দিন কাটায়। আর আপনি আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল হওয়া সত্ত্বেও শুয়ে রয়েছেন খেজুর পাতার পাটিতে। তিনি স. বললেন, ওমর! তুমি কি একথা জেনে প্রসন্ন হবে না যে, তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ইহকাল, আর পরকাল কেবল আমাদের? এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২

وَ اِذَا رَاَيۡتَ ثَمَّ رَاَيۡتَ نَعِيۡمًا وَّ مُلۡكًا كَبِيۡرًا ﴿۲۰﴾ عٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُنۡدُسٍ خُضۡرٌ وَّ اِسۡتَبۡرَقٌ ۫ وَّ حُلُّوۡۤا اَسَاوِرَ مِنۡ فِضَّةٍ ۚ وَ سَقٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُوۡرًا ﴿۲۱﴾ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمۡ جَزَآءً وَّ كَانَ سَعۡيُكُمۡ مَّشۡكُوۡرًا ﴿۲۲﴾

r তুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

r তাহাদের আবরণ হইবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

r অবশ্য, ইহাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনাকে এবং আপনার বিশ্বাসী উম্মতকে যখন বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, তখন দেখতে পাবেন, সেখানে রয়েছে অজস্র-অসংখ্য সুখোপকরণ এবং সে রাজ্যের পরিধি কতো বিশাল!

এখানকার 'রআয়তা' (দেখবে) ক্রিয়াটি সকর্মক ক্রিয়া, কিন্তু এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে। এর কর্মপদ এখানে রয়েছে উহ্য। 'ছাম্‌মা' অর্থ সেখানে। অর্থাৎ বেহেশতে। পদটি 'রআয়তা' পদের ক্রিয়ার স্থানাধার। 'নাঈমান' অর্থ সীমাহীন শান্তি। ইতোপূর্বে সর্বোন্নত সূত্রবিশিষ্ট হজরত ইবনে ওমরের একটি হাদিসে বলা হয়েছে, সর্বনিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতবাসী এক হাজার, অথবা দু'হাজার বৎসরের পথের সমদূরত্বে থেকেও দেখতে পাবে বাগ-বাগিচা, প্রাসাদ, সঙ্গিনী, সেবক-পরিচারক ও খাট-পালঙ্ককে। নিকট-দূরের সকল কিছুই তার দৃষ্টিতে থাকবে সমভাবে প্রতিভাসিত। আর বেহেশতকে এখানে 'মুলকান কাবীরা' (বিশাল রাজ্য) বলা হয়েছে একারণে যে, তার সীমানা হবে যেমন সুবিশাল, তেমনি সে রাজ্য হবে চিরন্তন। সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি সম্ভাষণ জানাতে থাকবে ফেরেশতারা। আর সেখানে তারা যা চাবে, তা-ই পাবে। সর্বোপরি পাবে তাদের মহাপ্রতাপশালী প্রভুপালনকর্তার আনুরূপ্যবিহীন দর্শন।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম'। এখানে 'ছিয়াব' (আবরণ) হচ্ছে উদ্দেশ্য, অথবা বিধেয়, কিংবা 'আ'লীয়াহুম' বাক্যের কর্তা। 'সুনদুস' অর্থ সূক্ষ্ম, মিহিন রেশমী বস্ত্র এবং 'ইস্‌তাব্‌রাক্ব' অর্থ স্থূল রেশম, ঘন বুননবিশিষ্ট পুরুষ্ট রেশমী চাদর। অথবা টেকসই জলজ রেশমী উত্তরীয়। কামুস।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! জান্নাতবাসীদের বস্ত্র কীরূপ হবে? সেগুলো কী বৃক্ষোদ্ভূত তন্তু দ্বারা নির্মিত হবে? তিনি স. বললেন, সেগুলো হবে জান্নাতেরই ফল, জান্নাতের বৃক্ষোদ্ভূত। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ, বায্‌যার ও বায়হাকী। বিশুদ্ধ সূত্র সহযোগে বায্‌যার, তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষে উৎপন্ন হবে রেশম। ওই রেশম দিয়েই পরিধেয় প্রস্তুত করা হবে জান্নাতবাসীদের। হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে পুরুষ পৃথিবীতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সে জান্নাতে রেশমী পরিধেয় পাবে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম, হাকেম এবং নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— যে ব্যক্তি এ জগতে মদ্যপান করেছে, সে আর সুরাপান করতে পারবে না ওই জগতে। যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানাহার করেছে, সেও সেখানে বঞ্চিত থাকবে সোনা-রূপার পাত্রে পরিবেশিত পানাহার থেকে। বোখারী ও মুসলিম হজরত আনাস ও হজরত যোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ওমরের অনুরূপ হাদিস। আবার এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও। তবে সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বলা হয়েছে— জান্নাতে প্রবেশ করলেও সে পরতে পারবে না রেশমী পোশাক। বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদও। হাদিসটির সংকলয়িতাদের মধ্যে আরো রয়েছেন নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অলংকৃত হবে রৌপ্যনির্মিত কংকনে'। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে ১৫ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে' কথাটির সঙ্গে। অথবা কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরগণ' বাক্যটির সঙ্গে। অথবা কথাটি এই আয়াতেরই 'তাদের আবরণ হবে' বাক্যটির অবস্থাপ্রকাশক। এখানে উহ্য রয়েছে একটি নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ক্বদ' (নিশ্চয়)। আরও উহ্য রয়েছে এখানকার 'আসাউইরা' শব্দের পূর্বে একটি যের প্রদানকারী অব্যয়ও। আর এখানকার 'মিন ফিদ্বদ্বাত' (রৌপ্যের) কথাটির 'মিন' এখানে সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে। আবু শায়েখ তাঁর 'আলউজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, একজন ফেরেশতা জান্নাতবাসীদের সৃষ্টির পূর্ব থেকে

এখন পর্যন্ত ক্রমাগত নির্মাণ করে যাচ্ছে তাদের অলংকার। মহা প্রলয়কাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে তার এমতো নির্মাণকর্ম। ওই অলংকারগুলোর কোনো একটিকে যদি পৃথিবীতে আনা হয় তবে তার তেজে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে সূর্যকরচ্ছটা।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীগণের হাতে অলংকার থাকবে তাদের ওজুর স্থান পর্যন্ত। নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত উকবা ইবনে আমের উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি তোমরা জান্নাতের রেশমী বসন ও কংকন পরতে চাও, তবে পৃথিবীতে ওগুলো ব্যবহার কোরো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়'। একথার অর্থ— যা পবিত্র ও অস্পর্শিত, ওইরূপ অভূতপূর্ব পানীয় আল্লাহ্ পান করাবেন জান্নাতের অধিবাসীদেরকে। ওই পানীয়ের নাম শারাবান ত্বহূরা। আবু কেলাবা ও ইব্রাহিম বলেছেন, জান্নাতের পানীয় জান্নাতবাসীদের শরীরাভ্যন্তরে কোনো বর্জ উৎপাদন করবে না। বরং তা কেবল প্রস্তুত করবে মেশক আম্বর সদৃশ সুরভিত স্বেদ। আর এমতো স্বেদনির্গমনের ফলেই সৃষ্টি হবে তাদের পানাহার-স্পৃহা।

মুকাতিল বলেছেন, জান্নাতের তোরণে বিদ্যমান থাকবে 'ত্বহুরা' নামক একটি পানির উৎস। ওই উৎসের পানি পান করবে যারা, আল্লাহ্পাক তাদের অন্তর থেকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিবেন হিংসা- দ্বেষ। বায়যাবী লিখেছেন, এ সকল কথার চেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে, সেখানকার শরাব হবে অমূল্য ও অতুলনীয় এক পানীয়, যা পরিবেশন করবেন স্বয়ং আল্লাহ্। ওই পানীয়ের নামই 'শারাবান ত্বহূরা'। ওই পানীয় পান করলে পানকারী চিরদিনের জন্য হয়ে যাবে অন্যের মোহ থেকে মুক্ত। কেবল আল্লাহ্ই হবেন তখন তার কামনা ও আরাধনা। তখনই সে লাভ করবে পরমতম সত্তার অতুল দর্শন। এই পর্যায়টি পুণ্যবানগণের বিনিময় প্রাপ্তির সর্বোচ্চ স্তর। আর প্রাথমিক স্তর সিদ্দীকগণের।

'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, কেউ কেউ বলেন, জান্নাতবাসীদেরকে পানীয় পরিবেশন করবে ফেরেশতারা। একসময় জান্নাতবাসীরা অভিমান করবে। বলবে, হে আল্লাহ্! এতোদিন ধরে আমরা অন্যের মাধ্যমে পানীয় লাভ করেছি। এখন কোনো মাধ্যম আমরা চাই না। আমরা এখন চাই সরাসরি। হঠাৎ দেখা যাবে নেপথ্য থেকে পানীয়পূর্ণ পানপাত্র এসে ঠেকেছে তাদের ওষ্ঠাধারে। এমতো বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীরা মনে মনে সুরা পানের আকাংখা করবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে এসে যাবে সুরার পেয়ালা। তারা তখন তা পান করে পরিতৃপ্ত হবে। মাওলানা ইয়াকুব চরখী বলেছেন, অগ্রগামী নৈকট্যভাজনগণের নিকটে কোনো মাধ্যম

ছাড়াই শরাবের জাম পৌঁছে যাবে আরশের নিম্নদেশ থেকে। সাধারণ পুণ্যবানগণের কাছে পৌঁছবে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। আর জাহান্নামের শাস্তিভোগের পর আল্লাহ্র কৃপায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের কাছে সুরা পরিবেশন করবে গিলমানেরা।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে সাধারণ পুণ্যবান (আবরার)গণের কথা। তাদেরকে পানীয় পরিবেশন করবে কখনো গিলমানেরা, কখনো ফেরেশতারা। আবার কখনো তারা পানীয় পাবে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতিরেকেই। আর নৈকট্যভাজনগণ (মুকাররাবীন) অধিকাংশ সময় পানীয় লাভ করবে বিনা মাধ্যমে, সরাসরি।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত'। একথার অর্থ— এতোক্ষণ ধরে যে সকল সুখোপকরণের বিবরণ দেওয়া হলো, সেগুলো তোমরা পাবে তোমাদের পুণ্যকর্মের বদৌলতে। কেননা তোমার শুভকর্মসমূহ আমার নিকটে হবে গ্রহণযোগ্য।

এখানে 'মাশকূরা' অর্থ স্বীকৃত, গ্রাহ্য, মনঃপুত, প্রশংসার্হ, প্রতিদান প্রাপ্তির উপযুক্ত। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি যেনো আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। ওই সকল পুণ্যবানেরা নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যেহেতু অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীর আহার যোগান এবং যেহেতু তারা এর গ্রহীতার নিকট কোনো প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতার অভিলাষী হন না, সেহেতু আল্লাহ্পাক তাদের প্রতি প্রকাশ করেছেন কৃতজ্ঞতা। অর্থাৎ তিনি তাঁদের এমতো বিশুদ্ধ পুণ্য প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আমি বলি, আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে পুরস্কৃত করবেন নিজে দয়াপরবশ হয়ে। নতুবা এমন পুণ্যকর্ম কোথায়, যার বদলে পুণ্যবানেরা জান্নাতপ্রাপ্তির দাবি জানাতে পারে।

সূরা দাহ্র ঃ আয়াত ২৩— ৩১

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ
هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ

تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾ وَ
مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾ ۖق
يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾ ع

q আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে।

q সুতরাং ধৈর্যের সহিত তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং উহাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তাহার আনুগত্য করিও না।

q এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকালে ও সন্ধ্যায়,

q এবং রাত্রির কিয়দংশে তাঁহার প্রতি সিজদাবনত হও আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

q উহারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

q আমি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদের পরিবর্তে উহাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিব।

q ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।

q তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

q তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমরা— উহাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সমগ্র কোরআন আমি একবারে অবতীর্ণ করি নাই। বরং অবতীর্ণ করেছি এর একটি একটি করে আয়াত, অথবা সুরা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। বৈয়াকরণগণের মতে বাক্যটি অত্যন্ত বেগবান। এর মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, ক্রমে ক্রমে কোরআন অবতীর্ণ করার মধ্যে রয়েছে সবিশেষ প্রজ্ঞা ও অতিসুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিদর্শন।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধৈর্যের সঙ্গে তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা করো'। এখানে 'ফাসবির' (ধৈর্যের সঙ্গে) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নিমিত্ত প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! পাপী ও পুণ্যবানদের শেষ পরিণতি কী হবে, সে কথা যখন আপনি জানতে পারলেন, সেই সঙ্গে বুঝলেন কী কারণে আমি তাদেরকে শায়েস্তা করতে বিলম্ব করছি, তখন আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দ্বারা সৃষ্ট অপমান-অত্যাচারের

ব্যাপারে কিছুকাল ধৈর্যধারণ করুন। তাদের ত্বরিৎ শাস্তি আর কামনা করবেন না। আর এর জন্য মনঃক্ষুণ্নও হবেন না। বরং আপনি সর্বাবস্থায় প্রতীক্ষা করতে থাকুন নতুন নতুন নির্দেশের। দেখুন, আপনার প্রতি কখন কী অবতীর্ণ হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ, অথবা কাফের, তার আনুগত্য কোরো না'। একথার অর্থ— ইসলামের পূর্ণ বিজয় বিলম্বিত হতে দেখে পাপিষ্ঠ, অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথামতো চলতেও চেষ্টা করবেন না। এখানে 'আছিমা' অর্থ ওই পাপিষ্ঠ, যে মানুষকে পাপকর্মের দিকে আহ্বান জানায়। আর 'কাফুর' অর্থ ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যে আহ্বান জানায় সত্যপ্রত্যাখ্যানের (কুফরীর) দিকে।

সংশয় ঃ আলোচ্য বাক্য দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, যে কোনো এক দলের আনুগত্য পরিহার করতে হবে— গোনাহগারের, অথবা কাফেরের। তাহলে কি এরকম বলতে পারা যাবে যে, তাদের যে কোনো একজনের আনুগত্য সিদ্ধ?

সংশয় অপনোদন ঃ এখানকার 'আছিমান' ও 'কাফূরান' শব্দ দু'টো অনির্দিষ্টবাচক, একটি না-সূচক নিষেধাজ্ঞার অধীন। নিয়ম হচ্ছে অনির্দিষ্টবাচক বিষয়াদি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হলে তা কার্যকর হয় সাধারণভাবে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, পাপকর্মে আহ্বান করুক, অথবা আহ্বান করুক কুফরী কর্মের প্রতি— কোনোটারই আনুগত্য করা যাবে না। কিন্তু এখানে 'আও' (অথবা) এর পরিবর্তে যদি ব্যবহৃত হতো 'ওয়াও' (এবং) তবে বক্তব্যটি দাঁড়াতো— ওই ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না, যে আহ্বান জানায় পাপ ও সত্যপ্রত্যাখ্যান উভয়ের প্রতি। এতে করে একথা পরিষ্কার বুঝা যেতো না যে, তার কোন কর্মের আনুগত্য করা যাবে না— পাপের, না সত্যপ্রত্যাখ্যানের।

আয়াতের দাবি ঃ আলোচ্য আয়াতের দাবিটি এরকম— যদি পাপ পথে আহ্বানকারী, অথবা অবিশ্বাসের দিকে আহ্বানকারী এমন কোনো কর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, যা পাপ-অবিশ্বাস কোনোটাই নয়, তবে তার আনুগত্য করা সিদ্ধ হবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'অথবা 'ব্যবহৃত হয়েছে 'এবং' অর্থে। আর এখানকার 'আছিম' ও 'কাফূর' উভয়টির যুগ্মোপলক্ষ— আবু জেহেল। ঘটনাটি ছিলো এরকম— সে একবার রসুল স. এর নামাজে বাধা সৃষ্টি করলো। বললো, এখন থেকে তোমাকে এবং তোমার অনুচরদেরকে নামাজ পড়তে দেখলে আমি তোমাদের গর্দান পদদলিত করবো। কাতাদা থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক, ইবনে মুনজির ও ইবনে জারীর।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'পাপিষ্ঠ' ও 'কাফের' বলে বুঝানো হয়েছে যথাক্রমে উতবা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে মুগীরাকে। তাঁরা দু'জন একবার রসুল স.কে বললো, মোহাম্মদ! তুমি যা করছো, তা-কি নারী ও সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে? উতবা বললো, যদি বলো, তাহলে আমার কন্যার সঙ্গে বিনা মোহরে আমি

তোমার বিয়ে দিয়ে দেই। ওলীদ বললো, আমি তোমাকে দিবো তোমার মনোমতো সম্পদ। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো সকালে ও সন্ধ্যায়'। এখানে 'জিকির' (স্মরণ) অর্থ নামাজ। ব্যষ্টি বলে এখানে রূপকার্থ নেওয়া হয়েছে সমষ্টির। শর্ত শুধু একটিই— অংশটিও যেনো হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন তাকবীরে তাহরীমা নামাজের অংশ, কিন্তু অপরিহার্য একটি অঙ্গ। অথবা বলা যেতে পারে, নামাজের প্রতিটি পালনীয় বিষয়ই জিকির। যেমন রসুল স. বলেছেন, নামাজে মানুষের কথার কোনো অংশ নেই। নামাজ কেবল তাকবীর, তাসবীহ্ ও কোরআন আবৃত্তি। মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

এখানে 'বুকরাতান' অর্থ সকালে দিবসের প্রথমভাগে। অর্থাৎ ফজরের নামাজ। আর 'আসীলা' অর্থ সন্ধ্যায়, দিবসের শেষভাগে। অর্থাৎ জোহর ও আসরের নামাজ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এবং রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সেজদাবনত হও, আর রাত্রির দীর্ঘসময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'। এখানে আবার 'সেজদা' অর্থ নামাজ। অর্থাৎ পূর্বের আয়াতে ফজর, জোহর ও আসরের কথা বলে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মাগরিব ও এশার নামাজের কথা। এভাবে দেওয়া হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠের নির্দেশ। আর রাতের নামাজ যেহেতু কষ্টসাধ্য, তাই 'মিনাল্ লাইল' (রাত্রির কিয়দংশে কথাটিকে এখানে বসানো হয়েছে 'ফাসজুদ্ লাহু' (সেজদাবনত হও) কথাটির পূর্বে। 'ফাসজুদ্' এর 'ফা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত। আর শর্তমূলক একটি পদ 'আম্মা' এখানে রয়েছে উহ্য। প্রকৃত বাক্য ছিলো যেনো 'ওয়া আম্মা মিনাল লাইলি ফাসজুদ্'। আবার 'তসবীহ্' (পবিত্রতা ও মহিমা) অর্থও এখানে নামাজ। আর 'ত্বউইলান' (দীর্ঘতর) পদটি একটি উহ্য নামপদের বিশেষণ। অর্থাৎ 'তাসবীহান ত্বউইলান' (প্রলম্বিত, দীর্ঘ তসবীহ)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রাতের নামাজ পাঠ করো অর্ধরাত্রি ব্যাপী, অথবা তার কিছু কম বেশী।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে'। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকদের কাছে পার্থিবতাই পরমার্থ। পরবর্তী পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যে কঠিন বিপদ রয়েছে, সে কথার পরওয়া তারা করেই না। এখানে 'ইয়াওমান ছাক্বীলা' অর্থ কঠিন দিবস। 'ছাক্বীলা' বলে কঠোর, দুঃসাধ্য কর্মকাণ্ডকে। কিন্তু এখানে দিবসকেই রূপকার্থে বলা হয়েছে কঠিন দিবস। অর্থাৎ ওই দিবসের সিদ্ধান্ত-মীমাংসা হবে অত্যন্ত কঠিন, অতীব গুরুভার।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো'। এখানে 'বাদ্দাল্না' (আমি পরিবর্তন করবো) পদটি সাধারণ কর্মপদ, যা বক্তব্যকে করেছে বেগবান। আর 'ইজা শী'না' (আমি যখন ইচ্ছা করবো) শর্তযুক্ত বাক্য, যোজিত হয়েছে 'শাদাদ্না'র (আমি সুদৃঢ় করেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে এখানকার পুরো বাক্যটি হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি এক কঠোর ভর্ৎসনা। কেননা তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাশির প্রতি প্রকাশ করেছে চরম অকৃতজ্ঞতা। আর সর্বোত্তম অনুগ্রহ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অস্তিত্ব সৃষ্টির। কারণ অস্তিত্ব প্রাপ্তিই সকল অনুগ্রহের মূল। এভাবে এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন যে, সেদিন তো বেশী দূরে নয়, যেদিন তাদেরকে অবনমিত করা হবে শোচনীয়ভাবে। অতএব হে আমার রসুল! আপনি এ ব্যাপারে বিচলিত হবেন না মোটেও। বলা বাহুল্য, সেরকমই ঘটেছিলো। বদর যুদ্ধে তারা এমনভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলো যে, আর কখনো উত্থানের মুখ দেখেনি। আর এখানকার 'ইজা' (যখন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন' (যদি) অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীকে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক এরকম ইচ্ছা আর করেননি। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে কেবল প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর চির অপ্রতিরোধ্য ও সততস্বাধীন 'অভিপ্রায়' গুণের কথা।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এটা এক উপদেশ, অতএব, যার ইচ্ছা, সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক'। একথার অর্থ— এই সুরা, অথবা আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ হচ্ছে অমূল্য উপদেশবাণী, যা প্রদর্শন করে আল্লাহ্র পরিতোষের পথ। কাজেই যে আল্লাহ্র পরিতোষ কামনা করে, হতে চায় তাঁর নৈকট্যভাজন, তার কর্তব্য হবে, এই উপদেশাবলীর যথা অনুসরণ করা, বিশুদ্ধচিত্তে যথা আনুগত্য করা আল্লাহ্র এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! অথবা হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! জেনে রাখো, তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখনোই বাস্তবরূপ লাভ করবে না, যতোক্ষণ না তা সমর্থনপুষ্ট হয় আল্লাহ্র ইচ্ছার। সুতরাং আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে মান্য না করে শুভউপদেশাবলীর অনুসরণ অথবা অননুসরণ অসম্ভব।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল আদম সন্তানের হৃদয় একটি হৃদয়ের মতো আবদ্ধ রয়েছে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন হাতে। তিনি হৃদয়কে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বিবর্তন করেন। সুতরাং তোমরা

প্রার্থনা কোরো এভাবে— হে অন্তরসমূহের আবর্তন-বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে কেবল তোমা-অভিমুখী করে দাও। মুসলিম। সুতরাং একথা আর না মেনে উপায় নেই যে, আল্লাহ্ যাদেরকে হেদায়েত করতে চান, তারাই সৎপথ পায়, আর যাদেরকে করতে চান গোমরাহ, তারা অবশ্যই হয় পথভ্রষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— কে হেদায়েত পাবে, না পাবে তা তিনি আগে থেকেই জানেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। মানুষের পথপ্রাপ্তি ও পথবিচ্যুতির বিষয়টিও তাই সম্পন্ন হয় তাঁর আনুরূপ্যবিহীন ও অবোধ্য প্রজ্ঞার চাহিদা অনুসারে। পথপ্রাপ্তদের সূচনাস্থল তাঁর 'আলহাদী' (পথপ্রদর্শনকারী) গুণবাচক নাম এবং পথভ্রষ্টদের সূচনাস্থল তাঁরই গুণবাচক নাম 'আল মুদ্বিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী)।

শেষোক্ত আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালেমেরা— তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি'। একথার অর্থ— তিনি যাকে চান, তাকে করেন জান্নাতবাসীদের দলভূত। ফলে সে পায় ইমান, হেদায়েত, পুণ্য কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তিনি তো মর্মন্তুদ দোজখাগ্নির ব্যবস্থা করে রেখেছেনই, অনন্তকাল ধরে তা তাদেরকে ভোগ করতে হবেই। এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) অর্থ জান্নাত। কেননা জান্নাতই হচ্ছে অনন্তকালীন অনুগ্রহের আলয়।

সূরা মুরসালাত

২ রুকু এবং ৫০ আয়াতবিশিষ্ট এই পবিত্র সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ১—১৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ﴿۱﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ﴿۲﴾ وَّ النّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ﴿۳﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ﴿۴﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۵﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ﴿۶﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۷﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ﴿۸﴾ وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۙ﴿۹﴾ وَ اِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ؕ﴿۱۱﴾ لِاَیِّ یَوْمٍ اُجِّلَتْ ؕ﴿۱۲﴾ لِیَوْمِ

الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾

- q শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
- q আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার,
- q শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর
- q আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,
- q এবং শপথ তাহাদের যাহারা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ—
- q ওযর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য
- q নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী।
- q যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে,
- q যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে
- q এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে
- q এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে,
- q এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন্ দিবসের জন্য?
- q বিচার দিবসের জন্য।
- q বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
- q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

মুকাতিল বলেছেন, এখানকার প্রথম পাঁচটি আয়াতে বর্ণিত বিষয়াবলী দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে ফেরেশতামণ্ডলীকে। যেমন প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াল মুরসালাতি উ'রফান'। এখানে 'মুরসালাত' অর্থ ওই সকল ফেরেশতা, যারা বহন করে আনে শরিয়তের বিধি-নিষেধসমূহ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে 'উ'রফান' পদটি হবে নৈমিত্তিক কর্মপদ। আবার হতে পারে পদটি অবস্থা প্রকাশক। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে 'অবিরত'। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'উ'রুফুল ফারাস' (অবিরত ঘোড়-দৌড়) থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শপথ ওই সকল ফেরেশতার! যাদেরকে বিধি-নিষেধসহ প্রেরণ করা হয় অবিরত। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাল আ'সিফাতি আ'সফান'। এর মর্মার্থ— তারা আদেশ পালনে বৈকাল (আসর) পর্যন্ত চলে। 'আসফুর রিয়াহ্' অর্থ ঝড়ের গতি। ৩ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়ান্ নাশিরাতি নাশরান'। মর্মার্থ— তারা এ পৃথিবীতে বিস্তার করে আল্লাহ্‌র বিধি বিধান। মানুষের মৃত হৃদয়গুলোকেও সঞ্জীবিত করে তারা। ৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাল ফারিক্বাতু ফারক্বান'। মর্মার্থ— তারা বিভেদ সৃষ্টি করে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে। আর ৫ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাল মুলক্বিয়াতি জিকরান' মর্মার্থ— তারা নবী-রসুলগণের হৃদয়ে প্রক্ষেপ করে প্রত্যাদেশাবলী। অথবা সকল বিশ্বাসীদের অন্তরে সম্পাত ঘটায় শুভ ও সুদৃঢ় প্রতীতীর, আল্লাহ্‌র স্মরণের।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এই সুরার প্রথম পাঁচ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে বায়ু সম্পর্কে। তাই প্রথম আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— ওই বায়ুর শপথ! যা প্রবাহিত হয় নিরবধি। কারো কারো মতে এখানকার 'উ'রফান' অর্থ অধিক। অর্থাৎ ওই বায়ু যা অধিক প্রবাহিত। দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ— ঝড়ের বেগে প্রবাহিত বায়ু। তৃতীয় আয়াতের অর্থ— মেঘমালা সঞ্চালনকারী বায়ু। চতুর্থ আয়াতের অর্থ— মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ু, অথবা বারিপাতের পর মেঘমালাকে বিক্ষিপ্তকারী বাতাস। আর পঞ্চম আয়াতের অর্থ— আল্লাহ্‌র স্মরণ উদ্রেককারী মলয়প্রবাহ। অর্থাৎ বাতাস-তাড়িত সঞ্চারমান মেঘমালার লীলারহস্য দেখে মনে হয় মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা আল্লাহ্‌র মহিমময়তার কথা। বারিবর্ষণরূপ অনুগ্রহ দর্শনে মনে উদয় হয় অনাবিল কৃতজ্ঞতার। এভাবে বায়ুপ্রবাহ হয় মানবমনের জিকিরের নিমিত্ত।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত পঞ্চকের মর্মার্থ হচ্ছে কোরআনের আয়াতসমূহ, যা সদুপদেশসম্ভাররূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে রসুল স. এর উপরে। আর এখানে 'আসিফাত' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ ও ধর্মসমূহের রহিত হওয়ার কথা, যেনো সেগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঝটিকা সঞ্চালনে। 'আন্‌নাশিরাত' বলে বুঝানো হয়েছে, হেদায়েতের মর্মবাণী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে। সবখানে। 'আলফারিক্বাত' বলে পার্থক্য করে দেওয়া হয়েছে সত্য ও অসত্যের মধ্যে। আর 'মুলক্বিয়াত' বলে আল্লাহ্‌র স্মরণকে উচ্চকিত করা হয়েছে মহাপৃথিবীতে।

আবার এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আয়াত পঞ্চকের উদ্দেশ্য নবী-রসুলগণ, যাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনার্থে। 'আল্‌আ'সিফাত' (প্রলয়ংকারী ঝটিকা) অর্থ তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের বিধানাবলী বাস্তবায়নের বিষয়ে ছিলেন অতিতৎপর। 'আন্‌নাশিরাত' (সঞ্চালনকারী) অর্থ তাঁরা ছিলেন পথপ্রদর্শন পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারণে সনিষ্ঠ। 'আল ফারিক্বাত' (বিচ্ছিন্নকারী) অর্থ হক ও বাতিলকে পৃথককারী। আর 'আল মুলক্বিয়াতি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে— তাঁরা আল্লাহ্‌র জিকিরকে তাঁদের আপন আপন উম্মতের মনে ও মুখে প্রতিষ্ঠিত করে দেন সুদৃঢ়ভাবে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'ওজর আপত্তি রহিত করণ ও সতর্ক করার জন্য'। এখানকার 'উজরান আও নুজরান' শব্দদু'টো সাকিনযুক্ত জাল সহযোগে ধাতুমূল। 'উজর' অর্থ ওজর-আপত্তি-অজুহাত। আর 'নুজর' অর্থ ভীতি প্রদর্শন, সতর্কীকরণ। পেশযুক্ত জাল সহযোগে শব্দদু'টো বহুবচন। অর্থাৎ 'আজীর' এবং 'নাজীর' এর বহুবচন যথাক্রমে 'উজুর' ও 'নুজুর'। ধাতুমূল হিসেবে শব্দদু'টোর অর্থ হবে যথাক্রমে— অজুহাত-আপত্তি উপস্থাপন করা এবং সতর্ক করা। আর 'আজীর' ও 'নাজীর' এর কর্তৃপদীয় অর্থ হবে— অজুহাত উত্থাপনকারী ও সতর্ককারী। শব্দদু'টোকে যদি ধাতুমূল ধরে নেওয়া হয়, তবে শব্দদু'টো হবে

পূর্বের আয়াতপঞ্চকের বিবরণ। এমতোক্ষেত্রে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বর্ণিত কর্মপঞ্চক সম্পন্ন হয় বিশ্বাসীগণের পাপস্খলনের অজুহাত হিসেবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ভীতিসঞ্চারকরূপে। যদি সেখানকার 'মুরসালাত' অর্থ হয় বায়ু, তবে অবিশ্বাসীদের ভীতির উপলক্ষ হবে এরকম— তারা বিশ্বাস করে বারিপাত নির্ভর করে নক্ষত্রের গতিবিধির উপর। তাদের এমতো অপবিশ্বাসের কারণে বর্ষণশীল মৌসুমী বায়ুও শাস্তির বার্তাবাহক। আর যদি সেখানকার 'জিকির' (উপদেশ) এর অর্থ নেওয়া হয় প্রত্যাদেশ, তবে বুঝতে হবে এখানকার 'উজরান' ও 'নুজরান' পদদু'টো যবরযুক্ত হয়েছে অনুবর্তী বক্তব্য হিসেবে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী'। বাক্যটি আগের আয়াতসমূহে বর্ণিত শপথের জবাব। এর মর্মার্থ— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের আগমন অনিবার্য। এর মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ মাত্রই নেই।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৮— ১১) মর্মার্থ হচ্ছে— সেই অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয় দিবস যখন সমাগত হবে, তখন নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে পড়বে দ্যুতিহীন, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে আকাশ, পাহাড়-পর্বত সমূহ হয়ে পড়বে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত। এভাবে এক সময় সকলকিছুই হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন, নীরব, নিথর। এরপর শুরু হবে পুনরুত্থান পর্ব। সকলকে সমবেত করা হবে হাশরের প্রান্তরে। নবী-রসুলগণ তখন সাক্ষ্য প্রদান করবেন তাঁদের আপন আপন উম্মত সম্পর্কে। বাক্যগুলো এখানে শর্তযুক্ত। আর সে শর্তের জবাব এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ সেদিন পৃথক করা হবে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই সমূদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন দিবসের জন্য (১২)? বিচার দিবসের জন্য' (১৩)। এখানকার 'লি ইয়াওমিন' (কোন দিবসের জন্য) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'উজ্জিলাত' (স্থগিত রাখা হয়েছে) বাক্যাংশের সাথে। আর প্রশ্নটি এখানে রূপকার্থে মহাপ্রলয় দিবসের বিস্ময় ও ভয়াবহতাপ্রকাশক। অর্থাৎ উল্লেখিত ঘটনা এখনো ঘটছে না কেনো? দেরী কেনো? স্থগিত কেনো?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জানো (১৪)? সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' (১৫)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি জানেন, সত্যঅস্বীকারকারীদেরকে আমি তখন কীভাবে শায়েস্তা করবো? তাদের সেদিনের দুর্ভোগ তো হবে সীমাহীন। উদ্ধৃত প্রশ্নটিতে প্রকাশ করা হয়েছে বিপুল বিস্ময়। আর এখানকার 'ওয়াইল' অর্থ দুর্ভোগ। শব্দটি ধাতুমূল। এর ধাত্যর্থ— ধ্বংস ও অনাসৃষ্টি। বক্তব্যভঙ্গি দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, সেদিনকার দুর্ভোগ হবে নিরবচ্ছিন্ন। কেননা বাক্যটি রূপান্তর করা হয়েছে ক্রিয়াবাচক থেকে নামবাচকে এবং বাক্যটি একটি অপপ্রার্থনাও বটে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওয়াইল হচ্ছে জাহান্নামের গহীন গহ্বর। জাহান্নামীদেরকে সেই গহ্বরে ফেলে দিলে চল্লিশ বৎসরেও তারা পৌঁছতে পারবে না তার তলদেশে। হাকেম, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, হান্নাদ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জাহান্নামের একটি প্রবাহের নাম ওয়াইল। সেখানে প্রবাহিত হতে থাকবে জাহান্নামীদের বিগলিত রক্ত ও পুঁজ। ইবনে আবী হাতেম এরকম বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, ইবনে মুনজির ও নোমান ইবনে বশীর সূত্রে। আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, গলিত রক্ত-পুঁজ ভর্তি জাহান্নামের একটি আবর্তের নাম ওয়াইল। ওই আবর্তে পাহাড় নিক্ষেপ করা হলেও তা উত্তাপে গলে যাবে। বায়হাকী, ইবনে জারীর, ইবনে মোবারক।

হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওয়াইল হচ্ছে দোজখের একটি পাহাড়। শিথিল সূত্রে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে ইবনে জারীর ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওয়াইল হচ্ছে দোজখের একটি বিশাল প্রান্তর। সেখানে অনবরত ওঠা নামা করতে থাকবে আরাফাত দাবিদারেরা (ভবিষ্যদ্বক্তারাই আরাফাত দাবিদার)।

সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ১৬—২৮

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝١٦ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝١٧ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝١٨ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١٩ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝٢٠ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝٢١ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝٢٢ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝٢٣ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٢٤ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝٢٥ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ۝٢٦ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ۝٢٧ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٢٨

- আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই?
- অতঃপর আমি পরবর্তীদিগকে উহাদের অনুগামী করিব।
- অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।
- সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
- আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?

q অতঃপর আমি উহা রাখিয়াছি নিরাপদ আধারে,

q এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,

q অতঃপর আমি ইহাকে গঠন করিয়াছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!

q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

q আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,

q জীবিত ও মৃতের জন্য?

q আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগকে দিয়াছি সুপেয় পানি।

q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের অর্থ— আমি কি পূর্ববর্তী যুগের আদ, ছামুদ, কওমে নূহ, সাদুমবাসী ইত্যাদি অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করিনি? নিশ্চয় করেছি। সুতরাং মক্কার অবিশ্বাসীরা নিশ্চিন্তে বসে আছে কোন ভরসায়? আমি তো তাদেরকেও ধ্বংস করবো। অপরাধী যারা, তাদেরকে তো আমি এভাবেই শায়েস্তা করে থাকি। এতো গেলো ইহকালীন শাস্তি। আর পরকালে তাদের জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ তো রয়েছেই। রয়েছে ওয়াইল গহ্বরের মর্মন্তুদ শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! নিজেদের দিকে তাকাও। ভেবে দ্যাখো, তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি কীভাবে। এক ফোঁটা তুচ্ছ বারিবিন্দু থেকে আমি কি তোমাদেরকে সৃজন করিনি? তবুও কি তোমরা কেবল আমাকেই সৃজয়িতা ও পালয়িতা বলে মানবে না? প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। আর এখানকার 'মুহীন' অর্থ তুচ্ছ পানি, শুক্রবিন্দু।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তা রেখেছি নিরাপদ আধারে (২১), এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত' (২২)। এখানে 'নিরাপদ স্থানে' অর্থ মাতৃগর্ভে। বাক্যটির সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'আমি কি সৃষ্টি করিনি' কথাটির সঙ্গে। এখানকার 'ফা জ্বাআ'লনা' এর 'ফা' অব্যয়টি ব্যাখ্যামূলক, ধারাবাহিকতা বা ক্রমপ্রকাশক নয়। অর্থাৎ সৃষ্টি করার পর মাতৃগর্ভে রেখেছি এরকম নয়। আর 'এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত' অর্থ অন্যূন ছয় মাস, অনুর্ধ্ব দুই বৎসর। প্রকৃত সময় কতো, তা নির্ধারণ করেন আল্লাহ্ই।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কতো নিপুণ স্রষ্টা'। এখানকার 'ফা ক্বদার্না' (গঠন করেছি) কথাটিকে ক্বারী কাসায়ী পাঠ করতেন 'ফা ক্বদ্দারনা'। এভাবে পাঠ করলে অর্থ দাঁড়ায়— পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি তার মাতৃউদরে অবস্থানের সময়সীমা, জন্মগ্রহণের সময়কাল, আয়ুষ্কাল, উপজীবিকা, সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদেরকে তোমাদের

মাতৃজঠরে চল্লিশ দিন রাখা হয় শুক্রকণারূপে। এরপর তোমাদেরকে করা হয় জমাট রক্ত, তারপর গোশতপিণ্ড। এরপর তোমাদের কাছে পাঠানো হয় এক ফেরেশতাকে। সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে লিখে দেয় তোমাদের চারটি বিষয়— কর্ম, আয়ু, জীবনোপকরণ ও সৌভাগ্য, অথবা দুর্ভাগ্য। তারপরে ফুৎকার করা হয় প্রাণ। যিনি আমার জীবনাধিকারী, সেই পরমপবিত্র প্রভুপালকের শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেহেশতবাসীদের মতো কর্ম করতে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তার এবং বেহেশতের মধ্যে দূরত্ব থাকে মাত্র এক বিঘত। এমন সময় প্রবল হয় তার ভাগ্যলিপি। সে তখন শুরু করে দোজখবাসীদের মতো আমল। পরিশেষে প্রবেশ করে জাহান্নামে। বোখারী, মুসলিম। ক্বারী নাফে, ক্বারী কাসায়ী কথাটিকে পাঠ করেছে 'ফা ক্বদারনা' এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি তাদের অস্তিত্ব প্রদানে, বিনাশ সাধনে ও পুনরুত্থানে সম্পূর্ণ সক্ষম। অর্থাৎ আমি সকলকিছুতেই সুদক্ষ, নিপুণ। সম্ভবত এখানকার 'ক্বদির' অর্থ 'মুক্বতাদির' অর্থাৎ আমি পরিমিতি নির্ধারণকারী।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারীরদের জন্য'। একথার অর্থ— আমার এমতো পরিমিতি নির্ধারণকে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি ওয়াইল। উল্লেখ্য, ভাগ্যলিপি বা তকদীরকে অস্বীকার করে ক্বদরিয়া দল। তারাই এই উম্মতের অগ্নি উপাসক।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে'? এখানকার 'কিফাত' শব্দরূপটি বিশেষণীয়। এর অর্থ— ধারণকারী, সম্মিলনকারী। অথবা শব্দটি ধাতুমূল। আধিক্য অর্থে পৃথিবীকে এখানে বলা হয়েছে 'কিফাত'। অথবা শব্দটি কর্তৃপদীয়রূপে বহুবচন। যেমন 'সিয়াম' বহুবচন 'সায়েম' এর। অথবা 'কিফাত' বহুবচন 'কাফেতুন' এর। 'কাফতুন' অর্থ পূর্ণ করা। ভূমিকে যদি 'কিফাত' বলা হয়, তবে বুঝতে হবে, খণ্ডখণ্ড ভূমির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ভূপৃষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'জীবিত ও মৃতের জন্য'। বাক্যটিতে কর্মপদ রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ জীবিত ও মৃত প্রাণীর জন্য। অবশ্য 'কিফাত'কে বিশেষণীয় শব্দরূপ ধরে নিলেই কেবল এরকম ব্যাখ্যাকে মনে করা যেতে পারে সঙ্গত। অন্যথায় ধরে নিতে হবে এখানে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়া। অর্থাৎ ভূমি সীমাবদ্ধ করে, সামাল দেয়। এই ভূমি জীবিতদেরকে রাখে তার পিঠে এবং মৃতদেরকে রাখে তার অভ্যন্তরে। ফাররা বলেছেন, এখানে কর্মপদ (মানুষ) যেহেতু সুবিদিত, তাই বুঝতে হবে, এখানে উহ্য রয়েছে কর্মপদ। সম্ভাবনা এমনও রয়েছে যে, এখানকার 'আহ্‌ইয়াআন' (জীবিত) ও 'আমওয়াতান' (মৃত) দু'টোই কর্মপদ। আর দু'টোতেই তানভীন যুক্ত করা হয়েছে গুরুত্ব প্রকাশার্থে। কেননা জীবন ও মৃত্যু দু'টোই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুকাতিল বলেছেন, উপরোক্ত কর্মসমূহ মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থান অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়কর।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۹﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ
شُعَبٍ ﴿۳۰﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿۳۱﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ
كَالْقَصْرِ ﴿۳۲﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿۳۳﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۴﴾
هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۷﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾
فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿۳۹﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۴۰﴾

q তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে।
q চল তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে,
q যে ছায়া শীতল নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে,
q ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য,
q উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,
q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
q ইহা এমন একদিন যেদিন কাহারও বাকস্ফূর্তি হইবে না,
q এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না ওযর পেশ করার।
q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
q 'ইহাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তীদিগকে।'
q তোমাদের কোন কৌশল থাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।
q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চলো তারই দিকে'। কথাটি একটি অনুমানসাপেক্ষ প্রশ্নের জবাব। ওই প্রশ্নটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সেদিন তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে? সেদিন তো তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হবে নির্মম আচরণ। বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা যে জাহান্নামকে অস্বীকার করতে, এখন সেই জাহান্নামেরই যোগ্য হয়েছো তোমরা। চলো, এবার সেই জাহান্নামের দিকেই চলো।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'চলো তিন ছায়াবিশিষ্ট ছায়ার দিকে'। বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের প্রতি গুরুত্বআরোপক, অথবা তার অনুবর্তী। ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, এখানে 'তিন ছায়াবিশিষ্ট ছায়া' অর্থ জাহান্নামের তিন শাখাবিশিষ্ট ধুম্রপুঞ্জ। ওই তিন শাখাবিশিষ্ট ধুম্রের যে ব্যাখ্যা বায়যাবী দিয়েছেন, আমার তা মনঃপুত নয়। আমার মতে কথাটির ব্যাখ্যা হবে এরকম— জাহান্নামবাসীরা তাদের কর্মফলানুসারে হবে তিন ধরনের। তাই তারা তখন আবদ্ধ হবে তিন রকমের ধুম্রজালে— ১. ওই সকল কাফের, যারা প্রকাশ্যে রসুল স. এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাঁর সম্পর্কে বলেছে 'সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে'। ২. ওই সকল বেদাতী, যাদের অপবচন কোরআন ও হাদিসের প্রকাশ্য বক্তব্যের বিপরীত, যারা উম্মতের ঐকমত্যের বিরোধী। যাদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে কোরআনের আয়াতের অস্বীকৃতি ও রসুল স. এর রেসালতের অবমাননা। তারা হচ্ছে মুজাস্সিমা, ক্বদরিয়া, রাফেজী, খারেজী, মরজিয়া (বর্তমান যুগের কাদিয়ানি, মওদুদী)। মুজাস্সিমারা জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার হওয়াকে অস্বীকার করে। আরো অস্বীকার করে প্রতিফল দিবসের পাপপুণ্যের পরিমাপ, পুলসিরাত ইত্যাদিকে। অথচ এ সকল কিছু কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর রাফেজী-খারেজীরা অস্বীকার করে ওই সকল সুবিদিত হাদিস, যেগুলোতে রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুখ্যাতি। ৩. প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলমান, যারা অসংখ্য লঘু-গুরু পাপে পরিপূর্ণ, ফরজ দায়িত্বসমূহ পরিত্যাগকারী। এই তিন দলই সেদিন আবদ্ধ হবে জাহান্নামের তিন ধরনের ধুম্রকুণ্ডলীতে।

বাগবী লিখেছেন, কতিপয় বিদ্বজ্জনের অভিমত হচ্ছে, নরকের অভ্যন্তরভাগ থেকে বেরিয়ে আসবে তিন শাখাবিশিষ্ট একটি চূড়া। একটি শাখা হবে জ্যোতির, যা এসে থেমে যাবে বিশ্বাসীগণের মস্তকের উপরে। আর একটি শাখা হবে ধোঁয়ার, যা উড়ে এসে স্থির হবে কপটাচারীদের মাথার উপরে এবং অন্য আর একটি শাখা হবে অগ্নির। আগুনের ওই শাখাটি এসে থামবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মাথার উপরে। আমি বলি, বক্তব্যটিকে অবশ্যই হতে হবে সুপরিণত সূত্রাগত। তবে বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— নরকানলকে যে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার প্রথম ভাগ হচ্ছে নূর, অর্থাৎ এমন আলো, যাতে অপর দুই অংশের চেয়ে আঁধারের পরিমাণ থাকবে স্বল্পমাত্রায়। নচেৎ নরকের আগুনে তো প্রকৃত নূরের কথা চিন্তাও করা যায় না। রসুল স. বলেছেন, নরকের আগুন এক হাজার বছর জ্বলে জ্বলে ধারণ করেছিলো লাল বর্ণ। আরো এক হাজার বছর জ্বলবার পর তা হয়ে গিয়েছে কৃষ্ণবর্ণের। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও বায়হাকী। ওই আগুনের ধোঁয়ার ফিকে রঙই ছেয়ে যাবে মুসলমান পাপীদের মাথার উপরে। দ্বিতীয় প্রকারের ধোঁয়া হবে অধিক অগ্নিময় ও মসীলিপ্ত। ওই ধোঁয়া আচ্ছাদিত করবে কপট বিশ্বাসীদের মাথার উপরিভাগ। কপটবিশ্বাসী বা মুনাফিক অর্থ এখানে ওই সকল বিশ্বাসী, যারা

ইমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এমন সব মন্তব্য করে, যা হয়ে যায় কোরআন অস্বীকার এবং রসুল স. এর প্রতি অবমাননা। ওই সকল মুনাফিক নয়, যারা সচেতনভাবে অন্তরে কাফের এবং মুখে ইমানদার। তারা তো প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। তাদের ঠিকানা হবে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে। তৃতীয় ধোঁয়া হবে এমন আগুনের, যার দহন ক্রিয়া হবে চরমতম। ওই ধোঁয়া ছেয়ে যাবে কাট্টা কাফেরদের মস্তকের উপরিভাগে। উল্লেখ্য, বেদাতীদেরকে কপটাচারী বা মুনাফিক বলার কারণ বিবৃত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার 'জিল্লান' (ছায়া) অর্থ নরকেরই আগুন। সে আগুনকে এখানে 'ছায়া' বলা হয়েছে তার অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণে। অর্থাৎ সে অগ্নি ঘোর কালো বলেই তাকে এখানে বলা হয়েছে ছায়া। আর এখানকার 'তিন ছায়াবিশিষ্ট শাখার দিকে চলো' অর্থ চলো ওই নরকানলের দিকে, যেখানে পৌঁছানোর পথ হচ্ছে— ১. আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা ২. নবীগণকে অস্বীকার করা এবং ৩. পাপভারাক্রান্ত হওয়া। আর আদেশটি এখানে উপহাসমূলক। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত, তাই এবার শাস্তি আস্বাদন করো' 'তাকে সুসংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির'।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা থেকে'। এখানকার 'জলীলিন' শব্দটি আগের আয়াতের 'জিললিন' এর বিশেষণ। অর্থাৎ যে ছায়া শীতল নয়, নয় আরশের ছায়ার মতো স্বস্তিকর। বাক্যটি সম্ভবত একটি নামপদীয় উহ্য বাক্যেরও বিশেষণ। অর্থাৎ সে ছায়া প্রতিহত করতে পারবে না জাহান্নামের অগ্নিশিখা। অথবা বাক্যটি যোজিত হবে 'জলীল' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বাক্যটি তৃতীয় বিশেষণ হবে পূর্বোক্ত 'জিল' এর। বস্তুত 'জিল্ল' (ছায়া) শব্দটির উল্লেখ করাতে স্বাভাবিকভাবে এরকম ধারণার উদ্রেক হতে পারে যে, হয়তোবা এ ছায়া জাহান্নামের উত্তাপ থেকে কিছুটা রেহাই দিবে, অথবা রক্ষা করবে দোজখের হলকা থেকে। এমতো সম্ভাব্য ধারণার মূলোৎপাটনার্থেই এখানে বলা হয়েছে 'যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা থেকে'।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে—'তা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য'। এখানকার 'ইন্‌নাহা' কথাটির 'হা' (তা) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে আগের আয়াতের 'জিল্ল' এর সঙ্গে, যদি 'জিল্ল' অর্থ করা হয় 'নরকানল'। অন্যথায় বুঝতে হবে সম্পৃক্তব্য পদ এখানে রয়েছে উহ্য। তবে বক্তব্যভঙ্গিতে শেষোক্ত সম্ভাবনার অবকাশ নেই।

'তা উৎক্ষেপ করবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য' অর্থ ওই ছায়া দোজখের আগুনের বিশাল ঝাপটা ঠেকাতে পারবেই না। 'শারার' অর্থ এখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। শব্দটি 'শারারাহ্' এর বহুবচন। আর 'ক্বাসর' অর্থ অট্টালিকা, প্রস্তর নির্মিত ইমারত, গ্রাম, দুর্গ। এরকম উল্লেখ করা হয়েছে 'কামুস' অভিধানে। শব্দটির একবচন 'ক্বসর'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বসর' বহুবচন 'ক্বসরাতুন' এর 'ক্বসরাতুন' অর্থ খেজুর বৃক্ষের মূল, অথবা স্থূলকায় বৃক্ষ।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ'। 'জিমাল' শব্দটি 'জুমাল' এর বহুবচন। আবার এর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে 'জিমালাতুন'। এর অর্থ— উষ্ট্রসমূহ। আর এখানকার 'সুফর' অর্থ পীতবর্ণ। শব্দটি বহুবচন 'আসফার' এর। অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি যেহেতু হবে অগ্নিময়। তাই তা হবে পীত বর্ণের। এভাবে 'কাআন্নাহু জিমালাতুন সুফর' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তা হবে পীতবর্ণ উষ্ট্রসদৃশ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'সুফর' অর্থ 'সুফ' (কৃষ্ণ বর্ণ)। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে দোজখের আগুন হবে আলকাতরার মতো কালো। উটের কৃষ্ণবর্ণ হয় হলুদাভ। একারণে আরববাসীগণ উটের রঙকে বলে 'সুফর'। আগের আয়াতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার বিশালত্ব বোঝাতে, আর এই আয়াতে উটের সঙ্গে তুলনা করা হলো তার দ্রুততর সম্প্রসারণত্ব বোঝাতে।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য'। সেদিন অবিশ্বাসীরা যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে নিমজ্জিত হবে, সে কথা বুঝাতেই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে বার বার।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এটা এমন এক দিন, যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না (৩৫) এবং তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না ওজর পেশ করার (৩৬)। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' (৩৭)।

এখানে 'বাকস্ফূর্তি হবে না' অর্থ ভয়ে সেদিন তারা কথাই বলতে পারবে না। অথবা কথা বলতে পারলেও সে কথায় কোনো কাজ হবে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে সেদিন কোনো কোনো স্থানে তারা কথা বলতে সক্ষম হবে বটে, কিন্তু তাতে করে তাদের শাস্তি এতটুকুও কমবে না। আবার কোনো কোনো স্থানে তারা হয়ে যাবে নির্বাক। 'অনুমতি দেওয়া হবেনা ওজর পেশ করার' অর্থ তাদেরকে তখন অজুহাত উপস্থাপনের কোনো সুযোগই দেওয়া হবে না। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'বাকস্ফূর্তি হবে না' বাক্যের সঙ্গে। আবার এখানকার 'ওজর পেশ করার' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'অনুমতি দেওয়া হবে না' বাক্যাংশের সঙ্গে। অর্থাৎ তাদের যেহেতু উপযুক্ত অজুহাত থাকবেই না, সেহেতু অনুমতি প্রদানের প্রশ্ন উঠবেই বা কেনো? একারণেই হয়তো তারা তখন অজুহাত প্রদর্শনের কথা ভাববেই না। অর্থাৎ কথা বলার অনুমতি দিলেও তারা তখন কোনো অজুহাত-আপত্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— এটাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে (৩৮)। তোমাদের কোনো কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ করো আমার বিরুদ্ধে (৩৯)। সেইদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' (৪০)।

এখানে 'হাজা ইয়াওমূল ফাসলি' অর্থ এটাই ফয়সালার দিন। পুরো বাক্যটি 'হাজা' এই ইঙ্গিতসূচক উদ্দেশ্যের বিধেয়। অথবা বিধেয় হবে 'ফয়সালার দিনে'র।

এমতাবস্থায় এর সর্বনামকে ধরে নিতে হবে উহ্য। অর্থাৎ ওই দিন আমি সমবেত করবো তোমাদেরকে। অথবা বাক্যটি হবে 'ফয়সালার দিন' বা 'পার্থক্যের দিন' এর নিমিত্ত। অর্থাৎ সেই দিন পার্থক্যের দিন হওয়ার কারণেই আমি প্রথমে তোমাদেরকে করবো একত্রিত। অথবা ৩৮ সংখ্যক আয়াতের এই বাক্যটি হবে 'ফয়সালা' বা পার্থক্যের গুরুত্বনির্দেশক ও বিবৃতিমূলক।

'তোমাদের কোনো কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ করো' অর্থ তখন তাদেরকে বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা তো সর্বশক্তি দিয়ে সত্য ধর্মের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে চাইতে। আবার বলতে, তোমাদের মধ্যকার দশ জন বলশালী ব্যক্তি মিলে জাহান্নামের এক জন প্রহরীকে কাবু করতে পারবে। এবার তাহলে সেরকম কিছু করো, যদি পারো। এখানকার 'কীদূনী' (আমার বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন কোরো) শব্দটির 'ইয়া' অক্ষরটি রয়েছে উহ্য। আর বাক্যটি একই সঙ্গে আদেশসূচক ও হুমকিপ্রকাশক।

'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' অর্থ কৌশল প্রয়োগের কথা তারা তখন চিন্তাই করতে পারবে না। নিশ্চিত বুঝতে পারবে, দুর্ভোগকবলিত তারা হবেই।

সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ৪১—৫০

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ۝٤١ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝٤٢ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٤٣ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝٤٤ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤٥ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ۝٤٦ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤٧ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝٤٨ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤٩ فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ۝٥٠

r মুত্তাকীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,

r তাহাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।

r 'তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।'

r এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

r সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

r তোমরা আহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছু দিন, তোমরা তো অপরাধী।

r সেইদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

r যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও' উহারা নত হয় না।
r সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
r সুতরাং উহারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন মুত্তাকীগণের জীবন হবে কতোই না মধুর। তারা থাকবে তখন মনোরম বেহেশতী উদ্যানের ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজির অনন্ত সুখের ছায়ায়। থাকবে বাঞ্ছিত ফলমূলের অন্তহীন প্রাচুর্যের পরিবেশে।

এখানে মুত্তাকী অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, যারা পৃথিবীতে থাকে সতত অংশীবাদিতামুক্ত। অথবা সাধারণভাবে পাপাচরণমুক্ত, বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তরে স্থিত। আর বেহেশতের ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজিকেই এখানে উপমাস্বরূপ বলা হয়েছে ছায়া। নতুবা সেখানে তো ছায়া বলে কিছু থাকবে না। কেননা সূর্য থাকবে অনুপস্থিত। যেমন দীর্ঘাঙ্গী মানুষকে বলা হয় কোষধারী, তার কাছে তরবারী না থাকলেও। 'প্রস্রবণ' অর্থ এখানে দুধ, মধু, সুরা ও পানির বহুসংখ্যক স্রোতস্বিনী, যেগুলোর পানীয় কখনো বিস্বাদযুক্ত হবে না। আর 'বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্য' অর্থ সেখানে বেহেশতীরা যখন যে ফল যতো পরিমাণে খেতে চাইবে, তখন সে ফল ততো পরিমাণেই অনায়াসে পাবে। এখানকার 'বাঞ্ছিত' কথাটিতে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সেখানকার পানীয় ও ফলমূল বহুবিচিত্র স্বাদবিশিষ্ট, পৃথিবীর পানীয় ও ফলমূলের মতো এক রকমের স্বাদযুক্ত নয়।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে—'তোমাদের কর্মের পুরস্কাররূপে তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করো'। কথাটি আগের আয়াতের 'ফী জিলাল' (ছায়ায়) এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি অনুক্ত বাক্য 'মুসতাক্বির্‌রুনা' (অবস্থানকারী) তে লুপ্ত (তারা) সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ সেখানকার বৃক্ষরাজির ছায়াসদৃশ স্বস্তিমধ্যে অবস্থানকালে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে— তোমাদের পুণ্যকর্মের বিনিময়রূপে তোমরা এখন পরম শান্তিতে পানাহার করো। অথবা বলা যায়, আলোচ্য আয়াতের প্রসঙ্গ ভিন্নতর। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল বলা হবে— এ হচ্ছে তোমাদের শুভকর্মফল। সুতরাং তোমরা পান করো ও আহার করো।

এখানে 'হানীআম' অর্থ পানাহার করো, কথাটি একটি অনুক্ত ধাতুমূলের বিশেষণ। অর্থাৎ পান করো ও খাও। অথবা বাক্যটি অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ পরম পরিতৃপ্তির সাথে। 'হানাউন' অর্থ অনায়াসলব্ধ, অনিষ্ট মুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি'। এখানে 'সৎকর্ম' অর্থ ইমান এবং যাবতীয় প্রকারের দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত। আলোচ্য আয়াতের বাক্যটি সম্পূর্ণ নতুন একটি বাক্য, যা সূচনামূলক।

এখানকার 'নাজ্বযী' ক্রিয়ার কর্মপদ হচ্ছে 'কাজালিকা'। এখানে 'নাজ্বযী' ক্রিয়াবাচক বাক্য 'ইন্‌না'র বিধেয়। 'ইন্‌না' দ্বারা যে কর্মপদবাচক বাক্য গঠিত হয়, তাতে নিহিত থাকে পূর্বোক্ত বাক্যের অধিকতর তাৎপর্য। কেননা 'সৎকর্মপরায়ণ'

(মুহসিনীন) যারা, তারাই মুত্তাকী। আবার সৎকর্মপরায়ণগণ কখনো কখনো মুত্তাকী (সংযমী, সাবধানী)গণের চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যশীলও হয়। কারণ 'ইহ্সান' অর্থ এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা, যেনো আল্লাহ্ ইবাদতকারীর প্রত্যক্ষগোচর, অথবা এরকম বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, তিনি তো তাঁর ইবাদতকারীকে দেখছেন। প্রত্যাদেশবাহক জিবরাইল আমীনের এক প্রশ্নের জবাবে রসুল স. এমনই বলেছিলেন। বোখারী, মুসলিম। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'ইহ্সান' এর কথা সে অর্থে আসেনি। যদি আসতো, তবে গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একাকার হয়ে যেতো, যা অসমীচীন। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'মুহসিনীন' বলে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৪৫) পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য'। একথার অর্থ— সেদিন অবশ্যই চরম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। তারা বেহেশত থেকে হবে চিরবঞ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তোমরা আহার করো এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী'। বাক্যটি সম্পূর্ণ পৃথক। এর মাধ্যমে ভীষণভাবে শাসানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এখানকার 'ক্বলীলান' (অল্প কিছুদিন) কথাটি এই অনুক্ত ধাতুমূলের বিশেষণ। অথবা বিশেষণ একটি প্রচ্ছন্ন ক্রিয়ার আধারের, যথাক্রমে যৎকিঞ্চিত আহার্য, অথবা সাময়িক সম্ভোগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! যতোদিন তোমরা পৃথিবীতে বাঁচো ততোদিন খাও-দাও, ফুর্তি করো। মৃত্যুর পর তো তোমাদের এসকলকিছু শেষ হয়ে যাবেই। তারপর? তখন তো অপরাধের শাস্তি তোমাদেরকে পেতেই হবে। উল্লেখ্য, আগের আয়াতের ধমকের প্রভাব প্রবাহিত হয়েছে এই আয়াতেও।

এরপরের আয়াতে (৪৭) পুনরায় বলা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য'। এ কথার অর্থ— পৃথিবীর সাময়িক সম্ভোগোন্মত্ততার কারণেই পরবর্তী পৃথিবীতে তাদেরকে পোহাতে হবে অন্তহীন বিড়ম্বনা।

মুজাহিদ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সাক্বিফ গোত্রের নেতৃবর্গকে ডেকে আমন্ত্রণ জানালেন ইমান ও নামাজের প্রতি। তারা বললো, আমরা তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তোমার মতো ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করতে আমরা পারবো না। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত(৪৮)। বলা হয়—

'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্র প্রতি নত হও, তারা নত হয় না'। এই আয়াতখানিও শাসনমূলক। অথবা বলা যেতে পারে, আয়াতখানি সম্পর্কযুক্ত ৪৬ সংখ্যক আয়াতের 'তোমরা তো অপরাধী' কথাটির সঙ্গে। বক্তব্যবিষয়ের প্রতি মগ্নতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই এখানে বাক্যটিকে সহসা রূপান্তরিত করা হয়েছে মধ্যম পুরুষ থেকে প্রথম পুরুষে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা তো অপরাধী।

শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের প্রতি তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, অথচ তোমরা সেজদা করতে অস্বীকৃত হচ্ছো। এরকমও হতে পারে যে, আয়াতখানির যোগসূত্র রয়েছে আগের বা পরের আয়াতের 'মুকাজ্‌জিবীন' (অস্বীকারকারী) পদটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা নামাজ অস্বীকারকারী। নামাজ পড়তে বলা হলেও তারা নামাজ পড়ে না।

এরপরের আয়াতেও (৪৯) বলা হয়েছে— অস্বীকারকারীদের চিরদুর্ভোগ কবলিত হওয়ার কথা। অর্থাৎ 'ওয়াইল' দোজখ অবধারিত করা হয়েছে তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কাই করে না।

শেষোক্ত আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা কোরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে'? একথার অর্থ— কী চায় তারা? কোরআনের বদলে কি অন্য কারো কথা মান্য করতে চায়? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ প্রত্যাদেশিত বাণীর এই বিপুল সমাহার শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়েই চিরঅজেয়। এতে রয়েছে সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জী। অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তসম্ভার, মহাকল্যাণের নির্ভুল পথনির্দেশনা। সুতরাং কোরআন অস্বীকারকারীরা যে আর কোনো দলিল-প্রমাণ মানবে, তা আশা করা বৃথা।

সুরা দাহ্‌র যেমন আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ভরপুর, তেমনি এর মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রচণ্ড ভীতিপ্রদর্শন। রসুল স. বলেছেন, হুদ, ওয়াক্বিয়া, মুরসালাত, আ'মমা ইয়াতাসাআলূন এবং ইজাশ্ শামসু কুয়্যিরাত সুরা সমূহ আমাকে বয়োপ্রবীণ করে দিয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে মারদুবিয়া, আর প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম।

ত্রিংশতিতম পারা

সূরা নাবা

মহাপুণ্যময় মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানি ২ রুকু এবং ৪০ আয়াতবিশিষ্ট।
সূরা নাবা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ○
عَمَّ یَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ﴿۱﴾ عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ الَّذِیۡ هُمۡ فِیۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ؕ﴿۳﴾ کَلَّا سَیَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۴﴾ ثُمَّ کَلَّا سَیَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵﴾

r উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?
r সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,
r যেই বিষয়ে উহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।
r কখনও না, উহাদের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে;
r আবার বলি কখনও না, উহারা অচিরেই জানিবে।

'আ'ম্মা ইয়াতাসাআলূন' অর্থ তারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অর্থাৎ হে আমার রসুল! মক্কাবাসীরা একে অপরের কাছ থেকে কোন্ ভয়াবহ সংবাদটি জানতে চায়, আপনি কি তা জানেন?

এখানকার 'আ'ম্মা' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'আ'ন' ও 'মা'। 'আন' (হতে, থেকে) হচ্ছে যের প্রদানকারী একটি অব্যয় এবং 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নবোধক। শব্দদু'টোর সন্ধি হলে যের প্রদানকারী অব্যয়ের পর 'মা' অব্যয়ে 'আলিফ' অক্ষরটি লোপ পায় এবং 'নূন' অক্ষরটি পরিবর্তিত হয় 'মীম' এ। যেমন 'লিমা' 'ফীমা' 'আ'ম্মা' 'মিম্মা'। এরূপ হওয়ার কারণ দু'টি— ১. অধিক ব্যবহার এবং ২. যোজক ও প্রশ্নবোধক দু'টি 'মা' এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকের নিকটে কোনোকিছুই গোপন নয়। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। তাই বুঝতে হবে, এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে কেবল আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বর্ধনার্থে।

'ইয়াতাসাআলূন' অর্থ কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অর্থাৎ মক্কার পৌত্তলিকেরা কতোইনা ভয়াবহ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা সমালোচনা করে। অর্থাৎ রসুল স. যখন তাদের কাছে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, প্রতিফল দিবস ইত্যাদির অবশ্যম্ভাবিতার কথা শোনান, তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, দেখেছো, মোহাম্মদ আমাদেরকে কী ভয়ংকর সব কথা শোনায়। এরকম

বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর এবং হাসান বসরীর উক্তিরূপে যথাক্রমে বাগবী ও ইবনে আবী হাতেম। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— পৌত্তলিকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্বরে রসুল স. এবং সাহাবীগণের কাছে পরলোকের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতো। এমতাবস্থায় 'ইয়াতাসাআলূন' অর্থ হবে — তারা কী বিষয়ে প্রশ্ন করে?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেই মহাসংবাদ বিষয়ে (২), যেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে' (৩)।

আগের আয়াতের 'আ'ম্মা' সম্পৃক্ত হবে 'ইয়াতাসাআলূন' এর সঙ্গে। অথবা সম্পৃক্ত অনুক্ত আরেকটি 'ইয়াতাসাআলূন' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় প্রথম আয়াতখানির জবাব হবে দ্বিতীয় আয়াত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কী বিষয়ে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে? জিজ্ঞাসাবাদ করে এক মহাসংবাদের বিষয়ে। এরকমও হতে পারে যে, দ্বিতীয় আয়াতের বাক্যটিও প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ বাক্যটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি প্রশ্নবোধক শব্দ। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্যটি হবে প্রথম বাক্যের উল্লেখিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও ভয়াবহতাপ্রকাশক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা কী বিষয়ে জানতে চায়? মহাপ্রলয় ও তৎপরবর্তী বিষয়ের মহাবার্তা সম্পর্কে নাকি? আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানকার দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নের প্রতি অস্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ সেই ভয়ংকর বিষয় সম্পর্কে উপহাসমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত নয়। কেননা তা সন্দেহ-কৌতুকের অতীত। তাই তা প্রত্যক্ষগোচরতা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য। সুতরাং প্রশ্ন কেনো? বিষয়টিকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলেই তো হয়।

মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন, এখানে 'মহাসংবাদ' অর্থ কোরআন মজীদ, মহাপ্রলয় বা পরকাল নয়। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আপনি বলুন, কোরআন একটি মহাসংবাদ'। কাতাদা বলেন, প্রতিফল দিবস।

'আল্লাজী হুম ফীহি মুখতালিফূন' অর্থ যেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এখানকার 'আল্লাজী' যোজক অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত, যা পরবর্তী যোজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষণ হয়েছে 'নাবা' (সংবাদ) পদের। আর এখানকার 'তাদের মধ্যে' অর্থ মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে, যেমন প্রথম আয়াতের 'তারা' অর্থ মক্কার পৌত্তলিকেরা। এমতাবস্থায় বাক্যটি বিশেষণরূপে পরিগণিত হবে তখন, যখন প্রশ্নটিকে ধরে নেওয়া হবে উপহাসমূলক, অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মক্কার কিছুসংখ্যক লোক মহাসংবাদ অস্বীকারকারী এবং কিছুসংখ্যক সন্দিগ্ধ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, প্রথম আয়াতের 'তাদের' এবং এই আয়াতের 'তারা' সর্বনাম দু'টো দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়কে। তাদের মধ্যে একদল প্রশ্ন করে 'মহাসংবাদ' সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণের জন্য এবং আর এক দল প্রশ্ন করে ঠাট্টাবিদ্রূপ চরিতার্থে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কখনও না, তাদের ধারণা অবান্তর, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে'। এখানে 'কাল্লা' (কখনও না) কথাটির

দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছে ওই সকল পৌত্তলিকদের মতদ্বৈধতাকে। কেননা ওই মতদ্বৈধতার ভিত্তি ছিলো অস্বীকৃতি। সে অস্বীকৃতি তাদেরকে অধিকার করেছিলো ব্যাপকতরভাবে, অথবা অস্বীকারকারী ছিলো তাদের মধ্যকার কিছুসংখ্যক লোক। আর 'তারা শীঘ্র জানতে পারবে' অর্থ অদূর ভবিষ্যতে তাদের সকলকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবেই। তখন তারা তো সকলকিছু প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আবার বলি, কখনও না, তারা অচিরেই জানবে'। আগের বাক্যের এই পুনরাবৃত্তি এখানে ঘটানো হয়েছে বিষয়টিকে প্রাধান্য প্রদানার্থে। এভাবে এখানে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে দু'বার, একবার কবরের, আর একবার মহাপ্রলয় দিবসের। আর এখানকার 'ছুম্মা' (আবারও) শব্দটির দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সমাধির শাস্তি অপেক্ষা মহাপ্রলয় দিবসের ত্রাস-আতংক হবে আরো অধিক ভয়ংকর।

সূরা নাবা ঃ আয়াত ৬—১৬

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ﴿۶﴾ وَّ الۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ﴿۷﴾ وَّ خَلَقۡنٰکُمۡ
اَزۡوَاجًا ﴿۸﴾ وَّ جَعَلۡنَا نَوۡمَکُمۡ سُبَاتًا ﴿۹﴾ وَّ جَعَلۡنَا الَّیۡلَ لِبَاسًا ﴿۱۰﴾
وَّ جَعَلۡنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿۱۱﴾ وَّ بَنَیۡنَا فَوۡقَکُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا ﴿۱۲﴾ وَّ
جَعَلۡنَا سِرَاجًا وَّ هَّاجًا ﴿۱۳﴾ وَّ اَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا ﴿۱۴﴾ لِّنُخۡرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ﴿۱۵﴾ وَّ جَنّٰتٍ اَلۡفَافًا ﴿۱۶﴾

q আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা
q ও পর্বতসমূহকে কীলক?
q আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায় জোড়ায়,
q তোমাদের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম,
q করিয়াছি রাত্রিকে আবরণ,
q এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,
q আর আমি নির্মাণ করিয়াছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ
q এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ।
q এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি,
r যাহাতে তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,
r ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ— তাকাও পৃথিবী ও পর্বতসমূহের দিকে। তারপর বলো, আমি কি ভূপৃষ্ঠকে শয্যাস্বরূপ বিছিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থির রাখবার জন্য কীলকরূপে পর্বতসমূহকে তার উপরে স্থাপন করিনি? প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি নিছক অনুকম্পাবশত এরকম তো করেছি আমিই। সুতরাং তোমরা আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে অথবা কোনো কিছুকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে কেনো? বলা বহুল্য, এখানে এমতো প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে মানুষকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি অনুপ্রাণিত করণার্থে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় (৮), তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম (৯), করেছি রাত্রিকে আবরণ (১০), এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়' (১১)।

এখানে 'সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়' অর্থ তোমাদেরকে করেছি নারী, অথবা পুরুষ। 'নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম' অর্থ পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের নিমিত্ত বানিয়েছি নিদ্রাকে। এখানে 'সুবাতান' অর্থ বিশ্রাম। এর শাব্দিক অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। পরিধেয় বসন যেমন বিচ্ছিন্ন করে জনদৃষ্টিকে, নিদ্রাও তেমনি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় সকল জনসম্পৃক্ততা ও কর্মব্যস্ততা থেকে। 'রাত্রিকে করেছি আবরণ' অর্থ রাতকেই আমি নির্ধারণ করেছি বিশ্রাম গ্রহণের জন্য প্রকৃষ্ট সময়রূপে। তাই স্বাভাবিকভাবে তখন মানুষের কলকোলাহল থেকে রাতের আবরণে ঢেকে যায় দিবসের কর্মব্যস্ততা। আর 'দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময় অর্থ উপার্জন, জাগতিক কর্মসম্পাদন এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য শরিয়তের বিধি-বিধানাদি পালনের সময়রূপে আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি দিনকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ (১২) এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ' (১৩)। এখানে 'সিরাজাঁও ওয়াহ্হাজা' অর্থ প্রোজ্জ্বল প্রদীপ, সূর্য। মুকাতিল বলেছেন, সূর্য অত্যুপ্ত বলেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'ওয়াহ্হাজ' শব্দটি। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক সূর্যকে দান করেছেন আলোক ও উত্তাপ উভয়টিই।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা থেকে প্রচুর বারি'। এখানে 'মু'সিরাত' অর্থ ওই মৌসুমী বায়ু, যা বৃষ্টিপাত ঘটায়। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। মুজাহিদ, মুকাতিল ও কালাবীর অভিমতও এরকম। আবুল আলিয়া ও জুহাক বলেছেন, 'আল মু'সিরাত' অর্থ মেঘপুঞ্জ। ওয়ালেব সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ফাররা বলেছেন, 'আল মু'সিরাত' বলে বর্ষণোদ্যত বৃষ্টিবাহী মেঘকে। যেমন বলা হয় 'আল মারআতু মু'সিরাহ্' (ঋতু-আসন্ন নারী)। ইবনে কীসান শব্দটির অর্থ করেছেন— বর্ষণমুখর মেঘমালা। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জায়েদ ইবনে আসলাম ও মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন,

‘আল মু’সিরাত’ অর্থ আকাশ। মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার ‘মিনাল মু’সিরাত’ কথাটির ‘মিন’ অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অন্যান্যরা বলেন, সূচনাজ্ঞাপক। মুজাহিদ এখানকার ‘ছাজ্জ্বাজ্বা’ কথাটির অর্থ করেছেন— প্রচুর বর্ষণ। কাতাদা বলেছেন, নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, অতিবৃষ্টি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘যাতে তদ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ (১৫), ও ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান’ (১৬)। একথার অর্থ— বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে আমিই ভূমিতে উৎপন্ন করি মানুষের জন্য গম, যব, ধান, সবজী ইত্যাদি এবং পশুদের জন্য ঘাস। এভাবে ভূপৃষ্ঠকে সজ্জিত ও সমৃদ্ধ করি উদ্যানে ও অরণ্যে।

এখানে ‘জান্নাতিন আলফাফা’ অর্থ ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান। ‘আলফাফ’ বহুবচন ‘লাফফুন’ এর, যেমন ‘আজজ্বাউন’ বহুবচন ‘জ্বাজাউন’ এর। অথবা ‘আলফাফ’ বহুবচন ‘লাফীফুন’ এর, যেমন ‘আশরাফ’ বহুবচন ‘শরীফুন’ এর। অথবা শব্দটি এমন এক বহুবচন, যার একবচন হয় না। যেমন ‘আওদ্ব’। শব্দটিকে যদি ‘লাফ্‌ফুন’ এর বহুবচন ধরা হয়, তবে একে বলতে হবে বহুবচনের বহুবচন। কেননা ‘লাফ্‌ফুন’ আবার বহুবচন ‘লাফ্‌ফাফাতুন’ এর। বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট হলে তাকে বলা হয় ‘আলফাফ’। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘জান্নাতুন আলফাফা’। এভাবে এখানে একথাটিই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যেহেতু আকাশ, সূর্য, মেঘমালা, বৃষ্টি, অরণ্য-উদ্যান, শস্য-উদ্ভিদ ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেহেতু মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থানও তিনি ঘটাতে পারবেন। কেননা প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর।

সূরা নাবা ঃ আয়াত **১৭, ১৮, ১৯, ২০**

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

r নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস;

r সেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে,

r আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।

r এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস’। একথার অর্থ— মহাবিচার পর্ব অবশ্যম্ভাবী, যা অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থানের পর। সেদিনই প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করা হবে অনন্তকালীন পুরস্কার, অথবা তিরস্কার।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমবেত হবে'। বাক্যটি আগের আয়াতের 'ইয়াওমিল ফাসলি' (বিচার দিবস) এর অনুবর্তী, অথবা বর্ণনামূলক যোজ্য। কিংবা অনুবর্তী আগের আয়াতের 'মীক্বাত্বা' (নির্ধারিত রয়েছে) কথাটির। বা 'কানা' অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিতীয় বিধেয়।

বিশুদ্ধ সূত্র সহযোগে সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, শিঙ্গা হবে শিঙের আকৃতিবিশিষ্ট। মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে হজরত ইসরাফিলের হস্তধৃত ওই শিঙ্গাতেই ফুৎকার দেওয়া হবে। হজরত ইবনে ওমরও এরকম বলেছেন। বিষয়টির বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা হাক্বক্বা'র তাফসীরে। ওয়াহাব বলেছেন, শিঙ্গার গঠন প্রকৃতি হবে শুভ্র মুক্তা সদৃশ। শিঙ্গাটি হবে অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সুরা আল মুদ্দাছ্ছিরে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন ওই শিঙ্গায় দ্বিতীয় বারের মতো ফুৎকার ধ্বনিত হবে, তখন সকলে তাদের আপন আপন সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়ে দ্রুতগতিতে গমন করতে থাকবে বিচার-প্রান্তরের দিকে।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে সমবেত জনতা বিভক্ত হবে তিন শ্রেণীতে। এক শ্রেণী হবে প্রতুল পানাহারে পরিতৃপ্ত, অভিজাত পরিচ্ছদে সজ্জিত এবং সুদৃশ্য বাহনে আরুঢ়। দ্বিতীয় শ্রেণী ধাবিত হবে পদব্রজে। আর তৃতীয় শ্রেণীটি হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তারা হাজির হবে অধোমুখী হয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে। নাসাঈ, হাকেম, বায়যাবী।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন রসুল স. একবার আমাদেরকে 'সেই দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে' এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন, মহাবিচারের দিবসে আমার উম্মত বিভক্ত হবে দশটি শ্রেণীতে। তাদের মধ্যে একদল হবে বানরের মতো (ক্বদরিয়া সম্প্রদায়), এক দল হবে শূকরের আকৃতিবিশিষ্ট (মুরজিয়া সম্প্রদায়), এক দল হবে শূয়োর-কুকুরের মতো (হারুরিয়া সম্প্রদায়)। গাধার আকৃতিবিশিষ্ট হবে রাফেজীরা। অহংকারীরা হবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো, সুদখোরেরা বন্য পশুর মতো। পরচর্চাকারী এবং মূর্তিনির্মাতারা চলতে থাকবে মুখে ভর দিয়ে। একদল চলতে থাকবে হেলে দুলে নির্ভয়ে। তারাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন। আর পান ভোজনে পরিতৃপ্ত অবস্থায় থাকবে দক্ষিণ দিকের দল। ইবনে আসাকের হাদিসটি লিপিবদ্ধ করবার পর মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটিকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। কেননা এর সূত্রপরম্পরার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কতিপয় অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারী।

হাদিসটি আবার খতিব বাগদাদীর 'আস্‌সিরাজুম্ মুনীর' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— সেদিন আমার উম্মতের হবে দশটি দল। তাদের মধ্যে পরচর্চাকারীদের চেহারা হবে বানরের মতো, হারাম ভক্ষণকারীদের চেহারা হবে শূকরের মতো। সুদখোরেরা তাদের নিজেদের পা কাঁধে নিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে

চলবে। যারা অন্যায় বিচার করে তারা উঠবে অন্ধ হয়ে এবং তারা তাদের মাথা দোলাতে থাকবে এদিকে ওদিকে। দাম্ভিকেরা হবে বধির। যে সকল আলেম বক্তার আমল তাদের কথার বিপরীত, তাদের জিহ্বা তখন ঝুলে পড়বে তাদের বুকের কাছে। আর তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকবে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত ও পুঁজ। প্রতিবেশীদেরকে ক্লেশ প্রদানকারীরা উঠবে হাত পা কর্তিত অবস্থায়। আগুনের তক্তার উপরে আসীন থাকবে পর নিন্দাকারীরা। গলিত মৃতদেহের চেয়ে অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হবে প্রবৃত্তিতাড়িতরা, যারা খর্ব করে অপরের অধিকার। জাকাত ও উশর যারা যথাপাত্রে বিতরণ করে না, তাদের পরনে থাকবে সেদিন আলকাতরার চাদর। হজরত মুয়াজ থেকে হজরত বারা ইবনে আজীবও এরকম বর্ণনা করেছেন, যা সংকলন করেছেন ছা'লাবী।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর বিবরণ এসেছে এভাবে— ১. ক্বদরিয়া ঃ তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ্‌কে কর্মের স্রষ্টা হিসেবে তারা মানেই না। ২. মরজিয়া ঃ তারা বলে, যার ইমান ঠিক, তার পাপ তার জন্য ক্ষতিকারক নয়। তাদের কাছে আমলের কোনো গুরুত্বই নেই। ৩. হারুরিয়া ঃ তারা খারেজীদের একটি উপদল। হারুরী নামক স্থানে তারা সেনাসমাবেশ ঘটিয়েছিলো। হারুরিয়া নামে কুখ্যাত তারা সেকারণেই। তাদের অভিমত হচ্ছে আমল ইমানের অবিচ্ছেদ অঙ্গ। তাই লঘু পাপ করলেও ইমান চলে যায়। তারা হজরত ওসমান, হজরত আলী এবং হজরত মুয়াবিয়াকে কাফের বলে। ৪. রাফেজী ঃ এদের মতবাদ মরজিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মত হচ্ছে, অল্প কয়েকজন সাহাবী ইমানদার ছিলেন, আর হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর সহ অন্যান্য সকলেই ছিলেন ইমানহারা। তারা আরো বলে, খেলাফতের অধিকারী ছিলেন কেবল হজরত আলী। তার কাছ থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঐকমত্য (ইজমা) কোনো দলিল নয়। খেলাফত ও ইমামত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত। নবুয়তের উপর যেমন ইমান আনা অত্যাবশ্যক, তেমনি ইমান আনা অত্যাবশ্যক ইমামতের প্রতি। পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর এমতো অপবিশ্বাস থেকে আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহুদ্বারবিশিষ্ট'। এখানে 'আবওয়াবান' (বহু দ্বারবিশিষ্ট) কথাটির সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ বহুদ্বারবিশিষ্ট হবে আকাশ। অথবা গুরুত্ব সহকারে আকাশকেই এখানে বলা হয়েছে দরজা। অর্থাৎ আকাশে তখন এতো বেশী সংখ্যক দরজা দৃষ্ট হবে যে, মনে হবে সম্পূর্ণ আকাশই দরজাময়।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা'। একথার অর্থ— তখন পাহাড়-পর্বতগুলোকে করা হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। ফলে সেগুলো অণুপরমাণুর মতো ভাসতে থাকবে শূন্যমার্গে। অর্থাৎ সেগুলোর কোনো চিহ্নই আর তখন খুঁজে পাওয়া যাবে

না, যেমন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না মরীচিকার। ‘সারাব’ এর আভিধানিক অর্থ— যাওয়া, প্রস্থান করা। মরীচিকাকেও বলে ‘সারাব’। এই উপমাটি এখানে আনা হয়েছে একথা বোঝাতে যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ পাহাড় পবর্তগুলোর কোনো চিহ্নই আর তখন থাকবে না।

সূরা নাবা ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَّكَذَّبُوا بِـَٔايٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

q নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে;
q সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল।
q সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে,
q সেথায় উহারা আস্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—
q ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত;
q ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।
q উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,
q এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল।
q সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।
q অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করিব।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় অবাধ্যদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম তাদের জন্য ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছে। এখানে ‘কানাত মিরসাদা’ অর্থ অপেক্ষা করছে, ওঁৎ পেতে আছে। ‘রসদ’ অর্থ অপেক্ষা, প্রস্তুতি। বক্তব্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— শাস্তি ও স্বস্তির ফেরেশতারা নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকবে পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের দিকে। শাস্তির ফেরেশতারা তখন অবাধ্যদেরকে ধরে ধরে নিক্ষেপ করবে নরকে। আর স্বস্তির ফেরেশতারা হবে বিশ্বাসীগণের সুহৃদ। তাঁরা তাঁদেরকে রক্ষা করবে পুলসিরাতের দু’পাশের নরকানলোত্তাপ থেকে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সেদিন পুলসিরাত অতিক্রম করতে বলা হবে বিশ্বাসীদেরকেও। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘তোমরা প্রত্যেকে অতিক্রম

করতে থাকবে জাহান্নাম'। এমতাবাস্থায় 'মিরসাদ' এর অর্থ হবে পথ। এরকমও বলা হয়েছে যে, 'মিরসাদ' অর্থ অবিশ্বাসীদের জন্য নির্মিত। যেমন বলা হয় 'আরসত্তুশ্ শাই (আমি অমুক বস্তু নির্মাণ করছি)। হতে পারে, এখানকার 'মিরসাদ' শব্দরূপটি আধিক্যজ্ঞাপক। অর্থাৎ ওই ফেরেশতারা তখন তাদের দৃষ্টিকে রাখবে সতত সচকিত, যাতে করে একজন অবিশ্বাসীও হাত ফসকে না যায়।

হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, পুলসিরাত অসি অপেক্ষাও অধিক ধারালো। তখন বিশ্বাসী ও বিশ্বাসবতীগণকে নিরাপত্তা প্রদান করবে ফেরেশতারা। জিবরাইল ধরে রাখবে আমার কটিদেশ। আমি বলবো, হে আমার প্রভুপালয়িতা! রক্ষা করো! রক্ষা করো! তখন পুলসিরাত থেকে পতিত হবে অসংখ্য নর-নারী। হজরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের থেকে ইবনে মোবারক, বায়হাকী ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকের উপরে অবস্থিত পুলসিরাত হবে তলোয়ারের চেয়েও অধিক শানিত। তার দুই পাশ হবে কণ্টকাকীর্ণ আকর্ষীযুক্ত। ওগুলো উত্তোলন করবে মানুষকে। আমার জীবনাধিকারী পবিত্রতম প্রভুপালকের শপথ! ওই আকর্ষীগুলো মুজার ও রবীয়া গোত্রের লোকদের চেয়েও অধিকসংখ্যক লোককে ধরে ফেলবে। পাশে দণ্ডায়মান ফেরেশতারা মুহুর্মুহু উচ্চারণ করতে থাকবে— ইলাহী ! রক্ষা করো! রক্ষা করো!

হজরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তরবারীর ধারের চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট হবে পুলসিরাত। হবে পিচ্ছিল ও এবড়ো থেবড়ো। কিছুসংখ্যক ফেরেশতা তার পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, বাঁচাও বাঁচাও। আবার কিছুসংখ্যক ফেরেশতা আকর্ষীতে গেঁথে গেঁথে তুলতে থাকবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

মুকসিম সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জনগণকে পুলসিরাতের উপরে সাতটি স্থানে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রথম স্থানে প্রশ্ন করা হবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে কিনা। দ্বিতীয় স্থানে প্রশ্ন করা হবে নামাজ সম্পর্কে। তৃতীয় স্থানে জাকাত সম্পর্কে, চতুর্থ স্থানে রোজা সম্পর্কে, পঞ্চম স্থানে হজ সম্পর্কে, ষষ্ঠ স্থানে ওমরা সম্পর্কে এবং সপ্তম স্থানে বান্দার হক সম্পর্কে। এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে তো ভালোই, যদি এ সকল আমলে কিছু ত্রুটি থাকে, তবে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে নফল ইবাদতের দ্বারা। এভাবে অবশেষে বিশ্বাসীগণকে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন যে স্থানে আটকে যাবে, সে স্থান থেকেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

এখানে 'ত্বগীন' অর্থ পাপের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রমকারী, সীমালংঘনকারী। মৌখিকভাবে অবিশ্বাস প্রকাশকারীকে বলে কাফের। আর মনে-মুখে অবিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়াকে বলে 'ত্বগী'। যেমন রাফেজী, খারেজী, কৃদরিয়া, মরজিয়া, (বর্তমান যুগের কাদিয়ানি, মওদুদী) ইত্যাদি। আর এখানকার 'মাআব' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। পদটি 'কানাত' এর দ্বিতীয় বিধেয়।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে'। এখানে 'আহক্বাবা' অর্থ যুগ যুগ ধরে। শব্দটি 'হাক্বব' এর বহুবচন। জাহান্নামের একদিন হবে পৃথিবীর একহাজার বৎসরের সমান। এভাবে পরকালের আশি বৎসরের সমান হবে এক 'হোক্ববা'। সুতরাং এখানকার 'যুগ যুগ ধরে' কথাটির অর্থ হবে হোক্ববা হোক্ববা ধরে। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে বাগবী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে হান্নাদ। মুজাহিদ পরিসংখ্যান দিয়েছেন এরকম— এক হাজার বছরে একদিন, এই হিসেবে তিন শত ষাট বছরে এক বছর। সাত শত বছরে এক খরীফ। সত্তর খরীফে এক হোক্ববা এবং তেতাল্লিশ হোক্ববায় এক আহক্বাব। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, সত্তর হাজার বছরে হয় এক হোক্ববা।

একটি সংশয় ঃ আহক্বাব যতোই দীর্ঘ হোক না কেনো, তা তো এক সময় শেষ হয়ে যাবেই। অর্থাৎ আহক্বাব অন্তহীন নয়। অথচ কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে দোজখীদের অনন্ত দোজখবাসের কথা। যেমন 'ওয়াফীল আ'জাবিহুম খলিদূন' (তারা শাস্তি পেতে থাকবে অনন্তকাল ধরে)। বিষয়টি ঐকমত্যসম্মতও। মুররা ইবনে আবদুল্লাহ্র উক্তি উল্লেখ করে সুদ্দী বলেছেন, দোজখবাসীরা যদি জানতে পারে, তাদেরকে দোজখে থাকতে হবে ততোদিন পর্যন্ত, যতোগুলি প্রস্তরকণা আছে এই পৃথিবীতে, তবুও তারা উৎফুল্ল হবে এই ভেবে যে, একদিন না একদিন তারা নিষ্কৃতি পাবেই। আর বেহেশতবাসীরা যদি জানে পৃথিবীতে যতো প্রস্তরকণা রয়েছে, তাদের বেহেশতবাসও ততোদিনের, তবু তারা হবে বিমর্ষ এই ভেবে যে, এই সুখ তাহলে তো চিরন্তন নয়। তাই প্রশ্ন— তাহলে এখানে আহক্বাব বলা হলো কেনো?

সংশয়ভঞ্জন ঃ উদ্ভূত সংশয় নিরসনার্থে একদল কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতখানি রহিত (মনসুখ)। আর এর রহিতকারী আয়াত হচ্ছে 'ফালান নাযীদাকুম ইল্লা আ'জাবা' (আমি তাদের শাস্তি কেবল বাড়িয়েই দিবো)। অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে শাস্তি কেবল বর্ধিতই করা হবে দোজখীদের।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত বিজ্ঞপ্তিমূলক। আর বিজ্ঞপ্তি কখনো রহিত হয় না। রহিত হয় বিধান। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্পাক এখানে জাহান্নামবাসের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করে দেননি। বলেছেন 'আহক্বাবা' (যুগ যুগ ধরে)। অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে তাদের শাস্তি, যা কখনো নিঃশেষ হবে না। আমি বলি, বিষয়বস্তু কখনো বক্তব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। একারণেই আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরজাহান্নামী বলে জানি। তবে আলোচ্য আয়াতখানি নিশ্চয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর 'আহক্বাব'কে অনন্তকাল বলে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি অ-সবল। কেননা শব্দটি এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে মর্মার্থের বিপরীত ধারণা অপসারণার্থে। সুতরাং শব্দটির অর্থ অনন্তকাল নয়।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'হাক্বিব' এর বহুবচনরূপে আহক্বাব এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অবস্থাপ্রকাশক হিসেবে। যেমন বলা হয় 'হাক্বাবার রজুলু' (লোকটির জীবিকা রুদ্ধ হয়েছে)। অর্থাৎ সে উপজীবিকা থেকে হয়েছে বঞ্চিত। আবার যেমন 'হাক্বাবাল আ'লাক্বু' (পৃথিবীতে বৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছে)। অর্থাৎ পৃথিবী বঞ্চিত হয়েছে বৃষ্টি থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জাহান্নামবাসীরা বসবাস করতে থাকবে রিজিকবঞ্চিত অবস্থায়। কোনো আহার্যই তাদের জুটবে না। পরবর্তী আয়াতে সেকথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে 'সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোনো পানীয়'। আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যা হজরত আলী প্রমুখ সাহাবীগণের উক্তির বিপরীত। আর একথা তো মানতেই হবে যে, ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ এখানে একদম নেই। তাই সাহাবীবচনকে গ্রহণ করাই সমীচীন। কেননা তা সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মতোই অবশ্য মাননীয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোনো পানীয়— (২৪) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত' (২৫)। বাক্যটি আগের আয়াতের 'লাবিছীনা' (অবস্থান করবে) কথাটির অবস্থাপ্রকাশক, অথবা 'আহক্বাবা' (যুগ যুগ ধরে) এর বিশেষণ, কিংবা সেখানকার 'আহক্বাবা' এখানকার 'লা ইয়াজূক্বূনা' এর কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং পান করতে থাকবে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আস্বাদ্য পানভোজন তাদের ভাগ্যে কখনোই জুটবে না।

আমি বলি, ২২ সংখ্যক আয়াতের 'ত্বগীন' শব্দটির অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মনে করার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে জটিলতার। 'ত্বগীন' (সীমালংঘনকারী) বলে যদি কেবল 'বেদাতী' (রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি) অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে বিষয়টি আর জটিল থাকে না। কেননা বেদাতীরাও যেহেতু ইসলামের দাবিদার, তাই প্রকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো তারা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামে অবস্থান করবে না। একসময় তারা নিষ্কৃতি পাবেই। তাই 'আহক্বাবা' কথাটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়াই সমীচীন। অর্থাৎ যুগের পর যুগ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর তারা একসময় নিষ্কৃতি পাবে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আমার এমতো অভিমতের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আহক্বাব পূরণ না করা পর্যন্ত কেউ নরকাগ্নি থেকে নিস্তার পাবে না। আশি বৎসরের কিঞ্চিদধিক সময় কালকে বলে 'হাক্বব'। আর সেখানকার প্রত্যেক বৎসর হবে এখানকার তিন শত ষাট দিনের। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা 'ত্বগীন' তারা নির্ধারিত 'হোক্ববা' পূর্ণ করার পর বেরিয়ে আসবে নরক থেকে।

'হামীমা' অর্থ ফুটন্ত পানি। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, লোহার চিমটা দিয়ে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানির কাছে। ওই অতুষ্ণ পানির কাছে গেলেই ঝলসে যাবে তাদের মুখমণ্ডল। আর তা পান করলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে পেটের নাড়িভুঁড়ি। তিরমিজি ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু দারদা থেকে।

আর 'গাস্‌সাক্ব' অর্থ সীমাতিরিক্ত হিমশীতল। মুজাহিদ সূত্রে হান্নাদ এরকম বলেছেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে ওই পানীয় জাহান্নামীরা গলাধঃকরণ করতে পারবে না। মুকাতিল বলেছেন, যে শীতলতা হিমাংকের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, তাকেই বলে 'গাস্‌সাক্ব'। আবুল আলিয়ার বক্তব্যের অনুসরণে হান্নাদ বলেছেন, 'ইল্‌লা হামীমাঁও ওয়া গাস্‌সাক্বা' এই আয়াতে 'পানীয় সমূহের মধ্যে উষ্ণতর পানিকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে 'গাস্‌সাক্ব' থেকে। আর হান্নাদের বর্ণনানুসারে আতিয়ার অভিমতানুযায়ী 'গাস্‌সাক্ব' অর্থ জাহান্নামীদের প্রবাহিত রক্ত, পুঁজ। ইব্রাহিম নাখয়ী এবং আবু রযীনের অভিমতও এরকম। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে 'গাস্‌সাক্ব' এর ধাতুমূল হয় 'গাসাক্বাত' (প্রবহমান)। কা'বের উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বলেন, 'গাস্‌সাক্ব' নরকের একটি সরোবরের নাম। সেখানে জমা করা হবে সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য বিষধর প্রাণীর বিষ। সেখানে কোনো নারকীকে একবার মাত্র ডুবিয়ে দিলেই প্রচণ্ড বিষের প্রকোপে গোশত ও চামড়া খসে পড়বে তার অস্থিকাঠামো থেকে। তখন ওই নারকী তার ঝুলে পড়া গোশত ও চামড়া এমনভাবে টেনে নিয়ে ফিরবে, যেমনভাবে টেনে নিয়ে বেড়ায় কোনো অতিপ্রশস্ত বস্ত্রধারী তার বস্ত্র। যাহোক, বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে এখানে 'গাস্‌সাক্ব' অর্থ যদি অতি শৈত্য নেওয়া হয়, তবে বলতে হয় শব্দটি ব্যতিক্রম হয়েছে 'বারদান' থেকে। নচেৎ 'হামীম' ও 'গাসসাক্ব' দু'টো শব্দই ব্যতিক্রম হবে 'শারাবান' থেকে। এমতাবস্থায় 'বারদান' এর মর্মার্থ হবে জাহান্নামের অত্যধিক শৈত্য। আর 'শারাব' অর্থ হবে ওই জাতীয় পানীয়, যদ্দারা পিপাসিতরা পরিতৃপ্ত হয়। মোট কথা, সেরকম পরিতৃপ্তিদায়ক পানীয় নারকীদের ভাগ্যে জুটবেই না। জুটবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এটাই উপযুক্ত প্রতিফল'। বাক্যটি একটি উহ্য ক্রিয়াপদের সাধারণ কর্মপদ। 'উইফাক্বা' অর্থ অনুরূপ, সদৃশ, উপযুক্ত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তাদেরকে প্রদত্ত ওই শাস্তি হবে তাদেরই অপকর্মসমূহের অনুরূপ। অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল, উপযুক্ত প্রতিফল। মুকাতিল বলেছেন, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের পাপ অনুপাতে। শিরিক যেহেতু সর্ববৃহৎ পাপ, তাই তার শাস্তিও হবে ভয়াবহতম। অবশ্য এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করা যাবে তখন, যখন 'ত্বগীন' অর্থ গ্রহণ করা হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যেমন অর্থ করেছেন কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা। লক্ষণীয়, ২১ সংখ্যক আয়াতের 'নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে' বাক্যটি 'জ্বাযা' (প্রতিফল) এর প্রতিই ইঙ্গিতবাহী। সুতরাং অন্য কোনো অর্থ গ্রহণের সুযোগ এখানে নেই। তাই বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের গুরুত্ব আরোপক।

তবে আমাদের ভাষ্যমতে যদি 'ত্বগীন' অর্থ বেদাতীদল করা হয়, তবে এখানকার 'জ্বাযাআন' শব্দটিকে পূর্বোক্ত বাক্যের গুরুত্বআরোপক বলা যাবে না। বরং এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে ভিন্নতর এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বেদাতীরা শাস্তি পাবে তাদের স্ব স্ব অপবিশ্বাসানুপাতে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন মেয়াদে। এভাবে পূর্ণ হবে তাদের 'আহক্বাব'। কমপক্ষে তাদেরকে এক হোক্ববা শাস্তি ভোগ করতে তো হবেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতো না (২৭), এবং তারা দৃঢ়তার সঙ্গে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করতো' (২৮)। একথার অর্থ— পরকালের হিসাব-নিকাশ হওয়ার কথা স্বীকার না করা এবং আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেই সেদিন তাদেরকে দেওয়া হবে উপযুক্ত শাস্তি। উল্লেখ্য, বেদাতীদের কোনো কোনো দলও আখেরাতের হিসাব-নিকাশে আস্থাশীল নয়। যেমন মরজিয়ারা। আবার রাফেজীরা বলে, হজরত আলীর অনুসারী ও সুহৃদগণের লঘু-গুরু কোনো পাপেরই শাস্তি হবে না। তারা মান্যবর সাহাবীগণের মাহাত্ম্য অস্বীকারকারী। কেবল তিনজন সাহাবী ছাড়া অনান্য সকলকে তারা বলে মুরতাদ ও মুনাফিক। তাদের প্রবল ধারণা, হজরত আলীর পূর্ববর্তী ত্রয়ী খলিফার শাসনামল ছিলো বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। সাহাবীগণের যুগকেই তারা সর্বনিকৃষ্ট যুগ বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন 'যাদেরকে আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, তারা নামাজ আদায় করতো' 'অবশ্যই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি পরিতুষ্ট, যারা বৃক্ষতলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো আপনার হাতে। আল্লাহ্ জানেন তাদের হৃদয়ে কী আছে', 'মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে প্রথম অগ্রবর্তী দল হবে'। তাঁদের প্রশংসা ঘোষিত হয়েছে আরো অনেক আয়াতেও।

'কিজ্জাবান' শব্দটি ধাতুমূল, অসত্যারোপের সমঅর্থবহ। অর্থাৎ অস্বীকার করতো। এটা হচ্ছে শব্দটির সাধারণ ব্যবহার রীতি। অথবা 'কিজ্জাবান' 'মুফায়িলাতের' পরিমাপে ধাতুমূল 'মুকাজিবাতুন' এর। অর্থাৎ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা একে অপরের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী। কিংবা 'কিজ্জাবান' শব্দরূপটি আধিক্যজ্ঞাপক। মর্মার্থ— তারা অন্যান্য মিথ্যাবাদীর মতোই সাংঘাতিক মিথ্যাবাদী।

মাসআলা ঃ আমাদের ভাষ্যমতে আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়— বেদাতীরা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে প্রবেশ করবে কবীরা গোনাহ্কারীদেরও কেউ কেউ। আর তারা সেখানে অবস্থান করবে সাত হাজার বছর। তাদের জন্য ফুটন্ত পানি ও পুঁজ সরবরাহ করা হবে না। দেওয়া হবে না অন্যান্য ভয়াবহ শাস্তিও।

হজরত আলী থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে শাহীন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্কারী যে সকল বিশ্বাসী তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের চোখ পীতবর্ণ হবে না, কৃষ্ণবর্ণধারণ করবে না তাদের মুখমণ্ডল, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে না তাদেরকে শয়তানের সাথে এবং বেড়ি পরানো হবে না গলদেশেও। তাদেরকে পান করানো হবে না হামীম, পরিধান করানো হবে না আলকাতরার পোশাক। আল্লাহ্পাক তাদের শরীরের জন্য হারাম করে দিয়েছেন অনন্ত নরকবাস। সেজদা করার কারণে আল্লাহ্পাক তাদের মুখমণ্ডলকে নরকের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আগুন স্পর্শ করবে তাদের কারো কারো পা, কারো কারো হাঁটু, কারো

কারো কটিদেশ এবং কারো কারো গলদেশ। তারা এভাবে শাস্তিগ্রস্ত হবে তাদের পাপ ও অপকর্মের অনুপাতে। কেউ সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাবে এক বৎসর পর, কেউ আরো বেশী, আবার কেউ তারো বেশী। এভাবে তাদের পাপ যতো বেশী হোক না কেনো, তারা পৃথিবীর আয়ুষ্কালের পর, অর্থাৎ সর্বোচ্চ সাত হাজার বছর পর নরক থেকে নিষ্কৃতি পাবেই। হাকেম তাঁর নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থেও এরূপ হাদিস সংকলন করেছেন। সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এই কথাগুলোও— তাদের লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত করা হবে না, নিক্ষেপ করা হবে না নিম্নতর স্তরে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নরক থেকে বের হয়ে আসবে এক ঘণ্টা অবস্থানের পর, কেউ একদিন পর, কেউ এক বছর পর। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি ভোগকারীরা সেখানে অবস্থান করবে পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সমান সময়, অর্থাৎ সাত হাজার বছর।

আমি বলি, তাদের নরকবাসের দিন-মাস গণনা করা হতে পারে পৃথিবীর দিন-মাসের গণনা অনুসারে। নচেৎ শেষের 'সাত হাজার বছর' কথাটির সঙ্গে তা হবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কতিপয় সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, কোনো কোনো গুরুতর পাপী বিশ্বাসীকে আল্লাহ্‌পাক অগ্নিশাস্তিতে নিপতিত করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদান করবেন। পরে যখন শাফায়াতের কারণে সাধারণভাবে তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হবে, তখন তিনি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং ক্ষমা করে বের করে দিবেন নরক থেকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থা হবে এর বিপরীত। তারা সেখানে মরবেও না, স্বস্তিমতো বাঁচবেও না।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে' বাক্যটি একটি অনুক্ত ক্রিয়াপদের কর্মপদ, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়াপদ 'সংরক্ষণ করেছি' দ্বারা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী অথবা বেদাতীদের প্রত্যেক কর্মই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

'আহ্‌সাইনাহু কিতাবা' অর্থ সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে। এখানে 'কিতাবা' শব্দটি পার্থক্যকারী অথবা অবস্থাপ্রকাশক। 'কিতাব' শব্দটি এখানে ধাতুমূল ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদার্থে। অথবা এটি একটি সাধারণ কর্মপদ। যেমন বলা হয় 'দ্বরাবৃতু হুম সুউতান' (আমি তাকে চাবুকের মার মেরেছি)। অর্থাৎ আমি তার প্রতিটি কর্মই কুক্ষিগত করেছি, যেমন আয়ত্তভূত করা হয় লিপিবদ্ধ করে। অথবা বলা যায় এখানকার 'কিতাবান' একটি অনুক্ত ক্রিয়াপদের কর্মপদ। অর্থাৎ আমি তার কর্মকে বেষ্টন করে নিয়েছি সংরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে) অথবা আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয়ের কর্মবিবরণীতে (আমলনামায়)। এমনও বলা হয়েছে যে, বাক্যটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। কিন্তু আমার মতে বাক্যটি ২৬ সংখ্যক আয়াতের 'উপযুক্ত' কথাটির নিমিত্ত, যেমন সেখানকার 'প্রতিফল' নিমিত্ত ২৭ সংখ্যক আয়াতের 'তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতো না' কথাটির। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে

এই নিমিত্ত শাস্তি দিবো যে, তারা হিসাব নিকাশের ধারই ধারতো না। আর এই শর্তটি হবে তাদের কর্মফলানুপাতে। কেননা তাদের দুষ্কৃতিগুলো আমার কাছে লিখিতরূপে সুসংরক্ষিত।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ করো, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করবো'। এখানকার 'ফাজুক্বু' এর 'ফা' (অতঃপর) অব্যয়টি নৈমিত্তিক। দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই অব্যয়টি। আর তোমরা বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) অথবা বেদাতীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যেহেতু তাদের সবকিছুই লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি, তাই তাদেরকে সেদিন বলবো, যে শাস্তির কথা আমি তোমাদেরকে পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলাম সেই শাস্তি এখন ভোগ করতে থাকো। আর এই শাস্তি আমি ক্রমাগত বর্ধিত করতেই থাকবো।

হজরত আবু বুরাইদা থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং পরিণতসূত্রে বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সমগ্র কোরআনপাকের মধ্যে নরকবাসীদের সম্পর্কে এই আয়াতখানি সর্বাধিক কঠোর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সূরা নাবা ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

- মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য,
- উদ্যান, দ্রাক্ষা,
- সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী
- এবং পূর্ণ পানপাত্র।

r সেথায় তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য;

r ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের,

r যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদের থাকিবে না।

r সেই দিন রূহ ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

r এই দিবস সুনিশ্চিত; অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

r আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম; সেই দিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হইতাম'!

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর তখন মুক্তাক্বীগণের অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের জন্য সেখানে থাকবে প্রভূত সুখোপকরণ। থাকবে কুসম-পরিকীর্ণ মনোরম কানন, চিরসতেজ দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সমবয়সিনী পূর্ণ যৌবনা ললনাকুল এবং অতি-আস্বাদ্য পানীয়পূর্ণ পানপাত্র। এখানে 'মাফাযান' অর্থ সাফল্য। পদটি ক্রিয়ার আধার। অর্থাৎ সাফল্যস্থল। 'কাওয়াইবা' অর্থ উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী। শব্দটি বহুবচন 'কাঈব' এর। 'আতরাবান' অর্থ সমবয়সিনী। আর 'দিহাক্বান' অর্থ পরিপূর্ণ। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন 'দিহাক্বান' অর্থ ক্রমান্বয়ে। আর ইকরামা বলেছেন, স্বচ্ছ।

পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য'। আলোচ্য আয়াতখানি মুক্তাক্বীগণের সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক। এখানকার 'ফীহা' এর 'হা' (সেখানে) সর্বনামটি সম্বন্ধযুক্ত হবে ৩১ সংখ্যক আয়াতের 'মাফাযান' এর সঙ্গে। এখানে মাফাযান অর্থ উদ্যান। অথবা বাক্যটি 'কা'সান' এর বিশেষণ। অর্থাৎ পার্থিব সোমরস পান করলে পানকারীরা যেমন অযথার্থ ও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে, স্বর্গের অধিবাসীরা সেখানকার শরাব পান করলে সেরকম কিছু বলবে না। এখানে 'লাগ্‌ওয়ান' অর্থ অসার কথা। আর 'কিজ্‌জাবান' অর্থ অসত্যারোপ করা। অর্থাৎ সেখানে কেউ কারো প্রতি অসত্যারোপ করবে না। কেননা অসত্য বলে কিছু সেখানে থাকবেই না। শব্দটিকে ক্বারী কাসায়ী পাঠ করতেন 'কিজাবান'। এভাবে পাঠ করলে শব্দটি হয় ধাতুমূল। কেউ কেউ বলেছেন, 'কিজ্‌জাব' অর্থ মিথ্যা বলা। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'কিজ্‌জাব' ও 'কাজাব' সমঅর্থসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'এটা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের'। এখানকার 'জ্বাযাআন' (পুরস্কার) এবং 'আ'ত্বাআন' (দান) দু'টো শব্দই ধাতুমূল এবং একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ, পূর্বোক্ত বাক্যের গুরুত্ববর্ধক, যেমন উল্লেখিত হয়েছে ২৬ সংখ্যক আয়াতের 'এটাই উপযুক্ত প্রতিফল' বাক্যের বিশেষণে। অর্থাৎ তাদেরকে দেওয়া হবে পরিপূর্ণ পুরস্কার ও পূর্ণ

প্রতিদান। আর এখানকার ‘হিসাবান’ পদটি ‘দান’ এর বিশেষণ। অর্থাৎ পরিপূর্ণ দান। যেমন ‘আহ্সাবতু ফুলানান’ বলে বুঝানো হয়— আমি তাকে এই পরিমাণ দিয়েছি, যা তার জন্য যথেষ্ট। এমনকি সে নিজেও বলেছে, যথেষ্ট।

ইবনে উতবা বলেছেন, ‘আ’ত্বাআন হিসাবান’ অর্থ বিশাল দান। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— কর্ম অনুপাতে দান। ‘কামুস’ অভিধানে বলা হয়েছে ‘হাজা হিসাবিহী’ বলে বুঝানো হয়, গণনায় এটা তার সমতুল। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য ২৬ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের ঠিক বিপরীত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কাফের ও বেদাতীরা যেমন তাদের অপকর্মানুপাতে শাস্তি ভোগ করবে, তেমনি পুণ্যকর্মানুপাতে পুরস্কৃত হবে মুত্তাক্বীরা।

আমি বলি, যেমন কর্ম তেমন প্রাপ্তি— এই নিয়মানুসারে মুত্তাক্বীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে না। বরং আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করবেন তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিগুণ, দশগুণ, বহুগুণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিগুণ দিবেন। আর তিনি অপ্রতুল বৈভবাধিকারী, অতিশয় প্রাজ্ঞ’। নৈকট্যভাজন (মুকাররাবীন)ও পুণ্যবান (আবরার)গণের প্রাপ্তি যোগেও ঘটবে তারতম্য। নৈকট্যভাজনেরা তাদের অল্প আমলের বিনিময় এতো বেশী পাবে যে, পুণ্যবানেরা অধিক আমল করেও তা পাবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা আমার সহচরবৃন্দের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কোরো না। তোমাদের উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণদানও তাদের অর্ধ সা যব দানের সমতুল হবে না। মান্যবর মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, সকল সাহাবী, অধিকাংশ তাবেয়ী এবং কিছুসংখ্যক তাবে তাবেয়ী ছিলেন আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যভাজন। তারা ছিলেন নবুয়তের উৎকর্ষ (কামালিয়াত) প্রাপ্ত। নবুয়ত-সূর্যের প্রখর কিরণে আসত্তা নিমজ্জিত থাকতেন তাঁরা। তাঁদের ওই তিন উত্তম যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর অন্তরালবর্তী হয় নবুয়তের সূর্যালোক। সুদীর্ঘ এক হাজার বৎসর পর পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে সেই সুমহান সূর্যের। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আবারও আল্লাহ্পাকের বিশেষ দয়ায় আসত্তা স্নাত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন নবুয়তের সেই মহান সূর্যের কিরণে। তাঁরা পরবর্তী, কিন্তু অবিকল পূর্ববর্তীগণের মতো। যেমন রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত বৃষ্টিপাতের মতো। দেখলে বুঝা যায় না, কোন অংশ উত্তম— প্রথম না শেষ। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

জাফর ইবনে মোহাম্মদের মান্যবর পিতামহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, উল্লসিত হও, শুভ সমাচার শোনো। আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টিপাতের মতো, বুঝা যায় না এর প্রথমাংশ উত্তম, না শেষাংশ। অথবা তারা যেনো ফলের বাগান, যা থেকে ফলাহরণ করে এক মওসুমে এক দল, অন্যদল পরের মওসুমে। হতে পারে শেষ দলই অধিক হৃষ্টপুষ্ট,

অধিক পুণ্যবান। বায়হাকী ও রজিন বর্ণনা করেছেন, জনৈক সাহাবী জানিয়েছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি রসুল স. বলেছেন, শেষ যুগে এই উম্মতের মধ্য থেকে উদ্ভব ঘটবে এমন এক সম্প্রদায়ের, যাদের বিনিময় প্রাপ্তি ঘটবে প্রথম যুগের উম্মতের মতো।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্তকিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না'।

কুফার ক্বারীগণ এখানকার শুরুর কথাটিকে পাঠ করতেন 'রব্বিস্ সামাওয়াতি'। অন্যান্য ক্বারীগণ পাঠ করতেন 'রব্বুস সামাওয়াতি'। আবার ক্বারী আসেম ও ক্বারী ইবনে আমের পাঠ করতেন 'আর রহমানি' যের সহযোগে এবং অন্যান্য ক্বারীগণ পেশ সহযোগে পাঠ করতেন 'আর রহমানু'। এভাবে যেরবিশিষ্ট পাঠ 'রব্বি' ও 'রহমানি' নামপদ দু'টো হবে আগের আয়াতের 'রব্বিকা' (প্রতিপালকের) এর বিশেষণ, অথবা অনুবর্তী। আর পেশবিশিষ্ট ক্বেরাতে 'রব্বুস্ সামাওয়াত' হবে উদ্দেশ্য এবং 'আর রহমানু' হবে বিধেয় এবং তার বিধেয় হবে 'লা ইয়ামলিকূনা'। আর 'লা ইয়ামলিকূনা মিনহু খিত্বাবা' অর্থ তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না। অর্থাৎ পরকালে আল্লাহ্পাকের এমনই মহত্ত্ব-মহিমা প্রকাশিত হবে যে, আকাশ-পৃথিবীর কেউই তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট কোনো প্রকার আবেদন-নিবেদন উত্থাপন করতে সাহসী হবে না। কালাবী বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ তখন শাফায়াত করতে পারবে না। অথবা মর্মার্থ হবে— কেউ তখন এমতো অনুযোগও উপস্থাপন করতে পারবে না যে, কাউকে কাউকে অত্যধিক বিনিময় দেওয়া হলো কেনো? কেননা সকলেই তাঁর দাস। সকলেরই এবং সবকিছুরই একক অধিকর্তা তিনিই। সুতরাং পুণ্যার্জন কারো অধিকার নয়, বরং তাঁর দয়া।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের পূর্ববর্তীদের দীর্ঘ সময়ের তুলনা আসর-মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের মতো। দৃষ্টান্তটি এরকম— এক মহাপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করার জন্য নিযুক্ত করলো একদল শ্রমিককে। মজুরী নির্ধারিত হলো এক কিরাত। এভাবে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত নির্ধারিত হলো এক কিরাত এবং আসর থেকে মাগরিবের সময়ের জন্য নির্ধারিত হলো দুই কিরাত। এই নির্ধারণানুসারেই কাজ করলো তিনদল শ্রমিক— ইহুদী, খৃষ্টান এবং তোমরা। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করলেন নির্ধারিত মজুরী। ইহুদী-খৃষ্টানেরা বললো, আমাদের শ্রম বেশী, মজুরী কম, আর তাদের শ্রম কম, মজুরী বেশী। আল্লাহ্ বললেন, আমি কি তোমাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছি? তারা জবাব দিল, না। আল্লাহ্ বললেন, এটা আমার নিছক অনুগ্রহ, আমি এভাবে অনুগৃহীত করি যাকে খুশী তাকে। বোখারী।

আমি বলি, দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়েছেন পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় তাঁর উম্মতের আয়ুর স্বল্পতার কথা। আসর থেকে মাগরিবের দৃষ্টান্তটি তিনি স. দিয়েছেন একারণেই। এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই উম্মতের আয়ুষ্কাল স্বল্প, কিন্তু পুণ্য সঞ্চয় করবে এরাই অধিক। দুই কিরাতের কথা তিনি স. বলেছেন পুণ্যার্জনের আধিক্য বুঝাতেই। যেমন বলা হয়েছে 'তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও দু'বার'। অর্থাৎ বার বার। আমাদের এই ব্যাখ্যাটি আগের আয়াতের বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে'। এখানকার 'সেই দিন' কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না' বাক্যটির সঙ্গে। অর্থাৎ সেদিন কেউই আল্লাহ্পাক সকাশে কোনো কথা বলতে পারবে না, যেদিন সকলে সমবেত হবে হাশর প্রান্তরে, সমবেত হবে রূহ ও ফেরেশতাগণও। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে এখানকার 'সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না' এর সঙ্গে। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক সুস্পষ্ট।

'রূহ' সম্পর্কে বিদ্বজ্জন বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। যেমন ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রূহ অবস্থান করে চতুর্থ আকাশে। আকাশ-পর্বতমালা-ফেরেশতা অপেক্ষাও তা বৃহৎ। প্রতিদিন সে বারো হাজার তসবীহ পাঠ করে। আর তার প্রতি তসবী থেকে আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করেন একটি করে ফেরেশতা। প্রতিফল দিবসে তারা দাঁড়াবে পৃথকভাবে সারিবদ্ধ হয়ে।

আলোচ্য আয়াতের 'রূহ' সম্পর্কে জুহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু শায়েখ বলেছেন, রূহ সব সময় আল্লাহ্পাকের বিশেষ সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান। ফেরেশতাদের চেয়ে অনেক বড়। যদি সে মুখব্যাদান করে তবে সকল ফেরেশতা স্থান গ্রহণ করতে পারবে তার মুখগহ্বরে। তাই ফেরেশতারা ভয়ে তার দিকে তাকায় না। বরং তারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। হজরত আলীর উক্তি উদ্ধৃত করে আবু শায়েখ বলেছেন, রূহ একজন ফেরেশতার নাম। তার মুখমণ্ডলের সংখ্যা সত্তর হাজার। প্রতিটি মুখে রয়েছে সত্তর হাজার করে রসনা। প্রতিটি রসনা থেকে কথা বের হয় সত্তর হাজার। আর তার প্রতিটি কথাই আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা জ্ঞাপক।

আতা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, একজন ফেরেশতার নাম রূহ। তার ডানার সংখ্যা সত্তর হাজার। তালহা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আকৃতিগতভাবে সে সকল ফেরেশতার চেয়ে বড়। আতা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মহাসমাবেশস্থলে রূহের জন্য নির্ধারিত থাকবে একক একটি সারি। অন্য ফেরেশতারা দাঁড়াবে পৃথক

একটি সারিতে। তবুও আকৃতিগতভাবে উভয় সারি হবে সমান। মুকাতিল ইবনে হাব্বানের বরাত দিয়ে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, মর্যাদার দিক দিয়েও রূহ সকল ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্যধন্য এবং সে প্রত্যাদেশধারকও।

জুহাক সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহ্‌পাকের সকাশে দাঁড়িয়ে থাকবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। নিবেদন জানাবে, পুতঃপবিত্র তুমি! তুমি ছাড়া আর কোনোই উপাস্য নেই। আমি এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অন্য কেউই তোমার যথাযোগ্য ইবাদত করার উপযোগী নয়।

মুজাহিদের উক্তিরূপে আবু নাঈম এবং হজরত উম্মে হানির মুক্তকৃত দাস আবু সালেহের উক্তিরূপে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, রূহ হচ্ছে মানবাকৃতিবিশিষ্ট আর এক ধরনের সৃষ্টি, যারা মানুষ নয়। কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, তারা এবং ফেরেশতারা দাঁড়াবে পৃথক দু'টি সারিতে। সুপরিণতসূত্রে মুজাহিদ সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন আল্লাহ্‌পাকের সেনাবাহিনীর মধ্যে রূহও একটি বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয়। তাদের মাথা আছে। হাত-পা-ও আছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। শেষে বললেন, একটি দল হবে তাদের এবং একটি এদের।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্‌পাক রূহকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের আকৃতিতে। আকাশ থেকে যখন ফেরেশতারা নেমে আসে, তখন অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকে এক জন করে রূহ। আবু শায়েখ এবং ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, বায়হাকী বলেন, সেদিন আল্লাহ্‌পাকের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকবে দু'টি সারি— একটি ফেরেশতার, আর একটি রূহের। বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রূহ অর্থ আদম সন্তানগণ। কাতাদা এরূপ বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিনি আরো বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস প্রথম দিকে কথাটিকে গোপন রেখেছিলেন।

'সাফফান' পদটি এখানে কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। অথবা একটি উহ্য ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ হিসেবে ধাতুমূল। অর্থাৎ তারা তখন দাঁড়িয়ে থাকবে সারিবদ্ধ অবস্থায়।

'অন্যেরা কথা বলবে না' অর্থ— রূহ এবং ফেরেশতারা যেখানে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্যধন্য হওয়া সত্ত্বেও সেদিন বিনা অনুমতিতে কথা বলতে পারবে না, সেখানে অন্যদের কথা বলা তো চিন্তাই করা যায় না। আর 'দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত' কথাটি 'অন্যেরা কথা বলবে না' বাক্যের কর্তৃবাচক সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। শাব্দিক সামুজ্যের দৃষ্টিতে 'অন্যেরা কথা বলবে না' বাক্যটি কর্তৃবাচক সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক হওয়াই সমধিক সুস্পষ্ট। আর অর্থগত দিক দিয়ে দ্বিতীয়টির অবস্থাপ্রকাশ হওয়া সমধিক সঙ্গত। কেননা শাফায়াত করা এবং কথা বলার বিষয়টি শুধুমাত্র ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

আর 'ওয়া ক্বলা সওয়াবা' অর্থ এবং সে যথার্থ বলবে। অর্থাৎ তখন অনুমতি প্রাপ্তদের বচন হবে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের অনুকূলে। বস্তুতঃ কথা সাধারণত বিশ্বাসের অনুবর্তীই হয়। এখানকার 'বলবে' কথাটির যোগসূত্রে রয়েছে আগের বাক্যের 'অনুমতি দিবেন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ পৃথিবীর জীবনে যেহেতু তারা মহাসত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে, অবিশ্বাস ও মিথ্যাচারের আশ্রয় কখনোই নেয়নি, তাই তারা সেদিনও সত্য কথাই বলবে। মিথ্যা তো চিরকালই মিথ্যা। আর সত্য চিরদিন সত্যই। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় বেদাতীদের কথা। কোরআন মজীদই সাক্ষ্য দেয় যে, তারা অসত্যভাষী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ক্বলা সওয়াবা' অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। আর বেদাতীদের ভাগ্যে তখন শাফায়াত (সুপারিশ) জুটবে না। কেননা তারা শাফায়াতকে স্বীকার করে না।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এই দিবস সুনিশ্চিত'। একথার অর্থ— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসের যে সকল বিবরণ এতোক্ষণ ধরে প্রকাশ করা হলো, সে সকল বিবরণ সর্বৈবরূপে সত্য। এতে দ্বিধা-সংশয়-সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক'। এখানে 'মাআবা' অর্থ আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া, আল্লাহ্পাকের আনুগত্য করা এবং অনুগমন করা রসুল স. এবং তাঁর প্রতিনিধি কামেলে মোকাম্মেল পীর-মোর্শেদের। এখানকার 'ফামান' পদটির 'ফা' নৈমিত্তিক। কেননা আল্লাহ্পাক পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পথের পথিক হতে পারার কারণ হচ্ছে পরলোক, যা মহাসত্য। এখানে 'ইলা রব্বিহী' কথাটির সম্পৃক্তি ঘটেছে 'মাআব' এর সঙ্গে। অতএব কথাটি অবস্থাপ্রকাশক।

শেষোক্ত আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি থেকে সতর্ক করলাম; সেইদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফের বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম'। কথাগুলো বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী-দেরকে লক্ষ্য করে। 'আসন্ন শাস্তি' অর্থ এখানে পারলৌকিক শাস্তি, যার আগমন অবধারিত। আর অবধারিত বিষয় আসন্নই হয়। অথবা 'আসন্ন শাস্তি' অর্থ এখানে— কবরের আযাব। আর মৃত্যু তো জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে।

এখানকার 'ইয়াওমা' (সেই দিন) পদটি 'আ'জাবান' (শাস্তি) এর তৎসন্নিহিত কর্মপদ। কেননা শাস্তি অর্থ এখানে— শাস্তি প্রদান। 'মা' অব্যয়টি এখানে প্রশ্নবোধক, অথবা যোজক এবং 'ইয়ানজুরু' (প্রত্যক্ষ করবে) এর কর্মপদ। আর এর যোজ্য 'ক্বদ্দামাত' (পূর্বাহ্নে প্রেরিত কৃতকর্ম) বাক্যে সর্বনাম রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বাক্যরূপটি হবে 'ক্বদ্দামাতহু'। উল্লেখ্য পূর্বাহ্নে প্রেরিত কৃতকর্ম বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে 'ইয়াদাহু' (হাত)। অর্থাৎ স্বহস্তঅর্জিত। হাত দ্বারাই অধিকাংশ কর্ম সম্পাদিত হয় বলেই 'হাত' এখানে এসেছে কর্মের প্রতীক

হিসেবে। অথবা 'হাত' এখানে প্রতীক শক্তি-সামর্থ্যের, যার সাহায্যে কর্মসমূহ সম্পন্ন করা হয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রতিফল দিবসে মানুষ প্রত্যক্ষ করবে তাদের ওই সকল কৃতকর্ম যা তারা সম্পন্ন করেছিলো পৃথিবীর জীবনে। অথবা তারা তখন প্রত্যক্ষ করবে ওই সকল কর্মের প্রতিফল। কিংবা অপকর্মসমূহের প্রতিক্রিয়া তারা দেখতে পাবে কবরে।

হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবর হচ্ছে পরলোকের প্রথম ঘাঁটি। এই ঘাঁটি সহজে অতিক্রম করতে পারলে অন্য সকল ঘাঁটি অতিক্রমণ হবে সহজতর। আর যদি কবরে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তবে পরবর্তী পর্যায়গুলো হবে আরো বেশী ভয়াবহ। কবরের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অনেক অনেক হাদিস। যেমন বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. দু'টি কবরের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে করতে বললেন, কবরবাসীদ্বয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। বড় কোনো অপরাধের জন্য নয়। অপরাধ কেবল এতটুকু যে, তারা মুত্রত্যাগের প্রাক্কালে আড়াল করতো না। আর মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, এদের একজন প্রস্রাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক থাকতো না। আর একজন করে বেড়াতো পরনিন্দা।

কবরের মধ্যে কবরবাসীকে যে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, সে সম্পর্কে হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বর্ণিত হয়েছে একটি দীর্ঘ হাদিস, সেখানে বিশ্বাসীগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে ততোদূর পর্যন্ত, যতোদূর চোখ যায়। তার কাছে আসবে একজন সৌম্যকান্তি সুন্দর পোশাক পরিহিত যুবক। বলবে, সাধুবাদ গ্রহণ করো। উৎফুল্ল হও। আজ সেই শুভ দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো তোমাকে। কবরবাসী বলবে, তুমি তো দেখছি খুবই সুদর্শন। নিশ্চয় তোমার আগমন ঘটেছে কল্যাণ সহকারে। সে বলবে, আমি তোমার পুণ্যকর্ম। আর অবিশ্বাসীদের কবর হবে অতিসংকীর্ণ। মাটি তাকে এমনভাবে চাপ দিবে যে, ওই চাপের ফলে তার এক পাঁজরের অস্থিসমূহ ঢুকে যাবে অপর পাঁজরের মধ্যে। তার কাছে আসবে এক কুৎসিৎদর্শন ও বিশ্রি পোশাক পরা পুঁতিগন্ধময় ব্যক্তি। বলবে, শোনো এমন সংবাদ, যা তোমার মনঃপুত নয়। এই দিন সম্পর্কেই তোমাকে যথাসময়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিলো। কবরবাসী বলবে, তুমি কে? তুমি তো দেখছি অশুভবার্তাবাহী ও অতি কুশ্রী। সে বলবে, আমি তোমারই অশুভকর্ম। আহমদ।

'ইয়া লাইতানী কুনতু তুরাবা' অর্থ হায়! আমি যদি মাটি হতাম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, চামড়া যেভাবে মোড়ানো হয়, প্রতিফল দিবসে সেভাবে মোড়ানো হবে মৃত্তিকাকে। আল্লাহ্পাক পুনরুত্থান ঘটাবেন মানুষ ও পশু-পাখিদের। চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে সম্পন্ন করবেন প্রতিশোধ গ্রহণ পর্ব। এমনকি শিঙবিহীন ছাগলও তখন প্রতিশোধ নিবে শিঙবিশিষ্ট ছাগলের উপর। এভাবে পারস্পরিক প্রতিশোধ গ্রহণের পালা যখন সাঙ্গ হবে, আল্লাহপাক তখন বলবেন, এবার তোমরা সকলে মাটি হয়ে যাও। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন

এমতো দৃশ্য অবলোকন করে বলবে, হায়! আমরাও যদি এভাবে মাটি হয়ে যেতে পারতাম। হাকেম। ইয়াহ্ইয়া ইবনে জা'দা সূত্রে দিনুয়ারী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। বাগবী কর্তৃক লিখিত মুকাতিলের উক্তিও এরকম। তিনি বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কেউ কেউ তখন বলবে, পৃথিবীতে যদি আমি শূকর হতাম, তাহলে আজ মিশে যেতে পারতাম মৃত্তিকায়।

বাগবী লিখেছেন, জিয়াহ এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জাকোয়ান বলেছেন, আল্লাহ্পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তানুসারে যখন জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীরা তাদের নিজ নিজ আবাসে চলে যাবে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন বিশ্বাসী জ্বিন ও চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে। তারা মিশে যাবে মাটিতে। তা দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, হায়! আমরাও যদি এভাবে মাটি হয়ে যেতে পারতাম। ইবনে সুলাইম বলেছেন, বিশ্বাসী জ্বিনেরা মাটিতে পরিণত হবে।

এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানে 'কাফের বলবে' অর্থ চির অভিশপ্ত ইবলিস বলবে। সে মৃত্তিকাজাত আদমকে ঘৃণা করেছিলো। নিজে অগ্নির জাতক বলে প্রদর্শন করে ছিলো দম্ভ। কিন্তু পরকালে যখন সে আদমসন্তানদের প্রভূত মর্যাদা এবং নিজের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখবে, তখন সে আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে বলবে, হায় আমিও যদি মৃত্তিকার জাতক হতাম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তখন বলবেন, এরকম হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আমার সমকক্ষ, অথবা অংশীদার নির্ধারণ করে, আজ তার কোনো সম্ভ্রম নেই।

সূরা নাযিআ'ত ঃ

মহাপুণ্যভূমি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর রুকু সংখ্যা ২ এবং আয়াত সংখ্যা ৪৬।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ১, ২. ৩. ৪. ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿۱﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿۲﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿۳﴾ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿۴﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿۵﴾

r শপথ তাহাদের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
r এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেয়
r এবং যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
r আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
r অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।

এখানকার প্রথম আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ওয়াও' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে শপথ অর্থে। শপথের জবাব এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ 'নাযিআ'ত' ও 'নাশিত্বাত' এর শপথ! মহাপুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে এবং সকলকে তাদের কর্মফলের হিসাব দিতেই হবে। আর শপথের জবাব প্রতিধ্বনিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে।

'আন্ নাযিআ'তি গরক্বান' অর্থ ওই সকল ফেরেশতা যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের প্রাণ সংহার করে নির্মমভাবে, অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে। 'গরক্বা' শব্দটি মূলতঃ নামপদ, এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ধাতুমূলের স্থলে। আর 'আন নাশিত্বাতি নাশত্বান' অর্থ ওই সকল ফেরেশতা, যারা বিশ্বাসীগণের জীবন হস্তগত করে মৃদুভাবে, অত্যন্ত কোমলতার সঙ্গে। শব্দটি একটি প্রবাদবাক্য 'নাশাত্বদ্ দালবু' থেকে সাধিত হয়েছে, যার অর্থ সে অতি সহজেই পানির পাত্রটি কূপ থেকে বের করে আনলো। অথবা শব্দটি উৎসারিত হয়েছে অন্য একটি প্রবাদবচন 'নাশাত্বাল হাবলু' থেকে, যার অর্থ সে তার রশি এতোটাই শিথিল করে দিয়েছে যে, তা খুলেই পড়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিশ্বাসীগণ পৃথিবীতে বন্দী জীবন যাপন করেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো। মৃত্যুকালে ফেরেশতারা এসে সে বন্ধন আলগা করে দেয়, যেমন আলগা করে দেওয়া হয় উটের জানুর বন্ধন। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেয়। হাদিস শরীফে বিষয়টি বিবৃত করা হয়েছে এভাবে— যেনো খুলে দেওয়া হয় তাদের পদযুগলের বন্ধন। করে দেওয়া হয় তাদেরকে চিরমুক্ত।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরকালযাত্রার সময় সমাগত হলে বিশ্বাসীরা সম্পূর্ণরূপে অভিমুখী হয় পরলোকের প্রতি। তখন বেহেশতী কাফন ও সৌরভ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করে দিবসের আলোর মতো শ্বেতশুভ্র ফেরেশতারা। মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে বসে বলে, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! এসো আল্লাহ্‌র মার্জনা ও পরিতোষের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তার আত্মা, উপুড় করা কলস থেকে পতিত পানির মতো দ্রুত। ফেরেশতারা তা হস্তগত করে এবং মুহূর্তমধ্যে তাকে জড়িয়ে নেয় বেহেশতী বস্ত্রে। সুরভিত করে বেহেশতী মেশকের সৌরভে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকাল এসে গেলে আকাশ থেকে নেমে আসে কৃষ্ণকায় ভয়াল দর্শন ফেরেশতারা। সঙ্গে থাকে তাদের শনের খসখসে পট্টবস্ত্র। মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে বসে তারা বলে, হে দুষ্প্রবৃত্তি! চলো, আল্লাহ্‌র রোষতপ্ততার দিকে। সে ভয় পায়। কিছুতেই সম্পর্কছিন্ন করতে চায় না তার দেহের সঙ্গে। তখন কণ্টকগুচ্ছ থেকে যেমন জোর করে কণ্টকতার বের করে আনা হয়, তেমনি জোর করে বের করে আনা হয় তার প্রাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে নেয় খসখসে শনের পট্টবস্ত্রে। তৎসত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়ে তার বিশ্রী দুর্গন্ধ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মৃত্যুদূত তখন তার প্রাণ ছিনিয়ে নেয় তার শিরা-উপশিরাসহ। আহমদ।

হজরত ইবনে মাসউদের বিবরণ উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা অবিশ্বাসীদের প্রাণ সংহার করে তাদের প্রতিটি পশম, নখ এবং পায়ের তালুর নিচ থেকে খিঁচে খিঁচে। একবার টানে আর একবার ছেড়ে দেয়— এভাবে বার বার করবার পর তাদের মৃত্যু ঘটায়। মুকাতিল বলেছেন, মৃত্যুদূত ও তার সহকারী ফেরেশতারা অবিশ্বাসীদের প্রাণ জোর করে বের করে আনে সেভাবে, যেভাবে কাঁটাতারের গুচ্ছ থেকে বের করে আনা হয় কোনো একটি তার।

উপযোগ ঃ বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নফস বা প্রবৃত্তি দেহের মতোই স্থূল। আর কলব, রূহ, সির, খফি, আখফা হচ্ছে সম্ভাব্য মৌল, যেগুলোর প্রকৃত সম্পর্ক আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে। আর যেহেতু ওই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মৌলগুলো অবস্তুক, তাই সেগুলো নফসের উপরে আদেশকর্তা। এবং সেগুলো অনিরীক্ষ্য না হলেও দুর্নিরীক্ষ। আরশের উপরের উপমার জগতে আত্মিক দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে কেবল ওগুলোর অস্তিত্ব নেত্রগোচর হয়।

সুফী দার্শনিকগণ বলেন, আল্লাহ্পাক তাঁর পরিপূর্ণ ও রহস্যাচ্ছন্ন শক্তিমত্তার মাধ্যমে ওই নির্বস্তুক মৌলগুলোকে নফসের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন এমনভাবে, যেমনভাবে দিবাকরের সম্মুখে কিরণোদ্ভাসিত হয় দর্পণ। অর্থাৎ নফস আলোকিত হয় রূহের মাধ্যমে। অথবা বলা যায়, রূহ সূর্য এবং নফস চন্দ্র। পূর্ণিমার পূর্ণ শশী যেমন সূর্যালোক বুকে ধারণ করে হয়ে ওঠে আলোকজ্জ্বল, আলোকিত প্রবৃত্তিও তেমনি আলোকজ্জ্বল হয় রূহের আলোকে। মৃত্যুকালে তাই বের করে আনা হয় প্রবৃত্তি বা নফসকে, আত্মা বা রূহকে নয়। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, বিশ্বাসীগণের প্রশান্ত প্রবৃত্তিকে অতিসহজে বের করে নিয়ে ফেরেশতারা তাকে জড়িয়ে নেয় পবিত্র বস্ত্রে ও বেহেশতি সুরভিতে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঊর্ধ্বাকাশে। বিশ্বাসীগণের প্রবৃত্তির জন্য খুলে দেওয়া হয় সকল আকাশের দরজা। আল্লাহ্ তখন বলেন, আমার এই বান্দার কর্মবিবরণী লিখে রাখো ইল্লিয়্যিনে এবং তাকে ফেরত পাঠাও পৃথিবীতে। কেননা আমি তাকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। তাই এখন তাকে মিশিয়ে দিবো মাটিতে। তারপর যথাসময়ে সেখান থেকেই পুনরুত্থান ঘটাবো তার। অবিশ্বাসীদের প্রবৃত্তির জন্য আকাশের দরজা উন্মোচন করা হয় না। তাদেরকে সজোরে নিক্ষেপ করা হয় নিম্নদেশে, সিজ্জিনে।

বর্ণিত হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, যে নফসকে সাধারণত রূহ বলা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে ভূতচতুষ্টয় (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস) জাত। আর বিষয়টির তাত্ত্বিক আলোচনা দৃষ্টে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, কবরের আযাবকে অস্বীকার করবার কোনো উপায়ই নেই। অথচ বেদাতীরা তাকে অজ্ঞতাবশতঃ অস্বীকার করে। বলে, শাস্তি হলে হবে আত্মিকভাবে, স্থূলভাবে কবরে নয়। কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, কবর আযাব সত্য। এ সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং যারা তীব্রগতিতে সন্তরণ করে'। একথার অর্থ— যারা বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পাদনার্থে পরিভ্রমণরত, শপথ সেই সকল ফেরেশতাদেরও। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন, যে সকল সুদর্শন ফেরেশতা ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট অশ্বের মতো অতিদ্রুত অবতরণ করে নভঃদেশ থেকে, তাদের শপথ!

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়'। একথার অর্থ— ওই সকল ফেরেশতাদেরও শপথ! যারা পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে অগ্রগামী। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— শপথ ওই সকল ফেরেশতাবর্গেরও, যারা বিশ্বাসীগণের অন্তরাত্মাকে অনুপ্রাণিত করে শুভকর্মাবলীর দিকে। এর সঙ্গে আমি যুক্ত করি এই কথাটি— এবং অবিশ্বাসীদের প্রবৃত্তিগুলোকে ধাবিত করে শাস্তির দিকে। উল্লেখ্য, এ সকল ফেরেশতার কথা হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বিবৃত হয়েছে এভাবে— মৃত্যু দূত মানুষের প্রাণ হরণ করার পরক্ষণেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা নিয়ে নেয় তার সহচর ফেরেশতারা। অর্থাৎ এখানে 'দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ফেরেশতাকেই। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল পুণ্যাত্মাকে, যারা আল্লাহ্র অবাধ সান্নিধ্যধন্য হওয়ার সুতীব্র আনন্দে মৃত্যুকালে ছুটে যায় মৃত্যুর ফেরেশতাদের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যারা সকল কর্মনির্বাহ করে'। একথার অর্থ— শপথ নির্বাহী ফেরেশতাদেরও।

ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলমুদাব্বিরাত' (কর্মনির্বাহী) বলে শপথ করা হয়েছে ওই সকল ফেরেশতার, যারা কোনো ব্যক্তির জান কবজ করার সময় মৃত্যুদূতের সহযোগী হিসেবে আসে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মৃত ব্যক্তির প্রাণ নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যায় এবং কিছুসংখ্যক তার মরদেহের পাশে সমবেত আত্মীয়স্বজনদের দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকে 'আমিন' 'আমিন'। আর কিছুসংখ্যক তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে তার কাফনদাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস অভিমত প্রকাশ করেছেন, এখানে ওই সকল ফেরেশতার শপথ করা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যাদের উপরে ন্যস্ত করেছেন কিছু দায়িত্ব। আল্লাহ্ তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান। তারাই কার্যনির্বাহী ফেরেশতা।

আবদুর রহমান ইবনে সাবেত বলেছেন, পৃথিবীতে নির্বাহী ফেরেশতা আছেন চারজন— জিবরাইল, মিকাইল, আজরাইল ও ইস্রাফিল। জিবরাইলের দায়িত্ব হচ্ছে আকাশী বিপদ-মুসিবত ঠেকিয়ে দেওয়া, অথবা অবতীর্ণ করা এবং বিশেষ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধরত বিশ্বাসীগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা। মিকাইলের দায়িত্ব হচ্ছে বৃষ্টিপাত ঘটানো এবং উদ্ভিদরাজি উৎপন্নকরণ। আজরাইলের কাজ যথাসময়ে মানুষের প্রাণ সংহার করা। আর ইস্রাফিল সুবিশাল শিঙ্গা নিয়ে নিস্পলক দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহ্র শিঙ্গাধ্বনির আদেশের অপেক্ষায়।

কাতাদার অভিমত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াত ব্যতীত আগের তিন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে নভোমণ্ডলে স্বাভাবিকভাবে পরিক্রমণরত নক্ষত্রপুঞ্জের কথা। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন 'শূন্যমার্গের সবকিছুই পরিক্রমণশীল'। এরকম পরিক্রমণে সেগুলোর কোনো কোনোটি অগ্রবর্তী এবং কোনো কোনোটি পশ্চাদবর্তী। কিন্তু তাঁর এমতো ব্যাখ্যা অযথার্থ। কেননা 'নাজ্‌উন' 'নাশত্বন' 'সুবহুন' এই শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট প্রভেদ। এগুলোকে কিছুতেই সমার্থকরূপে গণ্য করা যায় না। আর এগুলোর অর্থ যদি একই হয়, তবে পুনঃপুনঃ একই কথা বলার কোনো প্রয়োজনই তো নেই।

তবে বর্ণনাক্রমিক (রেওয়ায়েত)ও অনুবৃত্তিক (নকলি) ব্যতিরেকে আলোচ্য আয়াতগুলোর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক (আকলি) ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা এখানে করা যেতে পারে। যেমন বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার প্রথম চার আয়াতে বলা হয়েছে নফসসমূহের অবস্থা, যা সৃষ্টি হয় দেহ পরিত্যাগ করার সময়। তখন অপবিত্র নফসকে নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে বের করে নেওয়া হয় দেহ থেকে, যেমন তীর ছোঁড়ার সময় ধনুকের ছিলা টেনে নিতে হয় সজোরে। প্রথম আয়াতের 'ওয়ান নাযিআ'তি গরক্বান' কথাটি উপস্থাপন করা হয়েছে ধনুকের ওই তীর ছোঁড়ার দৃষ্টান্ত থেকেই। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে পবিত্র নফসের কথা। তারা তখন নিজে নিজেই দ্রুত ধাবমান হয় ফেরেশতাজগতের প্রতি। সেখানে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্র। এরপর অগ্রসর হয় 'খত্বিরাতুল কুদস্' এর দিকে। এমনকি স্বীয় শক্তিমত্তা ও মর্যাদার নিমিত্ত অন্তর্ভূত হয় 'মুদাব্বিরাতি' পর্যায়ে। অথবা বলা যায়, আল্লাহ্পাকের দিকে পথপরিক্রমণকারী মর্যাদাশালী নফসগুলির অবস্থা হয় এরকম— প্রথমতঃ এরা প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জগতের দিকে আগুয়ান হয় মৃদু চালে। শুরু হয় উন্নতির স্তরান্তরণ। এভাবে এগিয়ে যায় পরিপূর্ণতার দিকে। সর্বশেষে উপনীত হয় 'মুদাব্বিরাতি'র দিকে, নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে। তখন পথ নির্দেশনা দিতে থাকে অন্যদেরকেও। অথবা আয়াতপঞ্চকে বলা হয়েছে জেহাদের ময়দানের যোদ্ধবৃন্দের কথা। তারা প্রচণ্ড শক্তিতে টান দেয় ধনুকের ছিলায়। তীর নিক্ষেপ করে উল্লাসের সঙ্গে। বিচরণ করে জলে স্থলে অরণ্যে। অগ্রসর হতে থাকে শত্রুদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য। পরিশেষে অধিনায়ক হিসেবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে রণকৌশল প্রণয়নে ও শৃঙ্খলা বিধানে।

কিংবা বলা যেতে পারে, এখানে বলা হয়েছে মুজাহিদবৃন্দের সমরাশ্বদের কথা। অর্থাৎ তাদের অশ্বগুলো ক্রীড়ারত হয় নিজেদের লাগামের সঙ্গে। হয়ে ওঠে ঘর্মাক্ত। মুসলমানদের রাষ্ট্রে থেকে প্রবেশ করে অমুসলমানদের রাষ্ট্রে। দুলকি চালে যেনো সন্তরণ করতে করতে সম্মুখবর্তী হয় শত্রুদের। পরিশেষে নিশ্চিত করে বিজয়।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩ يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝١٠ ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤

r সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করিবে,
r উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি,
r কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হইবে,
r উহাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হইবে।
r তাহারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই—
r গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'
r তাহারা বলে, 'তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।'
r ইহা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ,
r তখনই ময়দানে উহাদের আবির্ভাব হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইয়াওমা তারজুফুর রজ্বিফাহ্'। এখানকার 'ইয়াওমা' (সেই দিন) পদটি কালাধিকরণ কারক, শপথের উহ্য জবাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ হাশর প্রান্তরে তোমাদের মহাসমাবেশ ঘটবে সেই দিন, যেদিন বিকট শিঙ্গাধ্বনিতে প্রকম্পিত হবে সমগ্র সৃষ্টি। সেদিন থেকে জান্নাত-জাহান্নাম গমন পর্যন্ত সময়সীমা হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। সেদিনেরই একটি অংশে অনুষ্ঠিত হবে মহাসমাবেশ, হিসাব-নিকাশ। ওই সাময়িকতার দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয় 'ইয়াওমুল হাশর' 'ইয়াওমুল হিসাব' ইত্যাদি। মুজাহিদের উক্তি উল্লেখ করে বায়হাকী বলেছেন, এখানকার 'তারজুফুর রজ্বিফাহ্' অর্থ সেদিন কম্পন অনুভূত হবে ভূপৃষ্ঠে ও শৈলশ্রেণীতে। এরপর আসবে দ্বিতীয় ভূকম্পন।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি'। এখানে 'রদিফাহ্' অর্থ দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি'। আর আগের আয়াতে 'রজ্বিফাহ্' দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রথম শিঙ্গাধ্বনিকে। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। প্রথম ফুৎকারকে 'রজ্বিফাহ্' বলা হয়েছে একারণে যে, ওই ফুৎকারে শুরু হবে ভূকম্পন। সকল প্রাণী ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারকে 'রদিফাহ্' (পরবর্তী ফুৎকার) বলা হয়েছে এজন্য যে, ওই ফুৎকার হবে প্রথমটির অনুবর্তী। অপরিণত সূত্রে হাসান বসরী থেকে

ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যকার ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। হালিমী বর্ণনা করেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বৎসর। এব্যাপারে অন্যান্য বর্ণনাকারীরাও একমত।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা একবার বললেন, দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ। শ্রোতারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রসুল সহচর! চল্লিশ কী— দিন, মাস, না বৎসর। তিনি বললেন, তা জানিনা। রসুল স. এরকমই বলেছেন। এরপর আল্লাহ্পাক আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করবেন। কবর থেকে মানুষেরা উত্থিত হতে থাকবে, যেমন ভূমি থেকে উদ্গত হতে থাকে বৃক্ষের চারা। মৃত্যুর পর নিতম্বের একটি অস্থি ছাড়া সবকিছুই মাটিতে মিশে যায়। ওই অস্থিকে ভিত্তি করেই আবার তাদেরকে দেওয়া হয় নতুন জীবন। এই হাদিসটি আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আলবা'ছ' গ্রন্থে। তবে সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে চল্লিশ বৎসরের কথা। হাদিসটি সমধিক শুদ্ধও।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত থাকবে সমস্ত পৃথিবী। প্লাবন সরে যাওয়ার পর পুণর্জীবনপ্রাপ্ত হবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, যেমন প্লাবনের পরে জমিতে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকৃতির উদ্ভিদ। আর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সকলকেই দেখা যাবে অবিকল আগের মতো। এরপর ছেড়ে দেওয়া হবে রূহগুলোকে। তারা সংযোজিত হবে তাদের নিজ নিজ দেহের সঙ্গে। এই বিষয়টিই এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে 'ওয়া ইজান্ নুফূসু জুয়্যিজাত' (আর যখন মিলিত করে দেওয়া হবে আত্মাগুলোকে)।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'কতো হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে'। এখানে 'আল ওয়াজ্বিফাহ্' কথাটি ইঙ্গিতার্থে অধিক কম্পমান বা ভীতি-সন্ত্রাস হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কথাটির আভিধানিক অর্থ অবশ্য দ্রুতগমনশীল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— সেদিন অনেকেই হয়ে পড়বে ভয়ে জড়সড়।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তাদের দৃষ্টি ভীতিবিহ্বলতায় নত হবে'। একথার অর্থ— ভয়ে তারা তখন চোখ তুলে তাকাতেও পারবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবোই—(১০) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও'(১১)? একথার অর্থ— মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিষয়টিকে বিশ্বাস করে না। বলে, মরার পরে তো আমাদের গোশত-হাড়-গোড় সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। এর পরেও কি আমরা পুনর্জীবিত হতে পারবো? এটা কি একটি কথার মতো কথা হলো? এখানকার 'আমরা কি' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা বলে, পুনরুত্থান অসম্ভব। কোনো কোনো ক্বেরাতে আবার প্রশ্নবোধক 'হামযা'টি অনুল্লেখিত রয়েছে। এমতোক্ষেত্রেও বক্তব্যটির অর্থ গ্রহণ করতে হবে অনুল্লেখিত প্রশ্নবোধক 'হামযা' সহকারে। যেমন বলা হয় 'রজ্বাআ ফুলানুন ফীল

হাফিরাহ্' (লোকটি তার পূর্ব পথে ফিরে গিয়েছে, যে পথ ছিলো তার স্বরচিত)। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে বর্তমান জীবনের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতের। তাই এখানে বর্তমানকালের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ভবিষ্যতকাল। ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'আল হাফিরাহ্' অর্থ নরক।

'গলে অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও' প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। পুনঃপুনঃ অস্বীকৃতি বর্ধিত করে বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্বকে। আর এভাবেই পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা কি পচে গলে মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেও পুনরুত্থিত হবো? ফিরে আসবো আগের জীবনে? অসম্ভব।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'তারা বলে, আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবোই' (১০) তখন অবিশ্বাসী কুরায়েশরা বলতে শুরু করলো, পুনরুত্থিত হলে আমরা তো পড়বো মহাদুর্বিপাকে। তখনই অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (১২)। বলা হলো—

'তারা বলে, তাই, যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন'। ১০ সংখ্যক আয়াতের 'তারা বলে' কথাটির সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত সংযোগ। অথবা এখানে উহ্য রয়েছে একটি শব্দ 'কৃদ'। এভাবে কথাটি হয় 'তারা বলে' বাক্যের 'তারা' কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। তবে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটটি একথা সমর্থন করে না। কেননা অবস্থা প্রকাশকারী ও তার অবস্থানের বক্তব্য হতে হয় একই সময়ে। অথচ বক্তব্য দু'টোর মধ্যে রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। এখানে 'তিলকা' (এই) কথাটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে প্রত্যাবর্তনের দিকে। আর 'আমরা কি প্রত্যাবর্তিত হবো' থেকেই অনুমিত হয় প্রত্যাবর্তনের ধারণা। অর্থাৎ তারা বলে, মোহাম্মদের কথা যদি সত্যিই হয়, তবে সে জীবন তো হবে অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত। বলা বাহুল্য, তারা এরকম বলতো ঠাট্টা করে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এটা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ'। এখানে 'যাজ্বরাতুঁও ওয়াহিদাহ্' অর্থ এক বিকট আওয়াজ। 'সিহাহ্' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে 'যাজ্বর' অর্থ হুংকার দেওয়া। যেমন বলা হয় 'যাজ্বারতুহু ফাআনযাজ্বাহু' (আমি তার প্রতি হুংকার ছেড়েছি, ফলে সে বের হয়ে গিয়েছে)। এই আয়াতের মর্মার্থও সেরকম। অর্থাৎ শিঙ্গার বিকট আওয়াজ শুনে তখন মানুষেরা বের হয়ে পড়বে তাদের আপন আপন সমাধি থেকে। আবার কখনো কখনো 'যাজ্বর' ব্যবহৃত হয় শুধু আওয়াজের ক্ষেত্রে। যেমন 'ওয়ায্ যাজ্বিরাতি যাজ্বরান' (ওই সকল ফেরেশতা, যারা ধমকের সুরে পরিচালনা করে বাতাস)। আবার কখনো শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল বের করে দেওয়া অর্থেও। যেমন 'ইয্দাজ্বার' (সে বের করে দিলো)।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে—'তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে'। এখানকার প্রারম্ভিক শব্দ 'ফা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। 'ইজা' অর্থ অকস্মাৎ,

ঠিক তখনই। এখানে 'ইজা' সন্নিবেশ করায় 'হুম বিস্ সাহিরাহ্' নামপদীয় বাক্যটি পরিণত হয়েছে ক্রিয়াপদীয় বাক্যে। এভাবে পূর্বোক্ত 'তারা বলে' ক্রিয়াপদীয় বাক্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি হয়েছে যথার্থ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এখন তারা এরকম বলছে। কিন্তু যখন ভূপৃষ্ঠ হবে কেবল একটি সুবিশাল প্রান্তর, যেখানে শুরু হবে বিচারপর্ব, যা এসে পড়বে অকস্মাৎ। এমতো ব্যাখ্যাকে মান্য করলে বলতে হয় 'এটা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ' কথাটি ভিন্ন প্রসঙ্গের, যা যোজক ও যোজ্যের মধ্যে একথাই প্রকাশ করে দেয় যে, যে ভূকম্পনের কথা তারা অস্বীকার করে, আল্লাহ্পাক তা ঘটাবেন অতি সহজে। কেননা তাঁর জন্য কোনোকিছুই কঠিন নয়।

'আস্সাহিরাহ্' অর্থ ময়দানে, ভূপৃষ্ঠে। মর্মার্থ— তারা তখন হঠাৎ করে সমবেত হবে বিচারের ময়দানে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— প্রতিফল দিবসের ভূমি। কাতাদা বলেছেন, জাহান্নাম।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ১৫— ২৬

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
طُوًى ﴿١٦﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ
تَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ
الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَ عَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ
فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ
وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

r তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি?

r যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়া-য় তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

r 'ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে,'

r এবং বল,'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—

r 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর'?

r অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল।

r কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল।

r অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল।

r সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,

r আর বলিল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

r অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন।

r যে ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! নবী মুসার বৃত্তান্ত সম্পর্কে আমি কি আপনাকে প্রত্যাদেশ করিনি? প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ আমি তো আপনাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নবী মুসা সম্পর্কে অবহিত করেছিই। কথাটি একই সঙ্গে রসুল স. এর প্রতি সান্ত্বনা এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি রসুল মুসার ইতিবৃত্তটি স্মরণ করুন। তিনিও সত্যধর্ম প্রচার করতে গিয়ে আপনারই মতো সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আপনিও তেমনই করুন। আর হে মক্কার অবিশ্বাসীরা! তোমরাও জেনে রেখো, শেষরক্ষা তোমাদেরও হবে না। রসুল মুসার শত্রুরা যেমন শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিলো, তোমাদের কপালেও রয়েছে সেরকম দুর্ভোগ। সুতরাং এখনো সময় আছে, সতর্ক হও। ফিরে এসো শাশ্বত সত্যের পথে, ইসলামের চিরঅক্ষয় সুশীতল ছায়ায়।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যখন তার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাকে আহ্বান করেছিলেন'। এখানকার 'ইজ' (যখন) পদটি ক্রিয়ার আধার, সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের 'মুসার বৃত্তান্ত' কথাটির সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! মুসা নবীর ওই ঘটনাটি তো আপনাকে অবগত করানো হয়েছেই, যখন তাঁর প্রভুপালক তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন পবিত্র তুওয়া উপত্যকায়। এখানকার 'তুওয়া' পদটি 'আহবান করেছিলেন' অথবা 'পবিত্র উপত্যকা'র সাধারণ কর্মপদ, অর্থাৎ তিনি তাঁকে আহ্বান করেছিলেন দু'বার। অথবা ওই উপত্যকার পবিত্রতা ছিলো দ্বিগুণ।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'বলেছিলেন, ফেরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে (১৭), এবং বলো, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও-(১৮) আর আমি তোমাকে তোমার প্রভুপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো' (১৯)। একথার অর্থ— পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডেকে নিয়ে তিনি নবী মুসাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, হে আমার নবী! তুমি মিসরাধিপতির নিকটে গমন করো। কেননা সে পথভ্রষ্টতার সীমা ইতোমধ্যেই অতিক্রম করেছে। আসত্তা নিমজ্জিত হয়েছে অংশীবাদিতায় ও অহংকারে। তাই তাকে গিয়ে সোজাসুজি বলো, অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র হবার কোনো আগ্রহ তোমার আছে কি? আছে কি এমন শুভ অভিপ্রায় যে, আমি তোমাকে তোমার প্রভুপালনকর্তার দিকে পথ দেখাই, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করতে শেখো। মান্য করতে পারো তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহকে।

এখানে 'তাযাক্কা' অর্থ যাতে তুমি পবিত্র হতে পারো শিরিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস অর্থ করেছেন— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কালেমা পড়ে পবিত্র হবে, এমতো আগ্রহ তোমার আছে কি? 'ফা তাখ্শা' অর্থ যাতে তাঁকে ভয় করো। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। যেহেতু আল্লাহ্ভীরুতার পরিণতি আল্লাহ্পরিচিতি, আর আল্লাহ্পরিচিতির পরিণতি হেদায়েত, সেহেতু তুমি কি চাও আল্লাহ্ ভীরু হতে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখালো (২০)। কিন্তু সে অস্বীকার করলো এবং অবাধ্য হলো' (২১)। একথার অর্থ— অতঃপর তুওয়া উপত্যকা থেকে নেমে এসে নবী মুসা সপরিবারে যাত্রা করলেন মিসর অভিমুখে। সেখানে পৌঁছে তাঁর ভ্রাতা ও নবী হারুনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ফেরাউনের রাজসভায়। তাকে ও তার পারিষদবর্গকে আহ্বান জানালেন সত্য ধর্মের প্রতি। তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তাদের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন মোজেজা। তবুও তারা ইমান আনলো না। আগের মতোই অনড় রইলো ঘোর অবাধ্যতায়।

এখানে 'আয়াতাল কুবরা' (মহানির্দশন) বলে বোঝানো হয়েছে নবী মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত সকল মোজেজাকে। তবে মোজেজাসমূহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য যেহেতু একটাই, তাঁর নবুয়তের প্রত্যয়ন, তাই কথাটিকে 'আয়াত' (মোজেজা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে একবচনে। অর্থাৎ সকল মোজেজা যেনো একটিই। অথবা কথাটির অর্থ হবে— মোজেজাসমূহের মধ্যে একটি মোজেজা, অলৌকিক যষ্টির সর্পরূপ পরিগ্রহণ।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি হয়ে গেলো বিশালাকৃতির একটি সাপ। সাপটি ফেরাউনকে তাড়া করলো। ভয়ে সে পিছন ফিরে দিলো দৌড়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সে তখন অবলম্বন করল এক কৌশল। এখানকার 'ইয়াস্আ' (সচেষ্ট হলো) কথাটি অবস্থাপ্রকাশক 'সে পশ্চাৎ ফিরলো' বাক্যের 'সে' সর্বনামের। অথবা কথাটির মর্মার্থ— সে সচেষ্ট হলো ইমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাদপসরণের জন্য। এভাবে ডেকে আনলো নিজের ও রাষ্ট্রের ধ্বংস।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে সকলকে সমবেত করলো এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো (২৩), আর বললো, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক'(২৪)। একথার অর্থ— ফেরাউন তখন তার বশংবদদের, অথবা যাদুকরদের ডেকে চীৎকার করে বলতে লাগলো, সাবধান! মুসার কীর্তিকলাপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না। তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুপ্রতিপালক কিন্তু আমিই। এখানকার পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের 'উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো' পদের বিবৃতিপ্রদায়ক। অর্থাৎ সে তখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, আমিই তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় পালনকর্তা, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো পালনকর্তা নেই।

অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— তোমাদের কর্মের উপরে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, আমিই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কিংবা— আমি যেমন তোমাদের দেবতা, তেমনি দেবতা তোমাদের পূজনীয় দেব-দেবীসমূহেরও।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন। একথার অর্থ— ফেরাউনের এমতো ধৃষ্টতার শাস্তি আল্লাহ্পাক যথাসময়ে ঠিকই দিয়েছেন। সমুদ্রের পানিতে তাকে ডুবিয়ে মেরেছেন সদলবলে। আর পরকালেও তাকে শাস্তিভোগ করতে হবে অনন্তকাল ধরে।

এখানে 'নাকালা' অর্থ পাকড়াও করলেন, দমন করলেন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ দুর্বল করে দিলেন, দিলেন অক্ষম করে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ে বাঁধা রশি এবং উষ্ট্র-অশ্বের লাগামকে বলে 'নাকালি', যা ক্ষুণ্ন করে তাদের স্বাধীনতাকে। আর 'নাকাল' হচ্ছে 'তানকীল' ক্রিয়ার নামপদ। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় এমন শাস্তি, যা বাধাপ্রদান করে অপরাধমূলক কর্মকে। যেমন বলা হয় 'নাকালতু বিহী' (আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছি) এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একটি উহ্য ধাতুমূলের বিশেষণরূপে, যা বেগমান করেছে পূর্বের ক্রিয়াকে। অর্থাৎ আমি তাকে শায়েস্তা করেছি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে, তার অপকর্মপ্রবাহকে করে দিয়েছি চিররুদ্ধ।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, ক্রিয়াপদটি এখানে রয়েছে উহ্য। আর 'নাকাল' হচ্ছে তার গুরুত্ববর্ধক কর্মপদ। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক দমন করলেন তাকে। স্থাপন করলেন একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। আর এখানকার 'নাকাল'কে 'আল আখিরাতে'র সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করার ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, মধ্যবর্তীতে উহ্য রয়েছে হয় 'ফী' (র) অথবা সম্বন্ধপদীয় 'লাম'। 'ফী' ধরলে 'নাকালা ফীল আখিরাতি' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— ফেরাউনকে শায়েস্তা করার বিষয়টি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে পরকালের নরকযন্ত্রণা ও ইহকালের সলিল সমাধিরূপে। অর্থাৎ দু'টো শাস্তিই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হাসান বসরী ও কাতাদা। আর সম্বন্ধপদীয় 'লাম' সহযোগে মর্মার্থ দাঁড়াবে— তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো একারণে যে, সে বলেছিলো মারাত্মক দু'টি কথা 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক' এবং 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রতিপালক আছে বলে তো আমার জানা নেই'। উল্লেখ্য, তার উদ্ধৃত বক্তব্যদু'টোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিলো চল্লিশ বৎসর। তার এ দু'টো অপবচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ ও বিদ্বজ্জনের একটি দল।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'যে ভয় করে, তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে'। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার অনুসারীদের এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য, যারা ভয় করে কেবল আল্লাহ্কে। এখানে 'ভয় করে' বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে,

যাদের হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ্‌কে ভয় করার যোগ্যতা। আর যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, তারা তো মুত্তাকী (সংযমী, সাবধানী, আল্লাহ্‌ভীরু)। সুতরাং তাদেরকে ভয় করে চলতে বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ২৭—৩৯

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾

r তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন;

r তিনি ইহার ছাদকে সুউচ্চ করিয়াছেন ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

r আর তিনি ইহার রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন ইহার সূর্যালোক;

r এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।

r তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,

r এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন;

r এই সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।

r অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে

r মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা সে সেই দিন স্মরণ করিবে,

r এবং প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য

r অনন্তর যে সীমালংঘন করে

r এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

r জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে মানুষ! বলো, তোমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণী সৃষ্টি করা কঠিন, না সৃষ্টি করা কঠিন বিশালাকৃতির আকাশ? এই বিরাট আকাশকে তো নিখুঁত নৈপুণ্যে নির্মাণ করেছেন তিনিই।

এখানকার ‘সামাউ’ পদটির বিধেয় রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টি দুরূহতর। এখানকার প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ অবশ্যই আকাশ সৃষ্টি দুরূহতর। আর এখানে ‘আকাশ’ অর্থ আকাশসহ আকাশের সকলকিছু। কারণ এর পরে সবিস্তারে ভূমি, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, সামগ্রিক সৃষ্টির (আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল কিছুর) তুলনায় আংশিক সৃষ্টি মানুষের সৃজনায়ন নিশ্চয়ই সহজতর। তেমনি প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি (পুনরুত্থান) কি সহজতর নয়? যুক্তি তো এরকমই বলে।

‘বানাহা’ অর্থ তা নির্মাণ করেছেন। বাক্যটি ‘আস্‌সামাউ’ (আকাশ) বিশেষ্যের বিশেষণ। আর ‘আস্‌সামাউ’ এর আলিফ লাম এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, যেমন ‘ওয়ালাক্বাদ আমরু আলাল লাইয়িমি ইয়াসুব্‌বুনী’ বাক্যে ‘ইয়াসুব্‌বুনী’ অনির্দিষ্টবাচক হওয়া সত্ত্বেও বিশেষণ হয়েছে ‘আল লাইয়্যিম’ একটি নির্দিষ্টবাচক পদের। অথবা বলতে হয়, এখানকার ‘বানাহা’ এর পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি ‘আল লাতী’ যোজক অব্যয়। অর্থাৎ ওই আকাশ, যা নির্মাণ করেছেন আল্লাহ্। কিংবা বলা যায়, এখানকার দ্বিতীয় বাক্যটি সংযোজিত প্রথম বাক্যের সাথে। কিন্তু যোজক অব্যয় এখানে অনুক্ত। দু’টি বাক্যের মিলিতাবস্থায় এখানে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে এভাবে— আল্লাহ্ নির্মাণ করেছেন আকাশ, যা তোমাদের অস্তিত্ব নির্মাণ অপেক্ষা কঠিনতর। আর যিনি তা নির্মাণ করতে সক্ষম, তিনি তা থেকে দুর্বলতর বস্তু তো সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (২৮)। আর তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোক’ (২৯)।

এখানে ‘সামকাহা’ অর্থ সুউচ্চ করেছেন। অর্থাৎ ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন উচ্চতার একটি পরিমাণ। অথবা ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ মার্গের উচ্চতাও নির্মাণ করেছেন আল্লাহ্ই। ‘ফাসাওয়াহা’ অর্থ এবং বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ আকাশকে করেছেন মসৃণ, সেখানে রাখেননি কোনো ফাঁক-ফোকর ও অমসৃণতা। ‘ওয়া আগ্‌ত্বশা লাইলাহা’ অর্থ আর তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ তিনি আকাশাগত রাতকে করেছেন তমসাবৃত। যেমন বলা হয় ‘গত্বাশাল লাইল’ (রাত তমসাচ্ছন্ন হয়েছে)। এখানে রাতের সম্পর্ক আকাশের সঙ্গে করা হয়েছে একারণে যে, আকাশস্থিত দিবাকরের অবস্থান আকাশেই। তার উদয়াস্তের ফলেই তো পৃথিবীতে নেমে আসে দিবা-রাত্রি।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘এবং পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত করেছেন’। একথার অর্থ— আকাশ সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং পরে পৃথিবীকে করেছেন প্রসারিত। এখানকার ‘ওয়াল আরদ্ব’ (এবং পৃথিবী) কথাটির পূর্বে লুপ্ত রয়েছে একটি শব্দ ‘দ্বহা’ পরবর্তী ‘দাহাহা’ তার বিশ্লেষক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক ভূমি ও ভূমিস্থিত সকলকিছু সৃষ্টি করছেন দুই দিনে, আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। এরপর তাঁর শুভদৃষ্টি পতিত হলো আকাশ নির্মাণের দিকে। ফলে দুই দিনে সৃজিত হলো আকাশ। এভাবে তিনি সুবিন্যস্ত করলেন সপ্ত আকাশ। এরপর তিনি আবার মনোযোগী হলেন পৃথিবীর প্রতি। দুই দিনে পৃথিবীকে করলেন প্রসারিত, মানুষের বাসোপযোগী। এভাবে তিনি পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থিত সকল কিছু সৃষ্টি করলেন মোট চারদিনে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'বা'দা জালিকা' কথাটির অর্থ 'এরপর' না হয়ে হবে 'এর সাথে'। অর্থাৎ তিনি আকাশ সুবিন্যস্ত করার সাথে সাথে সুবিস্তৃত করেছেন পৃথিবীকে। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন, 'উ'তুলিম বা'দা জালিকা যানীম'। এই আয়াতেও 'বা'দা' (পরে) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। আর 'ছুম্মাস্ তাওয়া ইলাস্ সামা' আয়াতের 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি কালক্রম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে আভিজাত্যের অনুক্রম বিকাশের মানসে। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে রয়েছে মর্যাদাগত বিশাল পার্থক্য। যেমন 'ছুম্মা কানা মিনাল্ লাজীনা আমানূ' আয়াতে 'ছুম্মা' ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বাসীদের আভিজাত্য প্রকাশার্থে। প্রথম ব্যাখ্যাটি যেহেতু পূর্বসূরীগণের অভিমত্যানুগামী, তাই বলতে হয়, সেটাই সর্বোত্তম।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তিনি তা থেকে বহির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ'। একথার অর্থ— তিনিই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর পানি, তৃণলতা ও চারণভূমি। বাক্যটি আধারাধিকরণ রূপের স্থল বলে মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে পরিস্থিতির। অর্থাৎ সবজির স্থল বলে অর্থ নেওয়া হয়েছে সবজির। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'মারআ' (তৃণ) শব্দটি ধাতুমূল, ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদার্থে। অর্থাৎ তৃণভূমি বা চারণভূমি বলে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে চরে বেড়ানো পশুকূলের।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন (৩২); এই সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আনআ'মের ভোগের জন্য' (৩৩)। একথার অর্থ— হে মানবজাতি! সুবিস্তৃত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাহাড়পর্বতগুলোকে কীলকরূপে প্রোথিত করে দিয়েছি আমি তোমাদের এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারগুলোর সুবিধার্থে, যাতে তোমরা এবং তোমাদের পশুগুলো এখানে নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে পারো। উল্লেখ্য, এখানকার 'মাতাআ'ন' (ভোগের) পদটি নিমিত্ত। পূর্বোক্ত 'দাহা' এবং 'আরসা' পদের ক্রিয়া দু'টো এখানে 'মাতাআন' পদকে কর্মপদে রূপায়িত করার লক্ষ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আমি বলি, 'তোমাদের এবং তোমাদের আনআ'মের ভোগের জন্য' কথাটিকে 'আখরাযা মিনহা' (সেখান থেকে উদগত করেন) এর নিমিত্ত করা হলেই সম্ভবতঃ বিশ্লেষণটি হয় অধিক সঙ্গত। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক পানি ও তৃণকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ ও পশুদের ভোগের জন্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে (৩৪) মানুষ যা করেছে, তা সে সেই দিন স্মরণ করবে' (৩৫)। এখানকার 'ফা' (অতঃপর) অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে নৈমিত্তিক হিসেবে। অর্থাৎ এই বিশাল মহাসৃষ্টির পটভূমিতে যখন আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার প্রভূত প্রমাণপঞ্জী সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত, তখন তাঁর অনড় অঙ্গীকার মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের বিষয়টি আর অপ্রামাণ্য নয়। সুতরাং মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো এখানে সেই মহাসংকটের প্রতি, যা অবশ্যম্ভাবী। এভাবে এখানে বিষয়টির অবতারণা করা হলো 'যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে' বলে, যাতে অনুমিত হয় সেই ভয়ংকর দিবসের কিছুটা পূর্বাভাস।

এখানে 'ত্বাম্‌মাতুন' অর্থ মহাসংকট। 'ত্বম্‌মুন' এর আভিধানিক অর্থ প্রাবাল্য, প্রতাপ, প্রাধান্য, বিজয়। প্রবল প্রতাপান্বিত বলেই সমুদ্রকে বলা হয় 'ত্বম্‌মুন'। ভীষণ বিপদকেও বলা হয় 'ত্বম্‌মুন'। বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা ভীষণ হচ্ছে কিয়ামত, মহাপ্রলয়। তাই মহাপ্রলয়কে এখানে বলা হয়েছে 'ত্বম্‌মাতুন'। এখানে 'ইজা' (যখন) পদের অনুবর্তী হয়েছে 'ইয়াওমা' (সেই দিন)। আর 'মাসাআ' (স্মরণ করবে) পদটির 'মা' অব্যয়টি ধাতুমূল, অথবা যোজক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন বিচারানুষ্ঠান শুরু হবে, তখন মানুষ তাদের আপন আপন আমলনামা হাতে নিয়ে হয়ে পড়বে চিন্তাযুক্ত, রোমন্থন করতে চেষ্টা করবে পৃথিবীর জীবনের স্মৃতি।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য'। অর্থাৎ তখন জাহান্নামকে আনা হবে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে। মুকাতিল বলেছেন, তখন উন্মোচিত হবে দোজখের আচ্ছাদন। তার উপরে অবস্থিত পুলসিরাত অতিক্রম করতে গিয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা নিক্ষিপ্ত হবে দোজখে এবং বিশ্বাসীরা নির্বিঘ্নে তা অতিক্রম করে চলে যাবে বেহেশতে। অথবা মর্মার্থ হবে— তখন দোজখকে উন্মোচন করা হবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখানে 'ইজা'র জবাব (সেদিন কী হবে) কথাটি রয়েছে উহ্য। আর তা প্রতীয়মান হয় এখানকার 'সেই দিন মানুষ স্মরণ করবে' কথাটি থেকে। তবে এখানে লুপ্ত কিছু রয়েছে ধরে না নিলেও বক্তব্যটি অস্পষ্ট থাকে না। কেননা পরবর্তীতে বিষয়টিকে ব্যক্ত করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'অনন্তর যে সীমালংঘন করে (৩৭) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় (৩৮) জাহান্নামই হবে তার আবাস' (৩৯)। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি লংঘন করে অবাধ্যতার সর্বশেষ সীমা, পার্থিব অর্জনকে অগ্রাধিকার দেয় পারলৌকিক কল্যাণের উপর, নরকগমন তার জন্য অবধারিত। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীর মোহে অন্ধ, সে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে তার আখেরাতকে। আর যে ব্যক্তি ভালবাসে তার পরকালকে, সে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে তার দুনিয়াকে। সুতরাং তোমরা পরলোকপ্রেমিক হও। নশ্বরতার পরিবর্তে গ্রহণ করো অবিনশ্বরতাকে। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরক আচ্ছাদিত রয়েছে কুপ্রবৃত্তির তাড়না দ্বারা। মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী— নরক পরিবেষ্টিত রয়েছে প্রবৃত্তির অপবাসনা দ্বারা। আর জান্নাত আচ্ছাদিত বা পরিবেষ্টিত প্রবৃত্তির অপছন্দনীয় বিষয়াদি দ্বারা। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, জিকির, আলেম ও এলেম অন্বেষণকারী ব্যতীত এ জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ৪০, ৪১

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

r পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে

r জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর যে ব্যক্তি মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে তার কৃতকর্মাবলীর হিসাব দেওয়ার ব্যাপারে ভীত-চিন্তিত থাকে এবং বিরত থাকে প্রবৃত্তির অপবাসনা চরিতার্থ করা থেকে, সে অধিবাসী হবে অক্ষয় জান্নাতের।

'সিহাহ' অভিধানে বলা হয়েছে, 'হাওয়া' অর্থ চিত্তাকর্ষক বিষয়াদির প্রতি প্রবৃত্তির অনুরাগ। এই 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অপবাসনাই প্রবৃত্তি পূজকদেরকে নিয়ে যায় চরম বিপদগ্রস্ততার দিকে। আর পরজগতে নিক্ষেপ করবে হাবিয়া নরকে। 'হাওয়া' এর শাব্দিক অর্থ— নিম্নাবতরণ, অধঃপতন।

স্মর্তব্য, সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদির মূলে রয়েছে নফস বা প্রবৃত্তি। জ্ঞানগত ও ধর্মগত উভয় দিক দিয়েই প্রবৃত্তিতাড়না জঘন্য ও নিন্দার্হ। আর নফসে আম্মারাই আল্লাহ্র সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। জ্ঞানগতভাবে জঘন্য এজন্য যে, প্রত্যেক বিষয়বস্তুর একটি মৌলিক অবস্থান রয়েছে, বিশেষ করে আদি-অন্তের মূল তত্ত্বের। যেমন স্বভাব ও কর্ম। এ দুটোর দাবি হচ্ছে, হয় এদু'টো শুভ হবে, অথবা অশুভ। তবে তা জ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয়ও, তবুও তা নির্ভরযোগ্য নয়, যতোক্ষণ না অদৃশ্যের অধিকারী আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে অবহিত না করেন। মানুষের দ্বারা শুভ-অশুভ, পুণ্য-পাপ নির্ণয়ন যদি সম্ভব হতো, তাহলে নবী-রসুল প্রেরণের প্রয়োজন আর পড়তো না। সুতরাং বুঝতে হবে, বিশুদ্ধ বিশ্বাস, শুভ-অশুভ নির্ণয়ন, নন্দিত ও ধিক্কৃত স্বভাবের পার্থক্য নিরূপণ অর্জিত হতে পারে কেবল প্রবৃত্তির অপবাসনা পরিহার এবং রসুলগণের অনুসরণের মাধ্যমে। প্রবৃত্তিপরায়ণতা (নফসানিয়াত) অবশ্যই রসুলানুসরণের পরিপন্থী।

আবার শরিয়তের দৃষ্টিতেও অপপ্রবৃত্তি একটি জঘন্য বস্তু। একারণেই আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'আমি মানব ও জ্বিন সম্প্রদায়কে আমার ইবাদত সম্পাদন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। জাওহারী তাঁর 'সিহাহ' অভিধানে লিখেছেন, বিনয়, নম্রতা, আনুগত্য ও ইবাদতের তাৎপর্য হচ্ছে আত্মসমর্পণের শেষ প্রান্ত স্পর্শ করা।

ইবাদত দু'ধরনের— ১. বাধ্যতামূলক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকলকিছুই আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত হয় স্বেচ্ছায়, অথবা বাধ্যগত ভাবে'। ২. ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছাধীন ইবাদতই চাওয়া হয়েছে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এখন কথা হচ্ছে, সকল কিছুই যেমন বাধ্যগতভাবে আল্লাহ্র অনুগত, তেমনি সম্পাদিত হওয়া উচিত ইচ্ছাধীন ইবাদতগুলোও। তাই দৈহিক, মানসিক ও প্রবৃত্তিক কোনো কর্মই আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে না হওয়াই সমীচীন। প্রবৃত্তিপরায়ণতার অর্থই ইবাদতের বিরোধিতা করা। আর প্রতিটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট কর্মই প্রবৃত্তিপরায়ণতার শাখা অথবা প্রশাখা, যা উৎপন্ন হয় বিসদৃশ ও বিকৃত চিন্তা-চেতনা থেকে। তাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে 'আরে, এ কেমন রসুল! পানাহার করে, আবার বাজারে যায়'। এরকম বিকৃত চিন্তার একটি সম্প্রদায়ের নাম মুজাস্সামা। তারা বলে, আল্লাহ্ আকারসম্ভূত। বলে, প্রতিটি অস্তিত্বের অধিষ্ঠিতি কোনো না কোনো স্থানে। আর আল্লাহ্ যেহেতু অস্তিত্ববান, সেহেতু তিনি সাকার (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। মুতাজিলারাও বিকৃত বিশ্বাসী। তাই তাদের মুখে উচ্চারিত হয়— কবরের শাস্তি, পাপ-পুণ্যের পরিমাপ, পুলসিরাত ইত্যাদি ভিত্তিহীন। বৃহৎ পাপীরাও স্বীকার করে যে, কোরআনের বিধান ও রসুলের নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। চরিত্রহীনেরাও জানে, পরকালের শাস্তি অনিবার্য। তবুও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি মানে না। পরিত্যাগ করে অত্যাবশ্যক দায়িত্বসমূহ এবং লিপ্ত হয় নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে।

হজরত আসমা বিনতে উমাইস থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় ধ্বংসাত্মক। আর যে প্রবৃত্তির দাস, সে সর্বনিকৃষ্ট। প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে। তিনি স. আরো বলেছেন, তিনটি বিষয় মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে— ১. প্রবৃত্তির অপকামনা ২. সীমাতিরিক্ত কার্পণ্য ৩. আত্মশ্লাঘা। অবশ্য শেষোক্তটিই অধিক নিকৃষ্ট। হাদিসটি হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। আমি বলি, হাদিসে উল্লেখিত প্রবৃত্তি অর্থ যদিও বিশেষ ধরনের প্রবৃত্তি, কিন্তু তিনটি বিষয়ই প্রবৃত্তিপরায়ণতাসম্পৃক্ত।

উপযোগ ঃ প্রবৃত্তিপরায়ণতা পরিহার করা যেতে পারে বিভিন্ন উপায়ে। এর মধ্যে ন্যূনতম উপায় হচ্ছে, বিশ্বাসগত দিকটিকে হতে হবে অত্যন্ত সুদৃঢ়। অবশ্য বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ, কোরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং বিদ্বজ্জনের ঐকমত্যের বিরোধিতা করা যাবেই না। এরকম বিশ্বাসধারীরাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতভুক্ত। মধ্যম পন্থা হচ্ছে, পাপচিন্তা এলেই স্মরণ করতে হবে পরকালের

হিসাব নিকাশ ও পুরস্কার-তিরস্কারের কথা। এ স্তরের পূর্ণতা অর্জিত হয় সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী পরিত্যাগের মাধ্যমে। আবার সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করাও প্রয়োজন। রসুল স. বলেছেন, যারা সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, তারা তাদের ধর্ম ও মানসম্মানকে নিরাপদ রাখে। আর যারা সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহে মগ্ন হয়, তারা শেষ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় নিষিদ্ধতার গহ্বরে। তারা যেনো ওই ধরনের রাখাল, যে তার পশুগুলোকে চরায় নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে পাশে। এমতাবস্থায় তার পশুপালের নিষিদ্ধ চারণভূমিতে অনুপ্রবেশের রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। বোখারী, মুসলিম।

এ স্তরের আর একটি পূর্ণতা এরকম— তোমার প্রয়োজনকে সীমায়িত করো সিদ্ধ বস্তুসমূহের বৃত্তে। পরিত্যাগ করো সৌখিন আকাংখা। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যা মন চায়, তা-ই উদরস্থ করা অপব্যয়। ইবনে মাজা, বায়হাকী। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকেও।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেন, আমাদের মহাসম্মানিত শায়েখ বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার সহজতম উপায় হচ্ছে, প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিরুদ্ধাচরণ। অর্থাৎ শরিয়ত প্রতিপালনের সাথে সাথে প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ। আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত। আর একটি সূক্ষ্ম বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে, কিছু কিছু পাপ প্রকাশ্যত দৃষ্টিগোচর। কিন্তু কিছু কিছু পাপ আসে অন্ধকারে গোপন পথ ধরে, ধীরগতিসম্পন্ন পিপীলিকার মতো। এসব পাপ পরিধান করে পুণ্যের পোশাক। যেমন লোক দেখানো ইবাদত। কৃত ইবাদত ও সাধনার বিষয়ে আত্মগর্ব অনুভব। প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগী করা। এই স্তর আসলেই পদস্খলনের স্তর, যদিও তা বাহ্যত পুণ্যময়। জনৈক পীর-মোর্শেদ তাঁর মুরিদকে বলেছিলেন, শোনো, পাপের পথ ধরে শয়তান তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে, এরকম আশংকা আমি করি না। তবে আশংকা করি, সে হয়তো তোমার কাছে পৌঁছে যাবে পুণ্যের পথ ধরে। সুতরাং প্রবৃত্তিকে সব সময় সন্দেহের চোখে দেখো। অবলম্বন গ্রহণ কোরো রোদনের ও ক্ষমাপ্রার্থনার (ইস্তেগফারের)। জনৈক কবি বলেছেন— সর্বদা প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরোধিতা কোরো, যদিও তারা তোমার মঙ্গলাকাংখী হয়ে আসে। তুমি তো ভালো করেই জানো সুহৃদ-স্বজন ও সমাজপতিদের চক্রান্তের স্বরূপ। সুতরাং তাদের কথার কোনো মূল্য দিয়ো না। যা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয় নয়, তা থেকে আশ্রয়প্রার্থী হয়ো কেবল তাঁরই সকাশে। অগ্রাহ্য কথা ও কর্ম বন্ধ্যা রমণীতুল্য। পুণ্যের পরম্পরা তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারেই না। এই স্তরে নিরাপদ থাকার উপায় হলো এমন এক পীর-মোর্শেদের সাহচর্য অবলম্বন, যিনি আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণরূপে নিবেদিত। তাঁর আদেশ ও অনুমতি ব্যতীত কিছু করা নিতান্তই অসমীচীন।

শায়েখ ইয়াকুব চরখী তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন এভাবে— একবার আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। প্রবৃত্তি হয়ে পড়লো অলস। হৃদয়ে অনুভব করলাম অস্বচ্ছতা। ভাবলাম নফসের আলস্য ও কলবের অস্বচ্ছতা দূর করার জন্য কয়েকদিন রোজা রাখবো। রোজা রাখতে শুরু করলাম। এমতাবস্থায় একদিন উপস্থিত হলাম আমার প্রাণপ্রিয় পীর-মোর্শেদ ইমাম বাহাউদ্দিন নক্শবন্দের মহান সান্নিধ্যে। তিনি পানাহারের আয়োজন করলেন। বললেন, খাও। ওই ব্যক্তি অসুন্দর, যে দাসত্ব করে তার প্রবৃত্তির। তাকে বিপথে নিয়ে যায় প্রবৃত্তিই। শোনো, প্রবৃত্তির প্ররোচনায় রোজা রাখা অপেক্ষা আহার করা উত্তম। আমি বুঝতে পারলাম, নফল ইবাদতের জন্য এমন মহান মোর্শেদের অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য, যিনি প্রকৃতই আল্লাহ্মগ্ন এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত। নিবেদন করলাম, এমন মহান মোর্শেদ যদি কেউ না পায়, তবে সে কী করবে? তিনি বললেন, এরকম ব্যক্তির উচিত হবে অধিক পরিমাণে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। প্রতি ওয়াক্তে নামাজ পাঠের পর ইস্তেগফার করতে হবে কমপক্ষে কুড়িবার। যেমন রসুল স. বলেছেন, একবার আমি হৃদয়ে অশান্তি অনুভব করলাম। তখন আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলাম প্রতিদিন এক শত বার করে।

প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে মুক্ত হতে গেলে তার সকল প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে হৃদয় থেকে টেনে বের করে নিক্ষেপ করতে হবে দূরে। হৃদয়ে ভরপুর রাখতে হবে আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। একমাত্র তাঁকেই করতে হবে কামনা-বাসনা-অভীষ্ট-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। এমতো উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থে আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণ নিরবচ্ছিন্নরূপে মনে মনে পাঠ করেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেছেন, যতোক্ষণ মানুষ তার প্রবৃত্তির সঙ্গে বিজড়িত থাকে, ততোক্ষণ সে প্রবৃত্তির দাস ও শয়তানের অনুগামী। এমতো বিপদ থেকে মুক্ত হতে গেলে বেলায়েত অর্জন অপরিহার্য। আর বেলায়েত নির্ভর করে ফানা ও বাকার উপর। কিন্তু এমতো সমুচ্চ নেয়ামত আবার সকলের ভাগ্যে জোটে না।

আমি বলি, যারা আল্লাহ্র প্রকৃত দাস, তারা বেলায়েতের স্তরে পৌঁছলেই পছন্দ করতে শুরু করেন নিয়তিকে। স্বভাবের বিপরীত হলেও প্রসন্নচিত্তে মেনে নেন তকদীরকে। দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে পরিত্রাণ প্রার্থনা করেন কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, দোয়া করা আল্লাহ্র আদেশ। আর প্রভুপালকের দাসত্ব স্বীকার করাই দাসগণের মূল কর্তব্যকর্ম। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছার অনুগামী তিনি তখন হন না। শয়তান এরকম ব্যক্তিবর্গের কাছে আসার পথই খুঁজে পায় না। কেননা তার মূল সূত্র অপপ্রবৃত্তি তখন নিশ্চিহ্ন। লক্ষণীয়, যে ব্যক্তি রাগী স্বভাবের, শয়তান হত্যাকাণ্ড ও জুলুমকে তার সামনে তুলে ধরে সুন্দর কর্ম হিসেবে। আর যে কোমল স্বভাবের, শয়তান তাকে প্ররোচিত করে জেহাদের ময়দান থেকে পালাতে। শয়তান তাকে আরো প্ররোচনা দেয় মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অবশ্যপ্রযোজ্য প্রতাপকে পরিত্যাগ করতে, অধিকন্তু কপটতা করতে।

স্বনামধন্য শায়েখ ইয়াকুব চরখী বলেছেন, নফসের গোলামী থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত পৌরুষ অর্জন করা যায় না, যা একজন মানুষকে চিহ্নিত করে প্রকৃত মুমিন বলে। এদিকে ইঙ্গিত করেই এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমা কর্তৃক আনীত শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারে না। ইমাম বাগবী হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' গ্রন্থে। আর আল্লামা নববী তাঁর 'আর রাযীন' গ্রন্থে লিখেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

হজরত যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাক বর্ণনা করেছেন, অংশীবাদীরা একবার রসুল স.কে অতর্কিতে প্রশ্ন করে বসলো, বলো, কিয়ামত হবে কবে? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতগুচ্ছ। বলা হয়—

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

r উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামত সম্পর্কে, 'উহা কখন ঘটিবে?'

r ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!

r ইহার পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট;

r যে উহার ভয় রাখে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।

r যেই দিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন উহাদের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! তারা আপনাকে বিব্রত করে একথা জিজ্ঞেস করে যে, মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে?

এখানে 'মুরসাহা' অর্থ কখন ঘটবে। 'মুরসা' শব্দটির ধাতুমূল 'রাস' অর্থ সংঘটিত হওয়া, বাস্তবায়িত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া। হাকেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, অংশীবাদীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রসুল স. জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অথবা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানতে চেয়েছিলেন, মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে কখন? তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। তিবরানী ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, তারেক ইবনে শিহাব বলেছেন, রসুল স. প্রায়শই কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এমতো অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৪৩)। বলা হয়—

‘এর আলোচনার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক’। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আরো একটি প্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন হজরত ওরওয়া থেকে ইবনে আবী হাতেম। বিবরণটি এরকম— যখন জনগণ কিয়ামত হওয়ার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানার জন্য রসুল স.কে বার বার জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো, তখন তিনি স. এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের নিকটে দোয়া করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো ‘এর আলোচনার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক’? অর্থাৎ হে আমার রসুল! এ সম্পর্কে আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেনো? কিয়ামত কখন হবে, তা জানা এবং প্রচার করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। লক্ষণীয়, এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ গোপন রাখার মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে কোনো বিশেষ রহস্য, যা ভেদ করার যোগ্যতা ও অধিকার কারোই নেই।

এখানকার ‘ফীমা’ পদের ‘মা’ প্রশ্নবোধকটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং তা ‘মিন জিক্রাহা’ বাক্যের বিবৃতি। অর্থাৎ রসুল স.কে সম্বোধন করে এখানে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল স.! এ সম্পর্কে আপনি ব্যতিব্যস্ত হতে যাবেন কেনো? কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ জানাবার বিষয় যদি হতো, তবে তা তো আপনাকে জানিয়েই দেওয়া হতো। তা যখন করা হয়নি, তখন বুঝে নিন, বিষয়টি গোপন রাখাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। অথবা মর্মার্থ হবে— কিয়ামত সম্পর্কে আপনিই যখন কিছু জানেন না, তখন তা অন্যকে জানাবেন কী ভাবে? কিংবা এখানকার ‘ফীমা’ বাক্যটি বিধেয় এবং এর উদ্দেশ্য এখানে রয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এমতো প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্য কী? কী লাভ হবে একথা জেনে? এরপর শুরু হয়েছে নতুন বাক্য ‘আনতা মিন জিকরাহা’ (আপনি যার আলোচনায় নিমগ্ন)। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— আপনিই তো কিয়ামতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কেননা আপনি শেষতম নবী। আপনার নবুয়তের জামানা যখন শেষ হবে, তখনই তো সংঘটিত হবে কিয়ামত। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এরকম পরস্পরলগ্ন (তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী একত্রিত করে দেখালেন)। হজরত মাসতুরাহ ইবনে শাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আসন্ন কিয়ামতের আগে। যেমন এটা (শাহাদাত অঙ্গুলী) এটার (মধ্যমা অঙ্গুলীর) আগে। তিরমিজি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, হে আমার রসুল! এরকম আলোচনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের ‘তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে’ কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ জনগণ যা জানার জন্য ব্যাগ্র, তা আপনি প্রশ্রয়যোগ্য বিষয় বলে বিবেচনা করবেন কেনো, যে সম্পর্কে আপনাকে জানানোই হয়নি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘এর পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট (৪৪); যে তার ভয় রাখে, তুমি কেবল তাদের সতর্ককারী’

(৪৫)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, এ বিষয়ের জ্ঞানকে আল্লাহ্ গোপন রাখাই পছন্দ করেন। আর আপনাকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেবল একথা বলতে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তা যখনই ঘটুক না কেনো। এররকম প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেবল এ বিষয়ে সতর্ক করণার্থে যে, কিয়ামতের কথা স্মরণ করে মানুষ যেনো নিজেকে সাবধান করে নেয়, বিরত থাকে ওই সকল কার্যাবলী থেকে, যা কিয়ামত দিবসে ডেকে আনবে সমূহ বিপদ। সুতরাং আপনি সতর্ক করতে থাকুন কেবল তাদেরকে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় আত্মসংশোধনের বিষয়টিকে। তারাই তো সফলকাম।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেনো তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা, অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে'।

এখানে 'আ'শীয়াতান' অর্থ এক সন্ধ্যা এবং 'দুহা' অর্থ এক প্রভাত। উল্লেখ্য, সন্ধ্যা ও প্রভাত একই দিনের দু'টি অংশ। অর্থাৎ অত্যল্প সময়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে, অনুষ্ঠিত হবে মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারপর্ব, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে প্রকৃত সত্য। আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবী এবং কবরের জীবন যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, সে কথা বুঝতে পেরে তারা আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে আপন মনে বলতে থাকবে, হায়! কী করলাম আমরা! পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয়ে অস্বীকার করলাম আখেরাতকে। এখন তো দেখছি আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবীর জীবন একটি সন্ধ্যা, অথবা একটি সকাল মাত্র। তাদের এমতো আক্ষেপের কথা অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে 'আমরা দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলাম এক দিন, অথবা দিনের কিয়দাংশ সময়'। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত যেনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের 'মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে' প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর।

সূরা আ'বাসা

মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানির রুকুর সংখ্যা ১ এবং আয়াতের সংখ্যা ৪২।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শোরাইহ্ ইবনে মালেক ইবনে রবীয়া ফেহরী পরিচিত ছিলেন ইবনে উম্মে মাকতুম নামে। তিনি ছিলেন আমের ইবনে লুয়াইয়ের গোত্রভূত। একদিন তিনি রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন। রসুল স. তখন আলাপ করছিলেন উতবা, আবু জেহেল, ইবনে হিশাম, আব্বাস ইবনে মুত্তালিব, উবাই ইবনে খলফ, উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখ কুরায়েশ গোত্রপতিদের সঙ্গে। হজরত ইবনে উম্মে মকতুম ছিলেন দৃষ্টিহীন। তাই তিনি রসুল স. এর আচরণের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি না করতে পেরে বার বার বলে

যাচ্ছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল। হে মহান শিক্ষাদাতা! আল্লাহ্ আপনাকে যা শিখিয়েছেন, তা থেকে আমাকেও কিছু শিক্ষা দিন। প্রত্যাদেশিত বাণীসমূহ থেকে আমাকেও কিছু পাঠ করে শোনান। আমি যে অন্ধ। রসুল স. গোত্রপতিদের সঙ্গে আলাপচারিতাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন এই ভেবে, তারা যদি ইমান আনে, তবে সাধারণ জনতাও ইসলাম গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে। তাই হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমের কথায় বার বার তাঁর মনোযোগ ব্যহত হতে লাগলো। তিনি স. এই ভেবে আরো বিরক্ত বোধ করলেন যে, গোত্রপতিরা একটা ছুতা পেয়ে যেনো আবার এরকম মন্তব্য না করে বসে, ইসলামের অনুসারীরা আসলে এরকম অন্ধ-বিকলাঙ্গ ক্রীতদাসেরাই। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয় নিম্মোক্ত আয়াতগুচ্ছ—

সূরা আ'বাসা ঃ আয়াত **১—১৬**

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ﴿١﴾ اَنۡ جَآءَهُ الۡاَعۡمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدۡرِيۡكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ﴿٣﴾ اَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنۡفَعَهُ الذِّكۡرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسۡتَغۡنٰى ﴿٥﴾ فَاَنۡتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيۡكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنۡ جَآءَكَ يَسۡعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخۡشٰى ﴿٩﴾ فَاَنۡتَ عَنۡهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾ كَلَّآ اِنَّهَا تَذۡكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ فِىۡ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرۡفُوۡعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِاَيۡدِىۡ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

q সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,
q কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।
q তুমি কেমন করিয়া জানিবে— সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত,
q অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
q পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না,
q তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ।
q অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই,
q অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল,
q আর সে সশংকচিত্ত,
q তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিলে;
q না, ইহা ঠিক নহে, ইহা তো উপদেশবাণী,
q যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে,

- উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে
- যাহা উন্নত, পবিত্র,
- মহান, পূত-চরিত্র লিপিকারের হস্তে লিপিবদ্ধ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— রসুল স. বিরক্তিতে ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং ফিরেয়ে নিলেন তাঁর মুখ। কারণ তাঁর নিকটে তাঁর অন্ধ সহচর এসে বার বার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছিলো। এখানকার দ্বিতীয় আয়াতখানি প্রথম আয়াতের 'ভ্রুকুঞ্চন' ও 'বিমুখতা'র কারণ। অর্থাৎ 'আবাসা' ও 'তাওয়াল্লা' এখানে তৎসন্নিহিত কর্মপদ।

তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, এই আয়াতে 'অন্ধ লোকটি' বলে বুঝানো হয়েছে সাহাবী ইবনে উম্মে মকতুমকে। তিনি আরো বলেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন ইবনে উম্মে মকতুম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম জন! আমার উপরে আপনি কি অপ্রসন্ন? তিনি স. বললেন, না। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত আনাস থেকেও। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথা টুকুও— এরপর থেকে রসুল স. ইবনে উম্মে মাকতুমকে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে দেখতেন। দেখা হলেই তাঁকে সমাদর করতেন। বলতেন, অভিনন্দন ওই ব্যক্তির জন্য, যার কারণে আমার প্রিয়তম পালনকর্তা আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন। তাঁকে দেখলেই বলতেন, বৎস! কিছু বলতে চাও?

তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. দুই যুদ্ধের সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে ইবনে উম্মে মকতুমকে মদীনার সাময়িক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে হজরত ইবনে উম্মে মকতুমকে অন্ধ বলায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি দেখতে পেতেন না বলেই তখন রসুল স.কে সম্বোধন করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর এমতো আচরণ ক্ষমার্হ।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তুমি কেমন করে জানবে, সে হয় তো পরিশুদ্ধ হতো'। 'ওয়ামা ইয়াদরীকা' অর্থ তুমি কেমন করে জানবে। এখানকার 'মা' অব্যয়টি না-সূচক। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তো জানেন না। মূলত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক হিসেবেই না-সূচক। রসুল স. এর এমতো অনবহিতিই এখানে একটি অজুহাত হিসেবে গণ্য হয়েছে। অর্থাৎ তিনি স. যদি তাঁর মনের অবস্থা জানতেন, তবে তাঁকে ফেলে অন্যদিকে মনোযোগী হতেন না। কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রসুল স. এর প্রভুত মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত। যেমন—

বক্তব্যের সূচনায় লক্ষ্য করা যায়, সরাসরি সম্বোধন না করে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে, প্রথম পুরুষে অনুপস্থিত জনকে লক্ষ্য করে। এতে করে এই ধারণাটি পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, উপেক্ষা করার বিষয়টি আপনার দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, সম্পন্ন হয়েছে অন্য কারো দ্বারা। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন

মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে অনুপস্থিত জনকে। এভাবে ব্যাখ্যাটি দাঁড়ায়— কর্মের ফলাফল নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর। আর হজরত ইবনে উম্মে মকতুমকে উপেক্ষা করা নিশ্চয় রসুল স. এর উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তিনি ভেবেছিলেন, ইবনে উম্মে মকতুম তো ইসলাম গ্রহণ করেছেনই। সুতরাং তাঁর শিক্ষা দীক্ষা একটু দেরীতে হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কুরায়েশ গোত্রপতিরা এখনও যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তারা এখান থেকে এখন চলেও যেতে পারে। তখন তাদেরকে ইসলামের বিষয়ে বুঝানোর সুযোগটি যাবে হারিয়ে। আর কথাবার্তার মাধ্যমে এখনই যদি তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইমান আনে, তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিসর হবে অধিকতর প্রশস্ত, শক্তি যাবে বেড়ে। একারণেই তিনি স. তখন অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন ওই গোত্রপতিদেরকেই।

'তুমি কেমন করে জানবে' বলে এখানে রসুল স. এর অনবহিতিকেই বানানো হয়েছে একটি অজুহাত। এভাবে এই অজুহাতকেই বানানো হয়েছে তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার একটি নিমিত্ত।

মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করে এখানে রসুল স. এর ব্যক্তিত্বকে করা হয়েছে সুমহান। এভাবে দূরীভূত করা হয়েছে ওই ধারণাটির, যার উদ্ভব ঘটতো প্রথম পুরুষে সম্বোধন করলে।

অজুহাত প্রদর্শনের সম্পর্ক এখানে করা হয়েছে সরাসরি রসুল স. এর সঙ্গে। এভাবে এখানে এই বিষয়টিকেই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, হে আমার রসুল! এতে অবশ্য আপনার কোনো হাত ছিলো না। বরং আপনার অনবহিতি আপনার এমতো আচরণের পক্ষের একটি যথাযথ অজুহাতই বটে।

'লাআ'ল্লাহু ইয়ায্যাক্কা' অর্থ সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনার মনোযোগ পেলে ইবনে উম্মে মকতুম হয়তো পরিশুদ্ধ হতো পরিপূর্ণরূপে। মুক্ত হতে পারতো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে, অংশীবাদিতার সর্বদূরবর্তী অপরিচ্ছন্নতা থেকে, বস্তুজগতের প্রতিটি মৌলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভাব থেকে, কলব, রূহ, সির, খফি, আখফা লতিফাগুলোর অতি সূক্ষ্ম অমনোযোগিতা থেকেও। এ সকল কিছু তো অর্জিত হওয়া সম্ভব কেবল আপনার সুমহান নৈকট্য ও পরিপূর্ণ মনোনিবেশনের (তাওয়াজ্জোহের) মাধ্যমে, নবুয়তের উৎকর্ষতার আলোক সম্পাতে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো'। এখানে 'উপদেশ গ্রহণ করতো' অর্থ আল্লাহ্র স্মরণে নিমগ্ন হতো। আর 'উপদেশ তার উপকারে আসতো' অর্থ আল্লাহ্র ওই স্মরণমগ্নতা দ্বারা সে লাভ করতো প্রভূত কল্যাণ। সুদৃঢ় হতো তার হুজুরে কলব। সে অর্জন করতে পারতো আল্লাহ্র রহমতের অধিকতর আশা এবং শাস্তির অধিকতর ভীতি। এখানকার 'ইয়াজ্জাক্কারু' কথাটি মূলতঃ ছিলো 'ইয়াতাজাক্কারু'।

‘সিহাহ্’ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘জিক্‌রা’ অর্থ অধিক জিকির। সাধারণ ‘জিকির’ অপেক্ষা ‘জিক্‌রা’ অধিকতর সুদৃঢ় ও আধিক্যজ্ঞাপক। আগের আয়াতের ‘লাআ’ল্‌লাহু ইয়ায্‌যাক্‌কা’ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে পুণ্যবান (আবরার) গণের চূড়ান্ত উৎকর্ষের প্রতি, আর পুণ্যাত্মা (আখইয়ার)গণের শেষ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের ‘ইয়াজ্‌জাক্‌কারু’ দ্বারা। লক্ষণীয়, সিদ্দীক ও নৈকট্যভাজন (মুকার্‌রাবীন)গণের আলোচনা এখানে আসেনি। কেননা এই মাকামটি হচ্ছে আমিত্বের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ ইচ্ছাস্বাধীনতা দ্বারা যা কিছু অর্জন করা যায়, তার অধিষ্ঠান। এর ঊর্ধ্বের স্তরসমূহের আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। বলাবহুল্য, এর ঊর্ধ্বের মর্যাদাসমূহ তো লাভ হতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র নিছক দয়া-অনুকম্পায়। পুণ্যকর্মসমূহ এক্ষেত্রে কোনো উপকারে আসে না। এ বিষয়টি তো স্বতঃসিদ্ধ যে, নৈকট্যভাজনগণের মনোনয়ন আসে কেবল আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। তাঁর এমতো মনোনয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে কেবল নবী-রসুলগণের সঙ্গে। আর তাঁদের সৌজন্যে এমতো মর্যাদা লাভ করতে পারেন ওলীআল্লাহ্‌গণ। আল্লাহ্‌পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই এমতো নেয়ামত দানে ধন্য করেন। এতো হচ্ছে নিছক তাঁর ফজল। ওয়াল্লাহু আ’লাম।

এখানে ‘সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো’ কথাটির উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, হজরত ইবনে উম্মে মকতুম একই সঙ্গে পরিশুদ্ধ হওয়া ও উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্য নন। বরং কথাটি উদ্দেশ্য হবে এরকম যে, যদি তাঁর প্রতি তিনি স. মনোযোগী হতেন, তবে তাঁর কমপক্ষে দু’টোর একটি তো অর্জিত হতোই। কথাটির মধ্যে আবার প্রচ্ছন্নভাবে এই কথাটিও নিহিত রয়েছে যে, হজরত ইবনে মকতুমের মধ্যে যে যোগ্যতা রয়েছে, সে যোগ্যতা ওই গোত্রপতিদেরও নেই। তারা ইসলাম গ্রহণও করবে না। সুতরাং রসুল স. যে উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে চাচ্ছেন, তা কখনো সফল হবে না। আর আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ও সেরকম নয়। বরং তিনি চান তাঁর রসুল মনোযোগী হন আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রতি।

কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, আগের আয়াতের ‘সে হয়তো’ কথাটির ‘সে’ সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি হয়তো আশা করছেন, ওই গোত্রপতিরা পরিশুদ্ধ হবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে। কিন্তু আপনি তো জানেন না, আপনার এমতো আশা আদৌ পূরণ হবে কিনা। এমতাবস্থায় এখানকার ‘কেমন করে জানবে’ বাক্যের ‘জানবে’ এর প্রথম কর্মপদ হবে ‘কেমন করে’ এবং দ্বিতীয় কর্মপদ হবে ‘সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো’। আল্লাহ্‌ই সমধিক জ্ঞাত।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— ‘পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না (৫), তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো (৬)। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই’ (৭)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তারা তো তাদের

ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্বিত, উদ্ধত। মহাসত্যের আহ্বানের কোনো মূল্যই নেই তাদের কাছে। অথচ আপনি তাদেরই পথপ্রাপ্তির আশায় ব্যাকুল। সুতরাং তারা পরিশুদ্ধ হতে না চাইলেও কি তাদেরকে জোর করে হেদায়েত করবেন? আপনার কাজ তো কেবল মহাসত্যের দিকে আহ্বান জানানো। তারা এ আহ্বানকে মান্য করবে কি করবে না, সেটা তাদের ব্যাপার। তারা ইমান না আনলে আপনাকে তো আর একারণে অভিযুক্ত করা হবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটে এলো (৮), আর সে সশংকচিত্ত (৯) তুমি তাকে উপেক্ষা করলে' (১০)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, ইবনে উম্মে মকতুম জ্ঞানাহরণের জন্য কতো অনুরাগ নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এলো, আর তার অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীতও। অথচ আপনি তার প্রতি মনোনিবেশই করলেন না। এটা কি ঠিক হলো।

এখানকার 'তোমার নিকট ছুটে এলো' এবং 'আর সে সশংকচিত্ত' বাক্য দু'টো অবস্থাজ্ঞাপক। উল্লেখ্য, শুরুর আয়াতে 'ভ্রূকুঞ্চিত করলো' ও 'মুখ ফিরিয়ে নিলো' কথাদু'টোর দ্বারা যে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিলো, আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষ বাক্যে তা লাভ করলো পরিণত রূপ। এভাবে পুরো বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! ইবনে উম্মে মকতুম সম্পর্কে আপনি যে আচরণ করেছেন, তা আমার মনঃপুত নয়। এর বিপরীত আচরণই আমার মনঃপুত। অবশ্য আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। তাই আপনাকে এ সম্পর্কে আর ভর্ৎসনা করা হলো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'না, এটা ঠিক নয়, এটা তো উপদেশবাণী (১১), যে ইচ্ছা করবে, সে এটা স্মরণে রাখবে' (১২)। প্রথম বাক্যটির অর্থ— এটা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, সমগ্র কোরআন, অথবা কোরআনের আয়াতসমূহ অবধারিত করে আল্লাহ্‌র জিকিরকে। এখানে 'ইন্‌নাহা' বাক্যের 'হা' (এটা) সম্পর্কযুক্ত হবে কোরআনের সঙ্গে। আর এরকম হওয়া একারণেই শোভন হবে যে, এর বিধেয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আর 'যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে' অর্থ সুতরাং যে চায় সে যেনো সমগ্র কোরআন, অথবা এর আয়াতসমূহ স্মৃতিস্থ করে। উল্লেখ্য, আয়াতের বক্তব্যভঙ্গিমা দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, কোরআন হেফজ করা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। তবে এর মর্মার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে ভর্ৎসনা করা হয়েছে কোরআন, অথবা এর আয়াতসমূহ স্মৃতিস্থ না করার প্রতি এবং একই সঙ্গে প্রশংসা করা হয়েছে তাদের, যারা আল্লাহ্‌র জিকির করে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'এটা আছে মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে (১৩) যা উন্নত, পবিত্র (১৪), মহান পুতঃপবিত্র লিপিকারের হস্তে লিপিবদ্ধ' (১৫, ১৬)।

এখানকার 'মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে' বাক্যটি ১১ সংখ্যক আয়াতের 'উপদেশবাণী' এর বিশেষণ, অথবা ওই আয়াতেরই 'এটা তো' পদের দ্বিতীয়

বিধেয়, কিংবা বিধেয় একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের। অর্থাৎ ওই উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে সম্মানিত সুরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে), অথবা ফেরেশতাগণ কর্তৃক সংরক্ষিত লিপিসমূহে, কিংবা বিভিন্ন নবীর উপরে অবতীর্ণ আকাশী পুস্তিকা সমূহে (সহিফায়)। সহিফা বা আকাশী পুস্তিকার কথা বলা হয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন 'অবশ্যই তা বিধৃত হয়েছে পূর্ববর্তীগণের যবুরে' 'অবশ্যই একথা বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী সহিফাসমূহে' 'ইব্রাহিম ও মুসার সহিফা সমূহে'। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহ' অর্থ সাহাবীগণের ওই সকল নথিপত্র, যেগুলোতে তাঁরা প্রত্যাদেশাবলী লিপিবদ্ধ করতেন রসুল স. এর কাছে শুনে শুনে।

'যা উন্নত, পবিত্র' অর্থ আল্লাহ্পাকের সমীপে সমুন্নত ও মহিমময়। অথবা সপ্ত আকাশে উন্নীত। আর 'পবিত্র' অর্থ ঋতুবতীদের স্পর্শ থেকে পবিত্র।

'সাফারাতিন' অর্থ লিপিকার। শব্দটি বহুবচন 'সাফিরুন' এর। বই পুস্তককে একারণেই বলে 'সফর'। আর সফরের বহুবচন হচ্ছে 'আসফার'। এভাবে এখানকার 'মহান, পুতপবিত্র লিপিকার' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— মানুষের আমল লেখক ফেরেশতাবর্গ, অথবা নবী-রসুলগণ, কিংবা ওহীবাহক ফেরেশতাগণ। অন্যান্য বিদ্বজ্জন বলেন, 'সাফরাতুন' বহুবচন 'সাফীর' এর। আর 'সাফীর' অর্থ ওই মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি, যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয় বিবদমান দু'টি দলের মধ্যে। এখানে ফেরেশতা ও মানব জাতির মাধ্যম হচ্ছেন নবী রসুলগণ। আমি বলি, মাধ্যম হচ্ছেন প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধকারীগণ। উপরন্তু এই উম্মতের আলেমগণও মাধ্যম। তাঁরা হচ্ছেন রসুল স. ও সাধারণ উম্মতের মধ্যস্থতাকারী।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে এবং তা অপরকে শেখায়, সে মহান ও পুতঃপবিত্র লিপিকারগণের দলভূত। আর যে ব্যক্তি কোরআন অনুশীলনের সাথে সাথে এর দুরূহ বিধানগুলির মর্মোদ্ধারে ব্রতী হয়, সে পায় দ্বিগুণ বিনিময়। জননী আয়েশা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হাদিসে উল্লেখিত দ্বিগুণ বিনিময় হচ্ছে কোরআন অধ্যয়ন ও কোরআনের বিধান উদ্ধার প্রচেষ্টার বিনিময়। আরেকটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট যে, কোরআনের তত্ত্বজ্ঞগণের বিনিময়ের কথা এখানে রয়েছে অনুল্লেখিত। এতে করে বুঝা যায়, তাদের বিনিময় অপরিমেয়।

'কিরাম' অর্থ পুত-চরিত্র, যশস্বী, বিশ্বাসীদের প্রতি কৃপাপরবশ, কল্যাণ প্রয়াসী, ক্ষমা প্রার্থনাকারী। 'বারারাহ্' অর্থ মহান, সংযমী, আল্লাহ্ভীরু। বলাবহুল্য, ধর্মপ্রাণ বিদ্বানগণ এমনই হন। আর এখানকার 'বারারাহ্' পদটি 'সাফারাহ্' পদের দ্বিতীয় বিশেষণ।

সূরা আ'বাসা ঃ আয়াত ১৭—৩২

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ

خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿٢٤﴾ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

q মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!
q তিনি উহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?
q শুক্রবিন্দু হইতে, তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,
q অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন;
q অতঃপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।
q ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।
q না, কখনও না, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।
q মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক!
q আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,
q অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;
q এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;
q দ্রাক্ষা, শাক-সব্জি,
q যায়তূন, খর্জুর,
q বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,
q ফল এবং গবাদি খাদ্য,
q ইহা তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতখানি একটি বিস্ময়প্রকাশক অভিসম্পাত। 'কুতিলা' পদটি মানবজাতির জন্য একটি বিস্ময়উদ্রেকক নিকৃষ্ট সম্বোধন। বিস্ময় একারণে যে, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে রয়েছে ইমান গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্যতা। কিন্তু সে যোগ্যতা তারা কাজে লাগায় না। ফলে হয়ে যায় বেইমান ও অকৃতজ্ঞ। উদ্ধৃত অভিসম্পাতটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু রোষ ও তিরস্কারে ভরপুর।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু লাহাব নন্দন উতবাকে লক্ষ্য করে। সে প্রকাশ্যে বলেছিলো, আমি নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভুপালককে অস্বীকার করি। ঘটনাটি ছিলো এরকম— রসুল স.

তাঁর আদরের দুলালী হজরত উম্মে কুলসুম ও তাঁর সহোদরাকে বিবাহ দিয়েছিলেন আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবা এবং উতাইবার সঙ্গে। যখন সুরা লাহাব অবতীর্ণ হলো, তখন আবু লাহাব তার ওই দুই ছেলেকে বললো, তোমরা যদি মোহাম্মদের দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটাও, তবে বুঝবো, তোমরা আমার অবাধ্য সন্তান। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উতবা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালো হজরত উম্মে কুলসুমের সঙ্গে। সে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে দম্ভভরে বললো, আমি আপনার ধর্মমতকে প্রত্যাখ্যান করি। একথা বলেই সে রসুল স. এর পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ টেনে ছিঁড়ে ফেললো। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তাঁর সারমেয়গুলোর মধ্যে যে কোনো একটি সারমেয়কে যেনো তোমার উপরে লেলিয়ে দেন। এর কিছুদিন পর উতবা এক বাণিজ্যবহরের সঙ্গে যাত্রা করলো সিরিয়া অভিমুখে। পথিমধ্যে যাওরা নামক এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যাত্রাবিরতি করলো বহরটি। স্থাপন করলো শিবির। রাত হলো। একটি নেকড়ে এসে নিঃশব্দে চক্কর দিতে শুরু করলো শিবিরের চারদিকে। উতবা বললো, মোহাম্মদের বদদোয়া এবার না জানি কার্যকর হয়। তাকে শংকিত দেখে তার সঙ্গী-সাথীরা তাদের সকল মালপত্র দিয়ে নির্মাণ করলো একটি উঁচু স্তূপ। তার উপরে উতবাকে উঠিয়ে তারা শুয়ে পড়লো স্তূপটিকে ঘিরে। গভীর রাতে নেকড়েটি তাদেরকে একলাফে ডিঙিয়ে আক্রমণ করলো উতবাকে। সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেলো আল্লাহ্‌র দুশমন উতবা।

আমি বলি, আবু লাহাবের অপর দুই পুত্র উতাইবা ও মুয়াইতীব ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন তাঁরা। আর তখন তাঁরা ওই সকল সৈন্যেরও অন্তর্ভূত ছিলেন, যাঁরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হয়েছিলেন রসুল স. এর আহ্বানে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন'? প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা স্বীকার করো যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নিতান্ত অনুল্লেখ্য এক ফোঁটা পানি থেকে। আগের আয়াতের 'মা আকফারাহ্' এর 'মা' প্রশ্নবোধকটির বিবরণ হচ্ছে এখানকার 'মিন আইয়্যি শাইইন' (কোন্ বস্তু থেকে)। এরকম করা হয়েছে বক্তব্যটি আকর্ষণীয় করণার্থে। এভাবে মানুষকে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, অতি তুচ্ছ পদার্থ থেকে তোমার উৎপত্তি। সুতরাং অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার তোমাকে মানায়ই না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'শুক্র বিন্দু থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন'। উল্লেখ্য, আগের আয়াতের 'কোন বস্তু থেকে' কথাটির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে বিষয়টি, তার বিশেষণ প্রকাশিত হয়েছে এখানকার 'শুক্রবিন্দু থেকে' কথাটির মধ্যে। এরপর দেওয়া হয়েছে মানুষের সৃজন ও পরিণতির বিবরণ। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক প্রথমে তাকে মাতৃউদরে দান করেন এক অবয়ব, এরপর তার জন্য নির্ধারণ করেন একটি সুনির্দিষ্ট পরিমিতি। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে একজন ফেরেশতা এসে মাতৃজঠরস্থিত

ওই মানবশিশুর জন্য লিখে দেন চারটি বিষয়— আয়ুষ্কাল, কর্ম, জীবনোপকরণ এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য। হাদিসটির সবিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরা মুরসালাতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে উল্লেখিত হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী-মুসলিমের এক বর্ণনায়। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন' কথাটির অর্থ পরিমিত বিকাশসাধন করেন তার দেহের। তারা আরো বলেন, কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, সৃষ্টি শুরু হয় শুক্রকণা থেকে, তারপর পর্যায়ক্রমে ঘটানো হয় তার পরিমিত বিকাশ। তবে একথা বললে অতুক্তি হয় না যে, এ সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যাটিই উত্তমতর।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন'। এখানে 'আস্‌সাবীল' অর্থ পথ। 'পথ' শব্দটি এখানে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্মপদ। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে নির্গমনের পথ। আর 'ইয়াস্‌সারা' অর্থ সহজ, সরল, সুগম। কথাটি 'পথে'র ব্যাখ্যা। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথটি তার জন্য করে দেন সুগম। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুকাতিল ও সুদ্দী। অথবা বক্তব্যার্থটি হতে পারে এরকম— আল্লাহ্‌পাক নবী-রসুল প্রেরণ করে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তোমাদের আল্লাহ্‌প্রাপ্তির পথকে করে দিয়েছেন সহজ, যেনো এতে করে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণপঞ্জী। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকতায় উপস্থাপন করা যেতে পারে এই আয়াত 'অতএব যে দান করে, সংযমী হয়, প্রত্যয়ন করে সত্যের, অচিরেই আমি তার সুখের বিষয়ের জন্য দান করবো সহজ পথ। যে কৃপণতা করে, উদ্ধত হয় এবং প্রত্যাখ্যান করে উত্তম বিষয়কে, আমি তাকে দান করবো সহজ পথ কষ্টকর বিষয়ের প্রতি'। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'পথ সহজ করে দিয়েছেন' অর্থ সহজ করে দিয়েছেন পার্থিব জীবনের সূচনা ও পরিণতি। সুগম করে দিয়েছেন জান্নাতের পথ, নয়তো জাহান্নামের। সুতরাং জেনে রেখো, এই পৃথিবী তোমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। যেমন হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে প্রবাসী, অথবা পথচারী। ইবনে মাজাও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে, তিনি স. আরো বলেছেন, এ জগতে তোমরা নিজেদেরকে কবরবাসী বলে মনে কোরো।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তৎপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন'। লক্ষণীয়, এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত নেয়ামতসমূহের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মৃত্যুকেও। কেননা চিরস্থায়ী বাসস্থানে গমন করতে হয় মৃত্যুর তোরণ পেরিয়েই। রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীগণের জন্য মৃত্যু এক 'অনন্য উপহার'। হাদিসটি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, আবু নাঈম, তিবরানী ও হাকেম। এ জগতকে নরকের পথ বলা যেতে পারবে তখন, যখন মানুষ তার জীবনপথকে বেছে নিতে করবে ভুল। আর এমতো পথনির্বাচনের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কিছু নেই। বিষয়টি মানুষের স্বেচ্ছাধীন।

রসুল স. বলেছেন, আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই উদাহরণটি— জনৈক প্রতাপশালী ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। তারপর এক ঘোষককে নির্দেশ দিলো, সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাও। ঘোষকের আহ্বান শুনে কেউ কেউ উপস্থিত হলো ওই প্রাসাদে। পানাহার করলো পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে। নিমন্ত্রণকারীও হলো আনন্দিত। আর যারা এলো না, তারা হলো বঞ্চিত। নিমন্ত্রণকারীও রুষ্ট হলো তাদের প্রতি। এখানে প্রতাপশালী ব্যক্তি হলেন আল্লাহ্। ঘোষক আমি। প্রাসাদ জান্নাত। হাদিসটি হজরত রবীয়া জারাশী এবং হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে দারেমী ও বোখারী।

'ফা আক্ববারাহ্' অর্থ এবং তাঁকে কবরস্থ করেন। অর্থাৎ তাঁর বিধানানুসারেই মানুষ তাদের প্রয়াত স্বজনদের মরদেহ সংরক্ষণ করে মৃত্তিকাভ্যন্তরে, কবরে। বলা বাহুল্য, মরদেহকে সমাধিস্থ করার বিধানটিও একটি নেয়ামত। কেননা এই বিধানে মানুষের মরদেহকে সমাধিস্থ করা হয়। নতুবা মানুষের মরদেহগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা হতো অন্যান্য পশু-পাখির মতো।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন'। কথাটির মর্মার্থ— মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অনিবার্য। তারপর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে দেওয়া হবে যথোপযুক্ত প্রতিফল। ন্যায়-বিচারের দাবিতো এটাই।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'না, কখনও নয়, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনও তা পুরোপুরি করেনি'। একথার অর্থ— না, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা কখনো সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না, সমান্তরাল হতে পারে না কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্নেরা। বিশ্বাসীরা কৃতজ্ঞ ও দায়িত্বপরায়ণ, পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা উদাসীন। তারা এখনো তো আল্লাহ্র আদেশ অমান্যই করে চলেছে। আয়াতের শুরুতে 'কাল্লা' (কখনো নয়) কথাটি এভাবে এখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছে।

এরপরের আয়াতগুলোতে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহসম্ভারের কথা এভাবে— 'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক (২৪)। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি (২৫), অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি (২৬), এবং তাতে উৎপন্ন করি শস্য (২৭); দ্রাক্ষা, শাকসবজি (২৮), যয়তুন, খর্জুর (২৯), বহুবৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান (৩০), ফল ও গবাদি খাদ্য (৩১), এটা তোমাদের ও তোমাদের আনআ'মের ভোগের জন্য' (৩২)।

এখানে 'ভূমি বিদারণ' বা ভূমি কর্ষণের সম্পর্ক করেছেন আল্লাহ্পাক তাঁর নিজের সঙ্গে। কেননা মূল কর্মনির্বাহী তো তিনিই। শস্য উৎপাদনের সম্পর্কটিও এভাবে তিনি করেছেন তাঁর নিজের সঙ্গে। কেননা মূল সৃজয়িতাও তিনিই। 'ইনাবাঁও ওয়া ক্বদ্ববা' অর্থ দ্রাক্ষা, শাক সবজি। 'ক্বদ্ববুন' শব্দটি মূলত ধাতুমূল। এর অর্থ কর্তন। শাকসবজী যেহেতু ঘন ঘন কর্তন করতে হয়, তাই আরবী ভাষায়

শাকসবজিকে বলে ‘ক্বদ্বব’। ‘কামুস’ অভিধানে বলা হয়েছে, সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ও সুবিস্তৃত সকল বৃক্ষকেই বলে ‘ক্বদ্বব’। ‘যাইতুনাঁও ওয়া নাখলা’ অর্থ যয়তুন, খেজুর। ‘হাদাইক্বা গুল্‌বা’ অর্থ বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান। ‘হাদায়িক্ব’ বহুবচন ‘হাদীক্বাতুন’ এর। আর ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের সমাহারকে বলে ‘গুলব’। এরকম উল্লেখ করা হয়েছে ‘কামুস’ গ্রন্থে। ‘ফাকিহাতুন’ অর্থ ফল, যা ভক্ষণ করা হয় সাগ্রহে। ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, কেউ যদি ‘আমি ফলভক্ষণ করবো না’ বলে শপথ করার পর খেজুর, আঙ্গুর ও যয়তুন ভক্ষণ করে, তবুও তাকে শপথভঙ্গের দায়ে দায়ী হতে হবে না। কেননা এই ফলগুলি মূলত শরীরের শক্তিবর্ধক, কেবল আস্বাদ্য আহার্য নয়। অনেক ফল তো এমনও রয়েছে, যেগুলো ভক্ষণ করা হয় মূলত আস্বাদ গ্রহণের জন্য, অথবা ঔষধী হিসেবে, দৈনন্দিন খাদ্য হিসেবে নয়। ওই সকল ফল ভক্ষণ করলেও শপথ ভঙ্গ হবে না। যেমন ডালিম। এতদ্ব্যতীত ‘ফাকিহাতুন’ এর যোগসূত্র রয়েছে ‘শস্য’ ও ‘আঙ্গুর’ এর সঙ্গে। যোজ্য ও যোজিতের মধ্যে ঘটে বৈপরীত্য। যদ্দরুন এগুলি খাদ্য জাতীয় ফল নয়, বরং আস্বাদ্য জাতীয়। ‘আব্‌বা’ অর্থ গবাদিখাদ্য, চারণ ভূমির তৃণলতা। আর ‘এটা তোমাদের ও তোমাদের আনআমের ভোগের জন্য’ অর্থ হে মানুষ! বর্ণিত শস্য, ফল, শাকসবজি, তৃণলতা ইত্যাদি আমি তো নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে সৃষ্টি করেছি কেবল তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহের জন্য।

সূরা আ’বাসা ঃ আয়াত ৩৩— ৪২

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَاُمِّهٖ
وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ
مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا
قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

r যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে,

r সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে,

r এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,

r তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে,

r সেই দিন উহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।

r অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে উজ্জ্বল,

r সহাস্য ও প্রফুল্ল,
r এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে ধুলিধূসর
r সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।
r ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফা ইজা জাআতিস্ সখ্খাহ্' (যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে)। এখানে 'সখ্খাহ্' অর্থ মহানাদ। কামুস। মমার্থ শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনি। 'সিহাহ' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণীদের মহাকলরবকে বলে 'সখ্খাহ্'। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে রূপকার্থে শিঙ্গার ফুৎকারের আওয়াজকে বলা হয়েছে 'সখ্খাহ্'। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— যখন শিঙ্গা ফুৎকারিত হবে, তখন মানুষ ভয়ে শুরু করে দিবে বিকট চীৎকার। এরপর কী হবে, তা আর এখানে উল্লেখ করা হয়নি। আর পুরো শর্তসূচক বাক্যটির বক্তব্যগত যোগসূত্র রয়েছে ১১ সংখ্যক আয়াতের 'এটা তো আদেশবাণী' কথাটির সঙ্গে, অথবা ১৭ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ ধ্বংস হোক! সে কতো অকৃতজ্ঞ' কথাটির সঙ্গে। প্রথম যোগসূত্রানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কোরআন হচ্ছে সদুপদেশবাণী। যখন শিঙ্গার ফুৎকারধ্বনি উচ্চারিত হবে, তখন এই সদুপদেশবাণী মান্যকারী ও অস্বীকারকারীদের অবস্থা হবে পৃথক। মান্যকারীদের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং অস্বীকারকারীদের মুখমণ্ডল হবে ধূলিধূসরিত। এরকমও হতে পারে যে, তখন কী হবে, তার ফলাফল এখানে রয়েছে অনুক্ত। বরং 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর' (আয়াত ৪০) কথাটিই ফলাফল। আর দ্বিতীয় যোগসূত্রানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষ ধ্বংস হোক। কতোইনা অকৃতজ্ঞ তারা। যখন ধ্বনিত হবে শিঙ্গার বিকট আওয়াজ, তখন তারা মর্মেমর্মে উপলব্ধি করতে পারবে, অকৃতজ্ঞতার পরিণতি কতো ভয়ংকর।

পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে (৩৪), এবং তার মাতা, তার পিতা (৩৫), তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে' (৩৬)। একথার অর্থ— মহাপুনরুত্থান দিবসে মানুষ একথা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে যে, মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নী-পত্নী-সন্তান কেউ আজ কোনো উপকারে আসবে না। তাই তারা তাদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ। অথবা স্বজন-সুহৃদদের কৃতঘ্নতা ও দুরবস্থা দৃষ্টে তখন তাদের প্রতি তারা পোষণ করবে ঘৃণা ও রোষ। লুকাতে চাইবে নিরালা কোনো জায়গায়। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, জননী খাদীজা একবার তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের দুই প্রয়াত পুত্র সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন। রসুল স. বলেছেন, তারা প্রবেশ করবে নরকে। জননী মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তিনি স. বললেন, তুমি যদি তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করো, তবে তুমিও তাদেরকে ঘৃণা করবে। আহমদ।

লক্ষণীয়, এখানে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম আপনজনদের। অধিক আপনজনদের উল্লেখ করা হয়েছে পরে। এভাবে এখানে বক্তব্যের আবেদনকে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেনো বলা হয়েছে— সেদিন

মানুষ তার ভ্রাতা থেকে পলায়ন তো করবেই, অধিকন্তু পলায়ন করবে তাদের মাতা-পিতার নিকট থেকেও। শুধু তাই নয়, তারা পালিয়ে যাবে তখন তাদের প্রিয়তমা পত্নী এবং প্রাণপ্রিয় সন্তান-সন্ততিদের নিকট থেকেও।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখবে'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে মানুষের অবস্থা এতোই শোচনীয় হয়ে পড়বে যে, কেউ কারো দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোনো অবকাশই পাবে না।

তিবরানী, বায়হাকী ও বাগবী বর্ণনা করেছেন, জননী সাওদা বলেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রতিফল দিবসে মানুষ পুনরুত্থিত হবে নগ্ন পা, নগ্ন দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায়। তখন তারা নিমজ্জিত থাকবে স্বেদ-সাগরে। ফলে দেখে মনে হবে যেনো তাদের মুখে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘামের লাগাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে তো একে অপরের লজ্জাস্থান দেখে ফেলবে। তিনি স. বললেন, সেরকম কিছু করার অবকাশই তারা তখন পাবে না। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম ও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— সেদিন পরিস্থিতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অর্থাৎ কেউ কারো দিকে তাকাবার ফুরসৎই পাবে না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতপঞ্চকে বলা হয়েছে— 'অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে উজ্জ্বল (৩৮) সহাস্য ও প্রফুল্ল (৩৯) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে ধূলিধূসর (৪০) সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা (৪১)। এরাই কাফের ও পাপাচারী ' (৪২)।

'উজুহুঁই ইয়াওমাইজিম মুস্ফিরাহ্' অর্থ অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল। এখানকার 'মুস্ফিরাহ্' (উজ্জ্বল) শব্দটি সাধিত হয়েছে 'আসফারাস্ সুবহু' (ঊষালোক) থেকে। অর্থাৎ সেদিন বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল হবে প্রভাতের আলোর মতো সমুজ্জ্বল। 'দ্বহিকাতুম মুস্তাব্শিরাহ্' অর্থ সহাস্য, প্রফুল্ল। শব্দদুটি উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের বিশেষণ। অর্থাৎ উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখন হবে সহাস্য ও প্রফুল্ল।

'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর' অর্থ সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকলের, অথবা অধিকাংশের মুখমণ্ডল হবে কদাকার, মলিন, ধূলিধূসরিত। 'তার হাক্বহা ক্বতারাহ্' অর্থ সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা তখন হবে লাঞ্ছিত। ইবনে জায়েদ বলেছেন 'গবারাতুন' অর্থ ঘামমিশ্রিত ধূলি এবং 'ক্বতারাহ্' অর্থ বিশুষ্ক ও উড়ন্ত ধূলিকণা। আর 'উলাইকা হুমুল কাফারাতুল্ ফাজ্বারাহ্' অর্থ তারাই কাফের ও ফাজের। অর্থাৎ ওই ধূলিধূসরিত এবং কালিমালিপ্ত মুখাবয়ববিশিষ্ট ব্যক্তিরাই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপাচারী। এখানকার 'কাফারাহ্' ও 'ফাজ্বারাহ্' বহুবচন যথাক্রমে 'কাফির' ও 'ফাজ্বির' এর। 'ফাজ্বারাহ্' এর ধাতুমূল 'ফাজ্বর' অর্থ— বিদীর্ণ করা। অর্থাৎ ফাজের বা পাপাচারী তারাই, যারা মানুষের নিকট গচ্ছিতকৃত দীন-ধর্মকে করে বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই ফাজের।

সূরা তাকভীর

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যভূমি মক্কায়। এর রুকু সংখ্যা ১ এবং আয়াত সংখ্যা ২৯।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয়ের দৃশ্যাবলী যে ব্যক্তি স্বচক্ষে অবলোকন করতে চায়, সে যেনো পাঠ করে সুরা ইনশিকাক, সুরা ইনফিতার ও সুরা তাকভীর। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে কেবল সুরা তাকভীরের নাম।

সূরা তাকভীর ঃ আয়াত ১—১৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ۝١ وَاِذَا النُّجُوۡمُ انۡكَدَرَتۡ ۝٢ وَاِذَا الۡجِبَالُ
سُيِّرَتۡ ۝٣ وَاِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ۝٤ وَاِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ ۝٥
وَاِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ۝٦ وَاِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ ۝٧ وَاِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ
سُئِلَتۡ ۝٨ بِاَىِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۝٩ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ۝١٠ وَاِذَا
السَّمَآءُ كُشِطَتۡ ۝١١ وَاِذَا الۡجَحِيۡمُ سُعِّرَتۡ ۝١٢ وَاِذَا الۡجَنَّةُ
اُزۡلِفَتۡ ۝١٣ عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡ ۝١٤

q সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হইবে,
q যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে,
q পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে,
q যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে,
q যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে,
q সমুদ্র যখন স্ফীত করা হইবে,
q দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে,
q যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
q কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?
q যখন 'আমলনামা উন্মোচিত হইবে,
q যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,
q জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে,

q এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,
q তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

'ইজাশ্ শামসু কুয়্যিরাত' অর্থ সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে। এখানকার 'ইজা' (যখন) পদটি শর্তসূচক। আর 'আশ্শামসু' (সূর্য) পদটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্তা। আর 'কুয়্যিরাত' (নিষ্প্রভ করা হবে) ওই উহ্য ক্রিয়ার ব্যাখ্যা। কুয়্যিরাত' অর্থ সংকুচিত হওয়া, নিষ্প্রভ হওয়া, আলোকহীন হওয়া। এরকম বলেছেন ইবনে জারীর। আবু তালহার বক্তব্য উল্লেখ করে ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস 'কুয়্যিরাত' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'আজলামাত' (আঁধারে ছেয়ে যাবে)। 'ফীল বাহার ওয়াল আহ্ওয়াল' গ্রন্থে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া এবং 'আল উজমা' গ্রন্থে আবু শায়েখ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাসের যে উক্তি সংকলন করেছেন এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম যা বলেছেন, তা হচ্ছে— মহাপ্রলয়কালে আল্লাহ্তায়ালা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাকে কিরণহীন করে নিক্ষেপ করবেন মহাসমুদ্রে। আর প্রবাহিত করবেন পশ্চিমা লু হাওয়া। ওই হাওয়া সমুদ্রের পানি স্পর্শ করার সাথে সাথে সমুদ্র পরিণত হবে অগ্নিসাগরে।

কেউ কেউ বলেছেন, সূর্য সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগর হয়ে যাবে উত্তপ্ত ও অগ্নিময়। ইবনে মরিয়ম সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সূর্যকে যখন জ্যোতিহীন করে নরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং নক্ষত্রপুঞ্জ যখন ঝরে পড়বে নরকাভ্যন্তরে, তখন নরকে নিক্ষেপ করা হবে অংশীবাদীদের মিথ্যা উপাস্যগুলোকেও। ব্যতিক্রম হবেন কেবল হজরত ঈসা এবং তাঁর পুতপবিত্রা জননী।

আমি বলি 'সূর্যকে নিক্ষেপ করা হবে সাগরে' এবং 'নিক্ষেপ করা হবে নরকে' কথাদু'টোর অর্থ আসলে একই। অর্থাৎ সাগর তখন নিজে নিজেই হয়ে যাবে অগ্নিময় নরক। আর ওই অগ্নিতরঙ্গময় নরকেই নিক্ষেপ করা হবে সূর্যকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে চাঁদ-সুরুজ। বায্যার তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে লিখেছেন, ও দু'টোকে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে'। একথার অর্থ— তখন নক্ষত্রগুলোও হয়ে যাবে কক্ষচ্যুত। বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে এদিকে ওদিকে। যেমন বলা হয় 'ইনকাদারাত্ ত্বইরু' (পাখি ছিন্নভিন্ন হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে)। কালাবী বলেছেন, সেদিন আকাশের তারকাগুলো বৃষ্টির মতো ঝরে ঝরে পড়বে। আকাশে তখন একটি তারকাও আর থাকবে না।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে—'পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে'। একথার অর্থ— সেদিন পাহাড়-পর্বতগুলো বিচূর্ণিত ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়াতে থাকবে বায়ুমণ্ডলে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে'। এখানকার 'ইশারু' এর বহুবচন 'আশারা' অর্থ দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী। পুরো এক বৎসর পরে শাবক প্রসব করলেও আরববাসীগণ এরকম উষ্ট্রীকে বলেন 'আশারা'। উল্লেখ্য, আরব্য সমাজ ও সংসারের অন্যতম প্রিয় বস্তু হচ্ছে উট। তাই তখনকার যুগে তাঁদের বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয়িত হতো উটের পরিচর্যায়। আর 'উত্‌তিলাত' অর্থ উপেক্ষিত, রাখালের সংরক্ষণমুক্ত। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা দর্শনে রাখাল অথবা মনিব ভুলেই যাবে তাদের গর্ভবতী উটনীগুলোর কথা। অথবা 'ইশারু' অর্থ এখানে মেঘমালা। অর্থাৎ বৃষ্টিহীন মেঘ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যখন বন্য পশু একত্র করা হবে'। হজরত উবাই ইবনে কা'ব কথাটির অর্থ করেছেন— মহাপ্রলয়ের বীভৎস রূপ দেখে হিংস্র-অহিংস্র জন্তু জানোয়ারগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হবে উত্তাল তরঙ্গ সদৃশ চাঞ্চল্য। হিংসা-ক্রোধ ভুলে তারা মিলিত হবে এক জায়গায়। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— কোনো পশু অন্য কোনো পশুর ক্ষতি করে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত পশুকে দেওয়া হবে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে 'হায়! আমরাও যদি মাটিতে মিশে যেতে পারতাম' আয়াতের ব্যাখ্যায়। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জন্তু-জানোয়ারদের হাশর হচ্ছে তাদের মৃত্যু। এমনও বলা হয়েছে যে, মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণীকে সেদিন চিরতরে মিশিয়ে দেওয়া হবে মাটির সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যখন সমুদ্র স্ফীত করা হবে'। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, তখন সমুদ্রসমূহ হবে উত্তপ্ত, অগ্নিময়। অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে অগ্নিময় লাভা উদগত হয়ে সমুদ্রকে করে দিবে অগ্নিময় নরক। কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— সমুদ্রকে যখন করা হবে পরিপূর্ণ। কেননা 'মাসজুর' অর্থ ভর্তি করা, পরিপূর্ণ করা। মুজাহিদ ও কালাবী বলেছেন, সাগরগুলোকে তখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে। আর নোনা-মিঠা পানির ওই সম্মিলিত সমুদ্রই হবে নরকের অনল। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, সাগরসমূহ তখন হয়ে যাবে বিশুষ্ক, জলহীন।

আমি বলি, ব্যাখ্যাগুলোর সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে— তখন সকল সাগর-উপসাগর মিলে হয়ে যাবে একটি মাত্র সীমাহীন মহাসাগর। সূর্যকে নিক্ষেপ করা হবে ওই মহাসাগরেই। ফলে মহাসাগরের পানি হয়ে যাবে অগ্নিপূর্ণ উত্তপ্ত। শীতল পানির কোনো প্রকার চিহ্নও থাকবে না সেখানে। ওই উত্তপ্ত পানিই হবে নরকবাসীদের 'হামীম' (উত্তপ্ত সলিল)।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দেখা যাবে ছয়টি নিদর্শন। মানুষ কোলাহলমুখর বাজারে থাকবে কর্মব্যস্ত। হঠাৎ সূর্য হতে থাকবে নিষ্প্রভ। ধূলিসাৎ হবে পাহাড়-পর্বতগুলো। শুরু হবে প্রচণ্ড ভূকম্পন। মানুষ ও জ্বিনেরা হবে ভীত

সন্ত্রস্ত। জ্বিনেরা মানুষদেরকে বলবে, অপেক্ষা করো, আমরা সংবাদ নিয়ে আসছি। এই বলে তারা যাবে সমুদ্রের পাড়ে। দেখবে, সমস্ত সমুদ্র জুড়ে তরঙ্গিত হচ্ছে কেবল আগুন, আর আগুন। এমন সময় বইতে শুরু করবে অত্তপ্ত লু হাওয়া। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে সকল প্রাণীর। হজরত উবাই ইবনে কা'ব সূত্রে আবুল আলিয়ার মাধ্যমে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন, সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বলা হয়েছে— ভূপৃষ্ঠ হবে বিদীর্ণ। ধ্বনিত হবে মহাপ্রলয়ংকরী বিকট আওয়াজ। ভেঙে চুরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যাবে সপ্ত আকাশ ও সপ্তস্তরবিশিষ্ট মেদিনী। তখন আর নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না কোনো প্রাণীর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্রলয়ের নিদর্শন হবে বারোটি— ছয়টি ইহকালে এবং ছয়টি পরকালে। ওই ছয়টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে পরবর্তী ছয় আয়াতে।

৭ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে'। এখানকার 'যুয়্যিজ্বাত' অর্থ পুনঃসংযোজিত হবে। হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ওই সকল লোকের কথা, যারা সাংসারিক জীবনে একে অপরের দোসর, কাজে-কর্মে পরস্পরের অনুসারী। দেহে আত্মা পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে তাদেরকে মিলিয়ে দেওয়া হবে এক সাথে। বলাবাহুল্য, এরকম ঘটবে আল্লাহ্পাকের আদেশেই। এরূপ পরিস্থিতির সমর্থনে রসুল স. পাঠ করতেন 'এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে— ডান দিকের দল; কতো ভাগ্যবান ডান দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী'।

হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ওই দুই ব্যক্তি, যারা একই আদেশে অনুপ্রাণিত। সেকারণেই তারা হয় জান্নাতে যাবে, না হয় যাবে জাহান্নামে। তিনি আরো বলেছেন, 'উহশুরুল্ লাজীনা জলামু ওয়া আযওয়াজ্বাহুম' (যারা জুলুম করেছে, তাদের এবং তাদের সতীর্থদের পুনরুত্থান হবে সম্মিলিতভাবে)। সাঈদ ইবনে মনসুর বলেছেন, পুণ্যবানদেরকে পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে জান্নাতে এবং অপরাধীদেরকে অপরাধীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে জাহান্নামে।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'উহ্শুরুল্ লাজীনা জলামু ওয়া আযওয়াজ্বাহুম' আয়াতের মর্মার্থ— জালেম এবং তাদের দোসরদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও দোজখে। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'মিলিত করে দেওয়া হবে' অর্থ— তাদেরকে তখন মিলিত করে দেওয়া হবে তাদের কর্মবিবরণীর (আমলনামার) সঙ্গে। মুকাতিল বলেছেন, পুন্যবানদেরকে তখন মিলিয়ে দেওয়া হবে তাদের আয়তলোচনা সঙ্গিনীগণের সঙ্গে এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মিলিয়ে দেওয়া হবে শয়তানের সঙ্গে।

এভাবে এখানকার ‘ওয়া ইজান্ নুফূসু যুয়্যিজ্বাত’ কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায় তাদের আত্মাগুলোকে তখন মিলিয়ে দেওয়া হবে তাদের শরীরের সঙ্গে। এরকম বলেছেন ইকরামা।

৮ এবং ৯ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো’?

এখানে ‘আল মাওউদাতু’ অর্থ জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যা। শব্দটির ধাতুমূল ‘ওয়াদুন’ অর্থ বোঝা, ভার। জীবন্ত শিশুকন্যার উপরে মূর্খতার যুগের আরববাসীরা এমনভাবে মাটির বোঝা চাপিয়ে দিতো যে, তাদের বাঁচার আর কোনো উপায় থাকতো না। এটা ছিলো তাদের একটি জঘন্য প্রথা। নিম্নবংশে যদি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, তবে আর মান-সম্মান বলে কিছু থাকবে না, তাদেরকে খাওয়া-পরা দিতে গেলে দরিদ্র হয়ে যেতে হবে— এরকম বিকৃত চিন্তার বশবর্তী হয়েই তারা এরকম করতো।

‘কী অপরাধে তোমাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো’ এরকম প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের হত্যাকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেওয়া, যেনো তারা তাদের অপকর্মের পক্ষে আর কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘হে মরিয়ম তনয়! তুমি কি জনগণকে এরকম বলেছিলে যে, আমাকে এবং আমার জননীকে তোমরা তোমাদের উপাস্য বানিয়ে নাও’। অথবা বলা যেতে পারে, জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে’ কথাটি এখানে রূপকার্থক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তখন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে হন্তারকদেরকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ইননাল আ’হদা কানা মাসউলা’ (জিজ্ঞাসিত হবে প্রতিশ্রুতি)। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হবে প্রতিশ্রুতিদাতাকে। কিংবা ‘আলমাওউদাতু’ এখানে কর্মপদের শব্দরূপ হলেও অর্থ প্রদান করবে কর্তৃপদীয় শব্দরূপ ‘ওয়ায়িদাতু’ এর। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হবে সমাধিস্থকারীদেরকে। বা কথাটির অর্থ হবে ‘আলমাওউদাতু লাহা’। অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে প্রোথিত করা হয়েছে। ধাত্রী অথবা অন্য কেউ তো তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকেই এরকম করতো। অর্থাৎ প্রশ্ন করা হবে শিশুকন্যার পিতা-মাতাকে। যেমন রসুল স. বলেছেন, যে সমাধিস্থ করেছে এবং যার পক্ষ থেকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, তারা উভয়েই জাহান্নামী। উত্তম সূত্রসহযোগে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

উপযোগ ঃ জীবন্ত শিশুকে সমাধিস্থ করা মহাপাপ। চার মাসের উপরের গর্ভপাতও মহাঅন্যায়। কেননা চার মাসে ভ্রুণের অবয়বে আসে পূর্ণতা। তাতে সঞ্চার ঘটে প্রাণের। চার মাসের নিম্নের ভ্রূণ হত্যাও অবৈধ। তবে পূর্বানুপাতে পাপটি লঘু। এরকম করলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করে দেওয়া ওয়াজিব। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। যদি কেউ কোনো গর্ভধারিণীর উপরে আঘাত হানে, সে আঘাতে তার গর্ভস্থিত শিশুর মৃত্যু ঘটে গর্ভপাতের আগে অথবা পরে, তবে আঘাতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে একজন

পূর্ণ বয়স্ক লোকের রক্তপণ, ওই শিশুটির অবয়ব সম্পূর্ণ হোক, কিংবা হোক অসম্পূর্ণ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, বনী লেহিয়ানের এক রমণীর গর্ভপাত ঘটেছিলো এক লোকের আঘাতে। রসুল স. বিধান দিয়ে দিলেন, আঘাতকারীকে মুক্ত করতে হবে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাস অথবা দাসী। বোখারী, মুসলিম।

বিধান ঃ ক্রীতদাসীর সঙ্গে আযল করা (জরায়ুর বাইরে রেতঃপাত করা) সিদ্ধ। স্বাধীনাগণের সঙ্গে তাদের বিনা অনুমতিতে এরকম করা সিদ্ধ নয়। আবার সিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়। হজরত খুদ্দামা বিনতে ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা একবার রসুল স.কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি স. বললেন, এটা হচ্ছে গোপনে সমাধিস্থ করা, যেমন সমাধিস্থ করার কথা বলা হয়েছে 'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে' আয়াতে। আবার হজরত জাবের বলেছেন, আমরা আযল করতাম ওই সময়েও, যখন কোরআন অবতীর্ণ হতো। রসুল স. এ সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধও করা হয়নি। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে এই কথাটুকু— তিনি স. বিষয়টি জানতেন। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদেরকে নিষেধও করেননি।

এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা ইচ্ছা করলে ক্রীতদাসীদের সঙ্গে আযল করতে পারো। কিন্তু নিয়তিতে যা আছে, তা হবেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এরকম না করলে অসুবিধা কী? মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত যারা আসবার, তারা আসবেই। স্বাধীনাদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয় হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের সঙ্গে আযল করতে নিষেধ করেছেন।

১০ এবং ১১ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে'।

'আস্‌সুহুফু নুশিরাত' অর্থ আমলনামা উন্মোচিত হবে। আর 'আস্‌সামাউ কুশিত্বাত' অর্থ আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। অর্থাৎ জবাইকৃত পশুর চামড়া যেভাবে ছেলা হয়, সেভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে আকাশের আচ্ছাদন। এরকম হবে সংজ্ঞাহারক শিঙ্গা ফুৎকারের পূর্বে, যখন সূর্য হবে নিষ্প্রভ, নক্ষত্রপুঞ্জ পড়বে খসে। অথবা এরকম ঘটবে সংজ্ঞাহারক শিঙ্গার ফুৎকারের সময়ে। আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, এরকম ঘটবে ওই সময়ে, যখন আকাশ-পৃথিবীকে করে দেওয়া হবে একাকার। ফলে তারা উভয়ে হয়ে পড়বে স্থানচ্যুত।

কা'ব কারাজী লিখেছেন, আকাশ-পৃথিবীর বিভিন্ন রূপান্তরণের বর্ণনাবৈষম্যের সমাধান 'আফসাহ্' প্রণেতা দিয়েছেন এভাবে— আকাশ ও পৃথিবী রূপান্তরিত হবে দু'বার। প্রথমে হবে আকৃতিগতভাবে, সংজ্ঞাহারক শিঙ্গাধ্বনির আগে। আকাশ তখন হবে তাম্রবর্ণের। চন্দ্র-সূর্য হবে আলোহীন, নক্ষত্ররাজি হবে বিক্ষিপ্ত

ও নিক্ষিপ্ত। সাগর হবে অগ্নিময়, উত্তপ্ত। ভূপৃষ্ঠ হবে বিদীর্ণ, ফাটল ও গর্তবিশিষ্ট, অসমতল। এর পরের রূপান্তর হবে অবস্থানগত। শিঙ্গার দু'টি ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে আকাশ-পৃথিবীকে মোচড়ানো হবে কাগজ মোচড়ানোর মতো করে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে (১২), এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে (১৩), তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কী নিয়ে এসেছে' (১৪)। একথার অর্থ— শেষে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য উসকে দেওয়া হবে নরকানলকে এবং মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে সুখদ স্বর্গোদ্যানকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সন্নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে জান্নাতকে সংযমীদের জন্য'। আর এখানকার শেষোক্ত আয়াতটি ইতোপূর্বের চৌদ্দটি আয়াতের বক্তব্যের ফলাফল। অর্থাৎ সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে সকল বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হলো, তার জবাব হচ্ছে 'তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে এসেছে'। উল্লেখ্য, বর্ণিত ঘটনাগুলো ঘটবে দীর্ঘ সময় ধরে, শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার থেকে স্বর্গ-নরকে প্রবেশ করা পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ কালকেই বলা হয় কিয়ামত।

সূরা তাকভীর ঃ আয়াত ১৫— ২৯

فَلَآ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ﴿۱۵﴾ الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ﴿۱۶﴾ وَالَّيۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ ﴿۱۷﴾
وَالصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿۱۸﴾ اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ ﴿۱۹﴾ ذِىۡ قُوَّةٍ
عِنۡدَ ذِى الۡعَرۡشِ مَكِيۡنٍ ﴿۲۰﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ﴿۲۱﴾ وَمَا صَاحِبُكُمۡ
بِمَجۡنُوۡنٍ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدۡ رَاٰهُ بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ ﴿۲۳﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ
بِضَنِيۡنٍ ﴿۲۴﴾ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطٰنٍ رَّجِيۡمٍ ﴿۲۵﴾ فَاَيۡنَ تَذۡهَبُوۡنَ ﴿۲۶﴾
اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۲۷﴾ لِمَنۡ شَآءَ مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّسۡتَقِيۡمَ ﴿۲۸﴾
وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۲۹﴾

q আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,
q যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
q শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়
q আর ঊষায় যখন উহার আবির্ভাব হয়,
q নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী
q যে সামর্থ্যশালী, 'আর্‌শের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,

q যাহাকে সেথায় মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন।
q আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নহে,
q সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,
q সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।
q এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।
q সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?
q ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ,
q তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য।
q তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।

'ফালা উক্বসিমু বিল খুন্নাস' অর্থ আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের। 'ফা' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে প্রসঙ্গান্তর ঘটানোর জন্য। আর 'উক্বসিমু' কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সুরা ক্বিয়ামাহ'র তাফসীরে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি শপথ করে বলছি, কিয়ামত সম্পর্কে যে সকল বিবরণ আমি দিলাম, সে সকল কিছু অবশ্যই সত্য। এগুলোর মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্রও নেই।

'খুন্নাস' শব্দটির ধাতুমূল 'খুনুস'। এর অর্থ, ভ্রমণের শেষ প্রান্ত থেকে সূচনাস্থলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। এখানে 'খুন্নাস' এর মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে— পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্র, গতিশীল তারকা। অর্থাৎ আতারদ, জোহরা, মুশতারী, মিররিখ ও জোহল। এই নক্ষত্রগুলো কখনো পরিক্রমণ করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবার কখনো থাকে স্থির। প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা এই নক্ষত্রপঞ্চকের বৈচিত্রময় পরিক্রমণ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সংক্ষেপে এরকম— সৌরমণ্ডলের কতকগুলি বলয় অপেক্ষাকৃত ছোট। এরকম ছোট একটি বলয়ের অধিবাসী ওই নক্ষত্রপঞ্চক। এই সৌর বলয়টিও পরিক্রমণশীল। এর ঊর্ধ্বাংশ বৃহৎ সৌরবলয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তার মতোই পরিক্রমণ করে পশ্চিম থেকে পূর্বে। কিন্তু পরিক্রমণশীল নক্ষত্রপঞ্চক যখন অবস্থান করে ছোট সৌরবলয়ের নিম্নাংশে তখন সেগুলোর গতি হয়ে যায় বিপরীত। অর্থাৎ তখন তারা পরিক্রমণ করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। অথবা গতিবেগের তারতম্যানুসারে সেগুলো কখনো কখনো থাকে স্থির। এই বিপরীতমুখীনতাকেই বলে 'খুন্নাস'। আমরা অবশ্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের এমতো মহাশূন্যতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না। বরং জানি, প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে পৃথক পৃথক কক্ষপথ এবং প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রই গতিশীল। আর গতিশীল নক্ষত্রপঞ্চক সব সময় কক্ষ পরিক্রমণ করে কখনো পূর্ব দিকে, আবার কখনো পশ্চিম দিকে, কখনো ধীর লয়ে, কখনো দ্রুতগতিতে, অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যখন যেভাবে চান, তখন সেভাবেই সেগুলোকে পরিচালিত করেন।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'আলজ্বাওয়ারিল কুন্নাস' (যা প্রত্যাগমন করে এবং অদৃশ্য হয়)। কাতাদা বলেছেন, দিবসে অন্তর্হিত এবং নিশীথে সমুদ্ভাসিত

নক্ষত্রকে বলে 'খুন্নাস'। বরং 'খুন্নাস' বলে অস্তাচলকেই। আমি বলি, 'খুন্নাস'ও 'কুন্নাস' শব্দদ্বয় সমার্থক। এরকম বললে পুনরাবৃত্তির সংশয় আর থাকে না। 'কুন্নাস' বলে খরগোশ ও হরিণের নিজ নিজ আড্ডায় আশ্রয় নেওয়াকে। এখানে 'কুন্নাস' বলা হয়েছে অস্তমিত নক্ষত্রের বিলুপ্তিকে। আমি বলি, নক্ষত্রের প্রত্যাগমনস্থল বলে এখানে বোঝানো হয়েছে সম্ভবত আরশের নিম্নস্থলকে। যেমন হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, একদিন সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখে রসুল স. আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো অস্তমিত হওয়ার পর সূর্য কোথায় যায়? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত। তিনি স. বললেন, সে তখন আল্লাহ্‌কে সিজদা করার জন্য গমন করে আরশের নিচে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'শপথ নিশার, যখন তার অবসান হয় (১৭) আর ঊষার, যখন তার আবির্ভাব হয়' (১৮)। এখানে 'আ'সআ'সা' অর্থ নিশাবসান। আর 'তানাফ্ফাসা' অর্থ ঊষার অভ্যুদয়। হাসান বসরী বলেছেন 'আ'সআ'সা' অর্থ আঁধার সহকারে রাতের আগমন। অথবা রাতের পশ্চাদপসরণ। শব্দটি বিপরীতার্থক। 'সুবহি' অর্থ ঊষা এবং 'তানাফ্ফাসা' অর্থ আবির্ভাবও হয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'নিশ্চয়ই এই কোরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী (১৯) যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন (২০), যাকে সেখানে মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন' (২১)।

'এই কোরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী' অর্থ এই কোরআন পৃথিবীতে এনেছেন হজরত জিবরাইল, অথবা রসুলেপাক স.। 'যে সামর্থ্যশালী' অর্থ হজরত জিবরাইল, অথবা রসুল স. প্রচণ্ড শক্তিমত্তার অধিকারী। হজরত জিবরাইলের শক্তিমত্তা এরকম— তিনি নবী লুতের অবাধ্য জনপদবাসীকে তাদের আবাসভূমিসহ এক হাতে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে উল্টো করে প্রোথিত করেছেন মৃত্তিকায়। একটি মাত্র বিকট আওয়াজে মেরে ফেলেছিলেন ছামুদ জাতিকে। মুহূর্ত মধ্যে তিনি যাতায়াত করতেন ঊর্ধ্বাকাশ থেকে পৃথিবীতে। আর রসুল স. যে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। নবী নুহ সাড়ে নয়শত বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পরেও হেদায়েত করতে পেরেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের অল্প কয়েকজন লোককে। অথচ রসুল স. তাঁর উম্মতের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন মাত্র তেইশ বৎসর। এরই মধ্যে এক বিশাল জনগোষ্ঠী হয়েছিলো তাঁর অনুগামী। ইসলামের প্রসার ঘটেছিলো আরব জাহান ছাড়িয়ে অনারব অঞ্চলেও। বিদায় হজের সময় তিনি হজসমাপন করেছিলেন তাঁর অন্যূন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীকে নিয়ে। সপ্তম আকাশের বদরী বৃক্ষের ওপারে যেখানে হজরত জিবরাইলও যেতে অক্ষম সেখানেও তিনি স. গমন করেছিলেন মেরাজ রজনীতে। লাভ করেছিলেন আল্লাহ্‌র দীদার। অন্যান্য নবীর ভাগ্যে এমতো সৌভাগ্য জোটেনি। নবী মুসা তো দীদার চেয়েও পাননি। তাঁর প্রার্থনার পরিণাম এই হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌র অতিদূরবর্তী জ্যোতিচ্ছটায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলো তুর পর্বত। আর তিনি হয়ে পড়েছিলেন সংজ্ঞাহীন।

এখানকার 'ইনদা' (নিকট) শব্দটি সম্পর্কযুক্ত 'মাকীন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ আরশের অধিপতির নিকট তিনি স. অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন প্রিয়তমজন। সুতরাং তিনি মানবমণ্ডলীর অবশ্যমাননীয়। 'মুত্বাইন' অর্থ যাকে মান্য করা হয়। অর্থাৎ ফেরেশতারাও তাঁকে মান্য করে চলে। আর ছাম্‌মা আমীন' অর্থ যে বিশ্বাসভাজন। বাগবী লিখেছেন, মেরাজ রজনীতে আকাশের দ্বাররক্ষীরা হজরত জিবরাইলের নির্দেশে আকাশের দ্বার খুলে দিয়েছিলো রসুল স. এর মহামর্যাদার কারণেই। স্বর্গ-নরকের প্রহরীরাও দ্বার খুলে দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলো তাঁকে। আমি বলি, আকাশ ও স্বর্গ-নরকের দ্বারোন্মোচন ছিলো রসুল স. এর অতুলনীয় মর্যাদার এক অনন্য নিদর্শন। অথবা 'মান্য করা হয়' কথাটির অর্থ হবে এখানে— আল্লাহ্‌পাকের প্রত্যাদেশ প্রথমত অবতীর্ণ হয় হজরত জিবরাইলের উপর। তারপর তাঁর মাধ্যমে পৌঁছে যায় অন্যান্য ফেরেশতার কাছে।

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহপাক যখন কোনো কিছু প্রত্যাদেশ করেন, তখন সমস্ত আকাশে শুরু হয় কম্পন। আকাশবাসীরা তখন সেজদাবনত হয়ে হারিয়ে ফেলে তাদের চেতনা। এরপর প্রথম চেতনা ফিরে পান হজরত জিবরাইল। প্রত্যাদেশাবলী নিয়ে অবতরণ করেন নিম্নবর্তী আকাশসমূহের দিকে। আকাশবাসী ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে, আমাদের পরম প্রভুপালনকর্তা কী বললেন? হজরত জিবরাইল বলেন, তিনি যা বলেন, তা সত্যই বলেন। তিনি সুমহান, সুপবিত্র। সকল ফেরেশতা তখন তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করতে থাকে। সে ধ্বনি অনুরণিত হতে থাকে সমগ্র আকাশমার্গে।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাদের আনুগত্যের লক্ষ্যস্থল হজরত জিবরাইল। আর তিনি সহ সমগ্র ফেরেশতার আনুগত্যের লক্ষ্যস্থল রসুলুল্লহ্ স.। সুফী দার্শনিকগণ বলেন, হকিকতে মোহাম্মদী হচ্ছে মহাসত্যের ভাবাবেগস্থল (ফাইজে ওয়াজুদ) এবং নৈকট্যভাজনতার দিক দিয়ে এই নিখিল সৃষ্টি ও সম্ভাব্য জগতের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় সৃষ্টির উৎসমূল। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আকাশে আছে আমার দুই মন্ত্রী— জিবরাইল ও মিকাইল। আর আমার পৃথিবীর দুই মন্ত্রণাদাতা হচ্ছে আবু বকর ও ওমর। সুতরাং একথা আর না বললেও চলে যে, রসুল স. ছিলেন হজরত জিবরাইলেরও আনুগত্যের লক্ষ্যস্থল।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়'। বাক্যটি শপথের জবাব। এখানে 'তোমাদের সাথী' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। মক্কার অংশীবাদীরা তাঁকে 'উন্মাদ' বলেছিলো। এক আয়াতে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে 'সে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে অসত্য রচনা করেছে, না সে একটা উন্মাদ'? ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'বার্তাবহ' অর্থ যদি রসুল স. হন, তাহলে বুঝতে হবে এখানে 'তোমাদের সাথী' বলে বুঝানো হয়েছে তাঁকেই। এভাবে সর্বনামের

উল্লেখ না করে মক্কার অংশীবাদীদেরকে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এখন রসুল বলে যিনি দাবি করেছেন, তাঁকে তো তোমরা চল্লিশ বছর ধরে দেখছো। কোনো দিনও তো তোমরা তাঁকে জ্ঞানবিবেকবর্জিত কিছু বলতে শোনোনি। তাহলে এখন তোমরা তাঁকে উন্মাদ বলছো কেনো? এটা কি তোমাদের গোঁয়ার্তুমি, না তোমরা নিজেরাই উন্মাদ? তোমাদের উদ্দেশ্য আসলে কী?

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে'। বিদ্বজ্জনের ঐক্যমত্যাগত সিদ্ধান্ত এই যে, এখানে 'সে' অর্থ রসুল স.। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিগন্তে সুস্পষ্টভাবে তাঁকে দেখেছিলেন রসুল স. স্বয়ং। আর তাঁকে অর্থ আরশের অধিকারীকে। এমতাবস্থায় 'স্পষ্ট দিগন্তে' কথাটি হবে 'সে দেখেছে' এর অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ রসুল স. যখন সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে এমনকি মহাসৃষ্টির সর্বোচ্চ দিগন্তে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি স. প্রত্যক্ষ করেছিলেন আল্লাহ্পাককে।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজের ঘটনায় আমরা শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত যে হাদিস উল্লেখ করেছি, তাতে বলা হয়েছে, তিনি স. নিকটবর্তী হলেন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্তায়ালার। হলেন ধনুকের দুই জ্যা, অথবা তদপেক্ষা অধিক সমীপবর্তী। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সালমা এবং হজরত ইবনে আব্বাসও। জুহাক তাই বলেছেন, রসুল স. তখন আল্লাহকে দেখেছিলেন কীভাবে, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন রকমের অভিমত। কেউ বলেছেন, তিনি স. তাঁকে দেখেছিলেন অন্তর্চক্ষু দিয়ে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যা দেখেছেন, তাঁর হৃদয় তা অস্বীকার করেনি'। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। আবুল আলিয়া সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তিনি যা দেখেছেন, তাঁর হৃদয় তা অস্বীকার করেনি' অর্থ রসুল স. আল্লাহ্ পাককে দেখেছিলেন দু'বার, হৃদয়ের চোখ দিয়ে।

হজরত আনাস, হাসান বসরী ও ইকরামা বলেছেন, রসুল স. আল্লাহকে দেখেছিলেন তাঁর চর্মচক্ষু দিয়ে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত ইব্রাহিমকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর সখা (খলিল)রূপে। হজরত মুসাকে নির্বাচন করেছিলেন কথক বা বক্তা (কলিম)রূপে, আর রসুলে পাক স.কে নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর দীদার দানের জন্য। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি কি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি স. জবাব দিলেন, কেমন করে দেখবো? তিনি যে নূর।

আমি বলি, সম্ভবত 'আলউফুক্বিল্ মুবীন' এবং 'আল উফুক্বিল্ আ'লা' অর্থ আধ্যাত্ম পথের পথিকদের পথপরিক্রমার শেষ স্তর, দাসত্ব-তত্ত্বের সর্বোচ্চ পর্যায় হকিকতে মোহাম্মদী, যা প্রেমের বিশুদ্ধতম মহিমা। এটাই লা তাআ'য়্যুন (সীমাবিহীনতা)। এমতো স্তরে পথ পরিক্রমণের কথা চিন্তাও করা যায় না। এই পর্যায়ে পরিভ্রমণীয় হতে পারে কেবল চিন্তা-গবেষণা। মহামান্য মোজাদ্দেদ এরকমই বলেছেন।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি বড় দলের অভিমত এই যে, এখানকার 'তাঁকে' অর্থ হজরত জিবরাইলকে। অর্থাৎ রসুল স. স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন হজরত জিবরাইলকে। কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, তিনি ছিলেন তখন ঊর্ধ্বলোকের পূর্ব দিগন্তে। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার হজরত জিবরাইলকে বললেন, ভ্রাতঃ জিবরাইল! আপনি আমাকে আপনার প্রকৃত আকৃতি দেখান, যে আকৃতি নিয়ে আপনি বিহার করেন আকাশমার্গে। হজরত জিবরাইল বললেন, এটা তো সম্ভব নয়। তিনি স. বললেন, কেনো সম্ভব নয়? হজরত জিবরাইল বললেন, কোথায় দেখতে চান বলুন। রসুল স. বললেন, আবতাহা প্রান্তরে। তিনি বললেন, সেখানে তো স্থান সংকুলান হবে না। তিনি স. বললেন, তাহলে মীনায়। তিনি বললেন, সেখানেও তো একই সমস্যা। তিনি স. বললেন, তাহলে আরাফাতে। তিনি বললেন, আরাফাও অপ্রশস্ত। রসুল স. বললেন, তাহলে হেরা পর্বতে। তিনি বললেন, হেরা পর্বতমালা যদি আমার ভার বহন করতে পারতো, তবে তো ভালোই হতো। কথা মতো একদিন রসুল স. হেরা পর্বতে গেলেন। অকস্মাৎ শুরু হলো অস্ত্রের ঝনঝনানী এবং মেঘমালার গুরুগম্ভীর আওয়াজ। আরাফার শৈলমালার দিক থেকে ভেসে উঠলো হজরত জিবরাইলের সুবিশাল দেহাবয়ব। পা মাটিতে এবং মাথা ছুঁয়ে আছে আকাশ। আর পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে তাঁর শরীর। রসুল স. ওই সুবিশাল অবয়ব দেখে চেতনা হারিয়ে ফেললেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তাঁর সংজ্ঞাহীন শরীর। হজরত জিবরাইল ধারণ করলেন তাঁর পূর্বরূপ। রসুল স.কে তুলে জড়িয়ে নিলেন তাঁর বুকে। রসুল স. এর জ্ঞান ফিরে এলে বললেন, মহাসম্মানিত ভ্রাতঃ! ইসরাফিলকে দেখলে তো আপনি সহ্যই করতে পারবেন না। তার পা সর্বনিম্ন স্থানে, আর মাথা ঠেকে আছে সপ্তম আকাশ ভেদ করে আরশে। তাঁর কাঁধে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। এতো বিশাল বপুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে হয়ে যান ক্ষুদ্র চড়ুই সদৃশ। আর তখন শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয় কেবল আরশাধিপতির। উল্লেখ্য, জননী আয়েশাও স্পষ্ট দিগন্তে হজরত জিবরাইলকে দেখার প্রবক্তা। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বলে রসুল স. আল্লাহকে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি আবৃত্তি করতেন 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত'। আরো আবৃত্তি করতেন, 'প্রত্যাদেশ অথবা অন্তরালবর্তী হওয়া ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপ করা সম্ভব নয়'। বোখারী।

বিষয়টির সমাধান করা যেতে পারে এভাবে— মেরাজ রজনীতে রসুল স. আল্লাহকে দেখেছিলেন, একথা যাঁরা বলেন, তাঁদের অভিমত জননী আয়েশার অভিমত অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কেননা তাঁর উদ্ধৃত আয়াত 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন' পরলোকে আল্লাহ্‌র দীদার লাভকে যে নাকচ করে না, সে কথা তো ঐকমত্যসম্ভূত। অনুরূপ মেরাজ রজনীতে রসুল স. এর আল্লাহ্‌দর্শনের বিরুদ্ধে কোনো কথা উদ্ধৃত আয়াতখানিতে নেই। এখন কথা হচ্ছে হজরত জিব্‌রাইলকে

দেখা নিয়ে, যা বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা ও হজরত ইবনে আব্বাস। তাঁদের অভিমত তো অবশ্যই সঠিক। কিন্তু এর সঙ্গে আলোচ্য আয়াতকে সম্পর্কযুক্ত করার তো কোনো কারণ নেই। আলোচ্য আয়াতের গতি-প্রকৃতি দৃষ্টে তো একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যখন তিনি দেখেছেন, তখন তাঁর মর্যাদা অবশ্যই অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হজরত জিবরাইলকে দেখলে তো তাঁর মর্যাদা বাড়ে না। কারণ তিনি স. এমনিতেই তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পূর্বের আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলো 'যিনি সামর্থ্যশালী' 'আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন' 'যাকে সেখানে মান্য করা হয়' ও 'যিনি বিশ্বাসভাজন'। এরপর আল্লাহ্‌র দীদারের কথা উল্লেখিত হওয়াই তো স্বাভাবিক, হজরত জিবরাইলের দীদার তো পূর্বোল্লিখিত মর্যাদাগুলোর তুলনায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ নয়। আর যদি পূর্বোল্লিখিত গুণগুলো ধরা হয় হজরত জিবরাইলের, তবে তো বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হয়ে যাবে পণ্ড। কেননা তিনি আবার স্পষ্ট দিগন্তে কাকে দেখবেন? সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ— রসুল স. তখন স্পষ্ট দিগন্তে আনুরূপ্যহীন আল্লাহ্‌কেই দেখেছিলেন। হজরত জিবরাইল আল্লাহ্‌র দরবারে প্রভুত মর্যাদাশালী— এতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু তাঁকে দেখলে রসুল স. এর মর্যাদা বেড়ে যাবে, এরকম ভাবার তো কোনো কারণ নেই। কেননা রসুল স. তাঁর তুলনায় আরো অধিক মর্যাদাশালী।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয় (২৪) এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয় (২৫)। সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো' (২৬)। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! হে বিশ্ববাসী! শোনো, আমার শেষতম রসুল এমন নন যে, তিনি আমা কর্তৃক অবতারিত প্রত্যাদেশাবলীর কোনো অংশ প্রকাশ করবেন এবং কোনো অংশ করবেন গোপন। এই আকাশাগত জ্ঞান তিনি কাউকে শেখাবেন, আবার কাউকে শেখাবেন না, এমন কৃপণ তিনি কিছুতেই নন। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একথাও সর্বৈবরূপে মিথ্যা যে, এই বাণী অভিশপ্ত শয়তানের বাণী। কাজেই হে মক্কাবাসী! হে বিশ্ববাসী! ভেবে দ্যাখো, তাঁর প্রদর্শিত সত্য পথ ছেড়ে দিয়ে তোমরা কোথায় চলেছো?

'ফা আইনা তাজহাবূন' অর্থ সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো? এখানকার 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ এই পথ ছেড়ে তোমরা অন্য কোনো পথে গমন কোরো না। জুজায বলেছেন, এই আয়াতের মর্মার্থ হবে— আমি যে পথের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করলাম, সেই পথের চেয়ে উত্তম পথ আর কোথায় যে, তোমরা সে পথের পথিক হবে? বলো, সে পথ কোনটি?

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ'। এখানে 'জিকরুন' অর্থ উপদেশ। 'কামুস' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে 'তাজকুরুন' শব্দটির মতো 'জিকরুন' শব্দটিও ধাতুমূল। এর অর্থ কোনো

কিছু স্মরণে রাখা, যা উচ্চারণেও সাবলীল। অর্থাৎ কারো প্রসিদ্ধি, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা, নামাজ, প্রার্থনা, আকাশজ গ্রন্থ, যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে শরিয়তের বিধিবিধান, শিক্ষামূলক কাহিনী ইত্যাদিও জিকির নামে পরিচিত। এখানে মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়েছে শেষোক্তটির। কেননা কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মারক, যে আল্লাহ্‌র স্মরণ একান্ত জরুরী— সর্বদা, অথবা অধিকাংশ সময় আবৃত্তিযোগ্য বিষয়। এই কোরআনের আবৃত্তি অর্থ যেমন আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা, ইবাদত, তেমনি মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক ও তাদের প্রার্থনা-যাচনাও বটে।

'আ'লামীন' অর্থ বিশ্বজগত, মানবজগত। জ্বিনজগতও এর উদ্দেশ্যভূত। কেননা রসুল স. এর নবুয়ত ছিলো জ্বিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য। এতদসত্ত্বেও তাঁর পবিত্র সত্তা গোটা বিশ্বজগতের জন্য 'রহমত' বা করুণাসিন্ধু। অর্থাৎ তিনি স. 'রহমতাল্লিল আ'লামীন'। কোরআন অনুপ্রাণিত করে ফেরেশতাদেরকেও। যেমন হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন সুরা আনআ'ম অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বর্ণনা করলেন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা। তারপর বললেন, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানতে পেরে এতো অধিকসংখ্যক ফেরেশতা সমবেতভাবে এর সুচিতার বর্ণনা করেছিলেন যে আকাশমার্গে তিল ধারণের ঠাঁই ছিলো না।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য'। একথার অর্থ— যারা মহাসত্যাভিমুখী পথের পথিক, কোরআন শুভোপদেশ কেবল তাদের জন্য। এখানে এরকম বলার কারণ হচ্ছে, কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে কেবল তারাই, যারা বিশ্বাসবান, মহাসত্যাভিমুখী। আর যাবতীয় বিধান-সংবিধানকে এখানে সীমাবদ্ধ করেছে 'ইয়াসতাক্বীম' শব্দটি। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাক্বাফী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! দয়া করে আমাকে এমন কিছু ধর্মের কথা শোনান, যাতে আপনার মহাপ্রস্থানের পরেও আমাকে অন্য কারো দ্বারস্থ হতে না হয়। রসুল স. বললেন, বলো 'আমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করলাম এবং একথার উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত রইলাম'।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং সুলায়মান ইবনে কাসেম, ইবনে মুখাইমিয়া সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আবু জেহেল বললো, বাহ্! এবার তো পরিষ্কার করে বলেই দেওয়া হলো যে, যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্যই কোরআন উপদেশ। অর্থাৎ যে এরকম চায় না, তার কাছে কোরআন কিছুই নয়। এভাবে তো বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে করে দেওয়া হলো আমাদের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ হে মোহাম্মদ! আমরা ইচ্ছা করলে তোমার পথে চলতে পারি, আবার না-ও পারি। তার এমতো কুটকথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৯)। বলা হলো—

‘তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন’। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা ভেবেছো কী? ইচ্ছা করলেও তো তোমরা সরল পথের পথিক হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা লাভ করবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার আনুকুল্য, অনুমোদন অথবা সমর্থন। কেননা তিনিই সর্বাধিপতি। এই সুবিশাল সৃষ্টির প্রতিটি অস্তিত্বকে তিনিই দান করেছেন গতি-প্রকৃতি-প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি, সে অস্তিত্ব মৌল হোক, অথবা হোক যৌগ। তিনিই সকলের ও সকল কিছুর একক সৃজয়িতা, পালয়িতা ও নিয়ন্ত্রয়িতা। এমন কি তোমাদের অভিপ্রায় সৃজয়িতাও তিনিই। সুতরাং কাউকে যদি সরল পথাভিমুখী হতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে তার ইচ্ছার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌পাকের দয়ার্দ্র অভিপ্রায়ের অনুমোদন।

সূরা ইনফিত্বর

১ রুকু এবং ১৯ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

সূরা ইনফিত্বর ঃ আয়াত ১— ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾

r আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,

r যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে,

r সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে,

r এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে,

r তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।

r হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?

r যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন,

r যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

r না, কখনও না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;

r অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ;

r সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ;

r তাহারা জানে তোমরা যাহা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতপঞ্চকের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপ্রলয়কালে অবশ্যই মানুষ জানতে পারবে পূর্বাহ্নে তারা কী কী পুণ্যকর্ম প্রেরণ করেছে, আর পশ্চাতে রেখে এসেছে কোন কোন কুপ্রথা, যখন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়বে, নক্ষত্রগুলো কক্ষচ্যুত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে বিক্ষিপ্তরূপে, সমুদ্রসমূহ হয়ে উঠবে অগ্নিময়-উত্তপ্ত এবং কবরগুলো উন্মোচিত হয়ে পুনরুত্থিত হবে সকল মানুষ। বলাবাহুল্য, আলোচ্য আয়াতপঞ্চকে বলা হয়েছে অনেক কথা। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে 'অগ্রে পাঠিয়েছে' অর্থ সুকীর্তি এবং 'পশ্চাতে রেখে গিয়েছে' অর্থ কুকীর্তি। অর্থাৎ সুপ্রথা ও কুপ্রথা, যার অনুসরণ তাদের পরবর্তী বংশধরেরা করে। সেদিন এ বিষয়টিই বার বার মনে পড়বে তাদের। কেউ কেউ বলেছেন, মানুষের মন তখন এই চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে যে, তারা কী কী করতে পেরেছে এবং কী কী করতে পারেনি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তখন তাদের প্রথমে মনে পড়বে দান খয়রাতের কথা, তারপর জাকাতের কথা। আবার কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে কোনটিকে তারা প্রাধান্য দিয়েছিলো, সে কথাই তখন তাদের মনে পড়বে বার বার। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সেদিন মানুষকে জানানো হবে, যা তারা অগ্রগণ্য করেছে এবং যা কিছু করেছে পশ্চাৎগণ্য'।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো'। একথার অর্থ— হে মানব জাতি! তোমাকে প্রতারক বানালো কে? কে তোমাকে তোমার দয়াময় প্রভুপালনকর্তার বিরুদ্ধে যেতে অনুপ্রাণিত করলো? আয়াতখানি ভিন্ন প্রসঙ্গের। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খলফকে লক্ষ্য করে। কালাবী বলেছেন, উসায়েদ ইবনে কেলাদাহ ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ। সে একবার রসুল স.কে আঘাত করেছিলো। রসুল স. তার প্রতিশোধ নেননি। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

এখানে 'আল কারীম' অর্থ ক্ষমাশীল, মহান। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সেই ক্ষমাশীল প্রভুপালক সম্পর্কে কে তোমাকে করেছে প্রবঞ্চক, প্রতারক। কে তোমাকে শক্তি যোগালো তাঁর বিরুদ্ধবাদী হতে। তিনি তো তোমাকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিতে পারতেন। অথচ তিনি তা দেননি। তাহলে ভেবে দ্যাখো, তাঁর ক্ষমা ও ঔদার্য কতো বিপুল। 'কারীম' (ক্ষমাশীল, অনুকম্পাপরবশ, মহান) বিশেষণটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে একথা বুঝাতে যে, হে মানুষ! তাঁর এমতো অনুকম্পার কারণেই তোমরা প্রতারণায় পতিত হয়েছো। তাঁর দয়ার সুযোগেই শয়তান তোমাদেরকে একথা বুঝাতে সমর্থ হয়েছে যে, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তো অসীম দয়াময়। সুতরাং তোমরা শত অপরাধ করলেও তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্পাক সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেননি বলেই ওই লোকটি ধোকা খেয়েছে। সুদ্দী বলেছেন, মহান আল্লাহ্র সহনশীলতার কারণেই লোকটি পতিত হয়েছে প্রবঞ্চনায়।

আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার সহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের সুযোগ গ্রহণ করে প্রতারণায় পতিত হওয়া সিদ্ধ নয়। আর এরকম ভাবনাও প্রশ্রয়যোগ্য নয় যে, এভাবে শেষরক্ষা সম্ভব হবে। চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে অপরাধীকে। শত্রু-মিত্র সব হয়ে যাবে একাকার। কেননা আল্লাহ্পাক কঠোর শাস্তিদাতাও। অপরাধীকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তিনি অবশ্যই দিবেন। সুতরাং ঔদাসীন্য ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করে বিনম্র, অনুগত ও সংযত হওয়াই সমীচীন।

'আলকারীম' কথাটির দাবি হচ্ছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রতিবাদ করা অকৃতজ্ঞতার। অনুগ্রহদাতার দানের প্রতি কৃতঘ্ন হওয়া নিশ্চয় নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ। বরং এমতো ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও অনুগত হওয়া অপরিহার্য। মার্জনা ও মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে পাপমগ্ন হওয়া অবশ্যই ক্ষমাহীন অপরাধ।

কেউ কেউ বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে পাপীরা যেনো বলতে না পারে, হে আমাদের মহান প্রভুপালক! আমরা তো তোমার অপার অনুকম্পার কারণেই পৃথিবীতে প্রতারণায় পতিত হয়েছিলাম, সেকারণেই অবতীর্ণ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াত। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করেই সেদিন তাদের এমতো অশুভ অজুহাত খণ্ডন করা হবে। বলা হবে, কেনো? ধোকায় যাতে না পড়ো, সেজন্য তো তোমাদেরকে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিলো।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়াজ বলেছেন, সেদিন আল্লাহ্পাক যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, বলো, আমার ব্যাপারে তোমাকে কে প্রতারণা করেছিলো? আমি জবাব দিবো, পরম প্রভুপালনকর্তা আমার! তোমার আগত-অনাগত করুণাই আমাকে তখন উদাসীন করে রেখেছিলো। আবু বকর ওয়ারাক বলেছেন, আমাকে যদি আল্লাহ্পাক প্রশ্ন করেন, কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রভুপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে? আমি বলবো, তোমারই মহানুভবতা। হে আমার প্রাণপ্রিয় প্রভুপালক! তোমারই উদারতা।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মহাবিচারের দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে রেহাই পাবে না। তিনি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, হে আদম সন্তান! তোমাকে আমার সম্পর্কে নির্ভিক হতে সাহস যোগালো কে? তুমি কি তোমার জ্ঞানানুপাতে কর্ম সম্পাদন করেছো? নবীগণের আহ্বানে কি তুমি সাড়া দিয়েছিলে? আতা আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— হে মানুষ কিসে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করেছে তোমার অনুকম্পাপরবশ আল্লাহ্ থেকে? কে তোমাকে করেছে প্রবৃত্তির পূজারী?

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নামাজে দণ্ডায়মান হয়, তখন আল্লাহ্ হয়ে যান তার অভিমুখী। এরপর যখন সে আল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (নামাজ পরিত্যাগ করে) তখন আল্লাহ্ বলেন, ওহে আদম সন্তান! তুমি কার দিকে মুখ ফেরালে? আমার চেয়ে অধিক আপন তোমার কে? সে যখন দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখনো আল্লাহ্ একই কথা বলেন। কিন্তু তৃতীয়বার সে এরকম করলে আল্লাহ্ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। বায্যার।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সম্প্রদায়! কী করে তোমরা ভুলে যেতে পারলে তোমাদের পরম অনুকম্পাপরবশ সেই আল্লাহকে, যিনি দয়া করে তোমাদের আদি পিতাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, তারপর তোমাদের বংশানুক্রমকে বিস্তারিত করেছেন শুক্রবিন্দুর মাধ্যমে। তারপর তোমাদেরকে দিয়েছেন সুঠাম দেহবল্লরী এবং সুসমঞ্জস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এভাবে তোমাদেরকে করেছেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি!

এখানে 'আ'দালাক' অর্থ সুসমঞ্জস করেছেন তোমাকে। অথবা— সমন্বয় করেছেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ রক্ত-শ্লেষ্মা-অম্ল-পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলোকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অবয়বে এনেছেন কী নিখুঁত ভারসাম্য। এমতো সৃজনৈপুণ্যের প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত করো না কেনো? কোনো কোনো ক্বারী এখানকার 'ফা আ'দালাক' কথাটিকে পড়তেন 'ফা আ'দ্দালাক' যার অর্থ আল্লাহ্পাক তোমাদের দৈহিক কাঠামোকে করেছেন সুবিন্যস্ত, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে করেছেন সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন'। এখানকার 'সূরাত' শব্দটিকে অনির্দিষ্টকারক 'তানভীন যুক্ত করে করা হয়েছে 'সূরাতিন'। আর এই অনির্দিষ্টবাচকতাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করার নিমিত্তে এর পরে ব্যবহার করা হয়েছে 'মা' অব্যয়টি। এভাবে বুঝানো হয়েছে, তোমরা অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি তোমাদের সকলকে দিয়েছেন পৃথক পৃথক আকৃতি, যেমনটি তিনি চেয়েছেন।

মুজাহিদ, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন তোমাদের পিতা, মাতা, মামা, অথবা চাচার মতো অবয়ব, যেমন তিনি অভিপ্রায় করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পিতার শুক্ররেণু যখন অবস্থান করে মাতৃগর্ভে, তখন ওই রেণুর সম্মুখে উপস্থিত করা হয় হজরত আদম পর্যন্ত তার সকল পূর্বপুরুষের আকৃতি। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন 'যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন'। হাদিসটি শিথিলসূত্রে মুসা ইবনে আলী ইবনে রেবাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও তিবরানী। উল্লেখ্য, এখানকার 'আ'দালাক' কথাটির বিশ্লেষণ হচ্ছে 'ফী আইয়্যি সূরাতিম মা শাআ রক্কাবাক'। একারণেই বাক্য দু'টোর মধ্যে কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা হয়নি।

আগের আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্যটি এখানে ৬ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যটির দ্বিতীয় বিশেষণ, যা থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে আল্লাহ্পাকের প্রতিপালকত্বের চূড়ান্ত মহিমা ও মাহাত্ম্য। সেই সঙ্গে বিঘোষিত হয়েছে এই সতর্কসংকেতটিও যে, যে মহান প্রভুপালক সৃষ্টির সূচনালগ্নে এমন অভূতপূর্ব প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন, পুনরুত্থান দিবসে তিনি তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অবশ্যই পারঙ্গম। এভাবে এখানে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান নিষিদ্ধ। সুতরাং সাধু সাবধান!

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'না, কখনও না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাকো'। এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, কখনো না। একথা বলে এখানে শাসানো হয়েছে আল্লাহ্র অনুকম্পার সুযোগে বিভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে। আর 'বিদ্দীন' অর্থ এখানে— বিনিময়, বিচার, প্রতিফল, অথবা ইসলাম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র অনুকম্পার প্রতি কেবল অকৃতজ্ঞই নও, তোমরা তো প্রতিফল দিবসকেও অস্বীকার করে থাকো। অথবা বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াত ৫ সংখ্যক আয়াতের 'সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী পশ্চাতে রেখে এসেছে' কথাটির অনুবর্তী। অর্থাৎ যখন তোমরা জানবে, কী নিয়ে এসেছো এবং কী রেখে এসেছো, তখন একথাও তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে নিমজ্জিত ছিলে ঘোর অবাধ্যতায়। তৎসহ মহাবিচারের দিবস সম্পর্কেও তোমরা ছিলে ঘোর অবিশ্বাসী।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ (১০); সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ (১১); তারা জানে তোমরা যা করো' (১২)। একথার অর্থ— হে মানব সম্প্রদায়! এখনো সময় আছে, সাবধান! তোমাদের কৃতকর্মসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার অবশ্যই হবে। তোমরা তোমাদের কোনো অপরাধকে তখন লুকাতেও পারবে না। কেন না আমি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। তাছাড়া তোমাদের কৃতকর্মসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার জন্য আমি কিরামান ও কাতেবীন নামক দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োগ করেছি। তারা

সম্মানিত। সারাক্ষণ তারা তোমাদের সঙ্গেই থাকে। তারা দেখে, জানে ও লিপিবদ্ধ করে সকল কিছুই, তোমরা যা করো। উল্লেখ্য, এখানে আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয়কে বিভূষিত করা হয়েছে তিনটি ভূষণে— 'কিরামান' (সম্মানিত) 'কাতিবীন' (লিপিকার) এবং 'ইয়া'লামূন' (পরিজ্ঞাত)। এভাবে তাদের পরিচিতি প্রকাশ করে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মহাবিচারের দিবসে সকলের কৃতকর্মের বিচার করা হবেই। দেওয়া হবে সকলকে যথোপযুক্ত প্রতিফল— স্বস্তি অথবা শাস্তি।

সূরা ইনফিত্বর ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

r পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;

r এবং পাপাচারীরা তো থাকিবে জাহান্নামে;

r উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;

r এবং উহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।

r কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?

r আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?

r সেই দিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্‌র।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পুণ্যবান তারা জান্নাতে দিনাতিপাত করবে পরম আনন্দে, অনন্তকাল ধরে। আর পুণ্যবান তারাই, যারা প্রকৃত ইমানদার। যারা নিজেদেরকে বিরত রাখে ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস থেকে। মুক্ত থাকে অসুন্দর স্বভাব ও নিন্দনীয় কর্ম থেকে। অর্থাৎ যারা থাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুগত ও নিষেধাজ্ঞাবিচ্যুত। ইবনে আসাকের তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে পুন্যবান বলে আখ্যায়িত করেছেন এ কারণে যে, তারা তাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'এবং পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে'। এখানে 'ফুজ্জার' অর্থ পাপাচারী, হতভাগ্য, যারা অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার আড়ালে চিরতরে আচ্ছাদিত করে ফেলে ধর্মপরায়ণতা ও আমানতকে।

আয়াতখানির যোগসূত্র রয়েছে ৫ সংখ্যক আয়াতে 'তখন প্রত্যেকে জানবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গিয়েছে' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের পরিচয় যখন পাবে, তখন পাপাচারীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক একবার আবু হাশেম মাদানীকে বললেন, হায়! যদি জানতে পারতাম আল্লাহ্তায়ালার নিকটে আমার জন্য কী প্রতিফল জমা আছে। আবু হাশেম বললেন, কেনো, তোমার জন্য কী রয়েছে, তা তুমি কোরআনেই তো দেখতে পাবে। সুলায়মান বললেন, কোন আয়াতে? আবু হাশেম আবৃত্তি করলেন 'পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে; এবং পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে'। সুলায়মান বললেন, তাহলে আল্লাহ্পাকের রহমত কোথায় থাকলো? আবু হাশেম বললেন, পুণ্যবানগণের কাছে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে (১৫); এবং তারা তা থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না' (১৬) একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে প্রতিফলপ্রাপ্তির পর যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা সেখান থেকে আর কখনো বের হতে পারবে না। এখানকার 'তারা' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারীর সঙ্গে। তারা পাপাচারী। 'ফুজ্জার' অর্থ এখানে অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের। অর্থাৎ প্রকৃত পাপাচারী তারাই।

'ওয়ামা হুম আ'নহা বিগয়িবীন' অর্থ এবং তারা তা থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না। অর্থাৎ নরকে তাদের অবস্থান হবে সার্বক্ষণিক। অথবা মর্মার্থ হবে— আগেও তারা নরকের বাইরে ছিলো না। অর্থাৎ তারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করতো তাদের সমাধিমধ্যেও। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় দেখানো হয় তাদের আসল নিবাস— জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম। হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় দ্বীন সম্পর্কে। তারা তখন বলে, হায়, হায়! দ্বীন কী, তা তো আমি জানি না। তখন নেপথ্য থেকে আওয়াজ ভেসে আসে, এ লোক মিথ্যাবাদী। তার জন্য অনলশয্যা বিছিয়ে দেওয়া হোক। পরিধান করানো হোক তাকে আগুনের পোশাক। তার দিকে খুলে দেওয়া হোক নরকের দরজা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জানো (১৭)? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জানো' (১৮)? পুনঃ পুনঃ একই কথা বলে এখানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কর্মফল দিবসের গুরুত্বকে। আর প্রশ্ন দু'টো এখানে বিস্ময়পূর্ণ ও শাসনমূলক। অর্থাৎ সাবধান! সাবধান! কর্মফল দিবস হবে অত্যন্ত কঠিন, ভয়াবহ।

শেষোক্ত আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সেই দিন একের পক্ষে অপরের জন্য কিছু করবার সামর্থ্য থাকবে না, এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র'। একথার অর্থ— সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। কেননা সেদিন সর্বময় কর্তৃত্বের সরাসরি নিয়ন্ত্রয়িতা হবেন স্বয়ং আল্লাহ্।

ক্বারী ইবনে কাদের ও ক্বারী আমেরের ক্বেরাতে এখানকার 'ইয়াওমা' পদটি এসেছে আগের আয়াতের 'মা ইয়াওমুদ্ দীন' এর অনুবর্তী হয়ে। অথবা এর পূর্ব উদ্দেশ্য হিসেবে উহ্য রয়েছে একটি সর্বনাম 'হুয়া' (সে)। আর জমহুরের ক্বেরাতে আগের 'ইয়াওমাদ্ দীন' থেকে অনুবর্তী হয়েছে আলোচ্য আয়াতের 'ইয়াওমা' পদটি। অথবা এটি একটি উহ্য ক্রিয়ার আধার। অর্থাৎ দু'টি দলকেই সেদিন দেয়া হবে প্রতিফল, যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারেই আসবে না। কিংবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'ইয়াওমা' (সেই দিন) কথাটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে 'উজকুর' (স্মরণ করো) কথাটি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যে দিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না। কেননা সেই দিন প্রত্যক্ষত সর্বময় কর্তৃত্বাধিকারী হবে স্বয়ং আল্লাহ্।

'ওয়াল আমরু ইয়াওমায়িজিল্ লিল্লাহ্' অর্থ এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র। অর্থাৎ পৃথিবীর জীবনের মতো সেদিন কাউকে কোনো প্রকার সাময়িক মালিকানাও দেওয়া হবে না। অবশ্য মুমিনগণকে দেওয়া হবে শাফায়াতের অনুমতি। কিন্তু শাফায়াতের মালিক তাঁরা হবেন না। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— পৃথিবীতেও বস্তুত কারো কোনো মালিকানা নেই, আছে শুধু সাময়িক ভোগের অধিকার। কিন্তু পরকালে অধিকারের এই আবরণটুকুও আর থাকবে না। ফলে দ্বিধাহীন দৃষ্টিতে তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, সকল কর্তৃত্ব ও অধিকার কেবলই আল্লাহ্র। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ঃ

১ রুকু এবং ৩৬ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হাকেম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন মদীনাবাসীদের ওজন-মাপের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাদের এমতো অপ-অভ্যাস সম্পর্কেই তখন অবতীর্ণ হলো সুরা মুত্বাফ্ফিফীন। এরপর থেকে তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলো সঠিক পরিমাপে।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন সেখানে বাস করতো আবু জুহাইনা নামের এক লোক। সে পণ্যবিনিময়ের সময় ব্যবহার করতো দু'টি টুকরী। একটি ব্যবহার করতো নেওয়ার সময় এবং দেওয়ার সময় ব্যবহার করতো অপরটি। তাকে উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ হয় 'দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়.....'।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ۫﴿۲﴾ وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ؕ﴿۳﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ ۙ﴿۴﴾ لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ۙ﴿۵﴾ يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ﴿۶﴾

r দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,

r যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,

r এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।

r উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে

r মহাদিবসে?

r যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে!

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পণ্য-সামগ্রী মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, অথচ মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ, ওয়াইল দোজখ। এখানে 'আল মুত্বাফ্ফিফীন' অর্থ যারা মাপে কম দেয়। অর্থাৎ নেওয়ার সময় ঠিক ঠাক মাপ বুঝে নিলেও দেওয়ার সময় দেয় কম। উল্লেখ্য, তখনকার দিনের মাপ হতো দু'ধরনের— পাত্র বা টুকরি দিয়ে, যাকে বলা হতো মাপ এবং বাটখারা দিয়ে দাঁড়িপাল্লার মাধ্যমে, যাকে বলা হতো ওজন। এখানে বলা হয়েছে কেবল মাপের কথা। অবশ্য এর সঙ্গে ওজনের কথা আপনাআপনিই এসে যায়। আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, সে যুগে পণ্য আদান প্রদান হতো অনেকটা অনুমান-আন্দাজে। লক্ষণীয়, এখানে 'মিনান্ নাসি' (জনগণের নিকট থেকে) না বলে বলা হয়েছে 'আলান্ নাসি' (জনগণের উপর)। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জনগণের উপরে বিক্রেতার যে অধিকার আছে, তা সে গ্রহণ করে পুরোপুরি। অথবা, জনগণের কাছ থেকে সে তার পাওনা উসুল করে নেয় চক্রান্তমূলকভাবে।

ফাররা বলেছেন, এরূপক্ষেত্রে 'মিন' ও 'আলা' (উপরে) দু'টো অব্যয়ই ব্যবহার করা যায়। যেমন বলা হয় 'আকতাল্তু মিনকা' (তোমার নিকট থেকে আমি আমার পাওনা বুঝে নিয়েছি) এবং 'আকতালতু আলাইকা' (তোমার উপর আমার যে অধিকার ছিলো, তা আমি মেপে নিয়েছি)।

এখানকার 'কালূ হুম' ও 'ওয়াযানূ হুম' বাক্যদ্বয়ের 'হুম' এর পূর্বে উহ্য রয়েছে যের প্রদানকারী একটি করে 'লাম'। এভাবে 'কালূ লাহুম' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—

তারা তাদের জন্য, বা তাদেরকে মাপ করে দেয় এবং 'ওয়াযানূ লাহুম' অর্থ দাঁড়ায়— তারা তাদের জন্য বা তাদেরকে ওজন করে দেয়। এমনও বলা হয়েছে যে, বাক্যটির মূলরূপ ছিলো 'কালূ মাকীলাহুম' (তাদের মাপযোগ্য বস্তু মাপ করে)।

'ইউখ্‌সিরূন' অর্থ কম দেয়। ওজন কম করা, বা ওজন কম দেওয়াকে বলে 'তাত্বফীফ'। কারণ, মাপে-ওজনে কমের বিষয়টি ঘটে তুচ্ছতা থেকে। আলোচ্য আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, অতি তুচ্ছ পরিমাণ কম দিলেও ওয়াইল দোজখের অধিবাসী হওয়া অনিবার্য হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে কম দিলে দোজখবাসী হওয়া তো হয়ে যায় আরো অধিক অনিবার্য। রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি বিষয় থেকে উদ্ভব হয় পাঁচটি বিষয়ের— ১. যে জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্‌পাক তাদের উপরে প্রবল করে দেন তাদের শক্রুদেরকে ২. যে জাতি আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌পাক সে জাতিকে করেন দারিদ্রকবলিত ৩. যাদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচলন ঘটে প্রকাশ্যভাবে, তাদের মধ্যে মৃত্যুহার হয় অধিক ৪. যারা ওজনে কম দেয়, তাদের দেশের শস্য উৎপাদন যায় কমে, ফলে তারা হয় দুর্ভিক্ষকবলিত ৫. যারা জাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাদের দেশে বন্ধ হয়ে যায় বৃষ্টি। হজরত বুরাইদা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরির প্রচলন ঘটে, আল্লাহ্‌পাক সে জাতির অন্তরে সৃষ্টি করে দেন আতংক। যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন বেড়ে যায়, সে জাতির মধ্যে মৃত্যু হার যায় বেড়ে। মাপ ও ওজনে কম দেয় যে জাতি, তাদের উপরে চাপানো হয় অন্নকষ্ট। সত্য বিধানের বিপরীত সিদ্ধান্ত দেয় যে সম্প্রদায়, তারা হয় রক্তাপ্লুত। আর যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে তাদের দুশমনেরা। পরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক। এই হাদিসের 'ফতর' শব্দটির মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। আর ওজনে মাপে কম দিলে যে অন্নকষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা হবে দু'ভাবে— হয় মানুষ হবে দরিদ্র, অথবা উপজীবিকা থাকা সত্বেও তা ভোগ করার সামর্থ্য তাদের থাকবে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর কোনো ব্যবসায়ীর পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে লক্ষ্য করে বলতেন, আল্লাহকে ভয় কোরো। মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। মনে রেখো, মাপে-ওজনে যারা কম দেয়, তাদেরকে মহাবিচারের দিবসে এতো অধিক সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে যে, তাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকবে তেমনিভাবে, যেমনভাবে কলমের খোলা মুখ দিয়ে ঝরতে থাকে কালি। কানের অর্ধেক পর্যন্ত তাদের ডুবে যাবে ঘামের সাগরে।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে'? প্রশ্নটি একই সঙ্গে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, বিস্ময়প্রকাশক ও শাসনমূলক। উল্লেখ্য, মহাপুনরুত্থান অবশ্যবিশ্বাস্য। অথচ এখানে ব্যবহার করা

হয়েছে ‘ধারণা’ শব্দটি। এতে করে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, মহাপুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবস সম্পর্কে যদি কারো ন্যূনতম ধারণাও থাকে, তবুও সে পাপ থেকে সংযত হতে পারবে। আর এ সম্পর্কে যে দৃঢ় বিশ্বাসী, সে তো হবে আরো অধিক সংযমী (মুত্তাক্বী)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘মহা-দিবসে (৫)? যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে’ (৬)!

‘লিইয়াওমিন আ’জীম’ অর্থ মহাদিবসে। এখানকার ‘লাম’ অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ সেই মহাদিবসে হিসাব-কিতাবের জন্য। অথবা ‘লাম’ অব্যয়টি এখানে ক্রিয়ার আধার, ‘ফী’ (এতে) অর্থে। মর্মার্থ ওই মহান দিনে। মহাবিচারের দিবসকে এখানে মহাদিবস বলা হয়েছে একারণে যে, ওই দিন ঘটবে মহা মহা ঘটনা। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, তোমার আগে এমন অনেক জাতি অতীত হয়েছে, যারা অসংখ্য সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা সত্ত্বেও মহাবিচারের দিবসে তাদের ভাগ্যে নিষ্কৃতি জুটবে না।

আর এখানকার ‘সে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে ‘কথাটির যোগসূত্র রয়েছে ৪ সংখ্যক আয়াতের ‘পুনরুত্থিত হবে’ কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ যে দিন তাদেরকে তাদের নিজ নিজ কবর থেকে ওঠানো হবে, সেদিন তারা দণ্ডায়মান হবে জগতসমূহের প্রভুপালনকর্তার সকাশে। ‘লিরব্বিল আ’লামীন’ অর্থ জগতসমূহের প্রভুপালক, মহাবিশ্বের নিয়ন্তা।

সুপরিণতসূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেদিন জনগণ আল্লাহ্ সকাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ঘামের সাগরে কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবন্ত অবস্থায় থাকবে কিছুসংখ্যক লোক। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হাকেম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মানুষের শরীর থেকে এতো ঘর্ম নির্গত হবে যে, তা ভূপৃষ্ঠের উপরে উঁচু হয়ে থাকবে সত্তর বানহা পর্যন্ত। আর স্বেদ-সলিল পৌঁছবে তাদের কর্ণ পর্যন্ত। তিবরানী, আবু ইয়ালী ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিফল দিবসে অবিশ্বাসীদের মুখে লাগানো হবে তাদেরই ঘামের লাগাম। তারা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! এ বিপদ থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও; যদিও আমাদেরকে পাঠিয়ে দাও নরকে। হজরত জাবের থেকে হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাসমাবেশস্থলে কিছুসংখ্যক লোকের মুখে লাগানো থাকবে ঘামের লাগাম। তারা মিনতি জানাবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! এরকম কষ্ট থেকে তো নরকে চলে যাওয়াই উত্তম।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বায়হাকী লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হজরত কা’ব বলেছেন, মানুষ প্রতিফল দিবসের মহাসমাবেশস্থলে দণ্ডায়মান থাকবে তিনশত বৎসর ধরে।

হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কর্মফল দিবসে সূর্য নেমে আসবে অতি নিকটে, এক মাইল ব্যবধানে। সুলাইম ইবনে আমের বলেছেন, শপথ আল্লাহ্‌র! রসুল স. এক মাইল বলে কী বুঝাতে চেয়েছেন, আমি তা জানি না। জানি না তা কি পৃথিবীর প্রচলিত দূরত্ব, না চোখে সুরমা লাগানো কাঠির। তিনি স. তো এরকমও বলেছেন যে, তখন মানুষ স্বেদ-সমুদ্রে ডুবে থাকবে তাদের কৃতকর্মের তারতম্যানুসারে। ঘামের অবস্থান থাকবে তাদের কারো কারো পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত, কারো কারো উরুদেশ পর্যন্ত। কারো কারো কটিদেশ বরাবর, আবার কারো কারো মুখে লাগানো থাকবে ঘামের লাগাম। অর্থাৎ ঘাম পৌঁছবে তাদের মুখমণ্ডল পর্যন্ত। একথা বলার পর রসুল স. তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেছিলেন মুখমণ্ডলের প্রতি। হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আহমদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত আবু উমামা থেকে আহমদ ও তিবরানীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনায় আবার অতিরিক্তরূপে বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— সূর্যের তাপে তখন স্বেদসাগরের কীটপতঙ্গগুলোও উদ্বেলিত হতে থাকবে এমনভাবে, যেমনভাবে উথলে ওঠে জলভরা ফুটন্ত ডেকচি। আহমদ ও তিবরানী অত্যুত্তম সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, জীবন ধারণের পর মানুষ মৃত্যু অপেক্ষা অধিক বিপদের সম্মুখীন হয় না। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীর বিপদাপদ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। ভয়ে আতংকে তখন তাদের দেহ থেকে এতো অধিক স্বেদ নির্গত হতে থাকবে যে, তার লাগাম লেগে যাবে তাদের মুখে। ইচ্ছে করলে তখন স্বেদ-সরোবরে ভাসানো যাবে নৌকা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বায়হাকী লিখেছেন, অবস্থা তখন এতোই ভয়াবহ হবে যে, হিসাব গ্রহণের পূর্বে লাগাম লাগিয়ে দেওয়া হবে তাদের মুখে। আর পুণ্যবান বিশ্বাসীরা তখন উপবিষ্ট থাকবে মেঘের ছায়ায়, স্বর্ণ-কেদারায়। হাদিসগুলো হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে হান্নাদ বর্ণনা করেছেন অতিরিক্ত এই কথাগুলো সহযোগে— বিশ্বাসীদের কাছে তখনকার পুরো সময়কে মনে হবে এক দিনের কিয়দংশ।

হজরত সালমান ফারসী থেকে হান্নাদ ও ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, প্রতিফল দিবসে সূর্য নেমে আসবে মানুষের মাথার কাছাকাছি, ধনুকের দুই জ্যা এর ব্যবধানে। সূর্য তখন তার দশ বৎসরের উত্তাপ ছড়াবে একদিনে। সে সময় মানুষের দেহে থাকবে না কোনো দেহাবরণ। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের শরীরে লাগবে না তখন এতোটুকু উত্তাপ। তারা তখন দেহাবরণবর্জিতও হবে না। কিন্তু অবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসিনীদের অবস্থা তখন হবে অতি করুণ। প্রচণ্ড উত্তাপে তাদের শরীর থেকে নির্গত হতে থাকবে ঘামের ঝরণা। আর তাদের ভিতর থেকে উত্থিত হতে থাকবে 'অক অক' আওয়াজ।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾
كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ
بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾ اِذَا تُتْلٰى
عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ
كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾

r কখনও না, পাপাচারীদের ‘আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।

r সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান?

r উহা চিহ্নিত ‘আমলনামা।

r সেই দিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের ,

r যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,

r কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;

r উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, ‘ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা।’

r কখনও নয়; বরং উহাদের কৃতকর্মই উহাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরাইয়াছে।

r না, অবশ্যই সেই দিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;

r অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে;

r তৎপর বলা হইবে, ‘ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।’

প্রথমে বলা হয়েছে ‘কাল্লা’ এর অর্থ— না, কখনো নয়। অর্থাৎ না, না, তা হয় না, যা মহাসত্য, তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। শব্দটি নিজেই যেনো পুরো একটি বাক্য। আর এর যোগসূত্রে রয়েছে ইতোপূর্বের বক্তব্যপ্রবাহের সঙ্গে। এরকম বলেছেন হাসান বসরী।

‘ইন্না কিতাবাল ফূজ্জ্বারি লাফী সিজ্জ্বীন’ অর্থ পাপাচারীদের আমলনামা তো রয়েছে সিজ্জীনে। ‘ফুজ্জ্বার’ অর্থ পাপাচারী, অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের। আর এখানকার ‘সিজ্জ্বীন’ শব্দটি সাধিত হয়েছে ‘সিজ্জ্বনুন’ ধাতুমূল থেকে। ‘সিজ্জ্বনুন’ অর্থ অবরুদ্ধ, বন্দী। কামুস অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে ‘সিক্কীন’

শব্দরূপে ‘সিজ্জ্বীন’ অর্থ চিরবন্দী। আখফাশ অর্থ করেছেন, সুকঠিন বন্ধনে বন্দী। ইকরামা অর্থ করেছেন— লাঞ্ছিত, বিভ্রান্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কর্মবিবরণী অনুসারেই তারা হবে বিভ্রান্ত, লাঞ্ছিত, সুকঠিন বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ব্যাখ্যাটি রূপকার্থক। কেননা আমলনামাই তাদের বন্দীত্বের মূল কারণ নয়। মূল কারণ হচ্ছে তাদের অবিশ্বাস, সত্যপ্রত্যাখ্যান, বিভ্রান্তি।

নবীবচন ও সাহাবীবচন থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সিজ্জীন ওই স্থানের নাম, যেখানে সংরক্ষিত থাকে অবিশ্বাসীদের আমলনামা। কামুস। তাদের নিবন্ধন তালিকার নামও সিজ্জীন হতে পারে। আবার তাদের কর্মবিবরণীর সংরক্ষিতাগারের নাম সিজ্জীন হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এরকম নামকরণের উদ্দেশ্য— তাদের আত্মাসমূহ সিজ্জীনে বন্দী অবস্থায় থাকে। কেননা ‘সিজ্বনুন’ অর্থ বন্দী করা। আবার সিজ্জীনের অবস্থান মৃত্তিকার সপ্তমতম স্তরে। ইবনে মানদাহ, তিবরানী ও আবু শায়েখ অপরিণত সূত্রে হামযা ইবনে হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের আত্মার অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, বিশ্বাসীদের আত্মা সবুজ পাখির আকারে বেহেশতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়ায়। আর অবিশ্বাসীদের আত্মা বন্দী থাকে সিজ্জীনে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মাধ্যমে ইবনে মোবারক, হাকেম, তিরমিজি, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও ইবনে মানদাহ বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মা থাকে সিজ্জীনে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, কাতাদা, মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, সিজ্জীন রয়েছে ভূপৃষ্ঠের সপ্তমতম স্তরে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মাসমূহকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়। আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের এরকম উক্তি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া। হজরত বারা ইবনে আজীবের বর্ণনানুসারে স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, সিজ্জীন পৃথিবীর সপ্তম স্তরেরও নিচে এবং ইল্লিন সপ্তমাকাশেরও ঊর্ধ্বে আরশের নিম্নদেশে। সুপরিণত সূত্রে হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুর সময় আকাশের দরোজা খোলা হয় না। আল্লাহ্ তখন মৃত্যুর ফেরেশতাদেরকে বলেন, তাদের আমলনামাগুলো সিজ্জীনে রেখে দাও। আর তাদের আত্মাগুলোকে ছুঁড়ে দাও দূরতম কোনো দিগন্তের দিকে।

ইমাম আহমদ ও ইমাম বাগবী উল্লেখ করেছেন, শুবরামা ইবনে আত্তার বলেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হজরত কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে’— এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাকে জানান। তিনি জবাব দিলেন, মৃত্যুর পর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূহ উঠতে থাকে উপরের দিকে। কিন্তু আকাশ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি

জানায়। তখন ওই রূহকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় সপ্তমতম স্তরে সর্বনিম্ন স্থানে। সিজ্জীন থেকে বের হয়ে আসে তার নামাংকিত একটি কাগজ। ওই কাগজটি সীল মোহর করে সংরক্ষণ করা হয় ইবলিসবাহিনীর অবস্থানস্থলের নিম্নে, যাতে প্রতিফল দিবসে তার সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রমাণ হিসেবে কাগজটিকে উপস্থিত করা যায়।

কালাবী বলেছেন, মাটির সপ্তম স্তরের নিম্নের একটি সবুজ পাথরের নাম সিজ্জীন। তার উপর আকাশের নীলিমার ছায়াপাত ঘটে বলে পাথরটি নীলাভ, অথবা সবুজাভ। ওই পাথরটির নিচেই সংরক্ষিত রয়েছে কাফেরদের আমলনামা। বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল ফালাক্ব হচ্ছে জাহান্নামের অভ্যন্তরে সিজ্জীনে অবস্থিত ঢাকনি দিয়ে ঢাকা একটি কূপ। আর একটি মুখ খোলা কূপও রয়েছে সেখানে। আমি বলি, 'সিজ্জীন জাহান্নামে' এবং 'সিজ্জীন মৃত্তিকার সপ্তম স্তরে' এরকম বর্ণনা বৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, জাহান্নামের অবস্থিতিও ভূপৃষ্ঠের সপ্তমতম স্তরে। আবু শায়েখের 'আল উজমা'য় বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু যা'রা হজরত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, জান্নাত সপ্তমাকাশের উপরে এবং জাহান্নাম জমিনের সপ্তস্তরে। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মৃত্তিকাভ্যন্তরে।

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! মহাবিচারের দিবসে জাহান্নামকে কোথা থেকে আনা হবে? তিনি স. বললেন, তখন তাকে টেনে আনা হবে মৃত্তিকাভ্যন্তরের সপ্তম স্তর থেকে। অনেকগুলো লাগাম থাকবে তার। আর প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা। এভাবে টানতে টানতে তাকে আনা হবে মহাসমাবেশস্থলের এক হাজার বৎসরের পথের দূরত্বে। তখন সে ছাড়বে একটি দীর্ঘশ্বাস। তাই দেখে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন ফেরেশতা এবং নবী রসুলগণ হাঁটু গেড়ে বসে বলতে থাকবেন 'রব্বি নাফসি নাফসি' (হে আমার প্রভুপালক! আমার কী হবে? আমার কী হবে)?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জানো (৮)? তা হচ্ছে চিহ্নিত আমলনামা' (৯)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! সিজ্জীন কতো বিশাল, ভয়াল, তা কি আপনি জানেন? সিজ্জীন হচ্ছে এমনভাবে মুদ্রিত আমলনামা, যার লিপি অনপনেয়। ওই আমলনামার প্রতিবেদনানুসারেই শাস্তি দেওয়া হবে কাফেরদেরকে। অথবা মর্মার্থ হবে— আমলনামাগুলো এমন সংকেতবিশিষ্ট হবে যে, দর্শক মাত্রই সেগুলো দেখে অতি সহজে বুঝতে পারবে যে, ওগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

'সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জানো' প্রশ্নটি এখানে 'জ্ঞানাহরণসূচক'। কথাটির মর্মার্থ— বলো দেখি সিজ্জীনের বিশালতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে কী জানা আছে তোমার? জুজায কথাটির অর্থ করেছেন— সিজ্জীন তোমার কাছে অভূতপূর্ব। তোমার স্বজাতিরাও জানে না, সিজ্জীন কী?

'মারকুম' অর্থ চিহ্নিত। ইয়েমেনী হুমাইরি গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় 'মারকুম' অর্থ সীলমোহরযুক্ত। বাগবী লিখেছেন, 'মারকুম' এখানে সিজ্জীনের ব্যাখ্যা নয়, বরং আমলনামার বিবরণ। বায়যাবী লিখেছেন, শব্দটি সিজ্জীনের ব্যাখ্যা। আর সিজ্জীনকে এখানে আমলনামার সঙ্গে একারণেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, আমলনামা হচ্ছে তাদের অবরোধ ও বন্দীত্বের নিমিত্ত। গ্রন্থিত বিষয় তেমনইভাবে গ্রন্থমধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে, যেভাবে কয়েদীরা বন্দী থাকে কারাগারে। সে কারণেই সিজ্জীন একটি গ্রন্থ বা আমলনামা সদৃশ। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সকল জ্বিন ও মানুষের কৃতকর্মসমূহের বিবরণ জমা থাকে ওই সিজ্জীনেই। প্রকাশ থাকে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মাগুলোর অবস্থানস্থলও সিজ্জীন। আবার তা তাদের আমলনামাগুলোরও সংরক্ষণাগার। আর সম্ভবত বাক্যটিতে একটি শব্দ রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ কথাটির মূল রূপ ছিলো 'মা কিতাবু সিজ্জীন' (সিজ্জীনের সংরক্ষিত আমলনামাগুলো সম্পর্কে তুমি কী জানো)। অথবা এখানকার কিতাবুম মারকুম' এর আসল রূপ ছিলো 'মাহাল্লু কিতাবিম্ মারকুম' (আমল নামার ভাণ্ডার)।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের'। একথার অর্থ— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদেরকে পরকালে ওয়াইল দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে'। বাক্যটি আগের আয়াতে উল্লেখিত 'অস্বীকারকারী'র বিশেষণাত্মক বিশেষণ। অথবা অসৎ বা বিশেষ বিশেষণ। কিংবা 'অস্বীকারকারী' কথাটির অনুবর্তী। এ বাক্যটির প্রসঙ্গ আগের আয়াতের প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নতর। তবে এখানে 'অস্বীকার করে' বলে তিরস্কার করা হয়েছে অস্বীকারকারীদেরকেই। আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটি ৯ সংখ্যক আয়াতের 'চিহ্নিত আমলনামা'র স্থলাভিষিক্ত কর্তা (নায়েবে ফায়েল)। অর্থাৎ তাদের চিহ্নিত আমলনামাতেও একথা লেখা রয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিভোগ অবধারিত। অথবা বলা যেতে পারে, বাক্যটি বিশেষণ আমলনামার। অর্থাৎ তাদের আমলনামাই তাদের জন্য অনিবার্য করবে ওয়াইল দোজখ। প্রথম ব্যাখ্যাটি শাব্দিক বন্ধনের দিক দিয়ে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে পরের ব্যাখ্যাটিই অধিকতর জোরালো। কেননা তখন কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরই আমলনামা থাকবে না, আমলনামা থাকবে বিশ্বাসীদেরও।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী তা অস্বীকার করে'। এখানে 'মু'তাদিন আছীম' অর্থ পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী। 'মু'তাদ' বলে তাকে, যে তার অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতৃপুরুষদের নির্বিবাদ অনুকরণের ক্ষেত্রেও সীমালংঘন করে। অস্বীকার করে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও কর্মফল দিবসকে। আর 'আ'ছীম' অর্থ প্রবৃত্তিপূজক, পাপিষ্ঠ, এমনই পাপমগ্ন যে, এর বিপরীত কিছু তার চিন্তাতেই আসে না।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা। একথার অর্থ— ওই পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারীদের সম্মুখে কোরআনের বাণী পাঠ করে শোনানো হলে তারা তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে অথবা হিংসা-দ্বেষ, কিংবা অজ্ঞতার কারণে বলে, এগুলো প্রাচীনকালের কিংবদন্তি, কল্পকাহিনী। এখানকার 'আসাত্বীর' শব্দটি 'উসত্বুর' 'আসত্বার' ও 'ইসত্বর'এর বহুবচন। এর অর্থ অসংলগ্ন কথা। কামুস।

'সুরাহ' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আসাত্বীরুল আউয়ালীন' অর্থ অতীত যুগের লোকদের বানানো কল্পিত কিস্সা। কথাটির উল্লেখ করে এখানে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, তাদের বিভ্রান্তি সীমাহীন। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও অনুবৃত্তিক (আকলি ও নকলি) কোনো প্রমাণই তাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'কখনও নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে'। এখানে কাল্লা' (কখনো নয়) অর্থ তারা কখনোই এরকম অপবচন উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকবে না। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— না, না, কোরআনকে তারা বিশ্বাস করবেই না।

'বাল' অর্থ বরং। কথাটির দ্বারা পূর্ববর্তী বাক্য থেকে অপহ্নুতি করে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তাদের হৃদয় সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের যোগ্যতারহিত, বিভ্রান্তির রঙে রঞ্জিত। 'রনা আ'লা কুলূবিহিম মা কানূ ইয়াক্সিবূন' অর্থ তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধারিয়েছে। 'রনা'র ধাতুমূল 'রইনুন' অর্থ প্রাধান্য, প্রভাব। যেমন বলা হয় 'রনাল খমরু আ'লা কুলবিহী' (মদ তার মনে প্রভাব ফেলেছে)। এভাবে এখানকার 'হৃদয়ে জঙ ধরেছে' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— পাপের কলুষ তাদের অন্তরে ছায়াপাত করেছে। আর সে ছায়া হয়েছে এতোই প্রবল যে সেখানে সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের যোগ্যতাটুকু আর একেবারেই নেই।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি একটি পাপ করলে সাথে সাথে তার কলবে পড়ে যায় একটি কালো দাগ। দাগটি মুছে যায় তখন, যখন সে তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কিন্তু যদি সে পুনঃপুনঃ পাপ করতেই থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে কালো দাগে ছেয়ে যায় তার সারা অন্তর। এরকম অবস্থার কথা বুঝাতেই এখানে বলা হয়েছে 'তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে'। বাগবী, আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। কোনো কোনো বর্ণনায় 'বিশ্বাসী ব্যক্তি একটি পাপ করলে' কথাটির পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে 'নিশ্চয় বান্দা যখন পাপকর্ম করে'। এখন কথা হচ্ছে, বিশ্বাসীদের অবস্থাই যদি এরকম হয়, তবে অবিশ্বাসীদের অবস্থা যে কতো শোচনীয় হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ইমান নেই বলে তারা তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনাও করে না। তাই তাদের হৃদয় হয়ে যায় স্থায়ীভাবে জঙ ধরা।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'না, অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে অন্তরিত থাকবে'। এখানে 'কাল্লা' (না, না) বলে পাপে পাপে জঙ পড়ে যাওয়া হৃদয়ের প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছে বৈমুখ্য। অথবা 'কাল্লা' অর্থ এখানে ঠিক ঠিক। অর্থাৎ তারা যে জঙ ধরা হৃদয়ের অধিকারী, তা অতি নিশ্চিত। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'কাল্লা' অর্থ 'লা ইউ'সাদ্দিকুন'। অর্থাৎ না, না, সত্যের স্বীকৃতি তারা দিবেই না।

'অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে অন্তরিত থাকবে' অর্থ মহাবিচারের দিবসে যখন বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে, তখন অবিশ্বাসীরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাদের দৃষ্টির সামনে তখন থাকবে কেবল পাপের ঘন কালো পর্দা। ফলে আল্লাহ্ দর্শন থেকে তারা থাকবে বঞ্চিত, যেমন এখন বঞ্চিত আছে মহাসত্য দর্শন থেকে।

হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্‌প্রেমিকেরা যদি জানতে পারে যে, দীদারে ইলাহী তাদের ভাগ্যে জুটবে না, তবে তারা কলিজা ফেটে মারাই যাবে। ইমাম মালেকের নিকট একবার আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, এখানে যেহেতু বলা হয়েছে পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারীদের ভাগ্যে দীদার জুটবে না, সেহেতু একথা আর না বললেও চলে যে, বিশ্বাসীগণ অবশ্যই লাভ করবে দীদার। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন বিপরীতার্থ গ্রহণ করতে হবে আলোচ্য আয়াতের। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যেহেতু আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না, সেহেতু তাঁকে দেখতে পাবে বিশ্বাসীরা।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে'। একথার অর্থ— তখন তারা দীদার থেকেই কেবল বঞ্চিত হবে না, অধিকন্তু নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামেও।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— তৎপর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে'। একথার অর্থ— তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার পর সেখানকার প্রহরী ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, এটাই সেই দোজখ, যার কথা তোমরা বিশ্বাস করতে না।

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ আয়াত ১৮— ২৮

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِىْ ذٰلِكَ

فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

r অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যীনে,
r ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
r উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।
r যাহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে।
r পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,
r তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।
r তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,
r তাহাদিগকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে;
r উহার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।
r উহার মিশ্রণ হইবে তাস্‌নীমের,
r ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পক্ষান্তরে পুণ্যবানগণের আমলনামা থাকবে 'ইল্লিয়্যীন' নামক স্থানে, যা সিজ্জীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। উল্লেখ্য, 'কাল্‌লা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শনার্থে। আবার হতে পারে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সঠিক অর্থে। অর্থাৎ অবশ্যই। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ সুনির্ঘাত, অবশ্যই। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যে বেহেশতের কথা বিশ্বাসই করতো না, সেই বেহেশতের 'ইল্লিয়্যীন' নামক স্থানেই সংরক্ষিত থাকবে ইমানদারগণের আমলনামা।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানকার 'ইল্লিয়্যীন' অর্থ উচ্চ থেকে উচ্চতর, ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর। একারণেই— 'ওয়াও' 'নূন' সহযোগে শব্দটিকে করা হয়েছে বহুবচন। ফাররা বলেছেন, শব্দটি বহুবচনবোধক। কেননা শব্দটির একবচন হয় না, তবে ব্যবহৃত হয় স্থানের নামে। সতর্ক তত্ত্বজ্ঞগণ লিখেছেন, শব্দটির ধাতুমূল 'উলয়্যুন'। ইতোপূর্বে হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, 'ইল্লিয়্যীন' সাত আকাশের উপরে, আরশের নিচে। হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদিসে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আকাশে। আল্লাহ্ তখন বলেন, আমার এই দাসের আমালনামা রেখে দাও ইল্লিয়্যীনে এবং তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো পৃথিবীতে, তার নিজ সমাধিতে। আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম। হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইল্লিন হচ্ছে সবুজ জমরুদ পাথরের একটি ফলক, যা লটকানো রয়েছে আরশের নিচে। ওই ফলকেই মুদ্রিত

রয়েছে বিশ্বাসীগণের পুণ্যকর্মসমূহের বিশদ বিবরণ। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, ইল্লিন হচ্ছে মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতাকূলের পুণ্য কর্মসমূহের দপ্তর। কা'ব এবং কাতাদা বলেছেন, ইল্লিন আরশের দক্ষিণ পায়ার নাম। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একটি জান্নাতের নাম ইল্লিন। আতা এবং জুহাক মন্তব্য করেছেন, ইল্লিন হচ্ছে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা। অর্থাৎ সর্বোচ্চ সীমান্তবর্তী বদরীবৃক্ষ।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জানো (১৯)? ওটা চিহ্নিত আমলনামা' (২০)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ইল্লিন কী, সে সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? ইল্লিন হচ্ছে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের সীলমোহরযুক্ত আমলনামা।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তারা তা দ্যাখে'। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত' অর্থ আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ। আমি বলি, নবী-রসুল-সিদ্দীক-শহীদ এবং পুণ্যবানগণের আত্মাগুলোও আল্লাহ্‌র সন্নিধানধন্য। তাঁদের আত্মাগুলোও ইল্লিনে থাকবে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শহীদগণের আত্মা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সবুজ পাখিরূপে অবস্থান করে। তারা জান্নাতের যত্রতত্র ইচ্ছামতো ওড়াউড়ি করে। আবার ফিরে আসে সেই ঝাড়বাতির কাছে, যা লটকানো রয়েছে আরশের নিচে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তকী ইবনে মাখলাদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাসের উক্তির অনুকরণে আবু শায়েখ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক শাদা পাখির অভ্যন্তরস্থিত অবস্থায় শহীদগণকে ওঠাবেন। পাখিগুলো অবস্থান করবে আরশের নিম্নে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে। তারা অতি প্রত্যুষে উড়াল দেয়। ইচ্ছা মতো উড়ে উড়ে বেড়ায় জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে। আল্লাহ্‌পাক প্রত্যহ তাদেরকে দান করেন তাঁর বিশেষ সন্নিধান। জানান সালাম।

হজরত আবু দারদার উক্তি উল্লেখ করে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, শহীদগণের রূহগুলো হরিৎবর্ণের বিহঙ্গের আকারে অবস্থান করে আরশের নিম্নদেশে ঝুলানো ঝাড় ফানুসে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, যখন হারেছা শহীদ হলেন, তখন রসুল স. বললেন, নিশ্চয় হারেছা জান্নাতী, সমুন্নত ফেরদাউসের অধিকারী। হজরত হাবীব নাজ্জার সম্পর্কে সুরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে 'তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলে উঠলো, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো কীরূপে আমার প্রভুপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে করেছেন সম্মানিত'।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, শহীদগণের রূহ অবস্থান করবে জান্নাতে, আবার কোনো কোনোটিতে বলা হয়েছে— আরশের নিম্নের ঝাড় ফানুসে। এমতো বর্ণনাবৈষম্য নিরসনার্থে বলা যায়— জান্নাতের উপরে আরশ রয়েছে

আকাশের মতো ছাদ হিসেবে। আমি বলি, এরকম ব্যবস্থা কেবল শহীদগণের জন্যই নির্ধারিত নয়। নবী-রসুল ও সিদ্দীকগণও হবেন এমতো সৌভাগ্যের অধিকারী। কেননা তাঁরা শহীদগণের ঊর্ধ্বে। তাছাড়া হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'আল মু'মিনীন' (বিশ্বাসীগণ)। এতে করে একথাটিও প্রতীয়মান হয় যে, যারা প্রকৃত ইমানদার, তাদের অবস্থাও সেখানে হবে একই রকম।

হজরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে বিশুদ্ধসূত্রে মালেক ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীগণের আত্মা সবুজ পাখির আকারে বসে থাকবে জান্নাতের বৃক্ষরাজির ডালে। তারা তাদের পূর্বের অবয়বে ফিরে যাবে মহা বিচারের দিবসে। হজরত উম্মে হানি থেকে আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের বৃক্ষশাখায় পাখির মতো ঘুরে বেড়াবে মুমিনদের রূহ। প্রতিফল দিবসে তারা ধারণ করবে আসল আকার। আবু মারূফের স্ত্রী পুণ্যবতী উম্মে বিশর থেকে ইবনে আসাকেরও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, হাদিসগুলোতে উল্লেখিত 'মুমিন' অর্থ কামেল মুমিন (পূর্ণ বিশ্বাসী)। 'যারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তারা তা দ্যাখে' বাক্যটির সারমর্মও তা-ই। কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, মুমিনগণের রূহ অবস্থান করে ইল্লিনে। সেখান থেকে তারা প্রত্যক্ষ করে তাদের স্বর্গের নিবাস।

হজরত আবু হোরায়রা এবং ওয়াহাব ইবনে মুন্নাব্বাহ থেকে শিথিল সূত্রে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সপ্তম আকাশে আছে আল্লাহ্ কর্তৃক বিশেষভাবে সংরক্ষিত একটি গৃহ। ওই গৃহের নাম শ্বেত নিবাস। বিশ্বাসীগণের আত্মা সেখানে সমবেত হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রূহগুলো যখন সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন সেগুলোকে রাখা হয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে। হজরত সালমান ফারসী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনে মনসুর।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব সূত্রে ইবনে মোবারক, হাকেম, তিরমিজি, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, বিশ্বাসীগণের রূহ অদৃশ্যভাবে পৃথিবীতেই বিচরণ করে। যাতায়াত করে যেখানে খুশী সেখানে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূহগুলোকে বন্দী করে রাখা হয় সিজ্জীনে।

ইমাম শা'বী তাঁর 'বাহারুল কালাম' গ্রন্থে মর্যাদার তারতম্যানুসারে বিশ্বাসীগণের আত্মা সম্পর্কে যে সকল হাদিস সংকলন করেছেন, সেগুলো এরকম— ১. নবীগণের আত্মা তাঁদের পবিত্র দেহের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার পর ধারণ করে মেশক ও কর্পূরের রূপ। জান্নাতাভ্যন্তরে দিনভর পানাহার বিনোদনে কাটিয়ে রাতে অবস্থান গ্রহণ করে আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে। ২. শহীদগণের আত্মা দেহত্যাগ করার পর আশ্রয় নেয় সবুজ পাখির উদরে। তারাও সারাদিন জান্নাতে প্রমোদবিহার করে এবং পানাহারে পরিতৃপ্ত হয়ে রাতে ফিরে যায় আরশের নিচের সেই ঝুলন্ত ঝাড়বাতির আবাসে। ৩. সাধারণ পুণ্যবান বিশ্বাসীদের আত্মার গতিবিধি থাকে কেবল জান্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা

বেহেশতের সৌন্দর্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়। তাদেরকে পানাহার করানো হয় না। ৪. পাপী বিশ্বাসীদের আত্মা ঝুলন্ত থাকে আকাশ-পৃথিবীর মাঝামাঝি, শূন্যস্থানে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মাগুলোকে কালো পাখির জঠরাভ্যন্তরে ভরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় সিজ্জীনে।

আমি বলি 'নবীগণের আত্মা ধারণ করে মেশক ও কর্পুরের রূপ' কথাটির অর্থ তাঁদের পবিত্র দেহ মানব দেহ সদৃশ হলেও সেগুলোকে তখন করা হয় মেশক ও কর্পুরগঠিত, যাতে করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাঁদের মহিমার সৌরভ। মেশক আম্বর ও কর্পুরের দেহ বলতে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন— দত্তক দেহ। নবীগণ এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুগামী সিদ্দীকগণ আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুকম্পারূপে ওই বিশেষ দেহ লাভ করেন এই পৃথিবীতেই। অর্থাৎ পরলোকগমনের আগেই।

একটি সংশয় ঃ ইতোপূর্বে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, নবী-রসুল, সাধারণ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সকলের রূহই অবস্থান করে তাদের আপন আপন সমাধিতে। তাহলে তাদের ইল্লিন ও সিজ্জীনে থাকার কথা কীভাবে স্বীকার করা যায়? যেমন হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, বিশ্বাসীগণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, এদের আমলনামা সংরক্ষণ করা হোক ইল্লিনে। আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক পৃথিবীতে। কেননা আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে। সেখান থেকেই আমি যথাসময়ে ঘটাবো তাদের পুনরুত্থান।

অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গেও এধরনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের আত্মাগুলোকেও পৃথিবীতেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। মেরাজ রজনীতে রসুল স. নবী মুসাকে নামাজ পড়তে দেখেছিলেন তাঁর কবরেই। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, আমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কেউ দরূদ সালাম পাঠ করলে আমি তা শুনি। আর দূরবর্তী স্থানের কেউ দরূদ সালাম পাঠ করলে, তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়।

নিরসন ঃ উদ্ভূত জটিলতা নিরসনার্থে আমরা বলি, মুমিনগণের রূহ থাকে ইল্লিনে, অথবা সপ্তম আকাশের উপরে এবং কাফেরদের রূহ থাকে পৃথিবী পৃষ্ঠের সপ্তমতম স্তরে সিজ্জীনে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, ওই রূহগুলোর এক ধরনের সম্পর্ক তাদের আপন আপন কবরের সঙ্গে থাকেই, যার রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত কেবল আল্লাহ্পাক। সুতরাং বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈষম্য নেই। কোরআন ও হাদিসের বিবরণানুসারে বলতে হয়, দেহ ও আত্মার মিলিত নাম মানুষ। আর কবরস্থিত মানুষের সামনে উপস্থিত করা হয় স্বর্গের সুখানুভূতি, অথবা নরকের দুঃখযন্ত্রণা। তাই কবরবাসীরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে তাদের নিজ নিজ কবরে থেকেই। সেখানেই তারা জবাব দেয়, অথবা জবাব দিতে সক্ষম হয় মুনকির-নকির নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য হজরত জিবরাইলের প্রসঙ্গও

টেনে আনা যেতে পারে। তিনি আকাশবাসী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শ নেমে আসতেন পৃথিবীতে। উপস্থিত হতেন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে। আবার কখনো কখনো হাত রাখতেন তাঁর উরুদেশে।

শা'বী তাঁর 'বাহরুল কালামে' লিখেছেন, রূহ সম্পর্কযুক্ত দেহের সাথে। শাস্তি রূহের উপরে হলেও শরীর অনুভব করে তার ব্যথা। যেমন সূর্য আকাশে অবস্থান করলেও তার আলোকে আলোকিত হয় পৃথিবী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে(২২), তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে' (২৩)।

তাফসীরবেত্তাগণ বলেছেন, এখানে 'অবলোকন করবে' অর্থ তারা তখন দেখতে থাকবে তাদের প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্ভোগসম্ভারের প্রতুলতা। আমি বলি, অবিশ্বাসীরা যখন আল্লাহ্ দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে, তখন বিশ্বাসীগণ দেখতে থাকবেন আল্লাহ্-তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন রূপচ্ছটা। কাতাদা বলেছেন, তারা তখন জান্নাতের আরাম কেদারায় বসে দেখতে থাকবে জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত আল্লাহ্র দুশমনদেরকে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে'। একথার অর্থ— জান্নাতের অফুরন্ত সুখসম্ভার সম্ভোগের কারণে তাদের মুখমণ্ডলে ফুটে উঠবে পুলক ও পরিতৃপ্তির চিহ্ন— সজীবতা। এখানে 'দেখতে পাবে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষকে। হাসান বসরী বলেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য-সজীবতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় মুখমণ্ডলে এবং হৃদয়ে অনুভূত হয় প্রশান্তি।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে'। এখানে 'রহীক্ব' অর্থ বিশুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ-শুভ্র, পবিত্র। আর 'মাখতূম' অর্থ মোহর করা। অর্থাৎ পুণ্যবানেরাই ভেঙে ফেলবে ওই সীলমোহর, যা ইতোপূর্বে ছিলো অস্পর্শিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পুণ্যবানেরাই তখন স্বহস্তে সীলমোহর ভেঙে ফেলবে। তারপর পান করবে পবিত্র ও সুস্বাদু মদিরা।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তার মোহর মেশকের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক'। এখানে 'খিতাম' অর্থ ওই মৃত্তিকা যার উপরে সীল করা হয়। অর্থাৎ জান্নাতের পানপাত্রগুলো সীলমোহর করা থাকবে মেশকের দ্বারা এবং তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে সেখানকার মোমসদৃশ মাটিতে। ইবনে জায়েদও এরকম অর্থ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'মোহর মেশকের' অর্থ পানপাত্রের শেষ চুমুক হবে মেশকের ঘ্রাণযুক্ত, আস্বাদ্য। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক বস্তুর শেষাংশকে বলে 'খিতাম'।

'তানাফুস' অর্থ উত্তম কোনোকিছু প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যে প্রতিযোগিতায় থাকে কেবল ভোগের বাসনা, ত্যাগের নয়। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— পার্থিব সুখোপকরণসমূহ অপর্যাপ্ত, অস্থায়ী ও তুচ্ছ। তবুও মানুষ তা লাভ করার জন্য শুরু করে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা। অথচ প্রতিযোগিতা করা উচিত পরকালের সুখোপকরণের জন্য, যা পর্যাপ্ত, পবিত্র ও চিরস্থায়ী।

সন্দেহ ঃ সুখোপকরণ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা তো আসে লোভ থেকে। তাহলে লোভকে কি শরিয়তসম্মত বলা যাবে?

সন্দেহভঞ্জন ঃ পার্থিব বস্তু প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা আসে লোভ থেকে। এমতো প্রতিযোগিতায় যারা অবতীর্ণ হয়, তারা শেষ পর্যন্ত একে অপরের ক্ষতি করেই ছাড়ে। তাই এমতো প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীর অবস্থা তো এরকম নয়। তাই পরকালের কল্যাণপ্রাপ্তির প্রতিযোগিতা সিদ্ধ, বরং অভিপ্রেত। আর এমতো প্রতিযোগিতায় কোনো প্রতিযোগীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একজন পেলে অন্য জন পাবে না, অথবা কম পাবে, এরকম আশংকার কথা এমতোক্ষেত্রে অচিন্তনীয়।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের'। এখানে 'মিযাজু' অর্থ ওই বস্তু, যা মিশ্রিত করা হয় সুরার সঙ্গে। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা যে সুরা পান করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবে, তা হবে 'তাসনীম' মিশ্রিত। 'তাসনীম' শব্দটি এসেছে 'সানাম' থেকে, যার অর্থ উটের কুঁজ। কাতাদা বলেছেন 'তাসনীম' শব্দটি ঊর্ধ্ব অর্থবহ। কাতাদার বক্তব্যানুসরণে বাগবী লিখেছেন, 'তাসনীম' হবে ওই পানীয়, যা বর্ষিত হবে জান্নাতবাসীদের ঘরে, ছাদের দিক থেকে। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিক থেকে। আমি বলি 'তাসনীম' বর্ষিত হবে ঊর্ধ্ব দিক থেকেই। আর জান্নাতের ঊর্ধ্বে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। সুতরাং বুঝতে হবে, তখন আরশ থেকেই বর্ষিত হবে 'তাসনীম'।

এরকমও বলা হয়েছে যে, তখন সুরার প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে ঊর্ধ্বদেশের আবহাওয়ামণ্ডল থেকে। আর সে প্রবাহ দ্বারা পূর্ণ হতে থাকবে কেবল জান্নাতবাসীদের পানপাত্রসমূহ। অর্থাৎ সুরার প্রবাহ পূর্ণ করবে কেবল শূন্য পানপাত্রগুলো। আর সেগুলো পূর্ণ যখন থাকবে, তখন বন্ধ থাকবে ওই প্রবাহ।

জুহাক বলেছেন 'তাসনীম' জান্নাতের সর্বোত্তম শরাবগুলোর অন্যতম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, নৈকট্যভাজনগণের জন্য 'তাসনীম' একটি আদর্শ পানীয়। ওই পানীয়ের সঙ্গে কোনোকিছু মিশ্রিত না করেই তা পান করবেন তাঁরা। আর সাধারণ জান্নাতীগণের পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে দেওয়া হবে 'তাসনীম'।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'এটা একটা প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে'। এখানে দেওয়া হয়েছে 'তাসনীমে'র ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'তাসনীম' নামের অনন্য মদিরা পান করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন কেবল আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যধন্যগণ, যারা নবুয়তের উৎকর্ষতার পূর্ণ অধিকারী। অথবা বলা যায়, যাঁরা এমতো উৎকর্ষ অর্জন করেছেন নবীগণের আত্মিক সহায়তায়। অর্থাৎ সিদ্দীকগণ। বাগবী লিখেছেন, ইউসুফ ইবনে মেহরান বলেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নিকটে জানতে চাওয়া হলো, 'তাসনীম' অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন, এটা একটা অজানা বস্তু। এ ধরনের বস্তু সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কেউই জানে না তাদের চোখের আড়ালে কী গোপন রাখা হয়েছে'।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا
مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ
حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى
الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

r যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদিগকে উপহাস করিত

r এবং উহারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।

r এবং যখন উহাদের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া,

r এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।'

r উহাদিগকে তো তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।

r আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,

r সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে অবলোকন করিয়া।

r কাফিররা উহাদের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আবু জেহেল, ওলীদ, আস— এ সকল দুর্বৃত্তরা তো আম্মার, খাব্বাব, সুহাইব, বেলাল প্রমুখ প্রতিপত্তিহীন বিশ্বাসীকে যখন তখন ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এদের সঙ্গে দেখা হলেই ওই দুরাচারেরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাদের সতীর্থদের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। কটাক্ষপাত করে। আর তারা এমতো অপকর্ম করার পর তাদের সঙ্গী-সাথীদের কাছে ফিরে যায় অতি উৎফুল্ল হয়ে। যেনো সরল বিশ্বাসী ওই সকল মুসলমানকে অপমান করাই এক বিরাট বিজয়। আবার তাদের দেখলে প্রায়শ প্রচণ্ড হিংসাবশত তারা মন্তব্য করে, দ্যাখো, দ্যাখো, এরাই মোহাম্মদের অনুসারী। এরা তো পথভ্রষ্ট। না হলে কী এরা বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করে। পরলোকের অসীম সুখের আশায় পরিত্যাগ করে পার্থিব ভোগ-সম্ভোগ।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন; আবু জেহেল ও তার অনুসারীরা কতো অজ্ঞ এবং কতো অধিক সীমালংঘনকারী। তাদেরকে তো আমি কারো পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করিনি। এরকম মন্তব্যও তো করতে বলিনি যে, কে পথভ্রষ্ট এবং কে তা নয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফেরদেরকে (৩৪) সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে (৩৫)। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেলো তো' (৩৬)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনে রাখুন, তাদের ঔদ্ধত্যের যথাযোগ্য প্রতিফল তারা পাবেই। পরকালে বেহেশতের সুখাসনে বসে আজকের এই নিগৃহীত মুসলমানেরাই অবলোকন করবে তাদেরকে দোজখাভ্যন্তরে শাস্তিভোগরত অবস্থায়। এভাবেই তারা তখন দিবে তাদের এখানকার উপহাসের উত্তর। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, অথবা দোজখীদেরকে লক্ষ্য করে তারা তখন বলবে, দেখলে তো, বুঝলে তো যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি কীরূপ সুনিশ্চিত।

আবু সালেহ বলেছেন, তখনকার বাস্তবচিত্র হবে এরকম— হঠাৎ করে খুলে দেওয়া হবে দোজখের দরোজা। দোজখবাসীদেরকে বলা হবে, যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। একথা শোনার সাথে সাথে তারা পড়িমড়ি করে ছুটতে থাকবে দরোজার দিকে। কিন্তু দরোজার কাছাকাছি পৌঁছার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হবে দরোজা। নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে দোজখীরা। পুনরায় যখন দরোজা খুলে দেওয়া হবে, তখন পুনরায় তারা চেষ্টা করবে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু এবারও দরোজা হয়ে যাবে বন্ধ। এভাবে বার বার তাদের সঙ্গে করা হবে উপহাস। জান্নাতবাসীরা তাদের এরকম দুরবস্থা দেখে মৃদু মৃদু হাসবে। যেমন ওই দোজখীরা তাদেরকে দেখে হাসতো পৃথিবীতে।

হজরত কা'ব বলেছেন, স্বর্গ-নরকের মধ্যে থাকবে কতকগুলো জানালা। জান্নাতবাসীরা যখন তাদের পৃথিবীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী শত্রুদেরকে দেখতে চাইবে তখন খুলে দেওয়া হবে জানালাগুলো। তারা তখন দেখতে পাবে, নরকবাসীদের সঙ্গে পরিহাস করার দৃশ্য। তখন তারা আর না হেসে পারবে না।

হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদেরকে দেখে যারা পৃথিবীতে হাস্য-কৌতুক করে, তাদেরকে জান্নাতের দরোজা খুলে দিয়ে ডাকা হবে, এসো। তারা অগ্রসর হতে থাকবে। দরোজার কাছাকাছি পৌঁছতেই দরোজা বন্ধ করে দেওয়া হবে সশব্দে। এদৃশ্য দেখে নিরাশ হয়ে পড়বে তারা। আশাধারী হবে পুনরায় দরোজা উন্মুক্ত করা হলে। আবারও তারা পা বাড়াবে। কিন্তু শেষে আগের মতোই বন্ধ করে দেওয়া হবে প্রবেশপথ। পুনঃপুনঃ এভাবে আশাহত হতে হতে একসময় হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ। তখন দরোজা খোলা দেখলেও তারা আর সেদিকে পা বাড়াবে না।

সূরা ইনশিক্বাক্ব

এই সূরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ১ এবং আয়াতের সংখ্যা ২৫।

সূরা ইনশিক্বাক্ব ঃ আয়াত ১— ১৫

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

اِذَا السَّمَآءُ انۡشَقَّتۡ ۙ﴿۱﴾ وَ اَذِنَتۡ لِرَبِّہَا وَ حُقَّتۡ ۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡ ۙ﴿۳﴾ وَ اَلۡقَتۡ مَا فِیۡہَا وَ تَخَلَّتۡ ۙ﴿۴﴾ وَ اَذِنَتۡ لِرَبِّہَا وَ حُقَّتۡ ؕ﴿۵﴾ یٰۤاَیُّہَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّکَ کَادِحٌ اِلٰی رَبِّکَ کَدۡحًا فَمُلٰقِیۡہِ ۚ﴿۶﴾ فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ کِتٰبَہٗ بِیَمِیۡنِہٖ ۙ﴿۷﴾ فَسَوۡفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیۡرًا ۙ﴿۸﴾ وَّ یَنۡقَلِبُ اِلٰۤی اَہۡلِہٖ مَسۡرُوۡرًا ؕ﴿۹﴾ وَ اَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ کِتٰبَہٗ وَرَآءَ ظَہۡرِہٖ ۙ﴿۱۰﴾ فَسَوۡفَ یَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ یَصۡلٰی سَعِیۡرًا ؕ﴿۱۲﴾ اِنَّہٗ کَانَ فِیۡۤ اَہۡلِہٖ مَسۡرُوۡرًا ؕ﴿۱۳﴾ اِنَّہٗ ظَنَّ اَنۡ لَّنۡ یَّحُوۡرَ ۚۛ﴿۱۴﴾ بَلٰۤی ۚۛ اِنَّ رَبَّہٗ کَانَ بِہٖ بَصِیۡرًا ؕ﴿۱۵﴾

r যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

r ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।

r এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে।

r ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে।

r এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে ইহাই তাহার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই।

r হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিবে।

r যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে

r তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে

r এবং সে তাহার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে;

r এবং যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হইতে দেওয়া হইবে

r সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে;

r এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে;

r সে তো তাহার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল,

r সে তো ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;

r নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে; তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যখন মহাপ্রলয় সমাগত হবে, তখন আল্লাহ্ যেভাবে চান, সেভাবে আকাশ ভেঙে পড়বে। আকাশের জন্য তাঁর আদেশ পালন করাই সঙ্গত, কেননা আল্লাহ্ই তার সৃজয়িতা। আর পৃথিবীকে তখন করা হবে অধিকতর বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত।

মুকাতিল বলেছেন, চামড়া যেমন টেনে সম্প্রসারিত করা হয়, তেমনি করে তখন টেনে প্রসারিত করা হবে পৃথিবীকে। করা হবে সম্পূর্ণ সমতল। পাহাড়-পর্বত, প্রাসাদ অট্টালিকা উঁচু-নিচু কোনো কিছুই থাকবে না। হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে পৃথিবীকে এমনভাবে টেনে সমতলিত ও সম্প্রসারিত করা হবে, যেমনভাবে টেনে টান টান করা হয় চামড়াকে। তারপর সেখানে সমবেত করা হবে সকল মানুষকে।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত জাবের থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ভূমিকে টেনে প্রসারিত করা হবে, যেমন সম্প্রসারিত করা হয় চামড়া। তবুও মানুষ সেখানে কোনোক্রমে পাবে কেবল পা রাখার মতো জায়গা। প্রথমে ডাকা হবে আমাকে। আমি সেজদাবনত হবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে আবেদন জানানোর। জিবরাইল দাঁড়িয়ে থাকবে আরশের দক্ষিণ প্রান্তে। আল্লাহ্র শপথ! জিবরাইল দর্শন করবে আল্লাহ্পাককে। ইতোপূর্বে আর কখনো সে দেখেনি। আমি নিবেদন করবো, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! এই জিবরাইল আমাকে বলতো, তাকে আমার কাছে প্রেরণ করতে তুমিই। জিবরাইল কথা বলবে না। আমিও হয়ে যাবো নির্বাক। আদেশ ঘোষিত হবে, প্রার্থনা করো। আমি প্রার্থনা করবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তোমার দাসেরা সকলেই সমবেত হয়েছে। তিনি বলবেন, জিবরাইল ঠিকই বলেছে। এবার তুমি শাফায়াত করো। অনুমতি দেওয়া হলো। এখন তুমি অধিষ্ঠিত রয়েছ 'মাকামে মাহমুদে' (শাফায়াতের অধিষ্ঠানে)।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা আছে, তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে '। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে পৃথিবী তার ভিতর থেকে বের করে দিবে সকল মৃত লাশ এবং সকল খনিজ সম্পদ। সবকিছুকে এভাবে উগলে দিয়ে ভার মুক্ত হবে সে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে। এটাই তার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই'। একথার অর্থ— পৃথিবী তখন আল্লাহ্‌র এমতো নির্দেশ তো পালন করবেই। কেননা এটা তার কর্তব্য। আর তখন তোমরাও উঠে আসবে তোমাদের আপন আপন সমাধি থেকে।

আবুল কাসেম খাত্তালী তাঁর 'দীবাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রতিফল দিবসে সর্বপ্রথম ভূমি বিদীর্ণ করে পুনরুত্থিত হবো আমি। কিন্তু আমি বসে থাকবো আমার সমাধিতেই। আমার সম্মুখে খুলে দেওয়া হবে সাত আকাশের দরজা। দৃষ্টিগোচর হবে সাতটি আকাশ। এর পর খুলে দেওয়া হবে সাত তবক জমিনের দরজা। দেখতে পাবো নিম্নতম পাতাল। এরপর খুলে দেওয়া হবে দক্ষিণ প্রান্তের একটি তোরণ। সেদিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাবো জান্নাত। দৃষ্টিগোচর হবে আমার সঙ্গী-সাথীদের আবাসস্থলগুলোও। অকস্মাৎ আলোড়িত হবে পৃথিবী। আমি জিজ্ঞেস করবো, কী হলো তোমার? পৃথিবী বলবে, আমার প্রভুপালক আমাকে আদেশ করেছেন, আমার অভ্যন্তরের সকলকিছু উগলে ফেলে দিয়ে এখন আমাকে ভারমুক্ত হতে হবে, হতে হবে আগের মতো, মানবজাতি পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে যেমন ছিলাম। তখনকার অবস্থার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এখানকার ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াতে।

ইবনে মুনজির তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মাটি তখন উগলে দিবে তার ভিতরের স্বর্ণস্তম্ভগুলো। অর্থাৎ সকল গুপ্ত ধন তখন বেরিয়ে আসবে বাইরে। আতীয়া থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতেম ও মুজাহিদ সূত্রে ফারইয়াবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পৃথিবী বাইরে নিক্ষেপ করবে তার অভ্যন্তরস্থিত মৃত দেহগুলোকে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাকো, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে'। এখানে 'হে মানুষ' সম্বোধন করে বুঝানো হয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষকে। এখানকার 'কাদিহুন' অর্থ কঠোর সাধনা, ভালো-মন্দ সকল কাজে এমন অধ্যবসায়, যার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কর্তার উপরেও। আর 'ইলা রব্বিকা কাদ্‌হান' অর্থ তোমার প্রভুপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য হবার সাধনায় তোমাকে নিয়োজিত থাকতে হবে আমৃত্যু। শেষে তুমি পাবে তোমার কাংখিত ফল— আল্লাহ্‌র দীদার। 'ফামুলাক্বীহ্' অর্থ এখানে— ফল লাভ করবে। অর্থাৎ পরিশেষে তুমি পাবে তোমার সাধনার যথোপযুক্ত প্রতিফল। অথবা এখানকার 'তাঁর' সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— সাধনার উপযুক্ত পুরস্কার হিসেবে তুমি তখন পাবে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত। কিংবা সম্বন্ধপদটি এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাক্ষাত ঘটবে তোমার হিসাব-কিতাবের সঙ্গে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে (৭) তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে (৮) এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে' (৯)। বলাবাহুল্য, এরকম ঘটবে পুণ্যবান বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে, পাপী বিশ্বাসীগণের অবস্থা হবে ভিন্ন। তাদের কথা বলা হয়েছে পরে।

ইবনে আবী মুলাইকা সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা কোনো বিষয় বুঝতে অসমর্থ হলে সে সম্পর্কে রসুল স.কে প্রশ্ন করতেন। একবার রসুল স. বললেন, মহাবিচারের দিবসে যার হিসাব বুঝে নেওয়া হবে, তাকে অবশ্যই দেওয়া হবে শাস্তি। জননী বললেন, তা কেনো? আল্লাহ্ কি বলেননি 'তার হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে সহজে'। রসুল স. বললেন, এই আয়াতে যে হিসাবের কথা বলা হয়েছে, তা হবে নামমাত্র। কিন্তু প্রকৃতই যার হিসাব বুঝে নেওয়া হবে, সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! 'হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে' কথাটির অর্থ কী? তিনি স. বললেন, কেবল দেখা হবে আমলনামা। পরক্ষণেই দেওয়া হবে ক্ষমার ঘোষণা। কিন্তু যার হিসাব নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝে নেওয়া হবে, সে নিষ্কৃতি পাবে না কিছুতেই।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎ দিক থেকে দেওয়া হবে (১০) সে অবশ্য তার ধ্বংস আহ্বান করবে (১১); এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে' (১২)।

বায়হাকী লিখেছেন, পৃষ্ঠের পশ্চাৎ দিক থেকে আমলনামা দেওয়ার ব্যাপারটিকে মুজাহিদ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— পাপিষ্ঠদের বাম হাত নিয়ে যাওয়া হবে তাদের পিঠের পশ্চাতে। তারপর ওই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদের আমলনামা। ইবনে সা'দ বলেছেন, তাদের বাম হাত তাদেরই বক্ষভেদ করে নিয়ে যাওয়া হবে পিঠের দিকে। তারপর ওই হাতে দেওয়া হবে তাদের আমলনামা।

'ইয়াদঊ' ছুবূরা' অর্থ ধ্বংস আহবান করবে। অর্থাৎ বাম হাতে আমলনামা পেয়েই সে বুঝবে তার আর কোনো নিস্তার নেই। তখন সে নিজেই ডাকতে থাকবে মৃত্যুকে একথা ভেবে যে, এরকম দুর্গতির চেয়ে মৃত্যুও ভালো। আর 'ওয়া ইয়াস্‌লা সায়ীরা' অর্থ এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তখন সে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে নরকের লেলিহান আগুনে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সে তো তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিলো (১৩) সে তো ভাবতো যে, সে কখনোই ফিরে যাবে না (১৪) নিশ্চয়ই ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন' (১৫)। প্রথম বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ধ্বংস আহবান করবে' কথাটির কারণ। অর্থাৎ পৃথিবীতে সে পরিবার-পরিজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মহা আনন্দে দিন কাটাতো। পরকালের কথা তখন মনেও পড়তো না। এ সকল কথা মনে হওয়াতেই সে তখন আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে আহ্বান জানাবে মৃত্যুকে। ভাববে, মৃত্যুই এর চেয়ে ভালো।

‘ইন্নাহু জন্না আল্লাইঁ ইয়াহূরা’ অর্থ সেতো ভাবতো, সে কখনো ফিরে যাবে না। অর্থাৎ একথাও সে তখন মনে মনে বিশ্বাস করতো যে, পরকাল-হিসাব-নিকাশ হয়তো হবেই না। সুতরাং আর চিন্তা-ভাবনা কিসের। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহের মধ্যে তাহলে ছেদই বা টানতে হবে কেনো?

‘বালা’ অর্থ হ্যাঁ, নিশ্চয়। শব্দটির মাধ্যমে এখানে দেওয়া হয়েছে নেতিবাচক ধারণার ইতিবাচক উত্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকটে সকলকে একদিন ফিরে যেতে হবেই। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়। আর ‘ইন্না রব্বাহু কানা বিহী বাসীরা’ অর্থ তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ বান্দার কোনো কর্মই আল্লাহ্র দৃষ্টি বহির্ভূত নয়। সুতরাং তাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত কর্মফল ভোগ করতে হবেই— চিরস্বস্তি, অথবা চিরশাস্তি।

সূরা ইনশিক্বাক্ব ঃ আয়াত ১৬— ২৫

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

q আমি শপথ করি অস্তরাগের,
q এবং রাত্রির আর উহা যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার,
q এবং শপথ চন্দ্রের, যখন ইহা পূর্ণ হয়;
q নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।
q সুতরাং উহাদের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না
q এবং উহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজ্দা করে না?
q পরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।
q এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবগত।
q সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও;
q কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

এখানকার প্রথমোক্ত তিন আয়াতে (১৬, ১৭, ১৮) আল্লাহ্পাক শপথ করেছেন অস্তরাগ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি ও পূর্ণ চন্দ্রের। তার পরের আয়াতে (১৯) বলেছেন ‘নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে’।

এখানে ‘শাফাক্ব’ অর্থ অস্তরাগ, সূর্যাস্তশেষে পশ্চিমাকাশের লালিমা অপসারণ হওয়ার পরের শুভ্র আভা। আর ‘মা ওয়াসাক্ব’ অর্থ ওই সকল গৃহপালিত পশু, যেগুলো দিনভর চরে ফিরে সন্ধ্যাগমে ফিরে আসে স্বগৃহে। ‘লাইল’ অর্থ রাত।

‘মা ওয়াসাক্ব’ অর্থ রাত যেগুলোকে আবৃত করে। মুজাহিদের উক্তির প্রতিধ্বনি করে মনসুর বলেছেন, রাত্রির নিবিড় আঁধার যে সকল বস্তুকে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, সেগুলোকে বলে ‘মা ওয়াসাক্ব’। সাঈদ ইবনে যোবায়ের শব্দটির অর্থ করেছেন— রাতে যা কিছু করা হয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শপথ রাতের তমসাবৃত বস্তুনিচয়ের, অথবা নিশীথের কৃতকর্মসমূহের।

‘ক্বমর’ অর্থ চন্দ্র। ‘ইজাত্ তাসাক্ব’ অর্থ যখন তা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ শপথ ওই চন্দ্রের, যখন পূর্ণ হয় ষোল কলায়। কিংবা— শপথ চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত রাত্রির।

‘লাতার্‌কাবুন্‌না ত্ববাক্বান আ’ন ত্ববাক্ব’ অর্থ নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে উন্নতি করবে। এখানকার ‘তারকাবুন্‌না’ শব্দটিকে যদি ধরে নেওয়া হয় মধ্যম পুরুষের পুংলিঙ্গের একবচন তাহলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তুমি ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বারোহণ করবে। সম্বোধনটি করা হয়েছে রসুল স.কে। অর্থাৎ হে আমার রসুল! শুভসংবাদ শ্রবণ করুন, আপনি উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বারোহণ করতেই থাকবেন। শা’বী ও মুজাহিদের মন্তব্য অনুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি উল্লঙ্ঘন করবেন আকাশের পর আকাশ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে’। এমতো অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হয়, বাক্যটিতে ঘোষিত হয়েছে রসুল স. এর মেরাজের শুভসংবাদ। উল্লেখ্য, মেরাজ সম্পর্কিত হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সুরা ইস্‌রা ও সুরা নাজ্‌মের তাফসীরে।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে ধাপে ধাপে আরোহণ করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের পথের স্তরসমূহ অতিক্রম করার কথা। স্বসূত্রে বোখারী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘ধাপে ধাপে’ অর্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়। তিনি আরো বলেছেন, এখানে ‘ধাপে ধাপে আরোহণ করবে’ কথাটি বলা হয়েছে রসুল স.কে লক্ষ্য করে।

‘তার্‌কাবুন্‌না’ শব্দটিকে যদি এখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচক একবচন ধরে নেওয়া হয়, তবে এর অর্থ হবে আকাশারোহণ। আর ‘ত্ববাক্বান’ এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— স্তরান্তর, অবস্থান্তর। অর্থাৎ আকাশ এক অবস্থার পর ধারণ করবে অন্য অবস্থা। এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তখন ফাটল সৃষ্টি হবে আকাশে। ফলে তা ভেঙে ভেঙে পড়বে। শেষে ধারণ করবে লোহিত বর্ণ। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তখন আকাশ ধারণ করবে বিভিন্ন রঙ, কখনো লাল, কখনো গোলাপী। হয়ে পড়বে শিথিল। এক অবস্থার পর ধারণ করবে আর এক অবস্থা।

এখানে 'তার্‌কাবুন্‌না' শব্দটিকে লেখা হয়েছে 'বা' অক্ষরে পেশযুক্ত করে বহুবচনীয় শব্দরূপে (একারণেই বঙ্গানুবাদে তুমি না লিখে লেখা হয়েছে তোমরা)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মানব জাতি! প্রতিফল দিবসের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ঘটবে তোমাদের অবস্থান্তর। রূপান্তরিত হবে তোমাদের আকার-আকৃতি।

'ধাপে ধাপে' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুকাতিল বলেছেন, মৃত্যুর পর ঘটবে পুনরুত্থান। আতা বলেছেন কথাটির অর্থ জাগতিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা— কখনো ধনী, কখনো নির্ধন। আমর ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ধাপে ধাপে' অর্থ পর্যায়ক্রমে— বিপদ, স্বাচ্ছন্দ্য, মৃত্যু, পুনরুত্থান, মহাসমাবেশস্থলে গমন। ইকরামা কথাটির অর্থ করেছেন— বয়োক্রম, শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য। আবু উবায়দা অর্থ করেছেন— তোমরাও অতীতায়িত জাতিগুলোর মতো ক্রমশ নিমজ্জিত হবে প্রথাসর্বস্বতায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরাও এক সময় বিগত যুগের সম্প্রদায়গুলোর অনুসরণ করবে পায়ে পায়ে। তারা যদি প্রবেশ করে কোনো জানোয়ারের গর্তে, তবে তোমরাও তাই করবে। তারা যদি পথের ধারে স্ত্রীসহবাস করে, তোমরাও তা করবে। বোখারীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের কী হলো যে, তারা ইমান আনে না'? প্রশ্নটি একই সঙ্গে বিস্ময়সূচক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। ইতোপূর্বে উল্লেখিত পুণ্যবান ও পাপীদের প্রতিফল প্রদানের বিবরণসম্বলিত আয়াতগুলোর সঙ্গে রয়েছে এর বক্তব্যগত যোগাযোগ। মাঝখানের শপথপ্রকাশক আয়াতগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। আমি বলি, এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'ধাপে ধাপে আরোহণ করবে' কথাটির সাথে। কারণ অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় জানা যায় অবস্থা পরিবর্তনকারীর। প্রকাশিত হয় তাঁর সামর্থ্য ও শক্তিমত্তাও। এর পরেও তাঁকে মান্য না করার কি কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকে?

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের নিকট কোরআন পাঠ করা হলে তারা সেজদা করে না'? বাক্যটি পাঠ করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন পাঠ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সেজদা করতে হবে। কেননা কোরআন পাঠ শুনে সেজদা না করার জন্য এখানে ঘোষিত হয়েছে নিন্দাবাদ। অথচ ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে সেজদা করা ওয়াজিব হয় কেবল সেজদার আয়াত পাঠ করলে বা শুনলে। সুতরাং বুঝতে হবে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'সেজদা' অর্থ বিনয়াবনত হওয়া। অর্থাৎ বিনয় প্রকাশ করাকেই এখানে রূপকার্থে বলা হয়েছে সেজদা। অর্থাৎ কোরআনের প্রতিটি আয়াত শুনতে হবে আন্তরিক বিনয় সহকারে। অথবা 'সেজদা' অর্থ এখানে তেলাওয়াতের

সেজদা। ‘আল কুরআন’ এর আলিফ লাম এখানে সীমিতার্থক। অর্থাৎ যখন পাঠ করা হয় সেজদার আয়াত তখন তারা সেজদা করে না কেনো? ইমাম আবু হানিফার মতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব। শেষোক্ত মর্মানুসারে এই আয়াতই তাঁর অভিমতের পক্ষের প্রমাণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতকে তিনি সেজদার আয়াত বলে স্বীকার করেননি। কেননা বিষয়টি বিতর্কিত।

ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর সহচরদ্বয় তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায়, বলে, আক্ষেপ! মানুষকে সেজদার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা সে আদেশ মেনে অধিকারী হয়েছে জান্নাতের। আমাকেও তো এরকম আদেশই দেওয়া হয়েছিলো। আমি তা অমান্য করে হয়ে গিয়েছি জাহান্নামী।

প্রমাণ গ্রহণের উপাত্ত হলো— বক্তা ও শ্রোতা যদি জ্ঞানবান হয় এবং ওই বক্তার কথা শুনে ওই শ্রোতা কোনো প্রতিবাদ না করে, তবে বুঝতে হবে, বক্তার বিবরণ সঠিক। বর্ণিত হাদিসটিতে রসুল স. শয়তানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর তার ওই উক্তিটির সমালোচনাও তিনি স. করেননি। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে, তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব। ইবনে আবী শায়বা তাঁর ‘আলমুসান্নাফ’ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি সেজদার আয়াত শুনবে, তার উপরে সেজদা ওয়াজিব হবে।

জমহুর ফেকাহশাস্ত্রজ্ঞ ও হাদিসবেত্তাগণ বলেন, তেলাওয়াতের সেজদা সুন্নত। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই হাদিসগুলো— হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত বলেছেন, আমি রসুল স. এর সম্মুখে সুরা নজ্‌ম পাঠ করেছি, কিন্তু তিনি স. সেজদা করেননি। বোখারী, মুসলিম, দারাকুতনী, সুনান রচয়িতাবৃন্দ। দারাকুতনীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— আমাদের কেউই তখন সেজদা করেননি। হানাফীগণ বলেন, সেজদা ওয়াজিব নয়— এই হাদিস দ্বারা তা প্রমাণ করা যায় না। কেননা এটা একটি ঘটনা মাত্র। এরকমও তো হতে পারে যে, যখন সুরা নজ্‌ম তেলাওয়াত করা হয়েছিলো, তখন সেজদা করা ছিলো মাকরূহ্। কিংবা বলা যেতে পারে, যারা সেজদা করবে, তারা ছিলেন তখন ওজুবিহীন। বা এটাই হয়তো তখন প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিলো যে, সাথে সাথেই সেজদা করা ওয়াজিব নয়।

আমি বলি, সেজদা না করার পক্ষে যদি উল্লেখিত কারণগুলোর মধ্যে কোনো একটি কারণও থাকতো, তবে তা উল্লেখও করা হতো। তাছাড়া হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব কৃর্তক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, জুমআর দিন তিনি মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় একটি সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। পরক্ষণে মিম্বার থেকে নেমে সেজদা করলেন। জনগণও সেজদা করলো। এরপর আর এক জুমআর দিন তিনি খুতবা দান কালে একটি সেজদার আয়াত তেলাওয়াত

করলেন। জনগণ সেজদা করার প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু তিনি মিম্বর থেকে নামলেন না। বললেন, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। তেলাওয়াতের সেজদাকে ফরজ করে দেননি। কেউ ইচ্ছা করলে সেজদা করবে। ইচ্ছা না করলে করবে না।

শায়েখ ইবনে হাজার মক্কী বলেছেন, মাযানীর ধারণা, হাদিসটি ইমাম বোখারীর তালিকাত পর্যায়ের। কিন্তু মন্তব্যটি অনুমানপ্রসূত। বায়হাকী এবং আবু নাঈমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, হাদিসটি ঐকমত্যের বর্ণনাগত। আর ওই সমাবেশের কেউ হজরত ওমরের কথার কোনো প্রতিবাদও করেননি। আর শয়তানের উক্তি ছিলো মানুষকে সেজদার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সেজদা নিশ্চয় তেলাওয়াতের সেজদা নয়। হজরত আদমকে সেজদা করার যে নির্দেশ শয়তানকে দেওয়া হয়েছিলো, সে সেজদাও তেলাওয়াতের সেজদা ছিলো না।

একটি বিধান ঃ সুরা মুফাস্সালাতের তেলাওয়াতের সেজদা বিতর্কিত। জমহুরের অভিমতে তেলাওয়াতের সেজদা রয়েছে সুরা নাজ্বম, সুরা ইনশিক্বাক্ব ও সুরা আলাক্বে। এই অভিমতটিও অবিতর্কিত নয়। সুরা হজের দু'টি সেজদা এবং সুরা সফের সেজদাও এধরনের বিরুদ্ধমতপূর্ণ। জমহুরের মতে কোরআন মজীদে তেলাওয়াতের সেজদা রয়েছে ১৪টি অথবা ১৫টি। ইমাম মালেক বলেছেন, সুরা মুফাস্সালাতে সেজদার আয়াত নেই। একথার প্রমাণ হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. হিজরতের পরে সুরা মুফাস্সালাতের কোথাও সেজদা করেননি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আবু কুদামা হারেছ ইবনে উবায়েদ সূত্রে আবু দাউদ ও আবু আলী ইবনে সাকান, তিনি মাতার থেকে, তিনি ইকরামা থেকে। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, আবু কুদামা ও মাতার দু'জনই বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইমাম আহমদের মতে আবু কুদামা বিতর্কিত। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে একজন হীন প্রকৃতির লোক। তার বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ হওয়ার অযোগ্য।

তাহাবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, মুফাস্সালাত সুরায় সেজদার আয়াত আছে কি নেই, সে সম্পর্কে একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, নেই। আর আমাদের প্রমাণ হচ্ছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন, রসুল স. সুরা ইনশিক্বাক্ব ও সুরা আলাক্ব পড়ে সেজদা করেননি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কেবল মুসলিম। তবে ভিন্ন সূত্রে বোখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন, আবু নাফে বলেছেন, আমি একবার হজরত আবু হোরায়রার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ইশার নামাজ আদায় করলাম। তিনি সুরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করলেন। সেজদাও করলেন। আমি পরে বললাম, আপনি সেজদা করলেন যে। তিনি বললেন, আমি তো এরকম করেছি রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পাঠকালেও। তাই আমরণ এরকমই করতে থাকবো। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ষষ্ঠ হিজরীতে। এ সম্পর্কে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সুরা নাজ্বম পাঠ করে সেজদা করেছিলেন। তাঁর সাথে সেজদা করেছিলো পৌত্তলিকেরাও। তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, রসুল স. তেলাওয়াতের সেজদা করতেন কোরআন মজীদের পনরোটি স্থানে— সুরা মুফাস্সালাতের তিনটি এবং সুরা হজের দুইটি সেজদাও তার অন্তর্ভূত। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, হাকেম। আল্লামা মুনজিরী এবং ইমাম নববী বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট। কিন্তু শায়েখ আবদুল হক বলেছেন, শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। আরো বলেছেন, এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মোহাম্মদ ইবনে রাশেদকে আলেমগণ সাব্যস্ত করেছেন মিথ্যাবাদী বলে। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং লক্ষ্য করেছি, রসুল স. স্বয়ং 'ইজাস্ সামাউন শাক্বক্বাত' সুরাটি পড়ে সেজদা করেছেন অন্ততপক্ষে দশবার।

একটি বিধান ঃ তেলাওয়াতে সেজদার পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের জন্য সেজদা ওয়াজিব, শ্রবণ ইচ্ছাকৃত হোক, অথবা হোক অনিচ্ছাকৃত। কেননা এরকম আয়াতে নির্দেশ আসে সাধারণভাবে, কোনো প্রকার সীমারেখা ব্যতিরেকেই। আর সেজদা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে প্রকাশ করা হয় নিন্দাবাদও। অবশ্য জমহুর বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে সেজদার আয়াত শুনলে সেজদা করা ওয়াজিব হয় না। তাঁরা তাঁদের এমতো অভিমতের পক্ষে উপস্থাপন করেন একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওসমান একবার কোরআন পাঠরত হজরত আমর ইবনে আসের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। যখন সেজদার আয়াত এলো, তখন পাঠ করার পর হজরত আমর ভাবলেন, হজরত ওসমানও হয়তো এখন সেজদা করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। বরং বলতে বলতে গেলেন, সেজদা করতে হয় তাকে, যে ইচ্ছা করে তেলাওয়াত শোনে। আবদুর রাজ্জাক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুয়াম্মার থেকে, তিনি জুহুরী থেকে এবং তিনি ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে। বোখারী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'তালীকাত' নামক পুস্তকে।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ওসমান বলেছেন, সেজদা তার জন্য, যে শোনার জন্য উপবিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেজদা করতে হবে তাকেই, যে কোরআন শোনার জন্য বসে থাকে। বায়হাকী, ইবনে আবী শাইবা।

একটি বিধান ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, শ্রোতার জন্য সেজদা করা ওয়াজিব, পাঠক সেজদা না করলেও। যেহেতু নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। আর পাঠকের সেজদা করার শর্তও এখানে নেই। জমহুর বলেন, যতোক্ষণ পাঠক সেজদা করবে না, ততোক্ষণ শ্রোতার উপরে সেজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা জায়েদ ইবনে আসলামের বর্ণনায় এসেছে, একবার জনৈক ব্যক্তি রসুল স. এর সম্মুখে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। রসুল স.ও তাঁর সাথে সেজদা করলেন। এরপর আর একজন পাঠকও সেজদার আয়াত পড়লেন। কিন্তু তিনি স. সেজদা করলেন না। লোকটি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তার তেলাওয়াত শুনে সেজদা করলেন, অথচ আমার তেলাওয়াত শুনে সেজদা করলেন না যে। তিনি স. বললেন, এক্ষেত্রে তুমিই তো ইমাম। তুমি সেজদা

করলেই তো আমি সেজদা করতে পারতাম। জায়েদ ইবনে আসলামের এই হাদিসটি অপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। কিন্তু জায়েদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী আতা ইবনে ইয়াসারের মাধ্যমে। তাতে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই। সাহাবীর নামোল্লেখ ব্যতিরেকে ইমাম শাফেয়ীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বায়হাকী লিখেছেন, হাদিসটি জুহুরী বর্ণনা করেছেন কোররা থেকে এবং কোররা হজরত আবু হোরায়রা থেকে। কিন্তু কোররা বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। বোখারী আবার প্রলম্বিত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে।

একটি বিধান ঃ নীরব নামাজে সরবে সেজদার আয়াত পাঠ করা মকরূহ্। এই বিধানটি প্রযোজ্য একা একা নামাজ পাঠকারীর ক্ষেত্রেও। সরব নামাজের ক্ষেত্রে এমতো বিধান প্রয়োগযোগ্য নয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, ইমাম যদি নীরবে সেজদার আয়াত পাঠ করে, তবে তাকে সেজদা করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই সেজদা মকরূহ্ নয়। কেননা হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. জোহরের নামাজের মধ্যে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করেছিলেন। সাহাবীগণ তাঁর এই আমলটির অনুসরণ করেছিলেন।

বিধান ঃ ইমাম সেজদা করলে মুক্তাদিদেরকেও সেজদা করা উচিত। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতানুসারে যদিও তেলাওয়াতের সেজদা সুন্নত, তৎসত্ত্বেও এমতো ক্ষেত্রে তিনিও একমত।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'পরন্তু কাফেরগণ তাকে অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেজদার আয়াত শুনে সেজদা তো করেই না, উপরন্তু আল্লাহ্র বাণী বলে অস্বীকার করে সমগ্র কোরআনকে।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এবং তারা যা পোষণ করে, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত'। একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মনে মনে আল্লাহ্, রসুল এবং কোরআনের প্রতি যে কতো তীব্র বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবহিত। কেননা তিনি অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'ফাবাশ্‌শিরহুম বিআ'জাবিন আ'লীম' (সুতরাং তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও)। এখানে 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর 'বাশারাত' অর্থ সুসংবাদ। অর্থাৎ সুসংবাদের নিমিত্ত হলো তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যান। উল্লেখ্য, 'সুসংবাদ' বলা হয়েছে এখানে বিদ্রূপার্থে। অন্যথায় মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ তো কখনো সুসংবাদ হতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'। এখানকার 'ইল্‌লা' (ব্যতীত) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'লাকিন্না' (কিন্তু) অর্থে। আর এই ব্যতিক্রমীটি এখানে সংযুক্তক, অথবা বিযুক্তক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! শাস্তির

'সুসংবাদ' আপনি তাদেরকে দিবনে না— যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ। কেননা তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকালীন সুখ। অথবা— তারা পুরস্কার পাবে আশাতিরিক্ত। এটাই ব্যতিক্রমীটির নিমিত্ত।

সূরা বুরূজ

এই সুরাখানিও মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১টি রুকু এবং ২২টি আয়াত।

সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ১ ¾ ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ﴿۱﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ﴿۲﴾ وَشَاهِدٍ وَّ
مَشْهُوْدٍ ؕ﴿۳﴾ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ﴿۴﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ﴿۵﴾ اِذْ
هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ﴿۶﴾ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ﴿۷﴾
وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۸﴾ الَّذِيْ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ؕ﴿۹﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ؕ﴿۱۰﴾

q শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের,

q এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

q শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—

q ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—

q ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি,

q যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল;

q এবং উহারা মু'মিনদের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

q উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে—

r আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার; আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

r যাহারা বিশ্বাসী নরনারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াস্‌সামাই জাতিল বুরূজ'। এর অর্থ শপথ বুরূজবিশিষ্ট আকাশের। এখানকার 'বুরূজ' শব্দটি বহুবচন 'বুর্‌জ' এর। এর অর্থ প্রকাশ পাওয়া, দুর্গ, প্রাসাদ। যেমন বলা হয় 'তাবাররাজার মারআতু' (রমণীটি প্রকাশ পেয়েছে)। অর্থাৎ সে বেপর্দা হয়েছে। লোকচক্ষুর সম্মুখে সমুদ্ভাসিত বলে দুর্গকেও বলা হয় 'বুরূজ'।

আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, আকাশে এমন কিছু স্থান রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় 'বরজ'। আতিয়া বলেছেন, বরজ বলে প্রহরী পরিবেষ্টিত গৃহকে। মেরাজের ঘটনার এক স্থানে বলা হয়েছে—এর পর আমাকে উত্থিত করা হলো সপ্তমাকাশে অবস্থিত বায়তুল মামুর পর্যন্ত, যা কাবাগৃহের ঠিক উপরে। বোখারী, মুসলিম। সুরা তাত্বফীতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, সপ্তম আকাশে রয়েছে একটি শাদা প্রাসাদ। ওই প্রাসাদে একত্র করা হয় বিশ্বাসীগণের আত্মাসমূহকে।

অথবা 'বুরূজ' অর্থ আকাশের দ্বার। কেননা আকাশের দ্বারগুলো দিয়েই আকাশবাসীরা নেমে আসে পৃথিবীতে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের ধারণা— আকাশ বারো ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগেই রয়েছে স্থির তারকাপুঞ্জ। আবার সচল নক্ষত্রগুলোও উপস্থিত হয় সেখানে। ওগুলোর নাম— বৃষ, মেষ, কর্কট ইত্যাদি। বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাদের কল্পণাপ্রসূত এবং তা কোরআন হাদিসের বিপরীতও। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আকাশ এবং আকাশের সকল গ্রহ-নক্ষত্র সতত পরিভ্রমণশীল। তবে একথা ঠিক যে আকাশের কোনো নির্দিষ্ট অংশের নামই বুরূজ। আলোচ্য আয়াতের ইঙ্গিত এরকমই। এমনও বলা হয়েছে যে, আকাশের বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রগুলোর নাম বুরূজ, যেহেতু সেগুলো সতত প্রোজ্জ্বল। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাও এরকম বলেছেন।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (২), শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—' (৩)। এখানে 'ইয়াওমিল মাওউ'দ' (প্রতিশ্রুত দিবস) অর্থ কিয়ামত দিবস। 'শাহেদ' (দ্রষ্টা) অর্থ সাক্ষ্যদাতা এবং 'মাশহুদ' (দৃষ্ট) অর্থ আরাফার দিবস, যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় একজন সত্য সাক্ষ্যদাতা। অথবা ওই বস্তু, যার সাক্ষ্য দেয় একজন সাচ্চা সাক্ষ্যদাতা। আবার জুমআর দিবসকে (শুক্রবারকে)ও বলা হয় শাহেদ। বলা বাহুল্য, বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই আল্লাহ্ এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করে শপথ করেছেন।

ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এখানে 'প্রতিশ্রুত দিবস' অর্থ মহাপ্রলয় দিবস। দৃষ্ট বা প্রত্যয়িত দিবস হচ্ছে আরাফার দিন এবং দ্রষ্টা বা সাক্ষ্যদাতা অর্থ শুক্রবার। শুক্রবারে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে, যখন প্রার্থনা করলে তা আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক গৃহীত

হয়। কল্যাণ চাইলে দেওয়া হয় কল্যাণ। অর্থাৎ অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাইলে দেওয়া হয় কাংখিত পরিত্রাণ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। আর এর বর্ণনাসূত্রভূত এক বর্ণনাকারী মুসা ইবনে উবায়দা বলিষ্ঠ। শিথিল সূত্রসহযোগে হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তিবরানী। সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্পাক আমাদের জন্য শুক্রবারকে ধার্য করেছেন একটি বিশেষ দিন হিসেবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে ইউসুফ ইবনে মেহরান বর্ণনা করেছেন, এখানে সাক্ষ্যদাতা হলেন রসুলে পাক স.। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তাদের উপরে সাক্ষ্যদাতারূপে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি'। আর 'মাশহুদ' অর্থ এখানে— কিয়ামত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সেদিন হবে মানুষের সমবেত হওয়ার দিন, আর দিনটি প্রত্যয়িত'। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে অবশ্য পুনরাবৃত্তি হয়ে যায় অনিবার্য। অর্থাৎ 'ইয়াওমিল মাওঊ'দ'ও হয়ে যায় 'ইয়ামিল মাশহুদ'।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'দ্রষ্টা' বা সাক্ষ্যদাতা বলে বুঝানো হয়েছে আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে এবং 'দৃষ্ট' বা প্রত্যয়িত বলে বুঝানো হয়েছে মানবজাতিকে। হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, এখানে 'শাহেদ' অর্থ উম্মতে মোহাম্মদী এবং 'মাশহুদ' অর্থ অন্যান্য উম্মত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যেনো তোমরা হও মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা'।

মালেক ইবনে আবদুল্লাহ একবার সাঈদ ইবনে যোবায়েরের কাছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি জবাব দিলেন, এখানে 'শাহেদ' হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং 'মাশহুদ' হচ্ছে মানবজাতি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট'। কেউ কেউ বলেছেন, 'শাহেদ' হচ্ছে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা ও হাত-পা'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'শাহেদ' হচ্ছেন অন্যান্য নবী এবং 'মাশহুদ' হচ্ছেন রসুল স. স্বয়ং। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর আল্লাহ্ যখন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন নবীগণ থেকে ... তখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করলো। আর আমিও ছিলাম সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভূত'। আমি বলি, এখানকার 'শাহেদ' এবং 'মাশহুদে'র ব্যাখ্যা যদি কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা যায়, তবে ওই প্রমাণই হবে যথেষ্ট। তাহলে অন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনই আর থাকবে না। অন্যথায় আমরা বলতে পারি এখানে 'শাহেদ' অর্থ সত্যসাক্ষ্যদাতা। আর 'মাশহুদ' অর্থ সত্য দ্বারা সাক্ষ্যয়িত, সে যে কেউ হোক না কেনো । যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; আরো সাক্ষ্য দেন ফেরেশতাবর্গ এবং জ্ঞানীগণ'। এভাবে বুঝা যায়, এখানে 'সাক্ষ্যদাতা' অর্থ আল্লাহ্, ফেরেশতামণ্ডলী, আমল লেখক ফেরেশতা, নবী-রসুল, বিশ্বাসীগণ, বিশেষ করে উম্মতে মোহাম্মদী, আবার উম্মতে মোহাম্মদীর আলেমগণ, তারাও, যারা দণ্ডবিধানের মামলায় আদালতে পৌঁছে

সত্যসাক্ষ্য দেয়। আর 'মাশহুদ' অর্থ আল্লাহ্‌র এককত্বের বাণী, নবীগণের স্বীকৃতি, ধর্মপ্রচারকর্ম, মানুষের কর্ম ও আচরণ এবং ওই সকল কথা, যা বলেন একজন সত্যসাক্ষ্যদাতা। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা সাক্ষ্যদাতার মর্যাদা বজায় রেখো। আল্লাহ্ তাদের মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ ঘটান। আর রক্ষা করেন প্রপীড়িতদেরকে। শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন খতীব ও ইবনে আসাকের।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কুতিলা আসহাবুল উখদূদ্' (ধ্বংস হয়েছিলো কুণ্ডের অধিপতিরা)। কেউ কেউ এখানকার 'কুতিলা' (ধ্বংস হয়েছিলো) বাক্যটিকে বলেছেন শপথের জবাব। কিন্তু অভিমতটি নিতান্তই অশক্ত। কেননা শপথের জবাবে 'লাম' অব্যয়ের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। 'লাম' বিবর্জিত শপথের জবাব খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। তবে এখানে 'কুতিলা'কে শপথের জবাব না বলে বলা যেতে পারে, শপথের জবাব রয়েছে এখানে উহ্য। পরের আয়াতে শপথের সামঞ্জস্যশীল জবাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক বলেছেন— আমি শপথ করেই বলছি, কুরায়েশ পৌত্তলিকেরা অভিশপ্ত, যেমন অভিশপ্ত অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিরা।

হজরত সুহাইব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রাচীন যুগে ইয়েমেন প্রদেশ শাসন করতো এক রাজা। তার দরবারে থাকতো এক যাদুকর। যখন সে বৃদ্ধ হলো, তখন বললো, রাজন! আমি তো বুড়ো হয়ে গেলাম। মনে হয় বেশীদিন আর বাঁচবো না। আপনি বরং একটি ছেলে ঠিক করে দিন। আমি তাকে যাদু বিদ্যায় পণ্ডিত বানিয়ে দিয়ে যাবো। রাজা একটি যুবককে ঠিক করে দিলো। যুবকটি নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগলো যাদুকরের বাড়িতে। তার যাতায়াতের পথে পড়তো এক দরবেশের আস্তানা। সে একই সঙ্গে ওই দরবেশের কাছেও দীক্ষা গ্রহণ করলো। তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কাটাতো বলে কখনো কখনো যাদুকরের বাড়িতে যেতে তার বিলম্ব ঘটতো। তাই যাদুকর তাকে শাস্তি দিতে শুরু করলো। ফিরতি পথে দরবেশের সংসর্গে আবার কিছু সময় কাটাতো সে। ফলে বিলম্বে বাড়িতে ফেরার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকেও ভর্ৎসনা শুনতে হতো তাকে। একদিন তার পথে পড়লো এক বিরাট দর্শন বন্য প্রাণী। তার কারণে সে রাস্তায় লোক চলাচল হয়ে গিয়েছে একবারে বন্ধ। যুবকটি ভাবলো আজ হবে পরীক্ষা। দেখি কে উত্তম— দরবেশ, না যাদুকর। একথা ভেবেই সে হাতে তুলে নিলো একটি পাথরের টুকরা। বললো, হে আল্লাহ্! যাদুকর অপেক্ষা দরবেশ যদি তোমার অধিক প্রিয়পাত্র হয়, তাহলে আমার হাতের এই পাথর দ্বারা তুমি বন্য জন্তুটিকে ধ্বংস করে দাও। একথা বলেই সে পাথরটি ছুঁড়ে মারলো হিংস্র প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলো প্রাণীটি। পথিকদের পথ হয়ে গেলো নিরাপদ। যুবক দরবেশের কাছে উপস্থিত হয়ে খুলে বললো সব। দরবেশ বললেন, বৎস! তুমি

অনেক উন্নত হয়েছো। তোমার সাফল্য থেকে আমার ধারণা হচ্ছে, অচিরেই তুমি বিপদাপন্ন হবে। তবে বিপদাপন্ন হলেও তুমি আমার কথা কখনো প্রকাশ কোরো না।

এরপর থেকেই যুবকটির দ্বারা সম্পাদিত হতে শুরু করলো অনেক অলৌকিক ঘটনা। তার হাতের ছোঁয়ায় নিরাময় লাভ করতে শুরু করলো জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীরা। অন্যান্য রোগীরাও তার কাছে নিরাময় না হয়ে ফিরতো না। তার এমতো কীর্তির কথা প্রচার হয়ে গেলো সারা দেশে। রাজার এক বিশেষ সহচর ক্রমে ক্রমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সে-ও নিরাময়ের আশায় অনেক উপঢৌকন নিয়ে একদিন উপস্থিত হলো যুবকের দরবারে। বললো, আমার চোখ ভালো করে দাও, আর এই উপঢৌকনগুলো গ্রহণ করো। যুবক বললো, আমি আরোগ্যদাতা নই। আরোগ্য দান করেন আল্লাহ্। আপনি তাঁকে বিশ্বাস করুন এবং তাঁর নিকটেই আরোগ্য প্রার্থনা করুন। লোকটি তাই করলো। আল্লাহ্পাক তার চোখ ভালো করে দিলেন। সেখান থেকে সে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলো রাজদরবারে। অন্ধ হওয়ার পর থেকে রাজদরবারে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলো সে। রাজা তাকে দেখে অবাক হলো। তার অন্ধত্ব দূর হয়েছে বুঝতে পেরে বললো, কী ব্যাপার! তোমার চোখ ভালো হয়ে গেলো কী করে? লোকটি বললো, আমার মালিক সবকিছুই করতে পারেন। রাজা বললো, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মালিক আছে নাকি? সে বললো, নিশ্চয়ই। তিনি প্রভুপালনকর্তা তোমার, আমার, সকলের। রাজা একথা শুনে রোষান্বিত হলো। বন্দী করলো তাকে। শাস্তি দিতে শুরু করলো। বললো, ঠিক করে বলো, তোমাকে দৃষ্টিদান করলো কে? অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে একসময় বললো যুবকের নাম। রাজা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রী পাঠিয়ে রাজ দরবারে ধরে নিয়ে এলো যুবককে। বললো, তোমার যাদু তো ভালোই প্রভাব বিস্তার করেছে। ভালো হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিহীন, কুষ্ঠাক্রান্ত ও অন্যান্য রোগগ্রস্তরা। এটাতো বড়ই আনন্দের বিষয়। যুবক বললো, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আরোগ্যদাতা তো আল্লাহ্। একথা শুনে রাজা ক্ষিপ্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলো যুবককে বন্দী করতে। বন্দী অবস্থায় তার উপর অত্যাচার করা হতে লাগলো নিয়মিত। রাজা মাঝে মাঝেই তাকে বলতে শুরু করলো, বলো, এই বিদ্যা তুমি রপ্ত করলে কীভাবে? একসময় শাস্তির প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে যুবক বলে দিলো দরবেশের কথা। রাজা তলব করলো দরবেশকে। তিনি রাজ দরবারে উপস্থিত হলে রাজা বললো, দরবেশ! আমি নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করো। দরবেশ বললেন, অসম্ভব। রাজা দিলো মৃত্যুর দণ্ডাদেশ। রাজনির্দেশে করাত দিয়ে দুই টুকরা করা হলো দরবেশকে। এরপর রাজা নির্দেশ দিলো, যুবকটিকে নিয়ে উঠে যাও অমুক পাহাড়ের চূড়ায়। সেখান থেকে ফেলে দিয়ে নিপাত করে দাও তাকে। সিপাই শান্ত্রীরা তাকে নিয়ে যাত্রা করলো অমুক স্থানের দিকে। যেতে যেতে সে দোয়া করলো, হে আমার

আল্লাহ্! তুমি এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। একটু পরেই শুরু হলো ভূমিকম্প। হঠাৎ নিকটের একটি পাহাড় ধসে চাপা দিলো সিপাই শান্ত্রীদেরকে। যুবক অক্ষত অবস্থায় ফিরে গেলো রাজ দরবারে।

তাকে দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলো রাজা। এক দল লোককে নির্দেশ দিলো, একে নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় যাও। তারপর ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলতে থাকো। যদি সে তোমাদের কথা শোনে তো ভালোই। অন্যথায় ফেলে দিয়ো দরিয়ার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে। লোকেরা নির্দেশ পালন করলো। তাকে নিয়ে যখন সকলে মাঝ দরিয়ায় উপস্থিত হলো, তখন যুবক শরণ গ্রহণ করলো আল্লাহ্‌র। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রমধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। নৌকাডুবিতে মারা গেলো লোকেরা। যুবক রক্ষা পেলো অলৌকিকভাবে। রাজ দরবারে ফিরে এসে সে বর্ণনা করলো আনুপূর্বিক ঘটনা। বললো, রাজা! এভাবে তুমি আমার প্রাণ সংহার করতে পারবে না। যদি তুমি প্রকৃতই আমাকে বধ করতে চাও, তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ করো। রাজা বললো, বলো। যুবক বললো, উন্মুক্ত প্রান্তরে জনসমাবেশের ব্যবস্থা করো। সেখানে একটি গাছের গুড়ির সঙ্গে আমাকে বেঁধে দাও। তারপর আমারই তুন থেকে একটি তীর নিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহি রব্বিল গুলাম' বলে নিক্ষেপ করো আমার দিকে। তাহলেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। রাজা তাই করলো। বহু লোকের সামনে শহীদ হয়ে গেলো যুবক। কিন্তু ঘটনা মোড় নিলো অন্য দিকে। উপস্থিত জনতা সমস্বরে তিন বার ঘোষণা করলো, আমরা এই যুবকের পালনকর্তার উপরে ইমান আনলাম।

রাজা ক্ষেপে গেলো খুব। নির্দেশ দিলো, পথের ত্রিমোহনীতে খনন করো একটি বিশাল গর্ত। গর্তটি ভর্তি করো শুকনো কাঠ দিয়ে। জ্বালিয়ে দাও আগুন। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। একে একে আগুনে নিক্ষেপ করো তথাকথিত ইমানদারদেরকে। তাই করা হলো। নিষ্ঠুর রাজার নির্মমহৃদয় বশংবদেরা জ্বলন্ত আগুনে একে একে নিক্ষেপ করতে লাগলো বিশ্বাসীগণকে। এ সময় সামনে আনা হলো এক শিশু ও তার মাতাকে। মাতার কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সময় শিউরে উঠলো মাতা। শিশুটি বললো, মা! ভয় পেয়ো না। তুমি সত্যাধিষ্ঠিতা। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ইয়েমেন রাজ্যের নাজরান অঞ্চলের হুমাইরি বংশের এক রাজার নাম ছিলো ইউসুফ জুনুয়াস ইবনে শারজীল। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর সময়েই, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের সত্তর বৎসর আগে। তখন পৃথিবীতে কোনো নবী ছিলেন না। যুবকটির নাম ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে তামীর। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাজা জুনুয়াস তখন আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলো বারো হাজার লোককে। এরপর ইয়েমেন জয় করে রাজা কাফী ইরবাত। জুনুয়াস পালিয়ে গিয়ে সাগরে ঝাঁপ দেয়। এভাবেই সলিল সমাধি ঘটে তার। কালাবী বলেছেন, জুনুয়াসই হত্যা করেছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে তামীরকে।

মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, খলিফা ওমরের শাসনামলে সেখানে একটি খাল খনন করা হয়েছিলো। তখন বের হয়ে পড়েছিলো শহীদ আবদুল্লাহ্ ইবনে তামীরের মরদেহ। হাত রাখা ছিলো মস্তকের আহত স্থানে। হাত সরিয়ে নিতেই শুরু হতো রক্তপ্রবাহ। আবার হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আপনা আপনি চলে যেতো পূর্বের স্থানে। লোহার সীলযুক্ত একটি অঙ্গুরীয় ছিলো তাঁর হাতে। তাতে লেখাছিলো 'রব্বী আল্লাহ্' (আল্লাহ্ই পরম প্রভুপালক)। খলিফার কাছে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, সে অবস্থাতেই সমাহিত করা হোক।

'আসহাবুল উখ্দূদ' বা অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদের সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্যে ইমাম মুসলিমের বর্ণনাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাই অন্যান্য বর্ণনা আর উল্লেখ করা হলো না।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে—'ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিলো অগ্নি'। 'জাতিল ওয়াক্বদ' বাক্যটি এখানে অগ্নির বিশেষণ। অর্থাৎ ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি, লেলিহান শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ড। আর এখানকার 'আলিফ লাম' হচ্ছে জাতিবাচক।

রবী ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন, যে সকল বিশ্বাসীকে তখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, আল্লাহ্পাক তাঁদের প্রাণ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়ার পূর্বেই। আর তাঁদের প্রাণহীন দেহগুলোকেও আল্লাহ্পাক সুরক্ষিত রেখেছিলেন অগ্নিপ্রতিক্রিয়া থেকে। উপরন্তু অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট অবিশ্বাসীরাই পুড়ে মরেছিলো ওই আগুনে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যখন তারা এর পাশে বসে ছিলো (৬); এবং তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করেছিলো, তা প্রত্যক্ষ করছিলো' (৭)। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে মজা দেখছিলো, কীভাবে বিশ্বাসীগণকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। একথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে। এরকম বলেছেন, মুজাহিদ। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'প্রত্যক্ষ করছিলো' অর্থ তাদের কিছুসংখ্যক লোককে পর্যবেক্ষক হিসেবে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছিলো। তারাই রাজার কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, শাস্তিদানের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। ঠিকঠাক মতোই সবকিছু সম্পন্ন করেছে। অথবা মর্মার্থ হবে— মহাবিচারের দিবসে যখন তাদেরকে নির্বাক করে দেওয়া হবে, তখন তাদের হাত-পা-ই সাক্ষ্য দিবে যে, তারা ওই বিশ্বাসীগণকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলো এবং এমতো সিদ্ধান্তে তারা ছিলো প্রীত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে— (৮) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা' (৯)।

এখানে 'নাক্বামূ' অর্থ তারা নির্যাতন করেছিলো। ক্রিয়াটির কর্মপদ হচ্ছে 'আঁই ইউমিনূ' (তারা বিশ্বাস করতো)। 'নাক্বামূ' অতীতকালের ক্রিয়া বলেই এখানকার 'ইউমিনূ' অতীতকালার্থক, যদিও তা সন্নিবেশিত হয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতকালরূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ওই দুর্বৃত্তরা কোনো কৌলীন্য-প্রতিপত্তির কারণে, কিংবা প্রতিবাদী হওয়ার কারণে নয়, বিশ্বাসীগণকে তারা বধ করেছিলো কেবল এই কারণে যে, তারা ছিলো ইমানদার।

'আল আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, মহা পরাক্রান্ত, এমন মহাপ্রতাপান্বিত যে, যে কোনো সময় তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তির আশংকা বিদ্যমান। আর 'আল হামীদ' অর্থ প্রশংসার্হ, এমনই স্তব-স্তুতির অধিকারী যে, তাঁর কাছ থেকে পুণ্যকর্মের যথাবিনিময় আশা করা যায়।

'আল্ লাজী' লাহু মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর। 'ওয়াল্লহু আলা কুল্লি শাইইন শাহীদ' অর্থ আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই যেহেতু সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা, সেহেতু তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য এবং সকলের ভয় ও আশার লক্ষ্যস্থল। কথাটির মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে দেওয়া হয়েছে সান্ত্বনা এবং পুরস্কার প্রদানের পূর্ণ নিশ্চয়তা। একথাটির প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তারাই সত্যাধিষ্ঠিত। আর তাদের প্রতিপক্ষীয়রা মিথ্যাশ্রয়ী। সুতরাং বিশ্বাসীরা যেনো তাদের পরবর্তী পৃথিবীর সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে। এ বিষয়টিকেও তাদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করে নেয় যে, যেহেতু তিনি সর্বদ্রষ্টা, সেহেতু তিনি যথাসময়ে সকলকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেনই— বিশ্বাসীগণকে পুরস্কার এবং তিরস্কার অবিশ্বাসীদেরকে।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি'।

এখানে 'ইন্নাল্ লাজীনা ফাতানুল মু'মিনীনা ওয়ালা মু'মিনাতি' অর্থ যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে। অর্থাৎ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে বিপদাপন্ন করার অধিকার কারো নেই, অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদের যেমন নেই, তেমনি নেই অন্যান্যদেরও, না অবিশ্বাসীদের, না বিশ্বাসীদের।

'ছুম্মা লাম ইয়াতূবূ' অর্থ এবং পরে তওবা করেনি। 'ফা লাহুম আ'জাবু জ্বাহান্নাম' অর্থ তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। অর্থাৎ বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীদেরকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও যারা তওবা করে না এবং তওবা ছাড়াই ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে, তাদের নরকগমন সুনিশ্চিত, তারা যদি বিশ্বাসীও হয়, তবুও এমন হতে পারে যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল অবিশ্বাসী অত্যাচারীদের

কথা। কেননা প্রসঙ্গটি সূত্রায়িত হয়েছে অগ্নিকুণ্ডের অধিপতি প্রসঙ্গে, যারা সকলেই ছিলো অবিশ্বাসী। আর বিশ্বাসীরাও তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলো কেবল ইমান আনার কারণে, আর ইমানদারেরা কখনো আরেক ইমানদারের উপরে ইমান আনার কারণে অত্যাচার করে না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলনকারীরা এবং তাদের মতো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই প্রবেশ করবে জাহান্নামে। শাস্তি ভোগ করবে বিরতিহীনভাবে।

'ওয়া লাহুম আ'জাবুল হারীক্ব' অর্থ এবং আছে দহন যন্ত্রণা। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হয় এই পৃথিবী থেকেই। এখানেও দেখা যায়, যে অপরকে বিপদে ফেলতে চায়, সে-ই বিপদে পড়ে। অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীদের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটেছিলো। তাদের জ্বালানো আগুনে তারা পুড়ে মরেছিলো নিজেরাই। সমুদ্রে ডুবে মরেছিলো জুনুয়াসও। সম্ভবত আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে একটি অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে— আল্লাহ্পাক তাহলে কুণ্ডের অধিপতিদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলেন?

সূরা বুরূজ ঃ আয়াত **১১— ১৬**

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

r যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।

r তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।

r তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,

r এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,

r 'আর্শের অধিকারী ও সম্মানিত।

r তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে শরিয়তের নির্দেশ নিষেধাজ্ঞাসমূহ, তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে চিরসুখময় জান্নাত, যেখানে প্রবহমান রয়েছে মনোমুগ্ধকর স্রোতস্বিনী সমূহ। হে মানুষ! শুনে রাখো। এই জান্নাতপ্রাপ্তিই হচ্ছে মহা সফলতা। পৃথিবী ও পৃথিবীর সুখোপকরণসমূহ সে সফলতার কাছে কিছুই নয়।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন'। এখানে 'বাত্বশা' অর্থ মার, আক্রমণ, আঘাত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মানুষ! জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র মার বড় শক্ত মার। তাঁর পাকড়াও থেকে বেরিয়ে আসবার সাধ্য কারো নেই, কারো এমতো ক্ষমতাও নেই যে, তাঁর পক্ষ থেকে আগত আঘাতকে প্রতিহত করে। সুতরাং সাবধান হও। পরিত্যাগ করো তাঁর অবাধ্যতা।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান (১৩), এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময় (১৪), আরশের অধিকারী ও সম্মানিত'(১৫)।

'ইন্‌নাহু হুয়া ইউব্‌দীউ ওয়া ইউয়ীদ' অর্থ তিনি অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান। অর্থাৎ তিনি যেমন সকলকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, পুনরুত্থান দিবসে। সুতরাং স্রষ্টা যেহেতু তিনি ছাড়া কেউ নয়, সেহেতু তিনি ছাড়া উপাস্যও আর কেউ নেই। সে কারণেই তার পাকড়াও তো অনতিক্রম্য হবেই। অথবা বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— এই পৃথিবীতে যেমন তিনি অপরাধীকে শাস্তি দেন, তেমনি শাস্তি দিবেন পরলোকেও।

'ওয়া হুয়াল গফুরুল ওয়াদূদ' অর্থ এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। অর্থাৎ তিনিই বিশ্বাসীগণের পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের প্রেমিক ও প্রেমাস্পদও তিনিই। কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি এর বিপরীত, নির্মম ও কঠোর শাস্তিদাতা। 'জুল আ'রশিল মাজ্বীদ' অর্থ আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। অর্থাৎ সকল কিছুই যেহেতু তাঁর অধিকারায়ত্ত, তাই সকল সম্মান-কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। 'মাজ্বীদ' অর্থ সম্মানিত, মহিমান্বিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চির-অবশ্যম্ভাবিতাই তাঁর সত্তা ও মহিমার বহিঃপ্রকাশক। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার পূর্ণত্বজ্ঞাপক। ক্বারী হামযা ও ক্বারী কাসায়ী 'আল মাজ্বীদ' কথাটিকে পড়তেন যেরযুক্ত 'দাল' সহযোগে। এমতাবস্থায় এখানকার 'সম্মানিত' পদটি বিশেষণ হবে আরশের। অর্থাৎ সম্মানিত আরশের অধিকর্তা তিনিই। আরশ যেহেতু আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতিসম্পাতে সতত সমুজ্জ্বল, সেহেতু আরশ যে মহাসম্মানিত, তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ 'সম্মানিত' বলা না হলেও আরশ সম্মানিতই।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'ফায়্‌'আ'লুল্‌ লিমা ইউরীদ'। একথার অর্থ— তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। অর্থাৎ তিনি চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। তাঁর অভিপ্রায় অবশ্যবাস্তবায়নব্য, অপ্রতিহত।

সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ

مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

r তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত—
r ফির'আওন ও ছামূদের?
r তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;
r এবং আল্লাহ্ উহাদের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।
r বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,
r সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার নিকট অবাধ্য ফেরাউনের সম্প্রদায় ও ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যদ্রোহীতা এবং তার করুণ পরিণতি সম্পর্কিত বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তো জানেনই, কী নিদারুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও উদ্ধত ফেরাউন সম্প্রদায় এবং ছামুদ সম্প্রদায়কে। ফেরাউন সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো পানিতে, আর ছামুদেরা অক্কা পেয়েছিলো মহানাদের আঘাতে। তাছাড়া পরকালের অনন্তকালীন শাস্তি তাদের জন্য তো নির্ধারিত রয়েছেই। সুতরাং আপনি কুরায়েশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপব্যবহার দৃষ্টে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। বরং ধৈর্যের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করুন। তাদের পূর্বসূরীদের মতো তাদেরকে আমি যথাসময়ে শাস্তি বিধান তো করবোই।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তবু কাফেরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রত্যাদেশবাহী! পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চেয়ে আপনার উম্মতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অধিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কারণ এরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করছে সজ্ঞানে, সব কিছু দেখে শুনে, বুঝে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোর কাহিনী তারা শুনেছে। দেখেছে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের চিহ্নসমূহ। আপনিও তাদেরকে বার বার সতর্ক করে চলেছেন। তদুপরি সর্বশ্রেষ্ঠ আকাশজ গ্রন্থ আল কোরআনের হৃদয়স্পর্শী বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে তাদের সম্মুখেই। তাদের স্বজাতিভুক্ত ও সমভাষী রসুল সেগুলো তাদেরকে পাঠ করেও শোনাচ্ছেন। তবুও তো তারা দেখছি সত্যপ্রত্যাখ্যানেই অনড়। সংশোধিত হওয়ার এতো অধিক সুযোগ তো অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোর ছিলো না।

'তানভীন' যুক্ত 'তাকজীব' (মিথ্যারোপ) এখানে আতিশয্যপ্রকাশক। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানে কুরায়েশ কাফেরেরা অধিকতর দৃঢ়। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, 'বাল' (বরং) অব্যয়টি এখানে প্রসঙ্গান্তর ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে সূচনা-সূচক 'কিন্তু' অথবা 'তবু' অর্থে। এর যোগসূত্র রয়েছে

ইতোপূর্বের শপথের জবাবমূলক বাক্যের সঙ্গে। মাঝখানের আলোচনাগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— আগের যুগের কাফেরদের চেয়ে কুরায়েশ কাফেরেরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অধিকতর দৃঢ়।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টিকে ঘিরে রেখেছেন তার জ্ঞান ও কর্তৃত্ব দ্বারা। সুতরাং অপরাধীরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে, এরকম কখনো হতেই পারে না। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ কর্তৃক সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রাখার বিষয়টি তাঁর সত্তা-গুণবত্তার মতোই অবোধ্য, অতুল্য ও আনুরূপ্যবিহীন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বস্তুত এটা সম্মানিত কোরআন (২১), সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ' (২২)।

'বাল হুয়া কুরআনুম মাজ্বীদ' অর্থ বস্তুত এটা সম্মানিত কোরআন। অর্থাৎ এই কোরআন মাহাত্ম্যে ও আভিজাত্যে সকল গ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর প্রতিটি পঙক্তিই অব্যর্থ। ভাব ও ভাষা অজেয়। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'তবু কাফেরেরা মিথ্যা আলাপ করায় রত' বাক্যটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কোরআন মহাসম্মানিত ও চির অজেয় হওয়া সত্ত্বেও কাফেরেরা একে অস্বীকার করে। এতে করে তো একথাই প্রমাণিত হয় যে, ন্যূনতম প্রজ্ঞা ও বিবেচনাবোধও তাদের নেই।

'ফী লাওহিম মাহ্ফূজ' অর্থ সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। অর্থাৎ কোরআনের মূল অনুলিপি লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ লওহে মাহফুজকে সৃষ্টি করেছেন শ্বেতশুভ্র মুক্তা দ্বারা। এর পত্রগুলো লাল ইয়াকুতের। লেখাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে জ্যোতির কলম দ্বারা। আল্লাহ্ প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে লওহে মাহফুজের বিধানানুসারে সৃষ্টি করেন, জীবনোপকরণ দান করেন, ঘটান জীবন-মৃত্যু, সম্মান-অসম্মান। করেন আরো অনেক কিছু, যেরকম অভিপ্রায় করেন।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লওহে মাহফুজের শীর্ষে লেখা রয়েছে এই কথাগুলো— আল্লাহ্ এক, একক। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তাঁর নিকট পরম সত্য হচ্ছে ইসলাম। মোহাম্মদ তাঁর রসুল ও শ্রেষ্ঠ দাস। যে ব্যক্তি তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সত্য বলে জানবে তাঁর প্রতিশ্রুতিকে, মান্য করবে তাঁর নবীগণকে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।— লওহে মাহফুজ শ্বেতশুভ্রমুক্তানির্মিত। তার দৈর্ঘ্য আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের সমান। প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ। এর দুই প্রান্ত মুক্তা ও ইয়াকুত নির্মিত। কলম নূরের। লেখাও নূরের। এর সংশ্লিষ্টি আরশের সঙ্গে। আর লওহে মাহফুজকে কোলে করে রেখেছে এক বিশালাকৃতির ফেরেশতা। মুকাতিল বলেছেন, লওহে মাহফুজ রয়েছে আরশের দক্ষিণ প্রান্তে।

'মাহফূজ্বিন' পদটি এখানে 'লওহে'র বিশেষণ। এর অর্থ— হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সুরক্ষিত, সংরক্ষিত। ওই লিপিগুলিকে লওহে মাহফুজ বলা হয়েছে একারণেই। এটাই মূল গ্রন্থ বা উম্মুল কিতাব। 'আল কিতাব' সংকলিত হয়েছে এখান থেকেই। নাফে শব্দটিকে পাঠ করতেন 'মাহফূজুন' শেষ অক্ষরে পেশ সহযোগে। এমতাবস্থায় পদটি হবে কিতাবের বিশেষণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন্‌না নাহ্‌নু নায্‌যালনাজ্‌ জিকরা ওয়া ইন্‌না লাহু লাহাফিজূন' (এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আমিই এবং আমিই এর সংরক্ষক)। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌পাকের এমতো দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার কারণেই কোরআন সকল প্রকার সংযোজন বিয়োজন পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে চিরমুক্ত। অথচ দুরাচার রাফেজীরা আল্লাহ্‌তায়ালার এমতো অঙ্গীকারকে মান্য করে না। বলে, কোরআনের সঙ্গে রয়েছে অন্য কথার মিশ্রণ। আরো বলে, কোরআন ছিলো চল্লিশ পারা। এর মধ্যে দশ পারা বিলোপ করা হয়েছে। তাদের কথার প্রতিবাদে পাঠ করা যেতে পারে 'তবু কাফেরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত; এবং আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। বস্তুত এটা সম্মানিত কোরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ'।

সূরা ত্বারিক্ব

মহাতীর্থ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানিও। এর রুকুর সংখ্যা ১ এবং আয়াতের সংখ্যা ১৭।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর পরম শুভাকাঙ্খী পিতৃব্য আবু তালেব তাঁকে আহার করতে দিলেন দুধ ও রুটি। রসুল স. খেতে শুরু করলেন। হঠাৎ ঘটলো উলকাপাত। তার ঝলকানিতে সমুদ্ভাসিত হলো দর্শনযোগ্য সকলকিছু। আবু তালেব আতংকিত হয়ে বললেন, ওটা কী? তিনি স. বললেন, একটি নক্ষত্রাংশ, নিক্ষিপ্ত হলো শয়তানের প্রতি। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। আবু তালেব একথা শুনে বিস্মিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ﴿۱﴾ وَ مَآ اَدۡرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿۲﴾ النَّجۡمُ الثَّاقِبُ ﴿۳﴾ اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ ﴿۴﴾

- শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার;
- তুমি কি জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কী?
- উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!

r প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশের এবং রাতের আকাশে যা প্রকাশ পায়, তার শপথ! হে আমার রসুল! আপনি কি জানেন, রাতে যা প্রকাশ পায় তা কী? তা হচ্ছে উজ্জ্বল তারকা।

এখানকার 'আত্ব ত্বারিক্ব' শব্দটির অভিধানিক অর্থ পথের পথিক। ব্যবহারিক অর্থ রাতের আগন্তুক। উদীয়মান বস্তুকেও বলে তারিক্ব। এখানে শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে উলকাপাতকে। উলকাপাতের বিশেষত্ব কয়েকটি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, উলকাপাত ঘটানো হয় আড়ি পাততে আসা শয়তানকে আকাশ থেকে তাড়ানোর জন্য। তাছাড়া এটি একটি অলৌকিক নিদর্শনও বটে, যার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত করা। বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তুলবার উদ্দেশ্যেই এখানকার বক্তব্যটিকে দেওয়া হয় প্রশ্নের আকার।

'আন্ নাজ্বমুছ ছাক্বিব' অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র, যে কোনো তারকা। 'আলিফ লাম' এখানে জাতিবাচক। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— কক্ষচ্যুত কোনো নক্ষত্র, যা নিক্ষিপ্ত হয় শয়তানের প্রতি। অথবা 'আলিফ লাম' এখানে সীমিতার্থক। এরকম হলে অর্থ দাঁড়ায়— সপ্তর্ষিমণ্ডল। আরববাসীগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বলেন 'নাজ্বমুছ্ ছাক্বিব'। এরকম বলেছেন ইবনে জায়েদ। অথবা এর অর্থ— শনি গ্রহ, যার অবস্থান আকাশের দূরতম স্থানে। তাই একে বলা হয় 'আন্ নাজ্বম'। আরববাসীগণ তো দূর আকাশের উড়ন্ত পাখিকেও বলেন 'ক্বদ ছাক্বাব' (পাখিটি উঁচুতে উঠেছে)। 'আছ্ ছাক্বিব' অর্থ দীপ্তিমান, উজ্জ্বল। কেননা 'ছাক্বব' অর্থ ছিদ্র করা। ছিদ্র যেমন কোনোকিছুকে ভেদ করে, তেমনি কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের জ্যোতিচ্ছটাও ভেদ করে রাতের অন্ধকারকে। মুজাহিদ এরকম বলেছেন।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক জীবের উপরেই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে'। এখানে 'হাফিজ' অর্থ তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী। আলোচ্য আয়াতের অর্থ হতে পারে দু'ধরনের— তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া কোনো মানুষই নেই, অথবা প্রত্যেকের জন্য নিয়োজিত রয়েছে একজন করে সহায়তাকারী। আয়ু যখন কারো শেষ হয়, শেষ হয়ে যায় রিজিক, তখন ঘটে তার মৃত্যু। আর এখানে 'তত্ত্বাবধায়ক' অর্থ কোনো একজন তত্ত্বাবধায়ক নয়, বরং তত্ত্বাবধায়কদের একটি দল। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে বহুসংখ্যক তত্ত্বাবধায়ক'। এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করলে আয়াতদু'টোর মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। অথবা মর্মার্থ হবে— মূল হেফাজতকারী তো আল্লাহ্। তাঁর নির্দেশেই ফেরেশতারা রক্ষণাবেক্ষণ করে মানুষের। একারণেই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধানের বিষয়টি সম্পৃক্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে। আর দু'টো আয়াতই অর্থগত দিক থেকে বিবেচিত হবে শপথের জবাব হিসেবে।

ইকরামার উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, কুরায়েশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে আবুল আসাদ ছিলো খুবই শক্তিমান। একবার সে কাঁচা চামড়ার উপরে দাঁড়িয়ে দম্ভভরে বললো, শোনো জনতা! যে মোহাম্মদকে বিপদে ফেলতে পারবে তার জন্য রইলো পুরস্কার। সে বলে, জাহান্নামে নাকি রয়েছে উনিশজন শাস্তিদাতা ফেরেশতা। আরে, দশজনকে ধরাশায়ী করতে পারবো তো আমি একাই। বাকী নয়জনকে কি তোমরা কাবু করতে পারবে না? তার এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

r সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে!
r তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে,
r ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।
r নিশ্চয় তিনি তাহার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।
r যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে
r সেই দিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।

'ফাল্ইয়ান্জুরিল ইনসান' অর্থ সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক। 'ফাল্ইয়ান্জুর' এর 'ফা' অব্যয়টি এখানে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উপস্থিতি, তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল শুভ-অশুভ কর্মের তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি নিমিত্ত এই বিষয়টির যে, মানুষ তার প্রকৃতির উপর চিন্তা-ভাবনা করবে। যেনো সে তার প্রথম অস্তিত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে পৌঁছে যেতে পারে পরবর্তী সৃষ্টির (পুনরুত্থানের) বাস্তবতা পর্যন্ত এবং এমতো উত্তরণ তাকে একথাটি শিখিয়ে নিতে পারে যে, কৃতজ্ঞতা অত্যাবশ্যক। আর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে।

'মিম্মা খুলিক্ব' অর্থ কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'মিম্মা' পদটিতে আছে দু'টি শব্দ— 'মিন (হতে) এবং 'মা' (কী)। প্রথমটি সূচনাজ্ঞাপক এবং পরেরটি প্রশ্নবোধক। আর 'মিম্মা খুলিক্ব' এখানে 'ইয়ান্জুরু' (প্রণিধান করুক) বাক্যের কর্মপদ। অর্থাৎ মানুষের উচিত, তার সূচনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, চিন্তা-গবেষণা করা। এমতো অনুসন্ধিৎসার জবাব দেওয়া হয়েছে অবশ্য পরবর্তী আয়াতেই (৬)। বলা হয়েছে—

'তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে'। এখানে 'মাইন দাফিক্ব' অর্থ সবেগে স্খলিত পানি। 'দাফিক্ব' (সবেগে) শব্দটি এখানে বসানো হয়েছে রূপকার্থ প্রদানার্থে। অথবা বলা যেতে পারে, কর্তৃবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত কর্মবাচক অর্থে। যেমন 'ঈশাতুর রদ্বিয়াতুন' বাক্যের 'রদ্বিয়াতুন' অর্থ মনোনয়নদানকারী। কিন্তু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মারদ্বিয়াতুন' (মনোনীত) অর্থে। 'দাফ্‌ক্বুন' অর্থ প্রবাহিত হওয়া। এমতাবস্থায় পানির সঙ্গে শব্দটির সম্পৃক্তি ঘটবে ধাত্যর্থে। আর এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগ শুক্রপাত থেকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্যে থেকে'। এখানে 'সুল্‌ব' অর্থ পৃষ্ঠ, মেরুদণ্ড। 'সুরাহ' তাঁর অভিধানে লিখেছেন, 'সুল্‌ব' অর্থ সুদৃঢ়। পিঠ বা মেরুদণ্ডকে 'সুলব' বলা হয় এই দৃঢ়তার কারণেই।

'কামুস' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'তারাইব' অর্থ বক্ষস্থিত অস্থি, অথবা ওই সকল অস্থি, যেগুলো মিলিত হয়েছে কণ্ঠদেশের অস্থির সঙ্গে। কিংবা ওই হাড়, যা অবস্থিত কণ্ঠের হাড় ও বুকের মাঝখানে, বা বুকের দু'পাশের চারটি করে পঞ্জরাস্থি। অথবা দুই হাত, দুই পা ও চক্ষুযুগল। কিংবা হাসুলি ব্যবহৃত হওয়ার স্থান। বায়যাবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, চতুর্থ পর্যায়ের পরিপাকের পর সর্বোন্নত স্তরের অণু থেকে প্রস্তুত হয় 'নুত্বফা' বা শুক্ররেণু, নির্গত হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি থেকে খিঁচে খিঁচে। সে কারণেই এর দ্বারা পরিগঠিত হয় অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অণ্ডকোষ দু'টোর সূক্ষ্ম তন্ত্রীসমূহ শুক্ররেণুর অবস্থানস্থল। শুক্র সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে মস্তিষ্ক। তাই অত্যধিক সহবাস ডেকে আনে মস্তিষ্ক-দৌর্বল্য। আর দ্বিতীয় দফায় মগজ শুক্রসৃষ্টিতে সময় নেয়। তখন তার অবস্থানস্থল হয় মেরুদণ্ড। তাই এখানে বলা হয়েছে— এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থি থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় তিনি তার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান'। এখানে 'ইন্‌নাহু' অর্থ নিশ্চয় তিনি। 'ক্বদীর' অর্থ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম, পুনঃসৃজনের ব্যাপারে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। উল্লেখ্য, ৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে মানুষের প্রথম সৃষ্টির কথা। আর এখানে বলা হলো তাদের পুনরুত্থান দিবসের পুনঃ সৃষ্টি হওয়ার কথা। অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের মতোও তিনি মানুষকে সৃষ্টি করবেন। আর এরকম করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কেননা প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে (৯) সেই দিন তার কোনো সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়'(১০)। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে মানুষের গোপন বিশ্বাস, কথা ও কর্মগুলোকে প্রকাশ করা হবে। প্রকাশ করে দেওয়া হবে অন্তরের গোপন কথাগুলোও। আর সেদিন সকলেই হবে সামর্থ্যহীন ও সাহায্যবিহীন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌পাক প্রকাশ করে দিবেন যাবতীয় গুপ্ত বিষয়। গোপন রহস্যাবলী প্রকাশিত হবে বদনমণ্ডলে।

‘ফামা লাহু মিন ক্কুও্ওয়াত’ অর্থ সে দিন তার কোনো শক্তি-সামর্থ্য থাকবে না। ‘ওয়া লা নাসির’ অর্থ থাকবে না সাহায্যকারীও। অর্থাৎ সেদিন তাদের শক্তিসামর্থ্য ও সুহৃদ সাহায্যকারী থাকবে না বলেই শাস্তির উপযোগী যারা, তাদের ভাগ্যে জুটবে না পরিত্রাণ। শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবেই।

সূরা ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

r শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,

r এবং শপথ যমীনের, যাহা বিদীর্ণ হয়,

r নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।

r এবং ইহা নিরর্থক নহে।

r উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

r এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

r অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ, শপথ ধরিত্রীর, যাকে বিদীর্ণ করা হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে, নিশ্চয় মহাগ্রন্থ কোরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করেই ছাড়ে। সুতরাং এর জ্যোতির্ময় বাণীসম্ভার কখনো অর্থহীন, বা উদ্দেশ্যবিহীন হতেই পারে না।

এখানে ‘রজ্বউন’ অর্থ প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা। বর্ষা যেহেতু প্রতি বৎসর ফিরে ফিরে আসে, তাই বৃষ্টিকে বলা হয়েছে ‘রজ্বউন’। আর আকাশকে এখানে ধারণকারী বা প্রত্যাবর্তনস্থল বলা হয়েছে একারণে যে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নির্ধারিত সময়ে কক্ষ পরিভ্রমণ শেষে ফিরে আসে তাদের আগের জায়গাতেই।

‘জাতিস্ সদয়ী’ অর্থ যা বিদীর্ণ হয়। চাষ-বাসের সময় ভূমিকে বিদীর্ণ করা হয়। আবার লাঙ্গলও প্রবাহিত হয় মাটির বুক চিরে। আরো অনেক কারণে বিদীর্ণ করা হয় ভূমি। সেকারণেই এখানে শপথ করা হয়েছে বিদীর্ণ ভূমির। আর ‘ওয়ামা হুয়া বিল হায্লি’ অর্থ এবং এটা নিরর্থক নয়।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে’। একথার অর্থ—মক্কার মুশরিকেরা আমার রসুলের প্রতি পোষণ করে ঘোর বিদ্বেষ ও শত্রুতা।

বাইরে তারা তা পুরোপুরি প্রকাশ করে না। ষড়যন্ত্র করে গোপনে। অথবা— তারা সত্যের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করার জন্য আমার রসুলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের কলা-কৌশল।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি'। এখানে আল্লাহ্র কৌশল অবলম্বনের অর্থ, তিনি তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে তারা হয় অধিকতর পাপিষ্ঠ অথবা— তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন একারণে, যেনো পরকালে তাদের শাস্তি হয় অধিকতর মর্মন্তুদ।

শেষোক্ত আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও; তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি যেহেতু তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিচ্ছি, সেহেতু আপনিও এরকম করুন। তাদের বিনাশ বাসনায় ব্যতিব্যস্ত হবেন না। আমার আওতাবর্হিভূত হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। আর যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তো তাদেরকে দিবোই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

এখানে 'আম্হিল' ও 'মাহ্হিল' দু'টো শব্দের অর্থই— অবকাশ দাও। পরেরটি দ্বারা তাগিদ দেওয়া হয়েছে প্রথমটির। তাছাড়া দ্যোতনা সৃষ্টি করাও ছিলো এমতো দ্বিত্ব ব্যবহারের আর একটি উদ্দেশ্য।

'রুওয়াইদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় অল্প-বিস্তর, কিছু ইত্যাদি বুঝাতে। এখানে এর অর্থ— কিছুকাল। অর্থাৎ অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য, অনন্তকালের জন্য নয়। অথবা 'আরওয়াদ' শব্দটির ন্যূনতা প্রকাশক শব্দরূপ 'রুওয়াইদা' যার ধাতুমূল 'রওদুন' অর্থ— ধীরগতি সম্পন্ন। যেমন বলা হয় 'রদাতির রহি' (মন্দ মলয়)। ন্যূনতম শব্দরূপ ব্যতীত আরবী ভাষায় এর ব্যবহার নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য' কথাটিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শাস্তির হুমকি ও নিশ্চিত সংবাদ। অর্থাৎ কিছুকাল অবকাশ দেওয়ার পর তাদেরকে শায়েস্তা করা হবেই। তাই হয়েছিলো। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কিছুকাল পর বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করা হয়েছিলো তাদেরকে।

সূরা আ'লা

মহাপুণ্যভূমি মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানিতে রয়েছে ১টি রুকু এবং ১৯ টি আয়াত।

সূরা আ'লা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ﴿۱﴾ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ﴿۲﴾ وَ الَّذِىْ

قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣ وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥

- তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,
- যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।
- এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন,
- এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,
- পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

'সাব্বিহিস্‌মা' অর্থ তুমি নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। 'রব্বিকাল আ'লা' অর্থ তোমার সুমহান প্রতিপালকের। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতখানির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি আপনার প্রভুপালকের ওই সকল নামের মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যে নামগুলো সুনির্ধারিত কেবল তাঁর সুমহান সত্তার জন্য। অনুপযুক্ত, অযথার্থ এবং অপবিত্র (অংশীবাদিতা মিশ্রিত) নামে কখনো তাঁকে ডাকবেন না। আবার তাঁর জন্য নির্ধারিত নামে ডাকবেন না অন্য কাউকে অথবা কোনো কিছুকে। তাঁর নামোচ্চারণ করবেন অতীব সম্মান ও গুরুত্বের সঙ্গে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে নাম' অর্থ নামধারী পরম সত্তা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যার উপাসনা করছো, তা তো কেবল কতকগুলো নাম। আর সে নাম গুলো দিয়েছো তোমরাই'। অনেকে মনে করেন, এখানে 'নাম' (ইসিম) শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত সংযোগরূপে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তোমরা মুখের ভাষায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। বিরুদ্ধতা করো ওই সকল বিধর্মীদের, যারা বিভিন্ন অপনামে তাঁকে ডেকে কলংকিত করে তাঁর মহিমাকে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানে তসবীহ পাঠের (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার) যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করতে হবে বাচনিকভাবে। এর সমর্থন রয়েছে স্বসূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি বিবৃতিতে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. একবার 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' পাঠ করার পর বললেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। মনে হলো, তিনি স. যেনো নির্দেশটি এভাবেই বাস্তবায়িত করার জন্য আদিষ্ট।

কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, সকল প্রকারের পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে— বচনগত, কর্মগত ও বিশ্বাসগত। সুতরাং নির্দেশটিকে কেবল বাচনিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে ভাবার কোনো কারণ নেই। হাদিসের দ্বারাও কেবল মৌখিকভাবে তসবীহ পাঠের কথা প্রমাণিত হয় না। বরং বুঝতে হবে একই সঙ্গে মনে ও মুখে তসবীহ পাঠ করাই আলোচ্য নির্দেশনাটির উদ্দেশ্য। কেবল মুখের তসবীহ পাঠের তো কোনো মূল্যই নেই, যদি না তা হয় অন্তরের অন্তঃস্থলের বিশ্বাসোৎসারিত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাজ পাঠের। যেহেতু রসুল স.কে অন্যত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'সল্লি বি আমরি রব্বিকাল আ'লা' (আপনার মহান প্রভুপালকের নির্দেশে নামাজ পাঠ করুন)। এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করাও সম্ভব যে, নামাজের অভ্যন্তরে মুখে তসবীহ পাঠ করতে বলাই আলোচ্য নির্দেশনাটির উদ্দেশ্য। যেমন সুরা 'আল হাক্বক্বা'র তাফসীরে আমরা উল্লেখ করেছি, রসুল স. বলেছেন, একে তোমরা তোমাদের সেজদার সঙ্গে যোগ করে নাও। হজরত হুজায়ফার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. সেজদা অবস্থায় পাঠ করতেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও। উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে সবিস্তার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা আল হাক্বকার তাফসীরে।

এখানে 'রব' (প্রভুপালক) এর বিশেষণ 'আল আ'লা' (মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব)। পবিত্রতা (তসবীহ) এখানে কর্মের নিমিত্ত। আর আল্লাহ্পাকের মহাপ্রতাপের নিমিত্ত হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্য। তাঁর প্রতাপ-পরাক্রম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। সেকারণেই তাঁর মনোনীত নাম ব্যতিরেকে অন্য কোনো অযথার্থ নামে তাঁকে বিভূষিত করা যেতেই পারে না। বিধর্মীরা তাঁকে যে সকল অপনামে অভিহিত করে, তার চেয়ে তিনি অনেক অনেক পবিত্র ও মহান।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন'। 'আল্ লাজী খলাক্ব' অর্থ যিনি সৃষ্টি করেন। এখানে কর্মপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন— মৌলিক পদার্থসমূহ, মহাকাশ, মহাপৃথিবী, প্রাণী-উদ্ভিদ, জড়-অজড়, আশ্রয়সাপেক্ষ, আশ্রয়নিরপেক্ষ— সব। যেমন কোনো কোনো সৃষ্টি আবার স্বনির্ভর নয়, একক অথবা যৌথভাবে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। যেমন রঙ, পরিবর্তনশীল আকার— পানির, বাতাসের, শব্দ, অবস্থা, পরিস্থিতি, পরিমাপ ইত্যাদি। মানুষের কর্ম, অর্থাৎ কর্মজগতের স্রষ্টাও তিনিই।

'ফাসাও্ওয়া' অর্থ এবং সুঠাম করেন। অথবা পরিগঠন করেন স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে। কিংবা— তিনি সৃষ্টি করেন সুশৃঙ্খলতা ও সুবিন্যস্ততার চাহিদা অনুসারে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে— যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন'। এখানে 'ওয়াল্ লাজী ক্বদ্দারা' অর্থ এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন। ক্বারী কাসাই কথাটিকে পাঠ করতেন 'ওয়াল্ লাজী ক্বদারা'। অর্থাৎ তিনি সকল সম্ভাব্য সৃষ্টিতে সমর্থ। তবে প্রসিদ্ধ পাঠ হচ্ছে 'ক্বদ্দারা' তাশদীদযুক্ত 'দাল' সহযোগে।

বাগবী লিখেছেন, 'ক্বদ্দারা' ও 'ক্বদারা' সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে সকল সৃষ্টির জাতি, শ্রেণী, বৈশিষ্ট্য, নিয়তি, নিয়ন্ত্রণ, আকৃতি-প্রকৃতি-অবস্থা, কর্ম, উপজীবিকা, প্রবৃদ্ধি-স্থিতি সবকিছু নির্ধারণ

করে দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন সকল সৃষ্টির তকদীর। সে সময় তাঁর আরশ ছিলো পানির উপরে। মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল কিছুকে করা হয়েছে ভারসাম্যময়। এমনকি বোধবুদ্ধি এবং সতর্কতা-অসতর্কতাকেও।

'ফাহাদা' অর্থ এবং পথনির্দেশ করেন। অর্থাৎ যে পথে যেতে চায়, আল্লাহ্পাক তাকে সেই পথেই পরিচালিত করেন। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্পাক মানবজাতিকে দেখিয়েছেন কল্যাণ-অকল্যাণ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের পথ। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, সেই সকল কল্যাণের পথই দেখিয়েছেন তাদেরকে। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ—আল্লাহ্পাক মানবশিশুকে তার মাতৃউদরে বসবাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তাকে জানিয়েও দিয়েছেন তার বহির্গমনের পথের কথা। এরকম অর্থও গ্রহণ করা যায় যে— আল্লাহ্পাক যাকে হেদায়েত করতে চান, তাকে হেদায়েত করেন এবং গোমরাহ করেন তাদেরকে, যাদেরকে গোমরাহ করা তাঁর ইচ্ছা। যেনো পুরো বাক্যটি ছিলো এরকম 'ফাহাদা ওয়া আদ্বল্লা' (তিনিই পথ দেখান এবং পথভ্রষ্ট করেন)। 'আদ্বল্লা' বাক্যটিকে এখানে অনুল্লেখিত রাখা হয়েছে একারণে যে, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 'ইউদ্বিল্লু মাঁই ইয়াশাউ ওয়া ইয়াহ্দী মাঁই ইয়াশাউ'। অর্থাৎ 'ইউদ্বিল্লু' বলে দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট করেই। তাই এখানে কেবল 'ফাহাদা' বলাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন (৪), পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন'(৫)। এখানে 'ওয়াল্ লাজী আখ্রাজ্বাল্ মার্আ' অর্থ এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন। অর্থাৎ তিনিই ভুপৃষ্ঠে ঘটান সবুজের সমারোহ, তৃণভোজী পশুকুলের জন্য। 'ফাজ্বাআ'লাহু গুছাআন আহ্ওয়া' অর্থ পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। 'আহ্ওয়া' অর্থ ধূসর, কৃষ্ণবর্ণ। পদটি এখানকার 'গুছাআন' (আবর্জনা) এর বিশেষণ। আবার অনেকে বলেন, অবস্থাপ্রকাশক আগের আয়াতের 'মার্আ' (তৃণাদি) এর। অর্থাৎ সবুজ তৃণরাজিকে তিনি এক সময় পরিণত করেন ধূসর আবর্জনায়।

সূরা আ'লা' ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰٓ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِىْ يَصْلَى

النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾

r নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,

r আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।

r আমি তোমার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।

r উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;

r যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।

r আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

r যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে,

r অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

হজরত জিবরাইল যখন সদ্য অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ পাঠ করে শোনাতেন, তখন রসুল স. তা স্মৃতিস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আশংকা করতেন বিস্মৃতির। তাঁর এমতো অবস্থা লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না'। অর্থাৎ হে আমার রসুল! প্রত্যাদেশ স্মৃতিস্থ রাখার ব্যাপারে আপনি আর দুশ্চিন্তিত হবেন না। এখন থেকে এ ব্যাপারে আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করুন। প্রত্যাদেশবিস্মৃতি থেকে আমি আপনাকে চিরমুক্ত করে দিলাম। বিস্মৃতি আপনাকে আর স্পর্শ করবে না। আপনি যখন যে আয়াত পাঠ করতে চাইবেন, সেই আয়াতই আমি যথাযথরূপে আপনার কণ্ঠে উচ্চারিত করবো। বলা বাহুল্য, এর পর থেকে রসুল স. আর কোনো আয়াত ভুলে যেতেন না। এখানকার 'ফালা তান্সা' (ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না) বাক্যটিতে 'সীন' অক্ষরের পরে 'আলিফ' বৃদ্ধি করা হয়েছে দুটি আয়াতের মধ্যে যতিপাত ঘটানোর জন্য।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোরআন সংরক্ষণ করো। যিনি আমার জীবনাধিকারী, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ করে বলছি, এমন সময় আসবে, যখন ঔদাসীন্যের কারণে কোরআন অতিদ্রুত বেরিয়ে যাবে তোমাদের নাগালের বাইরে, যেমন হাঁটুর বেড়ি মুক্ত উট ছুটে পালিয়ে যায় দূরে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোরআনসংরক্ষক যেনো পায়ে বেড়ি পরানো উট। তার বেড়ি আলগা হলেই সে ছুটে পালায়। হজরত সা'দ ইবনে মাসআদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করার পর তা ভুলে যায়, সে পুনরুত্থিত হবে কুষ্ঠ রোগী হয়ে। আবু দাউদ, দারেমী।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন, তা ব্যতীত'। একথার অর্থ— কিন্তু আল্লাহ্ যদি না চান, তবে তা আপনি স্মৃতিবদ্ধ রাখতে পারবেন

না। ব্যাখ্যাটি জমহুরের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যে বিধান আমি রহিত করে দিবো, তার কথা আপনি আর মনে করতে পারবেন না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা নান্সাখ মিন আয়াতিন আও নুন্সিহা'। অর্থাৎ ভুলিয়ে দেওয়াও এক ধরনের রহিতকরণ (মনসুখ)। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, আলোচ্য আয়াতে মোজেজা রয়েছে দু'টি— ১. কোনোক্রমে ভুল না হওয়া, অথচ ভুল হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। ২. ভবিতব্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবগত করা। ব্যাখ্যাটি সঙ্গত বলে বিবেচ্য হতে পারবে কেবল তখন, যখন এখানকার 'ফালা তান্সা' বাক্যটিকে ধরে নেওয়া হবে সাধারণ না-বাচক। কিন্তু একে নিষেধাজ্ঞা সূচক বাক্য ধরা হলে এখানকার 'ইল্লা' (ব্যতীত) ব্যতিক্রমীটির অর্থ গ্রহণ করতে হবে— সাধ্যানুযায়ী কোরআন স্মৃতিবদ্ধ রাখা ওয়াজিব। তবে আল্লাহ্ যদি কোনো বিষয় ভুলিয়ে দিতে চান, তবে মানুষ তো এ ব্যাপারে নিরুপায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপনীয়'। অর্থাৎ— হে আমার প্রিয়তম নবী! আমি তো আপনার এবং অন্য সকলের গোপন-প্রকাশ্য ভাবনা বক্তব্য কর্ম সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আপনি জিবরাইলের পাঠ শুনে প্রকাশ্যে তা স্মৃতিস্থ করার জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তা যেমন আমি জানি, তেমনি জানি বিস্মৃতির যে আশংকা আপনি অন্তরে লালন করেন, তা-ও।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম জন! আমি আপনাকে দান করবো অপার্থিব সামর্থ্য। ফলে জান্নাতগমনের জন্য যে সকল কৃতকর্মকে নিমিত্ত করা হয়, সে সকল কৃতকর্ম সম্পাদন করা আপনার জন্য হয়ে যাবে সহজ। অর্থাৎ জান্নাতগমনের জন্য কোরআন স্মৃতিস্থ রাখা এবং কোরআনানুসারে জীবনযাপন করার সামর্থ্য আপনাকে দান করবোই। সুতরাং এব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আলোচ্য আয়াতের শব্দবিন্যাসে করা হয়েছে কিছু অগ্র-পশ্চাৎ। মূল বাক্যটি যদি হতো 'নুইয়াস্সিরুকা লিল্ইউস্রা লাকা' তবে তার অর্থ দাঁড়াতো— আমি আপনার জন্য সৃষ্টি করে দিবো সহজসাধ্যতা। কিন্তু এখানে 'ওয়া নুইয়াস্সিরুকা লিল ইউস্রা' বলাতে বক্তব্যবিষয়ে ঘটেছে আধিক্য। মূল বাক্যে আকাংখিত বস্তু ছিলো সহজসাধ্যতা, বস্তুত রসুল স. ছিলেন তার আকাংখাকারী। আর উদ্ধৃত বাক্যে শব্দবিন্যাসের অগ্র-পশ্চাৎ ঘটানোতে সহজসাধ্যতা বা সুগমতাই হয়েছে আকাংখাকারী এবং আকাংখিতজন হয়েছেন রসুল স. স্বয়ং। যেমন রিজিকের আকাংখাকারী হচ্ছে মানুষ, কিন্তু রিজিক যদি হয় অবশ্যম্ভাবী, তবে বলা হয়— আরে রিজিক তো তাকেই তালাশ করে বেড়াচ্ছে।

আমি বলি, বিশুদ্ধ প্রেমানুরাগের মহিমা তো এরকমই হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ইউস্রা' অর্থ পুণ্যকর্ম। কতক বিদ্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— আমি আপনাকে দান করবো সহজতর ও বিশুদ্ধ শরিয়ত বহনের সামর্থ্য।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'ফা জাক্‌কির ইন্‌ নাফাআ'তিজ্‌ জিকরা' (উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়, তবে উপদেশ দাও)। এখানকার 'ফাজাক্‌কির' বাক্যের 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ আমি যখন কোরআন ও শরিয়তের দায়িত্ববহন আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি, তখন আপনি এর অনুকূলে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করুন। দান করুন সদুপদেশ, যদি তা ফলপ্রসূ হয়। এখানকার 'তবে উপদেশ দাও' কথাটি আগের 'উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়' বাক্যের শর্তের পরিণতিপ্রকাশক। সেকারণেই এখানে নতুন করে শর্তসূচক শব্দ 'ইন' উল্লেখের আর প্রয়োজন পড়েনি। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বার বার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক লোকের সত্যবিমুখতা রসুল স.কে যাতে নিরাশ না করে, তাই এখানে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে বলা হয়েছে— উপদেশ দিন, দিতে থাকুন। হয়তো তা এক সময় ফলপ্রসূ হবে। নিরাশ হবেন না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আপনি ইমান গ্রহণে তাদেরকে তো বাধ্য করতে পারবেন না। আবার কতিপয় বিদ্বান বলেছেন, বাহ্যত বাক্যটি শর্তযুক্ত হলেও তিরস্কারার্থক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিরস্কার করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকেই। একটু পরোক্ষভাবে একথাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা চিরদুর্ভাগা। তাই শুভউপদেশ তাদের উপরে ফলপ্রসূ হয় না।

এরকমও বলা হয়েছে যে, উপদেশ দিতে হবে তখন, যখন তা ফলপ্রসূ হবে। অর্থাৎ যখন অত্যাবশ্যক হবে সৎকাজে আদেশ-অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব। একারণেই এখানে রসুল স. এর প্রতি এই নির্দেশনাটি দেওয়া হয়েছে যে, যারা সত্যবিমুখ তিনি যেনো তাদেরকে উপেক্ষা করেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শর্তের একটি অংশ এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনার উপদেশ ফলপ্রসূ হোক আর না হোক, আপনি উপদেশ দিতেই থাকুন।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে'। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, উপদেশ ফলপ্রসূ হবে তার উপরেই। কেননা তারাই উপাদেশাবলীর মর্ম বোঝে, এই নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং কর্মসম্পাদন করে তদনুসারে।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'আর তা উপেক্ষা করবে, যে নিতান্ত হতভাগ্য'। এখানে 'আল্‌আশক্বা' অর্থ যে হতভাগ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। 'আল' এখানে সীমিতার্থক। তাই বুঝতে হবে এখানে 'যে উপেক্ষা করবে' বলে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে ওলীদ ইবনে রবীয়া এবং উতবা ইবনে রবীয়াকে। অর্থাৎ তারাই নিতান্ত হতভাগ্য। তৎসহ নিতান্ত হতভাগ্য তারা, যারা তাদের মতো উদ্ধত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। বলা বাহুল্য, পাপী বিশ্বাসীরা নিতান্ত হতভাগ্য নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করবে (১২), অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' (১৩)। একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জাহান্নামের লেলিহান অগ্নির মধ্যে অনুপ্রবেশ করবেই। আর সেখানে তারা অগ্নিশাস্তি ভোগ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। সেখানে তারা মৃত্যুমুখেও পতিত হবে না। কেননা মৃত্যু ঘটলে শাস্তিতো শেষ হয়ে যায়। আবার তারা সেখানে বেঁচে থাকার যে সুখ, তা-ও কখনো অনুভব করতে পারবে না। কারণ তাদেরকে সেখানে শাস্তি দেওয়া হবে বিরতিহীনভাবে। লক্ষণীয়, শুধু শুধু শাস্তির চেয়ে সার্বক্ষণিক শাস্তি অধিক যন্ত্রণাদায়ক। আর কালের দিক থেকে শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করার মধ্যেও রয়েছে অগ্রসরতা। একারণেই শাস্তির ভয়াবহতা ও অস্তিত্ব দুদিক থেকেই সার্বক্ষণিক শাস্তি শুধু শাস্তির চেয়ে পশ্চাদবর্তী। তাই এখানে 'সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' কথাটির শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছুম্‌মা' (অতঃপর) অব্যয়টি।

সূরা আ'লা ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ﴿١٩﴾

- নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।
- এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।
- কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
- অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।
- ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—
- ইব্‌রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে'। আলোচ্য আয়াত থেকে তিন ধরনের পবিত্রতা সাফল্য লাভের চাবিকাঠি বলে প্রতীয়মান হয়—

১. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা— অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার কদর্যতা থেকে হৃদয়কে পবিত্র রাখা। মুক্ত থাকা প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে এবং আল্লাহ্‌র জিকিরের ব্যাপারে গাফলিত বা ঔদাসীন্য থেকে।

২. বাহ্যিক পবিত্রতা— হালাল উপার্জন, জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের পরিশুদ্ধায়ন। ৩. দৈহিক পবিত্রতা— পরিধেয় ও দেহকে নাপাক বস্তুসমূহ থেকে মুক্ত করণ ইত্যাদি। এই ত্রয়ী পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে যে, সে-ই লাভ করবে সাফল্য।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে'।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় সাফল্য লাভ করে সে, যে বিশুদ্ধ হয়, সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমাকে স্বীকার করে রসুল বলে। আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এবং যত্নের সঙ্গে সম্পাদন করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, এখানে 'প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে' অর্থ তকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে। তাঁরা আরো বলেন 'তকবীরে তাহরীমা' বা প্রথম তকবীর নামাজের অঙ্গ নয়, বরং শর্ত। কেননা এখানকার 'ফা সল্লা' (ও সালাত কায়েম করে) বাক্যের 'ফা' অব্যয়টি যোজক, অনুক্রমার্থক। সুতরাং বুঝতে হবে, যোজ্য ও যোজিত যেহেতু পৃথক, সেহেতু তকবীরে তাহরীমা এবং সালাত পৃথক বিষয়। অর্থাৎ তকবীরে তাহরীমা নামাজের অংশ নয়।

একটি সংশয় ঃ নির্দিষ্ট বিষয় কিন্তু অনির্দিষ্টের অন্তর্ভূত নয়। তবু নির্দিষ্টকে অনির্দিষ্টের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। নিয়মটি ঐকমত্যসম্মতও। এই হিসেবে তাকবীরে তাহরীমা নামাজের অংশ হয়ে যায়। আর একে নামাজের অংশ বললে অসুবিধা কোথায়?

নিরসন ঃ নির্দিষ্টকে অনির্দিষ্টের সঙ্গে সংযোজন করা হয় বিশেষ এক পর্যায়ে। যেমন নির্দিষ্টকে অধিক গুরুত্ব প্রদানার্থে। যেমন করা হয়েছে অনির্দিষ্ট সকল নামাজের সঙ্গে আসরের নামাজের। সেখানে কেবল 'মধ্যবর্তী নামাজ' বলে আসরের নামাজকে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ ফেরেশতাদের সঙ্গে হজরত জিবরাইলের উল্লেখও করা হয়েছে তাঁর অনন্যসাধারণ মর্যাদা প্রকাশার্থে। কিন্তু এখানে তো সেরকম কোনো বিশেষ পর্যায়ের কথা ভাববার অবকাশ নেই। আরবী সাহিত্যে এরকম সাধারণার্থক কোনো দৃষ্টান্তও নেই। একারণেই ফরজ নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে নফল নামাজ পাঠকারীর সংযুক্তি (নিয়ত) সঠিক। সঠিক নফল নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে নফল নামাজ পাঠকারীর সংযুক্তিও। বরং আবুল ইয়াসারের বর্ণনানুসারে নফল নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে ফরজ নামাজ পাঠকারীর সংযুক্তিও অবিশুদ্ধ নয়। কিন্তু সাধারণ হানাফীগণ শেষোক্ত অভিমতটিকে স্বীকার করেন না।

আমি বলি, তকবীরে তাহরীমাকে যদি নামাজের শর্ত ধরে নেওয়া হয়, তবুও তা অবলম্বনের সিদ্ধতা জরুরী নয়। যেমন নিয়ত নামাজের শর্ত। কিন্তু এক নিয়তে দুই নামাজ সিদ্ধ নয়। আবার ওজু নামাজের শর্ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য পৃথক পৃথক ওজু করা ওয়াজিবও ছিলো। তবে ফরজ নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে অনুগামী হিসেবে নফল নামাজ পাঠকারীর নামাজ অবশ্যই সঠিক। কেউ যদি জোহরের নামাজ চার রাকাত পূর্ণ করার পর ভুলক্রমে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তাকে আরো এক রাকাতসহ মোট ছয় রাকাত নামাজ পড়তে হয় এবং এমতাবস্থায় তার শেষের দুই রাকাত হয়ে যায় নফল।

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ গবেষকের মতে নামাজের অন্যান্য স্তম্ভের মতো তকবীরে তাহরীমাও একটি স্তম্ভ এবং অন্যান্য স্তম্ভের মতো এই স্তম্ভটিও অবশ্য সম্পাদ্য। বরং এটা তো অন্যান্য স্তম্ভের প্রারম্ভিক নিদর্শন। হানাফীগণের বক্তব্য হচ্ছে, নামাজের বাইরের শর্তগুলো তো নামাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নতুবা আলাদাভাবে এগুলোর নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নেই। যার দেহ ও বস্ত্রে অপবিত্রতা আছে, অথবা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত, কিংবা সূর্য এখনো ঢলে পড়েনি, বা কেবলামুখী হওয়া হয়নি— এমতাবস্থায় তকবীরে তাহরীমা উচ্চারিত হলো, পরক্ষণে বর্ণিত বিঘ্নগুলো অপসারিত হলো— লজ্জাস্থান আবৃত করা হলো, দূর হয়ে গেলো বস্ত্রের ও দেহের অপবিত্রতা, সূর্যও ঢলে পড়লো এবং কেবলামুখী হওয়ার কাজও সম্পন্ন হলো, এমতাবস্থায় নামাজ পাঠ করলে তা সঠিক হবে। 'কাফী' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের কিছুসংখ্যক হানাফী বিদ্বানের মতে তকবীরে তাহরীমা নামাজের রোকন। তাহাবীও এরকম বলেন। আর এরকম মন্তব্য গৃহীত হলে উপরোল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর গুরুত্ব তো আর থাকেই না।

আমি বলি, সম্ভবত এখানকার 'প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে' কথাটির অর্থ আজান ও ইকামত। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে তকবীরে তাহরীমাকে নামাজের রোকন প্রমাণ করার অবকাশ আর এখানে থাকে না। 'পবিত্রতা অর্জন করে' এবং 'তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে' কথাদু'টোর অর্থ কিছুসংখ্যক আলেম করেছেন— সদকায়ে ফিতর এবং ঈদের তকবীরসমূহ। আতাও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ 'তাযাক্কা' (যে পবিত্রতা অর্জন করে) কথাটির অর্থ করেছেন— যে দান খয়রাত করে। তিনি বলতেন— যে ব্যক্তি সদকা করে, অতঃপর নামাজ পাঠ করে। এরপর তিনি আবৃত্তি করতেন আলোচ্য আয়াত।

নাফে বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ঈদের দিন ফজরের নামাজ পাঠ করার পর বলতেন, নাফে! সদকায়ে ফিতর কি আদায় করা হয়েছে? আমি 'না' বললে তিনি বলতেন, এক্ষুণি দিয়ে দাও। জানো না, 'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে' অবতীর্ণ হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই। আবুল আলিয়া ও ইবনে সিরীনও এরকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, এরকম ব্যাখ্যা কীভাবে গ্রহণ করা যায়? কেননা এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর তখন সেখানে না ছিলো ঈদ, না ছিলো জাকাত-সদকা। এর জবাবে বাগবী লিখেছেন, হতে পারে আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছিলো পূর্বাহ্নে, মক্কায়, যার উপরে আমল করা হয় পরে, মদীনায়। লক্ষণীয়, সুরা বালাদও অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। তখন বলা হয়েছিলো, 'আর আপনি এই নগরের বৈধ অধিকারী হবেন'। অথচ একথা বাস্তবায়িত হয়েছিলো অনেক পরে মক্কাবিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর। তেমনি এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা অচিরেই পরাজিত হবে দলে বলে, করবে পশ্চাদপসরণ'। এই আয়াতও মক্কায় অবতীর্ণ।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি বুঝতে পারতাম না, পরাজিত হবে এবং পশ্চাদপসরণ করবে কারা। কিন্তু পরে যখন বদর যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আমি দেখলাম, রসুল স. এই আয়াত আবৃত্তি করছেন।

আমি বলি 'পরাজিত হবে' 'পশ্চাদপসরণ করবে' কথাগুলো ভবিষ্যতকাল-জ্ঞাপক। সুতরাং এক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু এখানকার 'স্মরণ করেছে' 'কায়েম করেছে' কথাদু'টো তো অতীতকালবোধক। সুতরাং এখানে আমলের পরবর্তিতার কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে কীভাবে?

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'সল্লা' (সালাত) অর্থ দোয়া। দোয়ার সুন্দরতম পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হবে প্রথমে ও শেষে। হজরত ফুজালা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক লোক এসে নামাজ পাঠ করলো। তারপর প্রার্থনা করতে শুরু করলো। বললো, হে আল্লাহ্! আমাকে মার্জনা করো। আমার প্রতি বর্ষণ করো তোমার কৃপা। রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, হে প্রার্থনাকারী! তুমি তো তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। তোমার উচিত ছিলো প্রথমে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি করা। তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং শেষে প্রার্থনা জানানো। বর্ণনাকারী বলেন, এর পর উপস্থিত হলো আর একজন। সে-ও নামাজ পাঠ করলো। তারপর দোয়া শুরু করলো প্রথমে আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা বর্ণনা ও দরূদ শরীফ পাঠের পর। প্রার্থনা শেষ হলে রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, এভাবেই প্রার্থনা করতে থাকো। তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে।

তিরমিজি, নাসাঈ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার মসজিদে নামাজ পাঠ করলাম। সেখানে রসুল স. এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মান্যবর আবু বকর ও মাননীয় ওমর। নামাজ শেষ করে আমি বসে বসে দোয়া করতে শুরু করলাম। প্রথমে বর্ণনা করলাম আল্লাহ্‌পাকের প্রশস্তি। তারপর পাঠ করলাম দরূদ। শেষে যাচনা করলাম নিজের জন্য। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, এভাবে চাইতে থাকো, পেয়ে যাবে।

আমাদের মহান শায়েখ মওলানা ইয়াকুব চরখী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে রয়েছে আধ্যাত্ম্য পথচারীর ক্রমময় বিভিন্ন স্তরের প্রতি ইঙ্গিত। যেমন— ১. 'ক্বদ আফ্‌লাহা মান তাযাক্‌কা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে তওবা ও আত্মশুদ্ধির। ২. জবানী, কলবী, রূহানী ও খফি (গোপন) জিকিরে নিমগ্নতার কথা বলা হয়েছে 'ওয়াজাকারাস্‌মা রব্বিহী' দ্বারা। ৩. আর 'ফাসাল্‌লা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মুশাহিদার (দর্শনের) প্রতি। কেননা নামাজ হচ্ছে মুমিনগণের মেরাজ। রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, নামাজ আমার চোখের শান্তি। আহমদ, নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী।

আমি বলি, হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি এ সম্পর্কে বলেছেন, এখানে 'তাযাক্‌কা' এবং 'জাকারা' শব্দদ্বয়ের 'ওয়াও' যোজক দ্বারা সংযুক্তি এবং 'ফাসল্‌লা' এর 'ফা' যোজকটির ব্যবহার জিকিরের বিশেষ পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিতার্থক।

অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক পথিকদের জন্য জিকির হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে 'ইসমে জাত' (আল্লাহ্) অথবা 'নফি এসবাত' (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্)। তিনি আরো বলেছেন, আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে নামাজের পুরোপুরি কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। পরমতম সত্তার জ্যোতিচ্ছটা এবং তাঁর নৈকট্যের দিকে উন্নতির জন্য নামাজই মূল মাধ্যম। সুতরাং নামাজ যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক আত্মশুদ্ধিও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও (১৬), অথচ আখেরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী' (১৭)। একথার অর্থ— হে হতভাগার দল! তোমরা তো অজ্ঞ, অন্ধ ও অপবিত্র। তাই তোমরা আত্মশুদ্ধির পথে আগমন করো না। করো না আল্লাহ্র জিকির। পাঠ করো না নামাজ। তাই তো তোমাদের অযথার্থ বিবেচনায় প্রাধান্য পায় পার্থিবতা, যা অবক্ষয়প্রবণ, নশ্বর ও অস্থায়ী। অথচ স্থায়ী, উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর হচ্ছে আখেরাত। সেখানে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখসম্ভার। রয়েছে পরম প্রেমময় প্রভুপালকের পরিতোষ, নৈকট্য ও দীদার।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে— (১৮) ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে' (১৯)। আলোচ্য আয়াতদ্বয় যাবতীয় ধর্মীয় অনুশীলনকে অন্তর্ভূতকারী। সকল আকাশীগ্রন্থের সারসংক্ষেপ; বিশেষ করে নবী ইব্রাহিম ও নবী মুসার গ্রন্থের। এখানকার 'সুহুফি ইব্রহীমা ওয়া মূসা' (ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে) কথাটি আগের আয়াতের 'সুহুফিল উ'লা' (পূর্ববর্তী গ্রন্থে) কথাটির আংশিক অনুবর্তী।

হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বাযযার বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে' তখন রসুল স. বললেন, এ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ ছিলো নবী ইব্রাহিম এবং নবী মুসার পুস্তিকায়। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'এটা তো আছে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য সুরায় উল্লেখিত বিষয়াবলীর প্রতি।

কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, নামাজে ফারসী ভাষায় কোরআন আবৃত্তি সিদ্ধ। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে সহজভাবে কোরআন পাঠ করার কথা। আবার এখানে বলা হয়েছে 'এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে'। অন্যত্র বলা হয়েছে 'নিশ্চয় এটা ছিলো পূর্ববর্তী যবুরে'। আর একথা তো ঠিকই যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের ভাষা আরবী ছিলো না। কিন্তু বক্তব্যবিষয় ছিলো এক। কাজেই কোরআনের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা যায়, এরকম যে কোনো ভাষাতেই নামাজের মধ্যে কোরআন পাঠ করা যাবে।

আমি বলি, হানাফীগণের এই অভিমতটি ভুল। কারণ কোরআন হচ্ছে শব্দ ও অর্থের মিলিত নাম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সরল আরবী ভাষায় কোরআন'। অন্যত্র বলা হয়েছে 'নিয়ে এসো অনুরূপ একটি সুরা'। বলা বাহুল্য,

প্রতিটি সুরার পাঠই এরকম অজেয়। একারণেই 'মিছলিহি' (অনুরূপ) কথাটির মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে— পাঠরীতির সমতুল। অর্থাৎ কোরআনের ভাষাশৈলী যেমন, তেমনই। সুতরাং কোরআনের অক্ষরান্তর কখনো কোরআন নয়, সে যে ভাষায় অক্ষরান্তর ঘটানো হোক না কেনো। তাই কোরআনের অনুবাদ গ্রন্থ ওজু-গোসলহীন অবস্থায় স্পর্শ করা দোষের নয়। বরং অপবিত্র দেহে এবং ঋতুবতী অবস্থাতেও তা পাঠ করা যাবে। অর্থাৎ 'ইন্নাহু লাফী যাবুর' (নিশ্চয় এটা ছিলো পূর্ববর্তী যবুরে) আয়াতের 'এটা' সর্বনামটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও তা হবে রূপকার্থক। অতএব একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কেবল ভাব ও বিষয়বস্তুর নাম কোরআন নয়। কোরআন হচ্ছে শব্দ ও অর্থের সম্মিলিত নাম।

হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. এই সুরাটিকে খুব ভালোবাসতেন। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. বিতির নামাজের প্রথম দুই রাকাতে পড়তেন যথাক্রমে সুরা আ'লা ও সুরা কাফিরূন। আর তৃতীয় রাকাতে পাঠ করতেন সুরা এখলাস, অথবা ফালাক্ব, অথবা নাস। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বিতির নামাজের প্রথম রাকাতে পাঠ করতেন 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা', দ্বিতীয় রাকাতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ'। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দুই ঈদ ও জুমআর নামাজে পাঠ করতেন 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা' এবং 'হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়্যাহ'। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত সামুরা বর্ণনা বলেছেন, রসুল স. জুমআর নামাজে পাঠ করতেন সুরা আ'লা ও সুরা গশিয়াহ।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, নুযুলের (আত্মিক অবরোহণের) ক্ষেত্রে যেমন সুরা আলাম নাশরাহ্ প্রভাবশীল, তেমনি উরুজের (আত্মিক উর্ধ্বারোহণের) ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী সুরা আ'লা।

সূরা গশিয়াহ্

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এর মধ্যে রুকু রয়েছে ১টি এবং আয়াত ২৬টি।

সূরা গশিয়াহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ﴿٣﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۙ﴿٤﴾ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ؕ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ؕ﴿٧﴾

r তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ আসিয়াছে?
r সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,
r ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে,
r উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;
r উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;
r উহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত,
r যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে 'তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ পৌঁছেছে'? প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার নিকট নিশ্চয় পৌঁছেছে মহাপ্রলয়ের সংবাদ। 'গশিয়াহ্' অর্থ এখানে— মহাপ্রলয়, যেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— নরকাগ্নি। কেননা এর পরেই বলা হয়েছে নরকাগ্নির কথা। কিন্তু যেহেতু এরপর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়ের পরিণতির কথা ধারাবাহিকভাবে এসেছে, তাই 'গশিয়াহ্' অর্থ এখানে মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থান গ্রহণ করাই উত্তম।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত (২), ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে' (৩)।

এখানে 'উজুহুন' অর্থ মুখমণ্ডলসমূহ। ব্যবহৃত 'তানভীন' এখানে আধিক্যপ্রকাশক। তাই শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— অনেক মুখমণ্ডল। অথবা 'তানভীন' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সম্বন্ধ পদকে অনুক্ত রেখে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডল, যাদের সংখ্যা হবে অনেক। 'খশিয়াহ্' অর্থ অবনত, নত, হেয়, লাঞ্ছিত— দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণে।

'আ'মিলাতুন' অর্থ ক্লিষ্ট এবং 'নাসিবাহ্' অর্থ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। অর্থাৎ তারা পরিশ্রান্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে নরকে। 'নাসবাতুন' এর ধাতুমূল 'নাসবুন'। হাসান বসরী বলেছেন, পৃথিবীতে তারা যেহেতু আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে কোনো কর্মই করে না, সেকারণে তখন আল্লাহ্পাক তাদেরকে কর্মক্লান্ত করে ছাড়বেন। কণ্ঠদেশে হাঁসুলি ও শৃঙ্খলের গুরুভার চাপিয়ে দিয়ে মহাবিচারের দিবসে পরিশ্রান্ত করা হবে তাদেরকে। কাতাদাও এরকম বলেছেন। আউফি বর্ণনা করেছেন, এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাসও। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তারা নরকে এমনভাবে দেবে যাবে, যেমন চোরাবালিতে দেবে যায় উট।

কালাবী বলেছেন, তাদেরকে অধোমুখী করে টেনে হিচঁড়ে নিয়ে যাওয়া হবে নরকে। জুহাক বলেছেন, তাদেরকে আরোহণ করানো হবে দোজখের লৌহ-গিরিশৃঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে' বলে বুঝানো হয়েছে পৌত্তলিকদের দুরবস্থার কথা। বুঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদী-খৃষ্টানকে ও যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করেছে সন্ন্যাসব্রত। আল্লাহ্পাক তাদের এমতো পণ্ডশ্রম গ্রহণ করেন না। তাদের দোজখবাস অবধারিত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জায়েদ ইবনে আসলাম এবং আতা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস। সুদ্দী এবং ইকরামা বলেছেন, এজগতে পাপের ভার বহনকারী এবং পরজগতে দোজখের দুঃখ-কষ্ট ভোগকারীদের সম্পর্কেই এখানে বলা হয়েছে 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে—'তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন দোজখের আগুনকে করা হবে অধিকতর উত্তপ্ত এবং চাপিয়ে দেওয়া হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপর।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে'। সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এখানকার 'আনিয়াহ্' শব্দটির অর্থ সর্বোচ্চ মাত্রার উষ্ণতা। হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, যে পদার্থের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাকেই আরববাসীরা বলে 'ক্বদ আনিয়া হাররাহ'। এখানে 'মিন আইনিন আনিয়াহ্' বলা হয়েছে সে কথা বুঝাতেই। কেউ কেউ বলেছেন, সৃষ্টিলগ্ন থেকে দোজখ ওই অত্যুষ্ণ প্রস্রবণের উপরে জ্বলছে। তাফসীরবেত্তাগণ লিখেছেন, পিপাসার্ত নারকীদেরকে পান করানো হবে এমন উত্তপ্ত পানি, যা একটা পর্বতগাত্রে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে পুরো পর্বত।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না, কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত'। নহশল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহাদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে জুহাক বিবৃত করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'দ্বরী' (কণ্টকময় গুল্ম) এমনই বস্তু, যা পিলু বৃক্ষের চেয়েও তিক্ত। বাসী মৃতদেহ অপেক্ষাও অধিক দুর্গন্ধযুক্ত এবং আগুনের চেয়েও অধিক উত্তপ্ত। বিষাক্ত ও কণ্টকাকীর্ণ। ওই কণ্টকময় উদ্ভিদ যদি কাউকে খাওয়ানো হয়, তবে সে তাকে না উদরস্থ করতে পারবে না, পারবে উগলে ফেলে দিতে। বরং তা আটকে থাকবে কণ্ঠদেশে। ওই উদ্ভিদ ভক্ষণ করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি যেমন হবে না, তেমনি পরিতৃপ্ত হবে না ক্ষুন্নিবৃত্তিও। এমতো বিপদের মধ্যে আবার পান করানো হবে উত্তপ্ত পানি।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন 'দ্বরী' (কণ্টকময় গুল্ম) অর্থ যাক্কুম বা কণ্টকময় উদ্ভিদ। হজরত আবু দারদা থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীরা

তখন আক্রান্ত হবে এমন অনন্ত ক্ষুধায় যে, তা যেনো হয়ে যাবে সকল শাস্তির সমতুল। মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদা বলেছেন, ‘দ্বরী’ এমন এক কাঁটাভরা গাছ, যার শিকড়গুচ্ছ মৃত্তিকা স্পর্শমুক্ত। কুরায়েশেরা একে বলে ‘শাবরক’। এর বিশুষ্ক অবস্থাকেই বলে ‘দ্বরী’। এটা একটা অতি নিকৃষ্ট খাদ্য। কালাবী বলেছেন, ‘শাবরক’ যখন শুকিয়ে যায়, তখন তার কাছে চতুষ্পদ জন্তুরাও ভিড়ে না। ইবনে আবী জায়েদ বলেছেন ‘দ্বরী’ বলে পৃথিবীর যাবতীয় শুষ্ক, কণ্টকময়, পত্রপুষ্পহীন ঝোপঝাড়গুলোকে। আর পরবর্তী পৃথিবীর ‘দ্বরী’ হবে ভীষণ উত্তপ্ত ও কণ্টকময়।

ভাষ্যকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পৌত্তলিকেরা বলতে শুরু করলো, আমাদের উটগুলো তো ‘দ্বরী’ খেয়ে খেয়েই বেড়ে ওঠে, হৃষ্টপুষ্ট হয়। উট সাধারণত ভক্ষণ করে সতেজ লতাগুল্ম। শুকিয়ে গেলে তারা আবার এর ধারে কাছেও ঘেষে না। জাহান্নামে তো থাকবে এগুলোই। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৭)। বলা হয়—

‘যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না’। একথার অর্থ— ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ ও পুষ্টি সাধন, খাদ্যগ্রহণের এই দু’টি উদ্দেশ্যের একটিও পূরণ হবে না জাহান্নামের কণ্টকময় যাক্কুম বৃক্ষ ভক্ষণ করলে। অর্থাৎ তা হবে উদ্দেশ্যবিবর্জিত আহার। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘তোমরা যেরকম ধারণা করো, আমার রসুল সেরকম আদৌ নন— নন গণৎকার, যাদুকর, অথবা কবি’। কেননা এর সবগুলোই রসুল হওয়ার প্রতিবন্ধক। লক্ষণীয় এখানে বলা হয়েছে দু’ধরনের দোজখীর কথা— এক ধরনের দোজখীকে পান করানো হবে কেবল ‘দ্বরী’ এবং আর এক ধরনের দোজখীকে ‘দ্বরী’ ও ‘যাক্কুম’।

সূরা গশিয়াহ্ ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

r অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,
r নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত,
r সুমহান জান্নাতে—
r সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না,
r সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,
r উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা,

r প্রস্তুত থাকিবে পানপাত্র,
r সারি সারি উপাধান,
r এবং বিছান গালিচা;

প্রথমে বলা হয়েছে 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল'। এখানে 'উজুহুন' অর্থ মুখমণ্ডল। আর এখানে 'তানভীন' প্রযুক্ত হয়েছে বিশেষার্থে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ক্ষেত্রে আধিক্য প্রকাশার্থে এবং এখানে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত সম্বন্ধপদের স্থলে। আর এখানেও 'মুখমণ্ডল' অর্থ মুখমণ্ডলধারী। এখানে 'নায়িমাহ্' অর্থ আনন্দোজ্জ্বল, সতেজ।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত (৯), সুমহান জান্নাতে' (১০)। একথার অর্থ— কৃতকর্মের যথাবিনিময় পেয়ে তখন বিশ্বাসীরা হবে পরিতৃপ্ত, যার জাজ্জ্বল্যমান প্রতিভূ হবে উন্নতমানের জান্নাত।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না'। এখানে 'লা 'তাস্মাউ' অর্থ তারা শুনবে না। অর্থাৎ শুনবে না ওই মুখমণ্ডলধারীগণ। অথবা এখানে সম্বোধিতজন হতে পারেন রসুল স.। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম জন! জান্নাতাভ্যন্তরে আপনি কাউকে অর্থহীন, অশিষ্ট কথা বলতে শুনবেন না। 'লাগিয়াহ্' অর্থ অসার বাক্য, অর্থহীন কথা।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ'। এখানকার 'আ'ইনুন' (প্রস্রবণ) শব্দটিতে তানভীন প্রযুক্ত হয়েছে মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবাহিত হতে থাকবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্রোতস্বিনী, ওই স্রোতস্বিনীসমূহের প্রবাহে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন মধু, কর্পুর, দুধ, অথবা সুরাবিশিষ্ট পৃথক পৃথক ধারা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের স্রোতস্বিনীসমূহ উৎসারিত হতে থাকবে মেশকের গিরিমালা থেকে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা'। একথার অর্থ— জান্নাতবাসীদের আসনসমূহ হবে সমুন্নত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু তালহা। আর হজরত আবু সাঈদ থেকে আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের দু'টি শয্যার মধ্যে ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর দূরত্বের মতো। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধানের কথা। তিনি আরো লিখেছেন, শয্যাগুলির পারস্পরিক মর্যাদাগত ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের মতো।

ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উমামা বলেছেন, যদি উপরের শয্যার চাদর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে চল্লিশ বছরেও তার প্রান্ত পৌঁছতে পারবে না নিচের শয্যা পর্যন্ত। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, শয্যার চাদরের প্রান্ত উপর থেকে নিচে পৌঁছতে সময় লাগবে দুই শত বছর।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সুখাসনগুলোর তক্তা হবে স্বর্ণের এবং তার প্রান্ত হবে জমরুদ, ইয়াকুত ও মোতির। আসনগুলো হবে অত্যুচ্চ। কিন্তু জান্নাতবাসীরা তাতে উপবেশন করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অবনমিত হবে। আবার তার উপরে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো উঁচু হয়ে যাবে আগের মতো।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র'। এখানকার 'আক্ওয়াব' শব্দটি 'কুওব' এর বহুবচন। এর অর্থ—পানপাত্র, পেয়ালা, সুরাহী। মুজাহিদের ব্যাখ্যা উল্লেখ করে হান্নাদ বলেছেন 'আক্ওয়াব' হচ্ছে হাতলবিবর্জিত পানপাত্র। 'মাওদূয়াহ্' অর্থ প্রস্তুত থাকবে। অর্থাৎ ওই পানপাত্রগুলো সুরক্ষিত থাকবে স্রোতস্বিনীসমূহের তীরে তীরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সারি সারি উপাধান (১৫) এবং বিছানো গালিচা' (১৬)। একথার অর্থ— সেখানে আরাম আয়েশে বসা ও ঠেস দেওয়ার জন্য থাকবে সারি সারি তাকিয়া, বালিশ। বিছানো থাকবে মসৃণ ও মনোহর গালিচাসমূহ। এখানকার 'নামারিক্ব' (উপাধান) শব্দটি 'নুমরিকাহ্' অথবা 'নামরিকাহ্'র বহুবচন। আর 'যারাবিয়্যু' বহুবচন 'যারবিয়াতুন' এর।

জান্নাতের এ সকল সুখোপকরণসমূহের কথা যখন মক্কার মুশরিকেরা শুনলো, তখন তারা বিশ্বাস করলো না। প্রকাশ করলো তাদের অস্বীকৃতিসূচক বিস্ময়। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা গশিয়াহ্ ঃ আয়াত ১৭— ২৬

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

r তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?

r এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে?

r এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?

r এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে?

r অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা,
r তুমি উহাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নহ।
r তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে
r আল্লাহ্ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।
r উহাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;
r অতঃপর উহাদের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, যখন বেহেশতের সুখসম্ভারের বিবরণসম্বলিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. সেগুলোর কথা ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝাতে লাগলেন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর এসকল কথা বিশ্বাস করলো না। উড়িয়ে দিলো অলীক বলে। বললো, অতো উঁচু আসনে মানুষ বসবে কী করে? অতো বেশী পানপাত্র প্রস্তুত করে রাখার দরকারই বা কী? বিছানার চাদর আবার এতো বেশী লম্বা হয় না কি? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে'? অর্থাৎ উট তাদের চেয়ে অনেক উঁচু হওয়া সত্ত্বেও তো তারা উটের পিঠে আরোহণ করে হর-হামেশা চলাফেরা করে। উট বসে পড়ে বলেই তো তারা তার পিঠে চড়তে পারে। বেহেশতের শয্যাগুলোও তেমনি অনেক উঁচু হওয়া সত্ত্বেও নিচে নেমে আসবে, যখন তার উপর উপবেশন করতে চাইবে বেহেশতবাসীরা। তাহলে তারা এ সম্পর্কে অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কেনো?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এবং আকাশের দিকে, কীভাবে তাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে'? একথার অর্থ— ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তারা দৃষ্টিপাত করলে কি দ্যাখে না, সেখানে জ্বল জ্বল করছে অসংখ্য নক্ষত্র। তাহলে বেহেশবাসীদের জন্য সেখানে অসংখ্য পানপাত্র প্রস্তুত করে রাখা যাবে না কেনো?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (১৯, ২০) বলা হয়েছে— 'এবং পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে, কীভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে'। একথার অর্থ— সারি সারি পর্বতগুলোর দিকে তারা তাকায় না কেনো? দ্যাখে না কেনো, কীভাবে বিছিয়ে রাখা হয়েছে ভূপৃষ্ঠকে। বেহেশতে বালিশ, তাকিয়া ও গালিচা বিছানো থাকবে তো এভাবেই।

আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, সৃষ্টি বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের। কোনো কোনোটি যৌগিক এবং কোনোটি মৌলিক। এসকল কিছুই তো মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্‌র অপার প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক। এগুলোর দিকে গভীরভাবে অভিনিবেশী হলে তো একথা অবশ্যমান্য হয়ে যায় যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যিনি এ সকল কিছু একবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো তা পুনঃ সৃষ্টিতেও সক্ষম। কেননা পূর্ববর্তী সৃষ্টি অপেক্ষা পরবর্তী সৃষ্টি সহজতর। সুতরাং মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার পর্ব, বেহেশত-দোজখ— এ সকল কিছু মেনে নিতে আর আপত্তি কোথায়? পরকালের সাফল্যের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণে অনীহাই বা কেনো?

লক্ষণীয়, আল্লাহ্পাকের অসংখ্য যৌগিক সৃষ্টির মধ্যে এখানে উপমা হিসেবে আনা হয়েছে কেবল উটকে। আর মৌলিক সৃষ্টি হিসেবে উপমা দেওয়া হয়েছে আকাশ, পর্বতশ্রেণী ও পৃথিবীপৃষ্ঠের। এরকম করার কারণ হচ্ছে, এই ত্রয়ী প্রয়োজন ও মহিমা নিয়ে যাপিত হয় আরববাসীগণের জীবন। যেহেতু এখানে সম্বোধন করা হয়েছে আরবজাতিকে, তাই এখানে ঘটানো হয়েছে এরকম উপমার সমাহার। তাদের দৃষ্টিপথে সতত প্রতিভাসিত হয় দিগন্ত প্রসারিত আকাশ, প্রলম্বিত পর্বতামালা এবং সুবিস্তৃত মরুপ্রান্তর। আর যুথবদ্ধ উটের বহর সতত তাদেরকে করে রাখে প্রাণবন্ত— সাংসারিক জীবনে, সামাজিকতায়, বাণিজ্যে। তাদের গোশত, দুধ ব্যবহৃত হয় আহার হিসেবে। ভ্রমণ ও পণ্য পরিবহনের জন্যও উট তাদের জন্য অপরিহার্য। তাই এখানে প্রথমে বিশেষভাবে উটের উল্লেখ করে তাদেরকে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, বিশাল বপুধারী উটও দ্যাখো, আল্লাহ্র নিয়মানুসারে তোমাদের কথায় ওঠে বসে। তাহলে বেহেশতের অত্যুচ্চ আসনগুলো তাঁর নিয়মানুসারে বেহেশতবাসীদের ইচ্ছানুসারে ওঠানামা করতে পারবে না কেনো? কেনো অযৌক্তিকভাবে অস্বীকার করতে হবে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশকে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইবিলি' অর্থ মেঘমালা, উট নয়। 'কামুস' অভিধানে লেখা আছে, 'ইবিলি' বলে ওই মেঘকে, যা পানিতে ভরপুর। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, আমা কর্তৃক সৃষ্ট মেঘের মতো মেঘ, পাহাড়ের মতো পাহাড় এবং দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত ভূমি কি কেউ সৃষ্টি করতে সক্ষম?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা (২১), তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও' (২২)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে মানুষকে কেবল উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন। হয়তো তাদের মধ্যে কারো কারো বোধোদয় ঘটবে। কেউ কেউ গ্রহণ করবে আপনার পথনির্দেশনা। কেননা আপনি তো কেবল উপদেশদাতা। তাদের কর্মনিয়ন্ত্রণ তো আপনার দায়িত্বভূত নয়। এখানকার 'তুমি তাদের কর্ম-নিয়ন্ত্রক নও' কথাটি আগের বাক্যের বেগ সৃষ্টিকারক। অর্থাৎ এরকম দায়িত্ব তো আপনাকে দেওয়া হয়নি যে, আপনি তাদেরকে আপনার উপদেশ মানিয়েই ছাড়বেন। এরকম বলা হয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। যেমন 'আপনি তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী তো নন'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে (২৩) আল্লাহ্ তাকে দিবেন মহাশাস্তি' (২৪)।

'ইল্লা' ব্যতিক্রমীটি এখানে বিযুক্তক, ব্যবহৃত হয়েছে 'তবে' অর্থে। অর্থাৎ তবে যারা আপনার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে দিবেন ভীষণ শাস্তি। অবশ্যই প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার

ব্যতিক্রমীটি সংযুক্তক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তবে আপনার উপদেশ যারা মানবে না, তাদেরকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে শাস্তি দিবেন তাদের উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে, আর পরকালে জাহান্নামের শাস্তি তো তাদের হবেই। অথবা বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— আপনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন। এর পরে যদি কেউ আপনার উপদেশ গ্রহণে অনীহ হয়, আল্লাহ্ তো তাকে শাস্তি দিবেনই দিবেন। ছেড়ে দিবেন না। এমতো ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বুঝতে হবে বক্তব্যটির যোগসূত্র রয়েছে ২১ সংখ্যক আয়াতের 'উপদেশ দাও' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আপনি নিরাশ হবেন না। আর নিরাশ না হওয়াই এমতাবস্থায় হবে ব্যতিক্রম্য।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট (২৫); অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ'। ভীতিপ্রদর্শনকে সুদৃঢ় করার জন্যই এখানে 'ইলাইনা' পদটিকে উল্লেখ করা হয়েছে আগে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যাবর্তন এক মহাশক্তিধর সত্তার সমীপে হবে, যিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আর এখানকার 'তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ' কথাটির অর্থ— তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের তারতম্যানুসারে উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করার দায়িত্বটি আমার। এখানে 'আ'লাইনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অনিবার্যতা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ হিসাব নিকাশ করে তাদেরকে অবশ্যই তিনি শাস্তিদান করবেন, যদিও এরকম করতে তিনি বাধ্য নন। তবে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তাঁর মহামর্যাদার অননুকূল। তাই কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে শাস্তি তিনি তাদেরকে দিয়েই ছাড়বেন।

সূরা ফাজ্বর

মহাপুণ্যনিকেতন মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানিতে রয়েছে ১টি রুকু এবং ৩০টি আয়াত।

সূরা ফাজ্বর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥

r শপথ ঊষার,

r শপথ দশ রজনীর,

r শপথ জোড় ও বেজোড়ের

r এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে—

r নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে শপথ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াল ফাজ্বরি'। এর অর্থ শপথ ঊষার। অর্থাৎ শপথ প্রভাতকালের। আবু সালেহের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইকরামাও এরকম বলেছেন । আতিয়া বলেছেন, এখানে 'ফাজ্বরি' অর্থ ফজরের নামাজ। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— মহররম মাসের প্রথম দশ দিনের প্রভাতকাল। কেননা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে জিলহজ মাসের দশ রাত।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়া লাইয়ালিন আ'শরিন'। এর অর্থ— শপথ দশ রজনীর। এখানকার 'তানভীন' শ্রেষ্ঠত্বপ্রকাশক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'দশ রজনী' অর্থ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত্রি। কাতাদা, মুজাহিদ, জুহাক, সুদ্দী এবং কালাবীও এরকম বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিনের ইবাদত অপেক্ষা অন্য কোনো দিনের ইবাদত আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় নয়। এ সময়ের এক দিনের রোজা সারা বছরের রোজার সমান। এক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান। শিথিল সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা।

আবু ওয়ারাক সূত্রে জুহাক বর্ণনা করেছেন, এখানকার 'দশ রজনী' অর্থ রমজান মাসের প্রথম দশ রাত্রি। আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় এসেছে রমজান মাসের শেষ দশদিনের কথা। আমরা সুরা বাকারার তাফসীরে রমজান মাসের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মহাসম্মানিত শবে কদরও শেষ দশ রাতের অন্তর্ভূত। ইনশাআল্লাহ্ সুরা কদরের তাফসীরে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। আইমান ইবনে রুবাব বলেছেন, এখানে শপথ করা হয়েছে মহররম মাসের প্রথম দশ রাত্রির, যার দশম দিন আশুরা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রমজানের রোজার পর আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট রোজা হচ্ছে মহররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ তাহাজ্জুদ। মুসলিম।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'শপথ জোড় ও বেজোড়ের'। এখানে 'ওয়াশ্‌শাফ্‌য়ি' অর্থ সৃষ্টি, যা হয় যুগ্ম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়'। আর বেজোড় হলেন আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং। এরকম অর্থ করেছেন হজরত আবু সাঈদ, আতিয়া এবং আউফি। মুজাহিদ ও মাসরুকও এরকম বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, সকল সৃষ্টি যুগল। তাদের একজনের বিপরীতে আছে আর একজন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ বৈপরিত্য-বিবর্জিত। তিনি বৈপরিত্যবিবর্জিত চির একক। তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বিভিন্নভাবে বৈপরিত্যধারী, যৌগ। যেমন বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুপথ-বিপথ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, রাত-দিন, আকাশ-পৃথিবী, জল-স্থল, চন্দ্র-সূর্য, জ্বিন-মানব, নর-নারী। আল্লাহ্‌পাক সকল প্রকার বিপরীতার্থকতা থেকে সতত পবিত্র।

একবার মহামান্য আবু বকর সিদ্দীককে জোড় ও বেজোড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, যুগল সৃজন হওয়া সৃষ্টির অমোঘ নিয়তি। যেমন জীবন-মৃত্যু, সম্মান-অসম্মান, বিনয়-দুর্বিনয়, সাবল্য-দৌর্বল্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, দৃষ্টি-দৃষ্টিহীনতা, শ্রুতি-বধিরতা, শব্দ-নৈশব্দ, বিত্ত-বিত্তহীনতা। কিন্তু আল্লাহ্ অযুগল। তিনি মৃত্যুহীন চিরঞ্জীব, অক্ষমতাহীন পরাক্রমশালী, অজ্ঞতাহীন প্রাজ্ঞ, বৈভবশালী।

হাসান বসরী ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, জোড় এবং বেজোড় উভয়ই আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি। কোনো সৃষ্টি জোড়, কোনো সৃষ্টি বেজোড়। হাসান বসরী বলেছেন, জোড় ও বেজোড় দু'টি সংখ্যা। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে নামাজের জোড় ও বেজোড়কে। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে ইমাম মালেক এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের থেকে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, 'শোফা' অর্থ হজ। অর্থাৎ হজের প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরের প্রত্যাবর্তন। যেহেতু আল্লাহ্পাক বলেন 'যে ব্যক্তি ত্বরা করবে দু'দিনের মধ্যে, তার জন্য কোনো পাপ নেই'। মুকাতিল ও ইবনে হাব্বান বলেছেন, পৃথিবীর দিবারাত্রি জোড়, আর পরবর্তী পৃথিবীর দিবস বেজোড়, কেননা ওই দিবসের পরে কোনো রাত্রি নেই। হাসান বসরীর অপর এক উক্তিতে এসেছে, জান্নাতের আটটি স্তর জোড়সংখ্যক, আর জাহান্নামের স্তর সাতটি বেজোড়সংখ্যক। সম্ভবত এখানে জোড়-বেজোড় উল্লেখ করে জান্নাত জাহান্নামের শপথ করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং শপথ রজনীর, যখন তা গত হতে থাকে'। এরকম শপথ করা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'অপসৃয়মান রাতের শপথ'। কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'ইজা ইয়াস্রি' অর্থ আগমনশীল রাতের শপথ। দিনের পরে রাতের সুনিশ্চিত আগমনও আল্লাহ্পাকের প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার নিদর্শন। আর রাত তাঁর অনুগ্রহও। কেননা রাতের সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও গোপন অনেক কিছু। সেজন্যই রূপকার্থে অভিসারের সম্পর্ক করা হয় রাতের সঙ্গে। যেমন বলা হয় 'সল্লাল মুকাম' (স্থান নামাজ পাঠ করেছে)। কিন্তু স্থান তো নামাজ পাঠ করে না। বরং নামাজ পাঠ করা হয় স্থানে। আর এখানকার 'রাতের শপথ' অর্থ যে কোনো রাতের শপথ, যা চলিষ্ণু, গমনশীল।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য'। প্রশ্নবোধকটি এখানে স্বীকৃতিসূচক। তাই বঙ্গানুবাদটিও করা হয়েছে সোজাসুজি। অর্থাৎ নিশ্চয় এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য শপথ। এখানে 'ক্বসামুন' অর্থ শপথ, কসম। এখানকার 'তানভীন'টি শ্রেষ্ঠত্বার্থক। অর্থাৎ নিশ্চয় বর্ণিত বিষয়গুলোর শপথ বিরাট এক ব্যাপার। এমতো শপথই যথেষ্ট। আর কোনোকিছুর শপথের প্রয়োজন পড়ে না । কেননা যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করে শপথ করা হয়েছে, সে বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলো আল্লাহ্পাকের বিচিত্র শক্তিমত্তা ও অতুলনীয় গুণবত্তার পরিচায়ক।

জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক মানুষকে বিরত রাখে অশুভ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে। সেকারণেই জ্ঞানকে এখানে বলা হয়েছে 'হিজ্র'। আর এখানকার শপথের জবাব হবে 'নিশ্চয় আপনার প্রভুপালক রয়েছেন প্রতীক্ষাস্থলে'। অথবা বলা যেতে পারে, শপথের জবাব রয়েছে এখানে অনুক্ত। অথবা বিষয়টি আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়নির্ভর। কিংবা বলা যায়, আল্লাহ্পাক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন, যেমন ধ্বংস করেছিলেন আদ-ছামুদ জাতিকে।

সূরা ফাজ্র ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ﴿٦﴾ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۙ﴿٧﴾ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۙ﴿٨﴾ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۙ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۙ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۙ﴿١١﴾ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۙ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚ﴿١٣﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۗ﴿١٤﴾

---

r তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের—

r ইরাম গোত্রের প্রতি— যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?—

r যাহার সমতুল্য কোন দেশ নির্মিত হয় নাই;

r এবং ছামূদের প্রতি?- যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;

r এবং বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি ফির'আওনের প্রতি?

r যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল,

r এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

r অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।

r তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলাম তারা'। এর অর্থ তুমি কি দ্যাখোনি? প্রশ্নটিতে প্রকাশ পেয়েছে না-সূচকতার অস্বীকৃতি, যার পরিণতি দাঁড়ায় হাঁ-সূচক। অর্থাৎ তোমরা তো দেখেছো। কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আদ বংশের— (৬) ইরাম গোত্রের প্রতি—(৭)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মক্কার অধিবাসীরা তো জানেই, কী নিদারুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিলো আদ জাতিকে, যাদের পিতৃপুরুষ ছিলো ইরাম। প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিমত্তার অধিকারী

ছিলো তারা। ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও গর্বোন্মত্ত। মহা তুফানের আঘাতে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তাদেরকে। তাহলে মক্কার মুশরিকেরা কীভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, সত্যদ্রোহিতা করা সত্ত্বেও তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে?

ইরাম আদ জাতির পূর্বপুরুষদের একজন। অথবা ইরাম আদের একটি শাখাগোত্র। শব্দটি 'তাদের' পদের অনুবর্তী, অথবা বিবৃতিমূলক যোজক। আদ জাতির শাসন ক্ষমতা ছিলো ওই ইরাম গোত্রের হাতে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইরাম ছিলো আদ ইবনে শাম ইবনে নুহের পুত্র। তার নামানুসারেই তার গোত্রের নাম হয়েছে ইরাম। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, ইরাম ছিলো আদের পিতামহ। তাই বলা যায়, আদ ইরাম গোত্রের একটি শাখা। কালাবী বলেছেন, আদ, সুয়াদে ইরাকের অধিবাসী। আরব উপদ্বীপের জনসাধারণের ঊর্ধ্বতন বংশই ইরাম বংশ। এজন্যই বলা হয় আদে ইরাম, ছামুদে ইরাম। আল্লাহ্পাক আদ ও ছামুদ জাতিকে গজবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট ছিলো কেবল সুয়াদে ইরাক ও আরব উপদ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ। এ সকল বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইরাম ছিলো একটি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা অধিকারী ছিলো সুউচ্চ প্রাসাদের (৭)? যার সমতুল্য কোনো দেশে নির্মিত হয়নি'(৮)।

আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো দীর্ঘদেহী ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তারা নির্মাণ করতো বিরাট বিরাট অট্টালিকা। একারণে তারা গর্বও করতো খুব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের দৈর্ঘ্য ছিলো খুঁটির মতো। মুকাতিল বলেছেন, তাদের দৈর্ঘ্য ছিলো রসুল স. এর হাতের মাপে বারো হাত। কেউ কেউ বলেছেন, তারা ছিলো আরো লম্বা। তাদেরকে স্তম্ভবিশিষ্ট বলা হতো একারণে যে, বসন্তকালে তারা তাদের তাঁবু, তাঁবুর খুঁটি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী বেঁধে নিয়ে পশুপালসহ বেরিয়ে পড়তো চারণভূমির দিকে। সেখানকার তৃণ-গুল্ম যখন শেষ হয়ে যেতো, তখন তারা ফিরে আসতো স্বগৃহে। তারা চাষাবাদ করতো, বাগান করতো। তাদের বসতবাটি ছিলো কুরা উপত্যকায়। কেউ কেউ বলেছেন, তারা নির্মাণ করতো সুউচ্চ প্রাসাদ। বড় বড় এবং মজবুত স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো প্রাসাদগুলো। তাই তাদেরকে বলা হতো 'স্তম্ভবিশিষ্ট'। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, শাদ্দাদ ইবনে আদ নির্মাণ করিয়েছিলো এমন অট্টালিকামালা, যার স্থাপত্যশৈলী ছিলো অতুলনীয়। একবার সে সদলবলে পরিদর্শন করতে চললো ওই শিল্পসৌধগুলো। এক সপ্তাহ চলার পরে একখানে যাত্রাবিরতি করলো তারা। সেখানেই অকস্মাৎ আকাশ থেকে ধ্বনিত হলো মহানাদ। ওই মহানাদের আঘাতে চিরদিনের মতো নির্মূল হয়ে গেলো শাদ্দাদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'ইরামা জাতিল ইমাদ' একটি নগরীর নাম; যা বর্তমানে পরিচিত দামেশক বলে। কুরতুবী বলেছেন, ওই স্থানের বর্তমান নাম ইসকান্দারিয়া। আর এখানকার 'যার সমতুল কোনো দেশে নির্মিত হয়নি' অর্থ তাদের ওই সুউচ্চ প্রাসাদগুলো ছিলো অতি মনোহর। ওরকম সুন্দর প্রাসাদ আর কোনো নগরীতে নির্মিত হয়নি।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং ছামুদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিলো'। এখানে 'জ্বাবু' অর্থ কাটতো, কর্তন করতো, কেটে কেটে মসৃণ করতো। 'সখ্র' অর্থ পাথর। এর একবচন 'সখরাতুন'। আর 'আল ওয়াদ' অর্থ কুরা উপত্যকা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কুরা উপত্যকায় বসবাস করতো ছামুদ জাতি। তারাও ছিলো সত্যদ্রোহী। তারা পর্বতগাত্রে পাথর কেটে কেটে নির্মাণ করতো সুন্দর সুন্দর বাড়ি। আল্লাহ্র গজবে তারাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো আদ জাতির মতো।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং বহু সৈন্যশিবিরের অধিপতি ফেরাউনের প্রতি'? 'আওতাদ' অর্থ এখানে মজবুত বালাখানা। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী এরকমই বলেছেন। আবার অনেকে বলেছেন, এর অর্থ দীর্ঘস্থায়ী রাজত্ব। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'হুম ফীল ইযনি ছাবিতুল আওতাদ' (তারা মর্যাদার কীলক প্রোথিত করেছে) অর্থাৎ অধিকারী হয়েছে যশের। আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'জিল আওতাদ' অর্থ সেনাবাহিনী। কেননা তারা কোথাও যাত্রা করলে সঙ্গে সঙ্গে বহন করে তাঁবু-খুঁটি-রসদপত্র। শিবির নির্মাণের সময় তাঁবু খাটায় কীলকের সাহায্যে। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, 'ওয়াতাদ' এর বহুবচন 'আওতাদ'। এর অর্থ কীলক। নিষ্ঠুরহৃদয় ফেরাউন মানুষকে শাস্তি দিতো কাঠের খুঁটিতে দাঁড় করিয়ে। তারপর পেরেক মেরে দিতো তার হাতে, পায়ে ও মাথায়। কখনো কখনো পেরেক মেরে দিতো ঝুলিয়ে। মুজাহিদ এবং মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, ফেরাউন মানুষকে শাস্তি দিতো এভাবে— প্রথমে মাটিতে চিৎ করে শোয়াতো। তারপর তার হাত-পাগুলো সোজা করে দিয়ে তাতে ঠুকে দিতো কীলক। সুদ্দী বলেছেন, মাটিতে লম্বা করে শুইয়ে হাত-পা টান টান করে তার মধ্যে গেঁথে দেওয়া হতো কীলক। এরপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দেওয়া হতো তার উপর। কাতাদা এবং আতা বলেছেন, একবার ফেরাউন তার অর্থসচিবের স্ত্রীকে তার সামনেই এভাবে সাজা দিয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরআউনের অর্থসচিব হিযকীলের স্ত্রী ছিলেন বিশ্বাসবতী। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি তাঁর ইমানকে গোপন করে রেখেছিলেন। ফেরাউনের কন্যার পরিচর্যাকারিণী ছিলেন তিনি। একদিন তিনি চিরুনী দিয়ে তার চুল আঁচড়িয়ে দেওয়ার সময় হঠাৎ করে হাত থেকে চিরুনীটি মাটিতে পড়ে গেলো। চিরুনীটি উঠিয়ে নেওয়ার সময় তিনি আপন মনে উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে, তারা নিপাত যাক। ফেরাউনদুহিতা বললো, আমার পিতা ব্যতীত আর কোনো উপাস্য আছে নাকি? অর্থসচিব-ভার্যা বললেন, নিশ্চয়। তোমার আমার, তোমার পিতার এবং আকাশ পৃথিবীর অধিপতি যিনি, সেই আল্লাহ্ই সকলের একমাত্র উপাস্য। ফেরাউনদুহিতা একথা সহ্য করতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার কাছে গিয়ে বললো, শুনেছেন, অর্থ সচিবের স্ত্রী তো আপনাকে প্রভুপালক বলে মানে না। বলে আকাশ-পৃথিবীসহ

সকলের সৃষ্টিকর্তা নাকি একজন। আর তিনিই সকলের একমাত্র প্রভুপালক ও উপাস্য। ফেরাউন তৎক্ষণাৎ তলব করলো অর্থসচিবের পত্নীকে। বললো, তুমি কি তাহলে মুসার অনুগামিনী? ভালো চাও তো এক্ষুণি পরিত্যাগ করো তার ধর্মবিশ্বাসকে। অর্থসচিবের স্ত্রী বললেন, না, তা হয় না। আপনি যদি আমাকে সত্তর বছর ধরে শাস্তি দান করতে থাকেন, তবুও আমি সত্য ধর্মবিশ্বাস থেকে এতোটুকুও টলবো না। সে তখন দু'টি শিশুকন্যার বড়টিকে এনে তার মায়ের সামনেই জবাই করলো। তারপর বললো, দ্যাখো হতভাগিনী! এখনো সময় আছে, মুসার ধর্ম পরিত্যাগ করো। নয়তো তোমার অপর কন্যাকেও আমি হত্যা করবো। তিনি বললেন, সারা পৃথিবীর সকল মানুষকেও যদি তুমি আমার সামনে বধ করো, তবুও আমি আমার পরম আরাধ্যকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। ফেরাউন তাঁর ছোট মেয়েকে হত্যা করার হুকুম দিলো। জল্লাদ তাকে ধরে এনে মাটিতে শুইয়ে দিলো। শিশুকন্যাটি ছিলো দুগ্ধপোষ্য। তবু তার কণ্ঠে কথা ফুটলো। মানুষের ইতিহাসে মাত্র চার জন দুগ্ধপোষ্য শিশু কথা বলেছিলো। তার মধ্যে ওই শিশুটিও একজন। সে বললো, মা! ধৈর্যধারণ করো। বিচলিত হয়ো না। আল্লাহ্ তোমার বাসস্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন জান্নাতে। সেখানে তোমার জন্য রয়েছে অভূতপূর্ব মর্যাদা। তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

ফেরাউন এবার হিযকীলকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালো। লোকেরা ফিরে এসে জবাব দিলো, হিযকীল বাড়িতে নেই। সে নাকি এক পাহাড়ে গিয়ে উপাসনা শুরু করেছে। ফেরাউন দু'জন শান্ত্রীকে নির্দেশ দিলো, যেখানে পাও, তাকে ধরে আনো। শান্ত্রী দু'জন খুঁজতে খুঁজতে হিযকীলকে এক পাহাড়ের উপরে পেয়ে গেলো। সবিস্ময়ে দেখলো, তিনটি সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে বনের হিংস্র পশুরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেখানে নামাজ পাঠ করছেন। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে হিযকীল বললেন, হে শান্ত্রীদ্বয়! ফিরে যাও। অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তারা ফিরে গেলো। হিযকীল প্রার্থনা জানালেন, পরওয়ারদিগার আমার! বহু বছর ধরে আমি তো আমার ইমানকে গোপন করে রাখলাম। এখন কেউ যদি তা প্রকাশ করে দেয়, তবে তুমি তাকে এ পৃথিবীতেই শাস্তি দিয়ো। আর পরবর্তী পৃথিবীতে তাকে নিক্ষেপ কোরো নরকে। শান্ত্রী দু'জন ফেরাউনের দরবার অভিমুখে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে তাদের একজনের ঘটলো অন্তর্বিপ্লব। সে আল্লাহ্ ও নবী মুসার উপরে ইমান আনলো। অপর জন রাজদরবারে গিয়ে বলে দিলো সব কথা। বললো, হিযকীল এখন আপনার নির্দেশবহির্ভূত। তিনি এখন এক আল্লাহ্র পূজারী। ফেরাউন তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো, এ কি সত্য কথা বলেছে? ইমানদার শান্ত্রী বললো, সে যা বলছে, আমিতো সে সম্পর্কে কিছু জানি না। ফেরাউন ক্রোধান্বিত হলো। নির্দেশ দিলো, সংবাদদাতা শান্ত্রীকে প্রহার করে শূলে চড়ানো হোক।

ফেরাউনের স্ত্রী পরম রূপবতী মাননীয়া আসিয়াও ছিলেন বিশ্বাসবতী। অর্থ সচিবের স্ত্রীর দুর্গতি দেখে তিনি প্রমাদ গুণলেন। ভাবলেন, এই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীটির সঙ্গে আর কি ঘর করা সম্ভব! পথপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাই তো এর নেই। তিনি চরম বুঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ফেরাউন এলো। পাশে বসলো তার। অকস্মাৎ মহাপুণ্যবতী আসিয়া বলে উঠলেন, তুমি এতো জঘন্য! নিষ্ঠুর! নিষ্পাপ শিশুকন্যা দু'টিকে হত্যা করলে কোন আক্কেলে? ফেরাউন চমকে উঠলো। বললো, তোমারও শেষে মতিভ্রম ঘটলো নাকি? আসিয়া বললেন, মতিভ্রম আমার ঘটেনি, ঘটেছে তোমার। কেনো তুমি এখনো এই মহাসত্যটি স্বীকার করতে চাইছো না যে, তোমার আমার সকলের একমাত্র প্রভুপালয়িতা আল্লাহ্। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। ফেরাউন ক্রোধান্ধ হলো। ডেকে পাঠালো আসিয়ার পিতা-মাতাকে। বললো, দ্যাখো, তোমাদের মেয়ের দশা হয়েছে হিযকীলের স্ত্রীর মতো। আসিয়া তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিখিল বিশ্বের একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনি সমকক্ষতা ও অংশীবাদিতা থেকে সতত পবিত্র। পিতা বললো, আসিয়া! তুমি কি আমালেকা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে অভিজাত রমণী নও? তোমার স্বামী কি আমালেকাদের প্রভুপালক নয়? আসিয়া জবাব দিলেন, আমি এরকম অপবিশ্বাস থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় যাচনা করি। পিতা! তুমি যা বলছো, তা যদি সত্যি হয়, তবে ফেরাউনকে বলো, আমাকে যেনো সে এমন একটি মুকুট বানিয়ে দেয়, যার সামনে থাকবে সূর্য এবং পেছনে থাকবে চন্দ্র। আর পুরো মুকুটটি শোভিত থাকবে নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে। ফেরাউন বিষয়টিকে আর দীর্ঘায়িত করতে দিলো না। বিদায় করে দিলো আসিয়ার পিতা-মাতাকে। তারপর তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে কীলক দিয়ে তাঁর হাত-পা টান করে পেরেক বিদ্ধ করে দিলো মাটিতে। আল্লাহ্পাক তাঁর দৃষ্টির সামনের অন্তরাল অপসারিত করলেন। আসিয়া তাকিয়ে রইলেন জান্নাতের অসংখ্য সুখপোকরণসমূহের দিকে। ফেরাউনের দেওয়া শাস্তির কষ্ট তাঁর অনুভূতিকে স্পর্শই করতে পারলো না। তিনি জান্নাতের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম দয়াময় প্রেমময় প্রভুপালয়িতা। পৃথিবী আমি আর চাই না। চাই কেবল তোমার সকাশ। দয়া করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করো। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র প্রাণপাখিকে স্থান দিলেন তাঁর একান্ত সন্নিধানে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যারা দেশে সীমালংঘন করেছিলো (১১), এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো (১২)। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন' (১৩)।

এখানে 'ত্বগাও' ফীল বিলাদ' অর্থ দেশে সীমালংঘন করেছিলো। 'আক্ছারূ ফীহাল ফাসাদ' অর্থ সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো। আর 'সাওত্বা আ'জাব' অর্থ শাস্তির কশাঘাত হানলেন। এখানে বিশেষণকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে বিশেষ্যের

সঙ্গে। মূল কথাটি ছিলো ‘আ’জাবা সাওত্বিন’। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। যেমন বলা হয় ‘আখলাকু ছিয়াবিন’ (পুরাতন অনেক বস্ত্র) ‘সাওত্ব’ এর ধাতুগত অর্থ মিশিয়ে দেওয়া। অনেক সুতার মিশ্রণ বলেই সুতলিকে বলে ‘সাওত্ব’। পরকালের শাস্তির প্রতিপক্ষে ইহকালের শাস্তি যেনো অসির প্রতিপক্ষে রশি। একারণেই এখানে পার্থিব শাস্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে রশির সাথে। কাতাদা বলেছেন, শাস্তির সাহায্যে পাকানো রশিই আল্লাহ্‌পাক ছুড়ে মেরেছিলেন তাদের দিকে। ভাষাবিদগণ বলেন, কথাটি রূপকার্থক। মূলতঃ শাস্তিটি ছিলো কঠিনতম। আর এখানকার ‘সব্‌বা’ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, ওই শাস্তি যেনো শাস্তির বৃষ্টিপাত। এমতাবস্থায় ‘শাস্তির কশাঘাত হানলেন’ কথাটির মমার্থ হবে— আল্লাহ্‌পাক তাদের উপরে সরাসরি অবতীর্ণ করেছিলেন সুকঠিন শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— ‘তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন’। বাক্যটি শপথের জবাব। অথবা জবাবটি অনুক্ত হলে, তার তাগিদ। ‘মিরসাদ’ অর্থ ঘাঁটি। এভাবে শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ ঘাঁটিতে অবস্থান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক চান তাঁর বান্দারা তাঁর প্রতি হোক সমর্পণপ্রবণ ও অনুগত। তাই তিনি তাদের কৃতকর্মের প্রতি রাখেন সদাসতর্ক দৃষ্টি। কোনো কিছুই তাঁর অবহিতিবহির্ভূত নয়। যেমন কোনো গোপন ঘাঁটির অতন্দ্র প্রহরীর দৃষ্টিবর্হিভূত নয় তার সম্মুখের ব্যক্তিদের গতিবিধি। কিন্তু মানুষ কতো উদাস। বিষয়টিকে গুরুত্বই দেয় না। মত্ত থাকে কেবল পার্থিবতার প্রেমে।

সূরা ফাজ্‌র ঃ আয়াত ১৫— ২৬

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ ﴿۱۵﴾ وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ ﴿۱۶﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿۱۷﴾ وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿۱۸﴾ وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿۱۹﴾ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿۲۰﴾ كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿۲۱﴾ وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿۲۲﴾ وَ جِایْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ۬ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿۲۳﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿۲۴﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ﴿۲۵﴾ وَّ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ﴿۲۶﴾

q মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

q এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয্ক সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে,'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন।'

q না, কখনও নহে। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

q এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

q এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল,

q এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস;

q ইহা সংগত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে,

q এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও,

q সেই দিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, তখন এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?

q সে বলিবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম?'

q সেই দিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না,

q এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞই হয়। যখন আল্লাহ্ তাদেরকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিত্ত-বৈভব-খ্যাতি দান করে পরীক্ষায় নিপতিত করেন, তখন সে বলতে থাকে, দ্যাখো, আমার কতো সম্মান। সবাই কি এরকম সম্মান লাভের যোগ্য? এভাবে সে কৃতিত্ব জাহির করে নিজের। আবার যখন আল্লাহ্ তাদেরকে অভাব-অনটনে-পরীক্ষায় নিপতিত করেন, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করে অভিযোগ। বলে, দ্যাখো, এতো লোক থাকতে আল্লাহ্ আমাকেই করলেন বিপদ কবলিত।

এখানে 'ফাইয়াকুলু রব্বি আকরামান' অর্থ আমার প্রভুপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। বাক্যটি আগের বাক্যের নিমিত্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেহেতু মানুষকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, সেকারণেই তারা এরকম বলে।

'ফা ক্বদারা আ'লাইহি রিয্ক্বাহ' অর্থ পরীক্ষা করেন তার রিজিক সংকুচিত করে। ক্বারী ইবনে আমের ও ক্বারী আবু জাফর এখানকার 'ফা ক্বদারা' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'ফা ক্বদ্দারা' তাশদীদ সহযোগে। সাধারণভাবে অবশ্য 'ফা ক্বদারা'ই প্রচলিত। কেউ কেউ বলেছেন, তাশদীদ প্রযুক্ত হলে অর্থ হবে আল্লাহ্ যখন তাকে অভাবী করে দেন। আর তাশদীদবিহীনভাবে অর্থ দাঁড়াবে— যখন আল্লাহ্ দান করেন পরিমাণ মতো। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, শব্দদু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ যখন তিনি সংকুচিত করে দেন মানুষের জীবনোপকরণ।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করার কথা। পরে সম্মান ও অনুগ্রহের বিপরীতে বলা হয়েছে কেবল রিজিক সংকুচিত করার কথা। অথচ লাঞ্ছিত হওয়ার কথা বলাই ছিলো আপাত দৃষ্টিতে শোভন। কিন্তু সে রকম করা হয়নি একারণে যে, অভাব অনটন সব সময় অসম্মানের কারণ নয়। বরং তা কোনো কোনো সময় হয় পরকালের মহাসম্মান লাভের নিমিত্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেবল দু'ধরনের লোকের প্রতি হিংসা সিদ্ধ। এক, ওই ব্যক্তি, আল্লাহ্ যাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে সারাক্ষণ তা পাঠ করতে থাকে। দুই, ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ দান করছেন প্রতুল বিত্ত; আর সে তা অহরহ ব্যয় করতে থাকে আল্লাহ্র সন্তোষকামনায়। এই হাদিসের বক্তব্য দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বিত্ত-সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র দান। এর মাধ্যমে পরজগতেও প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়। এর জন্য যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ অপরিহার্য।

'ফা ইয়াক্বুলু রব্বী আহানান' অর্থ আমার প্রভুপালক আমাকে হীন করেছেন। বলা বাহুল্য, এরকম যারা বলে, তারা সংকীর্ণচিত্ত। তাদের চিন্তা সম্পৃক্ত কেবল এ জগতের সঙ্গে। অনটনাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করা যে অপরিহার্য এবং এর মাধ্যমে যে দুনিয়া আখেরাতের প্রভূত কল্যাণ লাভ করা যায়, সে কথা তারা বুঝতেই পারে না। কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খলফ জুহুনীকে লক্ষ্য করে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'না, কখনও নয়। বরং তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান করো না'।

এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, কখনো নয়। অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ও ধৈর্যহীনেরা যেমন ভেবেছে, সেরকম কিছুতেই নয়। অকৃতজ্ঞতা ও অধৈর্য কখনো সফলতার পথ নয়। সফলতার অবলম্বন হচ্ছে কৃতজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতা।

হজরত মাসআব ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা সা'দ নিজেকে অন্যদের চেয়ে অধিক সম্মানিত জন বলে মনে করতেন। একদিন রসুল স. তাঁকে ডেকে বললেন, মনে রেখো, তোমাদের রিজিক দেওয়া হয় দরিদ্র জনসাধারণের অসিলায়। বোখারী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে নিঃস্ব মুহাজিরগণ বিত্তশালীদের চল্লিশ বৎসর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিত্তশালীদের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে বিত্তহীনেরা।

আর যদি অভাব-অনটনের সঙ্গে যুক্ত থাকে ধৈর্য ও আল্লাহ্র পরিতোষকামনা, তবে তো তা আল্লাহ্র নেয়ামত। অসম্মানজনক কিছু নয়। হজরত কাতাদা ইবনে নোমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করেন, তখন তাকে পৃথক রাখেন পার্থিবতা থেকে, যেমন তোমরা পানি থেকে পৃথক রাখো জলাতংক রোগীকে। আহমদ, তিরমিজি।

এরপরের 'বাল্‌লা' অর্থ বরং তা নয়। অর্থাৎ তোমরা এরূপ মনে করো না যে, অভাবীদের মধ্যে ফেলে রেখে আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে অসম্মান করছেন। 'তুক্‌রিমূনাল ইয়াতিম' অর্থ এতিমকে সম্মান করো না। অর্থাৎ তোমরা পিতৃহীনদের অভাবমোচন করো না। তাদের প্রতি প্রকাশ করো না সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি। এভাবে অসম্মান করছো তাদের অধিকারের।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'বরং' শব্দটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'তারা বলে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা যা বলে, তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা পিতৃহীনদের দাবির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে না। পার্থিব ভোগসম্ভোগের মধ্যেই তারা আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে নিজেদেরকে। মুকাতিল বলেছেন, উমাইয়া ইবনে খলফের পোষ্য ছিলো কুদামাহ্‌ ইবনে মাজউন। উমাইয়া তার অধিকার পূরণ করতো না। ক্বারী ইবনে আমের এখানকার 'লা তুক্‌রিমূনা' বাক্যটিকে পাঠ করতেন 'লা ইউক্‌রিমূনা'। অর্থাৎ তারা যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতো না। অনুরূপ পরবর্তী আয়াতের 'তাহাদ্দ্বূনা' কে পাঠ করতেন 'ইয়াহাদ্দ্বূনা', অর্থাৎ খাদ্যদানে তারা একে অপরকে উৎসাহিত করতো না। তেমনি এর পরের আয়াতদ্বয়েও বলা হয়েছে 'তারা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ ভক্ষণ করতো' 'ধন-সম্পদ অতিশয় ভালোবাসতো'। এভাবে বুঝতে হবে, ১৭, ১৮, ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'তারা' সর্বনাম সম্পর্কযুক্ত ১৫ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ' এর সঙ্গে, অথচ 'মানুষ' (ইনসান) শব্দটি একবচন। সেকারণে এখানকার 'মাব্‌তালাহু' (তাকে পরীক্ষা করেন) 'আকরামাহু' (তাকে সম্মানিত করেন) 'নাআ'মাহু' (তাকে অনুগৃহীত করেন) এবং ইয়াকুলু' (সে বলে) বাক্যাংশগুলোতে 'হু' (সে, তাকে) সর্বনামগুলো সম্পর্কযুক্ত হয়েছে 'ইনসান' (মানুষ) এর সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না'। এখানকার 'ওয়া লা তাহাদ্দ্বূনা' (পরস্পরকে উৎসাহিত করো না) ক্বেরাতটি কুফাবাসীদের। অন্যান্য ক্বারীর ক্বেরাত হচ্ছে 'ওয়ালা তাহুদ্দ্বূনা'। দু'টো ক্বেরাতই অবশ্য সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে তোমরা একেবারেই উৎসাহবোধ করো না। এ ব্যাপারে পরস্পরকে কোনো তাগিদও দাও না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেলো'। একথার অর্থ— ন্যূনতম ন্যায়বিচারবোধও তোমাদের নেই। তা নাহলে তোমরা এভাবে বিধবা, এতিম ও অন্যান্য দুর্বল উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে পারতে না। ইবনে জায়েদ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা হাতের কাছে যা পাও, তাই ভোগ করো, এরকম করা বৈধ কী অবৈধ, সে কথা একবারও ভেবে দ্যাখো না। কথাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এরকমভাবেও— প্রাপ্ত সম্পদ হালাল, না হারাম, সে বিষয়ে তোমরা এতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্যাখো না। যা পাও, তাই লুটে পুটে খাও।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালোবাস। এ কথার অর্থ— তোমাদের এমতো অপআচরণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তোমরা আসলে সম্পদলোভী, বিত্তপ্রেম তোমাদের মজ্জাগত।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এটা সঙ্গত নয়'। অর্থাৎ তোমাদের গর্হিত আচরণগুলোকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। শাস্তি থেকে যদি বাঁচতে চাও, চাও ইহ-পারত্রিক কল্যাণ, তবে তোমাদেরকে ওই কুঅভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করতেই হবে। মুকাতিল বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত হয়েছে নেতিবাচক শব্দ 'কাল্লা' যার অর্থ কখনোই নয়। অর্থাৎ তারা তা কখনোই কার্যকর করবে না। অথবা যে সকল শাস্তির কথা এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল শাস্তিতে তাদের নিপতিত হওয়ার সন্দেহটিকে অপসারিত করা হয়েছে এখানকার 'কাললা' কথাটির মাধ্যমে। অর্থাৎ ওই সকল শাস্তি থেকে তারা কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে'। অর্থাৎ যখন মহাপ্রলয় সমাগত হবে, তখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, করে ফেলা হবে কেবল সমতল ভূমি। উঁচু-নিচু কোনো কিছুই আর থাকবে না।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণও'। এখানে 'ওয়া জ্বাআ রব্বুকা' অর্থ এবং যখন তোমার প্রভুপালক উপস্থিত হবেন। আল্লাহ্পাকের এমতো উপস্থিতি যে হবে আনুরূপ্যবিহীন তা বলাই বাহুল্য। কথাটি নিঃসন্দেহে মুতাশাবিহাত (দুর্জ্ঞেয়) আয়াতসমূহের অন্তর্গত। 'আল্লাহ্ তাদের নিকট আগমন করবেন মেঘের ছায়ায়' আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনাও করা হয়েছে। 'ওয়াল মালাকু' অর্থ ফেরেশতাগণও যার 'আলিফ লাম' জাতিবাচক। অর্থাৎ ফেরশতা সম্পদায়। আর এখানকার 'সফ্ফান্ সফ্ফা' (সারিবদ্ধভাবে) পদটি ফেরেশতাদের অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ প্রতিফল দিবসে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে সারিবদ্ধভাবে।

ইবনে জারীর ও ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে প্রথমে ভেঙে পড়বে পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। ফেরেশতারা অবস্থান গ্রহণ করবে এক প্রান্তে। তারপর আল্লাহ্র আদেশে তারা নেমে আসবে পৃথিবীতে। যাবতীয় সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে যাবে সারিবদ্ধ হয়ে। এরপর বিদীর্ণ হবে দ্বিতীয় আকাশ। তারপর একে একে ভেঙে যাবে তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশ। ওই আকাশসমূহের ফেরেশতারাও পৃথিবীতে নেমে এসে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে পূর্বের সারিগুলোকে পরিবেষ্টন করে। সর্বোন্নত স্তরের ফেরেশতারা অবতরণ করবে সকলের শেষে। তাদের বাম পাশে আনা হবে জাহান্নামকে। জাহান্নাম দেখেই মানুষ প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করবে। কিন্তু থেমে যাবে ফেরেশতাদের সাতটি দুর্ভেদ্য বেষ্টনী দেখে। এক সময় জনান্তিকে ঘোষিত হবে একটি আহ্বান। তারপর শুরু হবে হিসাব নিকাশ। ওই দিনের দুর্গতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক আয়াতে। যেমন 'নিশ্চয়

আমি তোমাদের জন্য ভয় করি মহাপ্রলয় দিবসের ......' 'যখন তোমার প্রভুপালনকর্তা আগমন করবেন' 'হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি পারো, আকাশ-পৃথিবীর সীমানা ভেদ করে চলে যাও'।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করবে, তখন তার এই উপস্থিতি তার কী কাজে আসবে'?

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামের রয়েছে সত্তর হাজার লাগাম। প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা। এভাবে তাকে টেনে হিঁচড়ে সেদিন হাজির করানো হবে মহা সমাবেশস্থলে। মুসলিম, তিরমিজি এবং ইবনে ওয়াহাব উল্লেখ করেছেন, জায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে আগমন করলেন জিবরাইল। হজরত আলী জানতে চাইলেন, তাঁর আগমনের হেতু কী? তিনি স. বললেন, তিনি নিয়ে এসেছিলেন প্রত্যাদেশ 'পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে .... সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে' পর্যন্ত। জাহান্নামের আছে সত্তর হাজার লাগাম। সত্তর হাজার করে ফেরেশতা প্রতিটি লাগাম ধরে টেনে টেনে তাকে নিয়ে আসবে হাশর প্রান্তরে। এর মধ্যে একবার ফেরেশতাদের হাত থেকে ফসকে যাবে লাগাম। ওই সুযোগে সে ছুটে যেতে চাইবে। কিন্তু পরক্ষণে সকল ফেরেশতা ধরে ফেলবে তার লাগাম। এভাবে টেনে ধরে রাখবে তাকে। নাহলে সে পুড়িয়ে দিবে মহাসমাবেশস্থলের সকল মানুষকে।

কুরতুবী বলেছেন, জাহান্নামকে বন্দী করে তার নিজস্ব স্থান থেকে টেনে ধরে আনা হবে বিচারস্থলের মহাসমাবেশে। জান্নাতবাসীদেরকেও তার উপরের পুলসিরাত অতিক্রম করে যেতে হবে জান্নাতে।

আবু লাইছের বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বলেছেন, মহাপ্রলয়দিবসে ফেরেশতারা অবতরণ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্ জিবরাইলকে আদেশ করবেন, জাহান্নামকে উপস্থিত করো। জিবরাইল সত্তর হাজার লাগাম দিয়ে জড়িয়ে জাহান্নামকে টানতে থাকবেন। হাশর প্রান্তরের একশত বৎসরের দূরত্বে থাকতেই জাহান্নাম ছাড়বে একটি নিঃশ্বাস। ওই নিঃশ্বাসের উত্তাপে মানুষের প্রাণপাখি বেড়িয়ে যেতে চাইবে। দ্বিতীয় নিঃশ্বাস ছাড়লে হৃৎকম্পন শুরু হবে সকলের। জীবন হবে কণ্ঠাগত। লোপ পেয়ে যাবে বিবেক-বুদ্ধি। এমন কি নবী ইব্রাহিমও নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর সখ্যের দোহাই দিয়ে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবেন কেবল তাঁর নিজের জন্য। নবী মুসা নিবেদন করবেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি আমাকে দোয়ার ভাণ্ডার দান করে অনুগৃহীত করেছো। সেই দোয়ার ভাণ্ডারের দোহাই দিয়ে মিনতি জানাই, তুমি আমাকে পরিত্রাণ দাও। হজরত ঈসা বলবেন, ইয়া ইলাহী! তুমি আমাকে দান করেছো প্রভূত সম্মান। তোমার সেই মহাঅনুদানের অসিলা দিয়ে আমি ত্রাণ চাই কেবল আমার জন্য। আমার জন্মদাত্রী জননীর জন্যও আমি তোমার কাছে সুপারিশ করি না। শেষে, শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম

রসুল প্রার্থনা জানাবেন, হে মহাপ্রতাপশালী! সর্বজ্ঞ! সর্বশক্তিধর! আজ আধিপত্য কেবলই তোমার। দয়া করে তুমি আমার উম্মতকে রক্ষা করো। আমার পরিণতি নিয়ে আমি ভাবি না। আজ চাই কেবল আমার উম্মতের পরিত্রাণ। আল্লাহ্ বলবেন, প্রেমাস্পদ আমার! তোমার উম্মতের মধ্যে যারা আমার বন্ধু (আওলিয়া) তাদের কোনো ভয় নেই। আমি আমার মহামর্যাদার শপথ করে বলছি, তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমার চক্ষুযুগলকে শীতল করে দিবো। হে আমার প্রিয়তমজন! মস্তক উত্তোলন করো। দাঁড়াও। ফেরেশতারা তখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায়।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম'। একথার অর্থ— পৃথিবীর জীবনে যারা সুখে থাকলে গর্ব করতো এবং দুঃখ-কষ্টে পড়লে ধৈর্য ধারণের বদলে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো, তারা তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। আক্ষেপ প্রকাশ করবে এই বলে যে, যথাসময়ে যদি আমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারতাম, তবে আজকের এই কঠিন বিপদের দিনে পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বরূপ করতে পারতাম কিছু পুণ্যসঞ্চয়।

প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তাদের এমতো আক্ষেপ তখন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কেননা তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আয়াতখানি আবার একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও বটে। প্রশ্নটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন কী করবে? এর উত্তর হচ্ছে— তারা তখন তাদের ভুলের জন্য আফসোস করতে থাকবে। বলবে, হায়! পৃথিবীর জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে যথাসময়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারতাম, তবে আজ তার প্রতিফল পেতাম হাতে হাতে। বাঁচতে পারতাম এই মহাদুর্বিপাক থেকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না (২৫), এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না'(২৬)।

এখানে 'আ'জাবাহু' অর্থ তাঁর শাস্তি। 'তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না' অর্থ তাঁর দেওয়া শাস্তির তুলনাই হয় না। 'তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না' অর্থও তেমনি তাঁর শাস্তির বন্ধনও অতুলনীয়। এরকম আষ্টে-পৃষ্ঠে চিরদিনের জন্য শাস্তির বাঁধনে বাঁধার ক্ষমতা কারো নেই। এখানে 'তাঁর শাস্তি' এবং 'তাঁর বন্ধন' কথা দু'টোর 'তাঁর' সর্বনাম হয় কর্তৃবাচক, নয় তো কর্মবাচক। কর্তৃবাচক হলে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্র শাস্তি। অর্থাৎ মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ অপরাধীদেরকে যেভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিবেন, সেভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কেননা সার্বভৌমত্ব এবং আধিপত্য হবে এককভাবে শুধু তাঁর। দ্বিতীয় অবস্থায় সর্বনামটি হবে কর্মবাচক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নরকের প্রহরীরা তাদেরকে

যেভাবে শক্ত করে বেঁধে শাস্তি দিতে থাকবে, সেরকম শাস্তি কেউ কাউকে দিতে পারবে না। এই ব্যাখ্যাটিকে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ভাবা যেতে পারবে তখন, যখন 'শাস্তি কেউ দিতে পারবে না' এবং 'বন্ধন কেউ করতে পারবে না' ক্রিয়াদু'টোর কালাধাররূপে নির্ণয় করা হবে 'সেই দিন' কথাটিকে। আর যদি ধরে নেয়া হয়, ক্রিয়া দু'টো সম্পর্কযুক্ত রয়েছে 'সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে' কথাটির সঙ্গে, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে তখন এমন ভাবে বাঁধবেন ও শাস্তি দিবেন যে, সেরকম শাস্তি তিনি কাউকে দেননি, দিবেনও না। ব্যাখ্যাগুলো করা হলো প্রসিদ্ধ ক্বেরাত অনুসারে। কিন্তু ক্বারী কাসাই এবং ক্বারী ইয়াকুবের ক্বেরাত অনুসারে এখানকার 'ইউআ'জজিবু' হবে 'লা ইউআ'জজাবু' এবং 'ইউছিক্বু' হবে 'ইউছাক্বু'— কর্মপদবাচক পদের শব্দরূপ। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেদিন এমন শাস্তি কাউকে দেওয়া হবে না, যেমন শাস্তি দেওয়া হয় সাধারণ দণ্ডবিধি অনুসারে। বাঁধাও হবে না তাদেরকে সাধারণ কয়েদীদের মতো করে। অথবা বক্তব্যটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ, কিংবা বিশেষরূপে। আর ওই বিশেষ ব্যক্তিটি ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফ।

সূরা ফাজ্বর ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝٢٩ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝٣٠

r হে প্রশান্ত চিত্ত!

r তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,

r আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,

r আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

'ইয়া আইয়্যাতুহান নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ্' অর্থ হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! বাক্যের পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ, একটি পৃথক বাক্য, যা একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব। আর ওই প্রশ্নটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কী দুর্গতি হবে তা তো জানা গেলো। বিশ্বাসীদের পরিণতি তা হলে হবে কী?

'নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ্' অর্থ ওই প্রবৃত্তি, যা আল্লাহ্র স্মরণে ও আনুগত্যে শান্তিপ্রাপ্ত, যেমন পানির ভিতরে শান্তি পায় মাছ। প্রবৃত্তি প্রশান্ত হতে পারে তখন, যখন তার মধ্যে অসুন্দর ও অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষণ আর থাকেই না। আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটা যখন তার উপরে পতিত হয়, তখনই সে কেবল হতে পারে যাবতীয় অপপ্ররোচনা মুক্ত। তখন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেই জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে হয়ে যায় বিলীন। এটাই ফানা। আর এই অবস্থা স্থায়ী যখন হয়, তখনই তাকে বলে বাকা। নফসের এই ফানা-বাকার আগে হয় কলবের

ফানা-বাকা। আর তা হয় আল্লাহ্‌র জিকিরের নিরবচ্ছিন্নতার মাধ্যমে। নফস মুতমাইন্নাহ্ বা প্রশান্ত যখন হয়, তখনই লাভ হয় প্রকৃত ইমান। যেমন কুকুর একটি অপবিত্র প্রাণী, যা ভক্ষণ করা হারাম। তবে লবনের মধ্যে একে নিমজ্জিত করা হলে তার অপবিত্রতা যায় উবে। সম্পূর্ণটাই তখন হয়ে যায় লবন। তখন তা ভক্ষণ করা আর নিষেধ থাকে না।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে'।

এখানে 'রদ্বীয়াহ্' অর্থ সন্তুষ্ট এবং 'মারদ্বিয়াহ্' অর্থ সন্তোষভাজন। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন আল্লাহ্‌ও তার প্রতি পরিতুষ্ট হন এবং তখনই সে হয়ে যেতে পারে আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন। বরং আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাই তাঁর সন্তোষভাজন হওয়ার নিদর্শন। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক যখন কোনো প্রশান্তহৃদয় প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করতে চান, তখন তার হৃদয় ও প্রবৃত্তি হয় আরো অধিক প্রশান্ত। ফলে সে হয়ে যায় আল্লাহ্‌র পরিতোষভাজন।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তাদের সাক্ষাতে প্রীত হন। একথা শুনে জননী আয়েশা, অথবা অন্য কোনো উম্মতজননী জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু মৃত্যু তো কারো পছন্দ নয়। তিনি স. বললেন, না। ব্যাপারটা ওরকম নয়। মৃত্যু যখন কারো কাছে মহাসৌভাগ্যের শুভসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন পরকাল যাত্রা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তার আকর্ষণ আর থাকে না। আর মৃত্যু যখন কারো কাছে মহাশাস্তির পূর্বাভাষ হয়ে আসে, তখন চিরতরে হারিয়ে যায় তার সকল স্বস্তি। পরযাত্রা করতে হয় তাকে বাধ্য হয়ে। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশার আর এক বর্ণনায় এসেছে, মৃত্যু আসে আল্লাহ্‌র পরম সাক্ষাতের পূর্বে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, মুমিনের পরলোকগমনের প্রাক্কালে শুভ্র রেশমী বস্ত্র নিয়ে রহমতের ফেরেশতারা উপস্থিত হয়। বলে, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তোমার প্রভুপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। এ ডাক শুনে বের হয়ে আসে মেশকের মতো সুরভিময় পবিত্র রূহ। ফেরেশতাদের মাধ্যমে হাত বদল হতে হতে সে পৌঁছে যায় আকাশের দরজায়। সেখানকার ফেরেশতারা বলে, এতো দেখছি পবিত্র ও প্রশান্ত রূহ। রূহবাহী ফেরেশতারা বলে, একে মিলিয়ে দাও পবিত্র রূহগুলোর সঙ্গে। তাই করা হয়। পবিত্র রূহবৃন্দ নতুন সাথী পেয়ে মেতে উঠে আনন্দে, যেমন আনন্দাপ্লুত হয় বন্ধুরা তাদের হারানো বন্ধুকে ফিরে পেলে। তাদের একজন নতুন সাথীকে জিজ্ঞেস করে, অমুকের কী খবর? অন্যরা বলে, তুমি থামোতো। অস্বস্তিকর স্থান ছেড়ে ও কেবল তো এলো। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। নতুন অতিথি তবুও তার সাথীর প্রশ্নের জবাবে হয়তো বলে, অমুকের কথা জিজ্ঞেস করছেন? সে তো চলে গিয়েছে তার আসল ঠিকানায় (হাবিয়া দোজখে)। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকাল যখন সমাগত হয়, তখন তার

কাছে উপস্থিত হয় শাস্তির ফেরেশতারা। বলে, হে অপবিত্র নফস! বের হয়ে এসো আল্লাহ্‌র রোষতপ্ততার দিকে। তোমার প্রতি আল্লাহ্ অপ্রসন্ন। একথা বলে তারা তাকে জোর করে বের করে আনে। নিয়ে যায় সিজ্জীনের দরজায়। সেখানকার ফেরেশতারা বলে, উহ! কী দুর্গন্ধ! এরপর তারা তাকে মিলিয়ে দেয় তার হতভাগ্য পূর্বসূরীদের সঙ্গে।

ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও এরকম বলা হয়েছে। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— বিশ্বাসীদের রূহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঊর্ধ্বাকাশে। তার জন্য খুলে দেওয়া হয় আকাশের দ্বার। বলা হয়, পবিত্রাত্মার জন্য অভিনন্দন। আর অবিশ্বাসীদের আত্মাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলেও আকাশের দ্বার তার জন্য খোলা হয় না। বলা হয় এর আগমন অশুভ। অভিনন্দন এর প্রাপ্য নয়। সুতরাং একে নিক্ষেপ করো দূরে। তাই করা হয়। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার সমাধিক্ষেত্রে। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে আরো অনেক। তবে এই বিষয়টি কোনোক্রমেই তেমন স্পষ্ট নয় যে, এরকম কথা বলা হবে আসলে কখন। কেউ বলেছেন, এরকম কথোপকথন হয় মৃত্যুর সময়। একথার সমর্থন রয়েছে অনেক হাদিসে। আবু সালেহ বলেছেন, অন্তিম যাত্রার সময় বলা হয় 'এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে'। আর প্রতিফল দিবসে বলা হবে, 'আমার বান্দাদের অন্তর্ভূত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো'। কিছুসংখ্যক বিদ্বান বলেছেন, কবর থেকে পুনরুত্থিত করার সময় বলা হবে 'ইরজ্বিঈ' ইলা রব্বিক, ওয়াদখুলী ফী আজ্বসাদি ই'বাদী'। (স্বীয় পালনকর্তার দিকে ফিরে এসো, আর আমার বান্দার নিজ দেহে প্রবেশ করো)। অর্থাৎ তাকে তখন হুকুম দেওয়া হবে তার নিজ দেহে প্রবেশের। এরকম বলেছেন ইকরামা, আতা, জুহাক এবং আউফি সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস।

হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! ফিরে এসো আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদা ও পুণ্যের দিকে। তিনি তোমার জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট হও; জেনে রাখো, তিনিও তোমার প্রতি তুষ্ট। আর আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন দাসদের দলভূত হয়ে প্রবেশ করো জান্নাতে।

আমি বলি, বক্তব্যের গতি-প্রকৃতি এমতো ব্যাখ্যারই সমর্থক। অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে এরকম বলা হবে পুনরুত্থান দিবসে। যেমন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তার বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না' (২৫, ২৬)। তবে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, এরকম বলা হবে তাদের মৃত্যুকালে। এমতো দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে বলা যেতে পারে, এরকম বলা হবে মৃত্যু ও পুনরুত্থান উভয় সময়ে। তবে প্রশান্ত প্রবৃত্তি এরকম যোগ্যতা লাভ করে তার পৃথিবীর জীবনেই। অর্থাৎ পৃথিবীতেই সে হয় প্রশান্ত ও তুষ্ট। একারণেই তাকে সম্বোধন করে বলা হয়, 'ফিরে এসো তোমার প্রভুপালনকর্তার দিকে'।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমার বান্দাদের অন্তর্ভূত হও (২৯); আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো' (৩০)।

এখানে 'ই'বাদী' অর্থ বান্দাগণ, যাঁরা পুণ্যবান। এই পুণ্যবানদের দলভূত হওয়ার আকাংখা নবী সুলায়মান প্রকাশ করেছিলেন এভাবে 'আর তুমি অনুকম্পা পরবশ হয়ে আমাকে দলভূত কোরো তোমার পুণ্যবান বান্দাদের'। নবী ইউসুফ বলেছিলেন 'তুমি আমার মৃত্যু দাও মুসলমান অবস্থায়। আর আমাকে দলভূক্ত করো পুণ্যবানদের'। আল্লাহ্পাক স্বয়ং ইবলিসকে এদের সম্পর্কেই বলেছিলেন যে, তুমি তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

'ফাদ্খুলী' অর্থ অন্তর্ভুক্ত হও। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হওয়াই বিশুদ্ধ দাসত্ব অর্জনের নিমিত্ত। এমতো দাসত্ব অর্জন করা সম্ভব হবে কেবল তখন, যখন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখা যাবে মিথ্যা উপাস্যসমূহের অপপ্রভাব থেকে এবং শয়তানী প্ররোচনার সকল সূত্র থেকে। উল্লেখ্য, অন্য এক আয়াতে প্রবৃত্তিপূজকদেরকে গঞ্জনা দিয়ে আল্লাহ্পাক বলেছেন 'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা উপাস্য নির্ধারণ করে নিয়েছে তাদের প্রবৃত্তিকে'। আর রসুল স. তাদেরকে তিরস্কার করে বলেছেন, যারা বিত্তের দাস, তারা অধম।

'ওয়াদ্খুলী জান্নাতী' অর্থ আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। আল্লাহ্পাক এখানে এই জান্নাতকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন তাঁর নিজের সত্তার সঙ্গে। সুতরাং বুঝতে হবে, যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তিনি প্রশান্ত প্রবৃত্তিধারীদেরকে ডাকবেন, সেই জান্নাত নিশ্চয়ই হবে অন্যান্য জান্নাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস পরলোকগমন করেছিলেন তায়েফে। আমি তার জানাযায় উপস্থিত হলাম। অকস্মাৎ উড়ে এলো অদৃশ্যপূর্ব এক পাখি। পাখিটি ঢুকে পড়লো তাঁর নিঃসাড় দেহের ভিতরে। আর বের হলো না। যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো, তখন নেপথ্য থেকে কে যেনো আবৃত্তি করলো 'হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকটে ফিরে এসো পরিতুষ্ট ও পরিতোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভূত হয়ে। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো'।

হজরত বুরাইদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিলো শহীদশ্রেষ্ঠ মহামান্যবর হামযাকে লক্ষ্য করে। জুহাক সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ অবতীর্ণ হয়েছে মহামাননীয় খলিফা ওসমান ইবনে আফ্ফানকে কেন্দ্র করে।

দ্রষ্টব্যঃ কোনো কোনো সুফী আউলিয়া আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ করেন এভাবে— ওহে পৃথিবীর মোহে মগ্ন প্রবৃত্তি! ছিন্ন করো পার্থিবতার সর্বশেষ আকর্ষণ সূত্র। সম্পূর্ণরূপে হও আল্লাহ্অভিমুখী। ধরো তাদের তরিকা (পথ) যারা সতত পরিভ্রমণরত আল্লাহ্র পথে।

সূরা বালাদ

সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে চিরজ্যোতির্ময় পুণ্যধাম মক্কায়। এতে রয়েছে ১ রুকু এবং ২০ আয়াত।

সূরা বালাদ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿۱﴾ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿۲﴾ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿۴﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿۵﴾ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿۶﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿۷﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿۸﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿۹﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿۱۰﴾

q আমি শপথ করিতেছি এই নগরের
q আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,
q শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।
q আমিতো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে
q সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না?
q সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।'
q সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই?
q আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু?
q আর জিহ্‌বা ও দুই ওষ্ঠ?
q আর আমি তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে 'লা উক্বসিমু বিহাজাল বালাদ' (আমি শপথ করছি এই নগরের)। এখানকার 'লা' শব্দগতভাবে সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে এবং অর্থগতভাবে বক্তব্যকে গুরুত্ববহ করার উদ্দেশ্যে। 'লা' এর অতিরিক্ততা এটাই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, বিষয়টি অতিনিশ্চিত, তাই এ সম্পর্কে শপথ না করলেও চলে। আর 'হাজাল বালাদ' অর্থ এই নগরের। অর্থাৎ মক্কার।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আর তুমি এই নগরের অধিবাসী'। কথাটি পূর্বোক্ত বাক্যের অবস্থাপ্রকাশক। আল্লাহ্‌পাক পুণ্যভূমি মক্কার শপথ করেছেন— একথা ঠিক, কিন্তু একথাও ঠিক যে, শপথটি সীমিতার্থক। অর্থাৎ

শপথ মক্কার একারণে যে, এ নগর মহিমান্বিত। আর এর মহিমা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুলের অবস্থানের কারণে। রসুল স. হিজরতের প্রাক্কালে মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, সকল নগরী অপেক্ষা তুমি অধিকতর সুন্দর, মহিমময়। মক্কাবাসীরা আমাকে বের করে না দিলে আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতাম না। হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি সূত্রগতভাবে উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুর্লভ শ্রেণীর। অনুরূপ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন বলেছিলেন, প্রিয়তম মক্কা আমার ! শপথ আল্লাহ্র, তুমি আল্লাহ্র নিকট সকল নগরী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমাকে বের করে না দেওয়া হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।

এখানকার 'হিল্লুন' অর্থ মুস্তাহিল (বৈধ), হালাল মনে করা। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনাকে এ শহর থেকে বের করে দেওয়াকে আপনার শত্রুরা হালাল মনে করে, যেমন হালাল মনে করা হয় হেরেম শরীফের বাইরে শিকার করাকে। এভাবে এখানে যেনো মক্কার মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এই বলে যে, হে আমার নবী! আপনাকে বন্দী, হত্যা, অথবা দেশান্তর করা তাদের বিবেচনায় বৈধ। কথাটির মর্মার্থ এরকমও করা হয়েছে যে— হে আমার রসুল! অন্য সকলের জন্য নিষিদ্ধ হলেও আপনার জন্য এই নগরীতে কাউকে বন্দী অথবা হত্যা করা বৈধ। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বুঝতে হবে, বক্তব্যটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও একটি অঙ্গীকার। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, বিজয়ী আমি আপনাকে করবোই। সেদিন বেশী দূরে নয়। যখন মক্কা ও মক্কাবাসীসহ সমগ্র আরব ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে কেবল আপনার। তখন কিছুকালের জন্য এই শহরে রক্তপাত ঘটানো হবে আপনার জন্য বৈধ। বলা বাহুল্য, এরকমই ঘটেছিলো। মক্কাবিজয়ের দিবসে তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালাকে বধ করতে হবে, যেখানে তাকে পাওয়া যাবে সেখানেই। সে আঁকড়ে ধরেছিলো কাবা গৃহের গেলাফ। সেখান থেকে তাকে টেনে এনে হত্যা করেছিলেন হজরত মাকীস ইবনে খাবাবা ও তাঁর সঙ্গীগণ। তিনি স. তখন বলেছিলেন, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির দিবস থেকেই আল্লাহ্ এই নগরীকে করেছেন মহাসম্মানিত। মহাপ্রলয় পর্যন্ত বজায় থাকবে এই নগরীর মহামর্যাদা। এখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ। আমার পূর্বে এখানে রক্তপাত ঘটানো কারো জন্য বৈধ ছিলো না। বৈধ থাকবে না আমার পরেও। আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে কেবল দিবসের একাংশের জন্য। এখানে রক্তপাত তো নিষিদ্ধই, তদুপরি নিষিদ্ধ এখানকার বৃক্ষকর্তন ও তৃণগুল্ম উচ্ছেদ। কোনো শিকার এখানে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকেও সংহার করা যাবে না । এখানকার পরিত্যক্ত সম্পদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে না কারো অধিকার। তবে হ্যাঁ, পরিত্যক্ত সম্পদের ঘোষণা দিয়ে সে তা প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত আমানত হিসেবে নিজের কাছে রাখতে পারবে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে'। এখানে 'ওয়ালিদিন' অর্থ জন্মদাতা। অর্থাৎ মানুষের প্রথম পিতা নবী আদম, অথবা মুসলিম মিল্লাতের পিতা নবী ইব্রাহিম, অথবা সকল পিতা, যারা তাদের আপন আপন সন্তান-সন্ততির জনক।

'ওয়ামা ওয়ালাদ' অর্থ যা সে জন্ম দেয়। কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সকল আদম সন্তানকে, অথবা নবী ইব্রাহিমের বংশোদ্ভূত নবীগণকে। অথবা কেবল রসুল স.কে। এখানকার অনির্দিষ্টবাচক অব্যয় 'মা' মাহাত্ম্যপ্রকাশক। 'মান' (যে ব্যক্তি) এর স্থলে 'মা' (যা) এখানে বিস্ময়প্রকাশক। 'মা' এর এরকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'আর আল্লাহ তা জানেন, যা সে প্রসব করেছে'। সেরূপ এখানেও 'মান' এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে 'মা'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে'। বাক্যটি পূর্বোক্ত শপথের জবাব। আর এখানকার 'আল ইনসান' এর আলিফ লাম জাতিবাচক। অর্থাৎ যে কোনো মানুষ। অথবা বিশেষ কোনো মানুষ। যেমন আবুল আসাদ। এক বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো আবুল আসাদ সম্পর্কে। তার আসল নাম ছিলো উসায়েদ ইবনে কেলাদা ইবনে জমুহ। সে ছিলো খুবই বলশালী। উকাজী চামড়ার উপরে দাঁড়িয়ে সে বলতো, যে আমার পায়ের নিচের চামড়া সরিয়ে নিতে পারবে, তার জন্য রয়েছে এতো এতো পুরস্কার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে কেউ পুরস্কার নিতে পারেনি। চামড়া ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়েছে। কিন্তু তাকে তার স্থান থেকে কেউ নড়াতে পারেনি এতটুকুও।

'কাবাদ' অর্থ কষ্ট-ক্লেশ। এখানকার 'আল ইনসান' এর 'আল' যদি জাতিবাচক হয়, তবে শব্দটির অর্থ হবে দুঃখ-কষ্ট। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে আমি দিয়েছি ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবন। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি মানুষের জন্ম, প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটাই বিভিন্ন ক্লেশকর পর্যায়ের মাধ্যমে। যেমন ভ্রুণ, মাতৃজঠরের তমসা, ভূমিষ্ঠ হওয়ার অস্বস্তি, দুগ্ধপানের মুখাপেক্ষিতা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা। যৌবনের জীবিকার্জন চেষ্টা, বার্ধক্যের দৌর্বল্য, মৃত্যুর যন্ত্রণা— সবকিছুই তো ভোগ করতে হয় মানুষকে।

আমি বলি, অন্যান্য প্রাণীর জীবনও এরকম ঘাত-প্রতিঘাতময়। সুতরাং জৈবিক দুঃখ-কষ্ট এখানকার বক্তব্যবিষয় নয়। বরং এখানে বলা হয়েছে বুদ্ধিগত ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখ-ক্লেশের কথা। অন্যান্য প্রাণীর বিবেক-বুদ্ধি নেই। তাই তাদের দুঃখ-ক্লেশের উপলব্ধিও অত্যন্ত সীমিত। মানুষ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই প্রকৃত দুঃখভোগ করতে হয় তাদেরকেই। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে বলা হয়েছে 'আমানত' বহনের দুঃখ-ক্লেশের কথা, যে আমানতের দায়িত্ববহনের আমন্ত্রণ পেয়ে সভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে আকাশ-পৃথিবী-পাহাড়-পর্বত। অথচ মানুষ তা স্বস্কন্ধে তুলে নিয়েছে অবলীলায়। এখন এই দায়িত্ববহনের কষ্ট যারা স্বীকার করবে, তারাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন; আর যারা তা করবে না, তারা অবশ্যই হবে

শাস্তিগ্রস্ত। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতখানি হয়ে যায় অন্য আর একটি আয়াতের সমার্থক, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমারই ইবাদত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে'। উল্লেখ্য, মহান ধর্ম ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে রসুল স.কে ভোগ করতে হতো অনেক দুঃখ-যাতনা। তাই আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মাঝে মাঝে তাকে সান্ত্বনা দান করতেন। আলোচ্য আয়াতখানিও তেমনি একটি সান্ত্বনা প্রদানকারী আয়াত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলো আবুল আসাদ, এরকম মন্তব্য করার পর মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'কাবাদ' অর্থ শক্তি, বল।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপরে কেউ ক্ষমতাবান হবে না'। এখানে 'আ ইয়াহ্সাবু' অর্থ সে কি মনে করে? কথাটির কর্তা আগের আয়াতের 'মানুষ'। আর 'মানুষ' যদি এখানে আবুল আসাদ হয়, তবে ধরে নিতে হবে, এটা তার প্রতি এবং তার মতো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর প্রতি হুমকি। অর্থাৎ ক্ষমতার দর্প তাদেরকে পরিত্যাগ করতেই হবে। নতুবা শিকার হতে হবে করুণ পরিণতির, আর যদি 'মানুষ' অর্থ হয় মানব জাতি, তবে বুঝতে হবে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আবুল আসাদ, ওলীদ ইবনে মুগীরা ও তার মতো কতিপয় দুরাচারকে, যারা রসুল স.কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। সর্বাবস্থায় প্রশ্নটি হবে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং প্রতাপপ্রকাশক।

'আল্ লাঁই ইয়াক্বদিরা আ'লাইহি আহাদ' অর্থ কখনো তার উপরে কেউ ক্ষমতাবান হবে না? অর্থাৎ এরকম অপধারণা তারা যদি করেই, তবে এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাক। পরিত্যাগ করুক দম্ভ, অহমিকা। নতুবা পরিত্রাণ তাদের কপালে জুটবে না। এখানে না বাচক বক্তব্যের পর উল্লেখ করা হয়েছে অনির্দিষ্টবাচক 'আহাদ'। অর্থাৎ কেউ নয়। আবুল আসাদের ধারণা ছিলো, শাস্তিদানকারী ফেরেশতারা তার সাথে শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। অথবা 'আহাদ' অর্থ এখানে আল্লাহ্। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আবুল আসাদ ধারণা করে কী? সে কি এরকম ভেবে বসে আছে যে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, দান করেছেন তাকে প্রচুর শারীরিক সামর্থ্য, সেই সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ও তাকে পরাভূত করতে পারবে না?

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'সে বলে, আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি'। এই উক্তিটিও আবুল আসাদের। কথাটির অর্থ— সে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী তো বলেই, তদুপরি এরকম কথাও বলে যে, হে কুরায়েশ জনগোষ্ঠী! আমি তো মোহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রচুর অর্থও ব্যয় করে থাকি, যাতে করে তার অগ্রযাত্রা প্রতিহত হয়। অতএব এ ব্যাপারেও তো আমার শ্রেষ্ঠত্বের কথা তোমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এখানে 'লুবাদান' অর্থ প্রচুর অর্থ-সম্পদ। এর একবচন 'লুবদাতুন'।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি'? একথার অর্থ— সে মনে করেছে কী? আল্লাহ্পাক কি তার মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন না। সে তো নিতান্তই অজ্ঞ। তাই জানে না ও বিশ্বাস করতে চায় না যে, আল্লাহ্ অন্তর্যামী, সর্বদ্রষ্টা। তাই তিনি যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তাকে দিবেনই। শারীরিক শক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে এমতো জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এই ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কাতাদার ব্যাখ্যার অনুরূপ। কালাবী বলেছেন, আবুল আসাদ ছিলো মিথ্যুক ও দাম্ভিক। সে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কথা বলেছিলো বটে, কিন্তু আদতে তা করেনি। কেননা সে ছিলো ব্যয়কুণ্ঠও। তাই এখানে বলা হয়েছে— সে বলে আমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছি। কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা, তা কেউ না জানলেও আল্লাহ্ তো জানেন। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানের সঙ্গে মিথ্যাবাদিতার শাস্তিও তার জন্য অবধারিত। বাক্যটির মাধ্যমে তার প্রবহমান বক্তব্যকে করা হয়েছে অধিকতর বেগবান।

আল্লাহ্পাক অবশ্যই তাঁর এবং তাঁর রসুলের শত্রুদেরকে শায়েস্তা করতে সক্ষম এবং বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাঁর অধিকারভূত। কেননা তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন শত সহস্র নেয়ামত। সুতরাং অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাভূত। প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে কিছুসংখ্যক নেয়ামতের কথা। বলা হয়েছে—

'আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু (৮)? আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ' (৯)। একথার অর্থ— তার সত্তা এবং সত্তাসম্পৃক্ত সকল কিছুই যে আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহ, সে কথা সে ভেবে দ্যাখে না কেনো? আমি তাকে দিয়েছি দু'টি চোখ, যা দিয়ে সে দ্যাখে। দিয়েছি রসনা, যা দ্বারা সে কথা বলে, আস্বাদন করে খাদ্যের স্বাদ। দিয়েছি ওষ্ঠাধর, যা তাকে সাহায্য করে কথা বলতে, খেতে ও ফুৎকার দিতে।

বাগবী লিখেছেন, হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার রসনা যদি অশোভন কথা বলতে উদ্যত হয়, তবে তুমি ব্যবহার করো আমা কর্তৃক প্রদত্ত ঢাকনা— ওষ্ঠাধর। আর দৃষ্টি যদি উদগ্রীব হয় অসিদ্ধ কিছু দেখতে, তবে বন্ধ করে দিয়ো চোখের দুই পাতা, যা আমি তোমাকে দিয়েছি চোখের আবরণস্বরূপ। আর লজ্জাস্থানকে সংবৃত কোরো উপযুক্ত আচ্ছাদন দ্বারা, যে আচ্ছাদন আমারই দান।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে দু'টি পথ দেখিয়েছি'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে আমি তাকে দেখিয়েছি তার খাদ্যাধার, মায়ের দুই দুগ্ধপূর্ণ স্তন। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও জুহাক। তবে অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ এখানকার 'দু'টি পথে'র অর্থ করেছেন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পথ, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, হক-বাতিল, সুপথ-বিপথ। এভাবে কথাটির মর্মার্থ

দাঁড়ায়— আমি তাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে, নবী-রসুল ও কিতাব পাঠিয়ে তার সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছি সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও বিপথ। এখন সে নিজে নিজে ঠিক করুক কোন পথে সে চলবে ।

সূরা বালাদ ঃ আয়াত **১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০**

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

r সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে নাই।

r তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী?

r ইহা হইতেছে ঃ দাসমুক্তি

r অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান

r ইয়াতীম আত্মীয়কে,

r অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,

r তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মু'মিনদের এবং তাহাদের, যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের;

r ইহারাই সৌভাগ্যশালী।

r আর যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হতভাগ্য।

r উহারা পরিবেষ্টিত হইবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ফা লাক্বতাহামাল আ'ক্বাবাহ্' (সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি)। অনেকের মতে এখানকার 'ফালা' শব্দের 'লা' অব্যয়টি 'কেননা' অর্থে ব্যবহৃত। কারণ পুনরাবৃত্তি ব্যতীত 'লা' অব্যয়টি অতীতকালবোধক ক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয় না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সে তাহলে আমার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ বাদ দিয়ে আমার আনুগত্যকে মান্য করেনি কেনো, শয়তানের পথে সম্পদ ব্যয় না করে কেনো অর্থ ব্যয় করেনি আমার পথে। এরকম করলেই তো সে তার সম্পদের সাহায্যে অতিক্রম করতে পারতো আল্লাহ্র পরিতোষের পথের যাবতীয় প্রতিকূলতাকে।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে না-বাচক অব্যয় 'লা' ব্যবহৃত হয়েছে তার যথা অর্থেই। শব্দগতভাবে 'লা' এর ব্যবহারিক স্থল একটাই। কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে এর ব্যবহার রয়েছে কয়েকটি আক্বাবাতে। 'আ'ক্বাবা' অর্থ ঘাঁটি,

গিরিসংকট, বন্ধুর গিরিপথ। পরবর্তী আয়াতসমূহে 'লা' ব্যতীত উল্লেখ করা হয়েছে তিনটি ঘাঁটির কথা— দাসমুক্তি, অন্নহীনকে অন্নদান এবং বিশ্বাস গ্রহণ। এই তিনটি ক্ষেত্রে 'লা' ব্যবহারের সুযোগ ছিলো উন্মুক্ত। তবুও তা করা হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে, মূল বক্তব্যটি ছিলো যেনো এরকম— যে দাসকে মুক্ত করেনি, নিরন্নকে অন্ন দেয়নি, সে নিজেও বিশ্বাসী হয়নি।

প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি সম্পর্কযুক্ত হবে ৬ সংখ্যক আয়াতের 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি' কথাটির সঙ্গে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির প্রেক্ষাপটে আয়াতখানির যোগসূত্র মিলিত হবে শপথের জবাবের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি আদেশ-নিষেধের আওতাভূত করে। কিন্তু তারা আদেশ-নিষেধের ঘাঁটিতে অবতরণ করতেই চায় না। ফলে তাদের সাফল্য লাভের উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ। অথবা বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে 'আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দু'টি নয়ন' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় ভাবার্থ দাঁড়ায়— আমি তাকে দিয়েছি অবলোকনপ্রবণ চক্ষু এবং বাকশক্তিসম্পন্ন রসনা ও ওষ্ঠাধর। দেখিয়েছি সুপথ ও বিপথ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে তার জ্ঞান-বিবেচনাকে ব্যবহার করেনি। পথিক হয়নি সরল সঠিক পথের (সিরাত্বল মুস্‌তাক্বীমের)। প্রদর্শন করেনি আমার অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা।

বস্তুতঃ 'আক্বাবাহ্' বলে গিরিপথকে, যা সাধারণত হয় বন্ধুর। 'ইক্বতিহাম' অর্থ ঘষা। এখানে অর্থ হবে— নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা, আনুগত্যের পথের পথযাত্রার ক্লেশ। কাতাদা এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন 'ইক্বতিহাম' অর্থ গিরিপথের চড়াই-উৎরাই অতিক্রমণ। এভাবে মুক্তি প্রাপ্তির অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব থেকে। কারণ পাপীর উপরে পাপের বোঝাকে এবং অপরিহার্য দায়িত্বকে তুলনা করা হয়েছে এখানে বন্ধুর গিরিপথের সঙ্গে। আর অর্পিত দায়িত্বসমূহ যথাপ্রতিপালনকে তুলনা করা হয়েছে বন্ধুর গিরিপথ অতিক্রমণের সঙ্গে।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই বন্ধুর গিরিপথটি হচ্ছে জাহান্নামের একটি পার্বত্য পথ। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, 'আক্বাবাহ্' হচ্ছে জাহান্নামের সেতু পারাপারের একটি গিরিপথতুল্য পথ, যা অতিক্রম করা যায় কেবল আল্লাহ্পাকের আনুগত্যের দ্বারা।

মুজাহিদ, জুহাক ও কালাবী বলেছেন, জাহান্নামের উপরে স্থাপিত সেতুর নাম আক্বাবাহ, যা তলোয়ারের ধার অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং যার চড়াই-উৎরাই ও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ তিন হাজার বছর পথের দূরত্বের সমান। তার দু'পাশে রয়েছে শাদা বৃক্ষের কণ্টকসদৃশ কণ্টক ও বাঁধানো আংটি। কেউ সে পথ অতিক্রম করবে অনায়াসে, কেউ ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে। কেউ অশ্বারোহীর মতো দ্রুতগতিতে। আবার কেউ অধোমুখী হয়ে পড়ে যাবে জাহান্নামের আগুনে। কেউ চলবে ঝড়ের বেগে, কেউ পদব্রজে, কেউ নিতম্ব ঘষতে ঘষতে। কেউ কেউ আবার কাঁটার আঁচড়ে জখম হতে হতে এক সময় লুটিয়ে পড়বে জাহান্নামে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি' অর্থ সে তো চলেনি পরিত্রাণের পথে।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— তুমি কি জানো, বন্ধুর গিরিপথ কী? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তারা কি জানে পরিত্রাণের পথের স্বরূপ কী? সে পথের বন্ধুরতা কী? আর সে বন্ধুরতা অতিক্রমের পুরস্কারই বা কী? ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, আল্লাহ্পাক যদি বলেন 'মা আদ্রাকা' (তুমি কি জানো) তাহলে পরক্ষণেই জানিয়ে দেন তার জবাব। কিন্তু যদি বলেন 'মা ই'দরীকা' তাহলে তার জবাবটি আর উল্লেখ করেন না। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে 'মা আদরাকা' তাই এর পর দেওয়া হয়েছে উত্থাপিত প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর।

'আক্বাবাহ্' অর্থ যদি হয় আনুগত্য, তাহলে উহ্য কোনো কিছু আর ধরে নিতে হবে না। কিন্তু শব্দটির মর্মার্থ যদি করা হয় পাপের বোঝা, তবে বুঝতে হবে এখানে উহ্য রয়েছে একটি সম্বন্ধপদ। এমতাবস্থায় ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তুমি কি জানো, পাপের পথ অবলম্বন এবং তা থেকে মুক্তির উপায় কী?

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এটা হচ্ছে দাসমুক্তি'। 'ফাক্কু রক্বাবাতিন' এর শাব্দিক অর্থ গ্রীবামুক্তি। মর্মার্থ দাসমুক্তি। বক্তব্যটি সাধারণার্থক। এর অর্থ একজন ক্রীতদাসকে পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেওয়া, অথবা তাকে মুক্ত করে দেওয়া তার মূল্য পরিশোধ করে। অথবা লিখিত শর্তে মুক্তি প্রাপ্য দাসকে মুক্তির ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দান। কিংবা যে ক্রীতদাসের মুক্তিপণের কিছু অংশ অপরিশোধিত অবস্থায় আছে, তার সেই অপরিশোধিত অংশ পরিশোধ করে দেওয়া। অর্থাৎ সকল ধরনের ক্রীতদাস মুক্তিই আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যভূত।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, একবার এক বেদুইন রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল ! আমাকে এমন কিছু করতে বলুন, যা আমাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিনি স. বললেন, তোমার কথা ছোট্ট, কিন্তু এর আবেদন বিশাল। ঠিক আছে, ক্রীতদাস মুক্ত করো। মুক্ত করে দাও গ্রীবা। বেদুইন বললো, কর্ম দু'টো কি এক নয়? তিনি স. বললেন, ক্রীতদাস মুক্ত করা অর্থ পুরোপুরি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়া। আর গ্রীবা মুক্ত করার অর্থ কোনো ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে আর্থিকভাবে অংশ গ্রহণ। আর শোনো, ক্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য যদি তোমার না থাকে, তবে অনাহারীকে আহার করিয়ো। পানি পান করিয়ো পিপাসার্তকে। সৎকর্মের আদেশ দিয়ো এবং বিরত থাকার উপদেশ দিয়ো অসৎকর্ম থেকে। তাও যদি না পারো তবে জিহ্বাকে সংযত রেখো। ভালো কথা ছাড়া মন্দ কথা বোলো না। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করে, আল্লাহ্ তার প্রতিটি অঙ্গের পরিবর্তে নরকের আগুন থেকে রক্ষা করেন তার প্রতিটি অঙ্গকে। এমনকি গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে গুপ্তাঙ্গকে। বোখারী, মুসলিম। ইকরামা বলেছেন, পাপ থেকে তওবা করে স্বীয় প্রবৃত্তিকে পাপমুক্ত রাখার নামই 'ফাক্কু রক্বাবাতিন'।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান (১৪) এতিম আত্মীয়কে (১৫), অথবা দারিদ্রনিষ্পেষিত নিঃস্বকে' (১৬)। এখানকার 'মাস্‌গাবাতুন' 'মাক্‌রাবাতুন' এবং 'মাতরাবাতুন' শব্দত্রয়ের ধাতুমূল হচ্ছে যথাক্রমে 'সাগবুন' 'ক্বারুবুন' ও 'তারিবুন'। এর অর্থ ক্ষুধার্ত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া ও নিঃস্ব হওয়া। এখানে চরম নিঃস্বের কথাই বলা হয়েছে এভাবে— অথবা দারিদ্রনিষ্পেষিত নিঃস্বকে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মুমিনদের এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের'। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে 'বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি' অথবা 'এটা হচ্ছে দাসমুক্তি' এর সাথে। এখানে 'ছুম্‌মা' (তদুপরি, অতঃপর) হচ্ছে অনুক্রমিক অব্যয়। এর পূর্বাপর বিষয় হয় পৃথক পৃথক। দাসমুক্তি, অন্নদান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম ও ইমান পৃথক পৃথক বিষয়। তবে ইমান হচ্ছে যাবতীয় পুণ্যকর্মের ভিত্তি।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এরাই সৌভাগ্যশালী'। 'আস্‌হাবুল মাইমানাহ্‌' এর শাব্দিক অর্থ দক্ষিণ দিকের দল। প্রতিফল দিবসে এরাই যে হবে সৌভাগ্যশালী, তা বলাই বাহুল্য। এরাই তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে সৎ উপদেশ দেয়। বলে, বিপদে ধৈর্যধারণ করতে এবং পরস্পরের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ করতে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে 'আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য (১৯)। তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে' (২০)। একথার অর্থ— আর যারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করে, তারা প্রতিফল দিবসে অন্তর্ভুক্ত হবে বাম দিকের দলের। আমলনামা পাবে বাম হাতে। নিঃসন্দেহে তারাই চিরহতভাগ্য। দোজখের অবরুদ্ধ অগ্নিই হবে তাদের চিরকালীন আবাস। এখানে 'আসহাবুল্‌ মাশ্‌আমাহ্‌' অর্থ বাম দিকের দল। আর 'মু'সাদাহ্‌' অর্থ অবরুদ্ধ অগ্নি, আবদ্ধ গৃহ।

সূরা শাম্‌স

মহাপুণ্যময় নগরী মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এতে রয়েছে ১টি রুকু এবং ১৫টি আয়াত।

সূরা শাম্‌স ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَ الشَّمۡسِ وَ ضُحٰہَا ۪ۙ﴿۱﴾ وَ الۡقَمَرِ اِذَا تَلٰىہَا ۪ۙ﴿۲﴾ وَ النَّہَارِ اِذَا جَلّٰىہَا ۪ۙ﴿۳﴾ وَ الَّیۡلِ اِذَا یَغۡشٰىہَا ۪ۙ﴿۴﴾ وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰىہَا ۪ۙ﴿۵﴾ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا طَحٰىہَا ۪ۙ﴿۶﴾

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

- শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের,
- শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,
- শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে,
- শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,
- শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,
- শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,
- শপথ মানুষের এবং তাঁহার, যিনি উহাকে সুঠাম করিয়াছেন,
- অতঃপর উহাকে উহার অসৎকর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন।
- সে-ই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।
- এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াশ্‌শাম্‌সি ওয়া দ্বুহাহা' (শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের)। মুজাহিদ ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— উদীয়মান সূর্য-কিরণের শপথ কেননা ওই সময়ের সূর্যকিরণ থাকে অনাবিল। কাতাদা বলেছেন, 'দ্বুহা' অর্থ দিনভর। মুজাহিদ বলেছেন, সূর্যের উত্তাপ। কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে 'দ্বাহিয়্যাতু' অর্থ ক্রমবর্দ্ধমান দিবস। 'দ্বুহা' এবং 'দ্বিহা' উভয় শব্দের অর্থ দ্বিপ্রহরের পূর্বক্ষণ।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়'। বলা বাহুল্য চন্দ্র উদ্ভাসিত হয় সূর্যাস্তের পরেই। আর তার এ অবস্থা থাকে চান্দ্রমাসের প্রথম অর্ধাংশে। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— ওই সময়ের চন্দ্রের শপথ! যখন তা হয় ষোলো কলায় পরিপূর্ণ, প্রায় সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও গোলাকার। জুজাযও এরকম বলেছেন। আর চন্দ্রের এরূপ সৌন্দর্য ফোটে চান্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রাতে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে'। একথার অর্থ— শপথ দিবসের, যা উজ্জ্বল করে দেয় সূর্যকে, অথবা অন্ধকারকে, কিংবা পৃথিবীকে। সমুজ্জ্বল করার সঙ্গে এখানে দিবসের সম্পৃক্তি ঘটেছে রূপকার্থে। যেমন বলা হয়— তার দিবস রোজা রেখেছে। এখানে একটি অনুক্ত সর্বনাম 'হা' (তা) সম্বন্ধযুক্ত হবে সূর্যের সঙ্গে। অর্থাৎ দিবস যখন নিজেকে বিস্তার করে দেয়, তখন নেত্রগোচর হয় সূর্য। অথবা সর্বনামটির সম্বন্ধপদ এখানে অনুক্ত' অর্থাৎ অন্ধকার ও পৃথিবী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'শপথ রজনীর, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে'। একথার অর্থ— শপথ রজনীর, যা সূর্যকে, অথবা আকাশকে, কিংবা পৃথিবীকে করে অন্ধকারাচ্ছাদিত। এই তিন অবস্থাতেই এখানকার 'ইজা'

(যখন) অব্যয়টি কালাধিকরণ কারক হিসেবে সম্বন্ধযুক্ত হবে শপথের ক্রিয়ার সঙ্গে। এরকম বলেছেন জমহুর। পক্ষান্তরে 'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা বলেছেন, শপথবদ্ধতাকে ওই সময়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। তাঁর মতে শপথবদ্ধতাকে চন্দ্র-সূর্য বা দিবসের বিশেষণ স্থির করাও ঠিক নয়। কেননা কালাধিকরণ কারক সর্বদা ক্রিয়াবিশেষণই হয়। কারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কালের মধ্যেই। তাই অনুভূতিপ্রবণ কোনোকিছু ক্রিয়ার বিশেষণ হতে পারে না। অতএব এমতোক্ষেত্রে জমহুরের ব্যাখ্যা সমালোচনা সাপেক্ষ। তবে বলা যেতে পারে, এখানে একটি সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ সূর্যকিরণের সময়ের শপথ, যা সূর্যের পশ্চাতে প্রতিগমনের সময় ধার করে নেয়। ওই দিবসের উদীয়মান সময়ের শপথ, যে উদীয়মান দিবস উদিত করে সূর্যকে। আর নিশিথাগমনের সময়ের শপথ, যে আগমনী ছড়িয়ে যায় শূণ্যতায়। এরূপ অর্থ করলে কালাধিকরণ কারক বিশেষণ হবে অনুক্ত সম্বন্ধপদের। অথবা বলা যেতে পারে 'ইজা' এখানে ক্রিয়ার আধার নয়, বরং 'ইজা' অর্থ এখানে— সময়। যেমন বলা হয় 'ইজা ইয়াক্বুমু যায়িদ ইয়াক্বউদু আমর' (জায়েদের দাঁড়ানোর সময় আমর বসবে)। 'এখানে 'ইজা' ব্যবহৃত হয়েছে 'সময়' অর্থে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেন, তাঁর'। লক্ষণীয়, এখানে আকাশের উল্লেখ করা হয়েছে তার সৃষ্টিকর্তার আগে। তাই প্রশ্ন জাগে, এটা কি সৌজন্য বিরোধী নয়? স্রষ্টার পূর্বে সৃষ্টির উল্লেখ কি সমীচীন? এর উত্তরে বলা যায়— হ্যাঁ, এটাই তো নিয়ম। এ হচ্ছে ছোট থেকে বড়র দিকে, নিচু থেকে উচ্চতার দিকে যাত্রার প্রক্রিয়া। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে গমনই তো অধিক সৌজন্যসম্মত ও সমীচীন।

জুজায বলেছেন, এখানে 'মা' (তা) ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আকাশ ও তার সৃষ্টিশৈলীর শপথ।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন, তাঁর'। এখানেও 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে, অথবা ধাত্যর্থে। অর্থাৎ ভূমি ও তার সম্প্রসারণকারীর শপথ। অথবা শপথ ভূপৃষ্ঠের এবং ভূপৃষ্ঠস্থিত সকল কিছুর। এরূপে ব্যাখ্যারীতি প্রযোজ্য হবে পরবর্তী আয়াতেও।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন'। একথার অর্থ— শপথ মানবপ্রবৃত্তির এবং তাঁর, যিনি প্রবৃত্তির স্রষ্টা ও বিন্যাসক। তিনিই তো 'মানব প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বৈপরীত্যের সমতা, সুসাম্য ও যথা-উপযোগিতা।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন'।

'কাশ্শাফ্' রচয়িতার অনুকরণে বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'মা' অব্যয়টিকে ধাতুমূল ধরে নিলে বাক্যগুলোর মধ্যে দেখা দিবে অসঙ্গতি। আগের আয়াতের 'সাও্ওয়া' (সুঠাম করেছেন) শব্দটি ক্রিয়া। এর কর্তা তিনি, অর্থাৎ

আল্লাহ্। আবার আলোচ্য আয়াতের 'আলহামা' (তিনি জ্ঞান দান করেছেন) বাক্যটির যোগসূত্র যদি করা হয় পূর্বোক্ত 'সাও্ওয়া'র সাথে, তবে ক্রিয়ার যোগসূত্র ধাতুমূল 'মা' কে গ্রহণ করতে হবে 'মান' অর্থে। কিন্তু 'বাহরে মাওয়াজ' রচয়িতা লিখেছেন, একথা তো ভুলে গেলে চলবে না যে 'সাও্ওয়া' ক্রিয়ার সাথে 'মা' মিলিত হওয়ায় 'সাও্ওয়া' যেমন ধাত্যর্থ প্রকাশ করছে, তেমনি 'আলহামা'কেও ধাত্যর্থ ধরে নিয়ে যদি ধাতুমূলকে ধাতুমূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে তা মোটেও অসঙ্গত হবে না। বিষয়টি সহজ, জটিল কিছু নয়।

আগের আয়াতের 'নাফসিন' এর 'তানভীন' আধিক্যপ্রকাশক ও সাধারণার্থক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আ'লিমাত নাফ্সুম্ মা ক্বদ্দামাত ওয়া আখ্খারাত'। অথবা বলা যায়, এরকম করা হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে। এমতাবস্থায় 'নাফস' অর্থ হবে বিশেষ এক ব্যক্তি। অর্থাৎ নবী আদম। আতা বলেছেন, এখানে 'নাফসিন' বলে বুঝানো হয়েছে তাবৎ জ্বিন ও মানুষকে। আর এখানকার 'ইলহাম' (আল্হামাহা) 'ফুজুর' (ফুজুরাহা) এবং তাক্বওয়া (তাক্বওয়াহা) শব্দত্রয়ের অর্থ হবে— আল্লাহ্ মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছেন ভালো-মন্দ, আনুগত্য-অবাধ্যতার পরিচয়, যেনো তারা গ্রহণ করে ভালো ও আনুগত্যকে এবং পরিত্যাগ করে মন্দ ও অবাধ্যতাকে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ইবনে জায়েদের ব্যাখ্যা এরকম— আল্লাহ্পাক মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন মিতাচার ও অমিতাচারকে। সে যা আকাংখা করে, তার অন্তরকে আল্লাহ্পাক সেদিকেই ধাবিত করে দেন। অথবা তিনি প্রবৃত্তিকে দান করেন সংযমী হওয়ার সামর্থ্য। হৃদয়ে সৃষ্টি করেন সংযম-স্পৃহা। অথবা অসহায় ভাবে প্রবৃত্তিকে ছেড়ে দেন দুষ্কর্মাবলীর দিকে এবং হৃদয়েও সৃষ্টি করে দেন দুর্বৃত্তি। জুজায এই ব্যাখ্যাটিকে পছন্দ করেছেন।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, একবার মুজাইনা গোত্রের দু'জন লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! মানুষ যা করে, বা করার চেষ্টা করে, তা কি তার নিয়তির বিধানানুসারে? না তা আপনার আনীত শরিয়তের বিধানানুসারে ঘটিতব্য ভবিষ্যতের কর্মযোগ? অবাধ্যতার কারণে তো আমাদের বিরুদ্ধ দলিল-প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স. বললেন, না, মানুষের সকল কর্ম তার নিয়তির অনুসরণেই সম্পাদিত হয়। একথার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ্র কালামে। যেমন 'শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন'।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, মানুষের অন্তঃকরণ সর্বোতোভাবে আল্লাহ্র করতলগত। তিনি মানবহৃদয়কে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরিয়ে দেন। এরপর তিনি স. প্রার্থনা করলেন, হে হৃদয়সমূহের বিবর্তক! আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও। মুসলিম।

এখানে 'তাক্বওয়া'র পূর্বে 'ফুজুর' এর উল্লেখ করে 'ফুজুরাহা ওয়া তাক্বওয়াহা' রচনা করা হয়েছে ছন্দের দাবি পূরণার্থে। তাছাড়া এরকম করার আর একটি কারণ এই যে, নফস বা প্রবৃত্তি স্বভাবতই অপকর্মপ্রবণ। এরপরে সে সংযমী হতে

শেখে যথাঅনুশীলনের মাধ্যমে। আর এখানকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'ওয়াও' শপথজ্ঞাপক। সমস্যা রয়েছে কেবল চতুর্থ 'ওয়াও' নিয়ে। তবে একথা বললেও তা সঠিক পদবাচ্য হবে যে, প্রথম 'ওয়াও' শপথজ্ঞাপক, আর পরেরগুলো তার যোজক। সুতরাং বুঝতে হবে প্রথম শপথের সমাধান হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় শপথের অনুপ্রবেশ সিদ্ধ নয়। আর যোজক অব্যয় শপথের জন্য প্রতিনিধিস্বরূপ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'ক্বদ আফলাহা মান যাক্কাহা' (সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে)। 'যাক্কা' এর মর্মার্থ এখানে তিনি পবিত্র করবেন। প্রকৃত কর্তা এখানে আল্লাহ্পাক স্বয়ং। আর এখানকার 'হা' (একে, নিজেকে) সর্বনামটি সংযোজিত হবে 'মান' (যে) এর সঙ্গে। কিন্তু কথা হচ্ছে, 'হা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'মান' পুংলিঙ্গ। এই বৈসাদৃশ্যটির সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যায়, 'মান' ব্যক্তিগতভাবে পুংলিঙ্গ হলেও 'মান' অর্থ এখানে নফস, যা স্ত্রীলিঙ্গবাচক। অর্থাৎ অর্থগতভাবে 'মান' এখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচকই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বলতে শুনেছি, ওই নফস সফল, যাকে আল্লাহ্ পবিত্র করে দিয়েছেন। জুয়াইবিরের পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। সুপরিণত সূত্রে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলতেন, ইয়া ইলাহী! আমি তোমা সকাশে আশ্রয় যাচনা করি অস্বস্তি, আলস্য, অপৌরুষ, অতিবার্ধক্য ও কবরের শাস্তি থেকে। হে আমার আল্লাহ্! আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে দাও সংযম ও পবিত্রতা দিয়ে। তুমিই প্রবৃত্তি-পবিত্রতাকারী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমিই প্রবৃত্তির সকল কর্মের অধিকর্তা ও অভিভাবক। হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি পরিত্রাণ প্রার্থনা করি ওই জ্ঞান থেকে, যা শুভপ্রসূ নয়, ওই হৃদয় থেকে যা বিনয়াবনত নয়, ওই প্রবৃত্তি থেকে যা পরিতৃপ্ত নয় এবং ওই প্রার্থনা থেকে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতখানির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তাঁর গুণবত্তার জ্যোতিসম্পাত দ্বারা যে নফসকে পবিত্র করেছেন, সেই নফস হয় আল্লাহ্ ও তাঁর বিধানে পরিতুষ্ট এবং তাঁর স্মরণ ও আনুগত্যে প্রশান্ত। সে বিরত থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর পথের সকল প্রতিবন্ধকতা, সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে। এরকম প্রবৃত্তির অধিকারী যারা, তারাই সফল। হাসান বসরী বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করেছে, করেছে পুণ্য ও আনুগত্যমণ্ডিত, সে-ই সফলতার অধিকারী। সম্ভবত হাসান বসরী এখানকার 'যাক্কা' শব্দসংযুক্ত সর্বনামটি 'হা' কে সম্পৃক্ত করেছেন এখানকার 'মান' এর সঙ্গে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতে ওই সকল লোকের অবস্থা বিবৃত হয়েছে, যারা হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্র শুভদৃষ্টির লক্ষ্য। নিজস্ব অভিপ্রায় বলতে তাদের কিছুই নেই। তারা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে ওই সকল লোকের কথা, যারা সর্বোতোরূপে আল্লাহ্র অভিপ্রায়প্রত্যাশী। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, তাকে মহিমময় করে দেন। আর যারা তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তাদেরকে পথ দেখান।

আর আলোচ্য আয়াত হচ্ছে শপথের জবাব। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি উপস্থাপনার্থেই এতোক্ষণ ধরে এতোগুলি শপথ উচ্চারণ করা হয়েছে। তবে শপথের জবাব হিসেবে এখানকার 'কাদ' শব্দটির সাথে একটি 'লাম' সংযুক্ত হওয়া উচিত ছিলো। এ সম্পর্কে জুজায বলেছেন, পূর্বোক্ত বাক্যগুলোর প্রলম্বিত উপস্থাপনাই স্থলাভিষিক্ত হয়েছে 'লাম' এর। আল্লাহ্ পাক যখন চাইলেন, মানুষ তাদের প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত করার জন্য আজীবন চেষ্টা-সাধনা করুক, তখন তিনি এমন শপথ করলেন, যেনো এতে করে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর চিরস্থায়ী সত্তা ও গুণবত্তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে তার অভিনিবেশকে তিনি এখানে অধিষ্ঠিত করেছেন সর্বোচ্চ স্তরে। ফলে মানব জাতির জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ হয়েছে অপরিহার্য। এই স্তরটির পূর্ণত্ব আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অবতরণ করে প্রেমাকর্ষণ এবং বান্দার পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত হয় সাবলীল সংযম। আর এভাবেই সাধিত হয় আত্মশুদ্ধি বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, পরের আয়াতের 'এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে' কথাটি ভিন্ন প্রসঙ্গের । এভাবে এখানে পার্থক্য করা হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে। আর শপথের জবাব এখানে রয়েছে অনুক্তই, যার দিকনির্দেশনা করছে তারও পরের আয়াতে উল্লেখিত ছামুদ সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার প্রসঙ্গের প্রতি। তারা তাদের নবী সালেহকে অমান্য করেছিলো। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তদ্রূপ মক্কার অবাধ্যদেরকেও তিনি নিশ্চয় যথাসময়ে শাস্তি দিবেন।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে'। একথার অর্থ—আল্লাহ্পাক যাকে পথ দেখাবেন না, সে অবশ্যই হবে অসফল। তারা অপরিশুদ্ধ, তাই ধ্বংসের উপযুক্ত । অথবা মর্মার্থ হবে— যারা হয়েছে ভ্রষ্টপথানুগামী, তারা ডেকে এনেছে নিজেদেরই ধ্বংস।

এখানকার 'দাস্সা' এর মূল রূপ ছিলো 'দাস্সাসা' । শেষের 'সীন' অক্ষরটি রূপান্তরিত হয়েছে 'আলিফ' দ্বারা। শব্দটির ধাতুমূল 'তাদাস্সাসুন'। এর অর্থ গোপন করা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আম ইয়াদুস্সুহু ফীত্ তুরাব' (তাকে গোপন করে দাও মৃত্তিকায়)। এখানে এর অর্থ ব্যর্থ হওয়া, অথবা ধ্বংস করা। যা ধ্বংস করা হয়, তা তো চিরতরেই হয়ে যায় গুপ্ত অথবা লুপ্ত।

সূরা শাম্স ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ﴿١١﴾ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

r ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল।

r উহাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল,

r তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উহাদিগকে বলিল, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও।

r কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দিলেন।

r এবং ইহার পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না।

'কাজ্জাবাত ছামূদু বি ত্বগওয়াহা' অর্থ ছামুদ জাতি অবাধ্যতাবশতঃ অস্বীকার করেছিলো। উল্লেখ্য, পূর্বের আয়াতে ব্যর্থ হওয়া বা ধ্বংস হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার দৃষ্টান্তরূপে এখান থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছামুদ জাতির। ক্রমে ক্রমে বক্তব্যকে করা হয়েছে অধিকতর বেগবান। আর 'কাজ্জাবাত' (অস্বীকার করেছিলো) ক্রিয়াপদটির কর্মপদ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তারা অস্বীকার করেছিলো নবী সালেহের রেসালাতকে।

'বি ত্বগওয়াহা' অর্থ অবাধ্যতাবশত। কথাটির 'বা' অব্যয়টি হেতুবাচক। অর্থাৎ তাদের ধ্বংস হওয়ার হেতু বা কারণ ছিলো এই যে, তারা পৌঁছে গিয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের চরম সীমায়। নবী সালেহ কর্তৃক প্রচারিত এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা এবং তাঁর নবুয়তের সত্যতার কথা তারা স্বীকারই করতে চায়নি। তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল। তারা বলেছিলো, তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। তারা এরকমও দাবি করেছিলো যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসো। পাথরের ভিতর থেকে বের করো একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। তিনি তাদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটি প্রকাণ্ড পাথরের বুক চিরে বের করে এনেছিলেন একটি দশ মাসের শাবকসম্ভবা উষ্ট্রী। বের হওয়ার পরক্ষণে উষ্ট্রীটি প্রসব করেছিলো তার শাবক। উষ্ট্রীটি পানি পান করতো অত্যধিক। তাই তিনি নিয়ম করে দিলেন তাদের জনপদের কূপের পানি পালাক্রমে একদিন পান করবে উষ্ট্রীটি, আর একদিন পান করবে তারা ও তাদের পশুরা। প্রথম প্রথম তারা নিয়ম মান্য করে চললো। কিন্তু পরের দিকে হয়ে পড়লো অসহিষ্ণু। ঠিক করলো উটটিকে তারা বধ করবে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠলো'। একথার অর্থ— উষ্ট্রীবধের ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী ছিলো এক হতভাগ্য। সে নিজ হাতে উষ্ট্রীবধ করবে বলে পণ করলো এবং গ্রহণ করলো কার্যকর উদ্যোগ। এখানে 'ইজিম বাআ'ছা' অর্থ তৎপর হয়ে উঠলো। অর্থাৎ তাদের মধ্যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর ও হতভাগ্য যে লোকটি, সে যখন আর স্থির থাকতে পারলো না। অস্ত্র হাতে এগিয়ে যেতে লাগলো উষ্ট্রী ও তার শাবকটির দিকে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে সে সকলের অগ্রণী হলেও তার সম্প্রদায়ের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীই এ ব্যাপারে ছিলো তার পরামর্শক ও সমর্থক।

হতভাগ্য লোকটির নাম ছিলো কাজার ইবনে সালিক। সে ছিলো বেঁটে, গৌরবর্ণ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জামআ থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সালেহ নবীর উষ্ট্রীসংহার পর্ব প্রসঙ্গে বললেন। একথাও বললেন যে, উষ্ট্রীটি বধ করতে উদ্যত হয়েছিলো তাদের সম্প্রদায়ের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যেমন আবু জামআ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সালেহ নবীর উষ্ট্রী বধকারী লোকটিই মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা। আর হতভাগা আদম নবীর ওই সন্তান, যে হত্যা করেছিলো তার আপন ভাইকে। হত্যাকাণ্ডের প্রথম প্রচলন ঘটায় সে। সেকারণে পরবর্তী সময়ের সকল হত্যাকাণ্ডের পাপের একটা অংশ বহন করতে হবে তাকে। তিবরানী, হাকেম এবং বিশুদ্ধ সূত্রে 'হুলিয়া' পুস্তকে আবু নাঈম।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তখন আল্লাহ্র রসুল তাদেরকে বললো, আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করবার বিষয়ে সাবধান হও'। এখানে ওই অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী' বলে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব ও সম্মানকে। আর এখানকার 'তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও' অর্থ সাবধান! আল্লাহ্কে ভয় করো। উটনীটির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ো না। তাকে বাধা দিয়ো না কূপের পাড়ে যেতে। তার দেহের কোথাও আঘাত করতেও চেষ্টা কোরো না। অন্যথায় তোমাদের উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্র গজব।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা রসুলকে অস্বীকার করলো এবং তাকে কেটে ফেললো। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন'।

উষ্ট্রীটি বধ করে ওই হতভাগ্য লোকটিই। তৎসত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে 'কিন্তু তারা রসুলকে অস্বীকার করলো এবং তাকে কেটে ফেললো'। এরকম বলার কারণ হচ্ছে ওই লোকটি উটনীটি হত্যা করেছিলো সর্বসম্মতিক্রমে। তাই 'সে কেটে ফেললো' না বলে এখানে বলা হয়েছে 'কেটে ফেললো তারা'। নবী সালেহের সাবধানবাণীকে তারা তোয়াক্কাই করলো না। মুকাতিল বলেছেন, হত্যাকারী ছিলো নয় জন। উপরন্তু 'সর্বাধিক হতভাগ্য' যদিও পার্থক্যসূচক বিশেষণের একবচন, তবু তা যদি সদৃশপদ হয়, তবে কথাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে একবচন বহুবচন উভয় অর্থে।

উষ্ট্রীবধের পর নবী সালেহ মর্মাহত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ঠিক আছে। মাত্র তিন দিন তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো। প্রথম দিন তোমাদের চেহারা হয়ে যাবে হলুদ। পরদিন লাল এবং শেষের দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিবেন। তাই হয়েছিলো। সেই ঘটনাটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন। 'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা লিখেছেন 'দাম্দামাতুন' শব্দটির অর্থই হচ্ছে— সমূলে উৎপাটন করা, অথবা

ধ্বংস করে দেওয়া। আতা ও মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাদেরকে একেবারে বিনাশ করে দিয়েছিলেন। কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে 'দাম্দামাতুন' অর্থ ক্রোধান্বিত হওয়া। যেমন 'দাম্দামা আ'লাইহি' (তার সাথে সে ক্রোধের সাথে কথা বলেছে)। আর 'দাম্দামা আ'লাইহিম' অর্থ তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে ধ্বংস, ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে।

'বি জাম্বিহিম' অর্থ তাদের পাপের জন্য। অর্থাৎ নবীর অবমাননা ও উষ্ট্রীবধের জন্য। আর 'ফাসাওয়াহা' অর্থ একাকার করে দিলেন। অর্থাৎ তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নিপাত করলেন একভাবে, এক সাথে।

শেষোক্ত আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এবং এর পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না'। একথার অর্থ— শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি নির্দ্বিধ, নিঃশঙ্ক। ছামুদ জাতিগোষ্ঠীকেও তাই তিনি নিপাত করেছিলেন অসংকোচে। রেহাই দেননি কাউকেই। এরকম ব্যাখ্যাকে যথাযথ মনে করা যেতে পারবে তখন, যখন এখানকার 'ইয়াখাফূ' (তিনি ভয় করেন না) কথাটির 'তিনি' সর্বনাম দ্বারা ধরে নেওয়া হবে আল্লাহ্কে। আবু জুহাক এবং কালাবী বলেছেন, এখানকার 'ইয়াখাফূ' কথাটির সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে ১২ সংখ্যক আয়াতের 'সর্বাধিক হতভাগ্য' বাক্যের সাথে। আর বাক্যটিতে রয়েছে কিঞ্চিত অগ্র-পশ্চাৎ। যেনো মূল বাক্যটি ছিলো এরকম 'ই'জিম বাআ'ছা আশক্বাহা ওয়া লা ইয়াখাফূ উক্ববাহা'। অর্থাৎ তাদের মধ্যকার সর্বাধিক হতভাগ্য লোকটি উষ্ট্রীটির প্রাণসংহার করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো এবং এ ব্যাপারে সে ছিলো নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। এই বাক্যটি 'দাম্দামা' অথবা 'ইজিম বাআ'ছা' পদের কর্তা থেকে অবস্থাপ্রকাশক। আর অবস্থাজ্ঞাপক এখানকার 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টিও।

সূরা লাইল

১ রুকু এবং ২১ আয়াত সম্বলিত এই সূরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

সূরা লাইল ঃ আয়াত ১ — ১১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

وَ الَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى ۙ﴿۱﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿۲﴾ وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الۡاُنۡثٰٓى ۙ﴿۳﴾ اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰى ؕ﴿۴﴾ فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَ اتَّقٰى ۙ﴿۵﴾ وَ صَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰى ۙ﴿۶﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰى ؕ﴿۷﴾ وَ اَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَ اسۡتَغۡنٰى ۙ﴿۸﴾

وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾ وَ مَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾

- q শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
- q শপথ দিবসের, যখন উহা উদ্ভাসিত হয়
- q এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন—
- q অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।
- q সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে
- q এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে,
- q আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।
- q এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,
- q আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে,
- q তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পথ।
- q এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্ লাইলি ইজা ইয়াগ্শা'। এর অর্থ শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে। অর্থাৎ যখন সে আবৃত করে সূর্যকে, অথবা দিবসকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'রাত্রি আবৃত করেছে দিবসকে'। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রাত্রি তার অন্ধকার দ্বারা ঢেকে ফেলে সবকিছুকেই। এখানকার 'যখন সে আচ্ছন্ন করে' কথাটির যোগসূত্র রয়েছে একটি অনুক্ত শপথসূচক ক্রিয়ার সঙ্গে, অথবা একটি উহ্য সম্বন্ধপদের সাথে। 'ইজা' এখানে কালের আধার। তবে 'আল্ লাইল' (রজনীর) বিশেষণটি এখানে কালাধিকরণ কারক নয়। বরং 'ইজা' অর্থ এখানে— সময়, কাল।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'শপথ দিবসের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়'। একথার অর্থ— শপথ ওই দিবসের, যা উদ্ভাসিত হয় রাত্রির আঁধার ভেদ করে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ওয়ামা খলাক্বাজ্ জাকারা ওয়াল উন্ছা' (এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন)। 'মা' অব্যয়টি এখানে 'মান' অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ শপথ ওই সত্তার, যিনি বংশবিস্তারক্ষম প্রাণীকে বিভক্ত করেছেন দু'রকম সত্তায়— নর ও নারী। অথবা 'নর ও নারী' অর্থ এখানে— পিতা আদম ও মা হাওয়া । আবার 'মা' এখানে ধাতুমূলও হতে পারে। অর্থাৎ শপথ নর ও নারীর এবং যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির'। বাক্যটি শপথের জবাব। এর অর্থ হে মানুষ! কর্মপ্রচেষ্টা অনুসারে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে দু'টি স্থান— জান্নাত ও জাহান্নাম। তাই তো দেখা যায়, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জাহান্নামের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে ব্যস্ত। আর কেউ কেউ তৎপর জান্নাতের উন্নততর স্তর সন্ধানে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু মালেক আশরারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ সকালে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর বিক্রয় করতে থাকে নিজেকে। এভাবে কেউ নিজেকে মুক্ত করে জাহান্নাম থেকে, আবার কেউ নিজেকে নিক্ষেপ করে জাহান্নামে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে (৫) এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে (৬) আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ' (৭)।

এখানে 'দান করলে' অর্থ আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করলে। আর 'মুক্তাকী হলে' অর্থ যে সকল অপকর্মের জন্য শাস্তি অবধারিত, সে সকল অপকর্ম থেকে বিরত থাকলে। আদী ইবনে হাতেম সূত্রে বোখারী-মুসলিম, জননী আয়েশা থেকে আহমদ, হজরত আনাস থেকে বাযযার, 'আওসাত' পুস্তকে তিবরানী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে 'তাফসীরে কবীর' রচয়িতা, হজরত নোমান ইবনে বশীর এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে হজরত আবু উমামা ও হজরত বারা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও নরকাগ্নি থেকে পরিত্রাণের প্রয়াস পেয়ো।

'আল হুসনা' অর্থ যা সুন্দর। আবদুর রহমান আসলামা ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'আল হুসনা' অর্থ কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। আতিয়া বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম। মুজাহিদ বলেছেন 'আল হুসনা' অর্থ জান্নাত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লিল্লাজীনা আহ্সানুল হুসনা' (তাদের জন্য, যারা পুণ্যকর্ম করেছে জান্নাতের জন্য)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—যারা আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী, তিনি তাদেরকে দান করবেন জান্নাত। ইকরামা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম। কাতাদা, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— যে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে, সে অবশ্যই তাঁকে পাবে প্রতিশ্রুতি পূরণকারী হিসেবে।

'আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ' অর্থ আমি এরকম বিশ্বাসীকে দান করবো পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। ফলে সে পুণ্যকর্ম সমাধা করে উপযোগী হয়ে যাবে জান্নাতের। হবে আল্লাহ্র পরিতোষভাজন। এখানকার 'ইয়ুস্‌রা' (সুগম করে দিবো) কথাটি গঠিত হয়েছে 'ইয়াস্‌সায়াল ফারাস' যার অর্থ— অশ্বকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে লাগাম এবং তার উপরে স্থাপন করা হয়েছে গদি।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে (৮) আর যা উত্তম, তা অস্বীকার করলে (৯) তার জন্য আমি সুগম করে দিবো কঠোর পথ (১০)।

এখানে 'কার্পণ্য করলে' অর্থ আল্লাহ্র আদেশ মান্য করার ব্যাপারে গড়িমসি করলে। হজরত আনাস থেকে আলিয়া, হাকেম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি কৃপণ, যার

সামনে আমার নামোচ্চারণ করা হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। 'নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদর্শন করলে বেপরোয়া মনোভাব, তোয়াক্কা না করলে আল্লাহ্‌পাকের পাপ-পুণ্যের সিদ্ধান্তের।'যা উত্তম তা অস্বীকার করলে' অর্থ অমান্য করলে আল্লাহ্‌র এককত্বপ্রকাশক ও নবুয়তের সত্যতাজ্ঞাপক বাণীর। আর 'তার জন্য আমি সুগম করে দিবো কঠোর পথ' অর্থ তার উপরে আমি চাপিয়ে দিবো এমন স্বভাব, যা তাকে নিয়ে যাবে নরকে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার স্থান নির্ধারণ করা হয়নি স্বর্গ অথবা নরকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাহলে কি আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবো? তিনি স. বললেন, না। আমল করতে থাকো। প্রত্যেকে সেই আমল করতে সমর্থ হবে, যার জন্য সে সৃজিত। সৌভাগ্যবানেরা আমল করতে সক্ষম হবে সৌভাগ্যবানদের মতোই। আর দুর্ভাগারা আমল করতে সমর্থ হবে হতভাগ্যদের মতো। প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ আমল করা হবে সহজ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য সুরার ৫ থেকে ১০ সংখ্যক আয়াত। বোখারী, মুসলিম।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক একজন ক্রীতদাস ও দশ আওকিয়া রূপার বিনিময়ে উমাইয়া ইবনে খলফের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন হজরত বেলালকে, তারপর তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ওই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয় 'অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির'। অর্থাৎ উমাইয়া ইবনে খলফ এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের আমল ছিলো পৃথক প্রকৃতির। একজনের আমল ছিলো জাহান্নামের জন্য, অপর জনের জান্নাতের। এরকম বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও। ইকরামা সূত্রে হাকেম ইবনে আবানের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক লোকের একটি খেজুর গাছ ছিলো, যার কাছ ঘেঁসে বসবাস করতো এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি। একদিন গাছের মালিক তার ওই গাছের খেজুর পাড়তে শুরু করলো। তখন কয়েকটি খেজুর গিয়ে পড়লো দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ির ভিতরে। তার ছোট ছোট ছেলে- মেয়েরা সেগুলো টপাটপ মুখে পুরতে লাগলো। লোকটি তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গেলো। খেজুরগুলোও সে বের করে নিলো মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে। দরিদ্র ব্যক্তি ঘটনাটি জানালো রসুল স.কে। তিনি খেজুর গাছের মালিককে ডেকে বললেন, ওই খেজুরের গাছটি আমাকে দিয়ে দাও। তোমাকে অনুরূপ খর্জুরবৃক্ষ দেওয়া হবে জান্নাতে। লোকটি বললো, খেজুর গাছ তো আমার আরো অনেক আছে। কিন্তু ওই গাছটি আমার অত্যধিক প্রিয়। একথা বলেই সে প্রস্থান করলো। আর একজন আগন্তুক এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। সে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! ওই খেজুর গাছটি যদি আমি তার কাছ থেকে খরিদ করে নিয়ে আপনাকে দিতে পারি, তবে আমিও কি অনুরূপ বিনিময় পাবো? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। আগন্তুক লোকটি তখন গেলো খেজুরের গাছের মালিকের কাছে। বললো, গাছটি আমার কাছে বিক্রয়

করে দাও। সে বললো, গাছটি আমার খুবই প্রিয়। ঠিক আছে তুমি যদি গাছটি কিনে নিতে চাও, তবে ওই গাছের বদলে আমাকে চল্লিশটি গাছ দাও। আগন্তুক বললো, আমি রাজি। এভাবে সে গাছটি খরিদ করার পর উপস্থিত হলো রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বললো, গাছটি এখন আমার। আমি ওটিকে আপনার অধিকারে অর্পণ করলাম। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে বললেন, গাছটি এখন থেকে তোমার। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলো শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে....'। ইবনে কাছীর বলেছেন, বর্ণনাটি বিরল পর্যায়ের। বাগবী লিখেছেন, আতার মাধ্যমেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর বিবরণটি এরকম— খেজুর গাছের মালিক রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলো, আমার ওই খেজুর গাছটির সংলগ্ন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা গাছটির খেজুর খেয়ে ফেলে। এখন আমি কী করবো? তিনি স. বললেন, গাছটি আমাকে দিয়ে দাও। এর বদলে তোমাকে অন্য গাছ দেওয়া হবে, যে কয়টি চাও। লোকটি অসম্মত হলো। পথিমধ্যে তার সাক্ষাত ঘটলো আবুল দাহদাহের সঙ্গে। তখন অবতীর্ণ হলো 'এবং কেউ কার্পণ্য করলে ....'।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত হিসেবে হজরত আবু বকর ও উমাইয়া ইবনে খলফের ঘটনাটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কেননা এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। পরের ঘটনাটিকে যদি আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত ধরে নেওয়া হয়, তবে বলতে হয়, আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায় এবং একথাও তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে আবুল দাহদাহের সাধুতা সম্পর্কে। এমতাবস্থায় এখানকার 'যা উত্তম, তা সত্য বলে গ্রহণ করে' কথাটির অর্থ হবে— যে আল্লাহ্র রসুলের অঙ্গীকারকে সত্য বলে জানে ও মানে। অর্থাৎ আবুল দাহদাহের মতো যে আল্লাহ্র পরিতোষাকাংখায় তাঁর রসুলের কাছে তার সম্পদ সম্প্রদান করে, জান্নাত গমনের সহজ পথ সুগম করে দেই আমি তার জন্যই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতসমূহ বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও এর নির্দেশনাটি সার্বজনীন। তবে একথাটিকেও মেনে নিতে হবে যে, 'কার্পণ্য করলে' 'নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে' 'যা উত্তম তা অস্বীকার করলে' এ সকল কথা এখানে খেজুর গাছের মালিককে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। কেননা তিনি ছিলেন একজন আনসারী সাহাবী। সুতরাং কৃপণতা, বেপরোয়া ভাব, উত্তমতার প্রতি অস্বীকৃতি এ সকল অপস্বভাব তাঁর মধ্যে ছিলোই না। তাই তিনি কঠোর পথের অনুসারী কিছুতেই নন। কঠোর পথ বা জাহান্নামের পথ তো নির্ধারণ করা হয় তাদের জন্য, যারা ফরজ জাকাত দিতে অস্বীকার করে। এখানে তো সেরকম কিছু ঘটেনি।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'ওয়া মা ইউগ্নী আ'নহু মালুহূ' (এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না)। 'মা' অব্যয়টি এখানে না-সূচক, অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, প্রশ্নবোধক। এরপর বলা হয়েছে 'ইজা তারাদ্দা' (যখন সে ধ্বংস হবে)। 'তারাদ্দা' এর ধাতুমূল 'রাদ্দুন' অর্থ ধ্বংস, অথবা

শাস্তির উপযুক্ত। অথবা 'রাদ্দুন' অর্থ নিক্ষিপ্ত হওয়া। অর্থাৎ যখন সে নিক্ষিপ্ত হবে কবরে, অথবা জাহান্নামে। কাতাদা এবং আবু সালেহ বলেছেন, নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথাই বলা হয়েছে এখানে।

সূরা লাইল ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

q আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা,
q আমিতো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।
q আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।
q উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,
q যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।
q আর উহা হইতে দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে,
q যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য,
q এবং তাহার প্রতি কাহারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,
q কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়;
q সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্না আ'লাইনা লাল্হুদা' (আমার তো কাজ কেবল পথনির্দেশ করা)। এখানকার 'আলা' অব্যয়টি বেগ সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ পথ নির্দেশনা দানের দায়িত্বটি আমি অবধারিত করে নিয়েছি আমার পূর্বসিদ্ধান্তের কারণে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে।

'লাল্হুদা' অর্থ সত্যপথ প্রদর্শন। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন এবং প্রত্যাদেশ প্রেরণই হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের প্রতি হেদায়েত বা পথ প্রদর্শন। এরকম বলেছেন জুজায ও কাতাদা। ফাররা বলেছেন, যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তার গন্তব্য হয় আল্লাহ্। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সরল পথের গন্তব্যস্থল '।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের'। একথার অর্থ— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিকর্তা আমিই। সুতরাং যে প্রকৃত অধিকর্তাকে ছেড়ে অন্যের কাছে যাচনা করে, সে

বিভ্রান্ত । অথবা অর্থ— যেহেতু আমিই একমাত্র স্রষ্টা ও অধিকর্তা, তাই যারা পথপ্রাপ্ত, তাদেরকে পুরস্কৃতও করবো আমিই। আর যারা হেদায়েতের পথে চলে না, তাদেরকে পুরস্কৃত করা আমার কাজ নয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি (১৪)। তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য (১৫) যে স্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়' (১৬)।

'ফা' অব্যয়টি এখানে হেতুবাচক। অর্থাৎ যেহেতু আমি পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধীশ্বর, সেহেতু ভীতিপ্রদর্শনের অধিকার রয়েছে কেবল আমার। আমি তাই তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সাবধান করে দিলাম। আর এখানকার 'আশক্বা' (নিতান্ত হতভাগ্য) যদিও পার্থক্যসূচক বিশেষণ, তবুও তা গুণবত্তাসূচক বিশেষণের অর্থপ্রদায়ক। একারণেই যারা অবিশ্বাসী এবং পাপী বিশ্বাসী, তারাই এই বক্তব্যটির আওতাভূত। আর এখানকার 'যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়' কথাটির অর্থ— যে সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ্‌র রসুলকে। কথাটির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে কিছুসংখ্যক হতভাগার পরিচয়। যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। পাপী বিশ্বাসীরা বক্তব্যটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা বিশ্বাস ও হতভাগ্যতা কখনো একত্র হতে পারে না। নিরেট হতভাগ্য কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই। অথবা বলা যেতে পারে 'অস্বীকার করে' অর্থ এখানে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে, যেমন করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। কার্যত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে অবিশ্বাসীরা আর পাপী বিশ্বাসীরা করে নিষিদ্ধ কর্ম। বিশ্বাস বা সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী তারা নয়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'অস্বীকার করে' অর্থ অস্বীকার করে মুখ ও মন উভয়ের দ্বারা। এটাই প্রকৃত কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যান। কিংবা 'অস্বীকার করে' অর্থ এখানে অস্বীকার করে নফসে আম্মারা, মনে ও মুখে ইমান থাকলেও। অর্থাৎ সব ধরনের অস্বীকৃতিই এর অন্তর্ভুক্ত।

এমনও বলা যেতে পারে যে 'আশক্বা' এখানে পার্থক্যসূচক বিশেষণ অর্থেই ব্যবহৃত এবং এর মর্মার্থ— অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ এখানে সাধারণভাবে প্রবেশ করা নয়, যেমন জাহান্নামে প্রবেশ করবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপী বিশ্বাসী উভয়েই। এখানে জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ বিশেষভাবে চিরদিনের জন্য নরকবাসী হওয়া। একারণেই শায়েখ বায়যাবী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে লিখেছেন, জাহান্নামে যারা চিরদিন অবস্থান করবে, তারা হবে হতভাগ্য। তারাই কাফের। পাপী বিশ্বাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাদের জাহান্নামবাস হবে সাময়িক। কেউ কেউ বলেছেন, বিষয়টি জটিল করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। 'তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য' কথাটিতে ব্যবহৃত 'তাতে' সর্বনামটিকে 'লেলিহান অগ্নি'র সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিলেই তো বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে কেবল অবিশ্বাসীরা। পাপী বিশ্বাসীরা

সেখানে প্রবেশ করলেও তারা থাকবে লেলিহান নরকাগ্নি থেকে মুক্ত। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের তুলনায় তাদের শাস্তি হবে অনেক কম। জাহান্নামের উপরের স্তরে, ঠাঁই পাবে পাপী বিশ্বাসীরা এবং সেখানকার সর্বনিম্নস্তরে থাকবে অবিশ্বাসীরা।

আমি বলি, এখানে 'হতভাগ্য' বলে বুঝানো হয়েছে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকেই। আর 'নার' (অগ্নি) অর্থ এখানে সমতেজস্বী অগ্নি। জাহান্নামের আগুনও হবে সমান দহন ক্ষমতাসম্পন্ন। নিম্ন স্তরের হোক অথবা হোক উপরের স্তরের। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেই বলা হয়েছে 'নিতান্ত হতভাগ্য'। আর জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হবে তারাই।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সহচরবৃন্দ কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না। কেননা তাঁরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) যেমন নন, তেমনি নন পাপী (ফাসেক)। হতভাগ্যতার সঙ্গে তাঁদের কোনোই সম্পর্ক নেই। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্পাক জান্নাত নির্ধারণ করেছেন। বলেছেন 'তোমরা উত্তম দল, নির্বাচিত হয়েছো মানব জাতির কল্যাণের জন্য'। আরো বলেছেন 'মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। তাঁর সহচরবর্গ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে তাঁরা একে অপরের প্রতি নম্র'।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ইমানসহ আমার সাহচর্য লাভ করেছে, তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে রযীন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সদৃশ। তাদের যে কোনো একজনের অনুসরণ যারা করবে, তারা হেদায়েত পাবে। কোনো সাহাবীর দ্বারা পাপকর্ম সংঘটিত হওয়ার ঘটনা অতি বিরল। ঘটনাক্রমে এরকম ঘটে থাকলেও তাঁরা মনে প্রাণে তওবা করেছেন। আল্লাহ্পাকও নিশ্চয় তাঁদের তওবা কবুল করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পাপ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো। ইবনে মাজা। আর রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গ তাঁদেরকে করেছে চিরপরিশুদ্ধ। তাঁরা অবশ্যই পুণ্যবান। আর রসুল স. তাঁর পুণ্যবান উম্মত সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে তারা কখনো হতভাগ্য হবে না। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি। সাধারণ পুন্যবানের মর্যাদা যদি এরকম হয়, তবে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের মর্যাদা কীরকম হবে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

রসুল স. এর যুগে মানবগোষ্ঠী ছিলো স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত— নির্ভেজাল কাফের, অথবা পরিপূর্ণ ইমানদার। সেকারণেই কোরআন মজীদে আলোচনা এসেছে এই দুই দল সম্পর্কে। পাপী বিশ্বাসীদের আলোচনা তেমন নেই। কেননা আলোচনার অবতারণা করা হয় সাধারণত উপস্থিত জনতাকে কেন্দ্র করে।

মরজীয়া সম্প্রদায় আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে যে, দোজখে প্রবেশ করবে কেবল কাফেরেরা। মুসলমান কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না, পাপী হলেও। লঘু-গুরু কোনো প্রকার পাপই তার ইমানের জন্য ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ তারা বলে, ইমান থাকলে পাপ করলেও কোনো ক্ষতি নেই। তাদের এমতো অভিমত সঠিক নয়। কেননা বেইমান অবস্থায় যেমন পুণ্য কোনো কাজে আসে না, সুতরাং ইমানদার অবস্থায় পাপ ক্ষতিকর হবে না কেনো? খারেজীরাও এ ব্যাপারে মরজীয়াদের অভিমতানুসারী। আর শিয়ারা তো এই আয়াত থেকেই প্রমাণ করে যে, গুরু পাপের পাপীরা চিরকাল দোজখে বসবাস করবে। অর্থাৎ তাদের মত হচ্ছে, গুরুতর (কবীরা) গোনাহ যারা করে, তারা ইমানদারই নয়। অন্যান্য পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোও এরকম বলে। আমরা এ সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছি ইতোপূর্বেই। সুতরাং এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্পাক ক্ষমা করবেন না কেবল শিরিকের গোনাহ্। অন্যান্য গোনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। তার জন্য তওবা করা হোক, অথবা না হোক।

আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন 'হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের নফসের উপরে জুলুম করেছো, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তিনি যে পরম ক্ষমাপরবশ, অতীব দয়ালু'। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন শাস্তি'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ পুণ্যও করবে, সে তা দেখতে পাবে'। অতএব মুমিনদেরকে কখনো চিরজাহান্নামী বলা যাবে না, তারা পাপাচারী হলেও, তাদের পাপ মার্জনা করা না হলেও।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অণুপরিমাণ পাপ যে করবে, সে তা দেখতে পাবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক যদি তাকে শাস্তি দিতে চান তবে তাকে ভোগ করতে হবে জাহান্নামের শাস্তি। আর ওই শাস্তি হবে তার পাপক্ষয়ের কারণ। এভাবে পাপক্ষয়ের পর তাকে দেওয়া হবে নিষ্কৃতি।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে'। এখানে 'সাইউজ্বান্নাবুহাল আত্ক্বা' কথাটির 'সীন' অক্ষরটি নিশ্চিতার্থক। অর্থাৎ প্রকাশ্য-গোপন, দৈহিক-আত্মিক-প্রবৃত্তিক পাপ করা থেকে যারা মুক্ত, তাদেরকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে। আর 'আতক্বা'র (তাকওয়ার) স্তর অর্জিত হয় তখন, যখন হৃদয় হয় প্রশান্ত এবং প্রবৃত্তি হয় পবিত্র।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য'। একথার অর্থ— জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ওই সকল মুত্তাকীকেই, যারা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রীতদাস মুক্ত করে, দান করে অভাবগ্রস্তকে এবং ইত্যাকার জনহিতকর কার্যে।

এখানকার 'ইয়াতাযাক্কা' (আত্মশুদ্ধি করে) পদটি অনুবর্তী 'ইউতী' (দান করে) পদের, যা কর্তার অবস্থা বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুত্তাকীরা দান করে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন, কিংবা খ্যাতির জন্য নয়। অথবা 'ইতাযাক্কা' অর্থ এখানে জাকাত দেয়, যেহেতু এর বিপরীত অনুভূতি আমাদের কাছে ধর্তব্য নয়। একারণে এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণ করা যায় না যে, যারা সংযমী (মুত্তাকী) তারা আবার জাহান্নামে যাবে। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের অভিমতও এই যে, সংযমীরা কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যদিও তারা বিপরীত অনুভূতির প্রবক্তা। কারণ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সম্ভবত বাক্যটি তারই বিবরণ। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন নবীগণের পরে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকী। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাঁর কথা। অর্থাৎ তিনি দান করেন কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আর আগের আয়াতের 'আল আত্কা' (পরম মুত্তাকী) দ্বারা আমরা নবী-রসুলগণকে পৃথক করেছি কোরআন হাদিস এবং আলেমগণের ঐকমত্যের আলোকে। কথাটির 'আলিফ লাম' অন্তরালমূলক।

আগের আয়াতের 'আত্কা' (পরম মুত্তাকী) কথাটিকে নিবৃত্তিমূলক ধরে নিয়ে 'তুক্বা'র (স্বল্প মুত্তাকীর) জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করার আদেশের বিপরীত অনুভূতি সাপেক্ষ মনে করলে এবং 'আত্কা'র বিপরীত হিসেবে' 'তুক্বা' যদি মেনেও নেওয়া যায় এবং এর বিপরীত অনুভূতি সাপেক্ষে জাহান্নামে প্রবেশ যদি ধরেও নেওয়া যায়, তবুও 'তুক্বা'র মর্মার্থ গ্রহণ করতে হবে— ওই ব্যক্তি নিবৃত্ত ছিলো কেবল শিরিক বা অংশীবাদিতা থেকে। সে শিরিকসহ অন্যান্য পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারেনি। ফলে হতে পারেনি 'পরম মুত্তাকী'। আর এ ধরনের ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের শাস্তি সিদ্ধ।

ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক এমন সাত জন ক্রীতদাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালানো হতো কেবল ইসলাম গ্রহণ করার কারণে। তাঁর এমতো পুণ্যপ্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে 'আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে......'।

আমি বলি, 'আল আত্কা' এর 'আলিফ লাম' সীমিতার্থক। অর্থাৎ কথাটি প্রযোজ্য কেবল হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ক্ষেত্রে। আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে হাকেম লিখেছেন, একবার পিতা আবু কোহাফা পুত্র আবু বকরকে বললেন, তুমি তো দেখছি কেবল দুর্বল লোকগুলোকে কিনে কিনে মুক্ত করে দিচ্ছো। যদি শক্তিশালী লোকগুলোকে এভাবে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে, তবে তারা তোমার হেফাজত করতো, করতো সেবা-যত্নও। পুত্র বললেন, পিতা! আমি তো ওই বস্তুর প্রত্যাশী, যা সংরক্ষিত রয়েছে আল্লাহ্র নিকটে। তাঁর এমতো শুভবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য সুরার ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক আয়াত।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত বেলালের পিতার নাম ছিলো রিবাহ এবং মাতার নাম ছিলো হামামাহ্। তিনি ছিলেন জমুহ গোত্রের ক্রীতদাস। ছিলেন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। মহাপাতক উমাইয়া ইবনে খালফ তাঁকে প্রখর রোদে

উত্তপ্ত বালির উপরে চিৎ করে শুইয়ে দিতো। বুকে চাপা দিতো একটি প্রকাণ্ড পাথর। বলতো, মোহাম্মদের ধর্ম ছেড়ে দাও, যদি মুক্তি পেতে চাও। হজরত বেলাল যতক্ষণ জ্ঞান থাকতো ততক্ষণ বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবনে ওরওয়া বলেছেন, একবার হজরত আবু বকর সিদ্দীক কোথাও যাচ্ছিলেন। বনী জমুহের পল্লী অতিক্রমকালে দেখলেন, হজরত বেলালের উপর চালানো হচ্ছে চরম উৎপীড়ন। তিনি উমাইয়া ইবনে খালফকে বললেন, নিরীহ লোকটিকে তুমি কষ্ট দিচ্ছো। তোমার বিবেক বলে কি কিছু নেই? সে বললো, তুমিই একে নিয়ে নাও ও মুসিবত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। হজরত আবু বকর বললেন, আমার কাছে আছে এক বলশালী কাফ্রী ক্রীতদাস। তার সঙ্গে এর বদলাবদলি করো। উমাইয়া রাজী হলো। হজরত আবু বকর এভাবে হজরত বেলালকে নিজের অধিকারে নিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর পূর্বে তিনি এরকম আরো ছয়জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের একজনের নাম ছিলো হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরে শহীদ হয়েছিলেন বীরে মাউনার যুদ্ধে। মুক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্যে এক জন ছিলেন উম্মে উমাইস। মুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাচ্ছিলো। তাই কুরায়েশ কাফেরেরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলো, দ্যাখো, মুক্তিই তোমার দৃষ্টি কেড়ে নিলো। তাঁর কন্যা হুসনাও ছিলেন মুক্ত ক্রীতদাসীদের একজন। তাঁরা মাতা-পুত্রী দু'জনেই ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাসী। হজরত আবু বকর একদিন ওই মহিলাকে বললেন, এদেরকে মুক্ত করে দাও। মহিলা বললো, তুমি এদেরকে কিনে নিয়ে ছেড়ে দাওনা কেনো? হজরত আবু বকর তাই করেছিলেন। মহাপুণ্যবতী মাতা-পুত্রীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

বনী মুসেল গোত্রের এক ক্রীতদাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপরেও চালানো হতো চরম নিপীড়ন। হজরত আবু বকর তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর যখন হজরত বেলালকে ক্রয় করতে চাইলেন, তখন উমাইয়া বললো, বিনিময়রূপে দিতে হবে তোমার নাসতাশ নামের ক্রীতদাসটিকে। হজরত আবু বকর তখন ছিলেন ধনাঢ্য। তিনি নাসতাশকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু নাসতাশ তাতে রাজী হয়নি। শেষে নাসতাশের বিনিময়ে তিনি ক্রয় করলেন হজরত বেলালকে এবং যথারীতি তাঁকে মুক্তও করে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (১৯)।

বলা হলো— 'এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়'। একথার অর্থ— হজরত আবু বকর হজরত বেলাল ও তাঁর মতো অন্যান্য ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। তাঁদের এমন কোনো অনুগ্রহ তাঁর উপরে ছিলো না যে, তিনি এরকম করেছিলেন

তার প্রতিদান পরিশোধার্থে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীককে লক্ষ্য করেই। পুরো বাক্যটিই আগের আয়াতের 'দান করে' কথাটির অবস্থাপ্রকাশক। অথবা বাক্যটি প্রারম্ভিক, একটি ধারণাপ্রসূত প্রশ্নের জবাব। সেই ধারণাটি হচ্ছে— ক্রীতদাসগণ কি পূর্বে কখনো হজরত আবু বকরের কোনো উপকার করেছিলেন, যার প্রত্যুপকারস্বরূপ তিনি তাঁদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন? এমতো প্রশ্নের জবাবেই এখানে বলা হয়েছে 'এবং তাঁর প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়'।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়'। এখানকার 'ইল্লা' (কেবল) ব্যতিক্রমীটি বিযুক্তক। অর্থাৎ— না, তিনি প্রত্যুপকার সাধনার্থে তাঁদেরকে মুক্ত করে দেননি, মুক্ত করে দিয়েছিলেন কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ লাভের আশায়। অথবা ব্যতিক্রমীটি এখানে যুক্তক এবং যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তা এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তিনি তাঁর মহান প্রভুপালকের সন্তোষ লাভের আশা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, বা প্রত্যুপকার করার জন্য এমনটি করেননি।

শেষোক্ত আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে'। একথার অর্থ— হজরত আবু বকর পরলোকে অবশ্যই লাভ করবেন আল্লাহ্র পরিতোষ, আর পরকাল তো আসন্নই, বরং অত্যাসন্ন। অথবা কথাটির অর্থ হবে—আল্লাহ্পাক পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁর এমতো পুণ্যকর্মের এমন প্রতিদান দিবেন, যা লাভ করে তিনি হবেন অত্যুৎফুল্ল। উল্লেখ্য, রসুল স.কেও শুভ বারতা জানানো হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি তুষ্ট হবে'।

নবী-রসুলগণের পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীকই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী। সুতরাং তিনিই মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম। সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয় ঘোষণা করা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'তোমাদের মধ্যে মর্যাদাশালী ওই ব্যক্তি, যে মুত্তাকী'। উম্মতের আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সময়ে মহামান্য আবু বকরের সমতুল্য অন্য কাউকে মনে করতাম না। তাঁর পরে মান্যবর ওমর, তাঁর পর মাননীয় ওসমান এবং তাঁর পরে শ্রদ্ধেয় আলী। বোখারী।

মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া একবার হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, অনুগ্রহ করে বলুন, রসুল স. এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব ছিলেন কে? তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর। তারপর ওমর। আমি এ সম্পর্কে অনেক হাদিস, সাহাবীবচন উল্লেখ করে বিষয়টি যে ঐকমত্যসম্মত তা প্রমাণ করেছি আমার 'সাইফুল মাসলুল' গ্রন্থে।

সূরা দ্বুহা

মহাপুণ্যময় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এরমধ্যে রয়েছে ১টি রুকু এবং ১১টি আয়াত।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে গভীর রাতে উঠে তিনি স. দু'এক রাত নামাজ পড়তে পারলেন না। তাঁর প্রতিবেশিনী মহিলা বললো, মোহাম্মদ! এবার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন অবতীর্ণ হয় এই সুরা। বাগবী লিখেছেন, হজরত জুনদুব বলেছেন, মহিলাটি ছিলো হতভাগা আবু লাহাবের হতভাগিনী স্ত্রী।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে হাকেম বলেছেন, একবার বেশ কিছু দিন প্রত্যাদেশ অবতরণ বন্ধ রইলো। আবু লাহাবের স্ত্রী তখন বললো, মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গী তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। সে তোমার প্রতি অতুষ্ট। তার এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই সুরা।

হজরত জুনদুব থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, একবার বেশ কিছু দিন যাবত হজরত জিবরাইলের আগমন ঘটলো না। পৌত্তলিকেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদের সঙ্গী মোহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে। তখন অবতীর্ণ হয় 'ওয়াদ্‌দুহা ওয়াল লাইলি ইজা সাজ্বা....'। শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌র মাধ্যমে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, তখন জননী হজরত খাদীজা বললেন, মনে হয় আপনার অধৈর্যভাব দেখে আল্লাহ্ আপনার উপরে অপরিতুষ্ট হয়েছেন। তাঁর এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা দুহা। দু'টো বর্ণনাই অপরিণত শ্রেণীর। তবে বর্ণনাকারীগণ বলিষ্ঠ। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, প্রকাশ্যত ধারণা করা যেতে পারে, উম্মে জামিল এবং জননী খাদিজা হয়তো এরকমই বলেছিলেন। তবে তাঁদের একজনের মন্তব্য ছিলো উৎফুল্ল মনের এবং অন্য জনের ব্যথিত চিত্তের।

ইবনে আবী শায়বা এবং তিবরানী এমন এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন একজন অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হাফস ইবনে মাইসারা কুরায়েশী। তিনি তাঁর মাতা এবং তিনি তাঁর মাতা থেকে, যিনি ছিলেন রসুল স. এর পরিচারিকা, তিনি বলেছেন, একবার রসুল স. এর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলো একটি কুকুর ছানা। আশ্রয় গ্রহণ করলো রসুল স. এর খাটিয়ার নিচে। এরপর সে সেখানে মারা গেলো। ফলে চারদিন যাবত প্রত্যাদেশ আগমন বন্ধ রইলো। তিনি স. আমাকে বললেন, খাওলা! দ্যাখোতো কী ঘটলো। ভ্রাতা জিবরাইল আসছেন না কেনো? আমি ভাবলাম, ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করি। ঝাড়ু দিতে গিয়েই দেখলাম খাটিয়ার নিচে মরে পড়ে রয়েছে কুকুর ছানাটি। আমি সেটিকে বাইরে ফেলে দিয়ে এলাম। এমন সময় রসুল স. ঘরে ঢুকলেন। দেখলাম, তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু কাঁপছে। আমি জানতাম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর সমস্ত শরীর এভাবে কাঁপে। জানলাম, অবতীর্ণ হয়েছে নতুন সুরা 'ওয়াদ্‌দুহা' ১ থেকে ৫ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, কুকুর ছানার কারণে যে ওহী বন্ধ ছিলো, সে কথা ঠিকই। বর্ণনাটিও নিঃসন্দেহে সুপ্রসিদ্ধ। তবে এই ঘটনাটিকে সুরা ওয়াদ্‌দুহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত ভাবা অনুচিত।

বাগবী লিখেছেন, ওহী কতোদিন বন্ধ ছিলো, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, বারো দিন। মুকাতিল বলেছেন, চল্লিশ দিন। তিনি আরো বলেছেন, প্রত্যাদেশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পৌত্তলিকেরা রসুল স.কে

উপহাস করতে শুরু করলো। বলতে লাগলো, তার পালনকর্তা তাকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের এমতো অপমন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই সুরাখানি। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দীর্ঘ বিরতির পর যখন হজরত জিবরাইল ওহী নিয়ে আগমন করলেন, তখন রসুল স. বললেন, প্রিয় ভ্রাতঃ! আপনি আসছেন না দেখে আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। জিবরাইল বললেন, আমি তো স্বচালিত নই, পরিচালিত। নির্দেশ পাইনি বলেই এতোদিন আসতে পারিনি।

সূরা দ্বুহা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالضُّحٰى ۙ۝١ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۗ۝٣ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۗ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۗ۝٥

r শপথ পূর্বাহ্নের,

r শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,

r তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।

r তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

r অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াদ্দ্বুহা'। একথার অর্থ— শপথ পূর্বাহ্নের, অথবা দিবসের। কেউ কেউ বলেছেন, 'দ্বুহা' অর্থ দিবস, যেহেতু এর পরে দিবসের বিপরীতে এসেছে রজনীর কথা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আঁই ইয়া'তিয়া হুম বা'সুনা দ্বুহান' (আমার শাস্তি তাদের উপরে আপতিত হয়েছিলো দিবাভাগেই)। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ সকালের প্রথম ভাগ, যখন সূর্য একটু চড়া হয়ে ওঠে। এ সময়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, শীত-গ্রীস্ম-বর্ষা-বসন্ত সব ঋতুতেই এ সময়টা থাকে প্রায় একই রকম— আরামপ্রদ।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়াল্ লাইলি ইজা সাজ্বা' এর অর্থ— শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম। এখানে 'ইজা' (যখন) হচ্ছে ক্রিয়ার আধার। আর শপথসূচক ক্রিয়াটি এখানে রয়েছে উহ্য। অথবা এখানকার 'লাইল' (রজনী) শব্দটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি সম্বন্ধপদ। অর্থাৎ 'হুসুলু লাইল' (যখন রজনীর আগমন ঘটে)। 'যখন' সম্পৃক্ত এই আগমনের সাথে। অথবা 'ইজা' এখানে 'লাইল' এর বিশেষণ। কিংবা 'ইজা' এখানে ক্রিয়ার আধার না হয়ে হবে 'সময়ে'র অর্থবহ। আর 'সাজ্বা' অর্থ আঁধারসহ রাতের আগমন। এরকম বলেছেন হাসান বসরী। অর্থাৎ

আঁধারসহ আগমনকারী রাতের শপথ! আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আর ওয়ালেবী অর্থ করেছেন— অপসৃয়মান রাতের শপথ! আতা এবং জুহাক অর্থ করেছেন— রাতের শপথ, যখন সে তমসাবৃত করে সকল বস্তুকে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— যখন সে ঠিক হয়ে যায়। কাতাদা ও ইবনে সাকান বলেছেন— রাতের অন্ধকার যখন স্থির হয়ে যায়, যখন অন্ধকার আর বাড়ে না। অথবা মর্মার্থ হতে পারে— নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে মানুষ যখন সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সময়ের শপথ। 'লাইলুন সাজ্বা' অর্থ সেই রাত্রি, যাতে জন্ম নেয় প্রশান্তি। যেমন 'বাহরুন সাজ্ব' অর্থ প্রশান্ত সাগর। আগের সুরায় দিবসের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে রাত্রির। কেননা রাত আসে দিনের আগে। আর এখানে প্রথমে এসেছে পূর্বাহ্নের কথা। রাতের উল্লেখ এসেছে পরে। দিন যে রাতের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে রাতের আগে এসেছে দিনের পূর্বাহ্নের কথা।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আমি তো আপনাকে ভালোবাসি। সুতরাং আপনি একথা কখনো ভাববেন না যে, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করবো, অথবা হবো অপ্রসন্ন। এখানকার 'মা ওয়াদ্দাআ'কা (পরিত্যাগ করেননি) কথাটির 'কা' (তোমাকে) হচ্ছে কর্মপদ। তাই 'মা ক্বলা' (বিরূপও হননি) এর পরে আর 'কা' (তোমাকে) কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়নি। অন্যথায় এখানকার 'মা ক্বলা' কে পড়তে হতো 'মা ক্বলাকা'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য তো পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়'। কথাটি সম্ভবত পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আপনাকে আপনার প্রভুপালক তো পরিত্যাগ করেনইনি, অপ্রসন্নও হননি এতটুকু। তিনি ক্রমশ আপনাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রত্যাদেশ করতে থাকবেন। ক্রমাগত দান করতে থাকবেন অধিকতর মর্যাদা। ফলে আপনার মর্যাদা হতে থাকবে উন্নত থেকে উন্নততর।

এখানে 'পরবর্তী সময়' অর্থ পরকাল। অর্থাৎ আখেরাতে আপনি হবেন অধিকতর মহিমময় ও মহান। পাবেন নবীগণসহ সকল মানুষের একচ্ছত্র নেতৃত্ব। লাভ করবেন মাকামে মাহমুদ, হাউজে কাওছার, প্রশংসার পতাকা। আপনার উম্মত হবে অন্য সকল উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা। উল্লেখ্য, রসুল স. এর আখেরাতের অনন্যসাধারণ মর্যাদা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি সুরা বাকারায় 'তিলকার রসুল' আয়াতের তাফসীর ব্যপদেশে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার আহলে বায়াতের জন্য আল্লাহ্ ইহজগত অপেক্ষা পরজগতকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী।

অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হতে পারে এরকম— আপনার এ জীবনের পরবর্তী সময় হতে থাকবে পূর্ববর্তী জীবনের চেয়ে অধিক কল্যাণময়। অর্থাৎ রূহানী দিক থেকে আপনি পেতে থাকবেন আল্লাহ্‌র অধিকতর নৈকট্য ও পরিচয় (কোরবত ও

মারেফত)। একারণেই সুফীগণ বলেন, যে আধ্যাত্মিক পথিকের দুইদিন একরকম হাল থাকে, সে ক্ষতিগ্রস্ত। বুঝতে হবে, তার উন্নতি হয়ে গেছে রুদ্ধ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ভাবছেন কেনো, অচিরেই আমি আপনাকে দান করবো অনেক অনেক কল্যাণ। দান করবো বিজয়, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, প্রতাপ। অধিকসংখ্যক সহচর। ইসলামের ব্যাপকতর প্রসার। আর আখেরাতে শাফায়াতের অধিকার এবং নৈকট্যভাজনতা-প্রিয়ভাজনতার এমন মহিমা, যা কারো অনুমানসাধ্য নয়। প্রদর্শন করবো আমার আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্য। ফলে উৎফুল্ল না হয়ে আপনি পারবেনই না।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে, তিবরানী তাঁর 'আওসাতে' এবং হাকেম তাঁর নিজস্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভবিষ্যতে কী কী সাফল্যের অধিকারী করা হবে, তা একবার তাঁকে আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে দেখানো হলো। তিনিও হলেন বিস্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

শাফায়াতের অধিকারপ্রাপ্তি হচ্ছে রসুল স. এর একটি সুবৃহৎ মর্যাদা। তিনি স. বলেছেন, আমার একজন উম্মতও যদি দোজখে যায়, তবুও আমি সন্তুষ্ট হবো না। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতেই থাকবো। পরিশেষে আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে বলবেন, মোহাম্মদ! খুশী হয়েছো তো? আমি বলবো, হ্যাঁ। হে আমার পরমতম উপাস্য! আমি পরিতুষ্ট।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন' কথাটির অর্থ— অচিরেই আল্লাহ্ আপনাকে দিবেন শাফায়াতের অধিকার। আপনার সুপারিশে মার্জনা করা হবে অসংখ্য পাপীকে। আর আপনি তখন হবেন পূর্ণরূপে পরিতুষ্ট। এরকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী এবং ইমাম হাসান থেকেও। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমার উম্মতকে মার্জনা করো, আমার উম্মতকে মার্জনা করো। আল্লাহ্ তখন জিবরাইলকে বললেন, যাও, আমার প্রিয়তম রসুলকে সান্ত্বনা দাও। বলো, তার উম্মতের ব্যাপারে আমি তাকে প্রসন্ন করবো। দুঃখ দিবো না।

আইয়ুব ইবনে শোরাইহ বর্ণনা করেছেন, আমি মান্যবর আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী জয়নুল আবেদীনকে বলতে শুনেছি, ওহে ইরাকবাসী! তোমরা বলে থাকো, কোরআন মজীদের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক আয়াত 'হে আমার ওই সকল বান্দা, তোমরা যারা তোমাদের নফসের উপরে অত্যাচার করেছো, তারা আল্লাহ্‌র করুণা থেকে নিরাশ হয়ো না' কিন্তু আমরা আহলে বাইত বলি, সর্বাপেক্ষা অধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত হচ্ছে 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে'।

এখানকার 'লাসাওফা' পদের 'লাম' অব্যয়টিকে অনেকে বলেছেন সূচনামূলক। অর্থাৎ উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত এবং বিধেয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'লাম'। মূলতঃ বাক্যটি ছিলো 'ওয়া লা আনতা সাওফা ইউত্বিকা' (আর অবশ্যই আপনাকে দেওয়া হবে অচিরেই)। 'লাম' টি এখানে তাগিদসূচক নয়। কেননা বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের শব্দরূপের সঙ্গে 'লাম' তাগিদ যুক্ত হয় না। আবার অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এখানকার 'লাম' তাগিদসূচক। এজন্যেই 'লাম' যুক্ত হয়েছে 'সাওফা'র সাথে। বর্তমান-ভবিষ্যতকালের শব্দরূপ 'ইউত্বিকা'র সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আর সূচনামূলক 'লাম'ও 'সাওফা'র সাথে যুক্ত হয় না। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে কতকগুলো অযাচিত অনুগ্রহের কথা। যেমন—

সূরা দুহা ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۞ وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۞ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۞

r তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?

r তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

r তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন,

---

প্রথমে বলা হয়েছে 'আ লাম ইয়াজ্বিদ্‌কা ইয়াতীমান'। এর অর্থ— আল্লাহ্ কি আপনাকে পিতৃহীন, অনাথ হিসেবে পাননি? এখানকার 'ইয়াজ্বিদ' শব্দটির ধাতুমূল 'ওয়াজ্বদ'। এর অর্থ পাওয়া, জানা। প্রশ্নটি করা হয়েছে 'না' কে বিলুপ্ত করার জন্য। আর 'না'র বিলুপ্তিতে অনিবার্য হয় হাঁ। সম্বোধ্য ব্যক্তির নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায় করাই হয় এরকম প্রশ্নের উদ্দেশ্য। এভাবে কথাটির সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! স্মরণ করুন, আপনি পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন পিতৃহীন হয়ে। আপনার পিতা তো আপনার জন্য কোনো সহায়-সম্পদও রেখে যাননি।

এরপর বলা হয়েছে 'ফাআওয়া'। এর অর্থ— আর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? অর্থাৎ তারপর আল্লাহ্ই তো আপনার ভরণপোষণের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আপনার পিতৃব্য আবু তালেবের হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন আপনার প্রতি সুগভীর বাৎসল্য। ফলে একান্ত মমতায় আপনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহে। এটা কি আপনার প্রতি আমার বিশাল অনুগ্রহ নয়?

তিরমিজি সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি একবার আল্লাহ্‌র কাছে এমন একটি নিবেদন করেছিলাম, যা না করাই ছিলো উত্তম। আমি বলেছিলাম, হে আমার প্রভুপালক! তুমি নবী দাউদ ও নবী

সুলায়মানকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলে। দান করেছিলে আরো অনেক কিছু। আল্লাহ্ বললেন আমি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাইনি? আর তোমাকে আশ্রয় দান করিনি? আমি বললাম, নিশ্চয়, হে আমার প্রভুপালনকর্তা, অবশ্যই। এটা তো আমার উপর তোমার বিশাল অনুকম্পা। তিনি আরো বললেন, আমি কি তোমাকে পাইনি পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর আমি পথের নির্দেশ দিলাম। আমি জবাব দিলাম, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা, একথাও তো সঠিক। আর এটাও তো তোমার অযাচিত দয়া। আল্লাহ্ পুনরায় বললেন, আমি তোমাকে পেলাম নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাব মুক্ত করলাম। আমি বললাম, হে আমার পরম প্রভুপালক। তুমি তো তা করেছোই। এভাবে আমাকে করেছো বিশেষভাবে অনুকম্পায়িত। তিনি বললেন, আমি কি তোমার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দেইনি? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। এটাও তো তোমার অতুলনীয় অনুগ্রহ।

কেউ কেউ ধারণা করেন, রসুল স. বিত্তহীন ছিলেন বলেই বিধর্মীরা বলতো, সম্পদ চাও তো বলো। আমরা তোমাকে বিত্তশালী করে দিবো। তবু তোমার উদ্ভট প্রচার থামাও। রসুল স.ও মনে করতে শুরু করলেন, তাঁর ধন সম্পদ থাকলে তারা তাঁকে এরকম কথা বলতে পারতো না এবং তাঁকে হয়তো সত্য নবী বলে বিশ্বাসও করতো। আর তিনিমনে প্রাণে চাইতেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করুক। সেকারণেই তিনি আল্লাহ্র কাছে সম্পদপ্রার্থনা করেছিলেন। তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে উল্লেখ করেছিলেন অতীতের কয়েকটি অনুগ্রহের কথা। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভাবমুক্ত করার। কিন্তু তাঁদের এরকম ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। কেননা—১. আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নবুয়ত। সুতরাং পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকা শোভনীয় নয়। ২. আল্লাহ্পাক বলেছেন, তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন, সুতরাং অভাবমুক্ত বা ধনী হওয়ার পর তাঁর পক্ষে পুনঃসম্পদ কামনা করাও সম্ভব নয়। ৩. তিনি স. যদি আল্লাহ্র কাছে সম্পদপ্রার্থী হতেন, তবে আল্লাহ্পাক নিশ্চয়ই তাঁর প্রার্থনা পূরণ করতেন, কেননা তিনি স. ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয়তমজন। বাস্তবে দেখা যায়, তিনি স. ছিলেন পার্থিব সম্পদের প্রতি ঘোর নিস্পৃহ। কখনো কখনো অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু এর জন্য কখনো বিচলিত বোধ করেননি। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি ছিলেন সতত পরিতুষ্ট। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম তো এরকমই বর্ণনা করেছেন।

সুফী-আউলিয়াগণের ব্যাখ্যা আবার অন্য রকম। তাঁরা বলেন, আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের সম্মুখে উপস্থিত হয় দুটি অবস্থা— ১. সৃষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হয়ে তাঁরা হন পূর্ণরূপে আল্লাহ্ অভিমুখী। তাঁদের পরিভাষায় এর নাম আল্লাহ্র প্রতি পরিভ্রমণ, বা আল্লাহ্তে পরিভ্রমণ (সায়ের ইলাল্লহ্)। এ অবস্থার নাম অধিরোহণ (উরুজ)। ২. আল্লাহ্র আদেশে তাঁরা হন সৃষ্টির প্রতি পূর্ণ মনোযোগী। তাঁদের প্রতি অর্পিত হয় সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব। তাঁরা তখন আল্লাহ্র সঙ্গে হন বাহ্যত বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থার নাম অবরোহণ (নুযুল)। পূর্বাবস্থা থেকে এ অবস্থা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে বিরহ-বেদনা।

তাই তাঁরা এমতাবস্থায় হন বিষণ্ন, ব্যথিত। কিন্তু এ অবস্থা পূর্ণ ও পরিণত না হলে সৃষ্টি তাঁদের দ্বারা উপকৃত হয় না। তাই দেখা যায়, যাঁর উরুজ-নযুল দু'টোই পূর্ণ, তাঁর দ্বারা হেদায়েত পায় অধিকসংখ্যক মানুষ। সুফী-আউলিয়াগণ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন, নূহ নবী উরুজে পূর্ণ ছিলেন তো অবশ্যই, কিন্তু নুযুলে ছিলেন অপূর্ণ। তাই তাঁর সাড়ে নয়শত বছরের চেষ্টার পরেও ইমান এনেছিলেন অল্প কিছুসংখ্যক ব্যক্তি। অথচ শেষ রসুল স. ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত ছিলেন মাত্র তেইশ বছর। এর মধ্যেই ইসলামের প্রসার ঘটেছিলো সমগ্র আরবে, এমন কি আরবের বাইরেও। তাঁর মাধ্যমে সরাসরি হেদায়েত পেয়েছিলেন বিশাল এক জনগোষ্ঠী। আর পরোক্ষভাবে তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। এটা ছিলো তাঁর নুযুল পরিপূর্ণ হওয়ার প্রতিক্রিয়া। আবার উরুজের ক্ষেত্রেও তিনি স. অন্যান্য নবীর তুলনায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি স. তো আল্লাহ্‌র এমন নৈকট্য লাভ করেছিলেন যে, পৌঁছেছিলেন এমন অবস্থায়, যার সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'ক্বাবা কাওসাইনি আও আদনা' (নিকটে, আরো নিকটে, দুই ধনুকের জ্যা এর মতো অ-দূরত্বে)।

শায়েখে আকবর মুহিউদ্দিন আরাবী লিখেছেন, নবী নূহের আমন্ত্রণ পূর্ণফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ ছিলো এটা যে, জনগণের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পৃক্তি ছিলো অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ তাঁর প্রচারযোগ্যতা ছিলো সীমিত। আর শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. আন্তরিকভাবেও সম্পৃক্ত ছিলেন জনগণের সঙ্গে। অর্থাৎ তাঁর প্রচারযোগ্যতা ছিলো পূর্ণ ও পরিণত। নবুয়তে কামালাতের ফয়েজের তিনি স. ছিলেন পরিপূর্ণ অধিকারী। আর একারণেই তিনি স. এর বিরহযন্ত্রণা ছিলো অন্যান্য নবীর তুলনায় অধিকতর তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তিনি স. তাঁর এমতো অবস্থা প্রকাশ করতে যেয়ে বলেছেন, আমার চেয়ে অন্য কেউ অধিক ব্যথিত হননি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে ইবনে আসাকের এবং আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে।

হাদিসখানির মর্মার্থ যদি এরকমই ধরে নেওয়া হয়, তবে এর জন্য অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আর পড়েই না। কেননা রসুল স. এর মনোব্যথাই ছিলো বেশী। নতুবা অন্যান্য অনেক নবী বাহ্যিকভাবে অনেক বেশী দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করেছিলেন। নবী নুহ অত্যাচারিত হয়েছিলেন সাড়ে নয়শত বছর ধরে। নবী ঈসার উপরে অত্যাচারের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো বলেই তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিলো আকাশে। নবী ইয়াহ্‌ইয়া সহ আরো অনেক নবীকে করা হয়েছিলো শহীদ। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে একথা বলতে আর কোনো বাধা থাকে না যে, সুরা দুহা এবং সুরা 'আলাম নাশরাহ্‌' অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স.কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা প্রদানার্থে। আর ওই সময়টি ছিলো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা। সেই সঙ্গে সূচিত হতে শুরু করেছিলো তাঁর অবরোহ প্রক্রিয়া। তিনি স. বুঝতে পারছিলেন, তিনি ক্রমশঃ সৃষ্টিমুখী হচ্ছেন, দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ সন্নিধান থেকে। চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দায়িত্ব— সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের। এমনকি তখন তিনি স. বিচ্ছেদ-যাতনায় এমনই কাতর

হয়ে পড়েছিলেন যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছিলেন, পর্বতশিখর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটাবেন তাঁর বিরহযন্ত্রণার। এমতাবস্থায় একদিন হজরত জিবরাইল তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসুল। তাঁর তখনকার অস্বস্তিকর অবস্থা দেখে জননী খাদিজাও একবার তাঁকে বলেছিলেন, আপনি তো মানুষের হেদায়েত কামনায় অতি উদগ্রীব। একারণেই কি আপনার পরম সখা আপনার উপরে রুষ্ট হলেন? রসুল স. মনেপ্রাণে তখন চাইছিলেন, এরকম অস্বস্তির চির অবসান ঘটুক। চিরতরে নিভে যাক বিচ্ছেদযাতনার অসহনীয় আগুন।

উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই তো আপনাকে অতিবাহিত করতে হচ্ছে এই বিরহতাপিত সময়। কিন্তু মনে রাখবেন এটাই পরিপূর্ণতা, মহামিলনের পূর্ণ মাত্রা। এমতো অবরোহণ তিক্ত হলেও শত সহস্র মধুর ঊর্ধ্বারোহণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বুঝে নিন আপনার পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। পূর্বে তো আপনি ছিলেন কেবল উরুজের সম্পদে সম্পদবান, আর এখন উরুজসহ নুযুলের নেয়ামতপ্রাপ্তিতে ধন্য। আসন্ন আখেরাতে এর জন্য আপনি পাবেন সুবিশাল বিনিময়। তখন আপনার প্রভুপালক আপনাকে দান করবেন অতুলনীয় অনুগ্রহ। অধিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। দান করবেন শাফায়াতের অধিকার। তখন কি আপনি পরিতুষ্ট না হয়ে পারবেন ? পারবেন না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন'। এখানকার 'তিনি তোমাকে পেলেন' কথাটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের 'তিনি কি তোমাকে পাননি' বাক্যাংশের সঙ্গে। বাক্যাংশটিতে শব্দগতভাবে না-সূচক হয়েছে অর্থগতভাবে হ্যাঁ-সূচক এবং বিজ্ঞপ্তিমূলক, অর্থাৎ তিনি তোমাকে পেয়েছে বা জেনেছেন।

'দ্বল্লান' অর্থ এখানে অনবহিত। অর্থাৎ অনবহিত নবুয়তের দায়িত্ব ও শরিয়তের বিধি-বিধান এবং প্রত্যাদেশিত জ্ঞান সম্পর্কে। এভাবে এখানে এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এ সকল কিছু সম্পর্কে আপনি তো ছিলেন উদাসীন, নির্লিপ্ত। জানতেন না— কিতাব কী, ইমান কী। হাসান বসরী জুহাক ও ইবনে কীসান এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। আবুদ্দ্বোহা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আপনি তখন ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক, নিরীহ। অন্যান্য কুরায়েশ যুবকদের মতো চপল-চঞ্চল ছিলেন না বলে ছিলেন অনুল্লেখ্যও। ভাগ্যবতী হালিমা আপনাকে তাঁর দুগ্ধ পান করিয়েছেন। দুগ্ধপানের বয়স অতিক্রান্ত হলে সমর্পণ করেছেন আপনার পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের কাছে।

‘ফাহাদা’ অর্থ পথের নির্দেশ দিলেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, হজরত খাদিজাতুল কোবরার ক্রীতদাস মাইসারার প্রবাসী যাত্রীদলে রসুল স.ও ছিলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবের সহযাত্রী হিসেবে। সেখানে এক অন্ধকার রাতে ইবলিস তাঁর বাহনের লাগাম ধরে তাঁকে বিপথগামী করলো। সঙ্গে সঙ্গে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে এক ফুৎকার দিলেন। সেই ফুৎকারের চোটে ইবলিস ছিটকে গিয়ে পড়লো সুদূর আবিসিনিয়ায়। হজরত জিবরাইল তখন তাঁর বাহনের লাগাম ধরে বাহনটিকে নিয়ে এলেন সঠিক রাস্তায়। সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে ‘অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন’।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত’ কথাটির অর্থ— আপনি কে, তা তো আপনি নিজেও জানতেন না। কোনো কোনো সুফী তত্ত্বজ্ঞ কথাটির অর্থ করেছেন— আপনি তো ছিলেন আপনার প্রেমাস্পদের প্রেমে আসক্তা নিমজ্জিত। অর্থাৎ রূপকভাবে প্রেমাকর্ষণকেই এখানে বলা হয়েছে অনবহিতি বা বিভ্রান্তি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমাকর্ষিত (মজ্‌জুব) ব্যক্তি হয় দিশাহীন। এমতো দিশাহীনতাকেই এখানে বলা হয়েছে বিভ্রান্তি, অনবহিতি। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, প্রেম তাদেরকে করেছে অন্ধ, বধির। এভাবে এখানে কারুণিক (বিভ্রান্ত) বলে মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়েছে কারণ (আকর্ষণ) এর। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্ জীবিকা অবতরণ করেন আকাশ থেকে’। অর্থাৎ তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটান, যা হয় জীবিকার নিমিত্ত। নবী ইউসুফের ভ্রাতাগণ তাঁদের পিতা নবী ইয়াকুব সম্পর্কে বলেছিলেন ‘নিশ্চয় আমাদের পিতা পড়েছেন প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে’ ‘আপনি তো ভুগছেন সেই পুরাতন ভ্রান্তিতে’ মিসরের ললনাকুল আযীযভার্য্যা সম্পর্কে বলেছিলো ‘আযীয-গৃহিনী তো তার অপঅভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তার ভৃত্যকে ফুসলায়। সে তো তার প্রেমোন্মত্ত। আমরা তো তাকে দেখছি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে’।

‘পথের নির্দেশ দিলেন’ অর্থ তিনি আপনাকে বলে দিলেন নিদর্শন ও নির্দেশাবলী। অথবা আপনার দুধমাতার গৃহ থেকে আপনাকে পৌঁছে দিলেন আপনার পিতামহের গৃহে। কিংবা— মিলিয়ে দিলেন আপনাকে প্রবাসী যাত্রীদলের সঙ্গে। বা তিনি শিখিয়ে দিলেন আপনাকে আপনার সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পন্থা। অর্থাৎ আত্মপরিচয় যে পায়, সে-ই পায় তার প্রভুপালকের পরিচয়। কিংবা— আপনার পরম প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তার নিবিড় সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার পথ তো প্রদর্শন করেছেন তিনিই। ফলে আপনি পৌঁছতে পেরেছিলেন ‘ক্বাবা কাওসাইনি আও আদনা’র মতো অতুলনীয় অধিষ্ঠানে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাব মুক্ত করলেন’। একথার অর্থ— আপনি তো ছিলেন, কপর্দকশূন্য। তিনিই তো আপনাকে বানিয়েছেন বিত্তশালী— মহাপুণ্যবতী খাদিজার আর্থিক সহায়তায়, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের আনুকূল্যে, কিংবা যুদ্ধলভ্য

সামগ্রীর দ্বারা। এখানে ‘অভাবমুক্ত করলেন’ অর্থ এমন নয় যে, তিনি আপনাকে এমন বিত্তবান করলেন, যাতে করে আপনার উপরে জাকাত ফরজ হয়, বরং এখানে অভাবমুক্ত করার অর্থ ক্রমশ সম্পদ দান করা, যাতে করে প্রয়োজন পূরণ হয়, দূর হয়ে যায় নিঃস্বতা। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্পাক আপনাকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করে আপনাকে রক্ষা করেছেন অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে। এই ব্যাখ্যাটিকে অত্যধিক পছন্দ করেছেন ফাররা এবং বলেছেন, রসুল স. পার্থিব বৈভবে বৈভবিত ছিলেন না, ছিলেন হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। আর প্রকৃত বিত্তপতি তারাই, যাদের হৃদয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তিই সফল, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। পেয়েছে প্রয়োজন মতো। আর আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন অল্পে তুষ্টির মতো শুভ স্বভাব।

এরপরের আয়াত তিনটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। অথবা রসুল স. এর এতিম হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে পরের আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে পিতৃহীনদের বিধান। বলা হয়েছে—

সূরা দুহা ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

r সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না;

r এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।

r তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ফা আম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাক্বহার’। কথাটির অর্থ— সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি পিতৃহীনদের সম্পদের উপর বলপ্রয়োগপূর্বক আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন না। তাদের অসহায়তার সুযোগে গ্রাস করবেন না তাদের সম্পদ, যেমন করে থাকে মূর্খতার যুগের আরববাসীরা। এরকম অর্থ করেছেন ফাররা এবং জুজায। উল্লেখ্য, রসুল স. এর দ্বারা এরকম করা সম্ভবই নয়। তাই বুঝতে হবে তাঁকে লক্ষ্য করে এরকম উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদেরকে। অর্থাৎ বিধানটি সার্বজনীন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের ওই গৃহ সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে গৃহে বাস করে পিতৃমাতৃহীনেরা এবং তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হয় শিষ্টাচার। আর তাদের মধ্যে ওই গৃহ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, যে গৃহে বাস করে পিতৃমাতৃহীনেরা, অথচ তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হয় রূঢ়তা। রসুল স. তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে বলেছেন, এভাবে, আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে অবস্থান করবো এভাবে। বাগবী, ইবনে মাজা, বোখারী, আবু নাঈম।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা কোরো না'। ব্যাখ্যাতাগণ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আপনার গৃহদ্বারে যদি কোনো প্রার্থী উপস্থিত হয়ে আপনার কাছে আহার্য প্রার্থনা করে, তবে আপনি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না। তাড়িয়ে দিবেন না। হয় তাকে আহার্য দান করবেন, অথবা সামর্থ্য না থাকলে সুন্দরভাবে কথা বলে তাকে বিদায় করবেন। কেননা এক সময় আপনিও ছিলেন অভাবগ্রস্ত। এই বিধানটিও সার্বজনীন। কেননা রসুল স. এর সুমহান স্বভাবে এরকম অপআচরণের কথা কল্পনাই করা যায় না। হাসান বসরী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কোনো বিদ্যান্বেষী যদি আপনার কাছে কিছু জানতে চায়, তবে আপনি তাকে বিমুখ করবেন না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জ্ঞানানুসন্ধিৎসুর কাছে জ্ঞান গোপনকারীর মুখে মহাবিচারের দিবসে লাগিয়ে দেওয়া হবে আগুনের লাগাম। হাসান বসরীর ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কযুক্ত ৭ সংখ্যক আয়াতের 'তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত' কথাটির সঙ্গে। আর এরকম হলে আলোচনার ক্রমাগ্রসরতা হবে সঙ্গতিপূর্ণ।

শেষোক্ত আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও'। এই আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ৮ সংখ্যক আয়াতের 'তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাব মুক্ত করলেন' কথাটির সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! নিঃস্বতা দূর করে আপনাকে অভাবমুক্ত করেছি তো আমিই। সুতরাং আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করুন। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে একথা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করুন। সানাম ইবনে সামীয়াহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কৃতজ্ঞ পানাহারকারী ধৈর্যশীল রোজাদারের মতো পুণ্যপ্রাপ্তির যোগ্য। যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে মাজা ও দারেমী। আর তিরমিজি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরাইরা থেকে।

আশআছ ইবনে কায়েস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী সে-ই, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মানুষের প্রতি। আবার এক বর্ণনায় এসেছে, যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না আল্লাহ্‌র প্রতিও। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। এর অন্যান্য বর্ণনাকারীও বলিষ্ঠ। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত উপকারীর প্রতিদান দেওয়া। না পারলে অন্যদের কাছে তার সুখ্যাতি করা। এরকম করলেও দানের প্রতিদান দেওয়া হয়। আর দানের কথা গোপন করলে হয় অকৃতজ্ঞতা। এভাবে কেউ যদি বস্ত্রদাতার কথা গোপন করে, তবে সে যেনো পরিধান করে মিথ্যার বস্ত্র। বাগবী।

হজরত নোমান ইবনে বশীর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে তাঁর মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না, সে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না অধিকেরও। যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায়

করলো না, সে ব্যক্তি শুকরিয়া আদায় করলো না আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র দান স্মরণ করাই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আর দানের কথা বিস্মৃতি হওয়াই অকৃতজ্ঞতা, কুফরী। 'যুথবদ্ধ থাকাই আল্লাহ্‌র করুণা এবং যুথবিচ্ছিন্ন হওয়াই তাঁর রোষ'। সবগুলো হাদিসই সংকলন করেছেন বাগবী। এ সকল হাদিসের শিক্ষা হচ্ছে— মাশায়েখ ও শিক্ষকগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। সুখ্যাতি করতে হবে তাঁদের উপকারের। তাঁদের জন্য কামনা করতে হবে আল্লাহ্‌র পরিতোষ।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'নি'মাত' (অনুগ্রহ) অর্থ নবুয়ত। এরকম বর্ণিত হয়েছে বশীর থেকেও। আর এই ব্যাখ্যাটি জুজায়েরও মনঃপুত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনাকে যে বার্তাসহ প্রেরণ করা হয়েছে, আপনি তা মানুষের কাছে প্রচার করুন।

লাইছ সূত্রে মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'নি'মাত' অর্থ কোরআন মজীদ। কালাবীও এই অভিমতের প্রবক্তা। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে কোরআন আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করুন। আর এভাবে আয়াতখানির বক্তব্যগত সম্পৃক্তি ঘটে 'তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত' আয়াতের সঙ্গে। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামতের স্মরণ করাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর সে কৃতজ্ঞতার মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাক আপনাকে যে আশ্রয় দান করেছেন, পথের নির্দেশ দিয়েছেন, অভাবমুক্ত করেছেন, সে জন্য আপনি শোকর গোজারী করুন। এই ব্যাখ্যাটিই সমধিক সুস্পষ্ট। কেননা আলোচ্য আয়াতগুচ্ছে যে সকল নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সাধারণ নেয়ামত। এ সকল নেয়ামতকে সুনির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজনই নেই, সে নেয়ামত ইহলৌকিক হোক, অথবা হোক পারলৌকিক। অর্থাৎ সব রকমের নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্যকর্তব্য। এমতাবস্থায় আয়াতখানি সম্পৃক্ত হবে ইতোপূর্বের আয়াতগুলোর সঙ্গে।

একটি সমাধান ঃ সব ধরনের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। আর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে— অনুগ্রহদাতার অভিপ্রায়ানুসারে অনুগ্রহসম্ভার ব্যয় করা বা বিতরণ করা। আর্থিক অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে— অর্থব্যয় করতে হবে প্রসন্নচিত্তে আল্লাহ্‌র পথে। আর শারীরিক সামর্থ্যরূপ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে শারীরিক ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করে এবং যাবতীয় অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে। আর জ্ঞানরূপ অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে হবে যথাপাত্রে জ্ঞান বিতরণ করে, শুভপথ প্রদর্শন করে।

আর একটি সমাধান ঃ অনুগ্রহের প্রচার করে সম্পন্ন করতে হয় অনুগ্রহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় আমি আদম সন্তানগণের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশালী। একথা গর্ব ও অহমিকামুক্ত। এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। শায়েখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী বলেছেন, প্রত্যেক ওলী চলেন তাঁর নিজের

চরণে ভর করে, আর আমার গমন রসুল স. এর পবিত্র চরণনির্ভর, যে চরণযুগল পূর্ণিমার শশী সদৃশ। তিনি আরো বলেছেন, প্রত্যেক ওলীর স্কন্ধে স্থাপিত আমার পা।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ছিলেন বেলায়েতে ছোগরা, বেলায়েতে কোবরা এবং বেলায়েতে উলিয়া— এই তিন ধরনেরই পূর্ণত্বধন্য। তদুপরি তিনি পেয়েছিলেন নবুয়তের উৎকর্ষও। উলুল আজম রসুলগণের পূর্ণত্বের উৎকর্ষও তাঁকে দান করেছিলেন আল্লাহ্‌পাক। আর এ সকলকিছু তিনি অর্জন করেছিলেন রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুগমনের কারণে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার সূত্রে। যেহেতু তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো ওই মৃত্তিকা থেকে, যে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। সে কারণেই তিনি ছিলেন কাইয়্যুম। ছিলেন মহান মোজাদ্দেদ। এভাবে তাঁকে উপনীত করানো হয়েছিলো নৈকট্যের স্বর্ণশিখরে। এসকল কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন নিজ মুখে। আর বলা বাহুল্য, তাঁর সকল বচন অবশ্যই ছিলো গর্ব-অহমিকামুক্ত। অর্থাৎ এ সকল কথা তিনি বলেছিলেন কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো দ্বিধা নেই যে, যে ব্যক্তি তাঁর এ সকল বাণীকে শরিয়তবিরোধী বলে মনে করে, সে এই আয়াতের অস্বীকারকারী। এভাবে অন্যান্যরাও আল্লাহ্‌পাক থেকে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা নিজ মুখে প্রকাশ করতে পারেন। এতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তাকে হতে হবে প্রশান্ত হৃদয় ও পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তির অধিকারী। অন্যথায় এ ধরনের কথা উচ্চারণ করা অবৈধ। কারণ এমতাবস্থায় তার কথা হবে অহমিকাপূর্ণ, শয়তানের কথার মতো, যে বলেছিলো, আমি আদমের চেয়ে উত্তম।

পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম বাগবী লিখেছেন, মক্কাবাসীগণের সুন্নতসম্মত কোরআন পাঠের নিয়ম ছিলো এরকম— তাঁরা সুরা ওয়াদ্দুহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সুরা পাঠ শেষে উচ্চারণ করতেন 'আল্লাহু আকবর'। এভাবে তকবীর উচ্চারণ করার কারণ হচ্ছে— যখন কিছুদিন প্রত্যাদেশ আগমন বন্ধ ছিলো, তখন মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতে শুরু করেছিলো, মোহাম্মদের শয়তান মোহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে। রসুল স. তাদের এরকম কথা শুনে মনঃকষ্ট পেতেন। এরপর যখন সুরা দুহা অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি স. তা পাঠ করে আনন্দাতিশয্যে বলে উঠেছিলেন 'আল্লাহু আকবর'। তাঁর এই শুভ আমলটিকে সাহাবীগণ মান্য করে চলেছিলেন সারা জীবন। এই সুন্নতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এভাবেই।

বাগবী আরো লিখেছেন, আমি ইমামুল কুররা আবু নশর মোহাম্মদের নিকট থেকে এরকম ক্বেরাত শিক্ষা করেছি। তিনি ছিলেন আল্লামা ইবনে কাছীরের পাঠপদ্ধতির পরম্পরাভূত। তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন মুজাহিদ থেকে এবং মুজাহিদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং তিনি স্বনামধন্য ক্বারী সাহাবী হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে।

সূরা ইনশিরাহ্

৮ আয়াতবিশিষ্ট এই মহান সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।
সূরা ইনশিরাহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○
اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

- আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?
- আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার,
- যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক
- এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।
- কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,
- অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।
- অতএব তুমি যখনই অবসর পাও একান্তে ইবাদত করিও
- এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলাম নাশরাহ্ লাকা সদ্‌রাক'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবহক! আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতসহ এই সুরার সকল আয়াত সম্পৃক্ত হবে সুরা দুহার ৬, ৭ ও ৮ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে। যদি বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলে মান্য করা হয়, তবে বুঝতে হবে, রসুল স. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মনোভাব পরিবর্তিত হবে ভেবে আল্লাহ্‌র কাছে যে সম্পদ প্রার্থনা করেছিলেন, সেই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আয়াতগুলো। যা হোক, সর্বাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমি তো উন্মুক্ত করে দিয়েছি আপনার হৃদয়ের দুয়ার। ফলে ওই উন্মুক্ত দুয়ার দিয়ে আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে অপার্থিব জ্যোতি, প্রজ্ঞা ও পরিচয়, পঠন-পাঠন নতুবা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন দ্বারা তা অর্জন করা কখনোই সম্ভব হতো না। মানুষ সাধারণত হয় একমুখী। পূর্ণরূপে মজে থাকে সৃষ্টির প্রেমে। কিন্তু দেখুন, আপনার অবস্থা সেরকম নয়। আপনি তো একই সঙ্গে আমার প্রতি এবং পথ

প্রদর্শনার্থে আমার সৃষ্টির প্রতি সমান অভিনিবেশী। আমি আপনার বক্ষাভ্যন্তর সম্প্রসারিত করে দিয়েছি বলেই তো আপনি এভাবে হতে পেরেছেন উরুজ ও নুযুল উভয় প্রকার পূর্ণত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং অংশীবাদীদের অপবচন শুনে আপনি বিচলিত ও ব্যথিত হবেন কেনো। আপনি সর্বাবস্থায় আমার প্রিয়তম জন।

রসুল স. এর প্রকাশ্য বক্ষবিদারণ হয়েছিলো দু'বার। একবার অতি শৈশবে। যেমন হজরত আনাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অন্যান্য বালকের সঙ্গে আনমনে সময় কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল। তিনি তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। চিরে ফেললেন তাঁর বুক। হৃৎপিণ্ড থেকে টেনে বের করলেন একটি জমাট রক্তপিণ্ড। তারপর সেটিকে নিক্ষেপ করলেন দূরে। বললেন, এটাই ছিলো শয়তানের অংশ। এরপর তিনি তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে এনে ধৌত করলেন একটি পাত্রে রক্ষিত জমজমের পানি দ্বারা। তারপর হৃৎপিণ্ড সংস্থাপিত করলেন যথাস্থানে। এরপর চেরা বুক জোড়া লাগিয়ে দিলেন আগের মতো করে। তাঁর বালকবন্ধুরা দূরে থেকে এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে গিয়ে খবর দিলো তাঁর দুধমাতাকে। তিনি ও অন্যান্য লোক অতিদ্রুত অকুস্থলে ছুটে এসে দেখলেন, বালক মোহাম্মদ এগিয়ে আসছেন বিষণ্ন বদনে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বচক্ষে রসুল স. এর বক্ষবিদারণের দাগ দেখেছি।

দ্বিতীয় বার তাঁর বক্ষবিদারণ করা হয়েছিলো মেরাজ রজনীতে। ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন হজরত আবু জর থেকে বোখারী ও মুসলিম। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, মেরাজ যাত্রার পূর্বে জিবরাইল আমার কাছে এলেন। আমাকে চিৎ করে শুইয়ে ফেঁড়ে ফেললেন আমার বুক। তারপর সমস্ত বক্ষাভ্যন্তর ধুয়ে দিলেন জমজমের জল দিয়ে। তারপর বক্ষাভ্যন্তর পূর্ণ করে দিলেন ইমান ও হেকমত দিয়ে। আর ফেঁড়ে ফেলা বুক জোড়া লাগিয়ে দিলেন আগের মতো করে।

বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে মালেক ইবনে সা'সা' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার রসুল স. আমাদের সম্মুখে মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন, জিবরাইল এসে আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত (কণ্ঠনালী থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত) বিদীর্ণ করলেন। বের করে আনলেন হৃৎপিণ্ড এবং তা ধৌত করলেন স্বর্ণনির্মিত পাত্রে রক্ষিত জমজমের পানি দিয়ে। এরপর আর একটি স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে রক্ষিত ইমান ও হেকমত ভরে দিলেন আমার হৃৎপিণ্ডে। তারপরে যথাস্থানে তা পুনঃসংযোজন করে জোড়া লাগিয়ে দিলেন বিদীর্ণ বক্ষদেশ। আমি বলি, যে বস্তুটি তখন তাঁর হৃৎপিণ্ড থেকে বের করে ফেলা হয়েছিলো, তা ছিলো ভূতচতুষ্টয়জাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের নিকৃষ্ট অংশ, যা প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করে অশ্লীলতা ও পাপের দিকে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার'। বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের 'তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি' প্রশ্নটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি আপনার বক্ষকে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছি।

তৎসহ নামিয়ে দিয়েছি আপনার গুরুভার। এখানে 'উইয্‌রাক' অর্থ নামিয়ে দিয়েছি ভার। 'উইয্‌রুন' এর আভিধানিক অর্থ পাহাড়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কাল্‌লা লা ওয়াযারা' (না, না, কোনো পাহাড়ও থাকবে না আশ্রয় নেওয়ার জন্য)। এখানে শব্দটির রূপকার্থ হবে ভার, গুরুভার। অর্থাৎ বিচ্ছেদযাতনা, যা ভেঙে ফেলেছিলো তাঁর ধৈর্যের প্রাচীর। পরে যখন সুরা দ্বুহা ও সুরা ইনশিরাহ্ অবতীর্ণ হলো, তখন বিরহের গুরুভার হলো অপসারিত। চাঞ্চল্য পরিণত হলো স্থিরতায়। তিনি স. হলেন প্রশান্ত, একথা জেনে যে, সাময়িকভাবে প্রত্যাদেশ স্থগিত হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ছিলো না। বরং বিষয়টি ছিলো প্রজ্ঞাপূর্ণ, কল্যাণকর। আর ওই ব্যথার ভারকেই আল্লাহ্ অভিহিত করেছেন তাঁর অনুগ্রহ বলে। অথবা 'ভার' অর্থ হতে পারে এখানে— শরিয়তের বিধি-বিধানের গুরুভার, কেননা শরিয়তের ভার বহন, তার প্রচার ও বাস্তবায়ন নিশ্চয় ছিলো বিশাল এক গুরুদায়িত্ব, যে গুরুদায়িত্ব বহনের আহ্বান পেয়ে আকাশ-পৃথিবী সভয়ে তাদের অনীহা প্রকাশ করেছিলো। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'বিনয়ীগণ ব্যতীত অন্যের কাছে এটা একটা বিরাট বোঝা'।

রসুল স. এর বক্ষদেশ থেকে যখন শয়তানের অতিদূরবর্তী অংশ বের করে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো, বক্ষাভ্যন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিলো ইমান ও হেকমত দিয়ে, তখনই তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছিলো হালকা। শরিয়তের বিধি-নিষেধগুলো তখন তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো শান্তিদায়ক ও মনোমুগ্ধকর। তাই তিনি স. স্বয়ং স্বীকার করেছেন, নামাজ আমার চোখের শান্তি, নয়ন জুড়ানো নেয়ামত। 'অপসারণ করেছি তোমার ভার' কথাটির মর্মার্থ এরকমই। এটাই সুফী দার্শনিকদের বিবেচনায় প্রকৃত ইমান। তাঁরা বলেন, এরকম অবস্থা ঘটলেই শরিয়তের ভার হয় সহনীয়, মনঃপুত ও শান্তিপ্রদায়ক। ভারী বোঝা তখন আর ভারী থাকে না। হয়ে যায় সুবহ। এই প্রকাশ্য অবস্থা রসুল স. এর অর্জিত হয়েছিলো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'ভাবেই। আর তাঁর উম্মতের আউলিয়াগণের এ অবস্থা লাভ হয় অপ্রকাশ্যভাবে, যার রেখাপাত তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাসিত হয় উপমার জগতে, প্রবৃত্তির যাবতীয় লালসার বিনাশ (ফানা) সাধনের পর। তখন তাঁদেরকে জানানো হয় বক্ষসম্প্রসারণের সাধুবাদ। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি এবং অন্যান্য স্বনামধন্য মাশায়েখ। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াহইয়া এবং আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করছেন এভাবে— আমি আপনার উপর থেকে দূরীভূত করেছি নবুয়তের ভারী বোঝা। লঘু করে দিয়েছি নবুয়তের দায়িত্ববহনকে। ব্যাখ্যাটি পরের বিশ্লেষণটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— হে আমার প্রিয়তম নবী! নবুয়তের মহান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে মূর্খতার যুগের অনবধানতাসমূহকে আমি মার্জনা করলাম। কিন্তু ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণের আগেও তিনি স. নবী ছিলেন। যেমন তিনি স. স্বয়ং বলেছেন, আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন

আদম ছিলো পানি ও কাদায়। অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পূর্ব থেকেই আমি নবী। সুতরাং নবুয়তের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগেও তাঁর দ্বারা এমন কিছু সংঘটিত হওয়া অসম্ভব, যা অনবধানতা বা অন্যায়ের মধ্যে পড়ে। আর যা অপরাধ নয়, তা মার্জনা করার চিন্তাও তো করা যায় না। তাঁর মহান মর্যাদার ক্ষেত্রে এমতো ধারণা নিতান্তই অশোভন।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যা ছিলো তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক'। একথার অর্থ— ওই গুরুভার তো চেপে বসেছিলো আপনার কটিদেশে, যেমন ভারী বোঝা কাঁধে চাপালে মেরুদণ্ড ও কোমরে উত্থিত হয় কট কট আওয়াজ। সে গুরুভারকে তো আমি দূর করে দিয়েছি। এখানকার 'অতিশয় কষ্টদায়ক' কথাটি আগের আয়াতের 'ভার' পদটির বিশেষণ। 'ভার' অর্থ যদি বিরহের ভার হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বিরহব্যাথায় জ্বলে জ্বলে আপনি তো হয়ে গিয়েছিলেন পর্যুদস্তপ্রায়, আমি সে বিরহের অবসান ঘটিয়েছি। পুনরায় প্রবাহিত করেছি প্রত্যাদেশের ধারা। আর শরিয়তের বিধি-বিধানকেই যদি এখানে 'ভার' বলা হয়ে থাকে, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যদি আপনার বক্ষসম্প্রসারণ না করতাম, বিধি-বিধানের ভার অপসারণ না করতাম, তাহলে তা আপনার মেরুদণ্ডকে করে দিতো লুব্ধ। তখন আর আপনি সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, যদি আমার প্রভুপালক আমার প্রতি কৃপাপরবশ না হতেন, তাহলে আমি সরল পথের সন্ধান পেতাম না। জানতে পারতাম না দান, নামাজ এ সকল কিছুর সংবাদ।

যেহেতু শরিয়তের দায়িত্ববহন অতিশয় কষ্টদায়ক, যা পিঠ কুঁজো করে দেয়, প্রতিবন্ধকতা রচনা করে আবশ্যিক কর্তব্যাবলী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, সেহেতু এখানকার 'আ'নক্বাদ্বা' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে অতীত কালার্থক শব্দরূপে। কেননা রসুল স. সব সময়ই ছিলেন নিষ্পাপ। পক্ষান্তরে পাপকর্ম তো পরকালে ভেঙে চুরমার করে দিবে সহনশীলতাকে। তাই সাধারণভাবে পরকালের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে ভবিষ্যতকালার্থক শব্দরূপ ব্যবহার করাই হতো সঙ্গত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি'। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলুন 'আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি' কথাটির অর্থ কী? হজরত জিবরাইল বলেছিলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্পাক বলেন, যখন আমার নাম স্মরণ করা হবে, তখন স্মরণ করা হবে আপনার নামও।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত ও উদ্ধৃত হাদিসের অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতাজগতে ফেরেশতারা যখন আল্লাহ্র নামের জিকির করেন, তখন রসুল স. এর নামেরও জিকির করেন। ইতোপূর্বে এই হাদিসটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরশের মধ্যস্থলেও লেখা রয়েছে রসুল স. এর মহান নাম। সুরা বুরূজের তাফসীরেও

উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, লওহে মাহফুজের মধ্যস্থলে লেখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্দাহু দীনুহুল ইসলাম ওয়া মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু'।

আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতের 'জিকির' অর্থ আজান, ইকামত, তাশাহ্হুদ ও মিম্বরের খুতবা। যদি কেউ আল্লাহ্পাককে স্বীকার করে, তাঁর ইবাদতও করে, অথচ রসুল স.কে স্বীকার না করে, তবে তার সকল কর্মকাণ্ড হবে ব্যর্থ। এমতাবস্থায় সে হবে কাফের। হজরত ইয়াসার ইবনে সাবেত তাঁর কবিতায় বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর মহান নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম নবীর নাম। মুয়াজ্জিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলার সঙ্গে সঙ্গে বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লহ্'। আরশের অধিপতির নাম মাহমুদ, আর তাঁর প্রেমাস্পদের নাম মোহম্মাদ।

অনেকে বলেন, এখানে খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করার অর্থ আধ্যাত্মিক জগতের নবী-রসুলগণের ওই অঙ্গীকার, যাকে বলা হয়েছে 'মীছাক'। তাঁরা তখন এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা সকলেই রসুল স.কে নবী বলে স্বীকার করবেন। অর্থাৎ রসুল স. এর উপরে ইমান আনা আল্লাহ্পাক তাঁদের উপরে অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'ফা ইন্না মাআ'ল উ'স্রি ইউস্রান' (কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে)। এখানকার, 'ইউস্রান' শব্দটিতে প্রযুক্ত তানভীন প্রাচুর্যপ্রকাশক। আর এই বাক্যটি আর একটি অনুক্ত বাক্যের নিমিত্ত। যেনো বাক্যটি ছিলো— আপনার উপরে যে কষ্ট আপতিত হয়েছে, তার জন্য আপনি মুষড়ে পড়বেন না। কেননা এই কষ্টের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সুখ, কঠোরতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোমলতা।

কেউ কেউ আবার এর পরের আয়াতের 'ইউস্রান' শব্দে প্রযুক্ত তানভীনকে স্থির করেছেন অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ও আশার শালীনতারূপে। তবে সঠিক কথা হচ্ছে, এ অঙ্গীকার একটি নতুন ধরনের অঙ্গীকার, পূর্বকৃত কোনো অঙ্গীকার নয়। এর মর্মার্থ হচ্ছে আপনার জন্য কষ্টের দ্বিতীয় সত্তারূপে সুখ অবধারিত।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর তাফসীরে, হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাকে' এবং বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' অপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, শুভবারতা শোনো, এবার তোমাদের জন্যও সমাগত হয়েছে স্বস্তি। একটি কঠোরতা দু'টি কোমলতার উপরে কখনোই প্রবল হতে পারে না। হজরত জাবের থেকে শিথিল সূত্রে ইবনে মারদুবিয়াও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা'য় এবং হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাকে' হাদিসটির প্রত্যয়নানুকূলে আরো একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দুঃখ-দুর্দশা যদি কোনো ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে, তবে স্বস্তি-সুখও খুঁজে খুঁজে সেখানে প্রবেশ করবে ওই ছিদ্রপথ দিয়েই। দুর্বিপাক একগুণ, আর সাফল্য দ্বিগুণ। একগুণ কখনো দুই

গুণের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আরবী ভাষাবিদগণের রীতি এই যে, একটি শব্দ যদি দ্বিতীয়বার নির্দিষ্টবাচকরূপে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয়স্থলে তার অর্থ হবে একই, শব্দটির প্রথম উল্লেখ নির্দিষ্টবাচক বা অনির্দিষ্টবাচক যাই হোক না কেনো। কেননা পরে উল্লেখিত শব্দটি নির্দিষ্টবাচক হওয়ার কারণে সীমিতার্থক হয়েছে। কিন্তু পরে উল্লেখিত শব্দটি যদি অনির্দিষ্টবাচক হয়, তবে তার অর্থ হবে ভিন্নতর, প্রথমে উক্ত শব্দটি নির্দিষ্টবাচক হোক, অথবা হোক অনির্দিষ্টবাচক। এমতাবস্থায় বাক্যে বেগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ করাই হয় উত্তম। এখানেও তেমনি 'আলউ'স্‌র' শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তবে পরবর্তী 'আলউ'স্‌র' নির্দিষ্টবাচক হওয়ার জন্য উভয়ক্ষেত্রে শব্দটি হবে সমার্থক। তেমনি শব্দটির পরের উল্লেখ অনির্দিষ্টবাচক হওয়ার জন্য তার অর্থ হবে ভিন্নতর। অর্থাৎ তা হবে দু'বার স্বস্তির অর্থবহ।

'তানকীহুল উসুল' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যদি শর্তযুক্ত স্বীকারোক্তিতে বলে, আমার নিকট তোমার এক হাজার টাকা পাওনা আছে, তাহলে এরকম কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেও তাকে বলতে হবে ওই এক হাজার টাকাই। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। আর কেউ যদি শর্তহীনভাবে এক হাজার টাকার স্বীকারোক্তির পর কথাটির পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে দিতে হবে দুই হাজার টাকা। কিন্তু বৈঠক যদি একটিই হয়, তবে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন কথার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। সর্বাবস্থায় দিতে হবে এক হাজার। আমি বলি, পরোক্ত উক্তি প্রথমোক্ত উক্তির তাগিদ হবে তখনই, যখন বিদ্যমান থাকবে কোনো ইঙ্গিত।

একটি সংশয় ঃ আরবী ভাষাবিদগণের যে রীতির কথা উপরে বর্ণিত হলো, তার বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এই বাক্যটির অবস্থা তাহলে কী হবে 'ইন্‌না মাআ'ল ফারিসি সাইফান ইন্‌না মাআ'ল ফারিসি সাইফান'। এখানে তো দু'টি স্থলেই নির্দিষ্টবাচক পদ 'আলফারিসে'র একই অর্থ। অর্থাৎ একই অশ্বারোহী। আর অনির্দিষ্টবাচক 'সাইফান' দুই স্থলে একই তরবারী। বরং দ্বিতীয় বাক্যটি এখানে প্রথম বাক্যের তাগিদ।

সংশয়-নিরসন ঃ একথা আমরা বলেই দিয়েছি যে, তাগিদ ধরে নেওয়ার কোনো ইঙ্গিত যদি বর্তমান থাকে, তবে দু'টি উল্লেখের একই অর্থ গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত উদাহরণটিতে বাক্যের গতিপ্রবাহ একটাই এবং একই বৈঠক একথাই প্রমাণ করে যে, পরোক্ত উক্তিটি প্রথমোক্ত উক্তির তাগিদ, সমঅর্থবহ। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের যে দু'টি ভাষাগত তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার দু'টিই সঠিক। তাগিদ হিসেবে এবং নতুন বাক্য হিসেবে— দু'ভাবেই ব্যাখ্যা গ্রহণ সিদ্ধ। তবে এমতোক্ষেত্রে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে করে এর ভিন্নভাষ্য গ্রহণ করার উপায় আর নেই। এজন্যই এখানকার 'আল উ'সর' এর মর্মার্থ প্রথম 'আল উ'সর' এবং 'ইউস্‌রান'র অর্থ আর এক 'ইউস্‌রান'।

বাগবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে, যার মর্মার্থ হচ্ছে, এখানে একটি অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে দু'টি স্বস্তির ইঙ্গিত। এর কারণ এই নয় যে, এখানে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অনির্দিষ্টবাচক শব্দের, বরং এর কারণ— বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের সুরার আয়াতগুলোর সঙ্গে, যেখানে রসুল স.কে সান্ত্বনাস্বরূপ দেওয়া হয়েছে অভাবমুক্ত হওয়ার শুভসংবাদ। তাই হয়েছিলো। আল্লাহ্পাক তাঁকে পরে দিয়েছিলেন প্রতুল সম্পদ, রাজ্যাধিকার। এরকম ঘটনাও তখন ঘটেছে যে, তিনি স. কখনো কখনো একজনকেই দিয়েছেন দুইশত উট, তৎসহ আরো অনেক মূল্যবান সামগ্রী।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে'। বাক্যটি একটি নতুন বাক্য। কেননা এর পূর্বে নেই 'ফা' অথবা 'ওয়াও' এর মতো কোনো যোজক অব্যয়। এখানে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বাসবানকে পুণ্যপ্রদানের অঙ্গীকার, যার মধ্যে রসুল স.ও অন্তর্ভূত। আর অঙ্গীকারখানির মর্ম এই যে— পার্থিব অস্বস্তির পরে রয়েছে পারত্রিক অনাবিল শান্তি। আর রসুল স. এর জন্য রয়েছে একটি পার্থিব অস্বস্তির বদলে দু'টি স্বস্তি— একটি পৃথিবীর এবং আর একটি পরবর্তী পৃথিবীর। তাই তিনি স. বলেছেন, দু'টি সাফল্যের উপরে একটি বিপর্যয় বিজয়ী হতে পারে না। একথার অর্থ— ইহলৌকিক একটি দুর্বিপাক পার্থিব স্বস্তিকে পর্যুদস্ত করলেও তা অশুভ নয়। কেননা পারলৌকিক সাফল্য তো অক্ষুণ্ন রইলোই, যা চিরকালীন।

বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আল উ'সর' শব্দের 'আল' অব্যয়টি সীমিতার্থক এবং পরের 'আল উ'সর' এর 'আল' জাতিবাচক। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'আল উ'সর' অর্থ দারিদ্র ও নিগ্রহ, যা আগমন করতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দিক থেকে। তিনি স. এ বিষয়ে আল্লাহ্পাকের নিকটে অভিযোগও উত্থাপন করেছিলেন। এভাবে এখানকার প্রথম 'ইউস্রান' এর অর্থ হবে— কষ্টকর অবস্থার বিলোপন এবং পরবর্তী 'ইউস্রান' অর্থ হবে বিত্তহীনতার স্থলে বিত্তশালিতা।

বায়যাবী লিখেছেন, 'আল উ'সর' অর্থ বক্ষের সংকীর্ণতা, পৃষ্ঠের গুরুভার। স্বজাতির পথভ্রষ্টতা এবং অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে আসা উৎপীড়ন। আর প্রথম 'ইউস্রান' অর্থ বক্ষাভ্যন্তরের সম্প্রসারণ, গুরুভার অপসারণ, স্বজাতির সুপথ প্রাপ্তির সুযোগ, আনুগত্য এবং সকলের জন্য পারত্রিক পূর্ণ প্রতিফল। কতিপয় ভাষ্যকার লিখেছেন, এখানকার 'ইন্না মাআ'ল উ'স্রি ইউস্রান' অর্থ 'নিশ্চয় কষ্টের সাথে সাথে স্বস্তি' না হয়ে হবে— নিশ্চয় কষ্টের পরে স্বস্তি। দুঃখের পরে সুখের আগমন সুনিশ্চিত। অর্থাৎ দুঃখ-সুখ পরস্পরলগ্ন, তবে এক সঙ্গে নয়— পর পর।

আমি বলি, 'আল উ'স্র' (কষ্ট) অর্থ— স্রষ্টার প্রতি অভিনিবেশী থাকা অবস্থায় সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ প্রদান কষ্টদায়ক। অর্থাৎ উরুজ অবস্থায় নুযুলের প্রভাব অসহনীয়। রসুল স. এর উপরে এরকম টানাপোড়েনই ছিল তাঁর জন্য কষ্ট। আবার

এই টানাপোড়েন বা বৈপরীত্যের সংঘর্ষের কারণেই অর্জিত হয়েছিলো তাঁর বক্ষসম্প্রসারণ (শরহে সুদুর)। তারপর বিষয়টি তাঁর প্রতি হয়ে গিয়েছিলো সহজ। এর পর থেকেই তিনি স. আল্লাহ্‌র প্রতি নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতা সহ অভিনিবেশী হতে পেরেছিলেন তাঁর সৃষ্টির প্রতি। এই অবস্থাকেই সুফী-দার্শনিকগণ নাম দিয়েছেন 'সায়ের মিনাল্লহ্ বিল্লাহ্'। এভাবেই পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ধর্মপ্রচারকেরা হন আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও নির্দেশের বাস্তবায়নকারী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানকার প্রথম 'মাআ' হবে প্রকৃত অর্থে সঙ্গে, আর দ্বিতীয় 'মাআ' হবে রূপকার্থক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার পরম প্রেমাস্পদ! ব্যথিত হবেন না। এখন তো আপনার দায়িত্বপালনের সময়। সুতরাং আমার সৃষ্টির পথপ্রদর্শনার্থে তাদের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হন। আমার সঙ্গে সার্বক্ষণিক সংযোগ তো আপনার রইলোই। প্রকাশ্যত এ অবস্থা যাতনাদায়ক হলেও এর সঙ্গে রয়েছে অনন্তকালীন নিরবচ্ছিন্ন সুখের নিশ্চয়তা। পরবর্তী পৃথিবীতে তো বাহ্যিক এই আবরণটুকু আর থাকবে না। তখন তো আপনি পাবেন অনন্তরাল দীদার।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি যখনই অবসর পাও, একান্তে ইবাদত কোরো'। এখানে 'ফা ইজা ফারাগ্‌তা' অর্থ অতএব তুমি যখনই অবসর পাও। 'ফানসব' অর্থ একান্তে ইবাদত কোরো। 'নসব' অর্থ শ্রান্তি, ক্লান্তি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি যখন ধর্মপ্রচারের গুরুদায়িত্ব থেকে অবকাশ পাবেন, তখন নিমগ্ন হবেন ইবাদত-বন্দেগীতে, যেনো আপনাকে যে অনুগ্রহসম্ভার আমি দান করেছি এবং ভবিষ্যতে যে সকল অনুগ্রহ দান করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সকল কিছুর জন্য সম্পন্ন করতে পারেন যথাকৃতজ্ঞতা। অথবা— যখন এক ইবাদত থেকে আপনি অবসর গ্রহণ করবেন, তখন নিমগ্ন হবেন অন্য ইবাদতে, ইবাদতশূন্য অবস্থায় থাকবেন না। রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা ওই সময়ের জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে, পৃথিবীতে যে সময়টুকু তারা অতিবাহিত করেছিলো ইবাদতবিহীন অবস্থায়।

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, জুহাক, মুকাতিল ও কালাবী আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ করেছেন— যখন আপনি ফরজ, অথবা অন্য কোনো নামাজ শেষ করবেন, তখন আমার কাছে দোয়া করবেন। চাইবেন, যা চান। অর্থাৎ দোয়া করবেন তাশাহ্‌হুদ শেষ করে, অথবা সালাম ফিরানোর পর। শা'বী অর্থ করেছেন— যখন আপনি তাশাহ্‌হুদ পাঠ শেষ করবেন, তখন যাচনা করবেন ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। হজরত ইবনে মাসউদ অর্থ করেছেন— ফরজ নামাজসমূহ সমাপন করার পর নিমগ্ন হবেন নিশীথের নামাজে। হাসান বসরী এবং জায়েদ ইবনে আসলাম অর্থ করেছেন— যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ শেষ হবে, তখন আপনি মনোযোগী হবেন একান্ত উপাসনায়। এরকম কথা বলা হয়েছে একটি হাদিসেও। যেমন তিনি স. এক যুদ্ধ শেষে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ছোট যুদ্ধ শেষ হলো। এবার আমাদের শুরু হলো বড় যুদ্ধ (ইবাদত, যা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ)।

মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— যখন পার্থিব ক্রিয়াকর্ম থেকে অবকাশ পাও, তখন তোমরা আরাধনা কোরো তোমাদের পরম প্রভুপালকের। ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, কালাবী অর্থ করেছেন— হে আমার নবী! আপনি যখন নবুয়তের দায়িত্ব সম্পাদন শেষে অবকাশ পাবেন, তখন আমা সকাশে মার্জনাপ্রার্থনা করবেন বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের জন্য। এমতো ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র সাধিত হবে আগের আয়াতসমূহের সাথে এভাবে— আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের যথাকৃতজ্ঞতা আপনি প্রতিপালন করুন ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে। আর আমার ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— যখন আপনি সৃষ্টির প্রতি পথপ্রদর্শনের গুরু দায়িত্ব সমাপন করবেন, পূর্ণ করবেন অবরোহণের (নুযুলের) উদ্দেশ্য, তখন আপনি অধিরোহণের (উরুজের) দর্শন (শুহুদ) মুখী হওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াবেন। অগ্রসর হবেন আরো সম্মুখে।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কোরো'। বাক্যটির বিশ্লেষণাত্মক যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'একান্তে ইবাদত করো' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আপনি একান্ত ইবাদত সুসম্পন্ন করার পর যাচনা করবেন কেবল আপনার প্রভুপালনকর্তা সকাশে। অন্য কারো কাছে প্রার্থী হবেনই না। আতা কথাটির অর্থ করেছেন— আপনি আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবেন জাহান্নামের ভয়ে এবং জান্নাতের আশায়। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— সর্বাবস্থায় আপনার কামনা-বাসনাকে একাগ্র করবেন কেবল আপনার প্রভুপালকের প্রতি।

এখানে 'ইলা রব্বিক' এর সন্নিহিত বাক্যটি রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ সম্ভাব্য বাক্যটি ছিলো যেনো 'ফারগাব ইলা রব্বিকা ফারগাব'। অর্থাৎ মনোনিবেশ করুন, হোন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ অভিনিবেশী। আমি বলি, দু'বার মনোনিবেশী হওয়ার অনুজ্ঞা এখানে একথাটিই প্রমাণ করে যে, প্রথমে মনোনিবেশ করতে হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহসম্ভার ও তাঁর গুণবত্তার (সিফাতের) প্রতি এবং পরবর্তীতে মনোনিবেশ করতে হবে তাঁর পবিত্রতম সত্তার (জাতের) প্রতি।

দ্রষ্টব্য ঃ নুযুল অবস্থায় সুরা ইনশিরাহ এবং উরুজ অবস্থায় সুরা আ'লা পাঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। সুরা আ'লার তাফসীরেও আমি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

সূরা তীন

এই সুরাখানিও ৮ আয়াত বিশিষ্ট এবং এই সুরাও অবতীর্ণ হয়েছে পরম পুণ্যভূমি মক্কায়।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِ ۙ﴿۱﴾ وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَ ۙ﴿۲﴾ وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِ ۙ﴿۳﴾ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ ۫﴿۴﴾ ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ سٰفِلِيۡنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ ؕ﴿۶﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِالدِّيۡنِ ؕ﴿۷﴾ اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ ﴿۸﴾

r শপথ 'তীন' ও 'যায়তুন' এর,

r শপথ 'সিনাই' পর্বতের

r এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর,

r আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,

r অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি—

r কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; ইহাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

r সুতরাং ইহার পর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?

r আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াত্ তীনি ওয়ায্ যাইতূন' (শপথ তীন ও যয়তুন এর)। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইব্রাহিম, আতা, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, তীন হচ্ছে ডুমুর ফল, যা তোমরা ভক্ষণ করো। আর যয়তুন ওই ফল, যা থেকে নিঃসৃত হয় তেল। এখানে ডুমুরের শপথ করে বলে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, দ্যাখো, ডুমর ফলে বিচি নেই। জান্নাতের ফলসমূহও হবে এরকম বীজহীন। এদিক থেকে ডুমুর জান্নাতী ফল সদৃশ।

ছা'লাবী এবং আবু নাঈম তাঁর 'আত্বত্বিব' গ্রন্থে এক অপ্রসিদ্ধ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু জর বলেছেন, ডুমুর অর্শরোগের মহৌষধ। পায়ের ঘায়েরও প্রতিষেধক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'শপথ সিনাই পর্বতের'। জুহাক বলেছেন, 'সীনীন' (সিনাই) শব্দটি নাবতী ভাষার। এর অর্থ সৌন্দর্যময়, অথবা সৎ। মুকাতিল বলেছেন, ফলবান বৃক্ষে সুশোভিত পাহাড়কে নাবতী ভাষায় বলে 'সীনীন' বা 'সাইনা'। ইকরামা বলেছেন, ওই ভূখণ্ডকে 'সীনীন' বলে, যেখানে

অবস্থিত তুর পর্বত। কেউ কেউ বলেছেন, সুরিয়ানি ভাষায় ঘন সন্নিবিষ্ট তরুবীথি শোভিত শ্যামল শৈলশ্রেণীকে বলে 'সীনীন' বা 'সাইনা'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শব্দটি আবিসিনীয়। মুজাহিদ বলেছেন 'সীনীন' অর্থ বরকত। অর্থাৎ বরকতময় পাহাড়। কাতাদা বলেছেন, সৌন্দর্যময় গিরিমালা। কালাবী বলেছেন, সুসজ্জিত পর্বত শ্রেণী। কেউ কেউ বলেছেন, বিশেষ প্রস্তর। এধরনের প্রস্তর ছিলো তুর পর্বত সংলগ্ন। তাই এখানে 'তূর' কে সম্বন্ধিত করা হয়েছে 'সীনীন' এর সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর'। এখানে 'আমীন' অর্থ নিরাপদ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'আমান' থেকে। 'আমান' অর্থ নিরাপত্তা। শব্দটি কর্তৃপদীয় হলে অর্থ হবে— যে এই শহরে প্রবেশ করে, তাকে এই শহর নিরাপত্তা দেয়। আর কর্মপদীয় হলে অর্থ হবে— যে এই শহরে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। 'আমীন' এর আর এক অর্থ— গচ্ছিত সম্পদ রক্ষাকারী।

'নিরাপদ নগরী' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মহাশান্তিধাম মক্কাকে। মূর্খতা ও ইসলাম উভয় যুগে মক্কাভূমি ছিলো নিরাপদ আলয়। এখানে যে কয়টি বস্তুর শপথ করা হয়েছে, সেগুলোর সব কয়টিই বরকতপূর্ণ। ডুমুর ও যয়তুনের উৎপন্ন স্থল ছিলো নবী ইব্রাহিমের হিজরতের স্থান। সিনাই পর্বতসন্নিহিত অঞ্চল ছিলো নবীগণের আবাসভূমি এবং প্রত্যাদেশ অবতরণের স্থান। তুর পর্বতে নবী মুসার সঙ্গে আল্লাহ্পাক বাক্যালাপ করেছিলেন। আর মহাতীর্থ মক্কা তো ছিলো শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম নবীর জন্মস্থান এবং প্রত্যাদেশ অবতরণের কেন্দ্র।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দর গঠনে'। এখানে 'মানুষ' (আল ইনসান) বলে বুঝানো হয়েছে সমগ্র মানব জাতিকে। আর 'তাক্বভীম' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ক্বিয়াম' বা 'ক্বওয়াম' ধাতুমূল থেকে 'তাফয়ীল' প্রক্রিয়ায়। কোনোকিছুর অবয়ব বা ভিত্তি নির্ধারণ করার অবস্থাকে বলে 'ক্বিয়াম'। আমি বলি, 'ক্বওয়াম' ওই প্রেক্ষাপট, যা থেকে প্রস্তুত করা হয় কোনোকিছুর মৌলিক পরিকাঠামো। মানবসৃষ্টির মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রকাশ্য জগতের সকল বস্তু বিদ্যমান। এছাড়াও তার মধ্যে রয়েছে আত্মা জগতের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বস্তু। রয়েছে বাকশক্তি। এই সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিভূ। তাই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে পরিদৃষ্ট হয় শয়তান ও ফেরেশতার স্বভাবের সহাবস্থান। হিংস্র জন্তুর মতো পাশবিকতার মধ্যে সমাগত হয় জীবন, প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, অভিপ্রায়, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও প্রেম-ভালোবাসা— এককথায় আল্লাহ্তায়ালার সমষ্টিগত গুণবত্তার প্রতিবিম্ব। মানুষ তাই বিবেক-বুদ্ধির জ্যোতিতে স্নাত। পরম সত্তার অস্তিত্ব, গুণাবলী ও প্রতিবিম্বজাত পূর্ণত্বসমূহের ধারক ও বাহক মানুষই। একারণে মানুষই পেয়েছে আল্লাহ্পাকের প্রতিনিধিত্বের (খেলাফতের) উপঢৌকন। তিনি তাই বলেছেন 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই'।

‘আহ্‌সানি তাক্বভীম’ অর্থ সুন্দরতম গঠন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— কান্তিময় আকৃতি। কেননা ‘তাক্বভীম’ শব্দটি ধাতুমূল, যার অর্থ সুপরিমিত। ‘কামুস’ অভিধানে লেখা আছে ‘ক্বওয়ামতুহু’ (আমি তাকে সুপরিমিত করেছি, দিয়েছি সুষম সৌষ্ঠব)। ‘ক্বভীম’ ও ‘মুস্‌তাক্বীম’ অর্থ সরল, সমতল। আয়াতের ধাতুমূল শব্দটি কর্মপদীয় শব্দরূপীয়। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সঠিক পরিমাপ সহকারে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর পরিগঠনকৌশল এমন নয়। প্রাণীসমূহের মধ্যে কেবল মানুষই পরিমিত অবয়ব, পরিচ্ছন্ন ত্বক এবং ধারণ শক্তিসম্পন্ন হাতের অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি’। বাগবী লিখেছেন, বাক্যটি অনির্দিষ্টবাচক হওয়ার কারণে যথাযোগ্য সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর সাধারণার্থে সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্তকারী বলে যদি ধরে না নেওয়া হয়, তবে তা হবে আংশিকার্থক। এমতাবস্থায় যথাক্রমে এর অর্থ দাঁড়ায়— সকলেই অধঃপতনের অতল তলের অধিবাসী এবং অধঃপতিতদের মধ্যে কেউ কেউ অধিবাসী অতল তলের। এখানকার ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের পরিপোষকতায় একটি হাদিস উল্লেখ করা যায়। সেটি হচ্ছে— হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃতির উপর। এরপর তার মাতাপিতা তাকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অগ্নিউপাসক। আলোচ্য আয়াত এবং উদ্ধৃত হাদিসের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, আয়াতে মানবজাতির অধঃপতিত হওয়ার সম্পর্ক করা হয়েছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এ সম্পর্কটি সৃষ্টিগত। কেননা আল্লাহ্‌পাক মানুষের কর্মেরও স্রষ্টা। আর হাদিসে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিউপাসক বানানোর সম্পর্ক করা হয়েছে তাদের মাতাপিতার সঙ্গে। এ সম্পর্ক অর্জন বা নির্মাণ গত। কারণ আল্লাহ্‌পাক একমাত্র সৃজয়িতা হওয়ার কারণে মানুষের কর্মাবলীর সৃজয়িতা হলেও কর্মাবলীর নির্মাতা হয়েছে মানুষ। তাই তারা কর্মফল অর্জকও।

‘সাফিলীন’ অর্থ হীনতাগ্রস্তদের। অর্থাৎ হিংস্র জীবজন্তু পশু-পাখি ও শয়তানদের, যারা চিরকালের জন্য মানবিক পূর্ণত্ব লাভের বৈশিষ্ট্যবিবর্জিত। আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং আল্লাহ্‌র প্রেম-ভালোবাসা-পরিচয়ের জ্যোতির্সম্পাত ধারণ করা কোনোদিনই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ‘সাফিলীন’ ‘সাফিল’ এর বহুবচন। আর এখানে ‘সাফিলীন’ উল্লেখ করার কারণ এই যে, পশু-পাখি-জন্তু-জানোয়ার বিবেকসম্পন্ন প্রাণী নয়, কিন্তু জ্বিন ও শয়তান বুদ্ধি-বিবেকবিশিষ্ট। কিন্তু তারা যখন তাদের মানবিক পূর্ণত্ব অর্জনের সম্ভাবনাকে করে ব্যর্থ, বরণ করে কুফরী ও কৃতঘ্নতাকে, তখন তাদের পতন হয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্‌পাক তখন তাদেরকে নামিয়ে দেন কুকুর-শূকর-শয়তান ইত্যাদি সৃষ্টিরও নিম্নতম পর্যায়ে। দুর্ভোগ, শাস্তি ও লাঞ্ছনা হয় তখন তাদের জন্য অবধারিত। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেওয়া

হয় বেহেশতের দিকের একটি জানালা। তারা যখন ওই জানালা দিয়ে বেহেশত ও তার বিপুল সুখসম্ভারসমূহ দেখতে থাকে, তখন তাদেরকে বলা হয়, ওই দ্যাখো, ওই সকল সুখসম্ভার ভোগ করতে পারতে তোমরাও, যদি হতে বিশ্বাসী ও পুণ্যবান। এরপর আর একটি জানালা খুলে দেওয়া হয় দোজখের দিকের। হাদিসটি ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। তাঁর নিকট থেকে আবার বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীকে তাদের জাহান্নামের আবাস না দেখানো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না। তেমনি জাহান্নামীদেরকেও জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না তাদের জান্নাতের ঠিকানা না দেখিয়ে। এরকম করা হবে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে যথাক্রমে অধিকতর কৃতজ্ঞভাজন ও আক্ষেপজর্জরিত করার জন্য। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা ইমানদার না হলে যেখানে যেতো এবং জাহান্নামীরা ইমানদার হলে যা পেতো, তা তাদেরকে দেখানো হবেই। তবে শয়তান ও জীব-জানোয়ারদের ক্ষেত্রে এরকম করা হবে না। কেননা তাদের মধ্যে জান্নাতগমনের যোগ্যতা একেবারেই নেই। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'আসফালা সাফিলীন' অর্থ দোজখ। কেননা দোজখ বহুস্তরবিশিষ্ট— একটি আরেকটির নিচে। আবুল আলিয়া কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাদেরকে শূকর ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীবের আকৃতিবিশিষ্ট করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো দোজখের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'। এখানকার 'ইল্লাল্ লাজীনা আমানূ' বাক্যের 'ইল্লা' ব্যতিক্রমীটি মিলিতার্থক। কেননা বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদেরকে কখনো দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে না। রূপান্তরিতও করা হবে না তাদের আকার-আকৃতি।

'ফা লাহুম' (এদের জন্য) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর কথাটির অবস্থানও এখানে ব্যতিক্রমীর নিমিত্তস্থলে, যাতে করে বুঝা যায় ব্যতিক্রমের বাঁধনটি অত্যন্ত সুদৃঢ়। কেউ কেউ বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে এবং সর্বোত্তম সম্ভাবনা সহকারে, যাতে তারা সামান্য পরিশুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পেয়ে যেতে পারে মহাসফলতা। সকল প্রাণী ও অন্যান্য সৃষ্টিকে করেছি তাদের সেবাদাস। তাই অনুগত হয়ে যায় জ্বিন-শয়তানেরাও। আবার কিছুসংখ্যক মানুষকে আমি করেছি বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল, শিশুদের চেয়েও অধিক অকেজো। এভাবে তাদেরকে করেছি অক্ষমতার অতলতাবাসী। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার ব্যতিক্রমীটি হবে পৃথকার্থক। অর্থাৎ 'ইল্লা' (ব্যতীত) অর্থ এখানে হবে 'লাকিন্না' (কিন্তু), বাক্যের গতিধারা থেকে উদ্বুদ্ধ একটি ধারণাকে বিলুপ্ত করবার জন্য। তবে এখানে এরকম একটি ধারণা জাগতে পারে যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা এরকম হলে দুর্বল ইমানদারদের অবস্থাও তো হবে তথৈবচ। অচল-অক্ষম জীবন তো এক চরম বিড়ম্বনা। এরূপ ধারণা অপনোদনার্থে

তাই বলা হয়েছে— যারা যৌবনে নিয়মিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, তারা বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে গেলেও জারী থাকবে তাদের পুণ্যার্জনের খতিয়ান। জুহাক বলেছেন কথাটির অর্থ— পুণ্যকর্ম সম্পাদন ব্যতিরেকেই তারা তখন পেতে থাকবে পুণ্য।

আউফির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর সময়ে কেউ কেউ উপনীত হয়েছিলেন অতি বার্ধক্যে। তাঁদের স্মৃতিশক্তি যখন লোপ পেতে থাকলো, তখন তাঁরা রসুল স. সকাশে অনুযোগ উপস্থাপন করলেন। তিনি স. তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন, আগে তোমরা যে সকল পুণ্যকর্ম নিয়মিত করতে, সে সকল পুণ্যকর্মের প্রতিদান তোমরা পেতেই থাকবে, যেহেতু তোমরা সেগুলো করতে এখন অসমর্থ।

ইকরামা সূত্রে আসেম আহওয়াল বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ইল্লাল্ লাজীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুস সলিহাত' আয়াতের মর্মার্থ— যারা কোরআন তেলাওয়াত করে, তারা অসহায়, অকর্মণ্য ও বিপর্যস্ত বয়সে উপনীত হয়ই না। জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, বিশ্বাসীদের পুণ্যকর্ম করবার সামর্থ্য নেই— এরকম বয়সে পৌঁছলেও তাদের পূর্বাহ্নের পুণ্যকর্মগুলোর প্রতিদান লেখা হতেই থাকে। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান দৈহিকভাবে বিপদাপন্ন হয়, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন, সে স্বাস্থ্যবান থাকার সময় যে সকল আমল করতো, সে সকল আমলের পুণ্য তার আমলনামায় লিখে যেতে থাকো। হজরত ওমর থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। দু'টো হাদিসই সংকলন করেছেন বাগবী। হজরত আবু মুসা থেকে বোখারীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ অলংকারশাস্ত্রের রীতি হচ্ছে— সম্বোধিত জন যখন কোনো বিষয়ে প্রত্যাখ্যানপ্রবণ হয়, তখন তার প্রত্যাখ্যানের স্বরূপ বুঝে বক্তব্যকে করা হয় গুরুত্ববহ অব্যয়বিশিষ্ট, যাতে তা প্রতিপন্ন হতে পারে সঠিক প্রমাণ হিসেবে। আর প্রত্যাখ্যানের কোনো ইঙ্গিত যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে ব্যবহার করা হয় সাদা মাটা বাক্য। মানুষ জানে, সে একটি সুন্দর সৃষ্টি। আবার একথাও জানে যে, জরা-ব্যাধি-অসহায়ত্ব-বার্ধক্য এ সকলকিছুই তার ললাটলিখন। তৎসত্ত্বেও এখানে এমন কী ঘটলো, যার কারণে আল্লাহ্পাক উপস্থাপন করলেন শপথসূচক ও গুরুত্বজ্ঞাপক অব্যয় 'লাম'? আর 'ক্বদ' এর মতো নিশ্চিতার্থক শব্দ দ্বারা তাকে করলেন আরো অধিক তাৎপর্যপূর্ণ?

নিরসন ঃ প্রামাণ্য বিষয়কে অস্বীকার করার অর্থ প্রমাণকেই অস্বীকার করা। এদের একটি আর একটিকে অবধারিত করে। মানুষের পার্থিব জীবনের এই বিবর্তন তাদের পরবর্তী পৃথিবীর জীবন এবং তাদের প্রতিফল-প্রতিদান প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমতাবস্থায় কেউ যদি তার পরবর্তী পৃথিবীর জীবনকে অস্বীকার করে তবে বুঝতে হবে, সে এই পৃথিবীর বাস্তব জীবনকেও অস্বীকারকারী। সে অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যকে তো অতীব গুরুত্ববহ করতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'সুতরাং এর পর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে'? একথার অর্থ— হে অপরিণামদর্শী মানুষ! তোমার নিজের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বসম্পৃক্ত সকলকিছুই মহাসত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও বলো, কী এমন ঘটলো, যাতে করে তুমি অতি অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে অস্বীকার করে বসলে? অথবা মর্মার্থ হবে— বলো, কীসে তোমাকে মিথ্যাবাদী বানালো, যাতে করে তুমি অস্বীকার করে বসলে মহাপুনরুত্থান, মহাসমাবেশ, মহাপ্রতিদান এসকলকিছুকে? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে এতোটুকু জাগ্রত করবার অবকাশও কি তুমি পেলে না? কেনো একথাটি ভেবে দেখলে না যে, যিনি তোমাকে সুন্দরতম পরিকাঠামো সহকারে সৃষ্টি করলেন, তারপর জরা-ব্যাধি-বার্ধক্য দিয়ে তোমাকে করে ফেললেন ক্রমশঃ অকর্মণ্য, তিনি কি সক্ষম নন, তোমার মৃত্যু ঘটানোর পর তোমার পুনরুত্থান ঘটাতে? যথাসময়ে তোমার কর্মকাণ্ডসমূহের যথাপ্রতিফল প্রদান করতে?

এখানকার প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও প্রতাপপ্রদর্শনমূলক। অর্থাৎ সাবধান! প্রতিফল দিবসকে মান্য করে এখান থেকেই মহা সাফল্যলাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। অন্যথায় বিপদগ্রস্ত হবে। অথবা এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সরাসরি রসুল স.কে। আর 'মা' অব্যয়টি এখানে না-সূচক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! কোনোকিছুই আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। কিংবা 'মা' অব্যয়টি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এমতাবস্থায় মর্মার্থ হবে— আপনাকে যে তারা অমান্য করে, তার সপক্ষে তাদের কাছে কী কোনো প্রমাণ আছে? নিশ্চয়ই নেই। তাহলে তারা কিসের জোরে অস্বীকার করে প্রতিফল দিবসের মতো অবশ্যম্ভাবী বিষয়কে? এরকম কথা বিবৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থাপন করো'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে। আর প্রশ্নটি এখানে বিস্ময়প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! কী বিস্ময়! আপনার সত্যবাদিতার সপক্ষে প্রকৃষ্ট ও প্রতুল প্রমাণপঞ্জী বিদ্যমান থাকার পরেও তারা আপনাকে অসত্যভাষী বলে!

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তদুপরি না-সূচকও। এভাবে এখানে অস্বীকৃতি ও না-সূচকতার সমন্বয়ে সাধিত হয়েছে হ্যাঁ-সূচকতা। আর একারণেই বাক্যটি আগের আয়াতের বাক্যের পরিপোষক ও গুরুত্ব আরোপক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দরতম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যিনি অকৃতজ্ঞদের পরিণত করেন হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে, তিনি কি মানুষসহ তাঁর মহাসৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার ব্যাপারে মহাপ্রাজ্ঞ নন? আর যিনি মহাপ্রাজ্ঞ ও

মহাশক্তিধর, তিনি কি সক্ষম নন পুনরুত্থান সংঘটনে ও যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদানে? নিশ্চয়-ই। অবশ্য-ই। অথবা মুকাতিলের ভাষ্যানুসারে মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্ কি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাধিকারী নন? অবশ্যই, নিশ্চয়ই। তাহলে হে আমার নবী! আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার এখনকার বিব্রতকর অবস্থা সাময়িক। নিশ্চয় আসন্ন প্রতিফল দিবসে আমি আপনার এবং আপনার বিরুদ্ধপক্ষীয়দের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করবো। আপনাকে দান করবো সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো অনন্তকালীন নরকাগ্নিতে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে রসুল স.কে। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অশোভন ও অসমীচীন আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কী করবেন। তারা যে চিরহতভাগ্য। নাহলে কি তারা তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলাকাংখীদের প্রতি এমন অযথার্থ আচরণ করে? অথবা বাক্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি। কিংবা বাক্যটি উপস্থাপিত হয়েছে পূর্বোক্ত বাক্যের নিমিত্তের স্থলে। অর্থাৎ হে মানব জাতি! আমার রসুলের প্রতি অসত্যারোপ করা নিতান্তই অসঙ্গত। মনে রেখো, আল্লাহ্পাক সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। সুতরাং অন্যায় করে তোমরা কিছুতেই পার পাবে না। সংশোধিত না হলে যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে শায়েস্তা করবেনই। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি এই সুরার শেষ আয়াত 'আ লাইসাল্লহু বি আহ্কামিল হাকিমীন' পাঠ করবে, সে যেনো বলে 'বালা ওয়া আনা আলা জালিকা মিনাশ শাহিদীন' (আর হ্যাঁ, আমিও এর একজন সাক্ষ্য-দাতা)। হজরত বারা বলেছেন, রসুল স. এক সফরে ইশার নামাজ পাঠ করলেন। তখন নামাজের এক রাকাতে তিনি স. পাঠ করলেন সুরা তীন। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা আ'লাক

মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানিতে রয়েছে ১৯টি আয়াত।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় 'ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল লাজী খলাক্ব' সুরা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাও এ ব্যাপারে একমত। অর্থাৎ সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই সুরার ১ থেকে ৫ সংখ্যক আয়াত।

মাতামহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুল স. এর প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির সূচনা ঘটে সত্যস্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন, তা প্রতিভাত হতো আদিগন্ত বিস্তারিত উষার আলোকরশ্মির মতো। অর্থাৎ তিনি যা দেখতেন, তা সত্যে পরিণত হতো। এর কিছুকাল পর থেকে তাঁর কাছে নির্জনবাস প্রীতিপ্রদ

হয়ে ওঠে। প্রায়শই তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। প্রতিবার কয়েকদিনের আহার্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন তিনি। মহাপুণ্যবতী খাদিজা ছিলেন তাঁর এ কাজের একনিষ্ঠ সহযোগিনী। তিনি নিয়মিত তাঁর আহার্য-পানীয়ের যোগান দিতেন। একদিন গুহাভ্যন্তরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর নিকটে প্রত্যাদেশ নিয়ে আগমন করলেন জিবরাইল আমিন। বললেন, পাঠ করুন। তিনি স. বললেন, আমি তো পাঠক নই। তিনি স. নিজ মুখে বলেছেন, তখন জিবরাইল আমাকে বুকে জাড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। আমি নিস্তেজ হয়ে গেলাম। তিনি ছেড়ে দিয়ে বললেন, এবার পাঠ করুন আমি পুনরায় অনীহা প্রকাশ করলাম। তিনি পুনরায় জাড়িয়ে ধরলেন আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে উবে গেলো আমার শক্তি। আবারো বললেন, 'পাঠ করুন। আপনার প্রভুপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন— সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রভুপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন— শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না'।

এরপর আমি প্রত্যাবর্তন করলাম স্বগৃহে। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছিলো। কাঁপছিলো বুক। খাদিজাকে ডেকে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। সে আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো। কিছুক্ষণ পর যখন আমি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম, তখন তাকে খুলে বললাম সবকিছু। বললাম, মনে হয় এবার আমার মৃত্যু ঘটবে। সে বললো, না, তা কখনোই হতে পারে না। আপনি বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর করে দেন, দান করেন এতিম, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদেরকে। একথা বলে খাদিজা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে। ওয়ারাকা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় লিখতে জানতেন। আরবীতে ভাষান্তর করতে পারতেন ইঞ্জিল। তিনি ছিলেন তখন অতি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। খাদিজা তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন। ওয়ারাকা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, এতো সেই নামুস, যাকে আল্লাহ্ পাঠাতেন নবী মুসার নিকট। আক্ষেপ! এখন যদি আমার যৌবনকাল থাকতো, তাহলে মোহাম্মদকে যখন তার স্বজাতি বহিষ্কার করবে, তখন আমি দাঁড়াতে পারতাম তার সহযোগী হিসেবে। আমি বললাম, কী বলছেন আপনি? আমার স্বজাতি কি আমাকে দেশান্তর করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি যা এনেছো তার জন্যই তারা তোমার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সকল মহাবাণীর বাহককে এরকমই দুঃখ-যাতনা ভোগ করতে হয়। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি, তবে আমি অবশ্যই একান্ত পক্ষ অবলম্বন করবো তোমার। এর কিছুদিন পরেই তিনি পরলোক গমন করলেন। এদিকে প্রত্যাদেশপ্রবাহও গেলো বন্ধ হয়ে।

অনেকের মতে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সুরা মুদ্দাছ্ছির। সুরা মুদ্দাছ্ছিরের তাফসীরে আমরা এ সম্পর্কে আলোকপাতও করেছি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সর্বাগ্রে অবতীর্ণ হয় সুরা ফাতিহা। কেননা বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ

করেছেন, তখন মাতা মহোদয়া খাদিজা হজরত আবু বকরকে ডেকে বললেন, আতীক! আপনার বন্ধুকে নিয়ে ওয়ারাকার কাছে যান। হজরত আবু বকর তাই করলেন। রসুল স. বলেছেন, আবু বকর আমাকে ওয়ারাকার কাছে নিয়ে গেলো। আমি তাঁকে বললাম, আমি নির্জনে থাকলেই ডাক শুনি, মোহাম্মদ! মোহাম্মদ! এরকম ডাক শুনলেই আমি পালিয়ে আসি। ওয়ারাকা বললেন, এরকম কোরো না। ডাক শুনতে পেলে থেমে যেয়ো। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করো। যা শুনতে পাও, তা এসে আমাকে জানিয়ো। এরপর একদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম, মোহাম্মদ! আমি দাঁড়ালাম। শুনতে পেলাম 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম— আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন......'শেষ পর্যন্ত। এরপর আমাকে বলা হলো, বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্।

প্রথমোক্ত বর্ণনাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। বাগবী বলেছেন, ওইটাই সঠিক। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জমহুর আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। আর সুরা মুদ্দাছ্ছিরকে প্রথম অবতীর্ণ সুরা বলা হয়েছে একারণে যে, প্রত্যাদেশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সুরা মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ হয়েছিলো সর্বপ্রথমে। আর সুরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সুরা বলার কারণ হচ্ছে, সর্বপ্রথম একবারে পুরো সুরা অবতীর্ণ হয়েছিলো এই সুরা ফাতেহা-ই। অথবা বলা যেতে পারে, সুরা মুয্যামমিল ও সুরা মুদ্দাছ্ছিরের পর সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় সুরা ফাতিহা।

রসুল স. হেরা পর্বতের গুহায় কতোদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি হেরা গুহায় এক মাস ইতেকাফ করেছিলাম। আর ওই মাসটি ছিলো রমজান মাস। বর্ণনাটি ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন তাঁর 'চরিতামৃত' গ্রন্থে। যুরকানী বলেছেন, এর অধিক দিনের নির্জনবাসের বিবরণগুলো সঠিক নয়। মুসাওয়ার ইবনে মাসআব বলেছেন চল্লিশ দিনের কথা। কিন্তু বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য।

নবী মুসা যেহেতু তুর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন চল্লিশ দিন, তাই কেউ কেউ বলেছেন রসুল স. এরও হেরা গুহায় চল্লিশ দিন অবস্থান করার কথা। দলিল হিসেবে তাঁরা উপস্থাপন করেন রসুল স. এর একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন আল্লাহ্পাকের সন্তোষ কামনায় সাধনা করবে, তার হৃদয় ও মুখ থেকে নিঃসৃত হবে হেকমতের স্রোতধারা। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া'য় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু আইয়ুব থেকে। কিন্তু হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। আর নবী মুসার সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপন করার ধারণাটিও দুর্বল। কেননা দুই নবীর নবুয়তের প্রেক্ষাপট ও সময়কাল ভিন্ন। তাছাড়া নবী মুসাকেও আল্লাহ্পাক এক মাস তুর পর্বতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বাড়িয়ে দেন আরো দশ দিন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি মুসার অঙ্গীকার নিয়েছিলাম তিরিশ রাত্রির জন্য। এর সঙ্গে পরে যোগ করে দিয়েছিলাম আরো দশ। এভাবে সে পূর্ণ করে ছিলো চল্লিশ রাত্রি'।

‘রসুল স. হেরা পর্বতাভ্যন্তরে কী ধরনের ইবাদত করতেন, তা নিয়ে বিদ্বানগণ মন্তব্য করেছেন অনেক রকমের। কেউ বলেছেন, তিনি স. সেখানে ইবাদত করছিলেন নূহ নবীর শরিয়তানুসারে। কেউ বলেছেন, তিনি স. তখন আরাধনা করতেন ইব্রাহিম নবীর শরিয়ত অনুযায়ী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ঈসা নবীর শরিয়তই ছিলো তাঁর তখনকার উপাসনার ভিত্তি। কিন্তু অভিমতগুলো অসঠিক। কেননা রসুল স. ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মি)। তাই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তিনি স. পাঠ করেছিলেন, একথা বলা যায় না। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি স. তখন সৃষ্টিজগত থেকে আন্তরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়েছিলেন মোরাকাবায়— ধ্যানে, চিন্তা-গবেষণায়।

কুসতুলানী বলেন, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির সময় রসুল স. এর হৃৎকম্প শুরু হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু তা জিবরাইলকে দেখে নয়। কেননা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য ছিলো জিবরাইলের চেয়ে অনেক উচ্চে। আর তাঁর হৃদয়ও ছিলো অত্যন্ত সুদৃঢ়। বরং তখন তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন একথা ভেবে যে, পরম আরাধ্য আল্লাহ্কে ছেড়ে আবার না ভিন্নতর ব্যস্ততার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি স. তখন কাঁপছিলেন নবুয়তের মহান গুরুভার বহনের কথা চিন্তা করে। আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতা জিবরাইল ও মিকাইল উভয়ে মিলে তখন তাঁর বক্ষ বিদারণ করেছিলেন। হৃৎপিণ্ড ধৌত করে দিয়েছিলেন জমজমের পানি দিয়ে। তারপর বলেছিলেন, পড়ুন ....।

একটি বিধান ঃ এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিসমিল্লাহ্ প্রত্যেক সুরার অংশ— কথাটি ঠিক নয়। কিন্তু ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরেশতা জিবরাইল যখন প্রথম আবির্ভূত হলেন, তখন বললেন, মোহাম্মদ! আল্লাহ্ সকাশে আশ্রয় যাচনা করুন। তিনি স. বললেন, ‘আসতাঈজু বিল্লাহিস্ সামীই’ল আ’লীম মিনাশ শাইত্বনির রজীম’। তিনি পুনরায় বললেন, এবার বলুন ‘বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম’। বলুন ‘ইক্বরা বিস্মি রব্বিকাল্লাজী খলাক্ব.......’।

একটি উপযোগ ঃ সুহাইল বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাদেশাগমন বন্ধ ছিলো আড়াই বৎসর। শা’বী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা শুরু হয় রসুল স. এর চল্লিশ বৎসর বয়স থেকে। এরপর থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁর একান্ত সঙ্গী ছিলেন ফেরেশতা ইস্রাফিল। তিনি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। তবে প্রত্যাদেশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তিন বৎসর এভাবে অতিবাহিত হওয়ায় রসুল স. এর নবুয়তের দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত হলেন ফেরেশতা জিবরাইল। এরপর থেকে বিশ বছর ধরে প্রধানত তাঁর মাধ্যমেই নিরবচ্ছিন্ন থাকে প্রত্যাদেশপ্রবাহ।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقۡرَاۡ وَ رَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾

r পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—

r সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে।

r পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত,

r যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—

r শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।

'ক্বিরআত' ধাতুমূলের অনুজ্ঞাসূচক শব্দরূপ ইক্বরা। এর অর্থ— পড়ুন। কর্মপদ এখানে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ কথাটি দাঁড়ায়— পাঠ করুন কোরআন।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিস্‌মি রব্বিক'। এর অর্থ আপনার প্রভুপালনকর্তার নাম নিয়ে। অথবা তাঁর নামের বরকত সহকারে। অথবা বলা যায়, বাক্যটি উল্লেখিত হয়েছে 'ইক্বরা' (পড়ুন) ক্রিয়ার কর্মপদের স্থলে। আর 'বা' অব্যয়টি এখানে সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— আপনি আপনার প্রভুপালনকর্তার নাম পাঠ করুন।

লক্ষণীয়, এখানে 'আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করুন' না বলে বলা হয়েছে 'আপনার প্রভুপালনকর্তার নাম পাঠ করুন'। এরকম করার কারণ এই যে, আল্লাহর সত্তাগত নাম— 'আল্লাহ্‌'। আর 'রব' (প্রভুপালনকর্তা) নামটি গুণবাচক। এখানে এই ইঙ্গিতটি দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌র সত্তার পরিচয় পেতে গেলে প্রথমে পরিচয় পেতে হবে তাঁর গুণাবলীর। আর তাঁর গুণাবলীর মধ্যে 'পালন' গুণটির প্রভাবই অধিকতর প্রকাশ্য এবং ঘনিষ্ঠ। তাই এই গুণটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। আমরা দেখি সৃষ্টি অবক্ষয় প্রবণ, নিত্য-নতুন। আর এই নিত্যনতুনতার সৃজয়িতা ও পালয়িতা তো একজন থাকবেনই, যিনি অনিত্য, অনাদি, অনন্ত, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিবর্তন-রূপান্তরণ থেকে চির পবিত্র। তাই তাঁর পরিচয় পেতে গেলে প্রথমে পরিচয় লাভ করতে হবে তাঁর প্রতিপালন গুণের। তাঁর সত্তার পরিচয় তো লাভ হবে পরে। তবে এ ব্যাপারে সুফী-দার্শনিকেরা পোষণ করেন ভিন্ন মত। তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক পথযাত্রা শুরু করেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জাতের দিকে লক্ষ্য করে। পরমতম সত্তাই তাঁদের পরমতম লক্ষ্য। আর তাঁর সকল গুণের সমাহারও তো তিনিই। তাই এমতো মহান অভিযাত্রায় 'ইসমে জাত' (আল্লাহ্‌) জিকিরই হয় তাদের প্রারম্ভিক অবলম্বন এবং চূড়ান্ত অবলম্বনও হয় ওই আনুরূপ্যবিহীন সত্তা প্রমাণকারী কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌'।

তৈয়বী লিখেছেন, এখানকার 'পাঠ করো' কথাটি সাধারণার্থক। কী পাঠ করতে হবে, সেকথা এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং এখানকার 'আলিফ লাম'কে জাতিবাচক বা পঠনজাতীয় কিছু বলতে হয়। আর 'বিস্‌মি' এর 'বা' অব্যয়টি এখানে সহায়ক হিসেবে বিবেচ্য, অতিরিক্ত হিসেবে নয়। বাক্যটি রসুল স. এর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী 'আমি পাঠক নই' এর জবাব। অর্থাৎ কীভাবে পাঠ করবো? এমতাবস্থায় আয়াতখানির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হ্যাঁ, পাঠ করুন। তবে আপনার নিজস্ব শক্তি ও জ্ঞান সহযোগে নয়, বরং আপনার প্রভুপালয়িতার প্রজ্ঞা ও শক্তি সহযোগে। তৈয়বীর ব্যাখ্যানুসারে 'বিসমি রব্বিকা' (আপনার প্রভুপালকের নামে) বাক্যের 'ইসিম' (নাম) হবে অতিরিক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্ লাজী খলাক্ব' (যিনি সৃষ্টি করেছেন)। বাক্যটি 'রব' বা প্রভুপালনকর্তার বিশেষণ। আর 'রবে'র অর্থ এখানে বিকাশক। কেননা প্রভুপালকত্বের দাবিই হচ্ছে সৃষ্টিকে বিকশিত করা। সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব বা অপূর্ণতা থেকে ক্রমোন্নতির পথে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। 'খলাক্বা' ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে অনুক্ত। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি বস্তুই তাঁর সৃষ্টি। যদি কর্মপদ এখানে উক্ত হতো, তবে তাঁর সৃষ্টিকর্ম হয়ে পড়তো সীমিত। তখন এই ধারণাটির উদয় হতে পারতো যে, অবশিষ্ট সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা হয়তো বা অন্য কেউ। আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এমন এক সৃষ্টি বিদ্যমান, যাদের রয়েছে পঠন শক্তি। এই পঠনশক্তিও তাঁরই সৃষ্টি। অথবা এখানে কর্মপদ অনুক্ত থাকার আর একটি কারণ এই হতে পারে যে— যদিও 'খলাক্বা' ক্রিয়াটি এখানে সকর্মক, তবুও এখানে তা ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক হিসেবে, এমতো অর্থ প্রদান করার জন্য যে, ওই আল্লাহ্ই প্রভুপালনকর্তা, যাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃজন ও উদ্ভাবন। এরকম বিশেষণ অন্য কোনো সত্তার প্রতি প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে'। প্রকাশ্যত বাক্যটি যোগসূত্রহীন একটি নতুন বাক্য। আগের বাক্যের সূত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ কী সৃষ্টি করেছেন? এই সম্ভাব্য প্রশ্নটিরই যেনো জবাব দেওয়া হয়েছে একথা বলে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। আর বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানুষ সৃষ্টি করার বিভিন্ন নিমিত্ত হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—

১. মানুষ গোটা বিশ্বগজতের সংক্ষিপ্তসার। সমগ্র সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, তার সকলকিছুই আছে মানুষের মধ্যে। সে কারণেই বিশ্বজগতকে বলা হয় বৃহৎ বিশ্ব এবং ক্ষুদ্র বিশ্ব বলা হয় মানুষকে।

২. মানুষ সৃষ্টির সেরা। পরমতম সত্তার সত্তা ও গুণবত্তাজাত জ্যোতিসম্পাত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। আল্লাহ্র পরিচয় লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন। আর এই মহাসৃষ্টি সৃজনের উদ্দেশ্যও এই যে, সৃষ্টির নেতা হিসেবে মানুষ লাভ করবে তাঁর পরিচয় (মারেফত)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়কে

আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। একথার অর্থ— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাদের কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, হে আমার নবী! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কোনোকিছুই সৃষ্টি করতাম না। বিকাশ ঘটাতাম না আমার প্রতিপালন কর্মের।

লক্ষণীয়, বর্ণিত হাদিসখানিতে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল শেষতম নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। কেননা তিনিই হচ্ছেন আদম সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অপর এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন, আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভাণ্ডার। চাইলাম পরিচয় প্রকাশ করতে। সেকারণেই আমি সৃষ্টি করলাম এই নিখিলবিশ্ব। উল্লেখ্য, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এখানে বলা হয়েছে কেবল মানুষ সৃষ্টির কথা। কেননা মানুষই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই বিশেষভাবে তাদের আভিজাত্য প্রকাশ করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। তদুপরি সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যে একমাত্র মানব জাতি, সেকথা প্রকাশ করাও আলোচ্য আয়াতের আর একটি উদ্দেশ্য।

শরিয়তের গুরুভার বহনের প্রধান দায়িত্ব মানুষের। আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কর্তব্য কেবল মানুষের উপরে ন্যস্ত। একমাত্র মানুষই পার্থক্য করতে সক্ষম নিজেদের ও অন্যান্যদের অবস্থার। নিজেদের এবং সমগ্র সৃষ্টির আবর্তন-বিবর্তন দৃষ্টে কেবল তারাই আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ সাপেক্ষে নির্ধারণ করতে পারে তাঁর পরিচয় জ্ঞান অর্জনের উপায়।

এরূপ মর্মার্থের সম্ভাবনাও নাকচ করা যায় না যে, প্রথম 'খলাক্বা' ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে উহ্য। অর্থাৎ 'খলাক্বা'কা (তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন)। এ ক্ষেত্রে আবার থেকে যায় একটি সম্ভাব্য প্রশ্নও। তা হচ্ছে, কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে? তার জবাবেই এখানে বলা হয়েছে 'মিন আ'লাক' (আলাক বা শুক্রকণা থেকে)। অধিকন্তু এরকমও বলা যায় যে, প্রথম 'খলাক্বা' ক্রিয়ার কর্মপদ 'মনুষ্যজাতি' এখানে অনুক্ত। আর দ্বিতীয় 'খলাক্বাল ইনসানা' পূর্বোক্ত বাক্যের প্রতি গুরুত্বআরোপক। একই সাথে রহস্যের জটিলতা উন্মোচক। অভিজাত জনের নিকটে বিষয়টিকে হৃদয়গ্রাহী করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। এমনও বলা যায় যে, 'আল ইনসান' (মানুষ) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল রসুল স.কে। আর বিশেষভাবে তাঁর কথা বলার অর্থ, তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রকাশ করা। কেননা তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সম্বোধিত জন।

'মিন আ'লাক্ব' অর্থ আলাক থেকে। অর্থাৎ জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। 'আ'লাক্ব' হচ্ছে 'আলাক্বাতুন' এর বহুবচন। আর 'আল ইনসান' অর্থ যেহেতু এখানে মানব জাতি, সেহেতু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক 'আ'লাক্ব'। উল্লেখ্য, শুক্রবিন্দু অথবা মাটি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে না বলে এখানে বলা হয়েছে 'আ'লাক্ব' (জমাট রক্তপিণ্ড) থেকে। এরকম করা হয়েছে আয়াতের অন্তমিল রক্ষার্থে। অথবা বলা যেতে পারে, মানবসৃজনের বিভিন্ন পর্যায়গুলোর মধ্যে জমাট

রক্তপিণ্ডের পর্যায়টি এমন, যা থেকে অন্যান্য পর্যায়গুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে সহজে। তাই এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে জমাট রক্তপিণ্ডের। কেননা মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। এরপরে মানব দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের বিভিন্ন রূপান্তরণের পর সৃষ্টি হয় শুক্রবিন্দু। ওই শুক্রবিন্দু পরিণত হয় জমাট রক্তপিণ্ডে। রক্তপিণ্ড থেকে হয় গোশতপিণ্ড। গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি। তার উপরে হয় ত্বকের আচ্ছাদন। পরিশেষে তন্মধ্যে ফুৎকার করা হয় আত্মাকে। অবশেষে পরিগঠিত হয় মানুষের জীবন্ত ও পূর্ণ অবয়ব। এ সকলকিছুর মধ্যে রক্তপিণ্ডের অবস্থান প্রায় মাঝামাঝি। এখান থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় উভয় দিকের।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'পাঠ করো, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত'। এখানে 'ইক্বরা' (পাঠ করো) কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্বপ্রদানার্থে, আধিক্য প্রকাশার্থে। প্রথম 'ইক্বরা' ছিলো সাধারণ পাঠের জন্য এবং দ্বিতীয় 'ইক্বরা' প্রচারের নিমিত্ত। অথবা দ্বিতীয় 'ইক্বরা' নামাজে কোরআন পাঠের ইঙ্গিতবহ। অথবা বলা যেতে পারে, প্রথম 'পাঠ করো' ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে, যার অর্থ হবে— পাঠক হও। আর এখানকার 'পাঠ করো' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে প্রথম আয়াতের 'তোমার প্রতিপালকের নামে' কথাটির সঙ্গে। বাক্যটি যোগসূত্রবিহীন একটি নতুন বাক্য হিসেবেও পরিগঠিত। অর্থাৎ রসুল স. যখন বলেছিলেন, আমি তো পাঠক নই, পাঠ করবো কী প্রকারে? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে— কোরআন পাঠ করুন 'বিসমিল্লাহ্' সহকারে। এরূপ মর্মার্থ গ্রহণ করা হলে হজরত জিবরাইলের 'পাঠ করো' কথাটির জবাবে রসুল স. এর বাণী 'মা আনা বি ক্বারী' হবে প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ আমি কি পাঠক?

'ওয়া রব্বুকাল আকরাম' অর্থ আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। 'ওয়াও' এখানে অবস্থাপ্রকাশক। 'রব্বুকা' (তোমার প্রতিপালক) হচ্ছে উদ্দেশ্য। 'আকরাম' হচ্ছে উদ্দেশ্যের বিশেষণ। 'করীম' অর্থ দানশীল। আর 'আকরাম' অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। কেননা তিনি দান করেন কোনো বিনিময় প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক দয়া পরবশ হয়ে, তাঁর বান্দা বাধ্য না অবাধ্য, মুমিন না কাফের, কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ— এ সকলকিছুর পরওয়া না করে। তিনি দান করেন অকাতরে। অবলীলায়। অসংখ্য, অগণিত। অথবা তিনি মাফ করে দেন ক্ষমার যোগ্য অপরাধসমূহকে। কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণযোগ্য পাপের প্রতিশোধও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেন না— সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও। বরং অবকাশ দেন পার্থিব সুখসম্ভোগের। বিদ্বানগণ বলেন, 'আফআ'লু' ও 'ফায়িল' শব্দরূপে গঠিত হয়েছে 'আকরাম' ও 'কারীম'। ক্রিয়াগুলো সমঅর্থসম্পন্ন। 'কারীম' মূলত আল্লাহ্পাকের একটি গুণ (সিফাত)। তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপের কেউ সমকক্ষ নয়। তাই বুঝতে হবে সৃষ্টির মধ্যে পরিদৃষ্ট 'দয়া' 'মায়া' ইত্যাদি রুপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। কেননা সৃষ্টি তাঁরই নাম-গুণাবলীর দর্পণ।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন'। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানকার 'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন' ক্রিয়াটির কর্মপদ রয়েছে অনুক্ত। আর 'কলমের দ্বারা' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ওই অনুক্ত কর্মপদের সঙ্গে। অর্থাৎ বক্তব্যটি দাঁড়াবে 'আ'ল্লামাল খাত্ত্বা বিল ক্বলাম' (আল্লাহ্ কলমের দ্বারা লেখার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন)। কেননা এতে করে আকাশাগত গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে তা টিকে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। মানুষ জানবে যুগ-যুগান্তরের ইতিবৃত্ত, শরিয়তের বিধি-বিধান। শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ হিসেবে এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে কলমের কথা। ফলে লেখনীর গুরুত্ব বেড়েছে অত্যধিক। কেউ কেউ বলেছেন, নবী ইদ্রিসই সর্বপ্রথম লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তিনিই প্রথম লেখক।

আমি বলি, এখানকার 'বিল ক্বলাম' (কলমের সাহায্যে) বাক্যটি সম্পৃক্ত হবে 'আল্লামা' (শিক্ষা দিয়েছেন) এর সঙ্গে। অর্থাৎ তিনি কলমের সাহায্যেই জ্ঞান দান করেছেন। কলমের দ্বারা জ্ঞানদান পদ্ধতিই শিক্ষাদানের যাবতীয় পদ্ধতির মধ্যে অগ্রগণ্য। সেকারণে এই পদ্ধতিটিরই উল্লেখ করা হয়েছে আগে। আর এতো হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অনুপম অনুকম্পা

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও কর্মশক্তি সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রমাণাদি। নবী-রসুলগণের নিকটে প্রেরণ করেছেন 'ওহী' (প্রত্যাদেশ)। আউলিয়াগণের নিকটে 'ইলহাম' (অনুপ্রেরণা)। সাধারণ ও বিশেষ মেধাসম্পন্নদেরকে দিয়েছেন অভাবনীয় জ্ঞান। সুবিদিত বার্তা সহযোগে দান করেছেন পারস্পরিক অবহিতি। এ সকল সূত্র থেকে মানুষ আহরণ করতে পারে এমন জ্ঞান, যা সে পূর্বে জানতো না।

লক্ষণীয়, ইতোপূর্বের 'আল্লাজী' (যিনি) এবং 'আলআক্রাম' (মহামহিমান্বিত) পদদ্বয়কে যদি 'রব্বুকা' (তোমার প্রভুপালনকর্তা)র বিশেষণ ধরে নেওয়া হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি হবে বিজ্ঞপ্তিমূলক। আর যদি পূর্বোক্ত বাক্যটিকেই বিধেয় ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হয়, এই বাক্যটি তার অনুবর্তী (বদল)। তবে আগের বাক্যে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে কলমের ব্যবহারের মাধ্যমে, আর এ বাক্যে বলা হয়েছে এমন জ্ঞান দানের কথা, যা কলমের গণ্ডিবহির্ভূত। অর্থাৎ এই জ্ঞান হচ্ছে বিশেষ ধরনের জ্ঞান। এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে আর একটি জগত থেকে, যা লেখনীর আওতাবহির্ভূত। এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, মানুষ জ্বিন ও ফেরেশতাকে জ্ঞান দান করা হয় ওই কলম দ্বারাও, যে কলম সকল কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে লওহে মাহফুজে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ নিরস-সরস এমন কিছু নেই যার কথা লওহে মাহফুজের লিপিতে নেই। কিন্তু একথাটিও স্মরণে রাখতে হবে যে, কেবল মানুষকে দেওয়া হয়েছে এরও অধিক কিছু জ্ঞান, যা লওহে মাহফুজের

লিপিতেও নেই। এ জন্যই এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আর আল্লাহ্ আদমকে শিখিয়ে দিলেন সকল কিছুর নাম’। বলা বাহুল্য, এই নামগুলো লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিলো না। যদি থাকতো, তবে ফেরেশতাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা একথা বলতেন না যে ‘এ সকল কিছু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই’। অতএব বুঝতে হবে, আল্লাহ্পাকের তত্ত্বজ্ঞান অর্জিতব্য নয়। অর্থাৎ কেবল চেষ্টা করলে তা অর্জন করা যায় না। বরং এই জ্ঞান হচ্ছে সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান, যা পরম দয়ালু দাতার অভাবনীয় করুণা। লওহে মাহফুজে এই জ্ঞানের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকতে পারেই না। কলমের সাধ্য নেই যে সে এই জ্ঞান তার লিপিরেখায় আটকে রাখে। বরং কলম তো এই জ্ঞানের একটি শাখা মাত্র। জনৈক কবির কবিতায় বিষয়টি বিধৃত হয়েছে এভাবে— ‘এই পৃথিবী ও মহাপৃথিবীর সকল জ্ঞান, কলম আর সুরক্ষিত ফলক, সে তো তোমার মহাজ্ঞানের এক কণা’।

আবার এরকমও বলা যায় যে, ‘ওয়া রব্বুকাল আকরাম’ বাক্যটি ‘ইক্বরা’ বাক্যের কর্তৃপদীয় সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক। রসুল স. যখন ‘পাঠ করো’ কথাটির প্রেক্ষিতে বললেন ‘আমি তো পাঠক নই’ তখন তাঁকে বলা হলো— আপনি ওই মহামহিম সত্তার শরণ গ্রহণ করে পাঠ করুন, যিনি জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে। আদম ও অন্যান্য নবীকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা তাঁরা জানতেন না। তিনিই তাঁর অপার মহিমার বলে আপনাকে পাঠক হতে দিবেন, যদিও আপনি পাঠক নন। মর্মার্থ এমনও হওয়া সম্ভব যে— ‘মানুষ’ অর্থ এখানে স্বয়ং রসুল স.। তিনি স. বার বার বলতে লাগলেন, আমি পাঠক নই। আর হজরত জিবরাইল বার বার তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। তিনি স. ক্রমশ হয়ে পড়লেন স্বশক্তিচ্যুত। এভাবে তৃতীয়বার আল্লাহ্পাক আদি-অন্তের জ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিলেন তাঁর হৃদয়াভ্যন্তর। কেননা তিনি তো তাঁর বান্দাগণের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের স্রষ্টা। সেহেতু তিনি অবশ্যই করতে পারেন জ্ঞানবিহীনকে জ্ঞানী এবং অপাঠককে পাঠক। এর পরেই তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর বিশেষ অনুকম্পার কথা। বললেন, ‘শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না’। অন্য এক আয়াতেও কথাটি বলা হয়েছে এভাবে ‘আপনি যা জানতেন না, তিনি আপনাকে তা জানিয়েছেন’।

একটি সংশয় ঃ জ্ঞান দান করা হয় তো অজানা বিষয়েরই। যা জানা আছে, তার জ্ঞান দান করার বিষয়টি অযৌক্তিক নয় কি? তাহলে এখানকার ‘যা সে জানতো না’ কথাটির সার্থকতা কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ মানুষ তো মূলত অক্ষম, অসহায়, অজ্ঞ। সুতরাং আত্মগরিমা কি তার সাজে? নিজেকে জ্ঞানহীন ভাবা এবং প্রাপ্ত জ্ঞান যে আল্লাহ্তায়ালার নিছক দয়ার দান— একথা মনে করার মধ্যেই তো রয়েছে তার কৃতজ্ঞতার আভাস। সার্থকতা তো তার এখানেই।

‘মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, হজরত জিবরাইল রসুল স. এর কাছে এলেন অনিন্দ্যসুন্দর আকৃতি ধরে। বললেন, মোহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আপনাকে তিনি মনোনীত করেছেন জ্বিন ও মানব জাতির

রসুল হিসেবে। 'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই' এই মহাবাণীর প্রতি আপনি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানান। এরপর তিনি মৃত্তিকায় পদাঘাত করলেন। উচ্ছিত হলো ঝর্ণা। ঝর্ণার পানিতে ওজু করলেন তিনি। রসুল স.কেও বললেন তাঁর অনুকরণ করতে। রসুল স.ও তাই করলেন। ওজু শেষে হজরত জিবরাইল রসুল স.কে ডান পাশে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। সম্পন্ন করলেন দুই রাকাত নামাজ। এভাবে তাঁকে নামাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে হজরত জিবরাইল উধাও হয়ে গেলেন দূর অম্বরের ওধারে। রসুল স. বাড়ির পথ ধরলেন। পথের দু'পাশের তরুলতা, পাহাড় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো— আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লহ। ঘরে ফিরে তিনি স. তাঁর মহাপুণ্যবতী ভার্যাকে খুলে বললেন সব। আহবান জানালেন মহাবাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করলেন মহাপুণ্যবতী খাদিজা। তিনিও রসুল স. এর কাছ থেকে শিখে নিলেন ওজু ও নামাজ। ওই সময় ফরজ নামাজ ছিলো দুই রাকাতই। পরে যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়, তখন জোহর, আসর ও ইশার নামাজকে করা হয় চার রাকাত, মাগরিবকে তিন রাকাত এবং ফজর রয়ে যায় দুই রাকাতই। আর মুসাফির অবস্থায় চার রাকাত নামাজগুলিকে করা হয় দুই রাকাত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে অন্য কোনো নামাজ ফরজ ছিলো কিনা সে সম্পর্কে রয়েছে মতপ্রভেদ। কেউ কেউ বলেছেন, তখন ফরজ ছিলো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ। অর্থাৎ ফজর ও আসর। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. মেরাজের পূর্বেও নামাজ পাঠ করতেন এবং তাঁর অনুসরণে নামাজ পাঠ করতেন সাহাবীগণও। তিনি আরো লিখেছেন, রসুল স. এর প্রথম দায়িত্ব ছিলো আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করবার জন্য আহ্বান। দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিলো অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। এর পরের দায়িত্ব ছিলো নিশীথের নামাজ। সুরা মুয্যাম্মিলের প্রথম দিকে উল্লেখিত নিশিজাগরণ। পরের দিকের আয়াতগুলোতে আবার এই গুরুদায়িত্ব থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়। এরপর যখন তাঁর মেরাজ সংঘটিত হয়, তখন ফরজ করা হয় পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ। সঙ্গে সঙ্গে রহিত হয়ে যায় রাত্রি জাগরণ ও নিশীথের নামাজের অপরিহার্যতা। আর উপরে বর্ণিত হাদিস অনুসারে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে ফরজ করা হয়েছিলো ওজু।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল একবার জনগণকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি কখনো মোহাম্মদকে মাটিতে মাথা ঘষতে দেখেছো (সেজদা করতে দেখেছো)? তারা বললো, হ্যাঁ। সে বললো, আমি যদি তাকে এরকম করতে দেখি, তবে তার মস্তক পদদলিত করবো। ধূলিধূসরিত করবো তার মুখমণ্ডল। তার এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতসমূহ। বলা হয়—

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۙ﴿۶﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ﴿۷﴾ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ؕ﴿۸﴾ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ﴿۹﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ﴿۱۰﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ﴿۱۱﴾ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ﴿۱۲﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ﴿۱۳﴾ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ﴿۱۴﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ۬ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ﴿۱۵﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ﴿۱۶﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ﴿۱۷﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ﴿۱۸﴾ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩﴿۱۹﴾

q বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে,

q কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।

q তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।

q তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়

q এক বান্দাকে— যখন সে সালাত আদায় করে?

q তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি, যদি সে সৎপথে থাকে

q অথবা তাক্ওয়ার নির্দেশ দেয়,

q তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়,

q তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?

q সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া—

q মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।

q অতএব সে তাহার পার্শ্চরদিগকে আহ্বান করুক!

q আমিও আহ্বান করিব জাহান্নামের প্রহরীদিগকে।

q সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না এবং সিজ্দা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

প্রথমে বলা হয়েছে 'কাল্লা'। এর অর্থ কক্ষণো না। অর্থাৎ যারা মহাসত্যের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে চায়, তারা কখনো সফল হবে না। এভাবে এখানে গতিরোধ করতে চাওয়া হয়েছে আবু জেহেলের অপবচনের, যদিও তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অথবা 'কাল্লা' অর্থ এখানে— বস্তুত, মূলত। আর 'ইন্নাল ইনসানা লা ইয়াত্বগা' অর্থ মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে। এখানে 'মানুষ'

অর্থ গোটা মানব জাতি হলেও এর প্রকৃত অর্থ হবে মানুষের মধ্যে কিছুসংখ্যক দুরাচার। অর্থাৎ আবু জেহেল ও তার মতো চিরহতভাগ্যরা। অর্থাৎ তাদের মতো হতভাগ্যরা স্বভাবতই সীমালংঘক।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে'। একথার অর্থ— সে নিজেকে বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে বেপরোয়া মনে করে বলেই এমন দুর্বিনীত হতে সাহস পায়। বাক্যটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি নিমিত্তপ্রকাশক 'লাম' অব্যয়। অথবা বাক্যটির আগে উহ্য রয়েছে 'ওয়াক্ত' (সময়, কাল) শব্দটি। তার বিত্তসম্পদগুলোই তার চোখে সব সময় ভাসে, এমতাবস্থায় অবাধ্যতা দর্শনের সময়টা বিবেচিত হবে ক্রিয়ার কালাধার হিসেবে। অর্থাৎ সে কারণেই সে উচ্চারণ করতে পারে এরকম অবাধ্যতাপ্রকাশক বাক্য। কিংবা এখানে 'দর্শন' অর্থ হৃদয়ের দর্শন, চোখের দর্শন নয়। অর্থাৎ সে যে সম্পদপতি, ভিতরে ভিতরে সে কথা সে এতোটুকুও বিস্মৃত হয় না। উল্লেখ্য, আবু জেহেল যে সম্পদশালী, সে কথা সে প্রকাশ করতে ভুলতো না। পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, বাহন সবকিছুতেই সে পার্থক্য বজায় রাখতো সাধারণ জনতার নিকট থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত'। বাক্যটি শাসনমূলক, ভীতিপ্রদর্শক, যোগসূত্রবিহীন, প্রারম্ভিক এবং একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি ছিলো— এ ধরনের সীমালংঘনকারীদের পরিণাম তাহলে কী? এমতো প্রশ্নের জবাবেই যেনো এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌র কাছে তো তাদেরকে ফিরে আসতে হবেই। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই দিবেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বাধা দেয় (৯) এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে' (১০)।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন রসুল স. নামাজ পাঠ শুরু করলেন। আবু জেহেল তাঁকে বাধা দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'তুমি কি দেখেছো' থেকে 'মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ' পর্যন্ত (আলোচ্য সুরার ৯ থেকে ১৬ সংখ্যক আয়াত)।

এখানে 'তুমি কি দেখেছো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক, নিশ্চিতার্থক। উদ্দেশ্য এই যে, সম্বোধিত জন যেনো স্বীকার করেন, হ্যাঁ, তিনি দেখেছেন। অথবা প্রশ্নটি বিস্ময়সূচক, দেখা না দেখার কথা এখানে নেই। দর্শিত বিষয় সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করাই এখানে উদ্দেশ্য। এখানে দেখা অর্থ মনের দেখা, বা মনে রাখা। 'বাধা দেয়' অর্থ আবু জেহেল বাধা দেয়। আর 'এক বান্দা' ও 'সালাত আদায় করে' অর্থ রসুল স. নামাজ পাঠ করেন।

লক্ষণীয়, প্রথমে রসুল স.কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে 'তুমি কি দেখেছো' বলে এবং পরে তাঁর কথা বলা হয়েছে পরোক্ষভাবে 'এক বান্দাকে, যখন সে সালাত পাঠ করে' বলে। এরকম করা হয়েছে রসুল স. এর দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা

প্রকাশার্থে। আল্লাহ্র দাসত্বের মধ্যেই প্রকাশ পায় মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। আর দাসত্বের পরম প্রকাশ ঘটতে পারে কেবল নবী-রসুলগণের মধ্যে। রসুল স. হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ দাসত্ব তো প্রকাশ পাবে তাঁর সুমহান স্বভাবেই। তাঁর এই সুমহান স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এমতো বিশেষ বাকভঙ্গি। আর এভাবে এখানে এই বিষয়টিও প্রমাণ করা হয়েছে যে তাঁর কাজে যারা বাধা দেয়, তারা যে চিরহতভাগা, তা বলাই বাহুল্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি লক্ষ্য করেছো কি, যদি সে সৎপথে থাকে (১১) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়' (১২)। এখানেও 'তুমি কি লক্ষ্য করেছো' বলে পুনর্বার সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কেই। অর্থাৎ হে আমার নবী, আপনি তো জানেনই, যিনি নামাজ পাঠ করেন, তিনি যদি হন সৎপথের পথিক এবং মানুষকে আহ্বান জানান আল্লাহভীরু হতে, তবে তাঁর কাজে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, তাদেরকে তো মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবেই। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়।

এখানে আরো প্রমাণিত হয় যে, আবু জেহেল বাধা দিয়েছিলো দু'টি কাজে— নামাজ পাঠে ও ধর্মপ্রচারে। কিন্তু এর আগের আয়াতে (৯, ১০) বলা হয়েছে কেবল নামাজে বাধা দেওয়ার কথা। পরে দু'টির উল্লেখ করা হবে বলেই আগে একটির উল্লেখকে মনে করা হয়েছে যথেষ্ট। অথবা কেবল নামাজে বাধা সৃষ্টি করার অর্থই নামাজ ও ধর্মপ্রচারের বাধা সৃষ্টি করা। কিংবা 'বান্দাকে বাধা দেয়' অর্থ আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন বান্দার সবকিছুকেই প্রতিহত করতে চায়। আর ওই সময় রসুল স. এর প্রতি দায়িত্ব ছিলো ওই দুইটিই— আল্লাহ্র একত্বার্থক বিশ্বাসের প্রচার ও নামাজ পাঠ।

এখানকার 'ইন কানা' (যদি সে) কথাটি শর্তযুক্ত। এর জবাব রয়েছে এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ রসুল স. স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হেদায়েতের উপর। তাই তাঁর মহা আহ্বানও প্রতিষ্ঠিত সত্যের উপরে। সুতরাং তাঁর কাজে সে বাধা দেয় কেনো? সে কি জানে না, তাঁর প্রতিপক্ষ যে হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য? আর 'আরাআইতা' ক্রিয়ার কর্মপদ থাকে দু'টি। এখানকার শর্তযুক্ত বাক্যটি ওই দু'টি কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত। পরের 'আরাআইতা' ক্রিয়ার ব্যাপারটি একই রকম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি লক্ষ্য করেছো কি, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৩) তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন' (১৪)? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনিই বলুন, যে সত্য পথের পথিককে বাধা দেয়, তার প্রতি অসত্যারোপ করে এবং সত্যের আহ্বানের প্রতি হয় বিমুখ, সে কি কখনো আল্লাহ্র শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে? সে তো জানে না, আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং সে কখনোই তার অপরাধ গোপন করতে পারে না। ফলে মর্মন্তুদ শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর মাধ্যমে আবু জেহেল ও তার মতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছে হুমকি ও ভীতি। আর 'আন্নাল্লহা ইয়ারা' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ দেখেন, জানেনও। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক

ভালো করেই জানেন ও দেখেন, কে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং কে সত্যপ্রচারের প্রতিবন্ধক, মিথ্যাআরোপক এবং সত্যবিমুখ। আর এ বিষয়টিও তাঁর অবহিতি ও অবলোকনের অন্তর্ভুক্ত যে, তাঁর এই বিশেষ বান্দা শেষতম, শ্রেষ্ঠতম নবী সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আর তিনি মানুষকে নিরন্তর মহাসত্যের দিকে আমন্ত্রণও জানিয়ে চলেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র অবহিতি ও দর্শনের অবশেষ পরিণতি এই যে, তাঁর প্রিয়তম দাস ও সর্বশেষ বাণীবাহক হবেন পুরস্কৃত এবং তাঁর শত্রু আবু জেহেল ও তার মতো হতভাগারা হবে তিরস্কৃত। যথাক্রমে জান্নাত ও জাহান্নামই হবে তাদের নিজ নিজ আবাসস্থল। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার 'তুমি লক্ষ্য করেছো কী' কথাটির অর্থ হবে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি কি জানেন, কী ভয়ানক দুর্গতি হবে আবু জেহেল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের?

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে পরপর চার বার উল্লেখ করা হয়েছে 'আরাআইতা' (তুমি কি লক্ষ্য করেছো) কথাটি। এর মধ্যে প্রথম তিনবার কথাটি বলা হয়েছে রসুল স.কে সম্বোধন করে। আর শেষ সম্বোধনের লক্ষ্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। এরকম করা হয়েছে এখানে ন্যায়বিচারের নিরীখ প্রতিপালনার্থে। বিচারক যেমন বাদী-বিবাদী দু'জনের দিকেই লক্ষ্য করে কথা বলেন, এখানকার বিষয়টি সেরকম।

শায়েখ জালালউদ্দিন মাহাল্লী বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সম্বোধিত জনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, কী বিস্ময়ের কথা! একজন স্বয়ং সত্যাধিষ্ঠিত, অন্যকেও সত্যের দিকে আহ্বান করার কাজে রত, অথচ তার কাজে ও নামাজে আর একজন অনর্থক প্রতিবন্ধকতা রচনা করছে। ভাবছে, এতো বড় অপরাধ করেও সে পার পেয়ে যাবে। অথচ সে জানে না, আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং তিনি যথাসময়ে তার অপকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দিবেন। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! দেখুন, আমি আবু জেহেলকে সত্যদ্রোহী ও সত্যবিমুখ করে রেখেছি। সে যদি সত্য পথের পথিক হতে চাইতো, তবে তা তার জন্য হতো কতোইনা কল্যাণকর। কিন্তু সে এতো বড় সৌভাগ্যলাভের যোগ্যই নয়। তাই আমি তাকে সত্যাভিমুখী হবার সামর্থ্যই দেইনি। আমি যথাসময়ে তাকে শায়েস্তা করবোই। প্রবেশ করাবো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। সে তো জানে না, আমি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। এখানে 'তুমি কি লক্ষ্য করেছো' তিনবার বলে এবং দু'টি শর্তযুক্ত বাক্য 'যে বাধা দেয়' বলে প্রকাশ করা হয়েছে সীমাহীন বিস্ময়।

বায়যাবীর ব্যাখ্যা এরকম— হে আমার একান্ত মনোনীত বাণীবাহক! আপনিই বলুন, এই যে লোকটি অনর্থক আপনার নামাজে বাধা দিচ্ছে, সেটা কি কল্যাণকর কোনো কাজ? সে যে ঘোর প্রতিমাপ্রসক্ত এবং সেই অপবিত্রতার দিকেই সে সকলকে ফিরে যেতে বলে, তা কি যুক্তিযুক্ত, না শোভন? সে তো মিথ্যাকেই সত্য বলে

গ্রহণ করে এবং সত্যকে বলে মিথ্যা। তার কি জানা নেই, তার সৃজয়িতা ও পালয়িতা আল্লাহ্ সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন? জানেন, কে পথপ্রাপ্ত এবং কে পথভ্রষ্ট? সে কী জানে, তার পরিণতি হবে কতো ভয়ংকর?

বাগবী লিখেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— হে আমার পরম প্রিয়ভাজন রসুল! দেখুন, আমার বান্দা যখন আমার পরিতোষ কামনায় নামাজে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাঁকে বাধা দেয় যে, সে কতোইনা মহাপাতক! আর আমার বান্দা কতোইনা সজ্জন, সুশীল, যিনি নিজে সুপথের পথিক, আবার অন্যকেও আহ্বান জানান সুপথের পথিক হতে। অথচ মহাপাতকটি জানেই না, আল্লাহ্ তার সকল কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছেন। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি সে পাবেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সাবধান, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবো, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে (১৫) মিথ্যাচারী, পাপীদের কেশগুচ্ছ' (১৬)। একথার অর্থ— না, আর তাকে বাড়তে দেওয়া হবে না। সে সংযত না হলে, পুনঃপুনঃ তার মহাপাপের পুনরাবৃত্তি ঘটালে আমি তাকে অবশ্যই ধরে ফেলবো। আমার হুকুমে আমার ফেরেশতারা ওই মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠের মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলবে জাহান্নামের আগুনে।

এখানকার 'কাল্লা লাইল্ লাম ইয়ান্তাহি' (সাবধান! সে যদি বিরত না হয়) কথাটি শাব্দিকভাবে শপথের জবাব এবং অর্থগতভাবে শর্তের পরিণতি। আর তাগিদযুক্ত 'নূন' 'তানভীন' রূপে লেখার রীতিটিও সুপ্রচল। 'সাফউন' অর্থ কোনো বস্তুকে ধরে সজোরে টান দেওয়া। এভাবে এখানকার 'লানাস্ফাআ'ম্' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবো নরকে। 'আন নাসিয়্যাহ্' অর্থ মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ। আর এখানকার 'কাজিবাহ্ (মিথ্যাবাদী) ও 'খত্বিআহ্' (পাপিষ্ঠ) শব্দদ্বয় 'নাসিয়্যাহ্' (কেশগুচ্ছ) পদের রূপকার্থক বিশেষণ। আর এই 'নাসিয়্যাহ্' আগের বাক্যের 'নাসিয়্যাহ্' এর অনুবর্তী।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'অতএব সে তার পার্শ্বচরদেরকে আহ্বান করুক'।

তিরমিজি ও ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আবু জেহেল এসে বললো, মোহাম্মদ! আমি কি তোমাকে এখানে নামাজ পড়তে নিষেধ করে দেইনি? রসুল স. রাগান্বিত হলেন। বললেন, তুমি নিজেকে কী মনে করো। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমার বিরুদ্ধে এই পাহাড়-প্রান্তর ভরে দিবো অশ্বারোহী সৈন্য-সামন্ত দিয়ে।

'নাদি ' অর্থ ওই উঁচু স্থান যেখানে গোত্রের লোকেরা সমবেত হয়ে পরামর্শ সভা বসায়। শব্দটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি পদ 'আদল' (সভাসদবর্গ) এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— ওহে নরপশু! তোমার জাত্যাভিমানে যদি তুমি এতোই মদগর্বিত হও, তবে ডাকো তোমার সকল সহযোগীকে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আমিও আহ্বান করবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে'। একথার অর্থ— তোমার দলবলকে যদি তুমি ডেকে আনো, তবে আমিও ডেকে আনবো দোজখের প্রহরীদেরকে, যারা তোমাকে এবং তোমার সকল অনুচর-পার্শ্বচরদেরকে এক সঙ্গে এক মুহূর্তে দোজখে নিক্ষেপ করতে সক্ষম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যাবানিয়্যাহ্' অর্থ দোজখের প্রহরীরা অথবা দোজখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতারা। জুজায বলেছেন, কঠিন চেহারার দুর্দান্ত প্রকৃতির ফেরশতাদেরকে বলা হয় 'যাবানিয়্যাহ্'। 'যাবানিয়্যাহ্' বহুবচন 'যাবান' এর, অর্থ— প্রতিরোধ করা। অর্থাৎ যে কোনো আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম ফেরেশতাবর্গ। বাক্যটিতে একটি শর্ত রয়েছে অনুক্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, যদি আবু জেহেল তখন তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে ধরে নিয়ে আসতো, তাহলে ঠিকই দেখতে পেতো জাহান্নামের প্রহরীরা কীভাবে তাদের সকলকে পাকড়াও করে গায়েব করে দেয়। জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, উক্তিটি সুপরিণত পর্যায়ের।

শেষোক্ত আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ' সাবধান! তুমি তার অনুসরণ কোরো না এবং সেজদা করো এবং আমার নিকটবর্তী হও'।

এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, তা কখনোই না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যাবানিয়্যা বাহিনীর ভয়ে আবু জেহেল আর তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে জড়ো করার চেষ্টা করবেই না। সুতরাং হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাকে এতোটুকুও মান্য করবেন না। একটুও মূল্য দিবেন না তার হুমকির। আপনি নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন। নিমগ্ন হোন আপনার প্রিয় নামাজে এবং অধিকতর নৈকট্যলাভ করতে থাকুন কেবল আমার। বাক্যটি যোগসূত্রহীন একটি নতুন বাক্য, রসুল স. এর দিক থেকে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে হে আমার আল্লাহ্! এই মহাদুর্বৃত্তটির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমার করণীয় কী? এই সম্ভাব্য প্রশ্নটিরই জবাব দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এখানকার 'সেজদা করো' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'তুমি তার অনুসরণ কোরো না' বাক্যের সঙ্গে। অর্থাৎ 'সেজদা করো' কথাটিই এই কথাটিকে করেছে অধিকতর বলিষ্ঠ ও বেগবান। আর 'ইক্বতারিব' অর্থ আমার নিকটবর্তী হও। অর্থাৎ সেজদার মাধ্যমে অর্জন করুন আমার অধিকতর আনুরূপ্যবিহীন সামীপ্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ সেজদা অবস্থায় আল্লাহ্র অধিক সমীপবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সেজদায় পড়ে দোয়া কোরো।

এখানে ‘সেজদা করো’ কথাটি আদেশসূচক। তাই এই আয়াত পাঠ করলে সেজদা ওয়াজিব হবে। রসুল স.ও এই আয়াত পাঠ করলে সেজদা করতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন। রসুল স. সুরা ইনশিক্বাক্ব ও সুরা আ’লাক পাঠ করলে সেজদা করতেন।

জমহুরের অভিমত হচ্ছে, এখানকার ‘সেজদা করো’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত যেহেতু ‘তুমি তার অনুসরণ কোরো না’ কথাটির সঙ্গে, তাই বুঝতে হবে, এখানে ‘সেজদা করো’ বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাজ পাঠের। অর্থাৎ সেজদা অর্থ এখানে নামাজ। অর্থাৎ আংশিকতাই এখানে সামগ্রিকতার্থক। আর রসুল স. এই সুরা পড়ে যে সেজদা করতেন বলা হয়েছে, তাঁর এই আমলখানি হবে সুন্নত, ওয়াজিব নয়। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সূরা ক্বদর

৫ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহান ও মহিমময় ভূমি মক্কায়।

হজরত ইমাম হাসান থেকে তিরমিজি, হাকেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. স্বপ্নে দেখলেন, উমাইয়া গোত্রের লোক তাঁর মিম্বরে সমাসীন। স্বপ্নটি দেখে রসুল স. বিষণ্ন হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো ‘নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি কাওছার’ (সুরা কাওছার) এবং ‘নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী কী, তুমি কি জানো? মহিমান্বিত রজনী সহস্র রজনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’। অর্থাৎ বনী উমাইয়ার হাজার মাসের শাসন অপেক্ষা একটি কদরের রাত্রি উত্তম। কাসেম ইবনে ফজল হামাদানী বলেছেন, আমি বনী উমাইয়ার শাসনকাল গণনা করে দেখেছি, কম-বেশী ব্যতীত তা এক হাজার মাস। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। মাযানী ও ইবনে কাছীর বলেছেন, হাদিসবেত্তাগণের নিকট বর্ণনাটি চরমভাবে অস্বীকৃত।

মুজাহিদের উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম ও ওয়াহেদী বলেছেন, একবার রসুল স. বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ওই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন দীর্ঘ এক হাজার মাস ধরে। একথা শুনে সাহাবীগণ বিস্মিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো ‘নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি....সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’। অর্থাৎ কদরের একটি রাত্রি বনী ইসরাইলের ওই মুজাহিদের হাজার মাসের জেহাদ অপেক্ষা উত্তম।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, বনী ইসরাইলের এক সাধু পুরুষ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত নামাজ পাঠ করতেন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকতেন জেহাদে। তাঁর এমতো কর্মসূচী নিরবচ্ছিন্ন ছিলো একাধারে এক হাজার মাস। তাঁর ওই সাধনার দিকে ইঙ্গিত করে অবতীর্ণ হয় ‘ইন্না আনযাল্নাহু ফী লাইলাতিল ক্বদর.....’।

ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা'য় লিখেছেন, আমি একজন বিশ্বস্ত বিদ্বানকে বলতে শুনেছি, রসুল স. এর উম্মতের আয়ুষ্কাল হবে সামান্য। তাই পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় তাদের পুণ্যকর্মের পরিমাণও হবে সামান্যই। যুক্তি অনুসারে এরকম ধারণাই যথার্থ। কিন্তু তা যে যথার্থ নয়, সে কথা জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে 'ইন্না আনযালনা....'। অর্থাৎ এই উম্মতের একটি কদরের রাত অন্যান্য উম্মতের হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আমি বলি, সুত্রপ্রবাহের দিক থেকে বর্ণনাটি অপরিণত। তবে এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার যতোগুলো প্রেক্ষিতের কথা জানা যায়, তন্মধ্যে এই বর্ণনাটিই সমধিক শুদ্ধ। আর এই বর্ণনাটির দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, অতি বৈশিষ্ট্যময় কদরের রাত বিশেষভাবে নির্ধারিত কেবল এই উম্মতের জন্য। ইবনে হাবীব মালেকীর ধারণাও এরকম। আর এটাকেই জমহুরের অভিমত বলে চিহ্নিত করেছেন ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'আল ইদ্দত' গ্রন্থে। তবে অভিমতটির বিপক্ষে রয়েছে হজরত আবু জরের একটি উক্তি, যা বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। উক্তিটি হচ্ছে— আমি একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রেমাষ্পদ! কদরের রাত্রি কি কেবল নবুয়ত ও রেসালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নবী-রসুলগণের মহাপ্রস্থান ঘটার সাথে সাথে কি কদরের রাত্রির কল্যাণও অন্তর্হিত হয়ে যায়? তিনি স. বললেন, না। বরং তা প্রবহমান থাকে। হাদিসটির ভাষ্যানুসারে শায়েখ ইবনে হাজার মন্তব্য করেছেন, কদরের রাত্রি ছিলো পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন, ইমাম মালেকের বিবরণটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হাদিস কখনো সুস্পষ্ট হাদিসের প্রতিপক্ষে কার্যকর নয়।

আমি বলি, সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হজরত আবু জরের হাদিসের প্রতিপক্ষে ইমাম মালেক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিই অধিক সুস্পষ্ট। হজরত আবু জরের বর্ণনার 'বরং তা প্রবহমান থাকবে' কথাটিই আসলে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কথাটির মর্মার্থ তো এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পরে প্রবহমান থাকবে কদর রজনীর কল্যাণ। এমনও তো বলা যায় যে, ওই কল্যাণ কেবল এক বৎসরের জন্য নয়, প্রতি বৎসরের জন্য। আবার এরকম ধারণাকেও নাকচ করা যায় না যে, কদর রজনীর আগমন অসংখ্যবার ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর। লক্ষণীয়, হজরত আবু হোরায়রাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, পৃথিবীর বুক থেকে কি কদরের রাতকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে? তিনি জবাবে বলেছিলেন, না। যে এরকম বলে, সে ভুল বলে। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, আমি স্বয়ং যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি প্রতি রমজান মাসেই কদরের রাত্রি দেখতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সূরা ক্বদর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ○

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰہُ فِیۡ لَیۡلَۃِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ ؕ﴿۲﴾

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

r নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে;

r আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?

r মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

r সেই রাত্রিতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।

r শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইন্না আন্যাল্নাহু'। এর অর্থ— নিশ্চয় আমি তা অবতীর্ণ করেছি। অর্থাৎ আমিই অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। কোরআন মজীদের সুবিশাল মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে প্রত্যক্ষভাবে কোরআনের উল্লেখ না করে উল্লেখ করা হয়েছে এর সর্বনাম। শ্রোতৃবৃন্দকে উৎকর্ণ ও অভিভূত করবার উদ্দেশ্যেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এরকম বাকভঙ্গিমা। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন, নিশ্চয় তা শ্রেষ্ঠ ও মহিমময়। আর তা তো কোরআনের মতোই মহিমান্বিত গ্রন্থ। আবার বক্তব্যটিকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও বেগবান করার লক্ষ্যেই এখানে প্রথমে ক্রিয়াবাচক বিধেয় 'আন্যাল্না' (অবতীর্ণ করেছি) এর আগে ব্যবহার করা হয়েছে নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ইন্না'। অথবা এরকম করা হয়েছে কর্তার মহানুভবতার দিকে লক্ষ্য রেখে।

এরপর কোরআনপাকের আরো অধিক মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে যোগ করা হয়েছে 'ফী লাইলাতিল ক্বদর' (মহিমান্বিত রজনীতে) অর্থাৎ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার লগ্নটিও মহাআড়ম্বরপূর্ণ, মহান। কেননা সমগ্র বিশ্বজগতের ও মানবসমাজের ঘটিতব্য যাবতীয় ক্রিয়াকর্মও স্থিরীকৃত হয় কদর রজনীতেই। হোসাইন ইবনে ফজলকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই কি আল্লাহ্পাক সকল ঘটিতব্য বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে কদরের রাতের অর্থ কী? তিনি বললেন, স্থিরীকৃত বিষয়কে তার নির্ধারিত সময়ের দিকে পরিচালনা এবং নির্ধারিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। অর্থাৎ প্রতি আগামী বৎসরের জন্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলি কদরের রাতেই জানিয়ে দেওয়া হয় নির্বাহী ফেরেশতাদেরকে, যারা ওই ঘটনাগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ইকরামা বলেছেন, স্থিরকৃত বিষয়গুলোর নির্ধারণ ও যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে মধ্য শাবানের রাতে (শবে বরাতে)। তালিকা প্রস্তুত করা হয় মৃত ও জীবিতদের। ওই তালিকার কোনো হেরফের হয় না। ইকরামার উক্তির সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে বাগবীর একটি বিবৃতি, যেখানে বলা হয়েছে,

রসুল স. বলেছেন, মধ্য শাবানে পরবর্তী বৎসরের মধ্য শাবান পর্যন্ত দেওয়া হয় মৃত্যুর সিদ্ধান্ত। আরো দেওয়া হয় বিবাহের, জন্মের। এর মধ্যে যে সন্তান অথবা সন্ততি জন্মলাভ করার পর মৃত্যুবরণ করবে, তার নামও থাকে মৃতদের তালিকায়। নাম থাকে তাদেরও, যারা এই সময়ের মধ্যে বিয়ে করার পর মৃত্যুবরণ করবে।

আমি বলি, সম্ভবত নির্ধারিত বিষয়ের ন্যূনতম পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয় মধ্য শাবানের রাতে। আর কদরের রাতে নিশ্চিত করা হয় সকল কর্মকাণ্ডের সাধারণ নিষ্পত্তি ও বিস্তারিত ব্যবস্থাপনা। কদরের রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে 'প্রতিটি প্রশাসনিক কর্মই সে রাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কদর রজনীতে সারা বৎসরের শুভ-অশুভ, উপজীবিকা, জীবন-মৃত্যু এমনকি হাজীদের হজ সম্পর্কেও অনুলিপি করে দেওয়া হয় লওহে মাহফূজের লিপিবদ্ধ ফলক থেকে।

জুহুরী বলেছেন, 'লাইলাতুল ক্বদর' নামকরণ করা হয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা অনুসারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর আল্লাহ্ যা নির্ণয় করে দিয়েছেন, তা যথাযথ'। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব যে পর্যায়ের, তেমনই তাঁর নির্ণয়নও। আবুদ্ দোহার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ্পাক সকল বিধানের সিদ্ধান্ত দেন। আর কদরের রাতে তার তালিকা হস্তান্তর করেন কার্যনির্বাহী ফেরেশতাদের নিকটে। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'লাইলাতুল ক্বদর' নামকরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, এই রাতের পুণ্যকর্ম আল্লাহ্পাকের নিকটে হয় অতি আদৃত। এর বিনিময় জোটে সুপ্রতুল। আর কদরের রাতে কোরআন অবতরণের তাৎপর্য প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাসের সমর্থনপুষ্ট সমাধান হচ্ছে, এই রাতেই সমগ্র কোরআন সুরক্ষিত ফলক থেকে নিয়ে আসা হয় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের বাইতুল ইজ্জতে। পরে হজরত জিবরাইল তা কুড়ি বৎসর ধরে অল্প অল্প করে রসুল স. এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী ইব্রাহিমের পুস্তিকাগুলি অবতীর্ণ হয়েছে ৩রা রমজানে। বর্ণনান্তরে ১লা রমজানে। নবী মুসার তওরাত ৬ রমজানে। নবী ঈসার ইঞ্জিল ১৩ রমজানে। নবী দাউদের যবুর ২৮ রমজানে এবং আমার কোরআন ২৪ রমজানে, যখন রমজানের রাত অবশিষ্ট ছিলো মাত্র ৬টি।

হজরত ওয়াইল ইবনে আসকা থেকে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সহিফাগুলি তাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিলো পহেলা রমজানে। তওরাত ষষ্ঠ রমজানে। ইঞ্জিল ত্রয়োদশ রমজানে। আর কোরআন চব্বিশে রমজানে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, শা'বী, হাসান বসরী এবং কাতাদা। এর সমর্থন পাওয়া যায় হজরত বেলাল কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিসেও, যা বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। হাদিসটি এই— তোমরা

কদরের রাত অনুসন্ধান কোরো রমজানের চব্বিশ তারিখে। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাসম্পৃক্ত ইবনে লেহিয়া সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার মন্তব্য করেছেন, তিনি হাদিসটিকে সুপরিণত শ্রেণীর বলে ভুল করেছেন।

বর্ণিত হাদিসগুলো যদি বিশুদ্ধও হয়, তবু একথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রতি বছর শবে কদর রমজানের চব্বিশ তারিখেই হয়। বরং এতে করে এটাই জানা যায় যে, যে বৎসর কোরআনপাকের অবতরণ ঘটে, সে বৎসরের শবে কদর ছিলো চব্বিশ তারিখে। হজরত বেলালের উক্তি অনুসারেও ওই বৎসরের শবে কদর ছিলো চব্বিশ তারিখে।

একটি উপযোগ ঃ শবে কদরের তারিখ নির্ণয়নের প্রসঙ্গটি মতপ্রভেদপূর্ণ। এ সম্পর্কে রয়েছে প্রায় চল্লিশটি অভিমত। তবে প্রকৃত কথা হচ্ছে, শবে কদরের আগমন ঘটে প্রতি রমজান মাসের শেষ দশ রাতের যে কোনো এক রাতে। এটাই বর্ণনাবৈষম্য অপনোদনের উত্তম পদ্ধতি। নিম্নে এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করা হলো। হজরত সালমান ফারসী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার শাবান মাসের শেষ তারিখে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বললেন, সমবেত জনমণ্ডলী! একটি আশির্বাদপুষ্ট মাস সমাগত। মাসটি অতীব মহিমান্বিত। এ মাসে এমন এক রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রমজানের মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে হাদিসটি আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করেছি সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। তবে রমজান মাস ছাড়াও অন্য মাসে শবে কদর আসে— এই অভিমতটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার এরকম একটি মন্তব্য কাযীখান উল্লেখ করেছেন তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ কাযীখানে।

একটি সংশয় ঃ সম্ভবত হজরত সালমান ফারসীর বিবরণটি ওই বৎসরের জন্য প্রযোজ্য, যে বৎসর অবতীর্ণ হয়েছিলো কোরআন মজীদ। অথবা তা প্রযোজ্য হবে তিনি যে বৎসরের কথা বলেছেন, সেই বৎসরের জন্য। সুতরাং তাঁর বিবরণ দ্বারা ওই অভিমতটিকে কীভাবে ভুল প্রমাণ করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, রমজানে যেমন শবে কদরের আগমন ঘটে, তেমনি ঘটে অন্যান্য মাসেও?

সংশয়খণ্ডন ঃ হজরত সালমান ফারসী রমজান মাসের আরো অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এ মাসে রোজা রাখা আল্লাহ্ ফরজ করে দিয়েছেন। আর নফল করে দিয়েছেন রাতের নামাজ। এ মাসের নফল নামাজ অন্য মাসের ফরজ নামাজ তুল্য। আর এ মাসের ফরজ নামাজ অন্য মাসের ফরজ নামাজের চেয়ে সত্তর গুণ অধিক ফযীলতপূর্ণ। এ মাস ধৈর্যের মাস। সহানুভূতি প্রকাশের মাস ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল বৈশিষ্ট্য কোনো নির্দিষ্ট রমজানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল রমজানেরই রয়েছে এ সকল বৈশিষ্ট্য। অনুরূপ কদর রাত্রির বৈশিষ্ট্যও কেবল কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাসের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়।

মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশদিন এমন কঠোরভাবে ইবাদতে মগ্ন হতেন, যা অন্য সময় হতেন না। মুসলিম। তিনি আরো বলেছেন, যখন রমজানের শেষ দশ দিনের আগমন ঘটতো, তখন তিনি স. কষে

বাঁধতেন তার লুঙ্গি। রাতভর নামাজ আদায় করতেন। পরিবারবর্গকেও জাগাতেন। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. তাঁর মহা-প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ পালন করেছেন। আর তাঁর মহা প্রস্থানের পরে ইতেকাফ পালন করতেন তাঁর পত্নীগণ। বোখারী, মুসলিম। মাতা মহোদয়া আরো বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। বলতেন, তোমরা রমজানের শেষ দিন শবে কদর অনুসন্ধান কোরো। বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. প্রথমে রমজানের প্রথম দশ দিন ইতেকাফ পালন করেছিলেন। তারপর পালন করেছিলেন মাঝের দশ দিন। এরপর থেকে পালন করতেন শেষ দশ দিন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, প্রথম ও মাঝের দশ দিন ইতেকাফ করার পর আমার কাছে এক ফেরেশতা এসে বললো, শবে কদর হয় শেষ দশ দিনের মধ্যে। সুতরাং আমি বলি, কেউ যদি শবে কদর পেতে চায়, তবে যেনো সে ইতেকাফ করে রমজানের শেষ দশ দিনে। আমি এ রাত পেয়েছি শেষ দশ দিনের মধ্যে। স্বপ্নেও আমাকে এ রাতকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, সে রাতের সকালে আমি সেজদা করছি কাদা-পানির মধ্যে। এরকম কথা শোনার পর সাহাবীগণ শবে কদর তালাশ করতেন শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে। বর্ণনাকারী বলেন, সে রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো। মসজিদের ছাদ ছিলো খেজুর পাতার। তাই বৃষ্টির পানির ফোটা পড়ার পরে মসজিদের মেঝেতে কাদা হয়ে গিয়েছিলো। একুশ তারিখ ভোরে নামাজের শেষে আমি দেখলাম, রসুল স. এর কপালে লেগে রয়েছে কাদা-পানির দাগ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, লাইলাতুল কদরের অন্বেষণে রসুল স. রমজানের মাঝের দশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন। দশদিন শেষ হলে তিনি স. বললেন, তাঁবু গুটিয়ে নাও। তিনি স. লাইলাতুল কদরের সঠিক তারিখ বিস্মৃত হয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি স. শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতে শুরু করেন এবং বলেন, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো শবে কদরের সঠিক তারিখ। আমি তা তোমাদেরকে জানানোর জন্য যখন বাইরে এলাম, তখন হঠাৎ আমার কাছে আগমন করলো দু'জন লোক। শয়তানও ছিলো তাদের সঙ্গে। তাই আমি শবে কদরের সঠিক তারিখ ভুলে গেলাম। এখন থেকে তোমরা রমজানের শেষ দশ তারিখের মধ্যে শবে কদর তালাশ করতে থাকো। বিশেষভাবে তালাশ কোরো শেষ দশদিনের পঞ্চম, সপ্তম ও নবম রাতে। বর্ণনাকারী হজরত আবু সাঈদ খুদরীর নিকট জানতে চাইলেন, গণনাবিদ্যায় তো আপনি অগ্রণী। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তা অবশ্য ঠিক। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক পারঙ্গম। তারপর বললেন, শোনো, নবম, সপ্তম ও পঞ্চম মানে কী? একুশ তারিখের রাত্রি অতিবাহিত হলে আসবে বাইশ তারিখ। বাইশের পর তেইশ। এই তেইশ তারিখের রাতই রমজানের শেষ নবম রাত্রি। এর একদিন পর পর আসে সপ্তম ও পঞ্চম। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু দাউদ ও তায়ালাসী বর্ণনা করেছেন, শবে কদর অনুষ্ঠিত হয় রমজানের চব্বিশ তারিখ দিবাগত রাতে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শবে কদর আমাকে দেখানো হয়েছে স্বপ্নে। এর পর আমি তা ভুলে গিয়েছি। ওই রাতের ভোরে দেখলাম আমি সেজদা করছি কাদা-পানিতে। বর্ণনাকারী বলেন, বৃষ্টি হয়েছিলো ২৩ তারিখ দিবাগত রাতে। ভোরে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে তিনি স. আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন। আমরা দেখলাম তাঁর ললাটদেশে লেগে রয়েছে কাদা-পানির চিহ্ন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে দিন, যেদিন আমি আপনার মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হবো। তিনি স. বললেন, তেইশ তারিখের পরে এসো। অন্য এক সূত্রে এসেছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি একুশ তারিখ ভোরে শবে কদর সম্পর্কে রসুল স. এর কাছে জানতে চাইলাম। বললাম, কদরের রাত কি বাইশ তারিখের রাত? তিনি স. বললেন, ওই রাত, অথবা তার পূর্বের রাত।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কদরের রাত চায়, সে যেনো তা অনুসন্ধান করে সাতাশ তারিখের রাতে। আহমদ, ইবনে মুনজির। হজরত জাবের ইবনে সামুরা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তিবরানীও।

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কদরের রাত্রি হয় সাতাশ তারিখে। যে সকল হাদিসে সাতাশ তারিখের কথা আছে, সেগুলোর সঙ্গে এই হাদিসটিও বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ এবং তা সমর্থন করেছেন ইমাম আহমদ। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। হজরত উবাই ইবনে কা'বও ছিলেন এই অভিমতটির প্রবক্তা এবং তিনি এ সম্পর্কে শপথও করেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবুল মুনজির! কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি এরকম বলছেন? তিনি বলেছিলেন, পূর্বাভাসের উপরে, যে পূর্বাভাস আমাকে দিয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। পূর্বাভাসটি হচ্ছে, ওই দিন সূর্যোদয় ঘটবে প্রখর কিরণ ব্যতিরেকে। মুসলিম।

হজরত ওমর, হজরত হুজায়ফা ও অন্যান্য সাহাবী থেকে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবার এমতো উক্তির পোষকতা রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও, যেখানে তিনি বলেছেন, আমরা একবার নিজেদের মধ্যে কদরের রাত্রি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় সেখানে রসুল স. উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি স্মরণ আছে ওই সময়ের কথা, যখন চাঁদ উদিত হয়েছিলো কাস্তের আকৃতিতে? আবুল হাসার ফারসী বলেছেন, একথার অর্থ— চাঁদের কৃষ্ণপক্ষের সাতাশ তারিখের রাত্রি। কেননা ওই রাতে চাঁদের আকৃতি এমনই হয়। এরপর পর চাঁদ হয়ে যায় অদৃশ্য। কিন্তু প্রমাণটি সবল নয়। কেননা ইতোপূর্বের হাদিসে বলা হয়েছে, সে রাতের ভোরে সূর্যকিরণ হয় অপ্রখর। তেমনি রাতের চাঁদ হয় নিষ্প্রভ। এর কারণ চাঁদের মাস পূরণ হওয়া নয়। বরং এর কারণ ভিন্নতর। তবে এ সকল হাদিসের দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, কখনো কখনো কদররাত্রির আগমন ঘটে সাতাশ তারিখেও। তার মানে আবার এটাও নয় যে, কেবল সাতাশ তারিখের রাত্রিই কদরের রাত্রি।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, এক লোক কদর রাত্রির সাক্ষাত পেলো সাতাশ তারিখে। রসুল স. বললেন, আমি চান্দ্রমাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে তোমাদের স্বপ্নের বাস্তবতা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং তোমরা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে তার অনুসন্ধান কোরো। মুসলিম। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সাতাশ তারিখের রাতে কদরের অন্বেষণ করা উচিত। আবদুর রাজ্জাক। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। অর্থাৎ বিশ তারিখের পরে সাতাশ তারিখের রাত। হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকেও সুপরিণত সূত্রে এসেছে অতিক্রমণশীল সাতাশ তারিখের রাতের কথা। আহমদ। আবার হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও সুপরিণত সূত্রে এসেছে, কদর রজনীর আগমন ঘটে রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে, সাতাশ তারিখে।

ভিন্নতর সূত্রে বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, কদর রজনী অন্বেষণ কোরো রমজান মাসের শেষ দশ দিনের পঁচিশ ও সাতাশের রাতে। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাদেরকে কদর রাত্রির সঠিক তারিখ জানানোর জন্য আসছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো দু'জন লোকের। শয়তানও ছিলো তাদের সঙ্গী। সে কারণে রসুল স. সঠিক তারিখের কথা ভুলে গেলেন। পরে আমাদেরকে বললেন, মনে হয় আমার ভুলে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তোমরা কদর অন্বেষণ কোরো রমজানের তেইশ, পঁচিশ, অথবা সাতাশের রাতে।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কদর রাতের অন্বেষণ কোরো একুশ, পঁচিশ ও সাতাশ তারিখের রাতে। অথবা শেষ তারিখের রাতে। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও আহমদ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, জনৈক সাহাবী একবার স্বপ্নে দেখলেন, কদর রাত্রি হয় রমজানের শেষ সাত তারিখের যে কোনো এক রাতে। রসুল স. তাঁর কথা শুনে বললেন, আমার ধারণাও তাই। সুতরাং যে কদরের রাত চায়, সে যেনো তা তালাশ করে রমজানের শেষ বেজোড় রজনীগুলিতে। বোখারী, মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কিছুসংখ্যক লোককে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো, কদর রাত্রি হয় রমজানের শেষ দশ রাতে। আবার কিছুলোক দেখেন, রমজানের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই রয়েছে লাইলাতুল কদর। রসুল স. তাদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত দেন, তোমরা কদর অনুসন্ধান কোরো রমজানের শেষ সপ্তাহের রাতগুলোতে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি তোমরা বিপর্যস্ত হও, রাত্রি জাগরণে হও অক্ষম, তবু রমজানের শেষ সপ্তাহের রাতগুলোতে বসে থেকো না। নামাজে দাঁড়িয়ে যেয়ো। আহমদ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণত সূত্রসহযোগে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশ রাতের মধ্যে কদর অন্বেষণ কোরো, দেহ যদি তোমাদের অবাধ্য হয়, তবুও। বর্ণিত হাদিসসমূহ দৃষ্টে একথাই

প্রতীয়মান হয় যে, কদর রাত্রির উপস্থিতি ঘটে রমজানের শেষ দশদিনের মধ্যে। কখনো একুশের রাতে, যেমন বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক। কখনো তেইশের রাতে, যেমন সাব্যস্ত হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের বিবরণ দ্বারা। কখনো চব্বিশের রাতে, যেমন প্রত্যয়িত হয়েছে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার রাত হিসেবে। কখনো সাতাশের রাতে, যেমন নিদর্শন অবলম্বন করে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন হজরত উবাই ইবনে কা'ব। আবার এমন প্রমাণিত হয়েছে যে, কদরের উপস্থিতি ঘটে বাইশ, চব্বিশ, আটাশ, উনত্রিশ ও তিরিশের রাতে। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বদর' (আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জানো)। এখানে 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। অস্বীকৃতিজ্ঞাপক হিসেবে। আর দু'বারই এরকম করা হয়েছে কদর রজনীর বিস্ময়কর মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ কদর রাত্রির মাহাত্ম্য অতুলনীয়।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। একথার অর্থ— এই এক রাতের ইবাদতের প্রতিফল অন্য সময়ের হাজার রাতের প্রতিফল অপেক্ষা অধিক। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, যে বিশ্বাসবান পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে কদর রজনীতে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়, আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন তার পূর্বকৃত সকল পাপ। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, সে যদি নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, আর যদি প্রকৃতই সে রাতে উপস্থিতি ঘটে লাইলাতুল কদরের। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মাঝরাতে জেগে উঠে নামাজে দণ্ডায়মান হয়, আর ওই রাত যদি হয় কদরের রাত, তবে তার ভাগ্যে জোটে ক্ষমা।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সেই রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে'। রূহ সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কদর রাত্রির আর একটি ফযীলত। অথবা উল্লেখ করা হয়েছে কদর রাত্রির মহিমান্বিত হওয়ার আর একটি কারণ। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের অনুমতিক্রমে এই রাতে ধূলির ধরণীতে আকাশ থেকে নেমে আসে রূহ সহ অগণিত ফেরেশতা। একারণেই এই রাতটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কদরের রাতে জিবরাইল ফেরেশতা তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ভূপৃষ্টে অবতরণ করেন। অবলোকন করেন ওই সকল ব্যক্তির কার্যকলাপ, যারা জিকির, তেলাওয়াত ও ইবাদতে মগ্ন এবং মানুষের জন্য আল্লাহ্র সমীপে করেন ক্ষমাপ্রার্থনা।

শেষোক্ত আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত'। এখানকার 'সালাম' (শান্তি) পদটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। অর্থাৎ বিষয়টি শান্তিময়, প্রশান্তিপ্রদায়ক। অথবা যাবতীয় বিপদাপদের

রক্ষাকবচ। আর 'আমরিন সালাম' এর 'আমর' অর্থ— ওই অনাবিল আনন্দের ফল্গুধারা, যা আল্লাহ্ পাক সে রাতে প্রবাহিত করে দেন বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীগণের হৃদয়ে।

'হিয়া হাত্‌তা মাত্বলাই'ল ফাজ্‌রি' অর্থ সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত। অর্থাৎ কদর রজনী স্থায়িত্ব লাভ করে ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত। এখানে 'হিয়া' (সেই) হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং 'ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত' হচ্ছে বিধেয়। বলা বাহুল্য, প্রতিটি রাতই স্থায়ী হয় ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত। তাই কদর রাত সম্পর্কে এরকম বলা অর্থহীন। তাই কথাটির মর্মার্থ হবে— কদর রাতে রূহ ও ফেরেশতাগণের আগমন ও তাদের শুভাশিস বর্ষণের বৈশিষ্ট্য প্রবহমান থাকে ফজরের নামাজের সময় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। অথবা বলা যেতে পারে 'হিয়া' এখানে উদ্দেশ্য এবং এর অগ্রবর্তী বিধেয় হচ্ছে 'সালাম'। এখানকার অগ্রবর্তী বিধেয়টি সীমিতার্থক। আর এর পরবর্তী পুরো বাক্যটি 'লাইলাতুল ক্বদর'এর দ্বিতীয় বিধেয়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কদরের নিশীথ শুধু শান্তি আর শান্তি, পরিপূর্ণরূপে শান্তিময়। মঙ্গল আর মঙ্গল; একেবারে মঙ্গলময়— অমঙ্গলের লেশমাত্র এ রাতে নেই।

জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এ রাতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন অশান্তি ও অমঙ্গলের পরিকল্পনা। অজস্র ধারায় বর্ষণ করেন কেবল মঙ্গল-বারি। শয়তানও এ রাতে করতে পারে না কোনো প্রকার অনিষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'শান্তিই শান্তি' অর্থ এ রাতে ফেরেশতারা বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীগণকে অধিক হারে অভিবাদন প্রদান করতে থাকে। অর্থাৎ তারা শান্তিসম্ভাষণে মুখর ও পরিপূর্ণ করে রাখে সারা রাত।

একটি উপযোগ ঃ কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, কদর রজনীতে পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়। নূরে নূরে ভরপুর হয়ে যায় বিশ্ব চরাচর। আর সারারাত ধরে ফেরেশতারা জানাতে থাকে শান্তিসম্ভাষণ। আমি বলি, এ সকল কিছু উদ্ভাসিত হয় কিছুসংখ্যক সাধকের আত্মিক দৃষ্টিতে। সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে এ সকলকিছু ধরা পড়ে না। আর পুণ্যপ্রাপ্তির জন্য এরকম আত্মিক উদ্ভাসন অত্যাবশ্যকও নয়। যদি অত্যাবশ্যক হতো, তবে সকল সাহাবী, তাবেয়ী ও আউলিয়াগণ এরকম দেখতেন। তবে কদরের রাত ইবাদতের সঙ্গে অতিবাহিত করা অত্যাবশ্যক। কেননা হাদিসে কদরের রাতে নামাজ পাঠকারীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার শুভসংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রবিধান ঃ যে ব্যক্তি কদরের রাতে ইশা ও ফজর জামাতের সাথে আদায় করে, সে পুণ্য লাভ করে কদর রজনীর। আর যে ব্যক্তি রাতে আরো অধিক ইবাদত করে, সে লাভ করে আরো অধিক পুণ্য। হজরত ওসমান গনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে, সে যেনো ইবাদত করে অর্ধরাত্রি ব্যাপী। এরপর যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে নামাজ পাঠ করে ফজরের, সে যেনো ইবাদত করে কাটায় সারা রাত। মুসলিম। কদরের

রাতে এই দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করা মোস্তাহাব 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফউন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আন্নী' (হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও)। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কদর রজনীতে আমি কী করবো? তিনি স. বললেন, এই দোয়া পাঠ কোরো 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফউন তুহিববুল আ'ফওয়া ফা'ফু আন্নী'। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

সূরা বায়্যিনাহ

পরম পুণ্যময় ভূমি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রয়েছে ৮টি আয়াত।

সূরা বায়্যিনাহ ঃ আয়াত ১—৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ
حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ﴿١﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ﴿٢﴾
فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ﴿٣﴾ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ
الْقَيِّمَةِ ؕ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ع﴿٨﴾

q কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিল—

q আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ,

q যাহাতে আছে সঠিক বিধান।

q যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

q তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

q কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে; উহারাই সৃষ্টির অধম।

q যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

q তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার— স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— শেষতম রসুলের মহাআবির্ভাবের আগে ইহুদী, খৃষ্টান ও অংশীবাদীরা নিমগ্ন ছিলো ঘোর অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতায়। ইহুদী-খৃষ্টানেরা আল্লাহ্‌র পুত্র বলতো নবী ওযায়ের ও নবী ঈসাকে। আর অংশীবাদীরা করতো প্রতিমা ও আগুনের উপসনা। এরপর মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে আবির্ভূত হলেন সর্বশেষ রসুল। তিনি তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শোনাতে লাগলেন, যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে শরিয়তের নির্ভুল বিধান।

এখানে ভবিষ্যতকালের শব্দরূপ ব্যবহার করা হলেও অর্থ হবে অতীতকালবোধক। 'আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক রসুল' বাক্যটি আগের বাক্যের 'সুস্পষ্ট প্রমাণ এলো' কথাটির অনুবর্তী। 'ইয়াতলু সুহুফান' অর্থ যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ। বাক্যটি 'রসুল' পদের বিশেষণ। অর্থাৎ তিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী, তাই অক্ষরপরিচয়ের প্রচলিত বিদ্যা ব্যতিরেকেই আবৃত্তি করতে পারেন আকাশজ গ্রন্থ। 'মুত্বাহ্হারা' অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ ওই গ্রন্থ, যা অনুপযুক্ততা ও শয়তানের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, পুতঃপবিত্র। অথবা পুতঃপবিত্র যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের স্পর্শ থেকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'যার সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে ভ্রান্ত কিছু আসতে পারেই না'। কিংবা পুতঃপবিত্র ওজুবিহীন, ঋতুবতী ইত্যাদির অপবিত্র স্পর্শ থেকে। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন 'পবিত্রগণ ব্যতীত একে কেউ স্পর্শ করবে না'। আর 'ফী হা কুতুবুন ক্বয়্যিমাহ্' অর্থ যাতে আছে সঠিক বিধান। অর্থাৎ যারা পথান্বেষী, তাদের জন্য এই কোরআনে রয়েছে নির্ভুল পথের দিক নির্দেশনা, সঠিক শরিয়ত।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো, তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর'। একথার অর্থ— ইহুদী-খৃষ্টানেরা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিলো বলেই তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব-বিবাদ বাঁধতো না। দ্বন্দ্ব দেখা দিলো তখন, যখন আবির্ভূত হলেন মহানবী মোহাম্মদ স.। অথচ তার জন্য তারা অপেক্ষা করতো। যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতো তাঁর অসিলা দিয়ে। কিন্তু তিনি যখন কোরআনসহ আবির্ভূত হলেন, আহ্বান জানালেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দিকে, তখনই তাদের মধ্যে শুরু হলো বিবাদ। শুভমনোবৃত্তিসম্পন্ন যারা, তারা গ্রহণ করলো তাঁর আহ্বানকে। আর অন্যান্যরা পোষণ করতে লাগলো চরম বিদ্বেষ, যেহেতু তিনি স. তাদের মতো বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত ছিলেন না, ছিলেন বনী ইসমাইল সম্প্রদায়ের। এটাই ছিলো তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণ। আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট কিতাবই এভাবে তাদেরকে ইমানদার ও কাফের এই দুই দলে ভাগ করে দিলো। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌পাকের গুণবত্তা (সিফাত) সম্পর্কে গ্রন্থধারীদের মধ্যে ছিলো চরম এক জটিলতা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা ও গুণবত্তার (জাত ও সিফাতের) অবিভাজ্য এককত্ব ও আনুরূপ্যবিহীনতা সম্পর্কে সঠিক ধারণাই রাখতো। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের অধিকাংশের ধারণাই ছিলো বিকৃত ও অংশীবাদিতাদুষ্ট। তারা বলতো, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টজগতের পিতা। কিন্তু রসুল স. এর আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে তাদের মনেও কোনো দ্বিধা-সংশয় ছিলো না, যেহেতু তাদের গ্রন্থে ছিলো রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর সবিস্তার বিবরণ। কিন্তু অংশীবাদীদের এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না। কেননা তাদের কাছে ছিলো না কোনো আকাশজ গ্রন্থ। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল গ্রন্থধারীদের প্রসঙ্গ, যাতে করে রসুল স. এর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির বিষয়টি প্রতিভাত হয় অধিকতর স্পষ্টরূপে।

বাগবী লিখেছেন, কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, প্রথম আয়াতের 'মুনফাক্কিনা' শব্দটির অর্থ ধ্বংসশীল। অর্থাৎ 'আপন মতে অবিচলিত ছিলো' অর্থ হবে এখানে— তারা ছিলো ধ্বংসের মধ্যে। যেমন আরবী প্রবাদে বলা হয় 'ইনফাককা সদরুল মারআ'তি ইন দান উইললাদাত' (সন্তান প্রসব কালে ফেটে গ্যাছে রমনীর বক্ষদেশ, যা আর জোড়াও লাগেনি, ফলে, সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের আগে গ্রন্থধারীরা ধ্বংসের মধ্যে থাকলেও শাস্তিযোগ্য ছিলো না। কেননা আল্লাহ্‌পাকের চিরাচরিত রীতি এই যে, নবী-রসুল প্রেরণ না করে তিনি কোনো জাতিকে শাস্তি দেন না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি কোনো সম্প্রদায়কে শাস্তি দেই না, যতোক্ষণ না প্রেরণ করি রসুল'।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিলো আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে, জাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন'।

এখানকার ‘লিইয়া’বুদু’ (ইবাদত করতে) কথাটির ‘লাম’ অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। আর এর স্থলে ধরে নিতে হবে একটি অনুক্ত অব্যয় ‘আন’ (যেনো)। অর্থাৎ ‘আইঁ ইয়া’বুদুল্লহ্’ (যেনো তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে)। কথাটি এখানকার ‘উমিরু’ (আদিষ্ট হয়েছিলো) পদের আদেশ-ক্রিয়ার কর্মপদ। অথবা ‘লাম’ অব্যয়টি এখানে নিমিত্তপ্রকাশক। আর কর্মপদই এখানে রয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আদিষ্ট হয়েছিলো তারা একারণেই যে, তাতে করে তারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে। অর্থাৎ শেষতম রসুলের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে সকল কথা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিলো, সেগুলো ছিলো তাদের জন্য প্রভুত কল্যাণের আকর। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারলো না। হয়ে গেলো মতোবিরোধাক্রান্ত। আশ্চর্য! আর এখানকার ‘মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন’ (এটাই সঠিক দীন) বাক্যটি ‘ইবাদত করতে’ বাক্যের ‘তাঁর’ সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক।

‘হুনাফা’ অর্থ একনিষ্ঠভাবে, যাবতীয় অযথার্থ ধর্মমতসমূহের প্রতি বিমুখ হয়ে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এই পদটিও সমার্থবোধক অবস্থাপ্রকাশক। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওরাত-ইঞ্জিল গ্রন্থে তাদেরকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিলো যে, তোমরা আল্লাহ্র অংশীবিহীন এককত্বে অবিচল আস্থা রেখে বিশুদ্ধচিত্তে ইবাদত করো কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। সময়মতো সম্পাদন করো ফরজ নামাজ। আদায় করো জাকাত। উল্লেখ্য, এখানকার ‘সালাত’ ও জাকাত’ সম্পর্কযুক্ত হবে ‘ইবাদত করতে’ কথাটির সঙ্গে।

‘আর এটাই সঠিক দীন’ অর্থ শেষতম রসুলের ধর্মাদর্শে যে সকল বিধি-বিধানের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, সে সকলকিছুই ছিলো পূর্ববর্তী যুগের নবী রসুল ও পুণ্যবানগণের ধর্ম। আর এমতো ধর্মমতকে মান্য করতেন বলেই তাঁরা সকলেই ছিলেন সরল সঠিক পথের অভিযাত্রী। নজর ইবনে শুমাইল বলেছেন, একবার ‘দ্বীনুল ক্বয়্যিমা’ (সঠিক ধর্ম) সম্পর্কে খলিল ইবনে আহমদকে প্রশ্ন করা হলো। তিনি উত্তরে বললেন, ‘ক্বয়্যিমুন’ ‘ক্বয়্যিমাতুন’ ও ‘ক্বয়িমুন’ সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ এটাই ছিলো সেই সঠিক তওহীদভিত্তিক ধর্মাদর্শ, যার উপর তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অথবা— সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাবলীনির্ভর ধর্মমত এটাই। অর্থাৎ ওই বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই ধর্মের বাণীমালাই লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিবিবর্জিত। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— এটাই সত্য ধর্ম, সহজ সরল শরিয়তের পথ।

বাগবী লিখেছেন, এখানকার ‘দ্বীন’ ও ‘আল ক্বয়্যিমাহ্’ পৃথক দু’টি শব্দ। সেজন্যই শব্দ দু’টোকে এখানে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আর ‘আল ক্বয়্যিমাহ্’ পদে স্ত্রীলিঙ্গবাচকতার সংযোজনের মূলে রয়েছে একটি অনুক্ত বিশেষ্য পদ ‘আল মিল্লাত’। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ‘জালিকা দীনুল মিল্লাতুন ক্বয়্যিমাহ্’ (এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মাধিকারীদের ধর্ম)।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে, তারা এবং মুশরিকেরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃষ্টির অধম'। একথার অর্থ— গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তারা (ইহুদী-খৃষ্টান) এবং অংশীবাদীরা (পৌত্তলিক-অগ্নিপূজকেরা) সকলেই চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে নরকাভ্যন্তরে। এখানকার 'কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে, তারা এবং মুশরিকেরা' বাক্যটি 'ইন্না' (নিশ্চয়) অব্যয়ের নামপদ, অথবা উদ্দেশ্য। আর 'অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' বাক্যটি হচ্ছে এর বিধেয়। অর্থাৎ তারা হবে নরকের স্থায়ী বাসিন্দা। আর এখানকার 'উলায়িকা হুম শাররুল বারিয়্যাহ' অর্থ তারাই সৃষ্টির অধম। অর্থাৎ তারা শূকর-কুকুর ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ'। অর্থাৎ ইমানদার ও সৎকর্মশীলেরা সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি নিষ্পাপ ফেরেশতা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। এই আয়াতের মাধ্যমে অনেকে প্রমাণ করেন যে, বিশেষ মর্যাদার মানুষ বিশেষ মর্যাদার ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম। আর পাপী ইমানদারদের পাপসমূহকে যখন ক্ষমা করে দেওয়া হবে, অথবা শাস্তিদানের মাধ্যমে শুদ্ধ করে নেওয়া হবে, তখন তাদেরকেও মিলিয়ে দেওয়া হবে পুণ্যবান ইমানদারগণের সঙ্গে। এভাবে তারাও প্রবেশ করবে জান্নাতে।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রতিপালকের নিকটে আছে তাদের পুরস্কার— স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে'।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি সুসংবাদ—১. ইমানদারেরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ২. তাদের পুণ্যকর্মের জন্য তাদেরকে করা হবে পুরস্কৃত ৩. ওই পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্র অধিকারে, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন ৪. তাদেরকে যে জান্নাত দান করবেন, তা হবে চিরস্থায়ী ৫. ওই জান্নাতের নিম্নদেশে প্রবহমান থাকবে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী ৬. 'জান্নাতু আদনিন' বলে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ওই জান্নাত কোনো সাধারণ ও নশ্বর প্রমোদোদ্যান নয়। বরং তা অদৃষ্টপূর্ব ও চিরস্থায়ী ৭. আল্লাহ্ তাদের প্রতি থাকবেন সতত প্রসন্ন, তেমনি তারাও থাকবে আল্লাহ্র প্রতি সদাসন্তুষ্ট। শেষে বলা হয়েছে 'জালিকা লিমান খশিয়া রব্বাহ্'। একথার অর্থ— এ সকল অনুগ্রহসম্ভারের অধিকারী হতে পারবে তারাই, যারা আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাস রেখে জীবন যাপন করবে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞানুসারে।

'রদ্বিয়াল্লহু আ'নহুম' অর্থ আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্পাকের এই প্রসন্নতাই হবে তাঁর সকল অনুগ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে

জান্নাতবাসীরা! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রিয়তম প্রভুপালয়িতা! এইতো আমরা। সকল কল্যাণ তো তোমারই আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি প্রসন্ন? তারা বলবে, কেনো নয়? তুমি তো আমাদেরকে দিয়েছো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহসম্ভার, যা আর কাউকেই দাওনি। আল্লাহ্ বলবেন, এর চেয়েও অধিক অনুগ্রহ কি আমি তোমাদেরকে দান করবো না? তারা বলবে, এর চেয়েও উচ্চতর অনুগ্রহ আছে কি? আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। আর তা হচ্ছে আমার পরম প্রসন্নতা। সেই অনুগ্রহই আজ তোমাদেরকে দিলাম। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবো না। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, জান্নাতবাসীদের 'তুমি তো আমাদেরকে দিয়েছো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ সম্ভার, যা আর কাউকে দাওনি' কথাটির অর্থ হবে— যা তুমি দাওনি ফেরেশতাদেরকেও। কেননা এমতোক্ষেত্রে জাহান্নামীদের সঙ্গে জান্নাতবাসীরা তো তুলনীয় হতে পারেনই না।

'ওয়া রাদ্বু আনহু' অর্থ তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, জান্নাতবাসীদের সন্তুষ্টি হতে পারে দু'রকমের— ১. 'রিদ্বা' (সন্তুষ্টি) শব্দটির পরে যদি উল্লেখ করা হয় 'বা' (সঙ্গ) অব্যয়, তবে অর্থ দাঁড়ায়— সম্মতি, স্বীকৃতি। যেমন 'রদ্বিয়াবিহী' অর্থাৎ তিনি যে বিশ্বজগতের একমাত্র প্রভুপালক, পরিচালক— সে বিষয়ে তারা জানায় সম্মতি, প্রদান করে স্বীকৃতি ২. আর শব্দটির পরে যদি উল্লেখ থাকে 'আন' (হতে, থেকে) অব্যয়ের, তবে তার অর্থ হয়— সন্তুষ্টি, পরিতুষ্টি। যেমন 'রদ্বিয়া আনহু' অর্থাৎ তারা তাঁর ব্যবস্থাপনায়, প্রতিপালনে ও প্রতিদানে সন্তুষ্ট।

বিষয়টি আমি আরো একটু পরিষ্কার করে দিতে চাই এভাবে— দ্বিতীয় প্রকারের পরিতুষ্টি হতে পারে কয়েক ধরনের— ১. আল্লাহ্পাকের সুষ্ঠু ও প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপনা তাঁরা মেনে নেয় নির্বিবাদে, বিনা বাক্য ব্যয়ে। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মে, আল্লাহ্ চিরমঙ্গলময়। তিনি যা কিছু করেন, তার সবকিছুই কল্যাণকর, তা তাঁদের মনঃপুত হোক, অথবা না হোক। তাঁরা এমতো বিশ্বাসও রাখে যে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ছাড়া কোনো কিছু হওয়া সম্ভবও নয়। এমনকি কুফরী ও পাপকর্মও। তবুও অবিশ্বাস ও পাপের জন্য অভিযুক্ত হতে হয় বান্দাকেই। কেননা আল্লাহ্পাক সকলকিছুর স্রষ্টা হলেও বান্দা নির্মাতা ও অর্জনকারী। এভাবেই তারা অবিশ্বাস ও পাপের সঙ্গে যুক্ত এবং শাস্তির যোগ্য। এভাবে বিশ্বাসী পুণ্যবানেরাও তাদের কর্মের নির্মাতা ও অর্জনকারী, কদাচ স্রষ্টা নয়। তবে যারা কাফের ও গোনাহ্গার তারা কখনোই এরকম ভাবতে পারে না যে, যেহেতু তাঁর অভিপ্রায়েই আমরা অবিশ্বাসী ও পাপী তাই অবিশ্বাস ও পাপের প্রতি, বরং এদু'টোর স্রষ্টার প্রতি আমরা পরিতুষ্ট। কেননা আল্লাহ্ পুণ্য-পাপ দু'টোরই স্রষ্টা হলেও পাপের ও পাপীর প্রতি তিনি অপরিতুষ্ট এবং পরিতুষ্ট পুণ্যের ও পুণ্যবানের প্রতি। এমতো

পরিতুষ্টির অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় জ্ঞান-বিবেক ও দলিল প্রমাণের দ্বারাও। জ্ঞানীগণ যখন লক্ষ্য করেন, আল্লাহ্পাকই সকলকিছুর একক অধিকর্তা, তখন সকলকিছুকেই তিনি পরিচালনা করবেন তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই হবেন সতত স্বাধীন। তাঁর অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি-অনুযোগ-অভিযোগ খাটবেই না। জ্ঞানীগণ এ-ও বোঝেন যে, আল্লাহ্পাক মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই প্রজ্ঞামণ্ডিত। কাজেই তাঁরা অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি থাকেন পরিতুষ্ট। বিশ্বাস করেন, প্রবৃত্তির দ্রোহ এবং ধর্মীয় দুর্বলতার মধ্যেই লুকানো থাকে অবিশ্বাস ও পাপের বীজ। আর অবিশ্বাস ও পাপ অবশ্যই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি উদ্রেককারী। প্রখ্যাত সুফী-সাধক সররি সাকতি এমতো পরিতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন, তুমি যদি তাঁর প্রতি তুষ্টই না থাকো, তবে তাঁর পরিতুষ্টির আশা করবে কীভাবে?

পরিতুষ্টির দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে— বান্দা অনুরাগী হবে তাঁর প্রভুপালনকর্তার যাবতীয় ইচ্ছার, যদিও তা হয় তার প্রবৃত্তির বিপরীত। আল্লাহ্প্রেম তো হওয়া উচিত স্বভাবজ। প্রেমাস্পদের প্রতি সদামুগ্ধ থাকাই তো প্রেমিকদের স্বভাব। প্রেমাস্পদের প্রতিটি কার্যকলাপই প্রেমিকগণের দৃষ্টিতে হয় চিত্তাকর্ষক, সুন্দর। তাই প্রেমিকেরা তাদের প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে আঘাত সুখ-দুঃখ সকলকিছুর প্রতিই হয় অনুরাগী। প্রেমের নিয়মই এরকম। তাই জনৈক কবি বলেছেন, তুমি যদি আমার বিরহ-যাতনাতেই তুষ্ট হও, তবে আমি তাতেই তুষ্ট।

তৃতীয় প্রকারের পরিতুষ্টির ব্যাখ্যা এরকম— মানুষ যখন আশা-আকাংখার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে পরিতৃপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ই তার পরিতোষ কামনা করেন। যেমন সুরা দুহায় বলা হয়েছে 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে'। এই আয়াতখানি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রসুল স. বলেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মত জাহান্নামে থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না।

'জালিকা লিমান খশিয়া রব্বাহ্' অর্থ এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের পরম প্রসন্নতা পেয়ে পরিতুষ্ট হতে পারবে ওই ব্যক্তি, যে ভয় করবে আল্লাহ্কে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ভীতিই সকল সৎকর্মের উৎস এবং সকল অশুভ কর্মের প্রতিবন্ধক।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার উবাই ইবনে কা'বকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেনো তোমার সম্মুখে কোরআন তেলাওয়াত করি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— আমি যেনো তোমাকে সুরা বায়্যিনাহ্ পাঠ করে শোনাই। উবাই বললেন, আল্লাহ্ কি আমার নামোচ্চারণ করেছেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। উবাই বললেন, মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালয়িতা কি আমারই নাম বলেছেন! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে উবাই অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, হজরত উবাই ইবনে কা'বের এমতো অবস্থা ছিলো প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরের।

সূরা যিল্‌যাল

৮ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যতীর্থ মদীনায়।
সূরা যিল্‌যাল ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿١﴾ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ﴿٢﴾
وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ﴿٤﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ
اَوْحٰى لَهَا ؕ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۬ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ﴿٦﴾
فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ﴿٧﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۧ﴿٨﴾

---

r পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে,
r এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে,
r এবং মানুষ বলিবে, ‘ইহার কী হইল?’
r সেই দিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে,
r কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন,
r সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, যাহাতে উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান যায়,
r কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে
r এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে ‘ইজা যুলযিলাতিল আরদ্বু যিল্‌যালাহা’। এর অর্থ পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের দিন পৃথিবী ভয়ংকরভাবে কাঁপতে শুরু করবে, যে রকম কম্পন তার উপযুক্ত। অথবা— পৃথিবী তখন প্রবলভাবে আলোড়িত হতে থাকবে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত নৈসর্গিক নিয়মে। কিংবা— যতোখানি আলোড়িত হওয়া তার পক্ষে উপযুক্ত, ততোখানিই তখন আলোড়িত হবে এই ধরিত্রী। বা— এ ভূপৃষ্ঠের জন্য যতোখানি প্রবল আলোড়ন নির্ধারণ করা হয়েছে, ততোখানিই তখন আলোড়িত হবে সে।

ইবনে আবী হাতেমের বিবরণে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই আলোড়ন সৃষ্টি হবে পৃথিবীর নিম্নতম স্তর থেকে। তবে প্রকম্পনকালের সময়সীমা সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ওই প্রকম্পন শুরু

হবে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের আগে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রকম্পন শুরু হবে দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে, পুনরুত্থানের সময়। প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তা শায়েখ ইবনে আরাবী ও তাঁর সমমতাবলম্বীগণ। তাঁদের দলিল হচ্ছে এই আয়াত 'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন স্তন্যদায়িনী মাতা বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের। আর তুমি দেখতে পাবে, মানুষেরা যেনো মাতাল......'। শেষোক্ত মতের প্রবক্তাদের প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত। এমতাবস্থায় এই আয়াতের প্রকৃতার্থ গ্রহণ না করে গ্রহণ করতে হবে রূপকার্থ। তাঁরা তাঁদের দাবির সমর্থনে আরো উপস্থাপন করেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত ও প্রত্যয়িত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, আমরা কয়েকজন রসুল স. এর পাশে ছিলাম যখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রভুপালনকর্তাকে। নিশ্চয় মহাপ্রলয়ের প্রকম্পন হবে অতি ভয়াবহ। সেদিন তোমরা দেখতে পাবে, স্তন্যদায়িনী মাতা ভুলে গিয়েছে তার দুগ্ধপানরত শিশুকে, গর্ভপাত ঘটেছে গর্ভিনীদের। আর তুমি মানুষকে দেখতে পাবে মাতাল সদৃশ.....'। রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো, ওই দিন হবে কোন দিন? যেদিন আল্লাহ্ পিতা আদমকে বলবেন, তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে দোজখীদের অংশ পৃথক করে ফেলো।

হাদিসটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্ নবী আদমকে ডেকে বলবেন, ওঠো! তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে দোজখের অংশ বের করে দাও। তিনি নিবেদন করবেন, হে আমার প্রভুপালক! দোজখের অংশ কতো? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি সহস্রে নয়শত নিরানব্বই জন। এরূপ নির্দেশ শুনে তখন ভয়ে-আতংকে বালকেরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। গর্ভপাত ঘটে যাবে গর্ভবতীদের। আর তোমাদেরকে দেখা যাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের মতো, অথচ তোমরা নেশাগ্রস্ত হবে না। এরকম হবে তোমরা শাস্তির ভয়াবহতা দেখে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে ওই প্রতি হাজারের একজন হবে কারা? তিনি স. বললেন, ইয়াজুজ-মাজুজদের মধ্য থেকে একহাজার এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন। অন্যান্য জাতির মধ্যে তোমরা হবে শাদা বলদের চামড়ার পশমের মধ্যে একটি কালো পশমের মতো। অথবা কালো ষাঁড়ের চামড়ার একটি শাদা পশম।

দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে যারা বলেন, তাদের অভিমত অভ্রান্ত নয়। আর তাঁরা তাঁদের অভিমতের পক্ষে যে হাদিস উপস্থাপন করেন, তার দ্বারাও তা প্রমাণিত হয় না যে, প্রকম্পনের ঘটনা ঘটবে তখন, যখন হজরত আদমকে দেওয়া হবে দোজখীদের অংশ বের করার নির্দেশ। তবে এতোটুকু প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায় যে, তখনও পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং ওই প্রকম্পনের পরেই হজরত আদমকে দেওয়া হবে কথিত নির্দেশ। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, রসুল স. প্রথম কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কম্পনের কথাও

আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার মতে বোখারী-মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটির এরকম ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে না। কেননা সেখানে স্পষ্ট করেই একথা বলা হয়েছে যে, দোজখীদের অংশ বের করার নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার সময়েই বালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতীদের ঘটবে গর্ভপাত। বরং আমি মনে করি, প্রকম্পনের ঘটনা ঘটবে কয়েকবার। তার মধ্যে একবার মহাপ্রলয়ের নিদর্শন হিসেবে এবং আর একবার পুনরুত্থানের পর। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে'। এখানে 'পৃথিবী তার ভার বের করে দিবে' কথাটি বলা হয়েছে রূপকভাবে। আসলে আল্লাহ্পাকই তখন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত সকলকিছু বের করে দিবেন। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পৃথিবী তার অভ্যন্তরে সমাহিত সকল লাশ বের করে দিবে। ফারিয়াবী বলেছেন, মুজাহিদের অভিমতও এরকম। এই ব্যাখ্যাটিকে মান্য করলে বলতে হয়, এরকম ঘটবে দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে।

আতিয়ার ব্যাখ্যাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, ভূমি তার অভ্যন্তরে রক্ষিত ধনভাণ্ডার বাইরে নিক্ষেপ করবে। সুতরাং এখানকার 'ভার' অর্থ ভূমধ্যস্থিত খনিজ সম্পদ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভূমি তখন তার কলিজার টুকরা সোনা-রূপা উগলে বের করে দিবে। একজন হত্যাকারী এসব দেখে বলবে, এগুলোর জন্যই তো আমি মানুষ খুন করতাম। একজন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বলবে, আমি তো আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতাম এসবের কারণেই। তস্কর বলবে, আমি তো অপহরণ করতাম এগুলোই। আর আমার হস্তও কর্তন করা হয়েছিলো এজন্য। কিন্তু ওগুলো গ্রহণ করার প্রবৃত্তি আর তখন কারো থাকবে না। মুসলিম।

সুপরিণত সূত্রসহযোগে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেই সময় আসন্ন, যখন সর্বোত্তম স্বর্ণ বহির্গত হবে ফোরাতের তীর থেকে। কিন্তু তখন পথচারীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে— সেদিন ততোক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতোক্ষণ না দৃষ্টিগোচর হবে ফোরাত নদী থেকে উত্থিত স্বর্ণের পাহাড়। তা হস্তগত করার জন্য জনতা লিপ্ত হবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। নিহত হবে শতকরা নিরানব্বই জন। সবশেষে একজন বেঁচে থাকবে। বলবে, সম্ভবত আমিই একমাত্র জীবিত। আমি বলি, প্রথমেই শুরু হবে হত্যাকাণ্ড। শেষে ওই সম্পদ আর কারো ভাগ্যেই জুটবে না।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো'? একথার অর্থ— ভূমির কম্পন ও উদগীরণ দেখে তখন মানুষ বলবে, কী সংঘাতিক কাণ্ড! কী ভয়ংকর ভূকম্পন!

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে ‘মানুষ’ অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। কেননা তারা পুনরুত্থান দিবসকে বিশ্বাস করতো না। তাই তারা নিজেদেরকে পুনরুত্থিত হতে দেখে বলবে, কী অবাক কাণ্ড! এ কী হচ্ছে! আর বিশ্বাসীগণ তখন বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌পাক এই দিবসেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর তাঁর মহান প্রেরিত পুরুষগণও একথা প্রচার করেছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘সেইদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে’। বাগবী লিখেছেন, এখানকার ৩ ও ৪ সংখ্যক আয়াতের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ লক্ষণীয়। মূলে যেনো বক্তব্যটি ছিলো এরকম— সেদিন পৃথিবী বর্ণনা করবে তার উপর সংঘটিত ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে। আর মানুষ বলবে, আরে পৃথিবীটার হলো কী! এতো দেখছি সবকিছু উন্মোচন করে দিচ্ছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আলোচ্য আয়াত পাঠ করার পর বললেন, তোমরা কি জানো, তখন ভূমি কী বর্ণনা করবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, ভূমি তখন পৃথিবীর সকল নর-নারীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে। বলবে, অমুক ব্যক্তি আমার উপরে এরূপ এরূপ কাজ করেছিলো। হাদিসটি বর্ণনা ও প্রত্যয়ন করেছেন তিরমিজিও। হজরত রবীয়া হারাছীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্তিকার সঙ্গে তোমরা সদাচরণ কোরো। কেননা মৃত্তিকা তোমাদের মাতা। তার উপরে তোমরা যা-ই কিছু করো না কেনো, সেই বৃত্তান্ত সে বর্ণনা করবেই। তিবরানী আরো বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদও এরকম বলেছেন।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন’। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এখানকার ‘বি আন্‌না’ পদের ‘বা’ অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর ‘লাহা’ শব্দের ‘লা’ (জন্য) অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘ইলা’ (প্রতি) অর্থে। অর্থাৎ পৃথিবী তখন একারণেই তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করবে যে, সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এ সম্পর্কে লাভ করবে ইঙ্গিত বা আদেশ। বাক্যটি পূর্বের আয়াতের বক্তব্যের অনুবর্তী, অথবা জবাব। অর্থাৎ মানুষ যখন বলবে ‘এ কী হলো’ তখন তার জবাবে পৃথিবী বলবে, আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে আমাকে এরকমই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আমার অস্তিত্ব জুড়ে সৃষ্টি করবো প্রকম্পন এবং আমার ভিতরের সকলকিছু নিক্ষেপ করবো বাইরে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়’। অর্থাৎ সেদিন হিসাব নিকাশ গ্রহণের পর মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে পৃথক পৃথক দলে। কেউ যাবে ডানে জান্নাতের দিকে এবং কেউ বামে জাহান্নামের দিকে।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার ‘যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়’ কথাটির অর্থ করেছেন— তাদেরকে তখন দেখানো হবে তাদের কৃতকর্মের ফলাফলরূপে স্বস্তি অথবা শাস্তি।

উল্লেখ্য, এখানে 'তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়' কথাটি বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে এভাবে— 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে (৭) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে, সে তা-ও দেখবে' (৮)।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উদ্ধৃতি সহযোগে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, যখন 'আল্লাহ্কে ভালোবেসে যারা আহার করায় পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত ও বন্দীকে' এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণের কেউ কেউ ধারণা করলেন, যৎসামান্য কিছু আল্লাহ্র পথে দান করলে হয়তোবা সওয়াব পাওয়া যাবে না। আবার কারো কারো মনে এরকম ধারণারও উদয় হলো যে, ছোটখাট বিষয়ে মিথ্যা কথা বলায়, অথবা নর-নারীর প্রতি দুই চারবার দৃষ্টিপাত করায় হয়তোবা পাপ নেই। এগুলোর জন্য কোনো শাস্তিও হবে না। শাস্তি প্রয়োগ করা হবে তো কেবল বৃহৎ বৃহৎ পাপের জন্য। এরূপ অপধারণা অপনোদনার্থেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য সুরার শেষোক্ত আয়াতদ্বয়।

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে' অর্থ যদি কেউ ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ অথবা ততোধিক ক্ষুদ্র সৎকর্মও করে, তবুও ওই সৎকর্মের প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে আখেরাতে। অর্থাৎ তাকে তখন সম্মুখীন করা হবে ওই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৎকর্মের প্রতিদানের। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির দ্বারা বিশ্বাসীদেরকে সৎকর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে চরমভাবে। যেনো বলা হয়েছে, তোমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৎকর্মের সুযোগও হস্তচ্যুত কোরো না। কেননা তা পরকালে হতে পারে অনেক বড় বিনিময়প্রাপ্তির নিমিত্ত। রসুল স. বলেছেন, কেউ তার পবিত্র উপার্জন থেকে অর্ধেকটি খেজুর দান করলেও আল্লাহ্ তা গ্রহণ করেন এবং তাকে বৃদ্ধি করতে থাকেন। ফলে তা বৃদ্ধি হতে হতে হয়ে যায় পর্বত সদৃশ। যেমন তোমাদের দ্বারা প্রতিপালিত গোশাবক কালক্রমে ধারণ করে বিশাল আকৃতি। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কল্যাণকর সামান্য কর্মকেও তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান কোরো না। যেমন প্রফুল্ল বদনে ভ্রাতাদের সঙ্গে সাক্ষাত। মুসলিম। আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণী মুতাজিলাদের বিপক্ষে এবং আহলে সুন্নত জামাতের পক্ষে। কেননা সুন্নত জামাতের অভিমত হচ্ছে, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা বড় বড় পাপে পাপী, তারা দোজখে গেলেও চিরকাল সেখানে থাকবে না। পাপমোচনের পর নিষ্কৃতি পাবে এবং অবশেষে প্রবেশ করবে বেহেশতে। পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে এর বিপরীত। আল্লাহ্পাকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যবাস্তবায়নব্য। আর তিনি তো এখানে স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন যে— অণু পরিমাণ পুণ্যকর্মের প্রতিদানও তিনি দিবেন। তবে এমতো প্রতিদান পাবে কেবল ইমানদারেরা। কেননা ইমানই সকল প্রকার পুণ্যকর্মের ভিত্তি। সুতরাং ইমানদারেরা পাপের শাস্তি ভোগ করলেও পুণ্যের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না। আর পুণ্যের প্রকৃত প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। তাছাড়া

রসুল স. এর সুমহান বাণীও এর সমার্থক। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অণু পরিমাণ বিশ্বাসও লালন করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করলেও অবশেষে সেখান থেকে বের হয়ে আসবে।

হজরত ওসমান গনি থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে। হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে শিরিক নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর শিরিকবিমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীরা যাবে জান্নাতে।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল' তার জন্য দোজখ নিষিদ্ধ। হাদিসটি বোখারী-মুসলিম কর্তৃক সংকলিত হয়েছে হজরত আনাস ও হজরত উতবান ইবনে মালেক থেকে, হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর সূত্রে এবং মুসলিমের নিকট পৌঁছেছে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ইমান বিদ্যমান, তারা দোজখে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ তার জন্য চিরস্থায়ী দোজখবাস হারাম। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি সে চোর ও ব্যভিচারী হয়, তবুও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনঃ পুনঃ আরো দু'বার একই প্রশ্ন করলাম। তিনিও একই জবাব দিলেন। শেষে বললেন, হ্যাঁ, তবুও, আবু জরের নাসিকা ধূলিধূসরিত হলেও (তুমি তা পছন্দ না করলেও)। আহমদ, বাযযার এবং তিবরানীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূ্যতী বলেছেন, এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলো সুবিদিত পর্যায়ের চেয়েও অধিক সুবিদিত।

একটি সংশয় ঃ আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য সাধারণার্থক। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে কেবল অণু পরিমাণ পুণ্য ও পাপের প্রতিদানপ্রাপ্তির কথা। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পার্থক্য তো এখানে করাই হয়নি। তাহলে কেনো একথা বলা হবে যে, অবিশ্বাসীরা চিরকাল দোজখে থাকবে?

সংশয়-নিরসন ঃ অবিশ্বাসীরা তাদের পুণ্যকর্মের বিনিময় পাবে না। কেননা পুণ্যকর্ম গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত, যা ইমান ছাড়া সম্ভবই নয়। রসুল স. বলেছেন, আমলের প্রতিফলপ্রাপ্তি নিয়ত বা বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বুঝতে হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পুণ্যকর্ম ওজুবিহীন নামাজের মতো। আর কে না জানে, ওজু ছাড়া নামাজ হয় না। বরং এরকম কাজ নামাজের প্রতি উপহাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। একারণেই বিদ্বানগণ বলেছেন, কেউ যদি কাফের অবস্থায় নামাজ-রোজা-ইতেকাফ পালনের মানত

করে, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেলেও তার ওই মানত পূরণ করা অত্যাবশ্যক হবে না। কেননা তার তখনকার নামাজ-রোজা-ইতেকাফ ধর্তব্যই নয়। তাই বুঝতে হবে, কাফেরদের পুণ্যকর্ম মরীচিকা সদৃশ, যা দৃশ্যত পানি বলে মনে হলেও মূলতঃ অস্তিত্বহীন।

শেষে বলা হয়েছে— 'কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও সে তা-ও দেখবে'। শিরিক ছাড়া অন্যান্য পাপ যে তওবার মাধ্যমে অথবা তওবা ছাড়াও মার্জনা করা হয়, সে কথা আমরা ইতোপূর্বে বলেছি। সুতরাং এখানকার 'অসৎকর্ম' অর্থ হবে— বিশ্বাসীগণের সাধারণ পাপ। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা দিবেন শাস্তি'— এই আয়াতও প্রযোজ্য হবে কেবল ইমানদারদের ক্ষেত্রে। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহ্র করুণা থেকে নিরাশ হয় না'। অন্য আর এক আয়াতে নির্দেশ এসেছে 'তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না'।

হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাঁর নিরূপম হাতে আমার জীবনপ্রদীপ, তাঁর শপথ করে বলি, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ ক্ষমার সাধারণ ঘোষণা দিবেন। এমনকি তখন ইবলিসও আশান্বিত হয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তার ভাগ্যে ক্ষমা জুটবে না। বায়হাকী। এ বিষয়ে এতো অধিকসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, বিষয়টি অতিক্রম করেছে সুবিদিত পর্যায়।

পথভ্রষ্ট মরজিয়া সম্প্রদায় বলে, ইমানদার ব্যক্তি যদি ফাসেকও হয়, তবুও আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। আর ইমান যার আছে, তার জন্য পাপ ক্ষতিকর নয়। তাদের এমতো অপধারণার বিরুদ্ধে আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে সুষ্পষ্ট প্রতিবাদ। আর আয়াতখানি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ বিশ্বাসের পক্ষের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অর্থাৎ প্রকৃত কথা হচ্ছে— কোনো ইমানদারের পাপ যদি ক্ষমা না করা হয়, তবে তা অবশ্যই উপস্থাপন করা হবে তার সম্মুখে। আর এর জন্য তাকে শাস্তিও দেওয়া হতে পারে, আবার করে দেওয়া হতে পারে ক্ষমা। ইমানদারদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, এরকম কথা কোরআন মজীদের কোথাও নেই। বরং কোরআন মজীদে শাস্তির কথা উল্লেখ করে বার বার তাদেরকে শাসানোই হয়েছে। আর বহুসংখ্যক হাদিসেও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্র পাপের জন্যও শাস্তি দিবেন। কেননা তিনি ন্যায়বিচারক। আবার বৃহৎ পাপও তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। কেননা তিনি পরম মার্জনাপরবশ। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এরকমই। আর বলা বাহুল্য, এই জামাতের আকিদাই বিশুদ্ধ আকিদা।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, মহাবিচারের দিন পাপীর দৃষ্টিতে তার ক্ষুদ্র পাপও মনে হবে বিশাল পাহাড় সদৃশ। হজরত সাঈদ ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হুনাইন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. শিবির স্থাপন করলেন তরুলতাহীন এক বিজন প্রান্তরে। আজ্ঞা করলেন, তোমরা যা কিছু পেয়েছো, তা আমার সামনে হাজির করো। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। প্রস্তুত হলো বিভিন্ন

দ্রব্যসামগ্রীর এক বিশাল স্তূপ। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি স. বললেন, দ্যাখো। এভাবেই একত্রিত করা হবে মানুষের পাপের বোঝা। সুতরাং মানুষের উচিত, তারা যেনো আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বেঁচে থাকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার পাপ থেকে। কেননা পাপরাশির প্রতিফল উপস্থিত করা হবে পাপীদেরই বিরুদ্ধে। তিবরানী।

নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, আয়েশা! ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপ থেকেও বিরত থেকো। কেননা সে সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনে হাব্বান হাদিসটির প্রত্যয়নও করেছেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, তোমরা ছোট খাটো পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করো। কিন্তু রসুল স. এর যুগে আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক পাপ বলে গণ্য করতাম। বিশুদ্ধসূত্রসহযোগে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কোরআন মজীদের মধ্যে এই সুরার শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ই সর্বাধিক সুদৃঢ় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। হজরত আনাস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদিসের একাংশে বলা হয়েছে— এই সুরার শেষোক্ত আয়াতদ্বয় নজিরবিহীন সমাবদ্ধ আয়াত। রবী ইবনে খাইছুম বর্ণনা করেছেন, এক লোক হাসান বসরীর পাশ দিয়ে সুরা যিলযাল পাঠ করতে করতে যাচ্ছিলো। তার পাঠ যখন শেষ হলো, তখন হাসান বসরী বললেন, বৎস! শেষ আয়াত দু'খানির নসিহতই আমার জন্য যথেষ্ট। এখানেই তুমি তোমার সদুপদেশের সীমারেখা টেনে দিয়েছো।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমাকে কিছু সদুপদেশ দিন। তিনি স. বললেন, কোরআন মজীদের আলিফ লাম র সংযুক্ত সুরা তিনখানি পাঠ কোরো। লোকটি বললো, আমি তো বয়োবৃদ্ধ। হৃদয় অ-কোমল। রসনাও ভারী। আমার পক্ষে এ নির্দেশ আয়ত্ত করা দু'ঃসাধ্য। রসুল স. বললেন, তাহলে পাঠ কোরো 'হা-মীম' সম্বলিত যে কোনো তিনটি সুরা। লোকটি পুনরায় তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলো। তারপর বললো, আমাকে এমন একটি সুরা শিক্ষা করতে বলুন, যা সমাবদ্ধ, পুণ্যে ভরপুর। রসুল স. তখন তাকে শিক্ষা দিলেন সুরা যিলযাল। লোকটি সুরাখানি স্মৃতিস্থ করার পর বললো, সেই পরম সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি এর কম অথবা বেশী আবৃত্তি করবোই না। একথা বলেই সে প্রস্থান করলো। তার দিকে তাকিয়ে তিনি স. বললেন, লোকটি সফলতা অর্জন করলো। আহমদ, আবু দাউদ।

হজরত আনাস এবং হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা যিলযাল অর্ধ কোরআনের সমতুল। সুরা ইখলাস ও সুরা কাফিরূন সমতুল যথাক্রমে এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের। তিরমিজি, বাগবী। ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে তিরমিজির অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, সুরা যিলযাল এক চতুর্থাংশ কোরআন তুল্য।

জাফরী বলেছেন, সুরা যিলযাল এক চতুর্থাংশ কোরআনের তুল্য। অর্থাৎ কোরআন মজীদে প্রধানত বর্ণিত হয়েছে চারটি বিষয়— জীবন, মৃত্যু, বিচার দিবসের মহাসমাবেশ ও হিসাব-নিকাশ। আর এই সুরায় বর্ণিত হয়েছে কেবল হিসাব নিকাশের কথা। আবার একে অর্ধেক কোরআনের সমতুল বলা হয়েছে একারণে যে, কোরআনে মূলত আলোচনা করা হয়েছে ইহলোক ও পরলোকের কথা। এই সুরায় বলা হয়েছে কেবল পরলোকের কথা। একটি অতি শিথিল সূত্রপরম্পরায় হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি চারবার সুরা যিলযাল তেলাওয়াত করে, সে সওয়াব পায় সমগ্র কোরআন তেলাওয়াতের। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা আ'দিয়াত

১১ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যময় নগরী মক্কায়।

হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বায্যার, দারাকুতনী, হাকেম ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনীকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। এক মাস গত হলো। কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোনো খবরাখবর পাওয়া গেলো না। রসুল স. বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা আ'দিয়াত ঃ আয়াত **১—১১**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿٣﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿٥﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿٦﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۗ﴿٨﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ﴿١٠﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۚ﴿١١﴾

r শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,

r যাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,

r যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,

r এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;

r অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

r মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ

r এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,

r এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।

r তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহা আছে তাহা উত্থিত হইবে

r এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?

r সেই দিন উহাদের কী ঘটিবে, উহাদের প্রতিপালক অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।

এখানে 'আলআ'দিয়াত' অর্থ আল্লাহ্‌র পথের যোদ্ধবৃন্দের ধাবমান সমরাশ্ব। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কালাবী, কাতাদা, আবুল আলিয়া প্রমুখ ভাষ্যকারগণ। আর আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতরূপে যদি উপরোল্লিখিত বিবরণটিকে গ্রহণ করা হয়, তবে বলতে হয়, সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। কেননা রসুল স. এর মক্কাবাসের সময় জেহাদের প্রত্যাদেশ আসেনি। জেহাদ তো অপরিহার্য হয়েছে তাঁর মদীনায় হিজরতের পর। এতদসত্ত্বেও যদি মনে করা হয়, এই সুরা মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে ধরে নিতে হবে, এখানে ধাবমান সমরাশ্বের শপথ করা হয়েছে ভবিষ্যতের জেহাদের দিকে ইঙ্গিত করে।

'দ্ববহান' অর্থ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। এখানে কর্মপদের ক্রিয়াপদ রয়েছে অনুক্ত। আর পুরো বাক্যটিই এখানে অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ উর্ধ্বশ্বাসে, হাঁপাতে হাঁপাতে। প্রকৃতপক্ষে 'দ্ববহান' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘোড়া, কুকুর ও শৃগাল ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর হাঁপানীর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। আর তাদের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায় কেবল তখনই, যখন তারা পরিশ্রান্ত হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

হজরত আলী বলেছেন, হজযাত্রীদের উষ্ট্রপালকে বলে 'আল আ'দিয়াত' যখন সেগুলো ধাবিত হয় আরাফা থেকে মুজদালিফায় এবং মুজদালিফা থেকে মিনায়। ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিলো বদর যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে আমাদের ছিলো কেবল দু'টি ঘোড়া— একটি যোবায়েরের এবং অপরটি মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের। এই বর্ণনাটিকে যদি মান্য করা হয়, তবে এখানকার 'আল আ'দিয়াত' অর্থ সমরাশ্ব হতে পারে কীভাবে? এরকম প্রশ্ন তুলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ ও সুদ্দী। মোহাম্মদ ইবনে কা'বের উক্তিও এরকম। সুতরাং তাঁদের মতে এখানকার 'দ্ববহান' কথাটির অর্থ হবে— দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট অগ্রসরমান উটের পাল।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে'। এখানে 'মূরিয়াত' অর্থ ওই সকল ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ঘোড়া, যেগুলো প্রস্তরময় পথে রাতে চলার সময় ক্ষুরের আঘাতে উদগিরিত করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা অভিযান করে প্রভাতকালে'। এখানকার 'আল মুগীরাত' অর্থ দ্রুতগতিসম্পন্ন। আর 'মুগীরাত' অর্থ ওই সকল যুদ্ধাশ্ব, যেগুলো অতি প্রত্যুষে স্বীয় আরোহীসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্রসেনাদের উপর। অধিকাংশ ভাষ্যকারই এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন। তবে কুরতুবী কথাটির অর্থ করেছেন— ওই উষ্ট্র, যে কোরবানীর দিন ঊষাকালে তার আরোহীকে বহন করে নিয়ে যায় মুজদালিফা থেকে মিনায়। অবশ্য প্রত্যুষের পূর্বে মুজদালিফা ত্যাগ না করা সুন্নত। বরং ওয়াজিব। তবে রসুল স. নারী ও শিশুদেরকে কোরবানীর দিন ফজরের সময় হলেই যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে'। এখানকার 'বিহী' কথাটির 'হী' (সেই) সর্বনামটি প্রত্যাবর্তিত হবে শক্রকুলের প্রতিআক্রমণ মুহূর্তের দিকে। বাক্যের গতিপ্রবাহ এখানে একথাটিই প্রমাণ করে। অথবা সর্বনামটি প্রত্যাবৃত হবে শক্রকুলের অবস্থানস্থলের প্রতি। এরকম ধরে নেওয়া যায় বাক্যটির ইঙ্গিত থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শপথ ওই সকল অশ্বের, যেগুলো শক্রকুলের উপরে হানা দেওয়ার সময়, অথবা তাদের অবস্থান স্থলে আক্রমণ করার সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর শক্রদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে'। অর্থাৎ অতঃপর ঢুকে পড়ে তাদের ব্যূহ ভেদ করে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ'। বাক্যটি শপথের জবাব। আর এখানকার 'আল ইনসান' (মানুষ) এর নির্দিষ্টার্থক 'আল' অব্যয়টি জাতিবাচক হলেও মানবজাতির কিয়দংশের অর্থপ্রকাশক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ক্বলীলুম মিন ই'বাদীয়াশ্ শাকুর'। এই আয়াতেও অকৃতজ্ঞদের সংখ্যানিরূপণ করা হয়েছে কিয়দংশের ভিত্তিতে। আর এখানকার 'লি রব্বিহী' (প্রতিপালকের প্রতি) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'লা কানূদ' (অকৃতজ্ঞ) এর সঙ্গে। এরকম রীতিবিরুদ্ধ সম্পৃক্তির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এখানে 'লা কানূদ' এর পূর্বে 'লি রব্বিহী' বসানো হয়েছে ছন্দের যতিপাত সম্পাদনার্থে।

'কানূদ' অর্থ এখানে— অকৃতজ্ঞ। মুজারগোত্রের আঞ্চলিক ভাষা অনুসারে শব্দটির অর্থ এরকমই দাঁড়ায় এবং এরকম অর্থ গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা। আবার কুন্দা গোত্রের উপভাষা অনুযায়ী শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— অবাধ্য। মালেকা গোত্রের উপভাষায়— কৃপণ। আবু উবায়দা বলেছেন, 'কানূদ' অর্থ 'ক্বলীলুল খইর' (অকিঞ্চিতকর কল্যাণ)। যেমন 'আরদ্বুন কানূদ' অর্থ অনুর্বর ভূমি।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত'। এখানকার 'ইন্নাহু' 'অবশ্যই সে' কথাটির 'সে' সর্বনামটি স্থলাভিষিক্ত আগের আয়াতের 'মানুষ' এর। আর 'এই' শব্দটির মাধ্যমে এখানে ইঙ্গিত করা

হয়েছে অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য অথবা কৃপণদের অপস্বভাবের প্রতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অথচ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই মুক্ত হতে পারে এমতো অপমনোবৃত্তি থেকে। অথবা বিষয়টি তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে পরকালে। তখন বলবে, আমরা নিশ্চয় অপরাধী। আমরা নামাজ পাঠ করতাম না। অন্নাভাবীদেরকে অন্ন দান করতাম না। পক্ষান্তরে অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাদের মতে এখানকার 'অবশ্যই সে' কথাটির 'সে' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে আগের আয়াতের 'প্রতিপালক' এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষের অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা, অথবা কৃপণতা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। তাঁর কাছে কোনোকিছুই গোপন নয়। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতে অকৃতজ্ঞদের প্রতি ঘোষিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল'। এখানেও 'সে' শব্দটি সর্বনাম 'মানুষ' এর। আর 'আল খইর' অর্থ এখানে ধন-সম্পদ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন তারাকা খইরান' (যদি সে পরিত্যাগ করে সম্পদ)।

'লাশাদীদ' অর্থ সুকঠিন, প্রবল। যদি ৬ সংখ্যক আয়াতের 'কানূদ' শব্দটির অর্থ অকৃতজ্ঞ হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানকার 'লিহুব্বিল খইর' (ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল) বাক্যের 'লাম' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে যোজক অব্যয় হিসেবে। অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদের মোহে প্রবলভাবে জড়িত। তাই তারা তাদের অর্থ-বিত্ত কল্যাণকর পথে ব্যয় করে না। আর 'কানূদ' অর্থ যদি হয় কৃপণতা, তবে এখানকার 'লাম' অব্যয়টি হবে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ মানুষ কার্পণ্য প্রকাশ করে অতিরিক্ত সম্পদাসক্তির দরুন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয়, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে (৯) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে' (১০)? এখানকার 'আফালা ইয়া'লামু' (সে কি অবহিত নয়) কথাটির 'হামযা' বিস্ময়প্রকাশক। আর 'ফা' অব্যয়টি যোজক। আর এর যোজ্য ক্রিয়াটি এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ কথাটি দাঁড়ায়— আলা ইয়ানজুরু ফালা ইয়া'লামু (একি বিস্ময়! মানুষ এখনো এ সম্পর্কে অবহিত নয় কেনো)। এভাবে পুরো বাক্যটি দাঁড়াবে— তবে কি সে এ সম্পর্কে জানে না যে, মৃত্যুর পর তার সমাধি থেকে তাকে পুনরুত্থিত করা হবেই। তারপর আল্লাহ্‌পাক তাকে দিবেন তার কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল। এমনকি তার অন্তরে যা কিছু লুক্কায়িত আছে, বিশ্বাস, অথবা অবিশ্বাস সবকিছুকেই তখন প্রকাশ করা হবে সর্বসমক্ষে?

এখানকার 'মা ফীল কুবূর' (কবরে যা আছে) বাক্যটি হওয়া উচিত ছিলো 'মান ফীল কুবূর'। কিন্তু তা করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, পরের আয়াতের 'মা ফীস্ সুদূর' (অন্তরে যা আছে) এর সঙ্গে ধ্বনিসামঞ্জস্য সাধন এবং এর আর একটি কারণ হচ্ছে একথা বুঝানো যে, মৃত ব্যক্তিরাও জড় পদার্থতুল্য নিঃসাড়, নিশ্চেতন।

‘ওয়া হুস্‌সিলা মা ফীস্ সুদূর’ অর্থ এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে। লক্ষণীয়, এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে অন্তরস্থিত প্রতীতি প্রকাশ করার কথা। অর্থাৎ তখন প্রকাশ করা হবে মানুষের অন্তরের বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসকে। কেননা বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসই মানুষের যাবতীয় শুভ-অশুভ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি।

শেষোক্ত আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— ‘সেদিন তাদের কী ঘটবে, তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত’। আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ। তৎসত্ত্বেও এখানে বিশেষভাবে তাঁর সেদিনের ঘটনাবলীর অবহিতির কথা বলা হয়েছে প্রতিফল দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধির জন্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে ‘খবীর’ অর্থ বিনিময়দাতা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌পাক সেদিন সকলের কর্মকাণ্ডের যথোপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। এরকম অর্থ করেছেন জুজায।

সূরা ক্বারিয়াহ্

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়। এতেও রয়েছে **১১**টি আয়াত।

সূরা ক্বারিয়াহ্ ঃ আয়াত **১**, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾

r মহাপ্রলয়,
r মহাপ্রলয় কী?
r মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?
r সেই দিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত
r এবং পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।
r তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,
r সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন।

এখানে ‘আল ক্বারিয়াহ্’ অর্থ কিয়ামত, মহাপ্রলয়। কথাটির সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সুরা ‘আল হাক্বক্বা’র তাফসীরে। শব্দটিতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ‘তা’ ব্যবহৃত হয়েছে এজন্য যে, এটি একটি বিশেষণ। আর এখানে এর বিশেষ্য

(সময়, মুহূর্ত, কাল) রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময় সবকিছু হয়ে যাবে ধ্বংস। অথবা শব্দটি এখানে আধিক্যজ্ঞাপক। এভাবে এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! মহাপ্রলয়ের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন, যখন মানুষসহ সকলকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে? অথবা— মহাপ্রলয়ের ধ্বংসপর্বমধ্যে মানুষও যে থাকবে, তা কি আপনার জানা নেই?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো'। অর্থাৎ তখন মনে হবে মানুষ যেনো উন্মত্ত কীটপতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিচ্ছে ধ্বংসের আগুনে। এখানে মানুষকে পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে শ্লেষ প্রকাশার্থে। অর্থাৎ অত্যধিক আতংক ও অস্থিরতার কারণে মানুষ তখন হয়ে পড়বে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আগুনে আত্মাহুতিদানরত পতঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত ও উন্মাতাল।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মতো'। 'ই'হ্‌ন' বলে রঙবেরঙের পশমকে। অর্থাৎ তখন পাহাড় পর্বতগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে যে, দেখে মনে হবে যেনো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ধূনিত রঙ-বেরঙের পশম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তখন যার পাল্লা ভারী হবে (৬) সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন' (৭)। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে 'সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো'। আর এখান থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাদের পরিণতির বিবরণ। এখানকার 'মাওয়াযীন' বহুবচন 'মাওযুন' এর। এর মর্মার্থ— ওই সকল কর্ম, যা তখন উপস্থিত করা হবে মানুষের সম্মুখে। আর 'কর্ম' অর্থ এখানে কেবল পুণ্যকর্ম। অর্থাৎ পুণ্যবানদেরকে তখন দেখিয়ে দেওয়া হবে তাদের পুণ্যকর্মের স্বরূপ। অথবা এখানকার 'মাওয়াযীন' বহুবচন' 'মীযান' এর। মর্মার্থ— পুণ্যকর্মের পাল্লা। বিশুদ্ধ হাদিসে বলা হয়েছে, ন্যায়ের ওই পাল্লার থাকবে বাকশক্তি এবং তার পক্ষ থাকবে দু'টি। হাদিসটি জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া, 'জুহুদ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন ইবনে মোবারক এবং আবু শায়েখ উল্লেখ করেছেন তাঁর তাফসীরে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আজারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যেমন আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন ন্যায়ের তুলাদণ্ডও।

'যার পাল্লা হবে ভারী' কথাটি একবচনবোধক। আবার 'মাওয়াযীন' উল্লেখিত হয়েছে বহুবচনে। এরূপ রীতিবিরুদ্ধ বহুবচন ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, এখানকার 'মান' (যে, যার) শব্দটি শব্দগতভাবে একবচন হলেও জনসমুদ্রের ইঙ্গিতবহ বলে অর্থগতভাবে বহুবচন। আর বহুবচনের বিপরীতে বহুবচন ব্যবহৃত হলে সে বহুবচন বিভক্ত হয়ে যায় এককের মধ্যে। ফল দাঁড়ায়— দাঁড়িপাল্লা থাকবে প্রত্যেকের জন্য একটি করে। যদিও দাঁড়িপাল্লা হবে একটি। কিন্তু যেহেতু যাদের কৃতকর্ম ওজন করা হবে, তারা হবে অসংখ্য, তাই বলা যেতে পারে, তাদের পাল্লাও যেনো অসংখ্য।

‘ফাহুয়া ফী ঈ’শাতির রদ্বীয়াহ’ অর্থ সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। অর্থাৎ সে তখন হবে মনঃপুত জীবনের অধিকারী। কথাটি রূপকার্থক। প্রকৃতপক্ষে ওই জীবনাধিকারীরাই হবে মনঃপুত। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার ‘রদ্বীয়াতুন’ এর শব্দরূপ কর্তৃবাচক হলেও এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্মবাচক ‘মারদ্বিয়াহ্’ অর্থে। অর্থাৎ মনঃপুত। কিংবা বলা যায়, ‘রদ্বীয়াতুন’ অর্থ এখানে— সন্তোষজনক।

সূরা ক্বরিয়াহ্ ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১

وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

r কিন্তু যাহার পাল্লা হাল্কা হইবে
r তাহার স্থান হইবে ‘হাবিয়া’।
r তুমি কি জান উহা কী?
r উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

‘ওয়া আম্‌মা মান খফ্‌ফাত মাওয়াযীনুহু’ অর্থ কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে। সাধারণভাবে একথার লক্ষ্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তবে ইমান না থাকার কারণে তাদের পুণ্যকর্ম গণনাই করা হবে না। আবার পাপী বিশ্বাসীরাও কথাটির অন্তর্ভূত। তাদেরই পুণ্যাপেক্ষা পাপের পাল্লা হবে ভারী। লক্ষণীয়, ইতোপূর্বে ‘যার পাল্লা ভারী হবে’ বলে বুঝানো হয়েছে নিষ্পাপ মুমিনদেরকে। অথবা যাদেরকে মার্জনা করা হবে, তাদেরকে। কিংবা তাদেরকে, যাদের পাপ অপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা হবে ভারী।

কুরতুবী বলেছেন, আমাদের জ্ঞানীগণের অভিমত হচ্ছে, মহাবিচারের দিবসে মানুষ বিভক্ত হবে তিনটি দলে। একটি দল হবে মুত্তাকীগণের। তাদের আমলনামায় কোনো কবীরা গোনাহ্ থাকবে না। সুউজ্জ্বল পাল্লায় স্থাপিত হবে তাদের পুণ্যকর্মসমূহ। তখন পুণ্যের ভারে সে পাল্লা আর উপরে উঠতে পারবেই না। অপর পাল্লা হালকা হয়ে ভাসতে থাকবে শূন্যে। দ্বিতীয় দল হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের। তাদের অবিশ্বাস ও পাপের বোঝা রাখা হবে অন্ধকার পাল্লায়। আর তাদের দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালনজাত পুণ্য রাখা হবে অপর পাল্লায়। কিন্তু প্রথম পাল্লার তুলনায় দ্বিতীয় পাল্লা হবে ওজনহীন। আর শূন্য পাল্লার মতো তা ঝুলতে থাকবে উপরে। রসুল স. একবার বললেন, বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় কিছুসংখ্যক মোটাতাজা দীর্ঘকায় লোক তুলাদণ্ডের নিকটবর্তী হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাদের ওজন একটি মাছির ওজনেরও সমান হবে না। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন ‘প্রতিফল দিবসে তাদের কোনো ওজনই স্থির হবে না’। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

তৃতীয় দলটি হবে পাপী মুমিনদের। তাদের পুণ্য ও পাপ রাখা হবে যথাক্রমে উজ্জ্বল ও অন্ধকার পাল্লায়। পুণ্যের পাল্লা ভারী হলে তারা যাবে জান্নাতে। আর পাপের পাল্লা ভারী হলে বিষয়টি নির্ভর করবে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর। ইচ্ছা করলে তিনি তখন তাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন জাহান্নামে, আবার ইচ্ছা করলে কৃপাপরবশ হয়ে তাদের পাপরাশি মার্জনা করবেন এবং প্রেরণ করবেন জান্নাতে। আর তাদের দু'টি পাল্লায় যদি সমান সমান হয়, তবে তারা বাস করবে আরাফবাসীদের সঙ্গে। তবে এরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে তখনই, যখন তাদের বৃহৎ পাপগুলো সম্পৃক্ত থাকবে আল্লাহ্র অধিকারের (হকুল্লাহ'র) সঙ্গে। আর যদি তা হয় বান্দার অধিকার (হকুল ইবাদ) সম্পৃক্ত, তাহলে তাদের পুণ্যগুলো দিয়ে দেওয়া হবে অধিকারসংশ্লিষ্ট দাবিদার বান্দাদেরকে। এতে করে যদি তাদের দাবি মিটে যায়, তবে তো ভালোই। নচেৎ তাদের পাপগুলো চাপিয়ে দেওয়া হবে তার ঘাড়ে। ফলে সে পাপগুলোরও শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে।

আহমদ ইবনে হারেছ বলেছেন, প্রতিফল দিবসে মানুষের পুনরুত্থান ঘটানো হবে তাদেরকে তিন দলে ভাগ করে। একদল তাদের পুণ্যকর্মের সুবাদে হবে বিরাট বিত্তপতি। দ্বিতীয় দল চরম অভাবগ্রস্ত হবে পুণ্যকর্মের ঘাটতির জন্য। আর তৃতীয় দলকে প্রথমে দেখা যাবে বিশাল পুণ্যাধিকারী। পরে বান্দার অধিকার পরিশোধ করতে করতে হবে চরম নিঃসম্বল।

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, তুমি যদি সত্তরটি গোনাহ্ নিয়েও আল্লাহ্পাক সকাশে উপস্থিত হও, তবুও তা বান্দার অধিকার খর্ব করার একটি পাপ নিয়ে হাজির হওয়া অপেক্ষা তোমার জন্য হবে উত্তম। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিফল দিবসে মানুষের পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে। যার পাপ অপেক্ষা একটি পুণ্যও অধিক হবে, সে প্রবেশ করবে বেহেশতে। আর যার পুণ্য অপেক্ষা অধিক হবে একটি পাপ, সে প্রবেশ করবে দোজখে। একটি শস্যবীজ পরিমাণ অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে পাপ-পুণ্যের পাল্লায় পার্থক্য সূচিত হবে। আর যাদের পাপ-পুণ্য হবে সমান, তারা অবস্থান করবে আরাফে। তাদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না। এমতাবস্থায় তাকে কিছু পাপের শাস্তি দিয়ে পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা কিছু ভারী করে তাকে করা হবে বেহেশতগমনের উপযোগী।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, নিষ্পাপ মুত্তাকী ব্যক্তিরও পুণ্য ওজন করা হবে। এরকম করা হবে জনসমক্ষে তাঁর মর্যাদা প্রকাশার্থে। আর পুরোপুরি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরও পাপ ওজন করা হবে সর্বসমক্ষে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। আমি বলি, কোরআন মজীদে যেখানেই পুণ্যবান বিশ্বাসীগণকে বিনিময় দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেখানেই বিঘোষিত হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা। তবে পাপ-পুণ্য বিমিশ্রিত বিশ্বাসীগণের ব্যাপারে শরিয়ত নীরব। আর এখানে 'কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে' বলে বলা হয়েছে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা। কেননা পরবর্তী আয়াতে (৯) স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'তার স্থান হবে হাবিয়া'। বলা বাহুল্য, কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই প্রবেশ করবে ভয়ংকর ও লেলিহান অগ্নিশিখাবিশিষ্ট হাবিয়া দোজখে।

‘ফা উম্‌মুহু হাবিয়া’ এর শাব্দিক অর্থ তার মাতা হবে হাবিয়া। অর্থাৎ হাবিয়া দোজখই হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। ‘উম্‌’ অর্থ মাতা। সন্তানের অবস্থান যেমন মাতৃক্রোড়, তেমনি দোজখীদের অবস্থানও হাবিয়া। এরূপ বাগধারা আরবী ভাষায় সুপ্রচল। হাবিয়া একটি গভীর গহ্বরবিশিষ্ট দোজখের নাম। ওই গহ্বরের পরিমাপ আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো জানা নেই।

কাতাদা বলেছেন ‘উম্‌মুহু হাবিয়া’ অর্থ তার মাতা পতনোন্মুখ। আরবী প্রবাদে বলা হয় ‘হাওয়াত উম্‌মুহু’ (তার মাতা পতিত হয়েছে)। এরকম বলা হয় তাকে লক্ষ্য করে, যে হয় কঠিন বিপদে বিপদগ্রস্ত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘উম্‌’ অর্থ মস্তক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সে অধোমুখে দোজখে পতিত হবে। বাগবী বলেছেন, ব্যাখ্যাটি কাতাদা ও আবু সালেহের সমর্থনপুষ্ট।

আমি বলি, হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে মুত্তাকীগণের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে কাফেরদের কথা। যেমন রসুল স. বলেন, তখন মানুষ পেয়ে যাবে তাদের পুরোপুরি প্রতিফল। দাঁড়িপাল্লার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশতা সকলের পাপ-পুণ্যের ওজন পরীক্ষা করবে। কারো পুণ্যের পাল্লা ভারী হলে সে সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করে বলবে, এ লোক সৌভাগ্যশালী। আর কোনোদিন সে হতভাগ্য হবে না। সমগ্র সৃষ্টি তার ওই চীৎকার শুনবে। এরকম বিকট চীৎকার সে করবে কারো পাপের পাল্লা ভারী হওয়ার পরক্ষণেও। বলবে, এই লোকটি চিরহতভাগ্য। আর কখনো সে সৌভাগ্যের মুখ দেখবে না। এই হাদিসে পাপ-পুণ্য মিশ্রিত ইমানদারদের বিষয়ে মৌনতাবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে ফেরেশতা তাদের ব্যাপারে কোনো ঘোষণা দিবে না।

একটি উপযোগ ঃ কুরতুবী বলেছেন, সকলের জন্য তুলাদণ্ডের প্রয়োজন হবে না। একদল বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর এক দল জাহান্নামে যাবে বিনা হিসাবে। এই দুই দলের জন্য তুলাদণ্ডের প্রয়োজন হবে না। আর বিনা হিসাবে জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যেই এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘অপরাধীরা পরিচিত হবে তাদের আকৃতি দ্বারা। ধরা হবে তাদের মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ও পা’।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, সম্ভবত তারা হবে কপট বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে নামাজ রোজা করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। যখন অংশীবাদী গোষ্ঠীগুলো পশ্চাতে দাঁড়াবে তাদের অলীক উপাস্যের, তখন কপটবিশ্বাসীরা মিশে থাকবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদের সঙ্গে। তাদেরকেই তুলাদণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক পৃথক করে দিবেন।

ইমাম গায্‌যালী লিখেছেন, বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে সত্তর হাজার লোক। তাদের জন্য কোনো তুলাদণ্ড স্থাপন করা হবে না এবং তারা আমলনামাও গ্রহণ করবে না। তৎপরিবর্তে পাবে একটি মুক্তিপত্র। তাতে লেখা থাকবে— এই মুক্তিপত্র অমুকের পুত্র অমুকের। হজরত আনাস থেকে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন উপস্থাপন করা হবে তুলাদণ্ড। সেখানে উপস্থিত করানো হবে নামাজীদেরকে। পুণ্য পরিমাপের পর তাদেরকে বিনিময়ও দেওয়া হবে

পুরোপুরি। এরপর হাজির করানো হবে হজ পালনকারীদেরকে। তাদেরকেও প্রতিদান দেওয়া হবে যথোপযুক্তরূপে। তারপর হাজির করানো হবে বিপদগ্রস্তদেরকে। কিন্তু তাদের আমল যেমন ওজন করা হবে না, তেমনি তাদের জন্য খোলা হবে না কোনো হিসাব-কিতাবের খতিয়ান। তাদের উপর অঝোরধারায় বর্ষিত হবে পুণ্যবিনিময়। তখন এ জগতের নিরুপদ্রব জীবনযাপনকারীরা কামনা করবে, আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে কাটা হতো কাঁচি দিয়ে। বিপদগ্রস্তদের অশেষ বিনিময় প্রাপ্তি দেখেই তখন মনে মনে এভাবে আক্ষেপ করতে থাকবে তারা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে পরোপুরি, বেহিসাবী'।

যথাসূত্র সহযোগে হজরত আনাস থেকে তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে হিসাব নিকাশের জন্য উপস্থিত করানো হবে শহীদগণকে। এরপর দান খয়রাতকারীদেরকে। তারপর দুঃখীদেরকে। কিন্তু তাদের জন্য না খোলা হবে হিসাবের খতিয়ান, না স্থাপন করা হবে ন্যায়ের তুলাদণ্ড। তাদের উপরে আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হতে থাকবে অজস্র ধারায়। সে দৃশ্য দেখে এখনকার সুখী লোকেরা মনে মনে আফসোস করতে থাকবে এই বলে যে, হায়! পৃথিবীতে যদি আমাদের দেহকে কাঁচি দিয়ে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করা হতো। ইতোপূর্বে আমরা একস্থানে উল্লেখ করেছি, সুফীসাধকগণ বিনা হিসাবে জান্নাতে গমন করবেন। তাই মনে হয়, সম্ভবত হাদিসে উল্লেখিত 'বালা' শব্দটির অর্থ হবে— দুঃখ-যাতনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষাক্লিষ্ট আল্লাহ্‌প্রেমিকগণ। কেননা তাঁরা পরিতুষ্ট থাকেন সুখে-দুঃখে-সর্বাবস্থায়।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর পরিমাপ আছে। পরিমাপ নেই কেবল অশ্রুর। অশ্রুর দ্বারা আগুনের সাগরও নিভিয়ে দেওয়া যায়। এ অশ্রু হচ্ছে আল্লাহ্ প্রেমিকগণের রোদনাশ্রু। অন্যথায় বিপদগ্রস্তদের কৃতকর্মের পরিমাপের কথা জানা যায় বহুসংখ্যক বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসের মাধ্যমে। যেমন হজরত ছাওবান ও হজরত আবু সালমা থেকে নাসাঈ, হাকেম, ইবনে হাব্বান, বায্যার, আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি তুলাদণ্ডে পাঁচটি বিষয় হবে কতোইনা গুরুভার— লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্, সুবহানাল্লহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর। আর যে পুণ্যবান মুসলমানের শিশুসন্তান মৃত্যুবরণ করেছে........শেষ পর্যন্ত। এ বিষয়টিও সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, শিশুসন্তানের মৃত্যু তার পিতা-মাতার জন্য একটি অবর্ণনীয় বিপদ। আর হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে যে শস্যের কথা বলা হয়েছে, সেটাও এক ধরনের বিপদ। আল্লাহ্‌ই অধিক অবহিত।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ যথাসূত্রসহযোগে হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে ন্যায়ের তুলাদণ্ড প্রতিস্থাপনের পর এক লোককে আনা হবে। আর পাপ-পুণ্য উঠিয়ে দেওয়া হবে তার দুই পাল্লায়।

দেখা যাবে তার পাপের পাল্লাই ভারী। সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, সে নারকী। সে তখন নরকের দিকে পা বাড়াবে। তরঙ্গায়িত হবে আল্লাহ্‌র দয়ার সমুদ্র। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হবে, তোমরা ওকে থামাও। তার একটি বিষয়ের ওজন তো এখনো নেওয়াই হয়নি। ফেরেশতারা তাকে থামাবে। বের করা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' লিখিত একটি ছোট্ট চিরকুট। ওই চিরকুটটিসহ তাকে পুনরায় ওঠানো হবে এক পাল্লায়। দেখা যাবে তার পুণ্যের পাল্লাই হয়েছে ভারী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছেন ইবনে হাব্বান ও তিরমিজি। তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। তা হচ্ছে মুমিনদের পাল্লা হাল্‌কা হবে কেনো? আর মুমিন তো কখনো লা ইলাহা ইল্লাল্লহ বিবর্জিত নয়, মাত্র একবার এ কলেমার স্বীকৃতি দিলেও। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র ওজনই তো হবে সর্বাধিক।

জিজ্ঞাসার জবাব ঃ সাধারণ রীতিনীতি পরকালেও চলবে, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। তখনকার রীতিনীতি হবে আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পাবিশিষ্ট। সেদিন ঘটবে তাঁর সকল গুণের প্রভূত বিকাশ। তবে তাঁর বিশেষ করুণাধারা প্রাপ্তির একমাত্র যোগ্যতা সেদিন হবে পরিশুদ্ধতা (ইখলাস)। তখন প্রত্যেকের প্রাপ্তি নির্ণীত হবে তার পরিশুদ্ধতার তারতম্যানুসারে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো, ওটা কী (১০)? ওটা হচ্ছে উত্তপ্ত অগ্নি' (১১)। এখানে 'তুমি কি জানো' বলে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে হাবিয়া দোজখের ভয়াবহতা বোঝাতে। ক্বারী হামযা এখানকার 'মা হিয়াহ্' (ওটা কী) পাঠ করেছেন মিলিতভাবে। আর অন্যান্য ক্বারী পাঠ করেছেন সংক্ষিপ্ত যতিপাত সহকারে, প্রশ্বাস না ছেড়ে। 'হিয়া' (ওটা) সর্বনামটি এখানে 'হাবিয়া'র স্থলাভিষিক্ত। আর 'ওটা কী' প্রশ্নটি হাবিয়া দোজখের ভয়ংকরতা প্রকাশক।

'নারুন হামিয়াহ্' অর্থ ওটা তো উত্তপ্ত অগ্নি। কথাটি 'অগ্নি' অথবা 'হাবিয়া'র অনুবর্তী (বদল)। অথবা তার বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ।

সূরা তাকাছুর

৮ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছ বিশ্বতীর্থ মক্কা নগরীতে।

সূরা তাকাছুর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ

الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

r প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে

r যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।

r ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে;

r আবার বলি, ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।

r সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না।

r তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই;

r আবার বলি তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে,

r ইহার পর অবশ্যই সেই দিন তোমাদিগকে নি'মাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'আলহাকুমুত্ তাকাছুর'। এর অর্থ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। অর্থাৎ পার্থিব বিত্ত-বৈভব লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। তোমরা তাই প্রলিপ্ত হয়ে পড়ো অকল্যাণকর কর্মকাণ্ডে। পরিত্যাগ করো আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং ওই সকল কাজ, যা আল্লাহ্‌র সন্তোষার্জনের সহায়। 'আলহা' অর্থ মোহাচ্ছন্ন রাখে, উদাসীন করে দেয়।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে 'হাত্তা যুরতুমুল মাক্বাবির' (যতোক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও) একথার অর্থ— তোমরা বিত্ত-বৈভব অর্জনে এমনই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ো যে, কখন মৃত্যু এসে পড়ে তা তোমরা টেরই পাও না। ফলে তোমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় সমাহিত হও ভূ-অভ্যন্তরে। হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিমুখ করে রাখে। সহসা এসে পড়ে মৃত্যু। কাতাদা বলেছেন, ইহুদীরা প্রাচুর্যের বড়াই করতো। বলতো, আমরা অমুক অমুক গোত্র অপেক্ষা অধিক বিত্তশালী। এমতো আত্মম্ভরিতাই তাদেরকে বিমুখ করে রাখে মহাসত্যের পরিচয় ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে। আর তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে বুরাইদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলো সম্মানিত আনসারগণের দু'টি গোত্র— বনী হারেছা ও বনী হারেছ। তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পদ নিয়ে একে অপরের সম্মুখে বড়াই করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা বলতেন, আমাদের অমুক অমুক ব্যক্তির মতো তোমাদের মধ্যে কেউ আছে নাকি। আবার কখনো সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কোনো বিশেষ কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, আমাদের— এঁর মতো তোমাদের তো একজনও নেই।

কালাবী বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো কুরায়েশ গোত্রাবলী সম্পর্কে। তাদের বনী আবদে মান্নাফ এবং বনী সাহাম একে অপরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, যা তোমাদের মধ্যে নেই। তা ছাড়া তোমাদের চেয়ে আমাদের জনসংখ্যাও বেশী। যখন গণনা করে দেখা গেলো, বনী আবদে মান্নাফই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তখন বনী সাহাম বললো, এখন আমরা আমাদের প্রয়াত ব্যক্তিদেরকেও গণনার মধ্যে ধরবো। এই বলে তারা সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে তাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে গণনা করলো। দেখা গেলো জীবিত ও মৃত মিলিয়ে তাদের জনসংখ্যা বনী আবদে মান্নাফের চেয়ে তিন ঘর বেশী। তাদের এমতো স্থূল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এমতো ঘটনার প্রেক্ষিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা জনসংখ্যার গর্ব করো। জীবিতদেরকে গণনা করেও ক্ষান্ত হও না। উপনীত হও কবরস্থানেও। তবুও দম্ভ থেকে পশ্চাদপসরণ করো না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'কবরে উপনীত হও' কথাটি হবে রূপকার্থক। অর্থাৎ মৃতদের কবরে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তোমরা সেখানে সমবেত হও না। সমবেত হও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত গ্রহণার্থে। অথবা কথাটি হতে পারে প্রকৃতার্থক। কেননা প্রকৃতই তারা কবর গণনার উদ্দেশ্যেই তখন উপস্থিত হয়েছিলো সেখানে। আর এখানকার 'হাত্তা' (যতোক্ষণ) অব্যয়টি নিমিত্তজ্ঞাপক।

বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাখীর বলেছেন, আমি একদিন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি আবৃত্তি করছেন 'আলহাকুমুত্ তাকাছুর.....'। আবৃত্তি শেষ হলে তিনি বললেন, মানুষ বলে, আমার সম্পদ আমার সম্পদ। আরে, তোমার সম্পদ তো ততোটুকু খাদ্য যতোটুকু তুমি ভক্ষণ করেছো এবং ওই পরিধেয়, যা ব্যবহার করে করে ফেলেছো পুরাতন। আর যা দান খয়রাত করে প্রেরণ করেছো সম্মুখে।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, মৃতের পশ্চাতে গমন করে তিনটি বস্তু, দু'টি ফিরে আসে, আর একটি থেকে যায়। যে দু'টি ফিরে আসে, সে দু'টি হচ্ছে তার আত্মীয়-স্বজন এবং বিত্ত, থেকে যায় তার আমল। বোখারী। হজরত আয়াজ ইবনে হিমার মাজশেয়ী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়াবনত হও। কখনো দম্ভ প্রকাশ কোরো না। কড়াকড়ি কোরো না কোনোকিছু নিয়ে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের উচিত, তারা যেনো বাপ-দাদাদের নামে আত্মগরিমা করা থেকে বিরত থাকে। কেননা আত্মগরিমা হচ্ছে জাহান্নামের কয়লা। আত্মগরিমা প্রকাশকারীরা তো আল্লাহ্র নিকট ওই গুবরে পোকার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট, যে তার শুঁড় দিয়ে ঠেলাঠেলি করে ময়লাযুক্ত বস্তু। আল্লাহ্ দয়া করে তোমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন মূর্খতার যুগের আত্মম্ভরিতা। এরপর তোমরা হবে পুণ্যবান, অথবা পাপী। তোমরা সকলেই আদম সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো মৃত্তিকা থেকে।

হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে আহমদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের বংশ-গৌরব করার কিছু নেই। তোমরা সকলেই আদম সন্তান, যেমন একটি সা' (কাষ্ঠনির্মিত পরিমাপ পাত্রবিশেষ) অপর একটি সা' এর সমান। ধর্মপরায়ণতা ও সংযমশীলতা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। এ দুটো গুণ ছাড়া কেউ কারো চেয়ে অধিক মর্যাদাবান নয়। নিকৃষ্টতা প্রকাশ পায় কটুভাষিতা, অশ্লীলতা ও কৃপণতা থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্ তাঁর এক ফেরেশতাকে এই বলে ঘোষণা দিতে বলবেন যে, শোনো হে জনতা! আমি একটি সম্বন্ধ স্থির করেছি; আর তোমরা সম্বন্ধ স্থির করেছো আর একটি। আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী বলি তাকে, যে মুত্তাকী। কিন্তু তোমরা তা মানতে চাওনা। তোমরা বলো, মর্যাদাশালী অমুকের পুত্র অমুক। আজ আমি আমা কর্তৃক স্থিরীকৃত সম্বন্ধটিকেই প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো। অবনমিত করবো তোমাদের বংশগৌরব। সুতরাং যারা মুত্তাকী, তারা অগ্রসর হও। তিবরানী হাদিসটি সংকলন করেছেন তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'কাল্লা সাওফা তা'লামূন' (এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে)। এখানে 'কাল্লা' অর্থ এটা কিছুতেই সঙ্গত নয়। অর্থাৎ প্রাচুর্যের মোহাচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো কল্যাণই নেই। 'তা'লামূন' (তোমরা জানতে পারবে) ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ আগামীতে যখন তোমরা শাস্তিকবলিত হবে, তখন বুঝতে পারবে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ও আত্মঅহমিকার পরিণতি কতো ভয়াবহ।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ছুম্মা' কাল্লা সাওফা তা'লামূন' (আবার বলি, এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে)। বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে আগের আয়াতটিরই পুনরুক্তি করা হয়েছে এখানে। অথবা প্রথমে হুমকি দেওয়ার পর এখানে হুমকি দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় বারের মতো। আর এখানকার 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি একথাটিকেই প্রমাণ করে যে, প্রথম হুমকির চেয়ে দ্বিতীয় হুমকি প্রবলতর। কেননা 'ছুম্মা' ব্যবহার করা হয় ক্রমোন্নতি বোঝাতেও। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে প্রথমে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে মৃত্যুর, অথবা কবরের। আর পরে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে পুনরুত্থানপর্বের পরের শাস্তির। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কবরের শাস্তি সম্পর্কে আমাদের প্রতীতি অস্বচ্ছ ছিলো। সে অস্বচ্ছতা দূর হলো তখন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আলহাকুমুত্ তাকাছুর.......সাওফা তা'লামূন'।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'কাল্লা লাও তা'লামূনা ই'লমাল ইয়াক্বীন' (সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না)। কথাটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার নিষিদ্ধতার তাগিদের উপর উপতাগিদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হায়! পরকালের জ্ঞান যদি তোমাদের থাকতো,

যেমন তোমাদের অনেকের রয়েছে পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান। বলোতো, তাহলে কী হতো? এমতো সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তাহলে তো তোমরা পরকালকেই অগ্রাধিকার দিতে, অথবা তাহলে তো তোমরা ঐশ্বর্য অর্জনের মোহে এভাবে জঘন্য প্রতিযোগিতায় নামতে না। উল্লেখ্য, অধিক গুরুত্ব প্রদর্শনের মানসেই এখানে এভাবে প্রশ্নের আড়ালে 'লাও' শব্দের জবাবকে রাখা হয়েছে অনুক্ত। কাতাদা বলেছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, মৃত্যুর পরের মহাপুনরুত্থান সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি রাখার নামই 'ই'লমুল ইয়াক্বীন'। আমি বলি, অদৃশ্যের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের নামই ই'লমুল ইয়াক্বীন, যা অর্জিত হয় দলিল-প্রমাণের সাহায্যে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'লাতারা উন্‌নাল জ্বাহীম' (তোমরা তো জাহান্নামকে দেখবেই)। স্মর্তব্য, কথাটি শর্তের দাবি নয়। কেননা জাহান্নামদর্শনের বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী। বরং বলা যেতে পারে, কথাটি একটি অনুক্ত শপথের জবাব। এভাবে এখানে শাস্তির ভীতিকে করে তোলা হয়েছে অধিকতর প্রকট ও ভয়ংকর। আমি বলি, আগের আয়াতের 'লাও' (যদি) শর্তসূচক অব্যয়টি 'ইজা' (যখন) ক্রিয়ার আধার হিসেবে বিবেচ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মৃত্যুকালে যখন তোমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ হবে পরকালের প্রতি, তখন তোমাদের চোখে ভেসে উঠবে জাহান্নামের ভয়ংকর রূপ। কিন্তু তখন তোমাদের এমতো দর্শন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবার জন্য যে পুণ্যকর্ম করতে হয়, সে সুযোগ তো তখন তোমরা হারিয়েই ফেলবে চিরতরে।

এখানে 'দেখবে' অর্থ জানবে। অর্থাৎ 'রুয়ত' (দেখা) অর্থ এখানে 'ইলম' (জানা)। আবার এর অর্থ চাক্ষুষ দর্শনও হতে পারে। কেননা কবরে কাফেরদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নাম দেখানো হবেই। আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি ইতোপূর্বে সুরা ইনফিত্বরের তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'ছুম্‌মা লাতারা উন্‌নাহা আ'ইনাল ইয়াক্বীন' (আবার বলি, তোমরা তো দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে)। একথার অর্থ— যে জাহান্নামের বিদ্যমানতা সম্পর্কে মৃত্যুকালে তোমরা ভালোভাবে জানতে পারবে, সেই জাহান্নামকে তোমরা চাক্ষুষ করে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে মহাপুনরুত্থানের পর হাশর প্রান্তরে। উল্লেখ্য, 'রুয়ত' (সাধারণ দর্শন) এবং 'আইনুল ইয়াকিন' চাক্ষুষ দর্শন সমঅর্থসম্পন্ন। একারণেই 'ইলম' (জানা) অর্থ চাক্ষুষ দর্শনও হয়।

এখানকার 'লাতারা উন্‌নাহা (তোমরা তো তা দেখবেই) কথাটির কর্মপদ 'আ'ইনুল ইয়াক্বীন' (চাক্ষুষ প্রত্যয়ে)। ক্রিয়ামূল দু'টি ভিন্ন হলেও এদু'টোর অর্থ অভিন্ন। অবশ্য ইতোপূর্বে বলা হয়েছে 'রুয়ত' অর্থ 'ইলম' (জানা, চেনা, দর্শন) তাই এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আগের ব্যাখ্যাটিকে বলতে হবে অচল এবং এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা তখন এমনভাবে জাহান্নামকে অবলোকন

করবে যে, তার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে অপরিহার্য। এটাই কারণ যে, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের পর যে জ্ঞান অর্জিত হয় তার নামই 'ইলমূল ইয়াক্বীন'। আর জ্ঞানার্জনের শক্তিশালী বাহনই হচ্ছে চোখের দেখা।

রসুল স. বলেছেন, শ্রবণ দর্শনের মতো নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে খতীব বাগদাদী এবং উত্তম সূত্র সহযোগে হজরত আনাস থেকে তিবরানী। তবে এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে যথার্থ সূত্রে হাকেম এবং তিবরানী যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— আল্লাহ্ যখন প্রত্যাদেশযোগে রসুল মুসাকে তাঁর উম্মতের গোবৎসপূজক হয়ে যাওয়ার কথা জানালেন, তখন তিনি তওরাতের ফলকগুলো নিক্ষেপ করেননি। নিক্ষেপ করেছিলেন তখন, যখন বিষয়টি চাক্ষুষ করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে। মাটিতে পড়ে তখন ফলকগুলো ভেঙেও গিয়েছিলো।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'ইনাল ইয়াক্বীন' বিশেষণটির বিশেষ্য এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ এমনই দর্শন, যা স্বয়ং প্রত্যয়। চাক্ষুষ করাকেই এখানে 'ইয়াক্বীন' বলা হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এরপর অবশ্যই সে দিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনি কেনো, কেনোই বা হয়েছিলে অকৃতজ্ঞ, সে সম্পর্কে পরকালে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেই।

বাগবী লিখেছেন, মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র অনুগ্রহসমুদ্রে ডুবে থাকে। তাই এ সম্পর্কে তখন তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেই। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ মক্কার পৌত্তলিকদেরকে দিয়েছিলেন প্রভূত সম্মান ও ধনসম্পদ। অথচ তারা এক আল্লাহ্কে ছেড়ে উপাসক হয়েছিলো প্রতিমার। তাই তাদেরকে তাদের এমতো অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে পরকালে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবেই। হাসান বসরীও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতের সম্বোধনটি সার্বজনীন। এর দ্বারা যেনো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যারা আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করে অন্যের উপাসনায় জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদেরকে প্রতিফল দিবসে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। ফলে পরিত্রাণ তারা পাবেই না। আবার এরকমও হতে পারে যে, এমতো সার্বজনীন সাবধানবাণী ঘোষিত হয়েছে এই সুরার ৬ থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা সকলেই এর আওতাভূত'। এক হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিনদেরকে তাদের কবরের মধ্যে দেখানো হবে তার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামের ওই স্থানটি, যার বিনিময়ে তাকে দেওয়া হয়েছে জান্নাত, যাতে করে সে হতে পারে অধিকতর কৃতজ্ঞচিত্ত।

একটি উপযোগ ঃ কোরআনের বাকভঙ্গি অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, কেবল প্রচুর বিত্তবৈভবের অধিকারীদেরকেই কেবল প্রতিফল দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর এখানেও বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেভাবে। কিন্তু একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, সুবিদিত হাদিস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়েছে, তখন অনুগ্রহসম্ভারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকেই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত ইবনে মাসউদ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন মানুষকে এ বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তাদেরকে প্রদত্ত নিরাপত্তা ও সুস্থতার কৃতজ্ঞতা তারা প্রকাশ করেছিলো কিনা। হজরত ইবনে আব্বাস এ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্পাক তখন জিজ্ঞেস করবেন চোখ, কান ও শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কেও। অর্থাৎ তাকে তখন বলা হবে শরীর ও তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ সে ব্যবহার করেছিলো কোন কাজে? ইবনে আবী হাতেম। মুজাহিদ বলেছেন, তখন জিজ্ঞেস করা হবে সকল আস্বাদ্য সামগ্রী সম্পর্কেও। ফারইয়াবী, আবু নাঈম। কাতাদা সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত সকল দান-অনুদান সম্পর্কেও সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম আহমদ তাঁর 'জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবু কেলাবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক ময়দার রুটি ভক্ষণ করবে মধু ও ঘি সহযোগে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন কিছুসংখ্যক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কীরূপ নেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে? আমরা তো ভক্ষণ করি রুটি ও খেজুর। আর সতত সশস্ত্র থাকি শত্রুর আক্রমণাশংকায়। তিনি স. বললেন, ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করো। অচিরেই তোমাদের অধিকারায়ত্ত হবে অজস্র নেয়ামত।

ইকরামা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! কোন অনুগ্রহ আমাদের জন্য সুলভ? আমরা প্রায়শ দিনাতিপাত করি অর্ধাহারে। খাই কেবল যবের রুটি। তাদের এমতো নিবেদনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'হে আমার নবী! তাদেরকে বলুন, উত্তপ্ত বালুকা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা কি পাদুকা ব্যবহার করো না? পান করো না কি শীতল পানি'?

হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি গমের রুটি আহার করে, সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপভোগ করে ছায়া, পান করে সুপেয় পানি, তাকেও সেদিন এ সকলকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স. মান্যবর আবু বকর ও ওমরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন আবুল হাইছুমের গৃহে। সেখানে তাঁরা আহার করলেন খেজুর ও গোশত এবং পান করলেন পানি। পানাহারপর্ব শেষ হলে তিনি স. বললেন, এগুলোই ওই নেয়ামত, যেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাঁর সহচরবৃন্দ উচ্চারণ করলেন 'আল্লাহু আকবর'। তিনি স. পুনরায়

বললেন, যখন তোমরা আহার্যসামগ্রীর সম্মুখে উপবেশন করবে, তখন শুরুতেই উচ্চারণ করবে 'বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ্'। আর পানাহার শেষ হলে বলবে 'আলহামদু লিল্লাহিল্ লাজী হুয়া আস্বাগানা ওয়া আরওয়ানা ওয়া আনআ'মা আ'লাইনা ওয়া আফদ্বাল'। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও। তাঁর মাধ্যমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জ্ঞানচর্চায় পরস্পরের শুভানুধ্যায়ী হয়ো। কারো কাছে কেউ জ্ঞান গোপন কোরো না। জ্ঞান আত্মসাৎ ধন আত্মসাৎ অপেক্ষা অধিক অপকৃষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। তিবরানী, ইসপাহানী। হজরত আবু দারদা থেকে ইমাম আহমদ ও ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা যে জ্ঞানার্জন করেছিলে, সে সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নিয়েছিলে?

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন বান্দা যেমন তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তেমনি জিজ্ঞাসিত হবে তার যোগ্যতা সম্পর্কে। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বান্দা তার একটি পদক্ষেপ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে। বলা হবে, তোমার ওই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিলো কী?

আবু নাঈম ও ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত মুয়াজ কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, প্রতিফল দিবসে বান্দাকে তার প্রতিটি উদ্যোগ সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে। এমনকি তার চোখে সুরমা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও। সুপরিণত সূত্রসহযোগে হাসান বসরী বলেছেন, যখন কোনো বান্দা ভাষণ দেয়, তখনই সে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির দায়ে দায়ী হয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তার ভাষণদানের উদ্দেশ্য ছিলো কী? হাদিসটি উত্তম পর্যায়ের এবং অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট। বর্ণনা করেছেন বায়হাকী।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ছুম্মা' (এরপর) শব্দটির দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে জাহীম, জাহান্নাম দেখার পর। আমি বলি, এরকম বলার কারণ হচ্ছে, নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে পুলসিরাতে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'থামাও ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত বান্দা পুলসিরাত থেকে অগ্রসর হতে পারবে না। যেমন— ১. সে তার আয়ুষ্কালকে ব্যবহার করেছিলো কোন কাজে ২. শরীরকে শ্রান্ত করেছিলো কোন কাজের জন্য। ৩. কী কাজে লাগিয়েছিলো অর্জিত জ্ঞানকে এবং ৪. সম্পদ আয় ও ব্যয় করেছিলো কোথায়, কীভাবে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। কুরতুবী লিখেছেন, এই সাধারণ বিধান থেকে তাঁরা ওই মুসলমানদের সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস উল্লেখ করেছেন, যারা বিনা হিসাবে প্রবেশ করবেন জান্নাতে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর সহচরবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করার সাধ্য কি তোমাদের নেই? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম নবী! এরকম সাধ্য হবে কার? তিনি স. বললেন, কেনো? তোমরা প্রতিদিন সুরা তাকাছুরও কি পাঠ করতে পারবে না?

সূরা আ'সর

৩ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরাখানির অবতরণ স্থল মহাপুণ্যময় নগরী মক্কা।

সূরা আ'সর ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

r মহাকালের শপথ,

r মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত,

r কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

'ওয়াল আ'সর' অর্থ মহাকালের শপথ। হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মহাকালের শপথ করা হয়েছে এ জন্য যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য মহাকাল প্রসঙ্গটি ভীতি উদ্রেকক ও শুভ উপদেশ প্রদায়ক। ইবনে কীসান বলেছেন, এখানে 'কাল' অর্থ দিবারাত্রি। হাসান বসরী বলেছেন, দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বলে আ'সর। কাতাদা বলেছেন, আ'সর বলে দিবসের শেষ প্রহরকে। মুকাতিল বলেছেন, শব্দটির অর্থ আসরের নামাজ। এটাই দিবারাত্রির মধ্যভাগের নামাজ। সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসরিন' (মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত)। এখানকার 'খুসরিন' পদের তানভীন গুরুত্বপ্রকাশক। মূল পুঁজির বিনাশকে বলে 'খুস্র'। মানুষও সাধারণতঃ তেমনি তার জীবন, সময় ও সম্পদ এমন কাজে ব্যয় করে, যা আখেরাতে তার কোনো কাজেই আসে না। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইল্লাল্ লাজীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুস্ সলিহাত' (কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে)। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং তাদের জীবন, সময়, সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বরং তারা লাভবান। কেননা তারা নশ্বর উপকরণের দ্বারা ক্রয় করতে পারে অনশ্বর সফলতা।

‘ওয়া তাওয়া সও বিল্ হাক্ব’ অর্থ এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। কাতাদা এবং হাসান বলেছেন, এখানে ‘হাক্ব’ অর্থ কোরআনপাক। আর মুকাতিল বলেছেন, ইমান ও তওহীদ। আর ‘ওয়া তাওয়াসাও বিস্ সবর’ অর্থ এবং ধৈর্যের উপদেশ দেয়। অর্থাৎ যারা পরস্পরকে ওই সকল বিষয় থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়, যে সকল বিষয় আল্লাহ্ পাকের কোপ উদ্রেকক।

‘সবর’ এর সাধারণ অর্থ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সে ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা আল্লাহ্র আনুগত্যের বিষয়ে হোক, অথবা হোক নিকৃষ্ট বিষয়াবলী পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে। আর এখানকার ‘সৎকর্ম’ অর্থ সাধারণ সৎকর্ম। অথবা ওই সকল ক্রিয়াকলাপ, যা একজন মানুষকে করে পরিশুদ্ধ মানুষ। সত্যাধিষ্ঠিত থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করাও সৎকর্মের অর্ন্তভূত এবং এদু’টো বিশেষ সৎকর্মও পরিশুদ্ধতা অর্জনের সহায়ক। এগুলো বাদে অন্য সকল ক্রিয়াকলাপ ধ্বংসের উপলক্ষ। ইব্রাহিম বলেছেন, মানুষ বয়োবৃদ্ধ হলে ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায়। সে তখন হয়ে যায় পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ও পুণ্যের বিনিময় লাভের অনুপযুক্ত। হয়ে যায় পশ্চাদবর্তী। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তখন তার আমলনামায় ওই সকল পুণ্যকর্মের বিনিময় লেখা হতে থাকে, যে সকল পুণ্যকর্ম সে সম্পাদন করতো যৌবনে, সুস্থাবস্থায়। অর্থগত দিক থেকে আয়াতখানি ওই আয়াতের সমতুল, যেখানে বলা হয়েছে ‘আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদেরও হীনতমে পরিণত করি কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার’।

মাসআলা ঃ সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎকর্মের প্রতিবন্ধক হওয়া একটি আবশ্যকীয় কর্তব্যকর্ম। এই দায়িত্বটি যারা পালন করে না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের সম্মুখে যদি শরিয়তবিরুদ্ধ কোনো কর্ম উপস্থিত হয়, তবে তোমরা প্রতিরোধ কোরো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, না পারলে কথার মাধ্যমে এবং তা-ও না পারলে ওই কর্মের প্রতি পোষণ কোরো আন্তরিক ঘৃণা। আর সেটা হবে দুর্বলতর ইমান। মুসলিম।

বাগবী তাঁর ‘শরহে সুন্নাহ্’য় লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বিশেষ লোকের দুষ্কর্মের শাস্তি সাধারণ লোকের উপরে চাপিয়ে দেন না। তবে সর্বসাধারণ তাদের সম্মুখে অপকর্ম হতে দেখেও বাধা না দিলে আল্লাহ্ শাস্তি অবতীর্ণ করেন বিশেষ সাধারণ সকলের উপরে। হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে সুপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, যে জাতির মধ্যে পাপকর্মের প্রসার ঘটে, সেই জাতি যদি তা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কার না করে তাহলে মনে রেখো, অচিরেই তাদের উপরে আপতিত হবে নৈসর্গিক বিপদাপদ। আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা হুমাযাহ্

এই সুরাখানির অবতরণ স্থলও মহাপুন্যময় নগরী মক্কা। এর মধ্যে আয়াত রয়েছে ৯টি।

সূরা হুমাযাহ্ ঃ আয়াত ১— ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ﴿١﴾ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۙ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ ﴿٤﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ ﴿٥﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ ﴿٦﴾ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ ﴿٨﴾ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

- দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,
- যে অর্থ জমায় ও উহা বার বার গণনা করে;
- সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে;
- কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুত্বামায়;
- তুমি কি জান হুত্বামা কী?
- ইহা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন,
- যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে;
- নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে
- দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

'ওয়াইলুল্ লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ্' অর্থ দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'হুমাযাহ্' ও লুমাযাহ্' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। 'হুমাযাহ্' অর্থ নিন্দুক, যারা অপরের অসাক্ষাতে তার দোষবর্ণনা করে। আর 'লুমাযাহ্' অর্থ কলঙ্ক লেপনকারী, যারা নিষ্কলঙ্ক লোকের চরিত্রে আরোপ করে কলঙ্ক। মুকাতিল বলেছেন, সামনাসামনি দোষারোপ করাকে বলে 'হুমাযাহ্' এবং 'লুমাযাহ্' বলে আড়ালে, অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা করাকে। আবুল আলিয়া ও হাসান বসরী বলেছেন এর বিপরীত। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন 'হুমাযাহ্' হচ্ছে পরনিন্দুক, মানুষের গোশত ভক্ষণকারী তুল্য। আর 'লুমাযাহ্' হচ্ছে অপবাদ আরোপকারী, দোষারোপকারী।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, ওই ব্যক্তিকে 'হুমাযাহ্' বলে, যে হাতের কুৎসিত ইঙ্গিতে মানুষকে মর্মাহত করে। আর কথার দ্বারা মানুষের দোষবর্ণনাকারীকে বলে 'লুমাযাহ্'। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, কথার দ্বারা নিন্দা করা 'হুমাযাহ্'। আর

চোখের ইশারায় দোষচর্চা করা 'লুমাযাহ্'। ইবনে কীসান বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সঙ্গী-সাথীদেরকে শানিত কথায় জর্জরিত করে সে 'হুমাযাহ্'। আর 'লুমাযাহ্' ওই ব্যক্তি, যে মানুষের দোষ প্রকাশ করে চোখ, মাথা, অথবা ভ্রূ'র দ্বারা।

আমি বলি 'হুমাযাহ্' এর আভিধানিক অর্থ ভেঙে দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা। এক হাদিসে প্রার্থনা করা হয়েছে 'আল্লাহুম্মা ইননী আউজুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াত্বীন' (হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যাবতীয় শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা করো)। আর 'লুমাযাহ্' অর্থ দোষারোপ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দদু'টোর অর্থ দাঁড়ায়— এরূপ সমালোচনা, যার দ্বারা মানুষের মানসম্ভ্রম আহত হয়। মানুষ হয় কলংকিত। এ সব অপকর্মে যারা অভ্যস্ত, তারাই 'হুমাযাহ্' ও 'লুমাযাহ্'।

হজরত ওসমান ও হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা সর্বক্ষণ একথাই শুনে এসেছি যে, এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খালফকে লক্ষ্য করে। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম। সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আখনাস ইবনে শুরাইক ইবনে ওয়াহাব সাকাফীকে কেন্দ্র করে। রেকা অধিবাসীদের জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, জামীল ইবনে আমেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইবনে ইসহাক সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, উমাইয়া ইবনে খালফ সব সময় রসুল স. এর সমালোচনা করতো। তার সম্পর্কেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়। ওলীদ ইবনে মুগীরাও সব সময় ছিলো রসুল স. এর সমালোচনামুখর। সে-ও এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে (২) সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে' (৩)। একথার অর্থ— উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওলীদ ইবনে মুগীরার মতো ধনবান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মনে করে দরিদ্র জনসাধারণই কেবল অনাহারে-অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরে, ধনবানেরা মরে না। কিন্তু এরকম আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ এখানে সমীচীন নয়। কেননা পৃথিবীতে অমর যে কেউ নয়, তা সকলেই জানে। তাই এখানে কথাটির অর্থ হবে— দীর্ঘ জীবনের আশা ও লালসাই তাদেরকে মৃত্যুর মতো মহাবিপদ থেকে উদাসীন করে রাখে। অথবা বাক্যটি উপেক্ষামূলক, শ্লেষাত্মক। প্রকৃত প্রস্তাবে অমরতা কখনো ধন-সম্পদনির্ভর নয়, ইমান ও পুণ্যকর্মনির্ভর।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, একবার রসুল স. মাটিতে আঁকলেন একটি বর্গক্ষেত্র। তার মাঝামাঝি অংকন করলেন একটি সরলরেখা। এরপর আরো কিছু রেখা আঁকলেন সরল রেখাটির দু'পাশে। তারপর বললেন, মাঝের সরল রেখাটি মানুষ। আর দু'পাশের রেখাগুলো তার পরিকল্পনাসমূহ। যদি এক পাশের রেখা থেকে সে মুক্তি পায়, তবে তাকে জড়িয়ে ধরে আর এক পাশের রেখাগুলো। এভাবে সে একবার জড়িয়ে যায় এদিকে, আরেকবার ওদিকে। হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. পাশাপাশি

কয়েকটি রেখা অংকন করলেন। তারপর মাঝের দু'টি রেখার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটা মানুষের আশা এবং এটা তার মৃত্যু। সে সতত আশার ছলনেই মগ্ন হয়ে থাকে। সহসা এসে পড়ে মৃত্যু।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কখনো না'। একথার অর্থ— পরনিন্দা, ধনলিপ্সা ও অনিয়ন্ত্রিত আশা অবশ্যপরিত্যাজ্য। এরপর বলা হয়েছে 'সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়'। বাক্যটি একটি অনুক্ত শপথের জবাব। আবার এরকমও বলা যেতে পারবে যে, 'কাল্লা' অর্থ এখানে সঠিক। এমতাবস্থায় শপথের জন্য অর্থটি হবে যথার্থ। আর আলোচ্য বাক্যের জবাব হবে 'হুত্বামাহ্'। 'হুত্বামাহ্' একটি জাহান্নামের নাম। 'হাত্বাম' অর্থ পিষ্ট করা, চূর্ণ করা। যেহেতু তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাই তারা সেখানে আগুনের আঘাতে হতে থাকবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। একারণেই জাহান্নামের আর এক নাম 'হুত্বামাহ্'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সে যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তা সুনিশ্চিত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো হুত্বামা কী (৫)? এটা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন' (৬)। এভাবে এখানে প্রশ্ন আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাহান্নামের বিশাল ভয়াবহতাকে। কিছু জানার জন্য এখানে প্রশ্ন করা হয়নি। যেনো বলতে চাওয়া হয়েছে— তোমরা জাহান্নামের ভয়ংকর রূপ সম্পর্কে অনবহিত। তোমাদের পক্ষে ভাবনা-চিন্তা করেও বিষয়টি অনুধাবন করা দুঃসাধ্য।

'নারুল্লহি মূক্বাদাহ্' অর্থ এটা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুত্বাশন। দোজখের আগুনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরার জন্যই এখানে আগুনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে। বলা হয়েছে— আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত আগুন। এতে করে একথাই প্রকাশ পায় যে, আল্লাহপাক কতোই না প্রতাপশালী (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকের 'জালাল' (প্রাবাল্য) 'জামাল' (কোমলতা) সকল প্রকার গুণই চরম পূর্ণত্বসম্পন্ন, যা মানুষের ধারণা-অনুমানের ঊর্ধ্বে।

'আল মূক্বাদাহ্' (প্রজ্জ্বলিত) পদটি এখানে অগ্নির বিশেষণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এমন ভয়ংকর অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় একে নিভিয়ে দেওয়াও। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোজখের আগুন এক হাজার বৎসর ধরে জ্বলতে জ্বলতে ধারণ করেছিলো লালরঙ। এরপর আরো এক হাজার বৎসর পর হয়েছিলো শাদা। এরপরে আরো এক হাজার বৎসর পর ঘোর কালো। তারপর থেকে তার কালো রঙ আর পরিবর্তিত হয়নি। তিরমিজি।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যা হৃদয়কে গ্রাস করবে'। একথার অর্থ— ওই অগ্নি পৌঁছে যাবে অন্তরাত্মা পর্যন্ত। 'ইত্তিলা' ও 'বুলুগ' শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন আরবী প্রবচনে বলা হয় 'ইত্তালাইতা আরাদ্বনা' (তুমি আমাদের দেশে পৌঁছে গিয়েছো)। স্বসূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, খালেদ ইবনে ইমরান উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকাগ্নি নারকীদেরকে গ্রাস করবে।

পৌঁছে যাবে তাদের কলিজা পর্যন্ত। এরপর লোকটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। আবার তাকে গ্রাস করবে আগুন এবং পুনরায় তা পৌঁছে যাবে তার হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত। এভাবে পুনঃপুনঃ তার শাস্তি চলতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে। এরকম বলেছেন কুরতুবী ও কালাবী।

আমি বলি, এখানে 'যা হৃদয়কে গ্রাস করবে' কথাটি বলার উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে, মানুষ যেনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে দোজখের আগুনের শাস্তির নিরবচ্ছিন্নতা কতো ভয়ংকর। জাগতিক আগুন তো সেরকম নয়। পৃথিবীর আগুন গায়ে লাগলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই মানুষের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু দোজখের আগুন কলিজা পর্যন্ত পৌঁছলেও মৃত্যু আসবে না। অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে শাস্তি চলতেই থাকবে। অথবা বলা যায়, মানবদেহের মধ্যে হৃদয়ই সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল ও সূক্ষ্ম অংশ। তাই এখানে বলা হয়েছে, হৃদয়কে গ্রাস করবে। কিংবা কথাটি এখানে এভাবে বলা হয়েছে এ কারণে যে, হৃদয়ই অপবিশ্বাস ও যাবতীয় দুষ্কর্মের মূল। অর্থাৎ অপবিত্র হৃদয়ই যেহেতু নরকাগ্নির প্রসূতি গৃহ, তাই নরকের আগুন তো হৃদয়কে গ্রাস করবেই।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে (৮) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে' (৯)। এখানকার 'আ'লাইহিম' (তাদেরকে) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'মু'সাদাতুন' (পরিবেষ্টন করে রাখবে) বাক্যের সঙ্গে। আর এখানে বহুবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথম আয়াতের 'কুল্লি' (প্রত্যেকের) কথাটি অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচনার্থক। আর পুরো বাক্যটি অসম্পৃক্ত একটি নতুন বাক্য।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, দোজখবাসীরা দোজখ থেকে বের হতে পারবে না কেনো? এমতো প্রশ্নের জবাবেই এখানে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে'। 'মু'সাদাহ্' শব্দটির অর্থই পরিবেষ্টন করে রাখা, বা আবদ্ধ রাখা। সুপরিণত সূত্রে অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক। যেমন 'আওসাত্তুল বাব' অর্থ আমি দরজা বন্ধ করেছি।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দু'জন করে দোজখবাসীকে আবদ্ধ করা হবে একটি লোহার সিন্দুকে। তার উপরে ঠুকে দেওয়া হবে লোহার পেরেক। এভাবে কয়েকটি সিন্দুককে আবদ্ধ করা হবে আর একটি সিন্দুকের ভিতরে। তারপর এরকম সিন্দুকগুলিকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখের অতল গহবরে। ফলে দোজখীরা পরস্পরকে দেখতেই পাবে না। এই হাদিসটি আবার হজরত সুয়াইদ ইবনে গাফলা থেকে বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম ও বায়হাকী।

'ফী আ'মাদিম মুমাদ্দাদাহ্' অর্থ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। অর্থাৎ তাদেরকে জড়িত করা হবে সুদীর্ঘ স্তম্ভের সঙ্গে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে স্তম্ভ (ফী আ'মাদ) কথাটির সম্পর্ক হবে একটি অনুক্ত শব্দ 'জড়িত' (মু'সিদ্বীন) এর সঙ্গে।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, শব্দটি সম্পর্কযুক্ত এখানকার 'মুমাদ্দাদাহ্' এর সঙ্গেই। এমতাবস্থায় অগ্নি হবে স্তম্ভের অভ্যন্তরে। 'উ'মুদ' এর বহুবচন 'আ'মাদ', যেমন 'উদুম' বহুবচন 'আদাম' এর। ফাররা এরকম বলেছেন। আবু উবায়দা বলেছেন, 'আ'মাদ' 'ইমাদ' এর বহুবচন, যেমন 'ইহাব' বহুবচন 'আহাব' এর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সকল স্তম্ভের মধ্যে নরকবাসীদেরকে প্রবেশ করানো হবে। তারপর সেগুলোর উপরে স্থাপন করানো হবে আরো অনেক স্তম্ভ। আর তাদের গলদেশে পরানো হবে কয়েদীদের মতো শিকল। তারপর বন্ধ করে দেওয়া হবে দোজখের দরোজা। কাতাদা বলেছেন, আমার নিকটে এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, ওই সকল স্তম্ভের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে নরকাভ্যন্তরে। মুকাতিল বলেছেন, তাদেরকে ওই স্তম্ভগুলোর সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে বন্ধ করে দেওয়া হবে নরকের দরোজা। তারপর দরোজায় এঁটে দেওয়া হবে লৌহকীলক। অন্য কেউ তখন সেখানে উপস্থিত হতে পারবে না। 'মামদুদা' অর্থ সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত। সুদীর্ঘ হওয়ার কারণেই তা আটকে থাকবে অধিক শক্তভাবে। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

সূরা ফীল

৫ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে চিরশান্তিধাম ও মহাপুণ্যময় মক্কা নগরীতে।

সূরা ফীল ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

r তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?

r তিনি কি উহাদের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?

r উহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,

r যাহারা উহাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।

r অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে 'আ লাম তারা (তুমি কি দ্যাখোনি)। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি কি বিষয়টি লক্ষ্য করেননি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, যার পরিণতি স্বীকৃতিমূলক। কেননা না-সূচকেও নেতিবাচকতায় সৃষ্টি হয় হাঁ-সূচকতার।

এভাবে কথাটির সরাসরি অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার বাণীবাহক! আপনি নিশ্চয় বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে আবরাহার হস্তিবাহিনীর ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গ। উল্লেখ্য, ওই হস্তিবাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো রসুল স. এর পৃথিবীতে আগমনের আগে। সুতরাং তিনি ওই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেননি। দেখেছিলেন ধ্বংসের চিহ্নসমূহ পরে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। অর্থাৎ ঘটনাটি যেহেতু ছিলো নিকট অতীতে, সেহেতু তিনি স. তা জানতেনই। তাই এখানে নিশ্চিতার্থক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে যে, আপনি তো তা পর্যবেক্ষণ করেছেনই। অথবা 'দেখা' অর্থ এখানে হবে— জানা, অথবা শোনা। অর্থাৎ আপনি তো তা জানেনই। যেহেতু ওই সর্বজনবিদিত ঘটনা আপনি বাল্যবেলা থেকেই শুনে এসেছেন। এভাবে এখানকার এই কথাটিতে এমতো ইঙ্গিতও রয়েছে যে, ওই বাহিনীর আরোহীদেরকে সত্যদ্রোহিতা ও সীমালংঘনের কারণে যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো, সেভাবে তাদের উত্তরসূরীদেরকেও অবশ্যই ধ্বংস করা হবে।

এরপর বলা হয়েছে 'কাইফা ফাআ'লা রব্বুকা বিআস্হাবিল ফীল' (তোমার প্রতিপালক হস্তি-অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন)। প্রশ্নটি বিস্ময়জ্ঞাপক। এজন্যই এখানে 'মা ফাআ'লা' না বলে বলা হয়েছে 'কাইফা ফাআ'লা'। উল্লেখ্য, একটি লুপ্ত রহস্যের দ্বারোন্মোচনের উদ্দেশ্যেই অবতারণা করা হয়েছে ঘটনাটির। এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের প্রভূত মর্যাদা। কেননা ঘটনাটি ছিলো তাঁর রেসালতের অবতরণিকা এবং তাঁর মহাআবির্ভাবের পূর্বাভাস। নতুবা হস্তিবাহিনীর অধিপতিরা ছিলো পথভ্রষ্ট খৃষ্টান, আর তখনকার মক্কাবাসীরা ছিলো পৌত্তলিক। সুতরাং তাদের কাউকে বিজয়ী করার মধ্যে কোনো মহিমা নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো ২২শে মহররম, রবিবার। তথ্যটি সর্বজনস্বীকৃত এবং বোখারী-মুসলিম কর্তৃক সুপ্রত্যয়িত। এ সম্পর্কে ভিন্নমতগুলি সন্দেহমুক্ত নয়। ওই ঘটনার দু'মাস পরেই এ ধরাপৃষ্ঠে মহা আবির্ভাব ঘটেছিলো রসুল স. এর। অধিকাংশ মুসলিম মনীষী এরকমই বলেছেন। তাই এই সিদ্ধান্তটিই বিশুদ্ধ। অবশ্য মুকাতিল বলেছেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাব ঘটেছিলো ওই ঘটনার চল্লিশ বছর পর। কেউ কেউ বলেছেন, সত্তর বছর পর। খুলাসাতুল ইয়াসার।

'বিআস্হাবিল ফীল' অর্থ হস্তি-অধিপতির সাথে। অর্থাৎ ইয়েমেনের অধিপতি আবরাহা ও তার সঙ্গী-সাথীরা। জুহাক বলেছেন, তারা এসেছিলো আটটি হাতি নিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, সর্ববৃহৎ হাতিটির নাম ছিলো মাহমুদ। তার সঙ্গে হাতি ছিলো আরো ১২টি। 'আল ফীল' শব্দটি একবচনবোধক। ওই বাহিনীতে একাধিক হাতি থাকা সত্ত্বেও এখানে এভাবে একবচনার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাদের মধ্যের প্রধানটিকে লক্ষ্য করে। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম করা হয়েছে ছন্দের চাহিদা পূরণার্থে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা সূত্রে ইবনে ইসহাক এবং ওয়াকেদীর বর্ণনায় এসেছে, তৎকালীন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর সেনাপতি আরিয়াতের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করলো ইয়েমেন রাজ্য অধিকারের উদ্দেশ্যে। ইয়েমেন বিজিত হলো সহজেই। আবরাহা ইবনে সাবাহ ছিলো ওই বাহিনীর এক উচ্চাভিলাষী সেনানায়ক। মনে মনে সে ঈর্ষা করতো প্রধান সেনাপতি আরিয়াতকে। সুযোগ বুঝে একদিন সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। যুদ্ধ হলো। আরিয়াত নিহত হলো। আর বিজয়ী হলো আবরাহা। এভাবে সে লাভ করলো পুরো বাহিনীর অধিকার।

শুরু হলো হজের মওসুম। আবরাহা লক্ষ্য করলো ইয়েমেনের বহু লোক হজযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ব্যাপারটা তার মোটেও পছন্দ হলো না। ভাবলো, এরা অতো দূরে মক্কায় যাবে কেনো? তার চেয়ে বরং কাবাগৃহের অনুকরণে এখানেই একটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হোক। তাহলে মানুষ এখানেই হজ করতে পারবে। সে আর দেরী করলো না। কাবার আকৃতিতে নির্মাণ করলো একটি গীর্জা। তারপর সম্রাটকে লিখে জানালো, আমি ইয়েমেনের সানআ নামক স্থানে একটি মনোমুগ্ধকর উপাসনালয় নির্মাণ করিয়েছি। এতো সুন্দর ধর্মালয় কোনো রাজা বাদশাহ নির্মাণ করতে পারেনি। আপনি শীঘ্রই শুভপদার্পন ঘটিয়ে ধর্মগৃহটি দেখে যান। আমি তো হজেরও ব্যবস্থা করেছি। মানুষকে আর মক্কায় হজ করতে যেতে হবে না। সিদ্ধান্তটি কানে গেলো বনী কেনানার জনৈক ব্যক্তির। সে সানআতে উপস্থিত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করলো ওই গীর্জায়। রাতে গীর্জাভ্যন্তর অপবিত্র করে দিয়ে সরে পড়লো সে। পরদিন আবরাহার কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো, তখন সে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো। শপথ করলো, কাবাগৃহকে আমি ধূলিসাৎ করবোই। সে সম্রাটকে লিখে জানালো, আমাকে কিছু সংখ্যক হাতি পাঠিয়ে দিন। আমি কাবাগৃহ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আসবো। তখন জনগণের সানআয় হজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। সম্রাট তার আবেদন মতো কিছুসংখ্যক হাতি পাঠিয়ে দিলো। সেগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎটির নাম ছিলো মাহমুদ।

আবরাহার পরিকল্পনার কথা ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র ইয়েমেনে— আরবে। আরববাসীরা ঠিক করলো, যেভাবে হোক আবরাহা বাহিনীকে তারা প্রতিরোধ করবেই। ইয়েমেনের এক আঞ্চলিক প্রশাসক জুনফার প্রথম গতিরোধ করলো আবরাহার। যুদ্ধ হলো। জুনফার হলো পরাজিত ও বন্দী। আবরাহা তাকে হত্যা করলো না। কিন্তু হাত পা বেঁধে রাখলো শক্ত করে। যাত্রা শুরু করলো মক্কাভিমুখে। পথে রুখে দাঁড়ালো নুফাইলের নেতৃত্বে খাছআম গোত্রের লোকেরা। সংঘর্ষ বাধলো। পরাজিত ও বন্দী হলো নুফাইল। বললো, আমি মক্কার পথ চিনি। সুতরাং আমাকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। আবরাহা তাকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিলো। এভাবে আবরাহা বাহিনী পৌঁছলো তায়েফে। সেখানে মাসউদ ইবনে মুগীছ সাকাফী তার গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে আবরাহার

সঙ্গে সাক্ষাত করলো। বললো, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করলাম। আপনিও আমাদেরকে নিরাপত্তা দিন। আমরা আপনাকে একজন পথপ্রদর্শক দিচ্ছি। একথা বলে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে দিলো ক্রীতদাস আবু রগালকে। সে পুরো বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। কিন্তু মারা গেলো মাগমাস নামক স্থানে পৌঁছে। সে স্থান অতিক্রম কালে এখনো মানুষ তার কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করে। আবরাহা সেখানে থামলো। আসওয়াদ নামক এক হাবশী সৈন্যকে হুকুম দিলো, হেরেম এলাকার সকল উট, দুম্বা, ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে এসো। সে কুরায়েশ গোত্রপতি আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উট হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। এবার আবরাহা জনৈক বাহনাত হুমাইরিকে নির্দেশ দিলো, তুমি গিয়ে মক্কাবাসীদের প্রধানকে খুঁজে বের করো এবং তাকে একথা জানাও যে, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এখানে আসিনি। এসেছি কেবল কাবাগৃহ ধূলিসাৎ করতে। বাহনাত মক্কায় গিয়ে আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে দেখা করে আবরাহার অভিপ্রায়ের কথা জানালো। আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ গৃহ আল্লাহ্র। তিনিই এর রক্ষাকর্তা। আবরাহাকে বলো, তাকে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। একথা বলে তিনি নিজেই উপস্থিত হলেন আবরাহার কাছে। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সুঠামদেহী। প্রথম দর্শনেই আবরাহা মুগ্ধ হলো। তাঁর প্রতি সম্ভ্রমবোধ জন্মালো তার মনে। আলোচনা শুরু হলো দোভাষীর মাধ্যমে। আবরাহা বললো, আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমার উটগুলো ফেরত দিন। আবরাহা বিস্মিত হলো। বললো, আপনি কুরায়েশপ্রধান। কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক। কাবাগৃহ রক্ষা করা তো আপনার ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু সে সম্পর্কে তো আপনি কিছুই বললেন না। তিনি জবাব দিলেন। উটগুলো যেহেতু আমার, তাই আমি উটগুলোই চাই। কাবাগৃহের মালিক তো আল্লাহ্। তিনিই একে রক্ষা করবেন। আবরাহা বললো, আমার হাত থেকে কেউই একে রক্ষা করতে পারবে না।

মান্যবর আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। জনতাকে বললেন, তোমরা আশে পাশের উপত্যকাগুলোর দিকে চলে যাও। আবরাহাকে বাধা দিতে যেয়ো না। আমি কাবাগৃহের হেফাজত সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করলাম আল্লাহ্র কাছে। প্রার্থনা করলেন, হে বিশ্বজগতাধিপতি! আমরা নিরুপায়। তোমার গৃহকে তুমিই রক্ষা করো। রক্ষা করো আমাদেরকেও। এরপর কবিতা আবৃত্তি করলেন— তোমার বান্দারা তাদের সম্পদের হেফাজত করুক। তুমি হেফাজত করো তোমার গৃহের। ক্রুশের ধারক-বাহকদেরকে পরাভূত করো। তোমার কৌশলের কাছে ওরা পরাভব মানতে বাধ্য। আশ্চর্য! তারা চায় তোমার গৃহ উৎসন্ন হোক। পরাজিত হোক তোমার গৃহের প্রতিবেশীরা। কতোইনা মূর্খ তারা। তুমি যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও চিরবিজয়ী, তা তারা জানেই না। তোমার ঘর এখন তোমার হেফাজতে। এখন তুমি যা ভালো মনে করো, তা-ই করো। প্রার্থনা ও কবিতা সমাপনের পর তিনি সকলকে নিয়ে মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন।

তখন সকাল। আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলো। নুফাইল প্রধান হাতিটার কানে কানে বললো, মনে রেখো, এখন তুমি অবস্থান করছো আল্লাহ্‌র মহাসম্মানিত গৃহের এলাকায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র গৃহের সম্মান রক্ষা করে এখানেই চুপচাপ বসে থাকো। নতুবা যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই ফিরে যাও। হাতিটি চুপচাপ বসে রইলো। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ওঠানো গেলো না। উপর্যুপরি প্রহারের আঘাতেও সে সেখান থেকে নড়লো না। শেষে যখন তার চোখের পাশে হানা হলো অঙ্কুষের আঘাত, তখন সে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু যাত্রা শুরু করলো ইয়েমেনের দিকে। কোনোক্রমেই তাকে আর কাবামুখী করা গেলো না। বরং ক্রমাগত অঙ্কুষের আঘাত খেয়ে পুনরায় বসে পড়লো। আল্লাহ্‌পাক সমুদ্রের দিক থেকে পাঠালেন আবাবিল নামের এক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখি। তারা তাদের দুই ডানায় দু'টি এবং চঞ্চুতে একটি করে মসুর দানার মতো ক্ষুদ্র প্রস্তরকণা বহন করে নিয়ে এলো। পুরো বাহিনীর উপর বর্ষণ করতে লাগলো প্রস্তরকণাগুলো। ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো বাহিনীর লোকেরা। এদিকে ওদিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেও বাঁচতে পারলো না। আবরাহা হঠাৎ আক্রান্ত হলো এক অজানা রোগে। প্রথমে তার হাতের আঙ্গুলের গিটগুলো ফুলে গেলো। তারপর আঙ্গুল খসে পড়তে লাগলো একটি একটি করে। পালিয়ে গিয়ে সে কোনোমতে সানআ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো ঠিকই, কিন্তু বেশীক্ষণ বাঁচতে পারলো না। তার বুক স্ফীত হতে শুরু করেছিলো আগে থেকেই। হঠাৎ স্ফীতবুক গেলো ফেটে। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হলো তার ভবলীলা।

ওয়াকেদী লিখেছেন, হাতিগুলো অক্কা পেয়েছিলো প্রস্তরকণার আঘাতে। বেঁচে গিয়েছিলো কেবল মাহমুদ নামের সর্ববৃহৎ হাতিটি। কেননা সে আল্লাহ্‌র গৃহের প্রতি প্রদর্শন করেছিলো সম্মান।

কাবা শরীফে হস্তিযুথের আক্রমণের উপলক্ষ সম্পর্কে মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন কুরায়েশ বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে নাজ্জাশীর দেশে গমন করলো। একস্থানে সাগর তীরে তারা যাত্রাবিরতি করলো। রান্নাবান্না করলো সেখানে। পানাহার করলো। তারপর যাত্রা করলো সম্মুখের দিকে। এক সময় তাদের চুলার আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ বাতাসের সঙ্গে উড়ে গিয়ে পড়লো নিকটবর্তী এক গীর্জার উপর। ফলে আগুন ধরে গেলো। আর ওই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলো গীর্জাটি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি কানে গেলো নাজ্জাশীর। সে তখন পণ করলো, এর প্রতিশোধ নিতে কাবাগৃহ সে ধ্বংস করবেই।

সে সময় আবু মাসউদ নামে ছিলেন এক সাধু পুরুষ। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন। তিনি গ্রীষ্মকালে বাস করতেন তায়েফে এবং শীতকালে মক্কায়। মানুষ তাঁকে মান্য করতো। সংকটে-বিপদে পরামর্শ গ্রহণ করতো তাঁর। মান্যবর আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তাঁর একান্ত সুহৃদ। আবরাহা বাহিনী যখন মক্কার কাছাকাছি এসে যাত্রা স্থগিত করলো, তখন আবদুল মুত্তালিব আবু মাসউদের কাছে ছুটে গেলেন। কামনা করলেন তাঁর পরামর্শ। আবু মাসউদ বললেন, আমাকে হেরা পর্বতের চূড়ায় উঠিয়ে দাও। ভেবে দেখি, কী করা যায়। তাই করা হলো। তিনি সেখানে

উঠে বললেন, শোনো, একশত উট জোগাড় করো। তাদের গলায় ঝুলিয়ে দাও মানতের কোরবানীর চিহ্নরূপে জুতার মালা। তারপর উটগুলোকে হেরেম এলাকায় যথেচ্ছ চরে ফিরে বেড়াতে দাও। সম্ভবত কোনো হাবশী লোক জোর করে ওগুলোকে ধরে নিয়ে যাবে। আবদুল মুত্তালিব তাঁর পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। একসময় দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই এক হাবশী লোক সেগুলোকে ধরে নিয়ে গেলো। তাদের কিছুসংখ্যককে বানালো তাদের বাহন। অবশিষ্টগুলোকে খেয়ে ফেললো জবাই করে।

ইয়েমেন প্রদেশের অধিপতিদের উপাধি ছিলো তুব্বা। আবু মাসউদ বললেন, তুব্বা কাবাগৃহ ধূলিসাৎ করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু হঠাৎ ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেললো তাকে। তিন দিন পর্যন্ত ঘোর অন্ধকারে আটকে রইলো সে। শেষ পর্যন্ত সে তার অসৎ সংকল্প পরিত্যাগ করলো। মিসরে নির্মিত শাদা চাদরে কাবাগৃহ আবৃত করে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলো আল্লাহ্র ঘরের প্রতি। মানত করলো উট কোরবানী করার এবং সে মানত পূরণও করলো সে।

ওদিকে আবু মাসউদ খেয়াল করলেন সাগরের দিকে। তারপর মান্যবর আবদুল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, লক্ষ্য করুন, সমুদ্রের দিকে কিছু একটা ঘটছে। আবদুল মুত্তালিব বললেন, ওদিকে তো উড়ন্ত কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে। আবু মাসউদ বললেন, চিনতে পারেন? আবদুল মুত্তালিব বললেন, শপথ আল্লাহ্র! ওরকম পাখি তো আমি কোনোদিনই দেখিনি। আবু মাসউদ বললেন, সংখ্যা কতো হবে? তিনি বললেন, মৌমাছিদের মতো অসংখ্য। প্রত্যেকের লাল চঞ্চুতে রয়েছে পাথরের কণা। মাথাগুলো কালো। গ্রীবাগুলো লম্বা। একটি পাখির নেতৃত্বে তারা উড়ে আসছে গগন অন্ধকার করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখিগুলো উড়ে এসে স্থির হলো আবরাহা বাহিনীর উপরে। শুরু করলো প্রস্তরকণা বর্ষণ। প্রস্তরকণাগুলোর গায়ে যার যার নাম লেখা ছিলো সেগুলো আঘাত করলো তাদেরকেই। ফলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলো সকলে। তারপর পাখিগুলো যেদিক থেকে উড়ে এসেছিলো, ফিরে গেলো সেদিকেই।

হজরত আবদুল মুত্তালিব ও আবু মাসউদ হেরা পর্বতের চূড়া থেকে নেমে এলেন পরদিন সকালে। একটি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করলেন আবরাহাবাহিনীর অবস্থা। নাহ্! কারো কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সেখান থেকে উঠলেন আর একটি টিলায়। কিন্তু সবকিছু নীরব। নিঝুম। কাছে গিয়ে দেখলেন রাশি রাশি শব। প্রস্তরকণাগুলো শিরস্ত্রাণ ভেদ করে ঢুকে পড়েছে তাদের মস্তিষ্কে। আর হাতি-ঘোড়াগুলোর দেহ ভেদ করে প্রস্তরকণা ঢুকে গেছে মাটির মধ্যে। তাঁরা দু'জনে আবরাহার লোকদের বেলচা দিয়ে মাটি খুঁড়লেন। প্রস্তুত করলেন দু'টি গর্ত। তাদের পরিত্যক্ত মূল্যবান বস্তুগুলো গর্ত দু'টোতে রেখে দিলেন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আবু মাসউদ! একটি তোমার এবং একটি আমার। ওই সম্পদ বহুদিন ধরে খরচ করেছিলেন তাঁরা। সম্পদের ভাগ পেয়েছিলো মক্কাবাসীরাও।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্ তো তাদের অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেনই।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন'। কথাটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতে! 'ব্যর্থ করে দেননি' বাক্যের সঙ্গে। অর্থাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট পাখি প্রেরণ করে আমি তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিলাম। এখানে 'ত্বইরান' (পাখি) এর বিশেষণ 'আবাবীল' (ঝাঁকে ঝাঁকে)। চতুর্দিক থেকে অশ্ববাহিনী আক্রমণ করলে আরববাসীগণ বলে 'জাআতিল খইল ওয়াল আবাবীল'। আবু উবায়দা বলেছেন, 'আবাবীল' বহুবচন 'ইব্‌বালাতুন' এর। পাখিগুলো ছিলো অসংখ্য। ছুটে আসছিলো একটির পিছনে একটি। তাই এখানে বলা হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ফাররা বলেছেন 'আবাবীল এমন ধরনের একটি বহুবচন, যার ধাতুমূল থেকে বহুবচন হয়ই না। কাসায়ী বলেছেন, 'আবুলুন' এর বহুবচন 'আবাবীল' যেমন 'আজ্জুলুন' এর বহুবচন 'আজ্বাজ্বীল'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের উপর প্রস্তরকংকর নিক্ষেপ করে। বাক্যটি আগের আয়াতের 'পাখি' এর বিশেষণ। অর্থাৎ ওই পাখিগুলো অসংখ্য প্রস্তরকণা নিক্ষেপ করেছিলো আবরাহার হস্তিযুথের উপর। 'সিজ্বজ্বীল' অর্থ প্রস্তরকণা, ওই মৃত্তিকাখণ্ড যা রূপান্তরিত হয় প্রস্তরে। কেউ কেউ বলেছেন 'সিজ্বজ্বীল' গঠিত হয়েছে 'সিজ্বলুন' থেকে, যার অর্থ বৃহৎ ডোল বা বালতি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'আস্‌সিজ্বলু' অর্থ সীলমোহর করা। অর্থাৎ ওই পাথরকণাগুলোতে যাদের নাম সীলমোহর করা ছিলো, পাথরকণা আঘাত করেছিলো তাদেরকেই। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পাখিগুলোর উপরের ঠোঁট পাখির মতোই ছিলো, কিন্তু নিচের ঠোঁটগুলো ছিলো কুকুরের থাবার মতো। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, পাখিগুলোর রঙ ছিলো সবুজ, আর তাদের ঠোঁটগুলো ছিলো হলুদ। কাতাদা বলেছেন, পাখিগুলো ছিলো কৃষ্ণবর্ণের। তারা দলে দলে আক্রমণ করেছিলো সমুদ্রের দিক থেকে এসে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, প্রতিটি প্রস্তরকণায় লেখা ছিলো নিহত ব্যক্তিদের নাম। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দিকেই তারা তীব্রভাবে নিক্ষেপ করেছিলো পাথরকণাগুলো। সেগুলো তাদের মস্তক ফুঁড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো তাদেরই পশ্চাদ্‌দ্বার দিয়ে।

শেষোক্ত আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক ওই প্রস্তরকণাগুলোর আঘাতে তাদেরকে করেন পশুপাল কর্তৃক ভক্ষিত চূর্ণবিচূর্ণ তৃণের মতো। 'কা আ'সফিম্ মা'কূল' অর্থ ভক্ষিত তৃণসদৃশ। 'আ'সফ' অর্থ গাছের পাতা। কাতাদা বলেছেন, ভূষি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গমের উপরের আবরণীকে বলে 'আ'সফ'। আর 'মা'কূল' এর অর্থ ভক্ষিত।

সূরা কুরাইশ

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কানগরীতে। এতে রয়েছে ৪টি আয়াত।

সূরা কুরাইশ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

r যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে,

r আসক্তি আছে তাহাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের

r অতএব, উহারা ‘ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের,

r যিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে ‘লিঈলাফি কুরাইশ’ (যেহেতু কুরায়েশদের আসক্তি আছে)। কাসায়ী এবং আখফাশ বলেছেন, এখানকার ‘লাম’ বিস্ময়প্রকাশক, সম্পৃক্ত একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কুরায়েশদের অনুরাগ দেখে অবাক লাগে। জুজায বলেছেন, এখানকার ‘লাম’ অব্যয়টি সংযুক্ত হবে ৩ সংখ্যক আয়াতের ‘তারা ইবাদত করুক’ বাক্যের সঙ্গে। অর্থাৎ কুরায়েশদের যেহেতু অনুরাগ আছে, তাই তাদের উচিত কাবা গৃহের মালিকের ইবাদত করা। কেননা তাদের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র অগণন অনুগ্রহ। এমতো অনুগ্রহ। এমতো অনুগ্রহের কথা বাদ দিলেও তাদের উচিত এই ঘরের অধিপতির উপাসনা করা।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার ‘লিঈলাফি’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত আগের সুরার শেষাংশের সঙ্গে। যেমন কোনো কবিতার দ্বিতীয় পঙক্তির সম্পর্ক থাকে প্রথম পঙক্তির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্‌পাক আবরাহার হস্তিযুথক করে দিয়েছেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ, যেনো কুরায়েশেরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে বহির্বিশ্বের সঙ্গে। অন্য দেশের লোকের সঙ্গে স্থাপন করতে পারে সম্প্রীতি-সৌহার্দ। অর্থাৎ ঘটনাটির মাধ্যমে অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের কাছে ফুটে উঠছে কুরায়েশদের মাহাত্ম্য। মানুষ বুঝতে পারবে, তাদের জন্যই আল্লাহ্‌পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদের কাবাগৃহের প্রতি আক্রমণ পরিচালনাকারীদেরকে। ফলে তারা তাদেরকে সমীহ করবে। কেউ আর তাদের প্রতি পোষণ করতে পারবে না আক্রমণাত্মক মনোভাব। অর্থগত এই সঙ্গতির কারণে কেউ কেউ বলেছেন, সুরা দু’টো মূলতঃ একই সুরা। হজরত উবাই ইবনে কা’বের পাণ্ডুলিপিতে সুরা দু’টো লিপিবদ্ধ ছিলো ছেদ ব্যতিরেকেই।

কুরায়েশ বলা হয় নজর ইবনে কানানার বংশধরদেরকে। শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ক্বারশূন' থেকে। 'তাক্বাররুশূন' অর্থ উপার্জন করা, কুক্ষিগত করা। যেমন বলা হয় 'ফুলানুন ইয়াক্বরুশু লি আহ্লিহী' (অমুক ব্যক্তি তার পরিবারের পোষ্যদের জন্য উপার্জন করেছে)। উপার্জনশীল সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রতি তাদের ছিলো উদগ্র আগ্রহ। এজন্যই তাদের নাম হয়েছে 'কুরাইশ'।

একবার হজরত মুয়াবিয়া হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, এই জনগোষ্ঠীর নাম কুরায়েশ হয়েছে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, 'কুরাইশ' একটি সুবৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী। সে তার আশেপাশের ক্ষুদ্র জীব-জন্তুদেরকে ভক্ষণ করে। অথচ তাকে কেউ ভক্ষণ করতে পারে না। অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীরা তার উপর প্রভাব বিস্তার করতেই পারে না।

'কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে 'ক্বারাশাহু' অর্থ তাকে কর্তন করেছে এবং এদিক সেদিক থেকে এনে একত্রিত করেছে। একটিকে যুক্ত করেছে অন্যটির সঙ্গে। কুরায়েশরাও সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতো হেরেম এলাকায়। এমতো নামকরণের আর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, তারা অন্য স্থান থেকে পণ্য সামগ্রী কিনে এনে গুদামজাত করে রাখতো। আর একটি কারণ— একদিন নজর ইবনে কানানা একটি মাত্র বস্ত্রে নিজেকে আবৃত করে এক স্থানে বসেছিলো। লোকেরা তাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে বলে উঠলো 'তাক্বাররাশা' (স্তূপীকৃত হয়েছে সে)। সেদিন থেকে তার বংশধরদেরকে বলা হতে থাকে 'কুরাইশ'। অন্য আর একটি কারণ— একবার নজর ইবনে কানানা তার স্বজাতিদের সমাবেশে আগমন করলে তারা সমস্বরে বলে উঠলো, আরে এ যে দেখছি কুরায়েশি উট (শক্তিশালী উট)। কুরাইশ নামের প্রচলন ঘটে সেদিন থেকেই। অথবা বলা যায়, শব্দটি 'ক্বারশূন' এর ন্যূনতা প্রকাশক রূপ। 'ক্বারাশ' হচ্ছে বৃহদাকার সামুদ্রিক প্রাণী।

একটি উপযোগ ঃ হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসমাইল থেকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন কানানাকে। কানানা গোত্র থেকে কুরায়েশকে। কুরায়েশ গোত্র থেকে হাশেমকে। হাশেম গোত্র থেকে আমাকে। বাগবী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এদিক দিয়ে সকল মানুষ কুরায়েশদের অনুসারী। তাদের মধ্যেই রয়েছে মুসলমান এবং তাদের মধ্যেই রয়েছে কাফের। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ উত্তম ও অধম এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে কুরায়েশদের অনুগামী। মুসলিম।

আমি বলি, সম্ভবত প্রথমোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে কুরায়েশদের যোগ্যতার মাত্রা এই নিরিখে যে, তাদের মধ্য থেকেই এসেছেন বহুসংখ্যক সাহাবী এবং আউলিয়া। আর পরের হাদিস দু'টোর মর্মার্থ হচ্ছে— রসুল স. এর মহাআবির্ভাব ঘটেছিলো কুরায়েশ গোত্রেই। তাই ইসলাম গ্রহণ ও শরিয়তের বিধান কার্যকর করার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিলো তাঁদের উপরেই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অবশ্যই আমি আমার রসুলকে প্রেরণ করেছি তাঁর স্বজাতির ভাষাসহ, যেনো তিনি তাদের নিকটে প্রকাশ করতে পারেন'। আর এক আয়াতে বলা

হয়েছে 'আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন'। যে কুরায়েশ ইমান গ্রহণ করবে, রসুল স. এর অনুগামী হবে, তার জন্য থাকবে উত্তম বিনিময়। অধিকন্তু পরবর্তী যুগের পুণ্যবানদের উত্তম বিনিময়ও তাদের ভাগ্যে জুটবে। সে কারণেই নবীগণের পরেই নির্ধারিত রয়েছে ওই মহান ব্যক্তিগণের মর্যাদা। আবার যে কুরায়েশ সত্যপ্রত্যাখ্যান করবে, হবে রসুল স. এর প্রতিপক্ষ; এরপর মৃত্যুমুখে পতিত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়, তাকে ভোগ করতে হবে কঠিনতর শাস্তি। তদুপরি পরবর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিও তার ভাগ্যে জুটবে। যেমন কাবিল ছিলো প্রথম নরঘাতক। তাই সে তার ওই অপকর্মের শাস্তি তো পাবেই, তদুপরি পাবে পরবর্তী সময়ের সকল নরঘাতকদের সমতুল শাস্তি। অবশ্য পরবর্তীদের শাস্তি এতে করে এতোটুকুও কমবে না। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। সুরা ওয়াশ্ শামসের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, হন্তারকদের মধ্যে কাবিলই সর্বাধিক দুর্ভাগা। হজরত ইবনে ওমর থেকে সুপরিণত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কুরায়েশদের মধ্যে দু'জন জীবিত থাকলেও চালু থাকবে এই পদ্ধতি। হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যতোক্ষণ পর্যন্ত কুরায়েশেরা তাদের মধ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রাখবে, এই পদ্ধতি চালু থাকবে ততোদিন পর্যন্ত। এমতাবস্থায় কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন। বোখারী।

আমি বলি, হাদিসে বর্ণিত 'আমর' বা পদ্ধতি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে খেলাফতের দিকে। আর হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য ভবিতব্য বর্ণনা নয়, বরং কুরায়েশগণের খেলাফত। আর হজরত মুয়াবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যটি একটি অপপ্রার্থনা ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য, যে বা যারা বিদ্রোহী হয় একজন কুরায়েশ খলিফার। হজরত সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরায়েশদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে হেয় করবেন। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম, তিবরানী ও বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ৭টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা কুরায়েশদেরকে মর্যাদায়িত করেছেন। যেমন— ১. আমার মহাআবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে ২. তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নবুয়ত ৩. তারাই কাবাগৃহের রক্ষী ৪. তারাই হজযাত্রীদেরকে পানি সরবরাহকারী ৫. তাদেরকে বিজয়দান করা হয়েছে হস্তিবাহিনীর উপরে ৬. নবুয়তের প্রথম দশ বছর কুরায়েশেরা ছাড়া আর কেউ ইবাদত করার সুযোগ পায়নি ৭. তাদের নামোল্লেখ করেই কোরআন পাকে অবতীর্ণ হয়েছে একটি সুরা। আর এ সুরার মধ্যে তারা ছাড়া আর কারো প্রসঙ্গ নেই। এ সুরার নাম 'লি ঈলাফি কুরাইশ'। হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে 'আমার মহাআবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে' কথাটি নেই। তিবরানী।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের'। বাক্যটি 'ঈলাফি কুরাইশ' এর অনুবর্তী এবং 'রিহ্‌লাতাশ্ শিতাই ওয়াস্‌সইফ' বাক্যের সীমারেখা। এভাবে এখানে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কুরায়েশদের আসক্তি বা অনুরাগকে। এটা তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র এক

সুমহান অনুগ্রহ। কেননা হেরেম উপত্যকা তরুলতাশূন্য পর্বতময় ও পানিবিহীন, মানুষ বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুতরাং শীত ও গ্রীষ্মকালে যদি বাণিজ্য যাত্রার সুযোগও তাদের না থাকতো, তবে তাদের জীবন যাপন করা হয়ে যেতো অসম্ভব। আল্লাহ্পাক তাদেরকে কৃপা করলেন। মক্কাকে করলেন মহাসম্মানিত হেরেম। হেরেম এলাকার বাইরে যত্রতত্র যখন তখন চলতো লুটপাট-রাহাজানি। কিন্তু হেরেমবাসীরা থাকতো নিরাপদে। অন্যান্য অঞ্চলের লোক তাদেরকে দেখতো সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে! বলতো, কতোইনা সৌভাগ্যবান এরা। বসবাস করে হেরেমের অভ্যন্তরে। এরা যে আল্লাহ্র ঘরের প্রতিবেশী। লুণ্ঠনকারীরাও একারণেই সমীহ করতো তাদেরকে। ফলে কুরায়েশরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলো বহির্বিশ্বের সঙ্গে। ইয়েমেনের দিকে শীতের প্রকোপ ছিলো কম। তাই তারা শীতকালে বাণিজ্য করতে যেতো ইয়েমেনে। আর গ্রীষ্মের প্রখরতা কম ছিলো সিরিয়ার দিকে। তাই তারা গ্রীষ্মকালে বাণিজ্য করতে যেতো সেদিকেই। এভাবে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় মওসুমে তাদের বেসাতি হতো প্রচুর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতা বর্ণনা করেছেন, প্রথমদিকে কুরায়েশরা ছিলো দুর্দশাগ্রস্ত ও অনাহারক্লিষ্ট। সর্বপ্রথম হাশেমই তাদেরকে শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে বহির্দেশে বাণিজ্যে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে বাণিজ্য করে তারা উপার্জন করতে থাকে প্রচুর পরিমাণে। দরিদ্র-ধনী সবার মধ্যে মুনাফার মাল বণ্টন করে দেওয়া ছিলো তাদের রীতি। ফলে দরিদ্র-ধনী সকলেই সেখানে জীবন যাপন করতো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। কালাবী বলেছেন, সর্বপ্রথম হাশেম ইবনে আবদে মানাফই উট বোঝাই করে সিরিয়া থেকে আমদানী করেন গম। বাগবী লিখেছেন, কুরায়েশদের জন্য ইয়েমেন ও সিরিয়ার পথে বাণিজ্যযাত্রা ছিলো খুবই কষ্টকর। পথ ছিলো বন্ধুর, অসমতল। তবে বাণিজ্যসম্ভারে ভরপুর ছিলো ইয়েমেন। সেখানে সুলভে পাওয়া যেতো কৃষিজাত পণ্য। দু'টি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো সেখানে। বিভিন্ন দেশের বণিকেরা বাণিজ্যকেন্দ্র দু'টিতে উপস্থিত হতো স্থলপথে উষ্ট্রারোহী হয়ে, অথবা জাহাজযোগে সমুদ্র পথে। পণ্য আমদানী করতো মাহসাব ও জেদ্দা সমুদ্র বন্দরে। সেখান থেকে পণ্য সংগ্রহ করে আনতো কুরায়েশরা। ওদিকে সিরিয়াবাসীরা তাদের পণ্য বাজারজাত করতো আবতারা নামক বাণিজ্যকেন্দ্রে। কুরায়েশরা সেখান থেকে পণ্য কিনে আনতো মক্কায়। এভাবে তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে চালাতো তাদের বাণিজ্যিক তৎপরতা। একারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন ইবাদতের নির্দেশ। বলছেন 'অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের' (আয়াত ৩)। যদি এখানকার প্রথম বাক্যটি আগের সুরার শেষ বাক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, অথবা এখানকার 'লাম' কে বলা হয় বিস্ময়সূচক, তাহলে এখানকার 'ফা' অব্যয়টি হবে যোজক অথবা নৈমিত্তিক। আর যদি 'লাম' সংযুক্ত করা হয় 'ইবাদত করুক' কথাটির সাথে, তাহলে বলতে হয়, 'ফা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, অথবা একটি অনুক্ত শর্তের ফলাফল।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন'। অর্থাৎ তিনিই তো

তাদেরকে করেছেন হেরেমের অধিবাসী। নিরাপদ করে দিয়েছেন লুণ্ঠনকারীদের অপপরিকল্পনা থেকে, এমনকি দুধর্ষ আবরাহা বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েও তিনি নিশ্চিত করেছেন তাদের চিরনিরাপত্তা।

জুহাক, রবী ও সুফিয়ান সওরী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে তাঁর রোষতপ্ত ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। নবী ইব্রাহিম দোয়া করেছিলেন 'হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তুমি এ স্থানকে করে দাও চিরশান্তির আলয়। আর এর অধিবাসীদেরকে জীবনোপকরণ দান কোরো ফল দ্বারা'। তাঁর এমতো প্রার্থনার মহিমায় কুরায়েশদের বসবাস স্থল মক্কা নগরীতে কখনো সংঘটিত হয়নি ব্যাপক ধ্বংসলীলা।

আল্লামা জাওজী তাঁর 'হিসনে হাসিন' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবুল হাসান কাযভীনী থেকে পরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, দস্যু-তস্করের আক্রমণাশংকাকালে লি ঈলাফি কুরাইশিন' পাঠ করলে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আমি বলি, আমার পীর-মোর্শেদ আমাকে বলেছেন, সুরা কুরাইশ যে কোনো বিপদ থেকে পরিত্রাণের রক্ষাকবচ। সুতরাং তুমি ভীতিপ্রদ পরিবেশে এই সুরাটি পাঠ কোরো। আমি এই আমলের উপরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

সূরা মাঊ'ন

৭ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাশান্তির আলয় পুণ্যভূমি মক্কায়।

সূরা মাঊ'ন ঃ আয়াত **১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ؕ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

- r তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে?
- r সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়
- r এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।
- r সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,
- r যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,
- r যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
- r এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'আরাআইতাল্ লাজী ইউ কাজ্জিবু বিদ্দ্বীন' (তুমি কি দেখেছো তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে)। 'বাহরে মাওয়াজ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। 'রুয়ত' অর্থ ' দেখা' হলেও এখানে এর অর্থ জানা, অথবা চেনা আর 'দ্বীন' অর্থ এখানে ধর্ম, অথবা প্রতিফল দিবস। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি ওই ব্যক্তিকে তো চিনেনেই, যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে।

আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে আস ইবনে ওয়ায়েল সাহামীকে লক্ষ্য করে। এক বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আয়াতখানির লক্ষ্যস্থল ওলীদ ইবনে মুগীরা। সুদ্দী, ইবনে কীসান এবং অপর বর্ণনানুসারে মুকাতিলের মন্তব্যও এরকম। জুহাক বলেছেন, আমর ইবনে আমের মাখজুমীর কথা। এ সকল বিবরণের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো দু'বার— প্রথম দিকে মক্কায় এবং শেষদিকে মদীনায়। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরা 'আরাআইতাল্ লাজী' অবতীর্ণ হয়েছে এক মুনাফিক ব্যক্তি সম্পর্কে। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি এ কথাই প্রমাণ করে যে, এখানকার ইঙ্গিতসূচক পদ 'আল্ লাজী' (যে, যে ব্যক্তি) সীমিতার্থক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জাতিবাচক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'সে তো সে-ই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়'। একথার অর্থ— ওই ব্যক্তিটি প্রতিফল দিবসকে তো অস্বীকার করেই, অধিকন্তু রূঢ় আচরণ করে পিতৃহীনের প্রতি। আর তাকে তাড়িয়েও দেয়। এখানকার 'ফাজালিকা' বাক্যের 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর এর পরের 'ফা' (আয়াত ৪) প্রথমোক্তটির নিমিত্ত। এখানে ইয়াদুউ' অর্থ সজোরে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেওয়া।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না'। একথার অর্থ— প্রতিফল দিবসের প্রতি বিশ্বাস নেই বলে সে আরো একটি অপকর্ম করে, নিরন্নকে অন্নদান করে না। এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না অন্যদেরকেও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের (৪) যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন' (৫)। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি পরিণতিসূচক। এভাবে ব্যক্তব্যটি দাঁড়ায়— এতিমের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার এবং অন্নহীনকে অন্নদান না করা যদি হয় ধর্মপরায়ণতার দুর্বলতার প্রতীক এবং তিরস্কার শাসনের উপলক্ষ হয়, তবে নামাজের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন, অথবা লোক দেখানো নামাজ তো হবে সত্যপ্রত্যাখানেরই একটি শাখা এবং তা হবে শাস্তিরও উপযোগী। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'ফা' অব্যয়ের পরেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ওয়াইল' (দুর্ভোগ)। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— এ সকল অসৎ আচরণের পরিণতি হচ্ছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অথবা বলা যেতে পারে 'ফা' অব্যয়টি এখানে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ আগের (আয়াত ২)'ফা' পরের 'ফা' এর নিমিত্ত। তাই এখানে

‘তাদের জন্য’ (লাহুম) না বলে বলা হয়েছে ‘সালাত আদায়কারীদের’ (লিল মুসল্লীন) একারণে যে, প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে আচরণ প্রসঙ্গে এবং পরে আল্লাহপাকের সঙ্গে আচরণ প্রসঙ্গে।

‘সাহূন’ অর্থ উদাসীন, বেপরোয়া। মাসআদ ইবনে সা’দ সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে ‘যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন’ আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাওয়া হলো। তিনি স. বললেন, এর অর্থ— যারা নামাজের সময় বিনষ্ট করে দেয়। ইবনে জারীর ও আবু ইয়ালার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সকল লোক ‘সাহূন’ (উদাসীন) যারা নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করে না। আবুল আলিয়া এর অর্থ করেছেন, যারা সময় মতো নামাজ পাঠ করে না এবং নামাজের মধ্যে রুকু-সেজদা পুরোপুরি আদায় করে না। কাতাদা বলেছেন ‘সাহূন’ অর্থ নির্ভিক, বেপরওয়া। কেউ কেউ অর্থ করেছেন যারা নামাজ পড়ে ঠিকই, কিন্তু এর জন্য পুণ্যের আশা করে না, আবার না পড়লে শাস্তিরও ভয় করে না, তারাই ‘সাহূন’। মুজাহিদ বলেছেন এর অর্থ যারা নামাজ পড়তে গড়িমসি করে এবং প্রদর্শন করে আলস্য। মুজাহিদ বলেছেন, ‘সাহূন’ তারাই, যারা নামাজ পাঠ করে লোক দেখানোর জন্য এবং নামাজ বাদ পড়ে গেলে তারা এর জন্য করে না আক্ষেপ।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে’। এখানকার ‘ইউরাউন’ শব্দটি সাধিত হয়েছে ‘রুয়ত’ (প্রদর্শন) থেকে। অর্থাৎ যারা নামাজ পাঠ করে জনগণের প্রশংসা অর্জনের জন্য। রসুল স. বলেছেন, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পাঠ করে ও রোজা রাখে এবং দান খয়রাত করে, তারা শিরিক করে।

শেষোক্ত আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘ওয়া ইয়াম্‌নাউ’নাল মাউ’ন’ (এবং গৃহস্থালীর ছোট খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে)। কুতরব বলেছেন ‘মাউ’ন’ বলে অতি তুচ্ছ বস্তুকে। আর এখানে ‘মাউ’ন’ অর্থ জাকাত। হজরত আলী, হজরত ইবনে ওমর, হাসান বসরী, কাতাদা এবং জুহাকও এরকম বলেছেন। পুঞ্জীভূত সম্পদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকে জাকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় বলেই এখানে জাকাতকে বলা হয়েছে ‘মাউ’ন’।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মাউন বলে দা-কুড়াল, বালতি, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে। মুজাহিদ বলেছেন,‘মাউ’ন’ হচ্ছে ধার-কর্জ। ইকরামা বলেছেন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বস্তু। ক্ষুদ্র হচ্ছে সাংসারিক বস্তু এবং বৃহৎ হচ্ছে জাকাত। মোহাম্মদ ইবনে কা’ব ও কালাবী বলেছেন, অতিপরিচিত সামগ্রী পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করাকে বলে ‘মাউ’ন’। এ সকল সামগ্রী কেউ চাইলে না দেওয়া ঠিক নয়। যেমন আগুন, পানি, লবণ ইত্যাদি।

জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কেউ চাইলে পানি না হয় দেওয়া গেলো। কিন্তু আগুন, লবণও কি দিতে হবে? তিনি স. বললেন, হুমায়রা! শোন, কেউ যদি কাউকে একটু আগুন দেয়, তবে সে যেনো তাকে দিলো আগুনে রান্না করা খাদ্য। আর যে লবণ দিলো, সে যেনো দিলো লবণ দিয়ে রান্না করা ব্যঞ্জন। পানি যেখানে সুলভ, সেখানে পানি যে দিলো, সে যেনো মুক্ত করে দিলো একজন ক্রীতদাসকে। আর পানি যেখানে দুর্লভ সেখানে যে পানি দান করলো, সে যেনো বাঁচালো একজনের জীবন। ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন' আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে। তারা মুসলমানদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়তো। তাঁদের অনুপস্থিতিতে নামাজ পাঠ করতো না। তাদের সাথে সাংসারিক লেনদেনও করতো না।

হজরত আনাস ও হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্পাকের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা; তিনি বলেছেন 'আ'ন সলাতিহিম সাহূন' 'ফী সালাতিম সাহূন' বলেননি। 'আ'ন সলাতিহিম সাহূন' অর্থ যারা নামাজ পরিত্যাগ করে, নামাজের পরোয়াই করে না। এরকম স্বভাব মুনাফিকদের। আর 'ফী সলাতিম সাহূন' অর্থ যাদের নামাজের মধ্যে এলোমেলো ধারণার আগমন ঘটে। নিঃসন্দেহে এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। এ ধরনের ধারণা অপসারণের চেষ্টা করতে হবে এবং এর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহ্র। আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে এমতো অমনোযোগিতার পাপ মার্জনাও করতে পারেন। মাদারেক।

হজরত ওসমান ইবনে আবুল আস বলেছেন, একবার আমি রসুল স. সকাশে নিবেদন জানালাম, হে মহাবিচার দিবসের কাণ্ডারী! আমিতো কখনো কখনো নামাজ এবং ক্বেরাতের মধ্যে শয়তান কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত অন্তরায় অনুভব করি। দ্বিধান্বিত হই। তিনি স. বললেন, ওই শয়তানটির নাম খিনযাফ। তুমি তার প্রভাব অনুভব করলে আল্লাহ্ সমীপে আশ্রয় কামনা কোরো। বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ কোরো তিনবার। হজরত ওসমান বললেন, আমি এরকম করেছিলাম। আল্লাহ্ তার প্রভাব থেকে আমাকে মুক্তও করেছিলেন। মুসলিম।

একলোক একবার ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদের নিকট জিজ্ঞেস করলো, আমার তো নামাজের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কী করবো? তিনি জবাব দিলেন, নামাজ পড়তে থাকো। নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হবে না। মনে মনে ভেবো, আমার নামাজ তো এখনো শেষ হয়নি। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সূরা কাওছার

৩ আয়াতবিশিষ্ট এই সূরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা রসুল স.এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। দেখলাম তিনি বসে আছেন উদাসভাবে। কিছুক্ষণ পর তিনি মৃদু হাসলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে দয়াল নবী! আপনার মৃদু হাসির অর্থ কী, তা কি আমরা জানতে পারি? তিনি স. বললেন, এক্ষুণি আমার উপরে অবতীর্ণ হলো সুরা কাওছার। এরপর তিনি স. সদ্য অবতীর্ণ সুরাখানি পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো, কাওছার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়তম নবীই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তিনি স. বললেন, কাওছার একটি প্রস্রবণ। আল্লাহ্ ওই প্রস্রবণ আমাকে দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহাবিচারের দিবসে ওই মহাকল্যাণময় কাওছারের পাশে সমবেত হবে আমার উম্মত। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো অগণন পানপাত্র বিদ্যমান থাকবে কাওছারের পাড়ে। উপস্থিত জনতার মধ্যে একজনকে টেনে বের করে দেওয়া হবে। আমি নিবেদন করবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালয়িতা! লোকটি তো আমার উম্মত। বলা হবে, না, আপনি জানেন না। আপনার তিরোধানের পর এই লোকটি ধর্মীয় বিষয়ে প্রচলন ঘটিয়েছিলো অপপ্রথার (বেদাতের)। মুসলিম।

শিথিল সূত্রসহযোগে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু আইয়ুব বলেছেন, যখন রসুল স. এর শিশুপুত্র হজরত ইব্রাহিম ইন্তেকাল করলেন, তখন অংশীবাদীরা বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদ আঁটকুড়ে, নির্বংশ। তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'ইন্না আ'ত্বইনাকাল্ কাওছার'। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত শাম্মার ইবনে আতীয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, উকবা ইবনে মুয়ীত বলতো, মোহাম্মদের সন্তান-সন্ততি বেঁচে থাকবে না। সে তো নির্বংশ। তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ'।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনানুসারে ইবনে জারীর বলেছেন 'সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কোরবানী করো' আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন। তখন হজরত জিবরাইল এসে বলেছিলেন, আপনি এখানেই কোরবানী করুন এবং ফিরে যান। একথা শুনে রসুল স. উঠে ভাষণ দিলেন। তাঁর ওই ভাষণের মধ্যে নির্দেশ ছিলো কোরবানী করার এবং কেশ কর্তন করার। এর পর তিনি আদায় করলেন দুই রাকাত নামাজ। স্বহস্তে কোরবানী করলেন তাঁর কোরবানীর পশু। বর্ণনাটি অতীব বিরল শ্রেণীর। বায্যার প্রমুখ হাদিসবেত্তাগণ বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদী একবার মদীনা থেকে মক্কায়

এলো। অংশীবাদী কুরায়েশরা তার সঙ্গে দেখা করে বললো, এই লোকটি (রসুল স.) আমাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। সে বলে, আমরা নাকি পাপী। আমরা হজযাত্রীদের সেবাযত্ন করি। তাদেরকে পানি পান করাই। আমরাই কাবাগৃহের রক্ষক। অথচ সে আমাদেরকে গোনাহগার বলে। কা'ব বললো, তোমরাই উত্তম। তখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরাই নির্বংশ'।

ইকরামার বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর উপরে যখন ওহী আসতে শুরু করলো, তখন অংশীবাদীরা বলতে শুরু করলো, সে আমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। সে লেজকাটা। তখন অবতীর্ণ হয় 'তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরাই তো নির্বংশ (লেজকাটা)। সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কারো পুত্রসন্তান মারা গেলে যদি তার আর কোনো সন্তান না থাকতো, তবে কুরায়েশরা তাকে বলতো, লোকটির বংশ কেটে গেছে। রসুল স. এর যখন পুত্রবিয়োগ ঘটলো, তখন আস ইবনে ওয়াইল বললো, মোহাম্মদের বংশ নিপাত গেলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আলী জয়নুল আবেদীন ইবনে ইমাম হোসাইন থেকে বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থেও উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর রসুল স. এর ওই মহাসৌভাগ্যশালী সন্তানের নাম ছিলো হজরত কাসেম। মুজাহিদ সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো আস ইবনে ওয়াইলকে উদ্দেশ্য করে। সে বলেছিলো, আমি মোহাম্মদের শত্রু। বাগবী লিখেছেন, একবার রসুল স. কাবাপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তখন সেখানে প্রবেশ করছিলো আস ইবনে ওয়াইল। বনী সাহাম তোরণে দু'জনের দেখা হলো। উভয়ের মধ্যে কিছু বাক্যবিনিময় হলো। তখন কুরায়েশদের হোমরা চোমরারা বসেছিলো কাবাপ্রাঙ্গণে। আস সেখানে পৌঁছলে তাদের একজন বললো, কী নিয়ে আলাপ করছো তোমরা? আস বললো, আলাপ আর কী হবে। সে তো আবতার (লেজকাটা)। তখন জননী খাদিজার সন্তান সদ্য বিগত হয়েছেন।

ইয়াজিদ ইবনে নোমান সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, রসুল স. এর প্রসঙ্গ উঠলেই আস ইবনে ওয়াইল বলতো, আরে বাদ দাও ওর কথা। ওতো আঁটকুড়ে। তার তো বংশধরই নেই। সে দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার কথা আর কেউ মনেও করবে না। তখনই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

আমার মতে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, রসুল স. এর কোনো সন্তানের পরলোকগমনের পর এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়নি। কেননা, হজরত কাসেমের ইন্তেকাল হয়েছিলো হিজরতের অথবা তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে মক্কায়। আর মোহাম্মদ ইবনে আলীর সূত্রভূত জাবের জুফী ছিলো একজন প্রতারক। ওয়াকেদীর সুদূর ধারণা এই যে, রসুলতনয় হজরত ইব্রাহিমের পরলোকগমন ঘটেছিলো দশম নববী সনে ১০ ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবারে। 'সাবিলুল রাশাদ' পুস্তকে

এরকমই বলা হয়েছে। তবে আয়াতখানি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে দু'টি বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। তার একটি বর্ণনা হজরত আনাসের, যা উপস্থাপন করেছেন মুসলিম। আর অন্যটি বর্ণনা করেছেন বাযযার, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। বর্ণনাটিতে ছিলো কা'ব ইবনে আশরাফের মক্কায় আগমনের কথা।

সূরা কাওছার ঃ আয়াত **১, ২, ৩**

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انۡحَرۡ ؕ﴿۲﴾ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ﴿۳﴾

r আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।

r সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।

r নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।

প্রথমে বলা হয়েছে—'ইন্‌না আ'ত্বইনাকাল্‌ কাওছার' (আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার দান করেছি)। ভাষাবিদগণ বলেন, 'কাওছার' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'কাছরত' থেকে, যেমন 'নাওফাল' থেকে নফল। যে বিষয়টি সংখ্যায় অধিক, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার, আরববাসীরা তাকেই বলে কাওছার। একথার সমর্থন রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে। তিনি বলেছেন, কাওছার হচ্ছে ওই মহামূল্যবান পুরস্কার, যা আল্লাহ্‌ কেবল দান করেছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবুল বাশার ও আতা ইবনে সাইব। আবুল বাশার বলেছেন, আমি একবার সাঈদ ইবনে যোবায়েরকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকে যে বলে কাওছার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম? তিনি বললেন, ওই প্রস্রবণও 'কাওছার' নামক মহামূল্যবান পুরস্কারের অন্তর্ভূত। এই বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, এখানকার 'আল কাওছার' এর 'আলিফ লাম' জাতিবাচক। হজরত ইবনে আব্বাস কথিত 'মহামূল্যবান পুরস্কারে'র অন্তর্ভুক্ত। এভাবে যারা কোরআন মজীদ এবং নবুয়তকে কাওছার বলেন, তার নিকটও এখানকার 'আলিফ লাম' জাতিবাচক। তবে উত্তম এই যে, এখানকার 'লাম' টিকে সীমিতার্থক ধরে নিয়ে ওই ব্যাখ্যাটিই উপস্থাপন করা সমীচীন, যা বর্ণিত হয়ে এসেছে রসুল স. থেকে, যা বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে ইমাম মুসলিম কর্তৃক।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বেহেশতে গিয়ে দেখলাম বিশাল একটি হ্রদ। তার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছে মুক্তাসদৃশ অসংখ্য তাঁবু। আমি হ্রদের পানিতে হাত দিলাম। দেখলাম, সে পানি

স্বচ্ছ, সুপেয় ও মেশকের মতো সুরভিময়। জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তিনি বললেন, এটাই সেই মহাকল্যাণময় কাওছার, যা আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. বললেন, কাওছারের পানি হবে দুগ্ধশুভ্র, মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। তাতে ভেসে বেড়াবে সন্তরণপ্রবণ পক্ষীকুল। তাদের গ্রীবাদেশ হবে উটের মতো অংস-পুটবিশিষ্ট। মান্যবর ওমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তমজন! তাহলে তো বিষয়টি হবে খুবই কল্যাণপ্রদ। তিনি স. জবাব দিলেন, তার চেয়ে অধিক কল্যাণপ্রদ হবে ওই পানি পান করা।

হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, একবার শহীদশ্রেষ্ঠ হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পত্নী রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনাকে কি জান্নাতে কাওছার নামের কোনো প্রস্রবণ দেওয়া হয়েছে? তিনি স. জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তার তটদেশ হবে মহামূল্যবান মুক্তা, জবরজদ ও ইয়াকুতের। আর তা প্রশস্ত হবে আইলা থেকে সানআ পর্যন্ত দূরত্বের সমান। আর সেখানকার পানপাত্রগুলো হবে তারকারাজি সদৃশ অগণন। তিবরানীর দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে 'ইন্না আ'ত্বইনাকাল্ কাওছার' আয়াতখানির ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত হুজায়ফা বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে বিশাল পরিধিবিশিষ্ট একটি হ্রদ। তার তটভূমিতে রক্ষিত স্বর্ণ-রৌপ্যের পানপাত্রগুলি হবে অসংখ্য। সেগুলোর সংখ্যা কতো তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতাভ্যন্তরের একটি প্রস্রবণের নাম কাওছার, যার দুই তীর স্বর্ণের। মুক্তাবিছানো জমিনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে তার পানি। ইবনে মাজা, আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি হাদিসটির প্রত্যয়ন করেছেন।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, একবার জননী আয়েশার নিকটে 'ইন্না আ'ত্বইনা কাল্ কাওছার' আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, কাওছার একটি পবিত্র প্রস্রবণ, যা আল্লাহ্ উপহার দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে।

অন্ততপক্ষে পঞ্চাশজন সাহাবী থেকে হাউজে কাওছার সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বহজরত খলিফা চতুষ্টয়, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইমাম হাসান, হামযা, আয়েশা সিদ্দিকা, উম্মে সালমা, আবু হোরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, জাবের এবং আরো অনেকে রেদ্বওয়ানুল্লহি তায়ালা আ'লাইহিম আজ্মাঈন। সুয়ূতী তাঁর 'বুদুরে সফিরা' গ্রন্থে মান্যবর সাহাবীগণ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন প্রায় সত্তরটি।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার' (সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কোরবানী করো)। এখানকার 'ফাসল্লি' (সালাত আদায় করো)। কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নিমিত্তপ্রকাশক। অর্থাৎ যেহেতু আপনার প্রভুপালক আপনাকে হাউজে কাওছার দান করে ধন্য করেছেন, সেহেতু আপনি কেবল তাঁর উদ্দেশ্যে নামাজ পাঠ করুন।

এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যাবতীয় উপায় নিহিত রয়েছে নামাজের মধ্যে— বচনগত, আচরণগত ও অন্তর্গত। মানুষের ভিতর-বাহির উভয়ই সম্মিলিতভাবে হয় যথাকৃতজ্ঞতার প্রতিভূ। কেউ কেউ উপদেশ দিয়েছেন, অতএব নামাজ পাঠ করা উচিত কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, অন্যের উদ্দেশ্যে (খেয়ালে) নয়।

'ওয়ান্‌হার' অর্থ কোরবানী করো। অর্থাৎ কোরবানী করুন উট (কেননা আরব দেশে উটই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্পদ বলে বিবেচিত) এবং উটের গোশত বিলিয়ে দিন পিতৃহীন ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। যারা এতিমদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না, তাদের মতো করবেন না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এই আয়াতখানির বক্তব্যগত যোগাযোগ ঘটবে আগের সুরার ২ ও ৩ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে 'সে তো সে-ই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না'। অর্থাৎ এখানে দেওয়া হয়েছে ওই আয়াত দু'টির বিপরীতার্থক নির্দেশ।

ইকরামা, আতা ও কাতাদা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— ঈদের দিন নামাজ পাঠ করো এবং স্বীয় কোরবানীর পশু জবাই করো। এমতো ব্যাখ্যার পটভূমিকায় ঈদুল আজহার নামাজ ও কোরবানী হয়ে পড়ে ওয়াজিব। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটির অর্থ করেছেন— মুজদালিফায় ফরজ নামাজ আদায় করো এবং কোরবানী করো মিনায় গিয়ে। জনৈক বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— নামাজ পাঠ করো এবং বক্ষদেশে বাম হাতের উপরে বাঁধো ডান হাত। অর্থাৎ নামাজ পড়ো তাহরীমা বেঁধে। এমতাবস্থায় 'আনহার' শব্দটির অর্থ হবে বুকের উপরে হাত বাঁধা। অবশ্য বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল। তাই তাফসীরকারগণ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি।

শেষোক্ত আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! নির্বংশ বলে আপনাকে যারা খোঁটা দেয়, তারাই সুনাম-সুকীর্তির দিক দিয়ে নির্বংশ। যুগ যুগ ধরে তাদের উপরে বর্ষিত হতে থাকবে মনুষ্যজাতি ও ফেরেশতাকুলের অভিসম্পাত।

আস ইবনে ওয়াইলের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পর তার দুই পুত্র হজরত আমর ও হজরত হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আস তো নির্বংশ বা লেজকাটা নয়। এমতো প্রশ্নের জবাব রয়েছে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাটির মধ্যেই। ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো তার কুফরীর বংশপ্রবাহ। তাঁর মুসলমান সন্তানদ্বয় তাই বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন কাফের পিতার উত্তরাধিকারজাত সম্পদ থেকে। কেননা মুসলমান কখনো কাফেরের ওয়ারিশ হয় না। এটাই ইসলামের বিধান। বরং বলা যেতে পারে, ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দু'জন হয়ে গিয়েছিলেন রসুল স. এর রূহানী সন্তান এবং তাঁর জান্নাতবাসিনী পত্নীগণ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের রূহানী জননী।

এখানকার 'হুয়া' (তারা) সর্বনামটি সীমিতার্থক। অর্থাৎ আপনার প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, তারাই নির্বংশ, আপনি নন। কিয়ামত পর্যন্ত কলেমা, আজান, ইকামত ও বহুবিধ বিষয়ে আপনার নামোচ্চারণ হতে থাকবে আল্লাহ্র নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। পরকালেও বিঘোষিত হতে থাকবে আপনার নামের মহিমা। বিশ্বাসী-পুরুষ-নারী এবং ফেরেশতাদের মুখেও আলোচিত হতে থাকবে আপনার প্রসঙ্গ। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! শেষ রসুল মোহাম্মদের বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী উম্মতকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা কাফিরূন

৬ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার কুরায়েশেরা রসুল স.কে আহ্বান জানালো এবং বললো, মোহাম্মদ! শোনো, আমরা তোমাকে এতো ধন-সম্পদ দিবো, যাতে করে তুমি হয়ে যেতে পারো মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদপতি। আর যে রমণীকে তুমি বিয়ে করতে চাও, তার সঙ্গেই আমরা তোমাকে দিবো পরিণয়বদ্ধ করে। বিনিময়ে আমরা শুধু চাই, তুমি আমাদের দেব-দেবীদের দুর্নাম করবে না। অথবা— এক বৎসর তুমি আমাদের দেব-দেবীদের উপাসনা যদি করো, তবে পরের বছর আমরা উপাসনা করবো তোমার আল্লাহ্র। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ থাকবে না। রসুল স. বললেন, দেখি! আমার পরম প্রভুপালয়িতা এ সম্পর্কে কী নির্দেশ দান করেন। ওয়াহাবের বক্তব্যানুসরণে আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কুরায়েশরা বলেছিলো, তোমার ও আমাদের মধ্যে মীমাংসা হোক এভাবে— এক বছর তুমি আমাদের মাবুদ গুলোর ইবাদত করো, আর এক বছর তোমার আল্লাহ্র ইবাদত করবো আমরা। এভাবেই বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে আমাদের উভয়ের ধর্মমত।

সাঈদের বর্ণনা থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, একবার ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়াইল, আসওয়াদ ইবনে আবুল মুত্তালিব এবং উমাইয়া ইবনে খালফ রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব রাখলো, মোহাম্মদ! এসো আমরা এক সঙ্গেই সব করি। পূজা করি আমাদের দেব-দেবীদের এবং তোমার আল্লাহ্র। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়—

সূরা কাফিরূন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۗ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۚ

r বল, 'হে কাফিররা!

r 'আমি তাহার 'ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর

r এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ যাঁহার ইবাদত আমি করি,

r 'এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার, যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ।

r 'এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ, যাঁহার ইবাদত আমি করি।

r 'তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূণ'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলুন, হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! এভাবে এখানে সম্বোধন করতে বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা রসুল স. এর কাছে উত্থাপন করেছিলো সত্য-মিথ্যার মিশ্রণের প্রস্তাব। আল্লাহ্‌পাক জানতেন, তারা চিরসত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই তিনি রসুল স. কে এখানে সম্বোধন করতে বলেছেন এভাবে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা করো'(২)। একথার অর্থ— তোমরা ইবাদত করো অলীক দেব-দেবীদের। ওরকম অযথার্থ ইবাদত তো আমি করি না। করবোও না কোনো কালে। এখানে বক্তব্যটির শুরুতে ব্যবহার করা হয়েছে নেতিবাচক 'লা'। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝানো হয়েছে যে, অংশীবাদিতা ও বিশ্বাসের মিশ্রণ চিরনিষিদ্ধ। বায়যাবী লিখেছেন, শুধু 'লা' (না) ভবিষ্যতকালার্থক। অর্থাৎ এখন যা হচ্ছে না, তা ভবিষ্যতেও হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি (৩) এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো' (৪)। এই বক্তব্যটিও ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক। অর্থাৎ আমি যে এক-এককক-অবিভাজ্য সত্তার ইবাদত করি, তাঁর ইবাদত তোমরা যেমন এখন করো না, তেমনি করবে না ভবিষ্যতেও।

'মান' শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিবেকসম্পন্নদের ক্ষেত্রে এবং বিবেকহীনদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'মা'। কিন্তু এখানে বিবেকবানদের ক্ষেত্রে 'মা' ব্যবহৃত হয়েছে কেবল শাব্দিক সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে। অর্থাৎ এখানে 'মা' আনা হয়েছে আগের আয়াতের 'মা' এর সঙ্গে সমতা রক্ষার্থে। এভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে কেবল পারস্পরিক উপাস্যের গুণাগুণের প্রতি। বিবেকবান-বিবেকহীনের প্রসঙ্গটিকে সামনে আনা

হয়নি। ‘মা’ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি যেমন কোনোদিন তোমাদের কাল্পনিক দেব-দেবীদের পূজা করবো না, তেমনি তোমরাও কোনোদিন আরাধনা করবে না মহাসৃষ্টির মহাপ্রভুপালয়িতার।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি’। বাক্যটি আগের বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি। অধিকাংশ ভাষাবিদ বলেন, কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু এর প্রকাশভঙ্গি হবে আরবী ভাষার রীতি অনুসারেই। সম্বোধনরীতিও হবে তেমনই। আর আরবীতে বার বার একই কথা বলা হয় বক্তব্যের গুরুত্ব প্রকাশার্থে। যেমন বাক্যসংকোচনের উদ্দেশ্য থাকে বক্তব্যসংক্ষেপণ। এখানেও সেরকমই করা হয়েছে। কুরতুবী বলেছেন, এখানে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদের বক্তব্যগত সম্মিলন ঘটার ফলে বাক্যগুলিও হয়ে পড়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক। কেননা বক্তব্যটি এসেছে কাফের কুরায়েশদের একটি নির্দিষ্ট অপপ্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে। তারা বলেছিলো, একবছর আমরা হবো বহুত্ববাদী, আর এক বছর একত্ববাদী। কিন্তু এরকম হওয়া যে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, সে কথাটিও এখানে বার বার উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকমও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বাক্যের প্রথম ‘মা’ যোজক এবং পরের ‘মা’ ধাতুমূলক। অর্থাৎ উপাস্যের একিভূতী এবং ইবাদতের একিভূতীর অবাস্তবতা বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য।

শেষোক্ত আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার’। এই আয়াতের দু’টি বাক্যই বিজ্ঞপ্তিমূলক। কিন্তু এমতো ভাবনার কোনো অবকাশ নেই যে, বক্তব্যটির (তোমাদের দ্বীন তোমাদের) দ্বারা এখানে কাফেরদের কুফরীর ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, অথবা মুসলমানদেরকে জেহাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং বলা যেতে পারে, এই আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে পূর্ববর্তী বক্তব্যের গুরুত্ব ও পরিণতিকে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা জেহাদের আয়াতকে রহিত করা হয়েছে, এরকম ভাবা যেতেই পারে না। কুফরী যেহেতু কল্যাণকর নয়, সেহেতু এরকম চিন্তাও অসমীচীন যে, সমঝোতার মাধ্যমে এখানে ইমানদার ও কাফেরদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে স্ব স্ব অবস্থানে থাকতে। তাই তো আমরা দেখতে পাই, এর পরেও রসুল স. বার বার কাফের কুরায়েশদেরকে ইমান ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা তাঁকে এবং তাঁর প্রিয় সহচরবর্গকে দিয়েছে নানা প্রকারের যাতনা। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম হওয়াই সমীচীন যে— তোমরা প্রতিফল লাভ করবে তোমাদের কৃতকর্মের এবং আমি লাভ করবো আমার কৃতকর্মের প্রতিফল।

ইতোপূর্বে সুরা যিলযালের তাফসীরের একস্থানে হজরত আনাস ও হজরত ইবনে আব্বাসের এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যের দিক দিয়ে সুরা কাফিরূন সমগ্র কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। জননী আয়েশা বর্ণনা

করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কতোই না উত্তম হতো, যদি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজে পাঠ করা হতো সুরা কাফিরূন এবং সুরা ইখলাস। ইবনে হিশাম। ওরওয়া ইবনে নওফেল ইবনে হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমাকে এমন একটি সুরা শিক্ষা দিন, যা আমি পাঠ করতে পারি রাতে শয্যাগ্রহণকালে। তিনি স. বলেছিলেন, সুরা কাফিরূন পাঠ করো। কেননা এতে রয়েছে অংশীবাদিতার প্রতি তীব্র অনীহা।

হজরত যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, তুমি কি চাও, প্রবাসকালে তোমার বাসস্থান হোক সর্বোন্নত এবং পাথেয় হোক সর্বাধিক? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, সর্বদা পাঠ কোরো সুরা কাফিরূন, ইখলাস, নাসর, ফালাক্ব ও নাস— এই পাঁচটি সুরা। আর প্রতিটি সুরা আবৃত্তির শুরু থেকে শেষে পাঠ কোরো বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। হজরত যোবায়ের বলেছেন, আমি ছিলাম বিত্তশালী। কিন্তু প্রবাসে আমি হয়ে যেতাম দুর্দশাকবলিত। পাথেয় হয়ে যেতো নিঃশেষ। কিন্তু যখন থেকে প্রবাসকালে আমি এই পাঁচটি সুরা পাঠ করতে শুরু করলাম, তখন থেকে দুর্দশা আমার নাগাল পেতো না। পাথেয় থাকতো প্রচুর। গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমি প্রাচুর্যের মধ্যেই থাকতাম।

হজরত আলী বলেছেন, একবার রসুল স.কে দংশন করলো একটি বৃশ্চিক। তিনি স. সঙ্গে সঙ্গে লবণ ও পানি আনতে বললেন। আর ক্ষতস্থানে লবণ পানি প্রবাহিত করে দিতে দিতে দম করতে লাগলেন সুরা কাফিরূন, সুরা ফালাক, সুরা নাস পড়ে পড়ে। আল্লাহই সমধিক অবগত।

সূরা নাসর

এই সুরাখানিতে রয়েছে মাত্র ৩টি আয়াত। এর অবতরণ স্থল মহাপুণ্যনিকেতন মক্কা নগরী।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, মুয়াম্মার সূত্রে জুহুরী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের বছর শহরের নিকটে উপস্থিত হয়ে রসুল স. হজরত খালেদের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক সৈন্যকে পাঠালেন মক্কার ভাটি এলাকায়। সেখানে হজরত খালেদের বাহিনীর সঙ্গে কুরায়েশদের একটি দলের সংঘর্ষ উপস্থিত হলো। বিজয়ী হলেন হজরত খালেদ। এরপর রসুল স. এক ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিপক্ষীয়দেরকে অস্ত্রসমর্পণের আদেশ দিলেন। সকলেই দলে দলে অস্ত্র সমর্পণ করতে লাগলো এবং গ্রহণ করতে লাগলো ইসলাম। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো এই সুরাখানি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

r যখন আসিবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়

r এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে

r তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহি ওয়াল্‌ফাতহ্‌'। মক্কাবিজয়ের সময় এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছিলো বলেই এখানকার 'ইজা' (যদি) শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'ইজ'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়। অন্যান্য আয়াতেও 'ইজা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'ইজ' অর্থে। যেমন 'ইজা জ্বাআ আম্‌রুনা ওয়া ফারাত তানূর' (অবশেষে যখন এসে গেলো আমার আদেশ এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ভূপৃষ্ঠ), 'হাত্‌তা ইজা বালিগা' (যখন সে পৌঁছলো)।

'ওয়াল ফাতহ্‌' অর্থ বিজয়। অর্থাৎ মক্কাবিজয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. বলেছিলেন, এটা সেই দিন, আল্লাহ্‌ যে দিনের প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন ' ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহি ওয়াল ফাতহ্‌'।

ঐতিহাসিকেরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হুদায়বিয়া নামক স্থানে রসুল স. কুরায়েশদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তি করলেন, যার শর্তগুলোর মধ্যে ছিলো— এই দশ বৎসর জনগণকে দেওয়া হবে পূর্ণনিরাপত্তা। তারা অবাধে চলাচল করতে পারবে। অন্যান্য গোত্র তাদের ইচ্ছামতো যে কোনো দলে যোগদান করতে পারবে। এই শর্তটির কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্র তাদের ইচ্ছামতো যোগ দিতে লাগলো মুসলমান অথবা কাফের কুরায়েশদের সঙ্গে। মুসলিম দলে যোগ দিলো খাজাআ গোত্র এবং বনী বকর যোগ দিলো কুরায়েশদের সঙ্গে। গোত্রদুটির মধ্যে ছিলো দীর্ঘদিনের প্রলম্বিত বিদ্বেষ। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর বনী বকর চড়াও হলো বনী খাজাআদের উপর। কুরায়েশদের মধ্য থেকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেলো সাফোয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, সুহাইল ইবনে আমর। শায়বা ইবনে ওসমান, হুয়াইতাব ইবনে আবদুল উজ্‌জা এবং তাদের সঙ্গী সাথীরা। প্রচণ্ড লড়াই হলো। দু'পক্ষেই হতাহত হলো অনেক লোক। যুদ্ধশেষে কুরায়েশেরা বুঝতে পারলো, রসুল স.

এর সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করা হয়েছে। এর জন্য তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। আমর ইবনে সালেম খাজায়ী তার গোত্রের চল্লিশ জনকে সঙ্গে নিয়ে সংবাদ জানানোর অভিপ্রায়ে যাত্রা করলো মদীনা অভিমুখে। কিন্তু তারা মদীনায় উপস্থিত হওয়ার আগেই রসুল স. ঘটনাটি জেনে ফেললেন। সাহাবীগণকে বললেন, কুরায়েশরা চুক্তিভঙ্গ করেছে। অবশ্য এটাই ছিলো আল্লাহ্র অভিপ্রায়। জননী আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ রয়েছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। জননী আয়েশা থেকে মোহাম্মদ ইবনে আমর এবং জননী উম্মে সালমা থেকে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

আমর ইবনে সালেম খাজায়ী তার লোকজনকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলো। রসুল স.কে খুলে বললো সকল বৃত্তান্ত। রসুল স. বললেন, এখন তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা আমার কর্তব্য। নতুবা আমরাও তো তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারবো না। ঘটনাটি ঘটেছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বাইশ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর শাবান মাসে। রসুল স. তিনটি শর্ত জানিয়ে তাঁর প্রতিনিধিরূপে মক্কায় পাঠালেন হজরত হামযাকে। শর্ত তিনটি ছিলো— ১. বনী খাজাআর নিহত ১৩ জনের জন্য রক্তপণ দিতে হবে ২. অন্যথায় বনী খাজআকে আক্রমণকারী বনী বকরের মিত্রশক্তি বনী নাফাছাকে করে দিতে হবে চুক্তিবহির্ভূত, যেনো মুসলমানগণ তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে ৩. অথবা রহিত করে দিতে হবে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি। শর্ত তিনটির কথা জেনে কুরায়েশরা মহা বিপদে পড়লো। নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্কের পর একমত হলো যে, সন্ধিচুক্তি রহিত করে দেওয়াই উত্তম। হজরত হামযা সন্ধিচুক্তি বাতিলের সংবাদ নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

রসুল স. পরামর্শ সভায় বসলেন। হজরত আবু বকর পরামর্শ দিলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! তাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করাই উত্তম। সন্ধিচুক্তিটি পুনর্বহাল করলেই মনে হয় ভালো হয়। কেননা তারা তো আপনারই স্বজাতি। অচিরেই হয়তোবা তারা আপনার অনুগামীও হয়ে যেতে পারে। হজরত ওমর বললেন, যুদ্ধ, কেবল যুদ্ধই হচ্ছে এর একমাত্র সমাধান। হে আল্লাহ্র প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যেও নিকৃষ্ট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তারা আপনাকে 'পাগল' 'যাদুকর' কতো কিছু বলে অপবাদ দেয়। সুতরাং যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। তাদেরকে পরাভূত করতে পারলে সমগ্র আরব আপনার করতলগত হবে। আর অনুগামী যদি হয়, তবে সমগ্র আরব হবে আপনার অনুগত।

রসুল স. হজরত ওমরের অভিমতকেই গ্রহণ করলেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন নীরবে। আরবের বিভিন্ন গোত্র-শাখাগোত্রকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন কুরায়েশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে। ফলে আসলাম, গিফার, মুজাইনা, হরফিয়া, আশজা ও সুলাইম গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে

সমবেত হলো মদীনায়। অন্যান্য গোত্রগুলো সংবাদ পাঠালো, তারা পথে তাদের লোকজন নিয়ে মিলিত হবে। এভাবে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজার, মতান্তরে বারো হাজারে। সম্ভবত মদীনা থেকে যাত্রার প্রাক্কালে সৈন্যসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। পথে অন্যান্যরা যোগ দিলে সে সংখ্যা হয়ে যায় বারো হাজার।

ওদিকে কুরায়েশরা চিন্তিত হয়ে পড়লো। মদীনায় পাঠালো তাদের প্রিয় নেতা আবু সুফিয়ানকে। তিনি মদীনায় এসে সোজাসুজি উপস্থিত হলেন তাঁর কন্যা উম্মতজননী উম্মে হাবীবার গৃহে। রসুল স. এর শয্যায় উপবেশনের উদ্যোগ করতেই জননী উম্মে হাবীবা বিছানা গুটিয়ে নিলেন। বললেন, এটা রসুলুল্লাহ্ স. এর বিছানা। এর উপরে কোনো মুশরিক উপবেশন করতে পারে না। আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি আমার কন্যা হয়ে আমার সঙ্গে এরকম আচরণ করতে পারলে? জননী উম্মে হাবীবা বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার কন্যা, কিন্তু আল্লাহ্ তো দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন পবিত্র ইসলামের ছায়ায়। অথচ আপনি একজন গোত্রপতি হলেও এখনো অংশীবাদী। আপনার তো উচিত এই মুহূর্তে মহাসত্য ইসলামকে গ্রহণ করা।

আবু সুফিয়ান সেখানে আর দাঁড়ালেন না। বাইরে এসে সাক্ষাত করলেন রসুল স. এর সঙ্গে। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন অনেক কথা। রসুল স. তার একটিরও জবাব দিলেন না। তিনি তখন সুপারিশকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন হজরত আবু বকরকে। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সরাসরি বলে দিলেন, আপনার জন্য আমি কোনো সুপারিশ করতে পারি না। হজরত ওমর রাগান্বিত হলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, যুদ্ধই সকল সমস্যার সমাধান। আমার কাছে যদি মাত্র একটি ছড়িও থাকে, তবুও তো আমি তাই নিয়ে যুদ্ধ করবো আপনাদের বিরুদ্ধে। আবু সুফিয়ান এবার দেখা করলেন হজরত আলী ও হজরত ফাতেমার সঙ্গে। তাঁরাও তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষে বিফল মনোরথ হয়ে তিনি ফিরে গেলেন মক্কায়। কিছুকাল পরে হজরত ইবনে উম্মে মকতুম, অথবা হজরত আবু জর গিফারীকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে রসুল স. ৮ম হিজরী সনের ১০ই রমজানে সদলবলে যাত্রা করলেন মক্কা অভিমুখে। দোয়া করলেন, হে আমাদের প্রভুপালক! গুপ্তচরের অপপ্রভাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কোরো।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. যোবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে আদেশ করলেন, এক্ষুণি মক্কার দিকে যাত্রা করো। বুস্তানখাখে পৌঁছে এক উষ্ট্রারোহিনীর সাক্ষাত পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে, পত্রটি ছিনিয়ে নিয়ে এসো। আমরা যাত্রা করলাম। বুস্তানখাখে পৌঁছে দেখা পেলাম কথিত উষ্ট্রারোহিনীর। তার গতিরোধ করে বললাম, চিঠিটা দাও। সে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমি বললাম, ভালোয় ভালোয় বের করে দাও। নয়তো তোমাকে বিবস্ত্র করে তল্লাশী করা হবে। সে এবার বিনা বাক্যে বের করে দিলো চিঠিটি। আমরা চিঠি নিয়ে ফিরে এলাম মদীনায়। চিঠিটি লিখেছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতা। ওই চিঠির মাধ্যমে তিনি মক্কায় অবস্থানরত

তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে রসুল স. এর মক্কা অভিযানের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। রসুল স. তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হাতেব! কী ব্যাপার? হাতেব বললেন, আমি মার্জনাপ্রার্থী। তবে হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! এর মধ্যে আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। আমার পরিবার-পরিজন রয়েছে মক্কায়। আমার কিছুসংখ্যক মুহাজির ভাইদের স্বজন-পরিজনও রয়েছে সেখানে। চিঠির মাধ্যমে আমি কেবল তাদের নিরাপত্তা কামনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই সংবাদ পাওয়ার কারণে তারা হয়তো কুরায়েশদের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বিজয় তো হবে আপনারই। রসুল স. বললেন, হাতেব সত্য কথাই বলেছে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তার আচরণ তো মুনাফিকদের মতো। অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রসুল স. বললেন, রসনা সংযত করো। তুমি কি জানো না হাতেব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন গাজী। ওই যুদ্ধবিজয়ীদের সম্পর্কে কি আল্লাহ্ এই বলে শুভসমাচার দান করেননি যে 'তোমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। এখন তোমরা যা খুশী তাই করতে পারো'। হজরত ওমর অনুতপ্ত হলেন। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে বরণ কোরো না'।

রসুল স. রোজাদার ছিলেন। রোজা রেখেছিলেন সাহাবীগণও। সকলে ইফতার করলেন কাদীর নামক স্থানে পৌঁছে।

রসুল স.এর প্রিয় পিতৃব্য হজরত আব্বাস ছিলেন হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বে। তিনি ওই সময় বেরিয়ে পড়েছিলেন মক্কা থেকে। উদ্দেশ্য ছিলো হিজরত। সৌভাগ্যবশত তিনি রসুল স. এর সাক্ষাত পেলেন জুহফা নামক স্থানে। তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ এবং তাঁর পুত্র জাফর ইবনে আবু সুফিয়ান রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন আবওয়ায়। তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবু সুফিয়ান এবং আতেকার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়া আবওয়া নামক স্থানে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি স. তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ওদের কোনো প্রয়োজন আমার নেই। ওরা আমার সম্পর্কে অনেক অবান্তর কথা বলেছে। আমার মর্যাদাহানি করেছে। তাঁরা শরণ গ্রহণ করলেন উম্মতজননী উম্মে সালমার। জননী তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করলেন। রসুল স. আর তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

কাদীরে পৌঁছেই যুদ্ধের পতাকা উড্ডীন করবার আদেশ দিলেন রসুল স.। পতাকা ভাগ করে দিলেন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে। তাঁর ব্যক্তিগত দলের পতাকাবাহী হলেন হজরত যোবায়ের। এরপর যাত্রা শুরু করলেন। ইশার নামাজের সময় পৌঁছে গেলেন মাররুজ জাহরান নামক স্থানে। তখন পর্যন্ত কুরায়েশরা রসুল স. এর অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। ওই রাতেই আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হাযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মক্কা থেকে বের হলো। রসুল স. তাঁর সেনাবাহিনীকে

বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করার আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হলো। এক সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো প্রায় দশ হাজার স্থানে। হজরত আব্বাস আপন মনে বলে উঠলেন, এই রাত্রিশেষের ভোর হবে কুরায়েশদের জন্য অত্যন্ত অশুভ। আল্লাহ্‌র শপথ! আজ যদি মোহাম্মদ মহাপ্রতাপের সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করে, তবে কুরায়েশদের দাপট নিভে যাবে চিরতরে। এরপর তিনি একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন এই উদ্দেশ্যে যে, যদি মক্কার দিকে গমনকারী কোনো জ্বালানী সংগ্রহকারী, দুগ্ধ বিতরণকারী, অথবা অন্য কোনো পথিকের মাধ্যমে কুরায়েশদেরকে এই সংবাদটি পৌঁছে দেওয়া যায় যে, বাঁচতে যদি চাও, তবে আল্লাহ্‌র রসুলের নিকট উপস্থিত হয়ে নিরাপত্তাপ্রার্থী হও। কিছুদূর অগ্রসর হতেই তিনি আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আজ রাতের মতো আলোর মেলা আমি জীবনে দেখিনি। হজরত আব্বাস তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, শোনো আবু সুফিয়ান! মোহাম্মদ তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছেন। তাঁকে প্রতিহত করা অসম্ভব। আবু সুফিয়ান বললেন, তাহলে উপায়? হজরত আব্বাস বললেন, তুমি যদি ধরা পড়ো, তবে নিশ্চয় তোমার মস্তক ছেদন করা হবে। তার চেয়ে আমার বাহনে উঠে পড়ো। আমি তোমাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেই। তুমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা করো। আবু সুফিয়ান তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। রসুল স. এর কাছে পৌঁছার আগেই তাঁরা ধরে পড়ে গেলেন হজরত ওমরের চোখে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আরে, আরে, এতো দেখছি আল্লাহ্‌র দুশমন। বিনা চেষ্টায় এসে গ্যাছে আমাদের দখলে। একথা বলেই তিনি আবু সুফিয়ানকে আঘাত করার জন্য ছুটে এলেন। তার আগেই হজরত আব্বাস তাঁকে নিয়ে দ্রুত উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তাঁর কথা শুনে বললেন, আজ রাতের জন্য আপনি তাঁকে আপনার সঙ্গেই রাখুন।

সকাল হলো। হজরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। রসুল স. বললেন, হে কুরায়েশ গোত্রপতি! এখনো কি লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্ কলেমায় বিশ্বাসী হবার সময় আসেনি? আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পিতামাতা আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হোক। আপনি সহিষ্ণু, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ধারণা, দ্বিতীয় কোনো আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যদি থাকতো, তবে তুমিই হতে সেই আল্লাহ্। রসুল স. বললেন, আমি যে আল্লাহ্‌র রসুল, এ বিষয়ে তোমার হৃদয়ে এখনো কি প্রতীতি জন্মেনি? আবু সুফিয়ান বললো, না। এখনো আমার মনে রয়ে গেছে কিছুটা খটকা। হজরত আব্বাস বললেন, আরে অবুঝ! ইসলাম গ্রহণ করো। মস্তক ছেদিত হওয়ার আগেই বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্। আবু সুফিয়ান আর কথা বাড়ালেন না। পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করলেন উদাত্ত কণ্ঠে। হজরত বুদাইল ও হাকীম তো ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এর আগেই।

তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আবু সুফিয়ান ওই পিলু গাছের আড়ালেই আছে। তাকে বন্দী করে আনো। ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদেরকে বন্দী করেছিলেন রসুল স. এর দেহরক্ষীগণ। আর সেদিন তাঁর দেহরক্ষীগণের প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন হজরত ওমর। তাঁর বর্ণনায় আরো এসেছে, আবু সুফিয়ান তখন বলেছিলেন, আব্বাস কোথায়? আর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, আবু সুফিয়ানকে যখন রসুল স. এর কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তখন তাঁর সাথে হজরত আব্বাসও ছিলেন। রসুল স. তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, ওই ব্যক্তিদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো, যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে কাবাপ্রাঙ্গণে, আবু সুফিয়ানের গৃহে, অথবা নিজ নিজ বাড়িতে। আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছে ঘোষণা করেছিলেন, হে কুরায়েশ জনতা! আজ মোহাম্মদ এমন একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আগমন করেছেন, যার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার সাধ্য তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা তাঁর ঘোষিত নিরাপত্তা গ্রহণ করো। আশ্রয় নাও কাবাপ্রাঙ্গণে, আমার বাড়িতে, অথবা নিজ নিজ ঘরে। লোকজন সেরকমই করলো।

হাকীম ইবনে হাযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা রসুল স. এর পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন। রসুল স. তাঁদেরকে আহবায়করূপে প্রেরণ করলেন কুরায়েশদের কাছে। তাঁরা মক্কায় উপনীত হলেন। এরপর তিনি স. মুহাজির ও আনসার বাহিনীর সৈনাপত্যের দায়িত্ব দিলেন হজরত যোবায়েরকে। নির্দেশ দিলেন, মক্কার উজানে হাজ্জন নামক স্থানে পৌঁছে পতাকা উত্তোলন কোরো। পুনরাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে স্থানত্যাগ কোরো না। তিনি পতাকা হাতে অগ্রসর হলেন। ওই হাজ্জন এলাকা দিয়েই রসুল স. মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে তাঁর জন্য নির্মাণ করা হয়েছিলো তাঁবু। তিনি স. তখন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তুমি বনী খাজাআ ও বনী সুলাইমকে নিয়ে প্রবেশ কোরো মক্কার ভাটি এলাকা দিয়ে। কুরায়েশ এবং আবদে মানাফের বংশদ্ভূতরা ইতোপূর্বে বনী বকরকে ভাটি অঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সেজন্যই রসুল স. হজরত খালেদকে ভাটির দিক থেকে অগ্রাভিযান শুরু করতে বলেছিলেন। আরো বলেছিলেন, যদি তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ লড়তে না আসে, তবে তোমরাও লড়াই কোরো না।

রসুল স. তখন হজরত সা'দ ইবনে উবাদার হাতেও নিশান তুলে দিয়েছিলেন। তিনি স. কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন কাদার পথ দিয়ে। প্রবেশ কালে জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আজ লড়াইয়ের দিন। আজ নিষিদ্ধতা বৈধ (আজ রক্তপাতের নিষিদ্ধতা স্থগিত)। জনৈক মুহাজির একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শুনুন, সা'দ কী বলছে? সে তো কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে এরকম বলতে পারে না। রসুল স. তখন হজরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঠিক আছে। পতাকা উত্তোলন করো তুমি। অগ্রসর হও কাদার পথ দিয়ে। হজরত আলী তাই করলেন। তারপর তাঁর পতাকা উড্ডীন করলেন কাবাপ্রাঙ্গণের রুকনে ইয়েমেনে।

আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত যোবায়ের বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে। আর তিনি স. মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন দু'টি ঝাণ্ডা নিয়ে। আলী আমার আগে মক্কার চড়াই অঞ্চলে পৌঁছুতে পারেননি। আর নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রবেশকালে খালেদ সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার। কুরায়েশ ও অন্যান্য অংশীবাদী গোত্রের লোকেরা তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তিনিও তাদের উপরে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন বীর বিক্রমে। ওই সংঘর্ষে নিহত হয় কুরায়েশদের চব্বিশ জন এবং হুজাইল গোত্রের চার জন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ওই সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলো বারো অথবা তেরো জন। এর পরেই অংশীবাদীরা পরাভব স্বীকার করে। কেউ কেউ পালিয়ে যায়। তখন মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন জুহাইনা গোত্রের হজরত সালমা ইবনে খাইলা, হজরত ইবনে জাবের ফেহরী এবং হজরত হারীশ ইবনে খালেদ। অবশ্য রসুল স. তাঁর সকল সেনানায়ককে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মক্কায় প্রবেশকালে কাউকে হত্যা করা যাবে না। তবে কেউ আক্রমণ করলে কেবল তাকে হত্যা করা যাবে। আবার তিনি স. নির্দিষ্ট করে কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ওদেরকে কোনোক্রমে রেহাই দেওয়া যাবে না, তারা যদি কাবাগৃহের গেলাফের নিচেও আশ্রয় নেয়, তবুও। তাদের নাম— ১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সাররাহ্। সে মুসলমান হওয়ার পরে ধর্মত্যাগ করেছিলো। মক্কাবিজয়ের দিবসে হজরত ওসমানের সুপারিশে তাকে রেহাই দেওয়া হয়। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ২. ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ৩. হুয়াইরিছ ইবনে নকীদ। হিজরতের পূর্বে সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছিলো। তাকে হত্যা করেছিলেন হজরত আলী। ৪. হাকীম ইবনে সাবাবা। সে মুসলমানও হয়েছিলো। জি-কারার যুদ্ধে জনৈক আনসারী ভুলক্রমে শত্রুসেনা মনে করে হত্যা করেছিলেন তার ভাইকে। ওই মান্যবর আনসারী থেকে সে রক্তপণ আদায় করেছিলো। তারপর সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে তাঁকেই আবার হত্যা করে সে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তাকে হত্যা করে তার নিজের সম্প্রদায়ের গাইলা ইবনে আবদুল্লাহ্। ৫. হুব্বার ইবনে আসওয়াদ, খুবই নিষ্ঠুর চরিত্রের লোক ছিলো সে। মুসলমানদেরকে সে অত্যাচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলতো। রসুল স. এর প্রিয় পুত্রী হজরত জয়নাবকে সে এমন আঘাত করেছিলো যে, এতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। ওই আঘাতজনিত রোগেই তিনি পরলোকগমন করেন। মক্কারবিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুল স. তাঁকে মার্জনা করেন। ৬. হারেছ ইবনে তিল্লাল খাজায়ী। তাকে হত্যা করেছিলেন হজরত আলী। ৭. কবি কা'ব ইবনে জুহাইর। সে রসুল স.কে অপবাদ দিয়ে কবিতা রচনা করতো। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসুল স. এর প্রশংসায় রচনা করেন অনবদ্য কবিতা। ৮. ওয়াহশী ইবনে হারব। তিনি ছিলেন রসুল স. এর প্রিয় খুল্লতাত শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার হত্যাকারী। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি তায়েফে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তায়েফ থেকে ফিরে

আসেন এবং আশ্রয় গ্রহণ করেন ইসলামের চিরনিরাপত্তা ও শান্তির ছায়ায়। ৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযাল। প্রথমে তার নাম ছিলো আবদুল উজ্জা। ইসলাম গ্রহণের পর রসুল স. তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। একবার রসুল স. তাকে জাকাত সংগ্রাহকরূপে এক স্থানে পাঠালেন। সহযোগীরূপে সঙ্গে দিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ খাজায়ীকে। তিনি ছিলেন পাচক। পথিমধ্যে উভয়ে এক সরাইখানায় যাত্রাবিরতি করলেন। একদিন দুপুর বেলা জাকাতসংগ্রাহক আবদুল্লাহ্ পাচক হজরত আবদুল্লাহ্কে বললো একটা কিছু জবাই করে তার গোশত রান্না করো। কিন্তু পাচক হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ পালনে আলস্য করলেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে সে তাঁকে হত্যা করলো। আর পালিয়ে গেলো ধর্মত্যাগী হয়ে। তার সঙ্গে থাকতো দু'জন নৃত্যগীতপটিয়সী ক্রীতদাসী। তারা তাদের গানের মাধ্যমে রসুল স. এর কুৎসা রটনা করতো। মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. মুরতাদ আবদুল্লাহ্ এবং ওই ক্রীতদাসীদ্বয়কে হত্যার নির্দেশ দেন। হজরত সাঈদ ইবনে হারেছ মাখজুমী ও হজরত আবু বারযাহ্ আসলামী ওই মুরতাদ ও তার একজন ক্রীতদাসীকে হত্যা করতে সমর্থ হন। অপর ক্রীতদাসী যায় পালিয়ে। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। ১০. আমর ইবনে হাশেমের মুক্তকৃতা ক্রীতদাসী সারা। সে ছিলো মক্কার প্রসিদ্ধ গায়িকা। তার কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছিলো হজরত হাতেব ইবনে আবী বালতার চিঠি। মক্কাবিজয়ের পর সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। ১১. হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। সে উহুদ যুদ্ধে চর্বণ করেছিলো রসুল স. এর প্রিয় পিতৃব্য শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার কলিজা। রসুল স. তাঁকে মার্জনা করেছিলেন। ১২. সাফওয়ান ইবনে উমায়ইয়া। মক্কাবিজয়ের দিন সে জেদ্দায় পালিয়ে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো, সে হয়তো সেখান থেকে কোনো জাহাজযোগে ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করতে সক্ষম হবে। রসুল স. তাকে নিরাপত্তা দেন হজরত উমাইর ইবনে ওয়াহাবের সুপারিশে। তাই সে জেদ্দা থেকে ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে চিন্তাভাবনার জন্য অবকাশ প্রার্থনা করে দুই মাসের। রসুল স. তাকে চার মাসের অবকাশ দেন। পরে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

ইমাম আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় প্রবেশ করেন পাগড়ীপরিহিত অবস্থায়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তখন তাঁর পবিত্র মস্তকে শোভা পাচ্ছিলো শিরোস্ত্রাণ। পরে পাগড়ী। প্রবেশকালে তিনি স. বার বার আবৃত্তি করেন সুরা নাসর।

পরিশেষে রসুল স. হাজ্জন নামক স্থানে তাঁর জন্য নির্মিত তাঁবুতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই মহাপুণ্যবতী সহধর্মিণী— হজরত উম্মে সালমা ও হজরত মায়মুনা। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে মহাবিজয়ী! আপনি কি আপনার পৈত্রিক নিবাসে উঠবেন না? তিনি স. বললেন, আকীল কি সে সুযোগ রেখেছে? কোথায় গিয়ে উঠবো? উল্লেখ্য, আকীল রসুল স. এর পিতৃপুরুষদের বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়েছিলো। জনৈক সাহাবী বললেন, হে মহাবাণীবাহক! সেখানে

তো অনেকেরই বাড়িঘর রয়েছে। আপনি তো যে কোনো বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারেন। তিনি স. বললেন, না। আমি কারো বাড়িতেই উঠবো না। তাই হলো। রসুল স. তাঁর তাঁবুতেই অবস্থান করতে লাগলেন। নামাজের সময় সেখান থেকেই তিনি স. উপস্থিত হতেন কাবা গৃহে। প্রথম দিন তিনি স. তাঁর তাঁবুতে কিছুক্ষণ বিশ্রামগ্রহণের পর স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পানি সংগ্রহ করা হলো। তাঁর প্রিয় পুত্রী হজরত ফাতেমা পর্দার ব্যবস্থা করলেন। স্নান সমাপনের পর তিনি স. পাঠ করলেন আট রাকাত চাশতের নামাজ। মুসলিম।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর চাচাতো বোন হজরত উম্মে হানী বলেছেন, তিনি স. সেদিন স্নান করেছিলেন আমার গৃহে এসে। এরপর নামাজ পাঠ করে তিনি স. উটের পিঠে চড়ে গমন করেন কাবাপ্রাঙ্গণে এবং উষ্ট্রারোহী অবস্থাতেই যষ্টি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তাতে চুম্বন দান করেন। উচ্চারণ করেন তকবীরধ্বনি। সাথে সাথে তার প্রতিধ্বনি ওঠে তাঁর সহচরবর্গের কণ্ঠে। তিনি স. সাতবার কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ করেন তাঁর সহচরবৃন্দও। প্রতিবারেই তিনি স. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন তাঁর যষ্টি দ্বারা। কাবাপ্রাঙ্গণে তখন প্রতিষ্ঠিত ছিলো ক্ষুদ্র-বৃহৎ তিন শত ষাটটি প্রতিমা। তিনি সেগুলোকে আঘাত করেন যষ্টি দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাগুলো হয়ে পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন এবং ভূতলশায়ী। তাঁর পবিত্র কণ্ঠে তখন বার বার উচ্চারিত হতে থাকে 'জ্বাআল হাক্বক্বু ওয়া যাহাক্বাল বাতিল' (সত্য সমাগত, মিথ্যা তিরোহিত)। রসুল স. এর যষ্টির আঘাত ছাড়াই তখন অনেক প্রতিমা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। ফুজালা ইবনে ওমর লাইছি মনে মনে ইচ্ছা করে, তাওয়াফরত অবস্থাতেই সে রসুল স.কে হত্যা করবে। ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে পৌঁছে গেলো তাঁর কাছে। তিনি স. ডাকলেন, ফুজালা! সে জবাব দিলো, এই যে আমি। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মন কী বলছে? সে বললো, তেমন কিছু না। আমি তো আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করছি। তার কথায় রসুল স. মৃদু হাসলেন। বললেন, লজ্জিত হও। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তিনি স. ফুজালাকে আরো কাছে ডেকে এনে তাঁর পবিত্র হস্ত স্থাপন করলেন তাঁর বক্ষদেশে। পরে হজরত ফুজালা নিজেই বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর পবিত্র হস্ত আমার উপর থেকে উঠিয়ে নেওয়ার আগেই আমি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করলাম, এখন তিনি স.ই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম জন। অংশীবাদীরা পর্বত শিখর থেকে এসবকিছুই চাক্ষুষ করেছিলো।

তাওয়াফ পর্ব সমাপ্ত হলো। চতুষ্পার্শ্বে তখনও প্রচণ্ড ভীড়। রসুল স. তাঁর উট থেকে অবতরণ করলেন। উটটিকে কোথাও বসানোর স্থান পাওয়া গেলো না। তাই সেটিকে রেখে আসা হলো কাবা চত্বরের সীমানার বাইরে। রসুল স. মাকামে ইব্রাহিমে উপস্থিত হলেন। তখন তার মাথায় ছিলো উষ্ণীষ। তিনি স. সেখানে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। গেলেন জমজম কূপের পাশে। কূপের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে বললেন, যদি আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠীর জন্য এটা গর্বের বিষয় না হতো, তবে আমি আজ নিজ হাতে এক ডোল পানি উত্তোলন করতাম। এক ডোল

পানি উত্তোলন করলেন হজরত আব্বাস, অথবা হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রসুল স. পান করলেন পবিত্র জমজমের জল। বাদবাকীটুকু দিয়ে সামাধা করলেন ওজু। ওজুর ব্যবহৃত জলাহরণের জন্য সাহাবীগণের মধ্যে লেগে গেলো ঠেলাঠেলি, প্রতিযোগিতা। যারা সে জলের অংশ পেলেন, তারা তা সঙ্গে সঙ্গে মেখে নিলেন নিজেদের মাথায়, চোখে-মুখে-শরীরে। কুরায়েশেরা এমতো অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলো। বলতে লাগলো, আমরা কোনো রাজাকেও এরকম সম্মান পেতে দেখিনি। শুনিওনি। হোবল ছিলো পৌত্তলিকদের সর্ববৃহৎ প্রতিমা। প্রতিমাটি ছিলো কাবাগৃহের সামনের দিকে প্রধান ফটকের কাছে। রসুল স. এর নির্দেশে সেটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হলো।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কাবাগৃহের ছাদে উঠলেন। আমাকেও বললেন, ওঠো। উঠলাম। ছাদের উপরে ছিলো আর একটি বড় প্রতিমা। আমি সেটিকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিচে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো প্রতিমাটি। রসুল স. উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলন 'সত্য সমাগত, অসত্য তিরোহিত। অসত্যের তিরোহিতি তো অবধারিত'।

এরপর রসুল স. কাবাগৃহের চাবি সংগ্রহের জন্য হজরত বেলালকে পাঠিয়ে দিলেন চাবিরক্ষক ওসমানের কাছে। ওসমান বললো, চাবি তো আমার মায়ের কাছে। একথা বলেই সে তার মায়ের কাছে চাবি চাইলো। তার মা বললো, লাত ও উজ্‌জার শপথ! আমি কাবার চাবি তোমার হাতে কখনোই দিবো না। সে বললো, মা! চাবিটা দিয়ে দাও। আজ লাত উজ্‌জা কেউ নেই। চাবি না দিলে আমার গর্দান তো যাবেই, আমার এই ভাইয়ের গর্দানও আস্ত থাকবে না। ওদিকে তাঁদের ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রসুল স. সেখানে পাঠিয়ে দিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওমর ফারুককে। তাঁরা ওসমানের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকলেন। তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনে তার মা বললো, ওসমান! এই নাও চাবি। ওদের হাতে চাবি দেওয়ার চেয়ে তোমার হাতে দেওয়াই ভালো। এভাবে চাবি উদ্ধার হলো এবং তা যথাসময়ে হস্তগত হলো রসুল স. এর। তিনি স. ওই চাবি দিয়ে কাবাগৃহের বন্ধ তালা খুললেন। ওসমান ও তালহা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ অধিকার তো ছিলো আমাদেরই। তিনি স. তাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

এরপর রসুল স. হজরত ওমরকে আদেশ করলেন, কাবাগৃহের ভিতর থেকে সমস্ত বিগ্রহ ও চিত্র অপসারিত করো। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। শুরু হলো ধোয়া-মোছার কাজ। এভাবে একসময় আল্লাহ্‌র ঘর ও তৎসন্নিহিত প্রাঙ্গণ থেকে চিরতরে অপসারিত হলো বিগ্রহ-ধর্ম-সংস্কৃতির অপবিত্র চিহ্নাবলী। রসুল স. হজরত জায়েদ এবং হজরত তালহাকে নিয়ে কাবাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করলেন। মধ্যখানে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন দুই রাকাত নামাজ। বললেন, এটাই কেবলা। তারপর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বললেন, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে

পরিণত করেছেন। তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের উপর। শোনো হে জনতা! আজ থেকে মূর্খতার যুগের সকল অপপ্রথা অবলোপিত হলো। পরিত্যক্ত হলো প্রতিশোধমূলক রক্তের অধিকার। আর সুদ ইত্যাদি পাওনা-দেনাকেও আজ আমি পদদলিত করলাম। সর্বপ্রথম আমি নিজে রবীয়া ইবনে হারেছের রক্তের দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম। তবে কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও হজযাত্রীদের পানি সরবরাহের দায়িত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না। যারা এতোদিন ধরে এ দায়িত্ব পালন করতো, তারাই থাকবে তাদের স্ব স্ব দায়িত্বে।

আরো শোনো, লাঠি-সোটার আঘাতে নিহত, অথবা ভুলক্রমে, কিংবা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যার রক্তপণ একশত উট। তার মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবর্তী। অংশীদারকে লক্ষ্য করে ওছিয়ত করা যাবে না। নবজাতক হবে তার, যার শয্যায় সে জন্মগ্রহণ করেছে। ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যু পর্যন্ত প্রস্তরাঘাত। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তার সম্পদ অন্যকে দিতে পারবে না। অমুসলিমদের বিপক্ষে সকল মুসলমান একটি বাহুর মতো। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিপক্ষে কোনো বিশ্বাসী অথবা আশ্রিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে (জিম্মিকে) হত্যা করা যাবে না। বিপরীত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অংশীদারিত্ব অচল। জাকাত-সংগ্রাহকরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে জাকাত সংগ্রহ করবে। জাকাতদাতাদেরকে জাকাত-দপ্তরে ডেকে আনা যাবে না। তারাও জাকাত-সংগ্রাহকদেরকে উত্যক্ত করতে পারবে না। কোনো রমণীর মা বা খালাকে বিবাহ করার পর আর তাকে বিবাহ করা যাবে না।

সাক্ষী উপস্থিত করা দাবিদারদের দায়িত্ব। সাক্ষী উপস্থিত না করতে পারলে শপথ করতে হবে। শপথ কার্যকর করা হবে দাবি অস্বীকারকারীর উপর। বিবাহ সিদ্ধ— এমন কোনো পুরুষের সঙ্গে রমণীরা ভ্রমণে বের হতে পারবে না। ফজর ও আসরের নামাজ সমাপন করার পর আর কোনো নফল নামাজ আদায় করা যাবে না। দু'দিন রোজা রাখা নিষেধ— ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন। নিষেধ মাত্র একটি লুঙ্গি, অথবা মাত্র একটি জামা পরিধানের। কেননা এতে করে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। তেমনি নিষেধ একটি চাদর অথবা একটি কম্বল এমনভাবে পরিধান করাতে, যাতে দুই বাহু হয়ে যায় আবদ্ধ, যাতে প্রয়োজনের সময়েও হাত বের করা যায় না।

হে কুরায়েশ জনগোষ্ঠী! আল্লাহ্ দয়া করে মূর্খতার যুগের অহমিকা ও জাত্যাভিমান থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। মনে রেখো, তোমরা সকলে এক আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। সুতরাং তোমাদের গর্ব করার কিছু নেই। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'হে মানবজাতি! আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে.....' শেষ পর্যন্ত।

এবার বলো, হে মক্কাবাসী! তোমরা আমার কাছ থেকে কীরূপ আচরণ আশা করো? জনতা জবাব দিলো, আপনি সজ্জন, সাধু, আপনার পিতা-পিতামহও ছিলেন এরকমই। সুতরাং আপনার কাছ থেকে আমরা সেরকমই শিষ্টাচার আশা

করি। তিনি স. বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি তো দয়ার পারাবার। যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত। সভা শেষ হলো। জনতা গাত্রোত্থান করলো। তাদেরকে দেখে মনে হলো, যেনো তারা এই মাত্র উঠে এসেছে কবর থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, অজ্ঞতার যুগে বনী লাইছের জনৈক ব্যক্তি হত্যা করেছিলো বনী খাজাআর জনৈক ব্যক্তিকে। মক্কা বিজয়ের দিবসে সুযোগ পেয়ে বনী খাজাআ তাদের অপ-প্রতিশোধ চরিতার্থ করলো। তারা হত্যা করলো বনী লাইছের এক লোককে। রসুল স. একথা জানতে পেরে তাঁর ভাষণে বললেন, হে জনতা! দ্যাখো, আবরাহাবাহিনীকে আল্লাহ্ এ শহরে প্রবেশই করতে দেননি। অথচ তিনি তাঁর রসুল ও তাঁর অনুগামীগণকে মক্কাবাসীদের উপরে বিজয়ী করেছেন। ভালো করে শুনে রাখো, আমার পূর্বে জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। এরকম অধিকার আমার পরেও কেউ পাবে না। আমার পূর্বে এখানে রক্তপাত ঘটানো কারো জন্য বৈধ ছিলো না। এরপরেও বৈধ হবে না কারো জন্য। আর আমার জন্যও এ কাজ বৈধ ছিলো কেবল আজকের দিনের কিয়দংশের জন্য। এরপর থেকে চিরদিনের মতো এখানে রক্তপাত হারাম। এখানকার বৃক্ষ, লতা-গুল্ম কিছুই কর্তন করা যাবে না। কারো পরিত্যক্ত সম্পদ জোরপূর্বক অধিকার করলেও নয়। আরো শোনো, নরহত্যার বিনিময় রক্তপণ, অথবা হত্যা। আবু শাহ নামক জনৈক ইয়েমেনী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল। একথাটা আমাকে লিখে দিন। রসুল স. জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন বিধানটি লিখে দিতে। একজন কুরায়েশী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! বৃক্ষ-লতা-গুল্ম কর্তনের বিধান থেকে ইজখের ঘাসকে বাদ দিলে ভালো হয়। এটা আমাদের সাংসারিক প্রাত্যহিক কর্ম সমাধার জন্য অত্যাবশ্যক। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, ইজখের ঘাস থেকে কর্তনের নিষিদ্ধতা উঠিয়ে নেওয়া হলো।

এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক তখন দাঁড়িয়ে বললো, হে মহানবী! আমি এক রমণীকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছিলাম। তার কয়েকটি সন্তানও আছে। এখন তার প্রতি আমার কর্তব্য কী? তিনি স. বললেন, বিবাহ ব্যতিরেকে কোনো রমণীকে রক্ষিতা রাখা যাবে না। এরকম রমণীর সন্তান-সন্ততি হবে অবৈধ। বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকারিত্ব থেকে তারা হবে বঞ্চিত। আমার ধারণা, তোমরা আমার কথা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। আমি আল্লাহ্ সকাশে আমার ও তোমাদের জন্য মার্জনা যাচনা করি। রসুল স. ক্ষান্ত হলেন। এরপর তাঁর নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করলেন, কোনো মুসলমানের গৃহে প্রতিমা থাকতে পারবে না। যদি থাকে তবে সেগুলোকে ভেঙেচুরে নিক্ষেপ করতে হবে দূরে।

জোহরের নামাজের সময় হলো। হজরত বেলাল নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে কাবাগৃহের ছাদে উঠে আজান দিলেন। কাবাপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট আবু সুফিয়ান, খালেদ ইবনে উসাইয়েদ ও হারেছ ইবনে হিশামের জাত্যাভিমান বিপর্যস্ত হলো। তাদের মনে

হলো, কালো মানুষের কাবাগৃহের ছাদে ওঠার অধিকার থাকবে কেনো? খালেদ ইবনে উসাইয়েদ বলেই ফেললো, আল্লাহ্ আমার পিতার সম্মান রক্ষা করেছেন। এরকম অসহনীয় দৃশ্য দর্শনের পূর্বে তাঁকে তুলে নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। কেউ কেউ বললো, এখন বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ নেই। হজরত আবু সুফিয়ান বললেন, আমি কোনো মন্তব্যই করবো না। বললেন এখানকার পাথরগুলোই একথা রাষ্ট্র করে দিবে। হজরত জিবরাইল তাদের এমতো কথোপকথনের সংবাদ ঠিকই জানিয়ে দিলেন রসুল স.কে। রসুল স. তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা যা কিছু বললে, তা আমাকে জানানো হয়েছে। তোমরা তো বললে এই কথাগুলো। ঠিক বলিনি? আবু সুফিয়ান তার সাথীদেরকে বললেন, কী, আমি কি বলিনি, এখানকার পাথরগুলোও আমাদের কথা প্রচার করে দিবে? খালেদ ও হারেছ বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র রসুল।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর দৃষ্টিহীন পিতাকে হাত ধরে রসুল স. এর কাছে হাজির করলেন। রসুল স. বললেন, আবু বকর। তিনি তো বয়োবৃদ্ধ। তাঁকে এভাবে কষ্ট দিলে কেনো? আমি তো নিজেই তাঁর কাছে যেতে পারতাম। রসুল স. সস্নেহে তাঁর বুকে পিঠে হাত বুলালেন। তিনিও অনায়াসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর মস্তক ও শ্মশ্রুর কেশরাজি হয়ে গিয়েছিলো ছাগামফুলের মতো শাদা। রসুল স. সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, কালো রঙ ছাড়া অন্য যে কোনো রঙ দ্বারা রঙ পরিবর্তন করে দিয়ো।

রসুল স. উপবেশন করলেন একটি উঁচু স্থানে। অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে বসলেন হজরত ওমর। দলে দলে লোক এসে রসুল স. এবং হজরত ওমরের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। পুরুষদের পালা শেষ হলো। এগিয়ে এলো মেয়েরা। তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হলো তাদের হস্তস্পর্শ না করেই, কেবল মুখে মুখে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। কাবাগৃহের দিকে চেয়ে ভাবের আবেগে আপ্লুত হলেন। হাত তুলে শুরু করলেন অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। পর্বতের সানুদেশে দণ্ডায়মান আনসার সাহাবীগণ সেই অপূর্ব মায়াভরা দৃশ্য দেখে এই ভেবে শংকিত হলেন যে, রসুল স. এর জন্মভূমির আকর্ষণ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এটাই তো স্বাভাবিক। তিনি মনে হয় আমাদের সঙ্গে আর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবেন না। প্রার্থনা শেষ হলো। রসুল স. নিচে নেমে এসে মিলিত হলেন আনসারগণের সঙ্গে। সম্বোধন করলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, হে মহানবী! এই যে আমরা। তিনি স. বললেন, তোমরা তো এসকল কথা ভেবে শংকিত হয়েছিলে, না? তাঁরা স্বীকার করলেন, হে মহান রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি স. বললেন, নিশ্চয় তোমাদের আশংকা ভিত্তিহীন। আমি তো আল্লাহ্র সন্তোষ কামনায় তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তোমাদের ও আমার জীবন মরণ সব একাকার। আনসারগণ কেঁদে ফেললেন।

বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম জন! আপনার প্রতি আমাদের উদগ্র ভালোবাসাই আমাদেরকে শংকাগ্রস্ত ও বিমর্ষ করে তুলেছিলো। আমরা আমাদের অপভাবনার জন্য মার্জনাপ্রার্থী। তিনি স. তাঁদের অজুহাত গ্রহণ করলেন।

মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. তিন ব্যক্তির নিকট থেকে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করে তা বণ্টন করে দিয়েছিলেন অস্বচ্ছল সাহাবীগণের মধ্যে। সাফওয়ান ইবনে উয়াইনার নিকট থেকে নিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রবীয়ার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার এবং হুয়াইতাব ইবনে আবদুল উজ্‌জার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার। এ সকল ঋণ তিনি পরিশোধ করেছিলেন হুনায়েন যুদ্ধের পর। রসুল স. সেদিন বলেছিলেন, আজকের দিনের পর মক্কার উপরে আর কোনো অভিযান পরিচালিত হবে না। হিজরতের প্রয়োজনও আজ থেকে শেষ হয়ে গেলো।

আবু ইয়ালা ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর শয়তান উচ্চস্বরে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। তার সাঙ্গপাঙ্গরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলে, আর কখনো আশা কোরো না যে, উম্মতে মোহাম্মদী শিরিকের দিকে ফিরে আসবে। মাকহুল সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ইবলিস তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো বিরাট বিরাট অগ্নিকুণ্ড। হজরত জিবরাইল তৎক্ষণাৎ রসুল স.কে একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন। দোয়াটি এরকম 'আউ'জু বিকালিমাতিললাহিত্‌ তামমাতিল লাতী লা ইউজ্বাউইবু হুন্‌না বাররুউঁ ওয়ালা ফাজ্বির মিন শররি মা নাযালা মিনাস সাজা ওয়ামা ইয়া'রুজু ফীহা ওয়ামিন শাররি মা বাছ্‌ছা ফীল আরদ্ব ওয়ামা ইয়াখরুজু মিনহা ওয়া মিন শাররিল লাইলি ওয়ান নাহার ওয়া মিন শাররি কুললি ত্বরিক ইয়াত্বরুকু বি খইর ইয়া রহমান'। ইবনে আবী বাযযার সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন দেখা গেলো, বিদখুটে কদাকার এক হাবশী বৃদ্ধা তার নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে এবং চীৎকার করে কাঁদছে। রসুল স.কে যখন তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি স. বললেন, সে ছিলো পৌত্তলিক কুরায়েশদের আরাধ্য দেবী। সে বলছে, তোমাদের শহরে আজ থেকে আমার উপাসনা হয়ে গেলো চিররুদ্ধ।

সেদিন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, তোমাদের নিকটে রক্ষিত গচ্ছিত সম্পদ তার প্রাপককে ফিরিয়ে দাও'। রসুল স. তখন ওসমান ইবনে আবী তালহাকে ডেকে এনে তার হাতেই পুনঃ অর্পণ করলেন কাবা গৃহের চাবি। বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ চাবি রক্ষিত হতে থাকবে তোমার বংশধরের মধ্যেই। জালেম ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের কাছ থেকে এ চাবি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। চাবিবহনের এ মহান দায়িত্বের জন্য আল্লাহ্‌ তোমাদেরকেই মনোনীত করেছেন। এই উপলক্ষে যা কিছু তোমাদের হস্তগত হবে, তা তোমাদের জন্য বৈধ। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত জিবরাইল তখন বলেছিলেন, যতোদিন পর্যন্ত এ গৃহ স্থায়ী থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত এ গৃহের

তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালন করবে ওসমান ও তাঁর বংশধরেরা। উল্লেখ্য, হজরত ওসমান পরলোক গমনের প্রাক্কালে কাবাগৃহের চাবি হস্তান্তর করেন তাঁর ভাই হজরত শায়বার হাতে। তাঁর বংশধরেরাই এ পর্যন্ত চাবি বহন করে আসছেন। বহন করবেন মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় অবস্থান করেছিলেন ঊনিশ দিন। ওই সময় তিনি নামাজ আদায় করতেন কসর হিসেবে। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. তখন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন সতেরো রাত এবং বোখারীর অপর বর্ণনায় এবং তিরমিজির বিবরণে বলা হয়েছে, তিনি স. তখন মক্কায় যাপন করেছিলেন আঠারো রাত। এমতো বর্ণনাবৈষম্য নিরসনার্থে বলা যায়, আগমন ও প্রস্থানের দিন বিয়োগ করলে সতেরো রাতই হয়, আর যোগ করলে হয় ঊনিশ দিন। আর প্রহর হিসেবে গণনা করলে হয় আঠারো।

মক্কাবিজয়ের পর সমগ্র আরব স্তম্ভিত হয়ে গেলো। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, যে আল্লাহ্ আবরাহার হস্তিযুথকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, সেই আল্লাহ্ই মোহাম্মদকে দান করলেন মহাবিজয়। এখন তোমরাই বলো, তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর আছে কি? সত্যি সত্যিই তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসুল। এরকম কথাবার্তা ও সিদ্ধান্ত চলতে লাগলো বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রগুলোর মধ্যে। শেষে সকলে একে একে দ্বিধাহীন চিত্তে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলো ইসলামের চির-সুশীতল ছায়ায়। এই সুরার দ্বিতীয় আয়াতে সে কথাটিই বলে দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে 'এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে'। ইকরামা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'মানুষ' অর্থ ইয়েমেনবাসী। রসুল স. একবার বলেছিলেন, ইয়েমেনবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। এরা অতীব বিনম্র এবং ইমান গ্রহণের ক্ষেত্রে কোমল হৃদয়বিশিষ্ট। জ্ঞানের উৎপত্তি ইয়েমেন দেশে। শোনো, উটের মালিকের কাছ থেকে প্রকাশ পায় উন্নাসিকতা ও আত্মম্ভরিতা এবং ছাগলের মালিকের নিকট থেকে প্রকাশ পায় সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচার।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কোরো এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো, তিনি তো তওবা কবুলকারী'।

এখানে 'ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিক' অর্থ তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কোরো। কথাটি প্রথম আয়াতের 'যখন' (ইজা) শর্তের পরিণতি। আর এখানকার 'বিহামদি' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি তখন পাঠ করুন 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী'। অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে যে অচিন্তনীয় মহাবিজয় দান করে আপনাকে অনুগৃহীত করলেন, তার জন্য আপনি বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা।

হজরত আনাস বলেছেন, মহানবী স. যখন মহাবিজয়ীর বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন, তখন জনতা তাঁর অতুলনীয় মর্যাদা ও সম্ভ্রম দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলো। আর তিনি স. এ দৃশ্য দেখে মনে মনে আল্লাহ্কে জানাচ্ছিলেন অসংখ্য কৃতজ্ঞতা, যা প্রকাশ পাচ্ছিলো তাঁর বাহ্যিক অবয়বেও। তিনি স. তাঁর মস্তক মোবারক করে রেখেছিলেন নিম্নমুখী। মনে হচ্ছিলো তা বুঝি স্পর্শ করে আছে উটের গদি। অত্যুত্তম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সবিনয় অবনমিত মস্তক তখন স্পর্শ করেছিলো তাঁর উটের আসনের মধ্যবর্তী স্থান। আর যখন লোকেরা দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো, তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, হে আমার পরমতম আরাধ্য! পারলৌকিক জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন।

'ওয়াস্তাগফিরহু' অর্থ এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কোরো। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার উম্মতের প্রতি অতিমমতাময়তার কারণে কখনো কখনো অত্যুৎকৃষ্ট আমল ছেড়ে গ্রহণ করেছিলেন কেবল উৎকৃষ্ট আমলকে, আপনার অতুলনীয় মর্যাদার পক্ষে যা ছিলো কিঞ্চিত অনুত্তম। সে কারণে আপনি আজ আমা সকাশে মার্জনাপ্রার্থনা করুন। অথবা— আপনি ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আপনার উম্মতের জন্য। কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই তো হবে গোনাহ্গার। উল্লেখ্য, এমতো নির্দেশনার কারণেই রসুল স. প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে একশতবার ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা। এরূপ হাদিস হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাস এবং হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিবরানী ও আবু ইয়ালা।

লক্ষণীয়, এখানে ক্ষমাপ্রার্থনা করার আগে উল্লেখ করা হয়েছে প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার কথা। বিষয়টি বিসদৃশ মোটেও নয়। কেননা এটাই হচ্ছে অবরোহণের (নুজুলের) প্রকৃত পদ্ধতি। আর এমতো পদ্ধতি কার্যকর করতে গেলে কিছু না কিছু ভুল হতেই পারে। তাই সব শেষে বলা হয়েছে ক্ষমা প্রার্থনার কথা। উল্লেখ্য, এভাবে এখানে রসুল স.কে লক্ষ্য করে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মূলত তাঁর উম্মতকেই। তবে উম্মতের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, প্রার্থনার পূর্বে পাঠ করে নিতে হবে দরূদ শরীফ।

'ইন্নাহু কানা তাও্ওয়াবা' অর্থ তিনি তো তওবা কবুলকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ক্ষমাপ্রার্থীদের প্রার্থনা গ্রহণকারী তখন থেকে, যখন থেকে তিনি তাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন আমানত বহনের ভার। ছায়লাবী লিখেছেন, রসুল স. এর কণ্ঠে একবার এই আয়াতের পাঠ শুনে হজরত ইবনে আব্বাস কেঁদে ফেললেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদলে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, এই সুরায় তো রয়েছে আপনার মহাতিরোধানের সংবাদ। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো।

বায়যাবী লিখেছেন, এই সুরায় বলা হয়েছে ইসলামের আহ্বানের পরিপূর্ণতার কথা। সে কারণেই বলা হয়, এখানে রয়েছে রসুল স. এর অন্তিমযাত্রার সংবাদ। অন্য এক আয়াতে বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম....'। আর এখানকার 'ক্ষমাপ্রার্থনা করো' কথাটির মধ্যে সুস্পষ্টরূপে একথাটি ফুটে উঠেছে যে, তাঁর মহা অভিযাত্রা সন্নিকটবর্তী।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মান্যবর ওমর আমাকে মহান বদরযোদ্ধাগণের অন্তর্ভূত বলে মনে করতেন। একবার এক সাধু পুরুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি একে বদর যোদ্ধাগণের মধ্যে গণনা করেন কেনো? এতো আমাদের সন্তানদের বয়সী। ওমর জবাব দিলেন, আপনারা যাদেরকে ভালো বলে জানেন, এতো তাদেরই দলের। তিনি আরো বলেছেন, একবার খলিফা ওমর বদর যোদ্ধাদেরকে নিমন্ত্রণ দিলেন। তার সঙ্গে নিমন্ত্রণ জানালেন আমাকেও। সর্বসমক্ষে আমার পরিচয় তুলে ধরাই ছিলো তাঁর এমতো নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য। পানাহারপর্ব শেষে তিনি নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বলুন তো দেখি, সুরা নাসর সম্পর্কে আপনারা কে কী জানেন? একজন বললেন, যেহেতু আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন, সেহেতু আমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার। আর একজন বললেন, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্যেরা রইলেন নীরব। শেষে মান্যবর খলিফা আমাকে বললেন, এবার তুমি কী জানো, বলো। আমি বললাম, সুরাখানি রসুল স. এর মহাতিরোভাবের ইঙ্গিতবাহী, আল্লাহ্ এখানে তাঁর রসুলকে জানাচ্ছেন— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমার সাহায্য সমাগত। মক্কাবিজয়ও সুসম্পন্ন। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন, তাঁর সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আপনার প্রিয় উম্মতের জন্য, যিনি পরম ক্ষমাপরবশ ও ক্ষমাপ্রার্থীদের প্রার্থনা গ্রহণকারী। আর আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন পরকালযাত্রার। সে পরমলগ্ন যে অত্যাসন্ন। খলিফা মহোদয় আমার কথা শুনে বললেন, বৎস! তুমি যা জানো, আমিও তা-ই জানি।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন সুরা 'ইজা জ্বাআ' অবতীর্ণ হলা, তখন রসুল স. আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, আমাকে এবার অন্তিমযাত্রার সংবাদ দেওয়া হলো।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, সুরা 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহ্' সমগ্র কোরআনের এক চতুর্থাংশ। জননী আয়েশা থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. তাঁর রুকু ও সেজদায় পাঠ করতেন 'সুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লহুম্মাগ্ফির'। তাঁর নিকট থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অত্যধিক পরিমাণে পাঠ করতেন 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লহা ওয়া আতূবু ইলাইহি'। রসুল স. বলেছেন, আমার পরম প্রভুপালয়িতা আমাকে বললেন, অচিরেই আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে দেখতে পাবেন একটি নিদর্শন। তখন পাঠ করবেন 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লহা ওয়া আতূবু

ইলাইহি'। আমি সে নিদর্শন প্রদর্শন করেছি। আর তা হচ্ছে 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহি...... ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা'। হাসান বসরী বলেছেন, যখন রসুল স. এর অন্তিমযাত্রার সময় হলো, তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে জানালেন, আপনার শেষ বিদায়ের সময় অতীব সন্নিকটবর্তী। সুতরাং আপনি অধিক হারে বর্ণনা করতে থাকুন আমার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা। অভিমুখী হন কেবল আমার, যেনো আপনার পৃথিবীর জীবনের সমাপ্তি ঘটে অত্যুত্তম পুণ্যসম্ভার সহযোগে। নিশ্চয় আমি আমার প্রতি অভিমুখীদেরকে গ্রহণ করি পরম সমাদরে। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীর আলো-ছায়ায় বাস করেছিলেন আর মাত্র দুইটি বছর।

সূরা লাহাব

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যের আলয় মক্কায়। এতে আয়াত রয়েছে ৫টি।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন অবতীর্ণ হলো 'আর আপনি আপনার নিকটজনদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন' তখন তিনি স. তাঁর আত্মীয় স্বজনদেরকে সমবেত করলেন। যথারীতি তাঁদেরকে ভয় প্রদর্শন করলেন আল্লাহ্র। বোখারী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. একদিন আরোহণ করলেন সাফা পর্বতের চূড়ায়। শংকাজড়িত কণ্ঠে উচ্চস্বরে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের নাম ধরে ডাকলেন। কুরায়েশ জনতা জড়ো হলো পর্বতের সানুদেশে। তিনি স. উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, হে জনতা! এখন আমি যদি বলি, পর্বতের অপর প্রান্তে একদল শত্রু সেনা লুকিয়ে আছে। তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে সন্ধ্যায়, অথবা সকালে, তাহলে তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? জনতা সমস্বরে জবাব দিলো, নিশ্চয়। তুমি যে আল আমীন (সত্যবাদী)। তিনি স. বললেন, তাহলে শোনো, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তোমরা সাবধান হও। আবু লাহাব বললো, তুমি ধ্বংস হও। এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকেছো? একথা বলেই সে একটি প্রস্তরখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে রসুল স. এর প্রতি নিক্ষেপোদ্যত হলো। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার প্রথম তিনটি আয়াত।

সূরা লাহাব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۝٤ فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ۝٥

r ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও।
r উহার ধন-সম্পদ ও উহার উপার্জন উহার কোন কাজে আসে নাই।
r অচিরে সে প্রবেশ করিবে লেলিহান অগ্নিতে
r এবং তাহার স্ত্রীও— যে ইন্ধন বহন করে,
r তাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— চিরহতভাগ্য আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক। ধ্বংস নেমে আসুক তার নিজের উপরেও। তার অর্থবিত্ত ও উপার্জন তার কোনো উপকারে আসেনি। আসবেও না। দোজখের লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে তার প্রবেশের ক্ষণ অত্যাসন্ন।

এখানে 'তাব্বাত' অর্থ ধ্বংস হোক। এর ধাতুমূল 'তাবাব' যার অর্থ, এমনই এক গহবর, যা সমূহ বিপদ ডেকে আনে। 'ইয়াদা আবী লাহাব' অর্থ আবু লাহাবের দুই হস্ত। অর্থাৎ আবু লাহাব স্বয়ং। যেমন বলা হয় 'ওয়ালা তুলকু বিআইদী কুম ইলাত তাহলুকাহ্, (তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না)। এখানেও 'আইদী' অর্থ নিজেকে, নিজেদেরকে। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আবু লাহাব রসুল স.কে আঘাত করার জন্য হাতে পাথর তুলে নিয়েছিলো। তাই এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে তার হস্তদ্বয়ের কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হস্তদ্বয় অর্থ ইহজগত ও পরজগত। অর্থাৎ তার ইহকাল-পরকাল— দুই কালই ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত। অথবা এখানে 'হস্তদ্বয়' কথাটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিত্ত ও প্রভুত্বকে।

আবু লাহাবের আসল নাম ছিলো আবদুল উজ্জা (উজ্জা দেবীর দাস) মুকাতিল বলেছেন, সে সুদর্শন চেহারার লোক ছিলো বলেই তাকে বলা হতো আবদুল উজ্জা। পরে তার উপনাম হয় আবু লাহাব। আবদুল উজজা নামটা অতি জঘন্য। তাই এখানে তাকে বলা হয়েছে আবু লাহাব, যার অর্থ ধ্বংসের পিতা, চরম ধ্বংসাত্মক। 'ওয়া তাববা' অর্থ ধ্বংস হোক সে নিজেও। অর্থাৎ সে তো ধ্বংসই হয়ে গিয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, 'তাববাত' শব্দটির মাধ্যমে এখানে তার ধ্বংস কামনা করা হয়েছে এবং 'তাব্বা' এখানে এসেছে তার ধ্বংসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের লক্ষ্যে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আবু লাহাব বিনাশপ্রাপ্ত হোক, বরং সে তো বিনাশ হয়েই গিয়েছে। অর্থাৎ তার বিনাশপ্রাপ্তির বিষয়টি সুনিশ্চিত। একারণেই এখানে ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহার না করে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালবোধক ক্রিয়া।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. যখন তাঁর স্বজনদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন, তখন আবু লাহাব বললো, ভাতিজা! তুমি আমাকে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছো। কিন্তু আমি তো শাস্তির পরোয়াই করি না। প্রয়োজন হলে আমি আমার সন্তান-সন্ততি-ধন-সম্পদ সবকিছুর বিনিময়ে তোমার কথিত শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করবো। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

'মা আগনা আ'নহু মালুহূ ওয়ামা কাসাব' অর্থ তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ তার সঞ্চিত বিপুল বিত্ত-বৈভব ও উপার্জিত সম্পদ তাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অথবা তার পুঞ্জীভূত ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন কি তাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে? পারবে না। 'ওয়ামা কাসাব' অর্থ তার উপার্জন। অথবা— তার সন্তান-সন্ততি। মাতা মহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নিজস্ব উপার্জনজাত আহার্য সর্বোত্তম ও পবিত্রতম। তোমাদের সন্তান-সন্ততিও তোমাদের উপার্জন। বোখারী, তিরমিজি।

উল্লেখ্য, আবু লাহাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র উতবা যখন বাণিজ্যব্যপদেশে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছিলো, তখন তাকে পথিমধ্যে ভক্ষণ করেছিলো একটি নেকড়ে। আর আবু লাহাব মারা গিয়েছিলো বসন্ত রোগে, বদর যুদ্ধের কয়েকদিন পর। কয়েকজন হাবশী ক্রীতদাসের সহায়তায় তাকে বালিচাপা দেওয়া হয়।

'সা ইয়াস্লা নারান জাতা লাহাব' অর্থ অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। 'জাতা লাহাব' অর্থ লেলিহান অগ্নি। অর্থাৎ সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যখন আবু লাহাব দগ্ধীভূত হতে থাকবে দোজখের লেলিহান আগুনে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে (৪) তার গলদেশে পাকানো রজ্জু' (৫)। এখানে 'ওয়াম্রাআতুহু' অর্থ তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলকেও ভোগ করতে হবে একই পরিণতি। উল্লেখ্য, সে ছিলো হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা এবং হজরত আবু সুফিয়ানের ভগ্নি।

'হাম্মালাতাল হাত্বব' অর্থ যে ইন্ধন বহন করে। আরবী ভাষায় পরনিন্দুককে বলা হয় কাষ্ঠ, বা ইন্ধন বহনকারিণী। অর্থাৎ পর নিন্দাকারিণী। ইবনে ইসহাক হামাদান খান্দানের জনৈক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, রসুল স. এর গমনাগমনের পথে আবু লাহাবের স্ত্রী কাঁটা পুঁতে রাখতো। সেদিকে ইঙ্গিত করেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। জুহাক ও ইকরামা সূত্রে ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন। আতিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে। কিন্তু কাতাদা, মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেছেন, 'হাম্মালাতাল হাত্বব' অর্থ পর নিন্দুক। উম্মে জামিলের স্বভাবই ছিলো পরনিন্দা করে বেড়ানো, একের বিরুদ্ধে অপরের কথা লাগিয়ে ওই দু'জনের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালানো, যেমন কাষ্ঠ খণ্ডের ঘর্ষণে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আগুন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'হাম্মালাতাল হাত্বব' অর্থ পাপের গুরুভার বহনকারিণী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা তাদের পিঠে বহন করে পাপের বোঝা'।

'ফী জ্বীদিহা হাবলুম্ মিম্ মাসাদ্' অর্থ তার গলদেশে পাকানো রজ্জু। 'জ্বীদ' অর্থ গলদেশ, গলা। আর 'মাসাদ' অর্থ লৌহশৃঙ্খল, যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত। ওই লৌহশৃঙ্খল তার গলায় আটকিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে তার পিঠের উপর দিয়ে

কটিদেশ পর্যন্ত। আবার শব্দটির অর্থ পাকানো মজবুত রজ্জুও হয়, খেজুর গাছের ছালের হোক, অথবা পাট জাতীয় অন্য কোনো তন্তুর। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং ওরওয়া ইবনে যোবায়ের। মুজাহিদ সূত্রে আখফাশ বলেছেন, লোহার শিকলকেই 'মাসাদ' বলে। শা'বী এবং মুকাতিল বলেছেন, উম্মে জামিল শক্ত রশি দিয়ে তার লাকড়ির বোঝা বাঁধতো। একদিন সে এভাবে বাঁধা একটি লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে একটি পাথরের উপরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। এমন সময় একজন ফেরেশতা সেখানে উপস্থিত হয়ে তার লাকড়ির বোঝাটি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ফলে তার গলায় ফাঁস লেগে যায় এবং ওই অবস্থাতেই অক্কা পায় সে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, ইয়েমেন অঞ্চলে এক প্রকার গাছ জন্মে, তার নাম 'মাসাদ'। আর তার আঁশ দ্বারা তৈরী রশিকেও বলে 'মাসাদ'। কাতাদা বলেছেন, 'মাসাদ' অর্থ গলার হার। হাসান বসরী বলেছেন, উম্মে জামিলের গলার মোতির মালাকে এখানে বলা হয়েছে 'মাসাদ'। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, রমণীটি সুন্দর একটি কণ্ঠহার ব্যবহার করতো। সেই কণ্ঠহারটিকেই এখানে বলা হয়েছে 'মাসাদ'। সে বলতো, মোহাম্মদের সাথে শত্রুতার পাথেয় হবে আমার এই গলার হার।

'মাসাদ' অর্থ যদি এখানে লোহার শিকল হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানে বলা হয়েছে তার পরকালের অশুভ পরিণতির কথা। আর এর অর্থ যদি হয় সাধারণ রশি, তবে বুঝতে হবে, প্রসঙ্গটি ইহজগতের। লক্ষণীয়, ঘটনাটি এখানে বর্ণিত হয়েছে রূপকভাবে। উম্মে জামিলকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করাই এখানে উদ্দেশ্য। তবে এখানে শা'বী যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন, তার অর্থ বোধগম্য নয়। কেননা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী তখনকার সমাজে পরিচিত ছিলো কুলীন ও রক্ষণশীল রূপে। সুতরাং উম্মে জামিল যে লাকড়ির বোঝা বহন করতো, এরকম কথা কষ্টকল্পনা বৈ কি।

সূরা ইখলাস

৪ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহিমময় পুণ্যতীর্থ 'মক্কায়'।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে আবুল আলিয়া বর্ণনা করেছেন, পৌত্তলিকেরা একবার রসুল স. এর কাছে আল্লাহ্‌র বংশপরিচয় জানতে চায়। তখন অবতীর্ণ হয় এই সুরা। তিরমিজি, হাকেম, ইবনে মাজা। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে তিবরানী এবং ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কা'ব ইবনে আশরাফ, হুয়াই ইবনে আখতাব এবং আরো কয়েকজন ইহুদী রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, যে আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কিছু গুণ বর্ণনা করুন। তখন অবতীর্ণ হয় এই সুরা। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বরাত দিয়ে ইবনে জারীর, কাতাদা এবং ইবনে মুনজিরও

এরকম বলেছেন। জুহাক, কাতাদা ও মুকাতিল সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, একবার কিছুসংখ্যক ইহুদী পণ্ডিত রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, 'আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে কিছু বলুন। হতে পারে, আমরা ইমান গ্রহণ করবো। তওরাত কিতাবে তো আল্লাহ্‌ তাঁর অনেক গুণের উল্লেখ করেছেন। বলুন, তিনি কিসের তৈরী? তিনি কী আহার করেন, না করেন না? কেউ তার অংশীদার কিনা। যদি থাকে, তবে সে কে? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা ইখলাস।

আবান সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, খায়বরের কতিপয় ইহুদী একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আবুল কাসেম! আল্লাহ্‌পাক তাঁর অন্তরালবর্তী জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন ফেরেশতামণ্ডলীকে, আসমানকে সৃষ্টি করেছেন গলিত কর্দম দ্বারা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা ইবলিসকে। তেমনি ধোঁয়া থেকে আকাশ এবং পানির বুদ্বুদ থেকে পৃথিবীকে। এখন বলুন, আপনার পালনকর্তা কিসের তৈরী? রসুল স. নীরব হয়ে রইলেন। তখন সুরা ইখলাস নিয়ে আবির্ভূত হলেন হজরত জিবরাইল। এ সকল বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সুরা ইখলাস অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আবুল আলিয়া বলেছেন, বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপ্রধানেরা একবার রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আমাদের কাছে আপনার প্রভুপালকের বংশপরিচয় প্রকাশ করুন। তাদের এরকম অপবিত্র উক্তির প্রেক্ষিতে হজরত জিবরাইল আনেন এই সুরাখানি। এই বর্ণনাটিও একথা প্রমাণ করে যে, সুরাখানির অবতরণস্থল মদীনা। ইতোপূর্বে হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে যে অংশীবাদীদের কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত তারাই বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপ্রধান। আর এরকমও হতে পারে যে, অংশীবাদী ও ইহুদী উভয় গোত্রের গোত্রপ্রধানেরা তখন একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে রসুল স.কে এরকম অপপ্রশ্ন করেছিলো।

আবু জুবিয়ান ও আবু সালেহ সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আমের ইবনে তোফায়েল ও আব্বাদ ইবনে রবীয়া রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। আমের বললো, মোহাম্মদ! তুমি আমাদেরকে কার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো? তিনি স. জবাব দিলেন, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি। আমের পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্‌ কীভাবে সৃষ্ট হলেন, সে সম্পর্কে কিছু বলো। তিনি সোনার, না রূপার? না কাষ্ঠনির্মিত? তাদের এরকম মন্দ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা ইখলাস। আব্বাদ ভস্মীভূত হয়েছিলো বজ্রাঘাতে এবং আমের ধ্বংস হয়েছিলো মহামারীতে।

সূরা ইখলাস ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ﴿۲﴾ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَ لَمۡ يُوۡلَدۡ ۙ ﴿۳﴾ وَ لَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

r বল, 'তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়,
r 'আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী;
r 'তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই,
r 'এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।'

প্রথমে বলা হয়েছে 'কুল হুয়াল্লহু আহাদ' (বলো, তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়)। এখানকার 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি অভিজাত শ্রেণীর। এখানে 'তিনি' উদ্দেশ্য এবং বিধেয় এর পরের বাক্যটি। অথবা এখানকার 'হুয়া' একটি সাধারণ সর্বনাম; যা সম্পর্কযুক্ত হবে সেই প্রভুপালনকর্তার সঙ্গে, যার সম্পর্কে করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তাদেরকে বলুন, হে অংশীবাদীর দল! তোমরা আমার নিকট যাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছো, জেনে রাখো তিনি এক-একক-অদ্বিতীয়'। এখানকার 'আহাদুন' 'আল্লাহ্র' অনুবর্তী। অথবা বলা যায়, 'আহাদুন' এখানে বিধেয় হয়েছে 'হুয়া' সর্বনাম থেকে। আর এখানকার 'আহাদুন'এর মূলরূপ ছিলো 'ওয়াহাদা'। 'ওয়াহাদা' এবং 'ওয়াহিদ' সমার্থক। হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে 'হুয়াল্লহু আহাদ' স্থলে রয়েছে 'লাওয়াহিদ'। হজরত ওমরের ক্বেরাতেও তা-ই।

যদি 'হুয়া' সর্বনামকে অভিজাত সর্বনাম ধরে নেওয়া হয়, 'আল্লাহ্'কে ধরে নেওয়া হয় উদ্দেশ্য এবং 'আহাদ'কে বিধেয়, তাহলে বাক্যের বিশুদ্ধ মর্মার্থ প্রকাশ্য অর্থে হবে না। কারণ একটি অবিভাজ্য প্রকৃত সত্তার নাম আল্লাহ্। আর যা অবিভাজ্য, তাতে একাধিকতা অসম্ভব। যেমন জায়েদ একজনের নাম, যা একজনকেই বুঝায় এবং নাকচ করে দেয় একাধিকতাকে। আর তা কোনোকিছুর সমষ্টিও নয়। কেননা এখানে বিদ্যমান সামষ্টিকতার একক। এরপর পুনরায় তাকে এক বলা সঙ্গত নয়। তাই 'আল্লাহ্' পদটির দ্বারা এমন এক সাধারণ সত্তাকে মেনে নিতে হয়, যিনি একক উপাস্য হওয়ার প্রকৃত যোগ্য। কারো উপাস্য হওয়ার যোগ্য হতে পারেন কেবল তিনিই, যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে আনেন অস্তিত্বে এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ করে দেন তার স্থিতিলাভের প্রয়োজনসমূহকে। আর যিনি স্বয়ম্ভু, তিনিই অপরকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম। সেই অবিভাজ্য সত্তার গুণাবলীও পূর্ণ ও পরিণত, নশ্বরতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে চিরপবিত্র। সৃষ্টি তাঁর সত্তা ও গুণবত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনিও সৃষ্টির সত্তা ও গুণবত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সৃষ্টির সত্তা ও গুণবত্তার সঙ্গে তাঁর সত্তা ও গুণবত্তার কোনো সংযোগই নেই। যা স্বয়ম্ভু ও স্বাধিষ্ঠ নয়, তা অপরকে অধিষ্ঠিত করতে পারবে কীভাবে? বরং তার নিজের বিদ্যমানতাই তো সেই স্বয়ম্ভু সত্তা ও গুণবত্তার প্রতিবিম্ব, শাখা-প্রশাখা কদাচ নয়। কেননা শাখা-প্রশাখার সংযোগ থাকে মূলের সঙ্গে। কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সত্তার এমতো সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। সুতরাং সৃষ্টি কেবলই প্রতিবিম্ব, যে প্রতিবিম্বে আল্লাহ্ই দয়া করে দান করেছেন অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব। সুতরাং আল্লাহ্ই কেবল আনুরূপ্যবিহীন, এক-একক-অবিভাজ্য-অসমকক্ষ ও অংশীবিহীন— এরকম ব্যাখ্যাই

অধিক ফলপ্রসূ সঙ্গতিপূর্ণ ও সমীচীন। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা আবার অংশীবাদী ও ইহুদীদের প্রশ্নের যথাযথ জবাবও নয়। কেননা তারা প্রশ্ন করেছিলো ভিন্নভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র এককত্বের স্বরূপ জানতে চেয়ে তারা কিছু বলেনি। কারণ রসুল স. তাদেরকে প্রথম থেকেই একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কলেমার প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। সে কলেমা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' (আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্যই নেই)। তাদের প্রশ্ন ছিলো অত্যন্ত অযথার্থ ও স্থূল। তারা বলেছিলো, যিনি তোমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপাদানগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। বলো তিনি কিসের তৈরী— সোনা, রূপা, লোহার, না কাঠের।

যদি এখানকার 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামকে ওই অবিভাজ্য সত্তার স্থলাভিষিক্তও ধরা হয়, যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছিলো প্রশ্নকারীদের প্রশ্নে, তবুও এ বাক্যটি তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে না। অর্থাৎ কথাটি তাদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর নয়। আল্লাহ্র এককত্ব সম্পর্কে তারা তো প্রশ্নই করেনি। বরং নবী প্রেরণকারী ওই সত্তার যৌগিক তত্ত্ব সম্পর্কে তারা প্রশ্ন তুলেছিলো। একারণেই উভয় অবস্থায় আল্লাহ্ হবেন যাবতীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিযোজন, পরিবর্ধন, এক কথায় সকল যৌগিকত্বের যাবতীয় অনিবার্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, পবিত্র। অর্থাৎ তিনি চির অমুখাপেক্ষী আকার-নিরাকার, প্রকার-প্রকৃতি থেকে। তাঁর সাত্তিক তত্ত্ব চির অসমকক্ষ। গুণবত্তার ক্ষেত্রেও কেউ অথবা কোনোকিছু তাঁর তুল্য নয়। অংশীদার তো নয়ই। সুতরাং কেউ অথবা কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি যে অনুরূপ্যবিহীন। একারণেই আল্লাহ্র পরিচয় ধন্য সুফী-আউলিয়াগণ বলেন, আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপে কারো অথবা কোনোকিছুর কোনোই অংশ নেই। তাঁর অবোধ্য সত্তা তাঁরই গুণবত্তার সমাহার, কিন্তু তাঁর ভিত্তি নয়। বরং তিনি তাঁর গুণরাজিরও ভিত্তি। আর তাঁর গুণরাজির মূল হচ্ছে তাঁরই চিরজীবিতা (হায়াত) গুণ (সিফাত)। ওই হায়াত সিফাতের ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অন্যান্য গুণ— জ্ঞান (এলেম) শক্তিমত্তা (কুদরত) অভিপ্রায় (এরাদা) বাণী (কালাম) দর্শন (বাসার) শ্রবণ (সামা) ইত্যাদি। আর হায়াত হচ্ছে তাঁরই সত্তার শাখা বা ভিত্তি। অর্থাৎ তাঁর সত্তা (জাত) যেনো মৌলিক অসমাধ্য একটি বিষয়, যার উৎস হচ্ছে তাঁরই অস্তিত্ব। সেকারণেই সুফি-সাধকগণ বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ অর্থ লা মাওজুদা ইল্লাল্লহ্ (তাঁর বিদ্যমানতা ছাড়া আর কারো বিদ্যমানতাই নেই)। কেননা প্রকৃত বিদ্যমানতা রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। সমগ্র বিশ্বজগত যেনো ওই বিদ্যমানতারই ছায়া-প্রচ্ছায়া। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ই চিরস্থায়ী, মৌলিক মহাসত্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে তারা মিথ্যা'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুই ধ্বংসশীল'। অর্থাৎ সকলকিছুই নশ্বর, অনশ্বর কেবল আল্লাহ্। সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণবত্তার সঙ্গে সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণবত্তার সাদৃশ্য রয়েছে কেবল নামত। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিলিত বা পরস্পর সম্পৃক্ত নয়। যারা এমতো ব্যাখ্যা বুঝতে অক্ষম, তাদের উচিত, তারা যেনো

সুফি-আউলিয়াগণের সাহচর্য-সম্পৃক্ত হয়। তাহলে হয়তো তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হতে পারে তত্ত্বজ্ঞানের দুয়ার। আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন এককত্বই কি তাঁর চিরবিদ্যমানতা ও তাঁর প্রতিপালনযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট নয়? সকল কিছুই যে তাঁর জ্ঞানগোচর। অথচ অজ্ঞ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না যে, তাঁর আনুরূপ্যহীন জ্ঞান ও ক্ষমতা সকল কিছুকেই আনুরূপ্যবিহীন ভাবে সতত পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আর এই আয়াতটি তাঁর পরিপূর্ণ সত্তা ও গুণবত্তার প্রতি ইঙ্গিতবহ।

'কুল' অর্থ বলো। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন। 'কুল হুয়াল্লহু আহাদ' অর্থ তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। এই বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে নবী-রসুলগণ কর্তৃক প্রচারিত বাণীর সারমর্ম। আর এই বাণীটি এমন এক জ্ঞানগর্ভ ও মহান বাণী যে, বিশাল বিশাল গ্রন্থের বক্তব্যাবলী যেনো এর কাছে কিছুই নয়। আর এই মহান বাণীর জটিল জটিলতর ব্যাখ্যার আবশ্যকও কিন্তু নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র অবোধ্য সত্তা ও গুণবত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা অবশেষে অন্তর্ভূত হয় যুক্তিবিদ্যাতেই। যারা প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত, তাদের কাছে বরং এরকম জটিল আলোচনা ধ্বংসাত্মক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদেরকে বলুন, রূহ হচ্ছে আমার প্রভুপালকের পক্ষে থেকে একটি আদেশ'। রূহও আল্লাহ্র সৃষ্টি। সেই রূহের রহস্যোদ্ধারই যখন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, তখন রূহের স্রষ্টার সত্তাগুণবত্তার রহস্যোদ্ধারকর্মও নিশ্চয় সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। বরং বুঝতে হবে, এ প্রসঙ্গে যে ব্যক্তি তার অক্ষমতার পরিচয় পায়, সে-ই আসলে জ্ঞানী। আর এ জ্ঞান লাভ হতে পারে কেবল তাদের, যারা পায় তাঁর ব্যবধানরহিত আনুরূপ্যহীন সামীপ্য ও সান্নিধ্য। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা নিয়তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রসুল স. সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের কথা শুনলেন। দেখলাম, তিনি রোষতপ্ত। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ। মনে হচ্ছিলো, তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ঘষে দেওয়া হয়েছে আনারের লাল দানা। বললেন, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য কি তোমরা আদেশপ্রাপ্ত? এজন্যই কি তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে আমাকে? এ সম্পর্কে তর্কাতর্কি করতে গিয়েই তো তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সাবধান! এ প্রসঙ্গে আর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ো না। তিরমিজি, ইবনে মাজা, শোয়ায়েব থেকে আমর ইবনে শোয়ায়েব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আল্লহুস্ সমাদ' (আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'সমাদ' অর্থ নির্ভীক, বেপরোয়া। হজরত বুরাইদা এবং ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন। আমার ধারণা, সম্ভবত বর্ণনাটি সুপরিণত সূত্রজাত। আর কথাটি রূপকার্থক। কেননা তিনি জ্ঞানাতীত, বোধ্য গুণাতীত, ধারণা-কল্পনার অতীত।

শা’বী বলেছেন, তিনিই ‘সমাদ’ যিনি পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে পরবর্তী বাক্যে। এরকম বলেছেন হজরত উবাই ইবনে কা’ব থেকে আবুল আলিয়া। আবু ওয়াইল শাকিক ইবনে সালমা বলেছেন ‘সমাদ’ অর্থ সর্বদিক দিয়ে যার কর্তৃত্ব শিখরস্পর্শী। আবু তালহা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির এরূপই মর্মার্থ করেছেন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যিনি যাবতীয় গুণে ও কর্মে পরিপূর্ণ, তিনিই ‘সমাদ’। কেউ কেউ বলেছেন, প্রতিটি কর্মের যিনি মূল উদ্দেশ্য, প্রতিটি প্রয়োজন যার উপরে নির্ভরশীল, তিনিই ‘সমাদ’। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ‘সমাদ’ ওই অধিপতি, যাঁর কাছে রয়েছে সকলের চাওয়া ও পাওয়া। তাই মানুষ প্রয়োজনে তাঁর কাছেই হাত পাতে এবং সাহায্য চায়। সুতরাং তিনিই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন আরবী প্রবাদে বলা হয় ‘সমাদতুহু’ (আমি তাকেই উদ্দেশ্য করেছি)।

কাতাদা বলেছেন, সৃষ্টি লয় হওয়ার পর যিনি অবশিষ্ট থাকবেন, তিনিই সমাদ। হজরত আলী বলেছেন, তিনিই সমাদ, যার উপরে আর কেউ নেই। এরকম বর্ণনা করেছেন ইকরামা। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, তিনিই সমাদ, বিপদ যাকে স্পর্শ করতে পারে না। মুকাতিল বলেছেন, সমাদ অর্থ নির্দোষ।

আমার মতে সমাদ এর প্রকৃত অর্থ লক্ষ্যস্থল। ‘কামুস’ অভিধানে লেখা রয়েছে, সমাদ অর্থ ইচ্ছাময়। যবরযুক্ত ‘মীম’ দ্বারা গঠিত ‘সমাদ’ অর্থ অধিপতি। কেননা তাঁর দাসগণের প্রতিটি কর্মের লক্ষ্যস্থল তিনিই। আর এখানকার ‘আস্‌সমাদ’ পদের ‘আলিফ লাম’ তাই প্রমাণ করে যে, তিনি অমুখাপেক্ষিতার চরম শিখরে আরূঢ়। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি-বিবেক দুর্দশায়িত। প্রকৃত বিশ্বাস থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে। পার্থিবতাকেই তারা বানিয়ে নিয়েছে তাদের লক্ষ্যস্থল। কিন্তু সৃষ্ট কোনোকিছু লক্ষ্যস্থল হওয়ার অযোগ্য। লক্ষ্যযোগ্য কেবল তিনিই।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাসমূহের কোনোটাই শব্দটির প্রকৃত অর্থ নয়। বরং ওগুলো আনুসাঙ্গিক। কেননা সামগ্রিকরূপে লক্ষ্যস্থল কেবল তিনিই, যিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সন্দেহাতীতরূপে সকল উৎকর্ষ ও পূর্ণত্ব কেবল তাঁর মধ্যেই বর্তমান। সর্বপ্রকার আধিপত্য তাঁরই কর্তৃত্বাগত। আর তিনি চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র সকল ধরনের দোষক্রটি, ক্ষতি-বিনষ্টি ও পানাহার থেকে। তিনি অনাদি। তাঁর স্বামী-ভার্যা-পিতা-সন্তান-বংশধর হওয়া অচিন্তনীয়। কেউই তাঁর সমান্তরাল, সমকক্ষ বা অংশীদার নয়। তিনি আনুরূপ্যবিহীন এক একক-আবিভাজ্য এমন এক সত্তা, যা জ্ঞান-ধারণা-কল্পনার অতীত।

উল্লেখ্য, ‘আল্লহু আহাদ’ বলার পর ‘আল্লহুস্ সমাদ’ বলার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তবু এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, তাঁর সম্পর্কে তথাকথিত বিভিন্ন মতের লোক বিভিন্ন কথা বলে, যার কোনোটাই তাঁর আনুরূপ্যবিহীন একক সত্তার উপযুক্ত নয়। যেমন কেউ বলে, তিনি এক নন। কেউ বলে, তিনি কারো জনক,

অথবা জাত, অথবা কারো বংশসম্ভূত। এ সকল অপউক্তির মূলোৎপাটনার্থেই প্রথমে বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। পরে করা হয়েছে সে সংক্ষিপ্তির বিস্তারণ। আর সে কারণেই 'আল্লহুস্ সমাদ' এর পরের বাক্যগুলো উপস্থাপনা করা হয়েছে যোজক অব্যয় ব্যতিরেকেই। 'আল্লহু আহাদ' বলার পর 'আল্লহুস্ সমাদ' বলার আর একটি উদ্দেশ্য একথা জানিয়ে দেওয়া যে, যে সত্তা সকলকিছু থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী নন, তিনি ইবাদতেরও যোগ্য নন। আর যিনি অমুখাপেক্ষী, তিনিই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যস্থল ও একমাত্র উপাস্য। তাঁর এমতো অমুখাপেক্ষিতা দর্শনেই তো মানুষকে বিনয়াবনতচিত্তে মেনে নিতে হয় তার একান্ত আনুগত্য। সুফী-সাধকগণ তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ জিকির করার সময় বিলোপ করতে থাকেন তিনি ব্যতীত অন্য সকলকিছুকে। এটাই তাঁদের মূল সাধনা। বিষয়টি অতীব জটিল। এমতো জাটিল্যের অবসান ঘটাতে পারেন কেবল আল্লাহ্।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ' (তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি)।

মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। ইহুদীরা বলতো, আল্লাহ্ নবী উযায়েরের জনক। আর খৃষ্টানেরা বলতো, আল্লাহ্ হচ্ছেন নবী ঈসার পিতা। এ সকল অপবিত্র উক্তির মূলোৎপাটনার্থেই এখানে বলা হয়েছে 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি'। এমতো কর্ম তাঁর জন্য অসম্ভব। কেননা তিনি কারো সমগোত্রীয় নন, নন সমকক্ষ, সমজাতীয় বা সমান্তরাল। পিতা-পুত্র-স্বামী-ভার্যা-বংশধর তো হয় সমজাতীয়রা। আর তিনি কোনো বিষয়েই অপারগ নন যে, তাঁকে পুত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আর ক্ষয়-বিলয় হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় যে, প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে পুত্রকে।

'তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি' অর্থ তাঁর কোনো জনক হওয়াও অসম্ভব। কেননা এ ক্ষেত্রেও সমগোত্রীয়তা ও অমুখাপেক্ষিতা হচ্ছে অনপনেয় বাধা। তাছাড়া জাত সকল কিছুই নশ্বর। কিন্তু তিনি তো অনশ্বর। আর নশ্বরতা তো উপাস্য হওয়ারও অন্তরায়। এখন কথা হচ্ছে, এখানে অতীতকালবোধক ক্রিয়া ব্যবহার করা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপউক্তিগুলো ছিলো অতীতকালবোধক। তাই অতীতকালবোধক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে এখানে প্রশ্নোত্তরের সঙ্গতি রক্ষার্থে। অথবা বলা যায়, অতীতকালজ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে পরের বাক্যে। তাই এভাবে এখানে রক্ষা করা হয়েছে ক্রিয়ার কালগত সাযুজ্য।

শেষোক্ত বাক্যে বলা হয়েছে—'ওয়া লাম ইয়াকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ' (এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই)। এখানে 'লাম ইয়াকুন' এর বিধেয় 'কুফুওয়ান'। এর উদ্দেশ্য 'আহাদুন'। আর 'লাহু' পদটি এখানে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে 'কুফুওয়ান' এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্পাকের পবিত্রতাও

অতুলনীয়, নিরূপম। একারণেই এখানে সম্পর্ককে উল্লেখ করা হয়েছে সম্পর্কযুক্ততার অগ্রে। শেষোক্ত তিনটি বাক্যই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যোজক অব্যয় সহকারে। এরকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথক পৃথক প্রত্যেক ধরনের অপমন্তব্যের মূলোৎপাটন করা।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত সূত্রসম্ভূত হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, আদমসন্তানেরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। অথচ এরকম করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তারা আমাকে গালি দেয়। এটাও অবৈধ। তার মিথ্যারোপের নমুনা হচ্ছে, তারা বলে, আল্লাহ্ প্রথমবার যা সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বার তা করতে সক্ষম হবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর। আর তাদের গালি হচ্ছে, তারা বলে, আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি আছে। অথচ আমি চির-অসমকক্ষ, এক-একক-অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী। আমি না জাতক, না জাত। আমি তো আনুরূপ্যবিহীন।

পরিচ্ছেদ ঃ হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ কোরআন পাঠ করতে পারো না? আমরা বললাম, তা কী করে সম্ভব? তিনি স. বললেন, সুরা ইখলাস পুণ্যের দিক দিয়ে এক তৃতীয়াংশ কোরআনের সমতুল। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন বোখারী। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আনাস থেকেও।

মাতা মহোদয়া আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক লোককে কিছুসংখ্যক সৈন্যসহ এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে নিয়ে নামাজ পাঠকালে প্রায়শ সুরা ইখলাস তেলাওয়াত করতেন। দলটি ফিরে এলে রসুল স. সমীপে সৈন্যরা বললো, তিনি এভাবে নামাজ পড়ালেন কেনো? রসুল স. বললেন, তাকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না, সে কী বলে। সৈন্যরা তাদের দলপতিকে যখন একথা বললো, তখন দলপতি বললো, এতে রয়েছে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণবত্তার অতুলনীয় বিবরণ। তাই আমি এ সুরাটিকে ভালোবাসি এবং অধিকাংশ সময় এই সুরা দিয়ে নামাজ পাঠ করি। রসুল স. এর কানে যখন তারা এ জবাব পৌঁছালো, তখন তিনি বললেন, তাকে বলে দিয়ো, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর সুমহান সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে বললো, সুরাটি আমার খুব ভালো লাগে। তিনি স. বললেন, এই ভাল লাগাই তোমাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিরমিজি। বোখারীও এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এক ব্যক্তিকে সুরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, অপরিহার্য হয়ে গেলো। আমরা সবিনয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কী অপরিহার্য হয়ে গেলো? তিনি স. বললেন, জান্নাত। মালেক, তিরমিজি, নাসাঈ। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি কর্তৃক

বর্ণিত এবং উত্তম ও বিরল শ্রেণীর আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি শয়নকালে ডান কাতে শুয়ে একশত বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। তিরমিজি ও দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন তার পঞ্চাশ বছরের পাপ। তবে তার ঋণের বোঝার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। অপর এক বর্ণনাতেও পঞ্চাশ বছরের পাপ মাফ করার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে ঋণের উল্লেখ নেই। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি এগারো বার 'কুল হুয়াল্লহু আহাদ' পাঠ করবে, তার জন্য বেহেশতে নির্মাণ করা হবে একটি গৃহ। আর কুড়িবার পাঠ করলে সেখানে নির্মিত হবে দু'টি প্রাসাদ। একথা শুনে হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহক! তা হলে তো আমাদের জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মিত হবে অনেক। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র দান এর চেয়েও অধিক সুপ্রশস্ত। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সূরা ফালাক্ব

মহাপুণ্যতীর্থ মদীনাভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে আয়াত রয়েছে ৫টি।

আবু সালেহ সূত্রে কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. কঠিন অসুখে পড়লেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, দু'জন ফেরেশতা এলো। একজন বসলো তাঁর শিয়রে, আর একজন পায়ের কাছে। দু'জনের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো এভাবে— এঁর কী হয়েছে? ইনি তো অসুস্থ। কী অসুখ? যাদুগ্রস্ততা। কে যাদু করেছে? ইহুদী লবীদ ইবনে আ'সাম। কীভাবে? চামড়ার ফিতায় যাদুমন্ত্র করে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে অমুক কূপের ভিতরে। যাও, সেটিকে বের করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। রসুল স. এর তন্দ্রা ভেঙে গেলো। ভোর হলো। রসুল স. হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে কথিত কূপে পাথরচাপা দিয়ে রাখা যাদুকৃত ফিতাটি উদ্ধার করে আনতে বললেন। তাঁরা অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দেশ প্রতিপালন করলেন। যাদুর ফিতাটি এনে দেখা গেলো, তার মধ্যে পেঁচানো রয়েছে একটি সূতা। সূতাটিতে রয়েছে এগারোটি গিঁট। এই ঘটনাটির প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। এই দুই সুরায় আয়াত রয়েছে মোট এগারোটি। তিনি স. একটি করে আয়াত পড়তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যেতে লাগলো একটি করে গিঁট। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে এরকমই বিবরণ দিয়েছেন।

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে আবু জাফর রাজী সূত্রে লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, একবার ইহুদীরা রসুল স. এর উপরে কিছু একটা করলো। তিনি স. পীড়িত হয়ে পড়লেন। শয্যাশায়ী রসুলের নিকটে অস্থির হয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন সাহাবীগণ। এমন সময় একদিন হজরত জিবরাইল আর্বিভূত হলেন সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস নিয়ে। রসুল স. সুরা দুটি দিয়ে তাবীজ বানালেন। সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেলো তাঁর পীড়া।

বাগবী লিখেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর ছিলো এক ইহুদী অনুচর। ইহুদীরা তাকে হাত করলো। তার মাধ্যমে তারা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো রসুল স. এর মস্তকের কেশ এবং তাঁর চিরুনীর কয়েকটি দাঁত। ওগুলোর সাহায্যে তারা রসুল স. এর উপরে যাদু করে বসলো। এ অপকর্মের মূল হোতা ছিলো লবীদ ইবনে আ'সাম। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয় সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, রসুল স. একবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রোগের প্রকোপে কখনো কখনো স্মৃতিভ্রমও ঘটতে লাগলো তাঁর। তাই কখনো কোনো কাজ না করেও তাঁর মনে হতো করেছেন। তিনি স. আল্লাহ্ সকাশে বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থনা করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র নিকট থেকে যা জানার দরকার ছিলো, তা আমি জেনে নিয়েছি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! খুলে বলুন তো বিষয়টা কী? বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক এলো। একজন দাঁড়ালো আমার মাথার দিকে, আর একজন পায়ের দিকে। একজন বললো, ইনি কষ্ট পাচ্ছেন কেনো? অন্যজন বললো, ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রথমজন বললো, কে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বললো, ইহুদী লবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথম জন— কিসের উপর। দ্বিতীয়জন— চিরুনী, চিরুনীতে লেগে থাকা চুল এবং পুরুষ খেজুর বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের উপর। প্রথমজন— ওগুলো কোথায় রাখা হয়েছে? দ্বিতীয়জন— বনী যুরাইকের কূপ যরওয়ানের মধ্যে। জননী বললেন, স্বপ্ন দেখার পর রসুল স. ওই কূপের পাশে উপস্থিত হলেন। ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! কূপটির পানি তো মেহেদীর মতো লাল। আর সেখানকার খেজুর গাছগুলো দেখতে ভূতের মতো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম জন! আপনি ওই লোকটিকে প্রকাশ্যে অপরাধী বলে চিহ্নিত করছেন না কেনো? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তো আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। তাছাড়া জনগণের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হোক, তা আমি চাই না। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, যাদুর পুঁটলিটি ছিলো কূপের তলদেশে একটি পাথরের নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায়। লোকেরা তা তুলে আনলো। দেখা গেলো ওটার মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর মাথার চুল ও চিরুনীর দাঁত।

হজরত ইয়াজিদ ইবনে আরকাম থেকে স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদী রসুল স.কে যাদু করেছিলো। ফলে তিনি স. খুব ক্লেশ ভোগ করছিলেন। এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল এসে তাঁকে জানালেন, এক ইহুদী আপনার উপর

যাদু করেছে। তিনি স. হজরত আলীকে পাঠিয়ে যাদুর সরঞ্জামগুলো উদ্ধার করে আনলেন। গ্রন্থিযুক্ত একটি সূতাতেই ছিলো যাদুর মূল মন্ত্র। একটা একটা করে গ্রন্থি খোলা হতে লাগলো। তিনিও একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। এভাবে সকল গ্রন্থি খোলা হলে তিনি লাভ করলেন পূর্ণ নিরাময়। মনে হলো তিনি যেনো বন্ধনমুক্ত হলেন। বিষয়টি তিনি স. ওই ইহুদীকে জানতেই দিলেন না।

জননী আয়েশা থেকে বায়হাকীর 'দালায়েল' গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এক ইহুদী রসুল স. এর উপর যাদু করেছিলো। একটি তন্তুতে এগারোটি গিরা দিয়ে সে ওই তন্তুটিকে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছিলো একটি কুয়ার তলায়। ফলে তিনি স. অপ্রকৃতিস্থিত হয়ে পড়লেন। কষ্ট পেতে লাগলেন খুব। এমন সময় নাজিল হলো সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। হজরত জিবরাইল এসে যাদুর স্থানের সন্ধান দিলেন। রসুল স. হজরত আলীর দ্বারা তন্তুটি উদ্ধার করে আনলেন। সদ্য অবতীর্ণ সুরা দু'টির এগারোটি আয়াত পাঠ করে তিনি স. খুলতে সমর্থ হলেন তন্তুটির এগারোটি গিরা। অবশেষে লাভ করলেন পূর্ণ উপশম। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. যাদুরোগে কষ্ট পেয়েছিলেন দীর্ঘ ছয়টি মাস। তার মধ্যে তিন রাতের কষ্ট ছিলো অসহনীয়। ওই সময়েই অবতীর্ণ হয় ফালাক্ব ও নাস।

মুসলিম লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, হজরত জিবরাইল তখন উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত জিবরাইল বললেন, পাঠ করুন বিসমিল্লাহি আরক্বীকা মিন কুললি শাই ইয়ুজীকা মিন শাররি কুললি নাফস্ আও আ'ইনিন হাসিদ আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লহি আরক্বীক।

সূরা ফালাক্ব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

- বল, 'আমি শরণ লইতেছি ঊষার স্রষ্টার
- 'তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,
- 'অনিষ্ট হইতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন উহা গভীর হয়
- 'এবং অনিষ্ট হইতে সমস্ত নারীদের, যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়
- 'এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।'

প্রথমে বলা হয়েছে 'কুল আউ'জু বিরব্বিল ফালাক্ব' (বলো, আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার)। এখানে 'আল ফালাক্ব' অর্থ অন্ধকার বিদীর্ণকারী ঊষালোক। জাবের

ইবনে হাসান, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদা এরকমই বলেছেন। 'ফালিক্বুল ইসবাহ্' আয়াতেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফালাক্ব' অর্থ বিদীর্ণ করা, ফেঁড়ে ফেলা। যেমন অর্থ গ্রহণ করা হয় 'ফালিক্বুল হাববি ওয়ান নাওয়া' আয়াত থেকে। যেমন সবজির বীজ ফেটে অংকুরোদ্গম ঘটে চারার। মেঘ ফেঁড়ে নামে বৃষ্টি। ভূমি বিদীর্ণ করে প্রবাহিত হয় স্রোতস্বিনী। গর্ভাশয় ফুঁড়ে বের হয় শিশু। জুহাক বলেছেন, এর মর্মার্থ— সমগ্র সৃষ্টি। ওয়ালেবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ফালাক্ব' জাহান্নামের একটি বন্দীশালা। কালাবী বলেছেন, দোজখের একটি উপত্যকা। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকের একটি অন্ধ কূপের নাম 'ফালাক্ব'। ইবনে জারীর ও বায়হাকী লিখেছেন, আবদুল জব্বার খাওলাদী বর্ণনা করেছেন, একবার দামেশকে আমাদের কাছে আগমন করলেন রসুল স. এর একজন শ্রদ্ধেয় সাহাবী। তিনি রা. লোকদেরকে পার্থিব কাজকর্মে অতিরিক্ত মগ্ন হতে দেখে বললেন, এতে এদের কোনো মঙ্গল নেই। এদের সম্মুখে কি ফালাক্ব নেই? জিজ্ঞেস করা হলো, হে মাননীয় রসুল-সহচর! 'ফালাক্ব' কী ? বললেন, ফালাক্ব হচ্ছে নরকের একটি কুয়া। ওই কুয়ার মুখ উন্মুক্ত করা হলে তার ভিতর থেকে এমন উত্তপ্ত আগুন বের হবে যে, তার ভয়ে নরক নিজেই আর্তনাদ করে উঠবে।

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, আল ফালাক্ব জাহান্নামের একটি গৃহ। ওই গৃহের দরজা যখন খোলা হবে, তখন তার ভয়াবহ উত্তাপ দেখে জাহান্নামবাসীরা ভয়ে চীৎকার করে উঠবে। জায়েদ ইবনে আলী তাঁর পিতৃস্থানীয় ইমাম হোসাইন ইবনে হজরত আলীর বরাত দিয়ে বলেছেন, আল ফালাক্ব হচ্ছে জাহান্নামের তলদেশের একটি কূপ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'রব্বিল ফালাক্ব' (ফালাক্বের প্রভুপালনকর্তা)। এরকম বলা হয়েছে একথাটি বুঝাতে যে, জাহান্নাম ও ফালাক্বের যিনি অধিপতি, তিনিই কেবল বাঁচাতে পারেন এদু'টোর ভয়ংকর অকল্যাণ থেকে। কাজেই এদু'টোর অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেতে চাইলে শরণ গ্রহণ করতে হবে কেবল তাঁর।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মিন শাররি মা খলাক্ব' (তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে)। এখানে 'মা খলাক্ব' অর্থ যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যাবতীয় সৃষ্টির অমঙ্গল থেকে ফালাক্বের মালিকের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাই। উল্লেখ্য, কোনো সৃষ্টিই অনিষ্টতামুক্ত নয়। আদম অর্থাৎ অনস্তিত্বের কলংক রয়েছে প্রতিটি সৃষ্টির মূলে। তবে ওই কলংক থেকে সৃষ্টি মুক্তি নিতে পারে কেবল আল্লাহ্পাকের জ্যোতিসম্পাতের আলোকে আলোকিত হলে। তখন তার অপকর্ষতা রূপান্তরিত হয় উৎকর্ষতায়, যেমন আলোর উদ্ভাস ঘটলে অন্ধকারও হয়ে যায় আলো। যেমন

এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তখন তার পাপকে পুণ্যে পরিণত করে দেন'। রসুল স. বলেছেন, আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গিয়েছে। সে আমাকে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্টের পরামর্শ দেয় না। আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক এখানেও কেবল সৃষ্টিজগতের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় যাচনা করতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জগতের উল্লেখ করেননি। কেননা সেখানে কোনো অনিষ্টতাই নেই। সেখানে তো কেবল কল্যাণ আর কল্যাণ। সৃষ্টিজগতের অনিষ্টতা কখনো হয় ইচ্ছাকৃত, যেমন জুলুম, অথবা স্বভাবগত যেমন আগুনের দাহিকাশক্তি, বিষের সংহারক ক্ষমতা।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ওয়া মিন শাররি গসিক্বিন ইজা ওয়াক্বাব' (অনিষ্ট হতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়)। 'গসাক্ব' এর আভিধানিক অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া, ভরপুর হওয়া। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইলা গসাক্বিল লাইলি' (রাত্রের আঁধার পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত)। এভাবে 'গসাক্বাল আ'ঈন' অর্থ অশ্রুভরা আঁখি। 'গসাক্বাল ক্বমার' অর্থ পূর্ণ চন্দ্রালোক। কামুস অভিধানে লেখা রয়েছে 'গসিক্ব' অর্থ চাঁদ, এবং রাত; যখন অপসৃত হয় রক্তিম গোধূলি। 'গাসাক্বন' এবং 'আগসাক্বন' অর্থ অন্ধকার হয়ে যাওয়া।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন 'গসাক্ব' অর্থ প্রবাহিত হওয়া। এভাবে 'গসাক্বাল লাইল' অর্থ রাতের আঁধার ও কুয়াশায় ঘেরা। 'গসাক্বাল আ'ঈন' অর্থ অশ্রুপ্রবাহ। 'গসাক্বাল ক্বমার' অর্থ চাঁদের দ্রুত অস্তগমন। কেউ কেউ বলেছেন, 'গসাক্ব' অর্থ শীতলতা, যেমন শীতের রাত দিবস অপেক্ষা শীতল। চাঁদ সূর্য অপেক্ষা কোমল। রাত ও চাঁদকে 'গসাক্ব' বলা হয় এ জন্যই। এরই ভিত্তিতে চাঁদকে বলে 'যামহারীর'— অত্যন্ত শীতল।

এখানে 'গসাক্ব' অর্থ হবে চাঁদ। কেননা মাতা মহোদয়া আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, এক রাতে রসুল স. আমার হাত ধরলেন এবং চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্র নিকট ওই গসিক্বের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কোরো, যখন তা অস্তগামী হয়। স্বসূত্রে বাগবী।

'ইজা ওয়াক্বাব' অর্থ যখন তা গভীর হয়। অর্থাৎ যখন তা হতে থাকে দ্যুতিহীন, অদৃশ্য। বলা বাহুল্য, চাঁদ ক্ষয় হতে থাকে পূর্ণ কিরণ্ময় হওয়ার পর থেকে, পূর্ণিমা রজনী থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী এবং মুজাহিদ বলেছেন 'গাসাক্ব' অর্থ রাত্রি। অর্থাৎ রাত্রির আগমনলগ্নে তার অন্ধকার আবৃত করে অপসৃয়মান আলোকে। ইবনে জায়েদ বলেছেন 'গাসাক্ব' অর্থ আকাশের নিচের দিকে অপসৃয়মান সপ্তর্ষিমণ্ডল, স্বল্প সময়ের মধ্যে যা চলে যায় অস্তাচলে। কারণ মানুষ বলে থাকে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমনকালে প্রকোপ বাড়ে বিপদাপদের। আর সে বিপদ কেটে যায় তার উদয়কালে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ওয়া মিন শাররিন্ নাফ্ফাছাতি ফীল উ'ক্বাদ' (এবং অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীর, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়)। এখানকার

'নাফ্ফাছাতি' স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনীয় শব্দরূপ। শব্দটির বিশেষ্যপদ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ যাদুকর নর-নারী, যারা মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে এবং রসুল স. এর উপরে যাদু করার সময় সুতায় ফুৎকার দেয়। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, লবীদের নির্দেশে তার কন্যারাই এরকম করেছিলো।

শেষ আয়াতে (৫) বলা হয়েছে 'ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইজা হাসাদ' (এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে)। এরকম করে বলা হয়েছে এখানে একথাটি বুঝাতে যে, মনের ভিতরের গোপন হিংসা দগ্ধ করে হিংসাকারীকে। কিন্তু অন্যের জন্য তা ক্ষতিকর হয় তখন, যখন সে হিংসা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যখন সে অন্যের উপরে হিংসা চরিতার্থ করে।

উল্লেখ্য 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে' (আয়াত ২) কথাটির মধ্যে সব ধরনের অনিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। তার পরেও বলা হয়েছে 'গসিক্ব' 'নাফ্ফাছাত' ও 'হাসিদ' এই তিনটি অনিষ্টতার কথা। এর কারণ হচ্ছে, রসুল স. এর উপরে যে যাদু করা হয়েছিলো তার মধ্যে ওই তিন ধরনের অনিষ্টতাই ছিলো। ছিলো যাদু, প্রতারণা ও হিংসা। আবার 'হাসিদিন' ও 'গাসিক্বিন' অনির্দিষ্টবাচক এবং 'আন নাফ্ফাছাতি' নির্দিষ্টবাচক। এভাবে এখানে তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার কারণ হচ্ছে, লবীদের কন্যারা ছিলো নির্দিষ্ট ব্যক্তি। তাই তাদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় যাচনা করা হয়েছে নির্দিষ্টবাচক শব্দরূপের মাধ্যমে। রসুল স. এর প্রতি হিংসাপোষণকারীরা অসংখ্য। আর তারা সুচিহ্নিতও নয়। তাই তাদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা উপস্থাপন করা হয়েছে অনির্দিষ্টবাচক শব্দরূপের মাধ্যমে।

হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আমি সুরা ইউসুফ ও সুরা হুদ পাঠ করে থাকি। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারীরূপে সুরা ফালাক্বের মতো আর কিছু নেই। আহমদ, দারেমী, নাসাঈ। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

সূরা নাস

এই সুরার অবতরণস্থল ও মহাপুণ্যতীর্থ মদীনা। এর মধ্যে আয়াত রয়েছে ৬টি।

সূরা নাস ঃ আয়াত **১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

r বল, 'আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,
r 'মানুষের অধিপতির,
r 'মানুষের ইলাহের নিকট
r আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার 'অনিষ্ট হইতে,
r 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
r 'জিন্নের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে 'কুল আঊ'জু বি রব্বিন্ নাস' (বলো আমি শরণ গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের)। এখানে 'বলো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। আর এখানে 'রববিন্ নাস' অর্থ মানুষের প্রভুপালক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার প্রার্থনায় বলুন, মানুষের যিনি স্রষ্টা, পালয়িতা ও ব্যবস্থাপয়িতা, আমি সেই মহান প্রভুপালনকর্তারই শরণ যাচনা করি।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মালিকিন নাস' (মানুষের অধিপতির)। অর্থাৎ সেই প্রভুপালয়িতার কাছেই আমি শরণ প্রার্থনা করি, যিনি মানুষের অস্তিত্বেরও অধিপতি।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ইলাহিন্ নাস্' (মানুষের ইলাহের নিকট)। বাক্যটি আগের বাক্যদু'টোর বিস্তৃতি বা বিবৃতি। অর্থাৎ শরণ কামনা করি আমি সেই প্রভুপালক ও অধিকর্তার নিকট, যিনি একমাত্র উপাস্যও। কেননা পালয়িতা তো বলা হয় মাতা-পিতাকে, অথবা অন্যান্য অভিভাবককেও। আবার অধিপতি বলা হয় রাজা-বাদশাহকেও। কিন্তু উপাস্য তারা কদাচ নন। আল্লাহ্র প্রতিপালকত্ব ও অধিপতিত্ব যে অন্য কারো মতো নয়, সেকথা প্রমাণার্থেই তাই অবশেষে বলা হয়েছে 'মানুষের উপাস্যের নিকট'। অর্থাৎ তিনি পালনকর্তা ও অধিপতিই কেবল নন, তিনি উপাস্যও।

এখানকার 'আন্ নাস্' (মানুষ) পদটির নির্দিষ্টবাচক 'আলিফ লাম' সীমিতার্থক। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সীমিত-সংখ্যকদেরকে। অর্থাৎ রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে। আল্লাহ্পাকের পালকত্ব, আধিপত্য ও উপাস্য হওয়ার বিষয়টি সার্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও এখানে বিশেষভাবে তাঁদেরকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য তাঁদের বিশেষ মর্যাদাকে প্রকাশ করতে। এর আরো একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, এই সুরা দুটো অবতীর্ণই করা হয়েছে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবর্গের উপর থেকে যাদুর প্রভাবকে চিরতরে তিরোহিত করা। কেননা পাল্যজনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব বহন করতে হয় পালনকর্তাকেই। গউছুছ্ ছাকালাইন বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী তাই বলেছেন—

'যখন তুমিই আমার পৃষ্ঠদেশের আশ্রয়, তখন আমার কাছে কি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আসতে পারে? পৌঁছতে কি পারে আমার কাছে কোনো জুলুম, যখন তুমিই আমার সাহায্যদাতা? চারণভূমির রক্ষাকর্তা যদি তা রক্ষা করতে সমর্থ হয়, আর এদিকে

হারিয়ে যায় উটের পা বাঁধার রশি, তবে কি তার জন্য এটা লজ্জার ব্যাপার নয়? অবিশ্বাসীরাও আল্লাহ্র প্রভুপালকত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের অধীন। তবুও আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয়ই নেই। তাই তারা তাঁর হেফাজত থেকে বঞ্চিত। একারণেই আহযাব যুদ্ধের সময় রসুল স. তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমাদের পালনকর্তা আছেন, তোমাদের কোনো পালনকর্তা নেই।

২ ও ৩ সংখ্যক আয়াতে পুনঃপুনঃ 'মানুষ' উল্লেখ না করে সর্বনাম ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তা করা হয়নি ব্যাখ্যাটিকে সুদূরপ্রসারী করণার্থে এবং রসুল স. ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীগণের সূউচ্চ মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। উল্লেখ্য, সুরা ফালাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে দৈহিক দুর্বিপাক থেকে আশ্রয় গ্রহণের, যে দুর্বিপাকে পতিত হতে থাকে মানুষসহ অন্য সকল সৃষ্টি। তাই সেখানে বলা হয়েছে 'রব্বিল ফালাক্ব'। কিন্তু এখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে হৃদয়ঘটিত অনিষ্টতা থেকে, যা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেকারণেই এখানে 'রব' (প্রভুপালক)কে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে মানুষের সাথে। বলা হয়েছে 'রববিন্ নাস'। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মানুষকে প্রবঞ্চনায় নিক্ষেপকারী প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনিষ্টতা থেকে আমি শরণ গ্রহণ করছি কেবল আল্লাহ্র, যিনি মানুষের কার্যাবলীর অধিপতি এবং মানুষের একমাত্র উপাস্য।

উল্লেখ্য, এই সূরার ৬টি আয়াতের মধ্যে ৫টিতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'আন্ নাস' (মানুষ)। সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি একটিতেও। এভাবে এখানে বক্তব্যকে করে তোলা হয়েছে অধিকতর উদ্দেশ্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ, সর্বনাম ব্যবহার করলে যা হতো না। তাছাড়া এখানে প্রতিটি আয়াতের উদ্দেশ্যও পৃথক পৃথক। সর্বনাম ব্যবহার করলে উদ্দেশ্যের এই পৃথকতাও প্রকাশ পেতো না। বক্তব্যটি হয়ে যেতো একমুখী। তাই কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন ১. প্রথমোক্ত 'আন্ নাস' অর্থ মানব শিশু, যারা লালন পালনের মুখাপেক্ষী। সেজন্যই বলা হয়েছে 'রব্বিন্ নাস' (মানুষের প্রতিপালকের) ২. দ্বিতীয় আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ যুবক, যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে। রাষ্ট্ররক্ষায় তাদের প্রয়োজন অনিবার্য। তাই বলা হয়েছে 'মালিকিন্ নাস' (মানুষের অধিপতির) ৩. তৃতীয় আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ বয়োপ্রবীণ, যারা পার্থিব কর্মকাণ্ড থেকে অবকাশ পেয়ে নিমগ্ন হয় এক আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতে। তাই বলা হয়েছে 'ইলাহিন্ নাস' (মানুষের ইলাহের নিকট) ৪. পঞ্চম আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ পরিশুদ্ধ মানুষ, যারা শয়তানের শত্রু। তাই আশ্রয় কামনা করতে বলা হয়েছে এভাবে 'মিন শাররিল ওয়াস্ওয়াসিল্ খন্নাস' (যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে) ৫. ষষ্ঠ আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ শয়তান প্রভাবিত মানুষ। অর্থাৎ শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, তেমনি কুমন্ত্রণা দেয় তার দলভূত মানুষেরাও। তাই তাদের অপপ্রভাব থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এখানে। রসুল স. বলেছেন, যদি অথর্ব বৃদ্ধ, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও চারণশীল চতুষ্পদ জন্তু না থাকতো, তাহলে তোমাদের উপরে নেমে আসতো শাস্তি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু

ইয়াসা, বাযযার ও বায়হাকী। এর সমর্থনে রয়েছে আরো একটি অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিস, যা জুহুরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম। আবার এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যদি বিশ্বাসী নর-নারী না থাকতো, যাদেরকে তোমরা জানতেনা ......' শেষ পর্যন্ত।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য সুরার বাক্যগুলোর গতিধারা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌পাক পুনরুত্থান ঘটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর বাক্যগুলোর ধারাবাহিক বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষের জন্য মর্যাদার স্তরও রয়েছে অনেক। তবে এমন স্তরের রহস্যভেদ করতে পারেন কেবল তাঁরা, যাঁরা আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য। তাঁরা আল্লাহ্‌র বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অভিভূত হয়ে যান। হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে পারেন, অবশ্যই আল্লাহ্ একমাত্র প্রভুপালয়িতা, যিনি কারোরই মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির প্রতিটি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন সেই আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্‌ই, অন্য কেউ নয়। তিনিই মালিক, মোখতার এবং সর্বাধিপতি। সুতরাং তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'মিন শাররিল ওয়াস্‌ওয়াসিল খন্‌নাস' (আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে)। এখানকার 'আল ওয়াস্‌ওয়াসি' নামপদ, অর্থ কুমন্ত্রণা।হ্রস্ব থেকে অতিহ্রস্ব ধ্বনির নাম 'ওয়াস্‌ওয়াসা', যা কেবল হৃদয়ে অনুভব্য, শ্রুতির অতীত। এখানে 'ওয়াস্‌ওয়াসা' বলে বুঝানো হয়েছে শয়তানের সেরূপ সূক্ষ্ম কুমন্ত্রণাকে। অথবা বলা যায়, আধিক্য বুঝানোর জন্যই এখানে ধাতুমূলকে ব্যবহার করা হয়েছে কর্তৃবাচক শব্দরূপের স্থলে। কিংবা এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপণকারী। এরকম বলেছেন জুজায।

এখানকার 'আল খন্‌নাস' (আত্মগোপনকারী) শব্দটি 'আল ওয়াস্‌ওয়াসা' (কুমন্ত্রণা) এর বিশেষণ। শব্দটির ধাতুমূল 'খনসুন' বা 'খুনসুন' অর্থ চুপিসারে পশ্চাদপসরণ করা। এটাই শয়তানের রীতি। যখন আল্লাহ্‌র জিকির করা হয়, তখন সে চুপিসারে পিছনে হটে যায়। এ জন্যই তাকে এখানে বলা হয়েছে 'আত্মগোপনকারী'। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের হৃদয়ে আছে দুইটি কুঠরী— একটিতে থাকে ফেরেশতা, অপরটিতে শয়তান। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র জিকিরে মগ্ন হয়, তখন শয়তান পিছনে সরে যায়। আর যখন মানুষ জিকির থেকে উদাসীন থাকে, তখন সে তার ঠোঁট দিয়ে হৃদয়ে ঠোকর মারতে থাকে। এভাবে হৃদয়ে প্রক্ষেপ করে প্ররোচনা। আবু ইয়ালা। তিনি এই হাদিসটি হজরত আনাস থেকেও বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আল্ লাজী ইউওয়াস্‌উইসু ফী সুদূরিন্ নাস' (যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে)। একথার অর্থ— মানুষ যখন আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত হয়, তখন শয়তান তার অন্তরে দেয় কুমন্ত্রণা। এভাবে এখানে বিবৃত হয়েছে 'ওয়াস্‌ওয়াসা' পদের দ্বিতীয় বিশেষণ। শব্দটিতে যের যুক্ত করা হয়েছে সে কারণেই।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ‘মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান্ নাস’ (জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে)। এই বাক্যটিও ‘ওয়াস্ওয়াসা’র বিবরণ, অথবা বিবরণ ‘আল্ লাজী’র। অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জ্বিনের মধ্য থেকে যেমন হয়, তেমনি হয় মানুষের মধ্য থেকেও। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আমি মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়ে দিয়েছি’। সারকথা হচ্ছে, আলোচ্য সুরার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুল এবং তাঁর অনুগামীগণকে জ্বিন ও মানুষের অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে আল্লাহ্ সকাশে আশ্রয় যাচনা করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

একটি সংশয় ঃ একজন মানুষ আর এক জন মানুষের হৃদয়ে তো প্রবেশ করতে পারে না। তাহলে মানুষ কুমন্ত্রণাদাতা, এরকম বলার অর্থ কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ মানুষও কুমন্ত্রণাদাতা। তবে তাদের কুমন্ত্রণা প্রভাব বিস্তার করে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে। মানুষের কথা অন্য মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেই। তখন হৃদয়ে কার্যকর হয় কুমন্ত্রণা। অথবা এখানকার ‘মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান নাস’ কথাটি সম্পৃক্ত হবে আগের আয়াতের ‘ওয়াস্ওয়াসা’ পদের সাথে। অর্থাৎ মানুষের মনের ভিতর জ্বিন ও মানুষ বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। কালাবী বলেছেন, আগের আয়াতের ‘কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে’ কথাটিতে যে মানুষ উদ্দেশ্য ‘জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে’ বাক্যে দেওয়া হয়েছে তারই পরিচয়। যেনো মানুষ জ্বিন ও মানুষ উভয়ের কুমন্ত্রণার ধারক। ‘নাস’ অর্থ আবার জ্বিনও হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ওয়া আন্নাহু কানা রিজ্বালুম মিনাল ইনসি ওয়া ইয়াউজুনা বি রিজ্বালিম মিনাল জ্বিননি’। এই আয়াতে রিজ্বালুম মিনাল ইনসি’ (অনেক লোক) বলে বুঝানো হয়েছে জ্বিনদেরকে)। বাগবী লিখেছেন, এক বেদুইন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, একদিন তার সামনে একদল জ্বিন উপস্থিত হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে? তারা বললো, আমরা জ্বিনদের লোক। ফাররার বক্তব্যও এরকম। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার বক্তব্যটি হবে— আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি জ্বিনজাতীয় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি জানো, আজ রাতে এমন কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, যার মতো ইতোপূর্বে আর অবতীর্ণ হয়নি। শোনো, সদ্য অবতীর্ণ সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। মুসলিম। আহমদের বর্ণনায় বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে, রসুল স. একবার বললেন, আমি কি তোমাদের এমন সুরা শিক্ষা দিবো না, যার অনুরূপ কোরআনে, যবুরে এবং ইঞ্জিলে নেই? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! অবশ্যই শিক্ষা দিন। তিনি তখন আবৃত্তি করলেন সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণের সময় সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস পাঠ করে দুই হাত একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন। তারপর দুই হাত দিয়ে মুছে ফেলতেন তাঁর পবিত্র শরীর। মুছতেন মস্তক, মুখমণ্ডল, দেহের উভয় পার্শ্ব, যতদূর হস্ত প্রসারিত করা যায়। এরূপ করতেন তিনি তিনবার। মুসলিম।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, এক যাত্রায় আমি ছিলাম রসুল স. এর সহগামী। জুহফা এবং আবওয়ার মাঝখানে পথ চলার সময় হঠাৎ শুরু হলো ঝড়। অন্ধকার আমাদেরকে ঢেকে ফেললো। রসুল স. সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস পাঠ করে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করতে লাগলেন। আমাকে বললেন, উকবা! তুমিও এমন করো। আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। ওভাবে কেউ কখনো আল্লাহ্ সকাশে সাহায্যপ্রার্থী হয়নি। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব বর্ণনা করেছেন, এক রাতে মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। চরাচর ঢেকে গেলো ঘোর অন্ধকারে। আমরা রসুল স. এর শরণাপন্ন হলাম। তিনি স. বললেন, বলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কী বলবো? তিনি স. বললেন, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। এই তিনটি সুরা সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পাঠ করলে তোমরা রক্ষা পাবে যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস পাঠ করে তাঁর নিজের উপরে ফুঁক দিতে লাগলেন। যখন খুব বেশী দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন আমিই সুরা দু'টো পাঠ করে তাঁর উপর ফুঁক দিতে লাগলাম। কিন্তু ফুঁক দিতাম তাঁর হাতে, আর তাঁর হাতই বুলিয়ে দিতাম তাঁর পবিত্র শরীরে। বাগবী।

কোরআনের মাহাত্ম্য

হজরত ওসমান ইবনে আফফান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়। বোখারী, মুসলিম। বায়হাকী তাঁর 'আল আসমা' গ্রন্থে অতিরিক্তরূপে সংযোজন করেছেন এই কথাটুকু— সকল গ্রন্থের উপরে কোরআনের মর্যাদা ওইরূপ, যে রূপ মর্যাদা স্রষ্টার, তার সৃষ্টির উপর।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই ধরনের লোকের প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ। তার মধ্যে এক ধরনের লোক এরকম— আল্লাহ্ যাকে দান করেছেন কোরআন। আর সে দিবারাত্রি জড়িত থাকে কোরআনের সঙ্গে। অপর ব্যক্তি সে, যাকে আল্লাহ্ দান করেছেন অঢেল সম্পদ, আর সে তার সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতে থাকে আল্লাহ্‌র পথে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে তিনটি বস্তু আরশের নিচে স্থান পাবে— ১. কোরআন, যার রয়েছে দু'টি দিক, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ২. আমানত ৩. স্বজনবন্ধন। স্বজনবন্ধন তখন চীৎকার করে বলতে থাকবে, শোনো, যে আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলো, আজ আল্লাহ্ও তাকে তাঁর স্বজন বলে গণ্য করবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করেছিলো, আজ আল্লাহও তাঁর সামীপ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন তাকে।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে কোরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করো এবং উন্নতমান হও। আবৃত্তি করো মধুর স্বরে, যেমন মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করতে পৃথিবীতে। সেখানে যেখানে শেষ করেছিলে, সে স্থানই তোমার মাকাম। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জ্বিন ও মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, যাকে তার কোরআন তেলাওয়াত আমার জিকির থেকে বিরত রাখে, তাকে আমি দান করব প্রার্থনাকারী অপেক্ষা অধিক। সকল বাণীর উপরে আল্লাহ্র বাণীর মর্যাদা ওই রূপ, যেরূপ মর্যাদা স্রষ্টার, তাঁর সৃষ্টির উপর।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করে, সে লাভ করে দশটি পুণ্য। আর একটি পুণ্যকে করা হবে দশগুণ। আমি এরকম বলিনা যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর। তেমনি পৃথক পৃথক অক্ষর লাম ও মীম। তিরমিজি, দারেমী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রপরম্পরাগত, বিশুদ্ধ ও বিরল শ্রেণীর। হারেছ ইবনে আওয়ার বর্ণনা করেছেন, আমি একবার এক মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, মসজিদের ভিতরে কিছু লোক হাদিস সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছে। আমি খলিফা হজরত আলীর নিকটে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তারা এরকম করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শোনো, রসুল স. একবার বললেন, সাবধান! অচিরেই ফেৎনার উদ্ভব ঘটবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! তাহলে আমাদের উপায় কী হবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র বাণী পাক কোরআন, যাতে রয়েছে অতীতের ইতিবৃত্ত, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা। তোমাদের জীবনযাপনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে কোরআনে। এ নিয়ে কেউ যেনো কৌতুক না করে। কোনো অত্যাচারীর কারণে যদি কেউ একে পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ ওই অত্যাচারীকে ধ্বংস করে দিবেন। কোরআনকে ছেড়ে কেউ যদি অন্য উপায়ে পথপ্রাপ্তির অভিলাষী হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করে দিবেন। এটাই আল্লাহ্পাকের সুদৃঢ় রজ্জু। এর মধ্যেই রয়েছে শুভউপদেশমূলক মহাজ্ঞান। এটা এমন মহান গ্রন্থ, যাকে মান্য করে চললে প্রবৃত্তি কখনো বক্র-পথাভিমুখী হবে না। বচনে থাকবে না কোনো দোদুল্যমানতা। জ্ঞানান্বেষীগণ এ গ্রন্থ বার বার পড়েও পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃ পুনঃ পাঠ করলেও

এর আবেদন কখনো ক্ষুণ্ন হবে না। এর বিস্ময় অনিঃশেষ। এটা ওই গ্রন্থ, যার সংস্পর্শে জ্বিন জাতির ঔদাসীন্য দূরীভূত হয়েছিলো। তারা বলেছিলো, আমরা এমন বিস্ময়কর বাণী শ্রবণ করেছি, যা প্রদর্শন করে সরল পথ। আমরা এর উপরে ইমান এনেছি। এই কোরআনের অনুসরণে যে কথা বলবে, সে সত্য বলবে। যে এর বিধানাবলীর উপরে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে, সে উত্তম বিনিময় লাভ করবে। যে এর আলোকে মীমাংসা করবে, সে সুবিচার করবে। এর প্রতি যে আমন্ত্রণ জানাবে, সে পেয়ে যাবে সরল পথ। তিরমিজি, দারেমী।

হজরত মুয়াজ জুহুনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে, কার্যকর করে কোরআনের নির্দেশাবলী, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তার পিতামাতার মাথায় পরিয়ে দিবেন এমন মুকুট, যা হার মানাবে দিবাকরের প্রখরতাকেও, যে দিবাকরকে তোমরা প্রত্যক্ষ করো তোমাদের আপন আপন আবাস থেকে। এখন অনুমান করো ওই ব্যক্তিটির মর্যাদা হবে কী রকম? আহমদ, আবু দাউদ।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, কোরআন পাক চামড়ার উপরে রেখে ওই চামড়া আগুনের উপরে রাখলে কোরআনপাক আগুনে পুড়বে না। দারেমী। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন মজীদ পাঠ করে এবং একে বানিয়ে নেয় তার পশ্চাতের ঢাল, এতে বর্ণিত হালালকে মেনে নেয় হালাল হিসাবে এবং হারামকে মনে করে হারাম, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তার পরিবারের এমন দশজনের জন্য তাকে শাফায়াত করবার অনুমতি দিবেন, যাদের জন্য অপরিহার্য হয়েছিলো জাহান্নাম। তিরমিজি, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজের বাইরে কোরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষা, নামাজের অভ্যন্তরে কোরআন তেলাওয়াত উত্তম। আবার নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করা তসবীহ, তকবীর অপেক্ষা উত্তম। আর রোজা দোজখ থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল। হজরত আউস সাকাফী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, না দেখে কোরআন পাঠ করার মর্যাদা এক হাজার। আর দেখে পাঠ করার মর্যাদা তার দ্বিগুণ। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, কোনো কোনো হৃদয়ে মরিচা পড়ে যায়, যেমন লোহাতে মরিচা পড়ে পানির পরশে। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সে মরিচা পরিষ্কার করার উপায় কী? তিনি স. বললেন, মৃত্যুর স্মরণ এবং কোরআন পাঠ। উপরোল্লিখিত হাদিসত্রয় বায়হাকী সংকলন করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এতো অধিক একাগ্রতার সঙ্গে তাঁর নবীর কোরআন তেলাওয়াত শোনেন যে, সেরকম করে অন্য কিছুই শোনেন না। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ উৎকর্ণ হয়ে কারো সুললিত স্বরের কোরআন তেলাওয়াত শোনেন না, যেমন উৎকর্ণ হয়ে শোনেন তাঁর নবীর সুললিত স্বরবিশিষ্ট সশব্দ তেলাওয়াত। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি আমাদের দলভূত নয়, যে সুললিত কণ্ঠে কোরআন আবৃত্তি করে না।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা কোরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলো একজন অনারব গেঁয়ো লোক। এমন সময় রসুল স. সেখানে উপস্থিত হলেন। বললেন, পাঠ করো। তোমাদের প্রত্যেকের পাঠ উত্তম। অচিরেই এমন লোকের আগমন ঘটবে, যারা কোরআনের পাঠপদ্ধতি সোজা করে ফেলবে, যেমন সোজা করা হয় তীর। অর্থাৎ তারা পাঠ করবে অতিদ্রুত। আর এমতো পাঠের বিনিময় তারা এ জগতেই নিয়ে নিবে। পরজগতের পুণ্যলাভের আকাংখাও তাদের থাকবে না। আবু দাউদ, বায়হাকী।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন আবৃত্তি কোরো আরবী পাঠরীতি ও আরবী স্বরে। গায়কদের রাগ-রাগিনী এবং গ্রন্থধারীদের পাঠপদ্ধতি পরিহার কোরো। আগামীতে এমন কিছুসংখ্যক লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটবে, যারা কোরআন আবৃত্তি করবে গায়কী ঢঙে, রাগ-রাগিনী সহযোগে। তাদের তেলাওয়াতের প্রভাব তাদের কণ্ঠনালীর নিচে পৌঁছবে না। তাদের হৃদয় হবে ফেৎনাভরা। তারাও ফেৎনায় পতিত হবে, যারা তাদেরকে ভালোবাসবে। বায়হাকী, ইবনে রযীন। হজরত উবায়দা মুলাইকি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওহে কোরআনের অধিকারী! কোরআন মজীদকে উপাধান বানিয়ো না। দিনে রাতে তেলাওয়াত কোরো। তেলাওয়াতের হক আদায় কোরো। পাঠ কোরো সুললিত কণ্ঠে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে। এর প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট হয়ো এবং এর বিষয়ে গবেষণাও কোরো, যেনো অর্জন করতে পারো সফলতা। পার্থিব বিনিময়প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাড়াহুড়া করে পাঠ কোরো না। এর প্রকৃত বিনিময় তো লাভ হবে পরকালে। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন পাক হচ্ছে উত্তম প্রতিষেধক। ইবনে মাজা। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করছেন, রসুল স. বলেছেন, মধু ও কোরআন সকল ব্যাধির উপশমক। ওয়াইলা ইবনে আসকা বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তার কণ্ঠনালীর ব্যথার কথা জানালো। তিনি স. বললেন, কোরআন পাঠ করতে থাকো। বায়হাকী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আমার বুকে খুব ব্যাথা। তিনি স. বললেন, কোরআন পাঠ করতে থাকো। আল্লাহ্ তো স্বয়ং বলেছেন 'শিফাউল লিমা ফীস্ সুদুর' (বক্ষে যা আছে তার নিরাময়ক)।

হজরত তালহা ইবনে মাতরাফের বর্ণনায় এসেছে, যখন কোনো রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন দেখা যায় তার রোগের প্রকোপ কমে আসছে। রসুল স. এর যুগেও এরকম বলা হতো। আবু উবায়দা। আল্লাহ্ই প্রকৃত পরিজ্ঞাতা।

আলহামদু লিল্লাহি রববিল আ'লামীন ওয়া সল্লাল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্বমাঈন। আমিন।

সমাপ্ত